উদ্বোধন সূচী

২৬ বর্ষ—মাঘ ১৩৩০ হইতে পৌষ ১৩৩১

	প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	অ		
১।	অখণ্ড বেদ (কবিতা)	শ্রীনিবারণচন্দ্র নন্দী	৩৪৭
২।	অঞ্জলি	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৬
৩।	অবতার তত্ত্ব	ব্রহ্মচারী ঈশানচৈতন্য	১২৯
	আ		
১।	আঁধার ও আলোক (কবিতা)	শ্রীগিরিশচন্দ্র সরকার	৩১৭
২।	আহ্বান (কবিতা)	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫১৩
	ঈ		
১।	ঈশ্বর	শ্রীসত্যবালা দেবী	১৫১
	উ		
১।	উদ্বোধন	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	১
২।	উৎসব	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	২৩৬
	এ		
১।	এরিষ্টটল ও আত্মা	শ্রীকানাইলাল পাল এম-এ, বি, এল	৭৪৩
	ক		
১।	কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি-এল	৪২৭, ৪৯০
২।	কর্ম্ম	শ্রীবিমলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৬
৩।	কামাখ্যাকূট (কবিতা)	শ্রীসুধীরচন্দ্র চাকী	৫৩৩
৪।	কল্পনা (কবিতা)	শ্রীমলিনাবালা দাসী	৬৯৮

প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
গ		
১। গান	স্বামী অসিতানন্দ	৬২
২। গ্রন্থপরিচয়		৬২, ১২৪, ১৯১, ২৫২, ৩১৮, ৩৮৩, ৪৪১, ৫১০, ৫৭৪, ৬৩৫, ৬৯৯, ৭৬৫
চ		
১। চণ্ডী	ডাঃ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বি-এ, এম-বি	৫২৪
জ		
১। জ্ঞান ও ভক্তি	শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	২৪
২। জড় বিজ্ঞান মায়াবাদ	স্বামী বাসুদেবানন্দ	৭২৮
৩। জীবন-রহস্য	শ্রীজ্যোতিন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩০, ৩৯৩
ত		
১। তত্ত্ব-কথা (কবিতা)	বিজ্ঞানী	৩৩৮
দ		
১। দুঃখের ভিতর সুখ	শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গোস্বামী	১০৫
২। দেশের দুঃখ	ঐ	৪১২
ধ		
১। ধনি-দরিদ্র সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপায়	শ্রীসাহাজী	২৭৩, ৪১৯
২। ধর্ম্মের স্বরূপ	শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়	১৭২, ২১২
ন		
১। নিবেদিতা (কবিতা)	শ্রীনিহারিকা দেবী	৫০৮
২। নির্ব্বাণ (কবিতা)	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কাব্যরত্ন, দর্শনশাস্ত্রী	১৩৬

প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
প		
১। প্রকৃত স্বাধীনতা	স্বামী কেশবানন্দ	৬৬১
২। পঞ্চবটী (কবিতা)	তিনু	৯৮
৩। পথ নির্দ্দেশ	স্বামী বিজয়ানন্দ	৬৭৫
৪। প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভদর্শনে (কবিতা)	ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য	১৯৩
৫। প্রবাসীর পত্রাংশ	অধ্যাপক ডাক্তার—	৪৭, ৫৫৪, ৬৩১, ৬৮০
৬। প্রাচীনের আহ্বান	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ	১০
ভ		
১। ভগিনী নিবেদিতা (কবিতা)	শ্রীকর্ণাটকুমার চৌধুরী	৩৮২
২। ভোগ ও ত্যাগ	শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক	৭৬০
ম		
১। মহিমা (কবিতা)	তিনু	১৪৬
২। মা (কবিতা)	শ্রীনিহারিকা দেবী	৬৮৪
৩। মাতৃ-বন্দনা (কবিতা)	শ্রীসাহাজী	৩৩০
৪। মাধুকরী		৫৭, ১২০, ১৮০, ২২৩, ৩০৭, ৩৭১, ৪৩৭, ৪৯৬, ৫৬৪, ৬২৭, ৬৯০, ৭৪৮
৫। মায়ের স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল বি-এ	২৬৪
৬। মিলন ও বিচ্ছেদ (কবিতা)	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	২৪৯
য		
১। যুগধর্ম্মে স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
২। যোগেন মা	স্বামী অরূপানন্দ	৩৬৫
র		
১। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও সার্ব্বভৌমিক বেদান্ত	ব্রহ্মচারী ধ্যান চৈতন্য	৭৩১

	প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	ল		
১ ।	লাটু মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী	স্বামী সিদ্ধানন্দ	৪০২, ৪৭০, ৫৩৫, ৫৯২, ৬৭০
	ব		
১ ।	বড় ও ছোট (কবিতা)	সত্যকাম	২৯৪
২ ।	বন্ধন ভীতি (কবিতা)	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৭২৫
৩ ।	বর্ণ বিভাগ	শ্রীরাধারমণ সেন	৮৭
৪ ।	বরণ (কবিতা)	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	১৮৯
৫ ।	বিদ্রোহী	শ্রীসরোজকুমার সেন	১৮
৬ ।	বিবেকানন্দ প্রণতিঃ (স্তোত্র)	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, এম-এ	৩২১
৭ ।	বৈদিক অধিকারী রহস্য	শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী	২, ৯১, ১৪০
৮ ।	ব্রতধারীর মহামিলন (কবিতা)	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	৪৩৬
	শ		
১ ।	শংকর ও চৈতন্য	শ্রীসাহাজী	১০০
২ ।	শ্রীবিবেকানন্দ-প্রশস্তি	শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল বি-এ	৩৩
৩ ।	শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত্ম্য	স্বামী মধুসূদনানন্দ	৬৫
৪ ।	শংকর-দর্শন	অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম-এ	১৯৫
৫ ।	শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম স্তোত্রম	বিদ্যার্থী বামদেব	৩৮৫
৬ ।	শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের কয়েকটি ঘটনাবলী	শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত	৪০৭, ৪৬৪
৭ ।	শ্রীশ্রীমায়ের কথা		৪৪৯, ৫১৪, ৫৭৭, ৬৪১, ৭০৫
	স		
১ ।	সংগীত	স্বামী বাসুদেবানন্দ	৬১৫
২ ।	সংসার (উপন্যাস)	শ্রীঅজিতনাথ সরকার	৭৫, ১৬২, ২৪০, ২৯৫, ৩৪৯, ৪৮২, ৫৪১, ৬০০

প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৩। সাংখ্য দর্শন	ওমর খৈয়াম্	৭৩৫
৪। সায়াহ্ন চিন্তা (কবিতা)	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৯৪
৫। সাধুর ডায়রী	শ্রী—	৫৫, ৮১
৬। সাধনা ও তাহার ক্রম	শ্রীতারিণীশঙ্কর সিংহ	২৫৭, ৩২১, ৩৮৭, ৪৫৯
৭। সুখের সন্ধানে	শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়	৪৭৮
৮। স্বদেশ প্রেম	শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন, বি-এ, বি-টি	২৮৩, ৩৩৯
৯। স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্ম্মজীবনে বেদান্ত	শ্রীসুশীলকুমার দেব	২৬৫
১০। স্বামী প্রেমানন্দ	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	১১২, ১৪৮
১১। স্বামী বিবেকানন্দ-স্মরণে	অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ	৬৮
১২। সংঘ-বার্ত্তা		৬২, ১২৭, ১৯২, ২৫৫, ৩১৮, ৩৮৩, ৪৪৩, ৫১১, ৫৭৫, ৬৩৭, ৭০০, ৭৬৬

উদ্বোধন

এস গো, রুদ্ররূপিণী মাতা, ধরিয়া সগু ভীষণ সাজ;
শুম্ভ দলনী রণরঙ্গিণী, মোহমুগ্ধ বিশ্বে আজ।
কাঁপায়ে চণ্ডী ভীম তাণ্ডবে, ছড়ায়ে বিশ্বে চুল;
এস, উল্লাসে হুঙ্কার ছাড়ি, উড়ায়ে পথের ধূল।
লক্ষ অশনি নিনাদে ওগো, বাজুক কালের ভেরী;
এস গো বিশ্বনাশিনী কালী, প্রলয় মূর্ত্তি ধরি'।
রুদ্র বিশাল গভীর মন্দ্রে তুলুক মরণ-সুর;
জগৎ বক্ষে শ্মশান জ্বলুক,— হাহাকারে ভরপুর।
ঝঞ্ঝাবায়ুর নিশ্বাস লয়ে ধূমকেতু-রথে চড়ি;
বিকট-অট্ট-হাস্য-ছটায় দাও দিগ্দেশ ভরি।
অসুর বক্ষ চিরিয়া মাতা, রক্ত করগো, পান;
পঞ্জর ভেদি উঠুক তাহার আর্ত্তনাদের গান।
রবি, শশি, তারা নিবে যাক্, হোক্ মহান্ধকারময়;
ত্রাসের মাঝারে আসুক নামিয়া রুদ্র মৃত্যুঞ্জয়।
এস গো, করালী বিবশবসনা মুক্ত-কৃপাণ-করে;
হাজার হাজার ছিন্নমুণ্ড লুটাক্ ধরণী'পরে!
তপ্ত রক্ত,—দনুজ মোহ পাপের স্নেহের কোল,
ভরে দিক্, ওগো, জুড়ে দিক্ আজি—ক্রন্দন মহারোল!
স্বপ্নের মাঝে ধ্বংসের লীলা সুপ্ত সাধক হেরি;
চমকি উঠুক,—শঙ্কিত, ভীত মহার্ত্তনাদ করি!

চণ্ডনীতির তাণ্ডব তালে পিশাচ-লম্ফ-ঝম্ফ ;—
নিয়ে এস আজ, ওমা চামুণ্ডা—প্রলয়ের ভূমিকম্প !
মহামারী এস, দুর্ভিক্ষ এস, "দুর্ব্বাসার অভিশাপ" ;
অবিরল ধারে ক্রন্দন এস, চিতার আগুন-তাপ !
দগ্ধ-হৃদয়-'শাহারা' এস, মুগ্ধ প্রাণের মাঝে ;
কাল বৈশাখীর দাবানল শিখা এস হে, শীতের-সাঁঝে !
ভস্ম হউক হিমাদ্রি-পাষাণ নয়ন অগ্নি-জ্বালে;
লবণ-সাগর শুকিয়ে যাক্ গভীর-অতল-তলে !
তীর্থ নদে ডাকুক্ মাতা, রক্ত-নদীর বান ;
শাক্ত, ভক্ত, নির্জ্জিত তাহে লভুক মুক্তি-স্নান !
এস মা দুর্গে, দশ প্রহরিণী, নাশিতে সুখের মোহ ;
চূর্ণ করিতে ক্ষুব্ধ, লুব্ধ বাসনা-মুগ্ধ-গেহ !
ডাকিনী, যোগিনী—সঙ্গিনী তব, নাচুক ধরণী বক্ষে ;
বাঁচনে তাহার যন্ত্রণা শুধু,—মরণে তাহার রক্ষে !
এস মা তারিণী, দানব-দলনী, এস মা, ভবানী-দুর্গে ;
ভণ্ড-যোগীর মুণ্ড এবার ছিন্ন করগো খড়্গে !
নীলকণ্ঠে হলাহল পান করিতে এস মা সঙ্গে ;
সংহার-মূর্ত্তি ধরিয়া মাতা, এস গো, এবার রঙ্গে !

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

বৈদিক অধিকারী রহস্য

(কর্ম্ম কাণ্ড)

ব্রহ্মের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্নতাই, বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ।* তবে কেবল মায়াবিলসিত জগতের জন্যই উপদিষ্ট হওয়ায়, সমাজের কল্যাণার্থ কর্ম্ম কাণ্ডীয় বেদ—

* "ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রঃ।" বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১।৪।১৫

"শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই; বৈশ্যষ্টোম যজ্ঞে বৈশ্যেরই অধিকার; ক্ষত্রিয়ই রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী; বৃহস্পতিযব যজ্ঞ ব্রাহ্মণই করিবে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বর্ণভেদে অধিকারী স্থির করায় সেই সেই স্থিরীকৃত বর্ণ ব্যতীত অন্যের অধিকার না থাকিলেও যখন "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্" আদিতে বর্ণভেদ ছিল না, পরে গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণভেদ নির্ণীত হইয়াছে," তখন অবশ্য বর্ণোচিত গুণলাভ করিতে পারিলেও অধিকার আছে। ভগবান্ও বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।" অর্থাৎ আমি যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা কেবল তখনকার ব্যক্তিগত গুণ ও কর্ম্মের-বিভাগ দৃষ্টে —চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ দৃষ্টে নহে; যেহেতু, তখন অর্থাৎ "আদিতে বর্ণও একমাত্র ছিল—একোহি বর্ণ এবচ।" (ভাগবত, ৯।১৪।৩৫) আদিতে যে বর্ণভেদ ছিল না, পরে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দৃষ্টে বর্ণভেদ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা বৃহদারণ্যকের ঋষি "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ, স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত" আদিতে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, সেই আত্মা আপনাকে পতি ও পত্নী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, অনন্তর তদুভয়ের মিলন হইতে মানব সকল উৎপন্ন হইল" এই বাক্যে "মনুষ্য মাত্রেই এক পিতার সন্তান" স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আবার পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়, ঋষভ প্রভৃতির পুত্রেরা এক পিতার সন্তান হইয়াও স্ব স্ব গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। (ভাগবত ১১শ স্কন্ধ)

গৌতম সংহিতাতেও লিখিত আছে—"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্। তমেব ব্রাহ্মণম্ মন্যে শেষাঃ শূদ্রাঃ ইতি স্মৃতাঃ॥ অগ্নিহোত্র ব্রতপরান্ স্বাধ্যায় নিরতান্ শুচীন্। উপবাসরতান্ দান্তাং স্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥ ন জাতি পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণ কারকাঃ। চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তংদেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥" অর্থাৎ ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র; যাহারা অগ্নিহোত্র ব্রতপর, স্বাধ্যায় নিরত, শুচি, উপবাসরত ও দান্ত দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন;

হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে—গুণই কল্যাণ কারক, চণ্ডালও সচ্চরিত্র হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। আবার মহাভারতে বনপর্ব্বের চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে আছে "পাতিত্য জনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়; আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি; কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পূর্ব্বেও উচ্চবর্ণের হীন গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা নীচবর্ণে নিক্ষিপ্ত এবং নীচ বর্ণস্থ সদ্‌গুণশালী পুরুষেরা উচ্চবর্ণে উত্তোলিত হইত। বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, নারদ ও সত্যকাম; ধীবর ব্যাস; ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের একাশীতি পুত্র ও বিশ্বামিত্র ঋষ্যাদি বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব এবং অজ্ঞাত পিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি বাহুবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবার দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুল হইতে পতিতেরা শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইত;—"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা।" অতএব, যখন পূর্ব্বেও উচ্চবর্ণস্থ হীনগুণ সম্পন্ন বক্তিরা নীচবর্ণে নিক্ষিপ্ত, এবং নীচবর্ণস্থ সদ্‌গুণশালী পুরুষেরা উচ্চবর্ণে উত্তোলিত হইত, তখন অবশ্য গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে—বর্ণানুসারে নহে; অর্থাৎ বর্ণভেদ জন্মগত নহে।

এক্ষণে এরূপ বলিতে পারা যায় না যে, গুণানুসারেই যখন বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন অবশ্য গুণও বর্ণগত হইতে বাধ্য; যেহেতু, বর্ণভেদ সত্ত্বেও গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। বর্ণভেদ সত্ত্বেও গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার হয় দেখিয়াই, মহাভারতে বনপর্ব্বের একোনাশীত্যাধিক শততম অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন,—"বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে; যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্র বংশ হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ; এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" বর্ণভেদ দ্বারা

কোন মতেই গুণকে ব্যভিচার দোষ হইতে রক্ষা করা যায় না বলিয়াই, অর্থাৎ একবর্ণের গুণ অন্যবর্ণে হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা রহিয়াছে দেখিয়াই, মনু মহারাজ বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়; ক্ষত্রিয় শূদ্র, এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় হয়; বৈশ্য শূদ্র, এবং শূদ্রও বৈশ্য হয়,—"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতান্। ক্ষত্রিয়াজ্জাত সেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥" অতএব, গুণানুসারে বর্ণভেদ নির্ণীত হইলেও, বর্ণ যখন গুণীকে ব্যভিচার দোষ হইতে রক্ষা করিতে ক্ষমবান্ নহে, তখন আর বর্ণভেদকে গুণভেদের কারণ বলা যায় না; বলিলে শাস্ত্র, যুক্তি এমন কি, প্রত্যক্ষেরও অপলাপ করা হয়। ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমিতি লাভ করিলে তাহা যখন আর স্বীয় প্রমিতি লাভের জন্য শাস্ত্রাদি অপর প্রমাণগুলির অল্প মাত্রও অপেক্ষা করে না—অধিকন্তু প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রাদি অপর প্রমাণগুলিরই প্রমিতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায়, তখন অবশ্য একবর্ণের গুণ অন্য বর্ণে দেখিয়া আর কোন মতেই বর্ণভেদকে গুণভেদের কারণ বলা যায় না; সুতরাং বর্ণভেদকে জন্মগত বলিবার উপায় নাই। কারণ, যদি এরূপ বলা যায় যে, জীবের জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার সত্ত্ব প্রধানাদি গুণ প্রকৃতি সৃষ্ট হয়, তাহারপর তাহার সেই গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণে জন্মলাভ করে, তাহা হইলে কদাচ একবর্ণের গুণ অন্যবর্ণে হইতে দেখা যাইত না। আবার উহাকে সমকালীনও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে বর্ণের সহিত বর্ণোচিত গুণের এবং গুণের সহিত গুণোচিত বর্ণের অল্পমাত্রও অসম্ভাব দৃষ্ট হইত না। অতএব, ইহা যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শৈশবে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বর্ণ্যের শিশুসন্তানদিগের মধ্যে কাহার কোন্ গুণ প্রধান তাহা জানিবার অল্প মাত্রও উপায় থাকে না, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের কার্য্য দৃষ্টে কাহার কোন্ গুণ প্রধান ইহা আমরা শেষবৎ অনুমানের দ্বারা জানিতে পারি, এবং ব্রাহ্মণের সন্তানদিগের মধ্যেও তমোগুণের ও শূদ্রের সন্তানদিগের মধ্যেও সত্ত্বগুণের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন অবশ্য বলিতেই হইবে যে, অগ্রে জীবের প্রকৃতসৃষ্ট সত্ত্ব প্রধানাদি গুণানুসারে জন্ম, তাহারপর তাহার সেই গুণ দৃষ্টে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ; সুতরাং বর্ণভেদ

কখনই জন্মগত নহে। তবে শৈশবে অপরিজ্ঞাত-গুণ ব্রাহ্মণ শিশুর জাত কর্ম্মাদি সংস্কার সমন্ত্রকরূপে এবং শূদ্র শিশুর অমন্ত্রকরূপে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার হেতু, প্রাচীন যুগের গুণগত বর্ণ জন্মগত হওয়াতেই প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য ক্রমে শিথিল বন্ধন ও হীনদশা প্রাপ্ত হইতেছে। বাস্তবিক, বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেশ্যই গুণের ব্যভিচার না হওয়া। কিন্তু যখন বর্ণভেদ সত্ত্বেও তাহার অসদ্ভাব নাই, তখন গুণানুসারে অধিকার দেওয়া না হইলে বর্ণভেদের কোন অর্থই থাকে না; আবার বর্ণভেদই উক্ত ব্যভিচার দোষ নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া, গুণলাভ সত্ত্বেও গুণোচিত বর্ণে উত্তোলিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার দিলেও ঐ একই দোষ রহিয়া যায়। অতএব, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ কেবল বর্ণভেদেই অধিকারী স্থির করিয়াছেন; কিন্তু তদ্দ্বারা এরূপ বলা হয় নাই যে, গুণানুসারে বর্ণাধিকার নাই।

ছান্দোগ্যোপনিষদের "সত্যকামের আত্ম-বিদ্যা" হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ আদৌ গুণানুসারে বর্ণাধিকার নিষেধ করেন নাই; কেবল বর্ণানুসারে কর্ম্মাধিকারই নিষেধ করিয়াছেন। যথা—জবালা তনয় সত্যকাম বেদাধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে গুরুগৃহে বাসেচ্ছায় জননীকে স্বীয় গোত্র জিজ্ঞাসা করেন: তদুত্তরে জবালা বলেন, "আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম,.........তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি বলিয়া আমি তোমার গোত্র জানি না।" * তবে এইমাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা আর তোমার নাম সত্যকাম। অনন্তর সত্যকাম হরিদ্রুমানের তনয় গোতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করায়, গৌতম গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। অজ্ঞাত-গোত্র সত্যকাম জননী প্রমুখাৎ যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, অকপটে তাহাই বলায়, গৌতম প্রীত হইয়া বলেন,—বৎস, তুমি যখন সত্য হইতে বিচ্যুত হও নাই, তখন আমি তোমাকে উপনীত করিব—তুমি সমিধ আহরণ কর। এই বলিয়া গৌতমঋষি সত্যকামকে উপনীত করিয়া তদনন্তর

* "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি।" এই উপনিষদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি।

অধিকার প্রদান করেন। অর্থাৎ, দ্বিজবর্ণত্রয় কর্তৃক অনুলোম ক্রমে অনন্তর বর্ণজা পত্নীর গর্ভ-সম্ভূত তনয়েরা মাতার হীন জাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি হইয়া থাকে ;—"স্ত্রীষনন্তর জাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুমাতৃদোষ বিগর্হিতান্॥" সুতরাং দাসী পুত্র সত্যকাম যদি ব্রাহ্মণ ঔরসজও হয়, তথাপি কিন্তু শূদ্র। তবে ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকায় গুণোচিত বর্ণে অধিকার থাকিলেও, উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত করিয়া সেই বর্ণে উত্তোলিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত কর্ম্মাদিতে অধিকার নাই দেখিয়া গৌতম ঋষি উপনীত করিয়াছিলেন, কেহ কেহ শ্রুতির "নৈতদব্রাহ্মণো" "এরূপ সত্যাদি লক্ষণ কখনই অব্রাহ্মণের পরিচায়ক নহে" এই বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও শ্রুতহানি ও অশ্রুত কল্পনা এই দুই দোষ হয়। অর্থাৎ শুনিবামাত্র যে অর্থ বোধগম্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিলে শ্রুতহানি দোষ এবং যে অর্থ শব্দের শক্তিতে লভ্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করিলে অশ্রুত কল্পনা দোষ হয়। বাস্তবিক, সত্যকামের যখন গোত্র সম্বন্ধে কিছুই শুনা যায় না কেবল সদ্গুণের পরিচয়েই উপনীত হইয়াছিলেন, অখন আর শ্রুত বিষয় অর্থাৎ সদ্গুণ ছাড়িয়া অশ্রুত বিষয় অর্থাৎ গোত্র কল্পনা করা উচিত নহে। আর গৌতমঋষিও যখন সত্যকামকে "কিং গোত্রোনু সৌম্যাসীতি" সৌম্য! তোমার গোত্র কি? এই বাক্যে সত্যকামকে গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য তিনিও সত্যকামের গোত্র জানিতেন না। এস্থলে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্মবিদ্যার্থী সত্যকামকে যখন ব্রহ্মবিদ্যার্থই উপনীত করা হইয়াছিল, তখন আর সেই জ্ঞানাধিকারের কথা কর্ম্মাধিকারে কেন? সুতরাং তদুত্তর এই যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে উপনয়ন সংস্কার ও বর্ণভেদের অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যেমন যজ্ঞোপবীত ব্যতীত যজ্ঞে এবং স্ববর্ণোচিত যজ্ঞাদি ব্যতীত অপর বর্ণোচিত যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে সেরূপ নহে। জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে যে উপনয়ন সংস্কার এবং বর্ণভেদের আদৌ অপেক্ষা নাই, তাহা আমরা

জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারীর আলোচনায় দেখিতে পাইব। তবে গৌতমঋষি যে সত্যকামকে উপনীত করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণবর্ণে ও ব্রাহ্মণবর্ণোচিত কর্ম্মাদিতেও অধিকার দেওয়ার জন্য। তাই ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত "উপকোশলের আত্মবিদ্যায়" দেখিতে পাওয়া যায় সত্যকাম আগ্নিক ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞাগ্নির পরিচর্য্যা এবং আচার্য্যের কার্য্যাদি করিতেছেন, আর পূর্ব্বেও এই জন্যই বলা হইয়াছে, সত্যকাম ব্রাহ্মণত্বে উত্তোলিত হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক, প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে অশক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যাগযজ্ঞাদির বিধান হইয়াছে; সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্নতানুসারে প্রবৃত্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাধ্য বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে প্রবৃত্ত্যনুসারে পৃথক পৃথক্ যাগযজ্ঞাদি উপদিষ্ট হওয়ায় বর্ণভেদের এবং কোন এক নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন দ্বারা উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়কে পরিচিত করিবার জন্য উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে তাহা নাই। কারণ, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম— "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এবং তাহাও কেবল নিবৃত্তিমার্গীয় পথিকদের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং নিবৃত্তির ভাবও অদ্বৈত বলিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারীদের মধ্যে পার্থক্য না থাকায় উপনয়ন ও বর্ণভেদের প্রয়োজন নাই। আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যে কেবল উপনয়ন সংস্কার এবং বর্ণভেদেরই অপেক্ষা আছে, তাহা নহে; পরন্তু দেবতা ও গোত্র না থাকিলেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই দেবতাদের দেবতা ও উপনয়ন না থাকায় এবং ঋষিদিগের ঋষি অর্থাৎ গোত্র না থাকায় কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার নাই। ঐস্থলে "অধিকার নাই" না বলিয়া, প্রয়োজন নাই বলাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ, চিত্তশুদ্ধির জন্যই যজ্ঞাদির আবশ্যক; কিন্তু দেবতা ও ঋষিদের তাহার অভাব নাই, তখন অবশ্য প্রয়োজনও নাই। তাই লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে জ্ঞানামৃত পরিতৃপ্ত পুরুষের কর্ম্মে প্রয়োজন কি?—"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কর্ম্মণা প্রজয়াচ কিম্।"

এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে, গুণানুসারে বর্ণভেদ নির্ণীত হইলেও গুণ যখন বর্ণভেদের অপেক্ষা করে না—গুণ লাভ হইলে গুণোচিত কর্ম্ম

স্বতঃই হইয়া থাকে, তাই জমদগ্নি, জামদগ্ন্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অথচ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মী ছিলেন এবং ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরাদি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত গুণলাভ করিয়াছিলেন, তখন আর উপনয়নাদি ব্যতীত অধিকার নাই বলিলে তাহাত অসঙ্গত হয়। সুতরাং তদুত্তর এই যে, গুণলাভ হইলেও গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইতে থাকে বটে কিন্তু তাহাতে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, উপনয়নাদি ব্যতীত কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যায়নে অধিকার জন্মে না; কাজেই যজ্ঞাদি একমাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন সাপেক্ষ বলিয়া, গুণলাভ হইলে গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইতে থাকিলেও তদ্দ্বারা কোন মতেই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ওরূপ নিষেধ সঙ্গত হয়। তাই সত্যাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ সত্ত্বেও সত্যকামকে ব্রাহ্মণোচিত যাগযজ্ঞাদিতে অধিকারী হওয়ার জন্য উপনীত হইতে হইয়াছিল; আবার "স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি" "দুষ্কুল হইতেও, গুণবতী স্ত্রী গ্রহণ যোগ্য" হইলেও, আদৌ উপনয়ন সংস্কার না থাকায় স্ত্রীলোকের কদাচ যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। যদিও উপনয়নাদি ব্যতীত যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই সত্য কিন্তু যখন উপনয়নাদি ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ব্যতীতও স্বতঃই সদ্‌গুণ লাভ হইয়া থাকে, তখন অবশ্য উপনয়নাদি ব্যতীত অধিকার নাই বলিলে, হয় দেবতা ও ঋষিদিগের ন্যায় প্রয়োজন নাই বলিতে হয়, অথবা উহা সাহসোক্তি। বাস্তবিক গুণই পরমার্থতঃ অধিকারিভেদের কারণ—বর্ণাদি ব্যবহারিক মাত্র। তাই স্বীয় সদ্‌গুণের প্রভাবে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া খ্যাত ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের রচিত গায়ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য রক্ষিত হইতেছে; এবং পবিত্র জ্ঞান প্রাখর্য্যে আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে পূজিত ধীবর ব্যাস কর্ত্তৃক সংকলিত বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণকুল পবিত্র ও গৌরবিত হইতেছেন। অতএব, সমাজের কল্যাণার্থ উপদিষ্ট হওয়ায় কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে উপনয়নাদি ব্যবহারিক কারণ ব্যতীত অধিকার না থাকায় ব্যবহারিক কারণই মুখ্য কারণরূপে গৃহীত হইলেও, গুণ যখন বর্ণভেদের অপেক্ষা করে না, তখন অবশ্য বর্ণভেদই ধ্রুবতারার মত হইলে কদাচ তাহা কল্যাণকর হইতে পারে না।

আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্যমাত্রেই এক পিতার সন্তান। কিন্তু ঐ পিতা কে এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কোন্ বর্ণ হইতে মানব সকলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তিনি কে তাহা দেখা হয় নাই। অতএব এক্ষণে তাহাই দেখিয়া তদনন্তর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

—শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী

প্রাচীনের আহ্বান

আর আমাদের চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবার দিন বোধ হয় নাই। জগতের উন্নতি এবং সভ্যতার মাপকাটিতে আমরা পিছাইয়া পড়িয়াছি কি না তাহার বিচারের কথা উঠিতেছে না। এই কথার উত্তর প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতেছেন। কথা হইতেছে, আমাদের নিষ্কৃতি কোথায়? প্রাচীনের আহ্বানের মধ্যে আছে কি? যদি বুঝি আমরা নানা অবস্থার ভিতর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি এবং ঐ শৃঙ্খলের কেবলমাত্র আমাদের বাহ্যিক দেহের সহিত নয়, মনের সহিতও যোগ আছে, সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে আমাদের নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবেই। হয় বাঁচিতে হইবে, না হয় মরিতে হইবে,—বাঁচা ও মরার মাঝামাঝি কোনও পথ নাই, অবস্থা নাই। হয় এদিক, না হয় ওদিক।

এই যে, লোক সমাজে আমরা জন্মিয়াছি, শিক্ষিত হইতেছি, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, তাহার সভ্যতা, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগের কার্য্যফলে ঘটিয়াছে জগতের সভ্যতার বৃদ্ধি ও হ্রাস। এই জাগতিক ব্যাপার সমূহের সহিত অবস্থা বিশেষের সহিত যে একটা সম্পর্ক আমাদের আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। তবে

দেশকালপাত্রের অবস্থানুযায়ী তৈরী মানুষ ;—তাহা কলকব্জা নয়—চেতনাযুক্ত জীব। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন আমাদের জীবন নিদ্ধারণ করে তেমনি জীব আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে গঠন করে। ওখানেই তাহার মরণ-বাঁচন চেষ্টা। এই জগতের সভ্যতা ও অনুশীলন কি ভাবে কি কি অবস্থার মধ্যদিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার স্থান এখানে নাই—তবে এইটা আমরা সকলেই বেশ্ বুঝিতে পারি, কি বিশাল একটা জিনিষ গড়িয়া উঠিয়াছে তিল তিল করিয়া— ইহার উৎপত্তি গতি এবং বৃদ্ধি দেখিতে গেলে বহু বন, জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে একেবারে সেই সভ্যতার গঙ্গোত্রীর মুখে।

দিনের পর দিন চলিয়া আসিতেছে—পরিবর্ত্তন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। আজ প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর যাহা দেখি, আগামী কল্য হয়ত তাহা আর দেখিতে পাইব না। নূতন আসিয়া পুরাতনকে সরাইয়া দিতেছে—নূতন এবং পুরাতনের জয়পরাজয়ের খেলা চলে প্রতি মুহূর্ত্তে। যদিও নূতন বলিতেছে পুরাতনকে সরিয়া যাইতে, তথাপি ঠিক ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় নূতন এবং পুরাতনের মূলে কোনও ভেদ নাই,—কেবল অবস্থার তারতম্য,—সময়ের খেলা। নূতন যতই প্রবল হউক না কেন, যত নূতনত্ব ও বিশেষত্ব তাহার থাকুক না কেন, সে কিন্তু দাঁড়াইছে পুরাতনের স্কন্ধে চাপিয়া, তাহার লব্ধসংস্কারের উপর ভর করিয়া। নূতন, পুরাতনকে অস্বীকার করিতে চায়, দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চায় ; এইটাই হইতেছে তাহার দোষ। প্রাকৃতিক নিয়মে এই নূতন পুরাতন একতাবদ্ধ—যখনই নূতন পুরাতনকে অস্বীকার করে তখনই তাহার জন্য প্রকৃতির দৃশ্যপটের আড়ালে একটী শাস্তির বিধান লিপবদ্ধ হয়,—সে হয়ত তখন তাহা দেখিতে পায় না। কিন্তু, একদিন তাহার এই সৌজন্যহীনতার জন্য অকৃতজ্ঞতার জন্য তাহাকে ভুগিতে হয়। ইহার বাহিরে নিষ্কৃতির পথ নাই। ইহা না বুঝিতে পারাতেই আমাদের সকল অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি।

প্রাচীনের একটা আহ্বান আমাদের নিকট রহিয়াছে, এবং অলক্ষ্যে সকল মানবের মনেই সে তাহার আহ্বান, আবেদন, প্রতিপত্তি, দাবী,

জানাইয়া দিতেছে। তবে আমরা অনেকে তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাই না। আমরা কম্‌লিকে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু কম্‌লি আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। কেনই বা ছাড়িবে—সে তাহার দাবী ছাড়িবে কেন? সে যে আমাদের জন্মদাতা পিতা! আমরা যে তাহার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান, ঋদ্ধিবান।

প্রাচীন ভারতে কেন, প্রাচীন জগতে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল সহরকে কেন্দ্র করিয়া নয়, সমগ্র দেশকে, গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া। প্রাচীন মিশর, গ্রীস্ এবং ভারত আজও তাহার সাক্ষ্য দেয়। প্রথম এই সভ্যতা নাগরিক-জীবনে কেন্দ্রীভূত হয় প্রতীচ্যে রোমান আধিপত্যের সময় এবং ভারতে হয় মুসলমান শাসনাধিকারে। অর্থলোলুপ, রাজ্য-লোলুপ প্রবল পরাক্রান্ত রোমান এবং মুসলমানেরা তাহাদের অধিকৃত দেশগুলিকে করিতে চাহিয়াছিল একটা বিপুল যন্ত্র—যেন শাসনের কেন্দ্রীভূত স্থান রাজধানী হইতে যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রদেশের, গ্রামের, অঙ্গসঞ্চালন, কার্য্যাবলী নিরিক্ষণ ও নিয়মিত করিতে পারে। তাহাদের শক্তিছিল বাহুতে,—সৈন্য-সামন্তে, অস্ত্র-শস্ত্রে,—কিন্তু অন্তরের বলে যাঁহারা বলীয়ান হইয়া উঠিতেন তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদাই আজ্ঞাবহ হইতে হইত এই নরপশুদের। তাহারা মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করিত না—নিজের স্বাধীনতার মূল্য বুঝিত অন্যের দাসত্বের শৃঙ্খলের সম্মুখে। কেবলমাত্র রাজ্যটাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই, রাজস্ব আদায় করিয়াই তাহারা সুখী হয় নাই—রাজ্যের রীতিনীতি, সভ্যতা, শিক্ষাকেও বিশেষ ভাবে শাসন-নীতির অঙ্গীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল—এবং এক্ষেত্রে রোমানদের কৃতিত্বই বেশী। কিন্তু প্রকৃতি তাহার কার্য্যের বিপর্য্যয়-কারীদিগকে অমনি ছাড়িয়া দেয় না, সুযোগ বুঝিয়া এই সকল অবহেলা, অকার্য্যকারিতার বিধান যথাযথ নিরূপণ করে। এবং প্রকৃতি প্রদত্ত শাস্তিটা এমন ভাবে আসে যে, আমাদের আর দাঁড়াইয়া বুঝিবার সময় থাকে না—সংগ্রামের সময় থাকে না, আমরা পড়িয়া যাই অলক্ষ্যে চক্ষুর নিমেষে একেবারে অতল অন্ধকারের নীচে।

এই সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীভূত সহর সভ্যতা আমাদিগকে এমন ভাবেই

পাইয়া বসিয়াছে যে, আমরা আজ সকল বিষয়ের জন্য চাহিয়া আছি সহরের দিকে ; আমাদের গ্রামে, পাহাড় জঙ্গলে, নদী-সৈকতে, মাঠে কি রত্ন আছে, আমরা তাহাদের সম্পর্কে আসিয়া কি ভাবে নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতাও সমগ্র জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে কেন্দ্রীভূত ভাবে। Industrial Revolution এই অবস্থা বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী। ইউরোপের মহাদেশগুলি এইজন্য খুবই ভুগিয়াছে এই বিগত মহাযুদ্ধে। এই মহাযুদ্ধের ইতিহাসটী যে কেন্দ্রীভূত বাণিজ্য ও অর্থনীতি সমস্যাপ্রসূত তাহাত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্যিক যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বটে,—মন্থন শেষ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার ফলস্বরূপ যে গরল উঠিয়াছে, তাহা হজম করিবার শক্তি কোনও জাতির আছে কি না সন্দেহ। এই জন্যই আজ ইউরোপের দেশ সমূহে একটা বিপর্য্যয়ের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জর্ম্মানী, রুস, ফরাসী এবং গ্রেটব্রেটেন সকলেই এই বিষে দগ্ধ হইতেছে—অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতিতে। আজ তাহারা বেশ বুঝিতে পারিতেছে তাহাদের এতকালের মহাগৌরবের সভ্যতার মধ্যে কোথায়ও এমন কীট বাস করিতেছে, যে প্রতিনিয়তই উহাকে দংশন করিতেছে। এই কীট বা রোগবীজাণুকে নির্ম্মূল করিতেই হইবে, নতুবা তাহাদের ধ্বংস, ক্ষয় নিশ্চিত। এই সব দেশগুলির অবস্থার সহিত যুদ্ধে নির্লিপ্ত Scandinavian দেশগুলির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাহারা তাহাদের গ্রাম বা পল্লীকে ছাড়ে নাই—তাহাদের সভ্যতা সকল প্রদেশে সমানভাবে বিস্তৃত। তাহারা তাহাদের ভৌগলিক অবস্থা, প্রকৃতির অবস্থা বিস্মৃত হয় নাই। এই ভৌগলিক অবস্থাটাকে এককথায় ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় "Rigionalism" ইংরেজি শব্দের দ্বারা। মানুষের অবস্থার সহিত, সভ্যতার সহিত, দেশকাল পাত্রের যে একটা যোগাযোগ রহিয়াছে তাহাকেই বলে "Regionalism" এই Regionalism" কথাটাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে এবং কার্য্যে খাটাইতে পারিলে আমাদের লুপ্ত ধর্ম্ম-সভ্যতা, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার: প্রকৃতভাবে মহাগৌরবে ফুটিয়া উঠে, তাহার

আর লয় নাই। এই যে বিশাল আমেরিকান সভ্যতা একটা নূতন জীবনের, কার্য্য তৎপরতার, বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রকৃত রহস্য কোথায়? যদিও তাহারা এক বিশাল বাণিজ্য ও অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত তথাপি তাহারা তাহাদের দেশকে, কৃষিকে, ভোলে নাই। সিকাগোর কৃষি, পশুরক্ষণ, ফল ও ফুলের চাষ দেখিলেই আমরা এই কথা বুঝিতে পারি। তাহাদের সভ্যতা কেন্দ্রীভূত হইয়াও কেন্দ্রীভূত নয়।

আমরা একটা অসীম অনুকরণপ্রিয় জাতি হইয়া উঠিয়াছি, ইহা আমাদের স্বভাবজাত নয়—কৃত্রিম। মুসলমান শাসনের সময় হইতেই এই অভ্যাসটা আমরা বেশ বরদাস্ত করিয়া লইয়াছি। আর এই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের আমলে তাহাদের প্রবর্ত্তিত ইউরোপীয় সভ্যতাটাকে আমরা বেশ আনন্দে অভ্যাস করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইগুলি আমরা এত বিবেচনাহীন হইয়া এবং অজ্ঞান হইয়া অনুসরণ করি যে, উহারা ঝুটা কি সাঁচ্চা তাহা একবার ভাবিয়াও দেখি না। অবশ্য সকল জাতির মধ্যে ভাল জিনিষের একটা আদান-প্রদান ভাল, তাহাতে জাতির শ্রীবৃদ্ধি হয়, সম্প্রসারণ হয়, কিন্তু আমরা লইতেছি, ঝুঁকিয়া পড়িতেছি, এই সব দেশের পরিত্যক্ত সভ্যতা, যাহা তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে, অকেজো বলিয়া, আমরা তাহা গ্রহণ করিতেছি হৃষ্ট চিত্তে—এতই মোহ অজ্ঞান আমাদের!

কিন্তু ভারতের আকাশে এক শুভ্র নক্ষত্র যুগ যুগান্তর ধরিয়া উদিত রহিয়া তাহার ভাগ্যবিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে এই পথ-ভোলা জাতিকে তাহার পথ দেখাইতেছে। তাই ভারত মরিয়াও মরে নাই, ডুবিয়াও ডুবে নাই। এখনও প্রাচীন অনুশীলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিতেছে—আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে বলিয়া কি? এস, কর্ম্মী, উদ্বোধিত কর তোমার অচঞ্চল জ্ঞান, ধ্বনিত কর তোমার পূত মন্ত্র, প্রবুদ্ধ কর তোমার গুপ্ত অমিত শক্তি;—কাটুক তোমার অজ্ঞান অন্ধকার, মেঘের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসুক নবোদিত সূর্য্য, হাসিয়া উঠুক "নির্ম্মল-শুভ্র-করোজ্জ্বল-ধরণী।"

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতার পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই তাহার ঋষিরা ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা—তাহার পুরোহিতরা ছিলেন এক অসীম সৌন্দর্য্যের উপাসক। তাঁহারা ধ্যানে সত্য উপলব্ধি করিয়াই বিরত ছিলেন না,—তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন চিন্তায় এবং দেখিতে পাইয়াছিলেন প্রত্যক্ষ আকারে। তাই তাঁহারা গুপ্তসত্যকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াগিয়াছেন বেদ বেদান্ত উপনিষদে এবং সৌন্দর্য্য খুদিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কঠিন পাথরের বক্ষচিরিয়া; কি কোমলতা, কি শুভ্রহাসি, কি দিব্য উন্মাদনা ও ভাবাবেশই না তাঁহারা ফুটাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন ঐ সব মূর্ত্তিতে— মন্দিরে, মন্দিরে !! এইগুলিই প্রাচীনের বাণী, এই খানেই প্রাচীনের আহ্বান—আমাদের অস্তিত্বের, সভ্যতার নিদর্শন। তুমি ভুলিতে পার, কিন্তু তাহারা তোমাকে ভুলিবে না; বার বার যখনই দেখিবে, মনে করাইয়া দিবে তোমার অতীত, তোমার জাতির মনুষ্যত্ব। কেবলমাত্র অতীতকে মনে করাইয়া দিয়াই তাহারা থামিবে না, তোমার অন্তরে জাগাইয়া তুলিবে একটী জ্ঞানস্পৃহা, একটা তৃষ্ণা—কিসের?—কেন?—তোমার নবজীবনের জন্য সংস্কারের জন্য, অতীতের উপর ভর করিয়া ভবিষ্যতে দাঁড়াইবে বলিয়া।

নানাপ্রকার অবস্থাভেদে আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। আমাদের শিক্ষাদর্শ একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বাপ পিতামহের ধর্ম্মেতিহাস পাঠ না করিয়া কপচাইতেছি বিদেশী রাজার যুদ্ধ-তারিখ; অজ্ঞানতা, দুর্দ্দশা আর কাহাকে বলে !! আপনার জনকে পর করিয়া পরকে আপন ভাবিতেছি—কিন্তু সেত আমাকে আপন ভাবিতেছে না। অবশ্য একথা বলিতে চাহি না যে, আমাদের আদর্শ, শিক্ষা এবং সভাতার পুনঃসৃষ্টি হইবে অন্যান্য সভ্যতাকে অস্বীকার করিয়া বা নিজে সীমাবদ্ধ হইয়া। সে গোঁড়ামি আমাদের থাকিবে কেন? কথা হইতেছে, আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের আপন অবস্থা ও আদর্শের সহিত সমন্বয় করিয়া। শিক্ষা-সমন্বয় এইখানে। অনেকে বলেন তাহা হইলে কি আমরা আবার আদিমযুগে ফিরিয়া যাইব?—রেল মোটার ছাড়িয়া পথ চলিব কি পায়ে বা গো-যানে,

সূক্ষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিয়া কি বল্কল পরিধান করিব ? তাহা নয়। আপনাকে বিস্মৃত না হইয়া জাতির ধারাকে অটুট রাখিয়া চলিব ; তাহা হইলেই আবার আমাদের শিক্ষাদর্শ ফুটিয়া উঠিবে—উপলব্ধি ও জ্ঞান উভয়ই আসিবে।

অধুনা শিক্ষাকেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে সহরে সহরে যেখানে ৪০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে বাস করিতেছে ষোল লক্ষ লোক। আলো নাই, শুদ্ধ বাতাস নাই—কাজেকাজেই জীবনীশক্তিও নাই। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালিত হইতেছে বৈদেশিক শাসন-পরিষদের আইন-কানুন দ্বারা ; অতীতের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাই তাহাদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তপোবনে, গিরি-গহ্বরে খোলামাঠে। হিন্দুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তেমনি স্থানে এই সকল বিষয় এক্ষণে চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ভাবিব, দেখিব, না নির্লিপ্ত থাকিব তাহা নির্ভর করিতেছে আমাদের উপর। আমরাই আমাদের জাতির ভাগ্য-বিধাতা—অপরের কাছ হইতে শত শত বৎসর ধরিয়াইত সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি, মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। কই, তাহারাত সাহায্য করিল না!—তাহারা আমাদের ভাঙ্গিয়া-চূরিয়াই দিল, গড়িয়া উঠিবার বিদ্যাত শিখাইল না! সুতরাং পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর দাঁড়াইয়া ভাবিবার সময় আমাদের নাই। কিছু না করার অর্থ, অনর্থ করা, অগ্রসর না হওয়ার অর্থ, স্থিতি নয়, পিছাইয়া পড়া, কিছু ভাল না করার অর্থ, খারাপ করা।

নিজের দেশের ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থা জানিয়া লইবার মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন কতটা নির্ভর করে, তাহা আমরা বোধ হয় ঠিক বুঝি না—যথার্থ ইতিহাস ও ভূগোলের স্থান তাই আমাদের শিক্ষা প্রণালী হইতে বলিতে গেলে বাদ পড়িয়াছে। নিজের দেশে কোথায় কোন জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা সরবরাহ করিবার কোথায় কি সুবিধা, কাঁচা-মাল কোথা হইতে আসে, তাহা আমরা এদেশে বাস করিয়া খোঁজ লই না—কিন্তু তাহার সন্ধানরাখে সমুদ্র পারের বিদেশী জাত—বেনের জাত।

চিরকালই শুনিয়া আসিয়াছি দেশ ভ্রমণ শিক্ষার একটা বিশেষ অঙ্গ।

কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন এই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান ? বোধ হয় শতকরা একজনও নয়। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর আসিবে আমরা "ছাত্রেরা" বড় গরীব, "আর যা আজকাল রেলের ভাড়া"—দেশভ্রমণ অসম্ভব। কিন্তু উত্তম থাকিলে জ্ঞানপিপাসুর নিকট উহা মোটেই প্রতিবন্ধক নয়। এখনও ভারতে যেখানে সেখানে অতিথি হইলে দুইমুঠা অন্ন মিলে—এখনও ভারত তাহার আতিথেয়তা ভোলে নাই। এখনও ভ্রমণকারী ছাত্রের পক্ষে সমস্ত সুবিধাই রহিয়াছে—কেবলমাত্র সে জানে না কি প্রকারে এই সকল সুবিধা গ্রহণ করিতে হইবে। (?)

যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে উদিত হইয়াছিল তাহা আজ যে কারণেই হউক এদেশ হইতে বিদূরিত। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের কিছু মঙ্গল করিয়াছে কি না এই প্রশ্ন এখানে আমরা উঠাইতে চাহি না। এই ধর্ম্ম আপামরে অহিংসাবৃত্তি শিখাইয়া এই জাতটাকে সামরিক বলে দুর্ব্বল করিয়া দাসত্ব আনিয়া দিয়াছে কি না তাহাও আমরা এস্থলে বিচার করিব না, কিন্তু ইহার সভ্যতা, জ্ঞান পিপাসা, ভাস্কর্য্য ইত্যাদির কথাই বলিতেছি। বৌদ্ধেরা তাঁহাদের অসীম সার্ব্বভৌমিক উন্নতির চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন দেশ-বিদেশে, ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি দূর জাভাতে পর্য্যন্ত। এখনও অজন্তা, ইলোরা, সাঞ্চী, সারনাথ, বর্ত্তমান রহিয়াছে—শিল্পকলার, চিত্রের, ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য বক্ষে ধারণ করিয়া। তাহাদের গায়ের চিত্রের একটী রেখা, খোদিত মূর্ত্তির একটা অংশ, স্তম্ভের একটা দিক্ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে এক বিরাট সভ্যতা ও নৈপুণ্য। তাঁহারা ছিলেন ধর্ম্মানুপ্রাণিত ভাস্কর। তাঁহারা অন্তরের অর্ঘ্যস্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ঐ সকল চিত্র ও শিল্পকলা। আমরা যে তাঁহাদেরই বংশধর তাহার খোঁজ রাখি কি ? তাঁহারা যে ভারতেই জন্মিয়াছিলেন তাহা জানি কি ? কিন্তু তাঁহারা আজ কোথায় আর আমরাই বা কোথায় ?

আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি এই জন্যই আমাদের বন্ধন। কিন্তু আমাদের নিদ্রাভঙ্গের সময় আসিয়াছে, আমরা জাগিতেছি। দিন আসিয়াছে, কিন্তু কর্ম্মী কই ?—তাহারাও আসিতেছে যদিও দূরে,

বিলম্বে। ধর্ম্ম আমাদের এক, ঈশ্বর আমাদের এক, দেশ আমাদের এক ; এস এই সত্য উপলব্ধি করিয়া দেশের ভাইদের ডাকিয়া আমরা অগ্রসর হই। অন্তরে ও বাহিরে মুক্ত হই।

প্রাচীনের আহ্বানে নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া লই এবং ভবিষ্যৎ তাহার উপর গড়িয়া তুলি। এখানে জাতি বিচার নাই, সমাজ বিচার নাই এখানে একমাত্র বিচার্য্য বিষয় "মুক্তির সন্ধান"। এস, একসুরে বলিতে শিখি প্রার্থনা করিতে শিখি "

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবির্ম এধিঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ।

"বিদ্রোহী"

গ্রে যেমন Elegy লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন—Skylark যেমন মহাকবি শেলীর নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে,—টেনিসন্ যেমন In Memoriam লিখিয়া বিশ্ব-সাহিত্যে বরণীয় হইয়াছেন তেমনি বাংলার দুলাল কবি কাজী নজ্রুল ইস্লাম 'বিদ্রোহী' লিখিয়া অমর ও স্বনামধন্য হইয়াছেন। তিনি যদি আর কোনও কবিতা না লিখিতেন —তাহা হইলে শুধু উক্ত কবিতাই তাঁহাকে সাহিত্যের বিরাট দরবারে জয়শ্রী মণ্ডিত উজ্জ্বল আসন প্রদান করিত। ভাবের গম্ভীরতায় —ছন্দের বিচিত্রতায়—অনুভূতির অভিব্যঞ্জনায় উহা অতুলনীয় হইয়াছে। এরূপ কবিতা যে কোন সাহিত্যের গৌরবের বিষয়।

আত্মা চিরকালই মুক্তি প্রয়াসী—তার প্রকৃতি হইতেছে—'নিত্যমুক্তো-স্বভাবাবান্'। তাই গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে বলিতেছেন—

"নৈনংছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥"

এই যে অবিনাশী আত্মা—যাহাকে কোন পার্থিব অস্ত্রের দ্বারা বিনষ্ট করা যায় না, আগুন যাহাকে দহন করিতে অসমর্থ, জল যাহাকে ক্লিপ্ত করিতে পারে না; মত্ত মারুত যাহাকে শোষণ করিতে পারে না; তার অমিত শক্তির পরিচয় কয়জনে দিতে পারে? কয়জনে উহার অতুল প্রভাব জীবনে অনুভব করিয়াছে? 'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে জান, মোহমুক্ত কর। আত্মাকে সবল, সতেজ ও স্বাধীন কর তাহা হইলে তোমার জীবনের মূলমন্ত্র সার্থক হইবে—এই হইল ভারতের চিরশাশ্বতী বাণী। আমরা অন্তরের এই চিরন্তন ধারাটী হারাইয়া ফেলিয়াছি—তাই আজ আমরা এত অবনত—এত নিঃস্ব। যেদিন নিজকে জানিতে পারিব—যেদিন বুঝিতে পারিব যে নিজের মাঝে কি অপরিসীম শক্তি নিহিত রহিয়াছে; সেদিন নির্ভীক হৃদয়ে বীরের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিব।—

"বল বীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমার, নত শির ওই
শিখর হিমাদ্রির!"

আত্মানুভূতির পুলক-স্পন্দনে তার অন্তর-বাহির পুলকিত—সত্যের সন্ধান পাইয়া তিনি আনন্দে উন্মাদ। দিব্যধামের বিমল আলোকে দৈন্য অবসাদের পুঞ্জীভূত মেঘ কাটিয়া গিয়াছে—তাই কবি জলদগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন,

"মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বলবীর—
আমি চির-উন্নত শির!"

ভারতের বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও একদিন আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ রচনা—
জড়জীব আদি যত।
মম আজ্ঞা বলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর ;
গর্জ্জে মেঘ অশনি নিনাদ ;
মৃদু মন্দ মলয় পবন
আসে যায় নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে।"

জীবনী শক্তির তড়িত প্রবাহের উন্মাদনায় বিদ্রোহীর অধীর হিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রলয় অভিযান সুরু করিয়াছে। কোন কিছুতেই তার বাধা নাই, ভয় নাই! এমন কি বিশ্বপিতার সিংহ-আসন পর্য্যন্ত তার রুদ্র তেজে টল্‌টলায়মান! আজ বিদ্রোহের রক্ত পতাকার জয় নিশ্চিত! আত্মা ছুটিয়াছে সত্যকে সাথী করিয়া—কে তাহাকে বাধা দিবে? সত্য এমনি জিনিষ যার গতি অবাধ—জ্যোতিঃ অম্লান! চলার বেগে গতিপথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন ঝড়ের মুখে তৃণের মতো কোথায় উড়িয়া গিয়াছে তার ঠিক্ ঠিকানা নাই। শুধু একটা সহজ চিৎ-ঘন আনন্দের অনঘ-দীপ্তি প্লাবনের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।—

"আমি নৃত্য পাগল ছন্দ!
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত
জীবনানন্দ!"

—ছন্দ তালমান তার হাতে ক্রীড়নক মাত্র!

বিদ্রোহের গোলাপীনেশায় অন্তরাত্মা মাতিয়া উঠিয়াছে—প্রাণের পেয়ালা উন্মাদনার তীব্র সুরায় ভরপুর! প্রাণ-শিখার দীপ্ত বহ্নি-জ্বালা আকাশ বাতাস আকুল করিয়া তুলিয়াছে। তার প্রলয় নিশ্বাস পলকে সৃষ্টিকে শ্মশানে পরিণত করিতে পারে। আবার তারি মোহন পরশে বিপুল ধরণী হাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বেদনা-হত ব্যথিতের রক্ত-রাঙ্গা হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করিতে এক মাত্র তিনিই সমর্থ।—

"আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা বারিধির !
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধনহারা ধারা গঙ্গোত্রীর !"

নীলকণ্ঠ যেমন স্বয়ং সমুদ্র মন্থন জাত গরল গলাধঃকরণ করিয়া দিব্যধামবাসী দেবতাদের আশু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেম্নি ব্যথিতের সমস্ত বেদনাহরণ করিয়া তাহাকে আনন্দের অমৃত সায়রে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে তার মন-প্রাণ উন্মুখ! তিনি যে ব্যথাহত বিদ্রোহী!

"আমি সন্ন্যাসী সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজ-বেশ ম্লান গৈরিক!
আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস্—
আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ!"

আত্মা ভগবানের প্রতীক—তাই সে কাহারো নিকট অবনত হইতে চাহে না। সকলের উপর তার আসন—যখন তাঁরি প্রেরণায় সে পরিপূর্ণ—তাঁরি শক্তিতে সে শক্তিমান্, তখন কিসের ভয়? তাই—

"আমি কভু প্রশান্ত, কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল চল-উর্মির হিন্দোল দোল"।—
—স্বর্গীয় প্রেমের দ্যোতনায় বিদ্রোহীর হৃদয় উদ্বেলিত!—
"আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দনশ্বাস হা-হুতাশ আমি হুতাশীর!
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষজ্বালা প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে
গতি ফের!"

কি সহানুভূতি—কি অসীম করুণা ইহার প্রতি ছত্রে ছত্রে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলে যেমন সবই সমতল বোধ হয়; তেম্নি যিনি আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন —যিনি অধ্যাত্ম উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন—যাঁর অন্তর বাহির তুরীয়ের সাধনায় নিমগ্ন তাঁর কাছে সবই সমান—তিনি একাধারে সব! বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র অণুপরমাণু পর্য্যন্ত তাঁর নিকট তুচ্ছ নয়! তাই সকলেরই প্রতি তাঁর সমান সহানুভূতি সমান করুণা!

কস্তুরিকা মৃগ যেমন আপনার নাভি গন্ধে পাগল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকে তিনিও তেম্নি আপনার মাঝে অসীম শক্তির সন্ধান পাইয়া আত্মহারা!—

"আমি তুরীয়নন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ! আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!"
—এ যে প্রকৃত সাধকেরই বাণী!

রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন।—

"ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন
লহরীর পর লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর—
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ;
উথলি' যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!
আমি, ঢালিব করুণা ধারা
আমি, ভাঙিব পাষাণ কারা
আমি, জগত প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।"

আর বিদ্রোহীর বিদ্রোহী হিয়া উদ্দাম গতিতে গাহিতে গাহিতে ছুটিয়াছে:—

"আমি শ্রাবণ-প্লাবন বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা !
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণুবক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি ;
আমি ধূমকেতু জ্বালা বিষধর কাল-ফণী !
আমি ছিন্ন-মস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্ব্বনাশী
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি !

* * *

আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীর বিদ্রোহী সৈন্য !
আমি ধন্য ! আমি ধন্য !!"

ক্ষাত্রশক্তি আজ পৃথিবীকে অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। তাই ধন-মদ গর্ব্বিত লালসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আপনার বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়াছেন। যতদিন না দাম্ভিক ক্ষাত্রশক্তি বিপর্য্যস্ত হইবে—যতদিন না দলিত মথিত জনগণের মর্ম্মন্তুদ হাহাকারের অবসান হইবে, ততদিন বিদ্রোহের জ্বলন্তশিখার লেলিহমান্ জিহ্বা চারিদিকে প্রসারিত হইয়া থাকিবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে—অসত্যের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম চলিবে। আর :—

"মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না !
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না !"

রবীন্দ্রনাথ ও শেলী নারী হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া সত্যকে পাইয়াছেন—বুঝিয়াছেন। নজরুল ইসলাম সত্যকে পাইয়াছেন পুরুষের অনুভূতির মধ্য দিয়া—বীরের হৃদয় দিয়া, তাই তিনি জগতে নূতন সত্যের প্রচার করিয়া চিরন্তন বিদ্রোহের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন :—

"আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা
চির-উন্নত শির !!"

—শ্রীসরোজকুমার সেন

জ্ঞান ও ভক্তি *

(শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)

জ্ঞান ও ভক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে জানিবার আকাঙ্ক্ষা সতত বিদ্যমান আছে। মানবের জ্ঞান পিপাসা প্রায় অতর্পণীয়,—যখন সে বলিতে পারে "আমি সমস্তই জানিয়াছি, আমার জ্ঞেয় বস্তু আর কিছুই নাই," কেবলমাত্র তখনই তাহার জ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্ত হয়। অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কিছুতে সে সন্তোষলাভ করে না। জ্ঞানের অর্থ, সেই পরমোজ্জ্বল অবস্থা, যাহাতে সর্ব্ব বস্তু সম্যক্রূপে বিদিত হওয়া যায়। মানুষ এই জ্ঞান সৃষ্টি করে না— ইহা সদাই তাহার অন্তরে বিরাজমান। প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে জ্ঞান বর্ত্তমান, কিন্তু তাহা নিবিড় অজ্ঞানমেঘে আবৃত বলিয়া আমরা তাহা দেখিতে পাই না। পঞ্চকোসই (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) পঞ্চমেঘ, উহারাই সত্যকে লুক্কায়িত রাখে। কেহ কেহ বলেন, কেবল জ্ঞানের দ্বারা এই সকল মেঘ বিদূরিত করা যায়—শুধু অসৎকে অস্বীকার করিয়া আমরা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ভক্তি না থাকিলেও জ্ঞানের দ্বারা লোকে ভগবানকে জানিতে পারে। ভক্তি ব্যতীত কোন মনুষ্যের পক্ষে স্বয়ম্ভূ-স্বয়ং-প্রকাশ-তত্ত্ব বা ভগবানকে উপলব্ধি করা এবং তাঁহার সহিত নিজের একাত্মবোধ সম্ভব কিনা তাহা দেখা যাউক।

আমরা যে 'অহং' বা 'আমি'র কথা বলি সেটী কি? প্রথমে আমরা দেহের সহিত আমাদের তাদাত্ম্য স্থাপন করি, অর্থাৎ দেহ হইতে আপনাদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করি। কিন্তু দেহের পূর্ব্বেও এই 'অহং' ছিল। মনে কর কোন ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করিল, তাহা হইলেই

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'Wisdom and Devotion' নামক পুস্তিকা হইতে শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ, বি, এ কর্ত্তৃক অনূদিত।

কি সে ভগবানকে জানিতে পারিবে?—না। যদিও সে বুঝিতে পারে যে দেহ হইতে সে ভিন্ন এবং দেহ হইতে দেহান্তরে গমনক্ষম, তথাপি সে সান্ত বা সীমাবদ্ধ জীবই থাকে, সান্ত জীবই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে সক্ষম। অনন্ত, অসীমের পক্ষে কি স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব? না। অনন্ত সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকে, সুতরাং এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিবে কিরূপে? প্রকৃত জ্ঞানও অনন্ত। এক্ষণে এই 'অহং'—যাহা এজন্মে রাম, পূর্ব্বজন্মে শ্যাম এবং পর জন্মে হয়ত হরি হইবে,—ইহার পক্ষে কি কখনও অনন্ত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব?—না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, সুতরাং ইহা সান্ত। কিন্তু তোমরা বলিতে পার যে, প্রতিনিয়ত ইহার জ্ঞানের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, সুতরাং পরিশেষে ইহা এমন কি স্বয়ং ভগবানকেও জানিতে পারিবে। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ, বহু কল্প পরেও ইহার জ্ঞানের পরিমাণ সসীমই থাকিয়া যায়, অতএব অনন্তের সহিত তুলনায় তাহা অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর,—সুতরাং অনন্তজ্ঞানকে উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

তাহা হইলে কিরূপে ইহার উপলব্ধি সম্ভব? সর্ব্ববিষয় জ্ঞাত হওয়া, এই সীমাবদ্ধ 'অহং'এর পক্ষে সম্ভব নহে—তথাপি কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ হইবার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। কিরূপে এই বাসনা পূর্ণ হইবে? স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীটী ঠিক নহে। কারণ সান্ত মনের পক্ষে নিখিল বিশ্বতত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব—অনন্ত কালের জন্য উহা সান্তই থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কিন্তু শিক্ষা দিয়াছেন যে সান্ত ব্যক্তিগত 'অহং' মানবের প্রকৃত স্বরূপ নহে। মানবের উচ্চাভিলাষী আত্মা অংশমাত্রে সন্তুষ্ট হইবে না। যতক্ষণ না সে বলিতে পারে, আমার জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই, আমি সমস্তই জানিয়াছি, ততক্ষণ সে শান্ত হইবে না। তাহা হইলে এই জ্ঞান কি প্রকারে লাভ করা যায়? দ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা লাভ করা যায় না। ভগবান সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, অনন্তকালের জন্য সে স্থানে (অর্থাৎ স্বর্গে), আর আমরা চিরকালের জন্য এস্থানে (অর্থাৎ মর্ত্ত্যে)। তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন

করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। "তিনি অনন্ত শক্তিমান, আমি দুর্ব্বল। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিলে আমি কষ্টভোগ করিব, অতএব তিনি যাহাতে অসন্তুষ্ট না হন তদ্বিষয়ে আমায় যত্নবান হইতে হইবে। কিরূপে আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে পারি ? শাস্ত্রে তাহার কতিপয় বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। সেই বিধিগুলি পালন করিলে ক্রমশঃ আমার অন্তরে প্রেমের উদয় হইবে এবং আমি প্রভুর আদেশ পালনে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিব। তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিব। এমন কি যদি তিনি আব্রাহাম ও আইজ্যাকের (Abraham and Isac) ন্যায় আমায় পুত্রহত্যা করিতে বলেন, তাহা হইলে প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে তৎসমীপে বলি দিব—মনে করিব, ভগবান তাঁহার নিজ সন্তানকে গ্রহণ করিয়াছেন।"

যিনি এরূপ মানসিক অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বে যাহা কিছু ঘটে তাহার নিন্দা করেন না,—কারণ সমস্তই ভগবদিচ্ছায় সংঘটিত হয়। অতএব, সর্ব্বদা সেই পরম ইচ্ছার বশীভূত হইয়া তিনি ভগবানের সহিত একাত্ম হইয়া যান—যদিও প্রভু হইতে ভৃত্যের ন্যায় ভগবান হইতে আপনাকে পৃথক্ রাখেন। ভৃত্য প্রকৃতপক্ষে প্রভুরই প্রক্ষেপণ (Projection), অর্থাৎ প্রভুরই প্রক্ষিপ্ত স্বরূপ মাত্র। একজনে যাহা করিতে পারে মানুষ তদপেক্ষা অধিক কিছু করিতে চাহে, সেজন্য তৎসাধনকল্পে সে অন্য একটী দেহ-মন ক্রয় করে। সেই দেহ-মন অপরের, কিন্তু সে তাহা ঠিক নিজের ন্যায় ব্যবহার করে ; সুতরাং প্রভু ও ভৃত্য বাস্তবিক স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু তাহারা আবার প্রকৃতপক্ষে এক বা অভিন্নও নহে। দেহের সহিত হস্তের যে সম্বন্ধ তাহাদেরও সেই সম্বন্ধ। হস্ত দেহেরই একটী অংশ,—তাহারই সেবা করে ও আদেশ মত চলে, তথাপি কিন্তু উহা হইতে ভিন্ন। ইহাকেই বলে ভক্তি বা অনুরাগ। আমিত্বের নাশ ও স্বার্থপর স্বভাব ধ্বংস হইলে মানুষ ইহা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটী গল্পের দ্বারা ঐ সম্বন্ধটী বিশদরূপে বুঝাইতেন। দুইটী ক্ষেত্র। একটী অন্যটী অপেক্ষা অধিক উচ্চ। উচ্চক্ষেত্রটী জলপূর্ণ,

নিম্নক্ষেত্রটী শুষ্ক। নিম্ন ভূমিটীতে জল দিতে হইলে ভূস্বামী জলপ্রবাহের জন্য উভয় ভূমির মধ্যে একটী খাল খনন করে। যতক্ষণ না নিম্নভূমির জল উচ্চভূমিস্থ জলের সহিত সমতল হয় ততক্ষণ উহা অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে, কিন্তু যখন উভয় ভূমির জল সমতল হয়, তখন জলপ্রবাহ বন্ধ হয় এবং উভয়ে মিলিয়া এক অখণ্ড জলরাশিতে পরিণত হয়। তখন একটী ক্ষেত্রতলের প্রতিতরঙ্গ অন্যটীতে সঞ্চালিত হয়। প্রকৃত ভক্তেরও ঠিক ইহাই হইয়া থাকে। তিনি যখন ভগবৎস্তরে উন্নীত হন, তখন দুয়ে এক হইয়া যান এবং ভগবানের চিন্তাস্রোতগুলি ভক্তের মনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। আমাদের ঠাকুর আর একটী গল্পও বলিতেন—তিনটী পুতুল। একটী পাথরের, একটী কাপড়ের, আর একটী লবণের। পরস্পরের বিশেষ বন্ধুত্ব। একদিন তাহাদের সমুদ্র স্নানের বাসনা হইল। প্রথম পুতুলটী সমুদ্রে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল—তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। দ্বিতীয়টী সমুদ্রে নামিয়া স্নানান্তে অতিকষ্টে আপনাকে তীরে তুলিল। তীরে আসিয়া সে সমুদ্রের আঘ্রাণ ও স্বাদ পাইতে লাগিল,—তাহার সমগ্র দেহ সমুদ্রজলময় হইয়া গেল। তৃতীয়টী সমুদ্র হইতে আর ফিরিল না। প্রথমটী সংসারাসক্ত জীব, দ্বিতীয়টী ভক্ত—ভগবৎপ্রেমে ও আনন্দে ভরপুর, তৃতীয়টী একজন জ্ঞানী—যিনি আপন আত্মাকে বিশ্বাত্মায় লীন করিয়া দেন।

কে ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনের যোগ্য ?—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।"

যিনি আপনাকে দীনহীন, তৃণাপেক্ষা নীচ মনে করেন; বৃক্ষের ন্যায় যাঁহার সহিষ্ণুতা—(বৃক্ষ ছেদককেও শীতল ছায়াদান করে); এবং যিনি আপনাকে সম্মানের যোগ্য মনে না করিয়া নিম্নতম সৃষ্ট জীবকেও সম্মান করেন, তিনিই যোগ্য। ভক্ত আপনাকে অতি অযোগ্য ও হীন মনে করেন। গৃহে আপনার পরিবারবর্গের মধ্যে থাকিয়া কেহ নিজেকে অতি গণ্যমান্য মনে করিতে পারে, কিন্তু বাহিরে গিয়া তদপেক্ষা অধিকতর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইলে তাহার সকল

অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। তখনও সে যে দেশে বাস করে তাহার জন্য গর্ব্ববোধ করে, কিন্তু যখন সে জানিতে পারে যে লণ্ডনের তুলনায় মান্দ্রাজ কত ছোট, লণ্ডন পৃথিবীর তুলনায় কত ক্ষুদ্র এবং জ্যোতি-র্বিজ্ঞান গোচর ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবীও একটী বিন্দুমাত্র, তখন ক্রমশঃ তাহার গর্ব্ব দূরীভূত হইতে থাকে এবং অবশেষে সে উপলব্ধি করে যে বিশ্বেশ্বরের তুলনায় সে কিছুই নহে। প্রকৃতি শূন্যকে ঘৃণা করে—অর্থাৎ প্রকৃতিতে কোন স্থান শূন্য থাকে না। অতএব, ভক্ত আপনাকে 'অহং' বা আমিত্ব শূন্য করিলেই ভগবান সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। তিনি কোন কর্ম্ম করিলে মনে করেন, উহা তিনি করেন নাই—ভগবান করিয়াছেন, এবং কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ করিলে ভাবেন, উহা তাঁহার নহে—ভগবানের। "নাহং নাহং—তুঁহু, তুঁহু"—ইহাই তাঁহার আসল ভাব, এবং ইহাই আদর্শ সন্ন্যাসীর স্বরূপ।

যিনি জ্ঞানী তিনি অন্য এক প্রণালী অবলম্বন করেন। তিনি এই জগতের শূন্যত্ব ও অসারত্ব উপলব্ধি করেন। আপনাকে আর দেহ হইতে অভিন্ন জ্ঞান না করিয়া তিনি ভগবানে আত্মবিসর্জ্জন করেন, তখন তাঁহার আর পৃথক্ সত্তাবোধ থাকে না। বিচারের দ্বারা তিনি এই অবস্থা লাভ করেন। সংস্কৃত 'অহঙ্কার' শব্দটীর অর্থ অস্মিতা বা অহংবোধ। এই 'অহং' কাহার? ইহা কি আমার, না অপরের অধীন? জ্ঞানী বলেন, আমি নিজের অধীন হইলে আমি আমার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতাম। কিন্তু সত্যই কি আমি আমাকে পরিচালিত করি, না অন্য কোন বহিঃশক্তি দ্বারা পরিচালিত হই? বাস্তবিক যদি জন্মাবধি আমি নিজেকে পরিচালিত করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি আমাকে রাজপ্রাসাদ, সুস্থ দেহাদি লাভের জন্য আদেশ করিতাম; কিন্তু আমি হয়ত কুটীরবাসী ও দুর্ব্বলদেহ! রাজপ্রাসাদে বাস করিতে কে না ইচ্ছা করে? রাজার পুত্র হইতে কাহার না সাধ হয়? নিউটনের ধীশক্তি লাভ করিতে কাহার না বাসনা হয়? কিন্তু মানুষ এগুলি ত পায় না। তাহার নির্ব্বাচনের

অধিকার থাকিলে, প্রত্যেক বিষয়ে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই সে নির্ব্বাচিত করিত—কিন্তু তাহার পিতা তাহার মনোমত নহে, জীর্ণ কুটীরে তাহার বাস এবং হীন খাদ্য আহার। হয়ত অধ্যয়নের জন্য তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু অর্থাভাব। সমস্তই তাহার বিপক্ষে। তবে কি এ নির্ব্বাচন তাহার নিজের? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, সে স্বয়ং নির্ব্বাচন করিতে পায় নাই, নতুবা তাহার মনোনয়ন আরও ভাল হইত—যে সকল বস্তুলাভে সে সুখী হইতে পারে, তাহাই নিশ্চয় সে মনোনীত করিত।

এইরূপে অহংকে বিশ্লেষণ করিবার সময় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, আমার বলিতে কিছুই নাই—এমন কি এ দেহ পর্য্যন্ত আমার বলিতে পারি না। এখানে আমরা এক দুর্জ্জেয় শক্তির অধীন, উহা আমাদের সকল কর্ম্মই নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব আমাদের অহমিকা ত্যাগ করা উচিত। কে আমি? সত্যই কি সেই শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার আমার কোন ক্ষমতা নাই? কিসে আমাকে এরূপ পরতান্ত্রিক বা পরাধীন করিয়াছে? আমি ক্ষুধার্ত্ত, সুতরাং আমাকে আহারের জন্য তাঁহার সৃষ্টিরই অন্বেষণ করিতে হইবে। আমি তৃষ্ণার্ত্ত, সুতরাং আমাকে জলের জন্য তাঁহার সৃষ্টিরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। কিন্তু জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করেন "আমি কি প্রকৃতই ক্ষুধার্ত্ত? সত্যই কি আমি তৃষ্ণার্ত্ত?" ক্ষুধা-তৃষ্ণার অধিষ্ঠান কোথায়? ইহা কি সত্য নহে যে দেহের মৃত্যু হইলে যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর থাকে না, তখনও আমি জীবিত থাকি? অতএব আমি দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ ও আমি দুইটী স্বতন্ত্র সত্তা। নক্ষত্রা-বিষ্কারকারী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় এই দেহ আমার নিকট যন্ত্রস্বরূপ, উহা স্বয়ং একটী জড় পদার্থ মাত্র। সুতরাং দেহে যাহা সংঘটিত হইতেছে তাহা আমাতে সম্পাদিত হইতেছে ভাবিব কেন? এই সকল বাসনার স্থান কোথায়?—দেহেতেই ক্ষুধা, দেহেই তৃষ্ণা; দেহকে সজীব রাখিতে হইলে চারা গাছের ন্যায় উহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়, তাহা না করিলে শুষ্ক পত্রের ন্যায় উহা স্খলিত হইবে। কিন্তু 'আমি' ত নষ্ট হয় না।

কথিত আছে, মায়া একদিন কোন জ্ঞানীর নিকট আসিয়া বলিল "আমি কি অতিশয় শক্তিশালিনী নহি? দেখ, আমি এতগুলি জগৎ, চন্দ্রতারকাদি সৃষ্টি করিয়াছি এবং এরূপ প্রকাণ্ড বিশ্বের অধীশ্বরী।" জ্ঞানী উত্তর করিলেন "তুমি শূন্যের রাণী।" তাহার মহত্ত্বের প্রতি এরূপ অসম্মানের জন্য মায়া অত্যন্ত কুপিতা হইল এবং সেই জ্ঞানীপুরুষকে স্পর্শ করিয়া একটী উষ্ট্রে পরিণত করিল। তখন তাঁহাকে মরুভূমিতে গিয়া উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া গুরুভার বোঝা সকল বহন করিতে হইল এবং তাঁহাকে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিতে হইত যে অবশেষে মায়া স্বয়ং দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিল। তৎপরে মায়া জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পূজা করিবেন কিনা। তিনি হাসিয়া বলিলেন "উষ্ট্রের দেহ বা মন কিছুই আমার নহে। তুমি আমার কোনই অনিষ্ট করিতেছ না, বরং নিজের গণ্ডদেশে নিজেই চপেটাঘাত করিতেছ।" মায়া রোষভরে বলিয়া উঠিল "এখনও তুমি অসংশোধনীয়?" তখন সে পুনরায় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া একটী গর্দ্দভে পরিণত করিল। গর্দ্দভ হইয়া তিনি প্রহৃত হইতে লাগিলেন এবং দুর্গন্ধ ভার বহন ও অতি দুঃখে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপরে আর একবার মায়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার পদানত হইতে আদেশ করিল। তিনি বলিলেন "কেন হইব? আমি ত কষ্ট ভোগ করিতেছি না—গর্দ্দভের দেহ তোমার, আমার নহে।" অবশেষে মায়া বুঝিল যে তাঁহার মনের প্রশান্তভাব নষ্ট করা তাহার সাধ্যাতীত এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিল "আপনিই মহত্তর।"

উহাই জ্ঞানীর প্রকৃতভাব। তাঁহার নিকট আত্মা ও দেহ স্বতন্ত্র, আত্মা ও মন দুইটী বিভিন্ন বস্তু, এবং তিনি জানেন যে দেহ কিংবা মনের ধর্ম্ম বা বিকার তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সেজন্য তিনি কাহাকেও ভয় করেন না—মৃত্যুকেও না। কেন করিবেন? তিনি কি পূর্ণ নহেন—অনন্ত নহেন? তিনি বরং বলেন "প্রভু এ সমস্ত আপনিই দিয়াছেন, এক্ষণে প্রতিগ্রহণ করুন। এইরূপে ত্যাগই

তাঁহার আদর্শ হইয়া থাকে। তিনি জানেন যে তিনি দেহ কিংবা মন নহেন এবং যখন তিনি দেহ ও মনের সহিত তাঁহার একত্বস্থাপনে বিরত হন, তখন তাঁহার অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তখন তিনি অনুভব করেন যে, তিনি ও ভগবান এক। এইরূপে তিনি সর্ব্ববস্তু ত্যাগ করিয়া সর্ব্ববস্তু লাভ করিয়াছেন; কারণ সকলেরই অধিকারী ভগবান—আর, তিনি ও ভগবান অভিন্ন।

তিনি কিন্তু নিজের বাহিরে উহা প্রাপ্ত হন না—অবশ্য সাধারণ লোকে পরিচ্ছদ বা আহার্য্য ক্রয় করিবার জন্য অর্থসহ বাজারে যায়; এ সমস্ত জিনিষই তাঁহার ভিতরে বর্ত্তমান। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে তিনি ছিলেন ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে ধনী হইয়াও আহারের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহার প্রতিবেশিগণ তাহাকে ধনী বলিয়া জানে এবং অবসাদবায়ুগ্রস্ত বা বাতুল মনে করে। তাহার যথেষ্ট অর্থ আছে, একথা তাহাকে সকলে বলিলেও সে আপনাকে নিতান্ত নিঃস্ব জ্ঞান করে। আমরাও এই বাতুলতাগ্রস্ত। আমরা আমাদিগকে দেহ মনে করি এবং ভাবি যে প্রাণ ধারণের জন্য আমাদের আহার ও বায়ুর আবশ্যক। কিন্তু মানুষ যখন ঠিকভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে তখন দেখে যে প্রকৃত পক্ষে তাহার কোন অভাব নাই—সে স্বপর্য্যাপ্ত। কিসে আমাদিগের এই জ্ঞান রোধ করে?—অহংজ্ঞানই আমাদিগকে স্বস্বরূপ অবগত হইতে দেয় না। আমিত্বকে দূরে নিক্ষেপ কর, তখনই বুঝিতে পারিবে যে ভগবান ও মনুষ্য এক—অভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, জল মধ্যে এক খণ্ড যষ্টি স্থাপন করিলে, জলটী দুইভাগে বিভক্ত মনে হয় এবং একটী দক্ষিণ ও একটী বামগামী স্রোত দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ যষ্টিখণ্ড তুলিয়া লও—তৎক্ষণাৎ সমগ্র জল এক হইয়া যাইবে, তখন আর দক্ষিণ ও বাম ভাগ থাকিবে না। আমরাও ঐরূপ এক, অভিন্ন। তাহা যে নহি, কিসে আমাদের সে ধারণা জন্মায়?—আমাদের মনোরূপ জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত অহং-যষ্টিই ন্যায়-অন্যায়, সদসৎ, আলোক-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বস্রোতের ধারণা উৎপন্ন

করে। ঐ যষ্টি তুলিয়া লও—অহংকে দূরে নিক্ষেপ কর। যদি মুহূর্ত্তের জন্য ইহা করিতে পার, তবে জানিতে পারিবে, তোমার প্রকৃত স্বরূপ কি। ইহাকেই বলে স্বানুভূতি বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অবস্থা। ঐ যষ্টি বহিস্কৃত ও স্রোতধারা এক হইয়া গেলেই এই অবস্থা লাভ হয়—ইহাই জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য।

অতএব, জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথেই মানবকে অহং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। ভক্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন যে এই 'অহং' তাঁহাতে অধিগত নহে। তিনি ইহাকে বিরাট 'অহং'এ নিমজ্জিত করেন—তখন তাঁহার ক্ষুদ্র আমিত্ব লোপ পায়। তিনি ভাবেন "আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর, হীনাদপি হীনতর—আমি নগণ্য।" ইহাই ভক্তের রীতি। জ্ঞানী বলেন, মন, দেহ বা পঞ্চকোষে আমি সম্বদ্ধ নহি। আমি সর্ব্বদাই একরূপ। আমাতে এই সকল তরঙ্গের অস্তিত্ব নাই, ইহারা মদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে—জড় পদার্থে কিংবা মায়ায় অবস্থিত।" অতএব, এই আমিত্ব বোধ, এই 'অহম্' প্রত্যয়কে দেহ-মনের স্তরে অবনত করার পরিবর্ত্তে তিনি দেখেন যে ইহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত (self-existent)। মানবের জড়প্রকৃতির সহিত ইহার একত্ব স্থাপন করা যায় না। তিনি এই ভাবে প্রকৃত 'অহং'এর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ইহা মানুষ বা দেবতা নহে, গৃহী বা সন্ন্যাসী নহে, ধনী বা দরিদ্র নহে—ইহা নামরূপ হীন।" এইরূপে তিনি আত্মবিচার করিয়া অবশেষে বুঝিতে পারেন যে, যাহাকে তিনি দেহের সহিত অভিন্ন মনে করিতেছিলেন তাহা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে চৈতন্যই ছিল।

উহা, কেবল একটী মাত্র উপায়ে সিদ্ধ হয়। দেহ ও মনের সহিত তাদাত্ম্যস্থাপনকারী সীমাবদ্ধ 'অহং'ই মানবের পরম শত্রু। মানবকে উহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। ইহার দুইটী উপায় আছে। স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া জ্ঞানীকে নম্রভাবে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল 'অহং'ভাব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি "আমি ব্রাহ্মণ" এই বোধ তাঁহার ছিল। তদ্বিনাশের জন্য তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া

সম্মার্জ্জনী হস্তে চণ্ডালের গৃহ পরিষ্কার করিতেন। কেবলমাত্র সেবা দ্বারাই লোকে অহংশূন্য হইতে পারে। কিন্তু ভক্তিহীনভাবে সেবা করিতে চাহিলে এরূপ শুষ্ক জ্ঞানে কোনই ফল হইবে না। সভক্তি সেবা দ্বারাই 'অহং'ভাব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত কেহ গর্ব্বিত হইয়া মনে করে 'আমি বিদ্বান ও মহৎ' সে পর্য্যন্ত সে ঠিক ঠিক সেবা করিতে পারে না।

আমরা জ্ঞানী হই, আর ভক্তই হই, আমাদের এক সাধারণ শত্রু বর্ত্তমান—অহংজ্ঞান। "আমি কিছুই নহি, ভগবানই সব" এইরূপ চিন্তা করিয়া ভক্ত উহার হস্ত হইতে রক্ষা পান। আর "আমি দেহ নহি, মন নহি, ইন্দ্রিয় নহি," এইরূপ নেতি নেতি করিয়া জ্ঞানী উহা হইতে মুক্ত হন। কিন্তু উভয়কেই সেবাপরায়ণ হইতে হইবে। আমরা সকলেই কোন না কোন ভাবে সেবা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা সুখ বা লাভের আশায় করি। কিছু লাভের আশা না থাকিলে সেরূপ আগ্রহের সহিত আমরা সেবা করি কি ?—না। কিন্তু এইরূপ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সেবার ভাব আমাদের থাকা চাই। একমাত্র উহা দ্বারাই আমরা অহংভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি—আর, এই অহং নাশ হইলে তবে ভগবদনুভূতি সম্ভব হয়।

শ্রীবিবেকানন্দ-প্রশস্তি

প্রতীচ্যাদর্শমৃগতৃষ্ণায়াং প্রসক্তান্ হি ভারতান্
অজ্ঞানতমিস্রচেতসো হে বিবেকানন্দ প্রধীঃ।
মধ্যন্দিন-তপন ইবাসীমদীপ্তিমান্ সদয়ম্
অবাতরোঽস্মিং শ্চেতয়িতুম্ লোকে কিল্বিষাকুলিতে।

বিশালবপুর্ভবান্ বীরেন্দ্র ইব সৌম্যাকৃতিশ্চ
কুশেশয়প্রতিমন্দধল্লোচনযুগলম্ রম্যম্।
বিপদি চ মহত্যেবাচল শ্চাসংবিগ্নমানসো
নালন্তুঙ্গশৈলানাং বাত্যাপি প্রকম্পনায় ঘোরা॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী চণ্ডালমপ্যুদারানুভাব
নিবিড়াশ্লেষেণাভ্রাত্রীয়ো ব্রহ্মবিৎ স্বদেশভক্তঃ ।
প্রতিষ্ঠাপিতা ত্বয়াবিদ্যানাশায় মঠা নরাণাং
নিষ্কামকর্ম্মণা বিশ্বেষাং নিকামমনোজ্ঞাঃ শুভাঃ ॥

ব্রহ্মসত্বং প্রথমং ঘোষিতং দরিদ্রেষু ত্বয়ৈব
সংগঠিতা স্তুতঃ সন্ন্যাসিসঙ্ঘাঃ পরিচর্য্যাধর্ম্মাঃ ।
শান্তিময়োৎসঙ্গে তেষাং বিশ্রান্তিং যান্ত্যাতুরানাথা
জগৎকল্যাণকৃত্বে শ্রদ্ধয়া স্মরন্তি চানুদিনং ॥

বীতভয়েন তে স্তম্ভিতং বাগজালেন চ সমগ্রং
পাশ্চাত্যং বজ্রগম্ভীরেণ সভ্যতাগর্ব্বিতং জগৎ ।
হিন্দুগৌরবং হি রামকৃষ্ণানন্দবিবেকানন্দ
প্রকীর্ত্ত্য প্রত্যাবৃত্ত ত্বম্ উড্ডায্য বিজয়পতাকাম্ ॥

পরব্রহ্মণাধুনা ভবান্ বিলীনঃ সমাপ্তকার্য্যো
বিশ্রামার্থমনন্তানন্দধামনি ত্রিলোকবাঞ্ছিতে ।
ভারতমাতুরাস্যং কামম্ উজ্জ্বলং ভবতিতরাং
প্রাপ্তায়া ভবাদৃশং সুতরূপেন মহাপুরুষং ॥

সহস্রং প্রণমামি শিবায় তে হসিতাননায়
মামুদীরয় পাপ্মানং পরহিতে সদৈব দেব ।
দুর্ব্বারাস্থৈর্য্যবশাদশান্তম্ অধিবসন্ মে মনঃ
সহিষ্ণুং কৃপয়া কুরু বিভীষণাঙ্কাপদমপি ॥

—শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল বি, এ

যুগধর্ম্মে স্বামী বিবেকানন্দ

(উদ্ধৃত)

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই—মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ দেহ রাখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কাজ আজও শেষ হয় নাই—হইলে লোকে তাঁহাকে ভুলিত। শরীরটা 'ভাঁজ করা পোষাকের মত' পৃথিবীতে রাখিয়া তাঁহার আত্মা অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব্ব সাধনা, তাঁহার নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম, অগ্নিময় দীক্ষা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস প্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শত শত বৎসরের জমাট কুসংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া, সমাজের অত্যাচার ও নির্দ্দয়তার ব্যূহ ভেদ করিয়া, তিনি যে শিক্ষা, সংযম ও কর্ম্মপ্রাণতার প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায় অগ্নিময় চাঞ্চল্যে কুলপ্লাবী, প্রাবৃটের নদীপ্রবাহের মত পরিপূর্ণ, উদ্দাম ও উচ্ছ্বাসময়।

তাঁহাকে আমাদের এত ভাল লাগিল কেন? তিনি ত আমাদেরই মত একজন সামান্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত—

তিনি ত আমাদেরই মত এণ্ট্রান্স, এল এ, বি এ, পরীক্ষা দিয়া চাকুরীর জন্য সমস্ত দিন আফিসে আফিসে ঘুরিয়াছিলেন ও সনাতন বি-এল্ পড়িয়াছিলেন—তিনি ত পিতার মৃত্যুর পর আমাদেরই মত পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া অর্দ্ধাশনে অনশনে দিন কাটাইয়া জীবনকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। পিতার আকস্মিক মৃত্যু না ঘটিলে আমাদের মত তাঁহারও ত শুভবিবাহ হইয়া যাইত। তবে প্রভেদ কোথায়? কি গুণে তিনি জগৎ-বরেণ্য হইলেন? কোন্ সোণার কাটীর পরশে তাঁহার মাটীর দেহ কাঞ্চন হইয়া গেল? পুরুষকার না দৈব? কর্ম্মী বলিবে পুরুষকার, কবি বলিবে দৈব—"নিজ বলে দুর্ব্বল সতত মানব, সুফল ফলে দেবের প্রসাদে।"

আমি বলিব বিধিলিপি। ভারতের দুঃখীর, পতিত জাতির ও

সমাজ-প্রপীড়িতের নীরব আর্ত্তনাদে বুঝি প্রভুর আসন টলিয়াছিল, তাই এই পুণ্যাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শত শত বর্ষব্যাপী বিপ্লবের আবর্ত্তে মহিমময় হিন্দুধর্ম্মের কত অবনতি ঘটিয়াছে, কত পৈশাচিক ঘৃণিত আচার-ব্যবহার ধর্ম্মের নামে হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছে, কত প্রক্ষিপ্ত রচনা শাস্ত্রের চাপরাস পাইয়া হিন্দুর সামাজিক জীবন শাসন করিতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্য ও সহজবোধ্য কর্ম্মময় সেবাধর্ম্ম প্রচারকল্পে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিজে দুঃখ পাইয়া, দুঃখের কষ্ট বুঝিয়াছিলেন।

তাঁহার দুরবস্থার কথা সকলের নিকট হইতে গোপন করিলে একজনের তাহা অবিদিত ছিল না।—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। কামকাঞ্চনত্যাগী এই মহাপুরুষকে পরীক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরমহংসদেব টাকা পয়সা স্পর্শ করিতেন না—করিলে তাঁহার যাতনা হইত। সাধনার এমনই প্রভাব! নরেন্দ্রনাথ একদিন গোপনে তাঁহার শয্যাতলে ১টী মুদ্রা রাখিয়া দিলেন, পরমহংসদেব শয্যা গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন, অবশেষে শয্যা ত্যাগ করিয়া আসনান্তরে উপবেশন করিলেন। সেইদিন হইতেই তাঁহার প্রতি বিশ্বাস তাঁহার বদ্ধমূল হইল। একদিন একজন ধনী বন্ধুকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যান; পরমহংসদেব সকলকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন "নরেন এখন বড় খারাপ অবস্থায় পড়েচে; বন্ধুরা যদি এখন তাহাকে সাহায্য করে তবে বেশ হয়।" সভাভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণকে নির্জ্জনে পাইয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "আপনি ওদের সাম্‌নে এসব কথা কেন বল্‌তে গেলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "হ্যাঁরে নরেন, আমি যে তোর জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্‌তে পারি।"

একদিন বড় অভাবে পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই একটা উপায় করিয়া দিতে পারেন, অতএব এখন তাঁহাকে ধরিতে হইবে। এই ভাবিয়া পরমহংসদেবকে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন "টাকা পয়সার জন্য আমি মাকে বল্‌তে পারি না। তুই নিজে গিয়ে মাকে বল্।" নরেন্দ্র বলিলেন

"আমি ত কালী মানি না ও বুঝি না, আমার কথা কি তিনি শুনিবেন ? আপনি আমার হইয়া মা'কে বলুন" কিন্তু তিনি নিজে না গিয়া নরেন্দ্র-নাথকে স্বয়ং যাইয়া মা'কে বলিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন ; অগত্যা নরেন্দ্রনাথ কালীর মন্দিরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন যে এতদিন যাঁহাকে পাষাণময়ী বলিয়া জানিতেন, সেই কঙ্কালমালিনী কালীমূর্ত্তি আজ জীবন্ত, অনন্ত সৌন্দর্য্য ও স্নেহসম্ভার পরিপূরিতা ; ভক্তিমুগ্ধ নরেন্দ্রনাথ সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া মাগিলেন—"মা আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, আমি আর কিছু চাই না।" কতক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন। "মা কি বলিলেন।" নরেন্দ্রনাথ যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। পরমহংসদেব আবার তাঁহাকে মন্দিরে পাঠাইলেন—আবার মা'র সেই স্নেহকরুণ মুখখানি দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সব ভুলিলেন, দৈন্য ভুলিলেন—আশা ভুলিলেন—লক্ষ্য ভুলিলেন—মাগিলেন "মা আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" শ্রীরামকৃষ্ণ তৃতীয়বার তাঁহাকে পাঠাইলেন—কোন কথাই তাঁহার মুখে আসিল না—কেবল "দাও মা আমায় শুদ্ধা ভক্তি।" শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনিয়া বলিলেন "তোর সব পাওয়া হয়েচে" নরেন্দ্রনাথের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের আর অভাব রহিল না। তিনি বি-এল্ পড়া ছাড়িয়া অনন্যচিত্তে পরমহংসদেবের উপদেশ মত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অল্পদিন পরেই পরমহংসদেব সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথকে গুরুভাইরা গুরুর আসনে বসাইলেন। ৩।৪ বৎসর মঠে সাধনানন্দে থাকিয়া ও সঙ্গীদিগকে শিক্ষা দিয়া তাঁহার লোকসঙ্গ কেমন অসহ্য হইয়া উঠিল—উচ্চতর আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কাশী, আযোধ্যা, বৃন্দাবন হাত্রাশ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন ; কিয়দ্দিন পরে আবার কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, শ্রীনগর, টিহরী প্রভৃতি বহু তীর্থস্থানে গমন করিয়া বদরিকাশ্রম ও হিমালয় যাত্রার পথে হৃষীকেশে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সে যাত্রা অতি কষ্টে আরোগ্যলাভ করিয়াও দেশে ফিরিতে চাহিলেন না। দুঃখ দারিদ্র্য ও পৌরহিত্যের অত্যাচার-ক্লিষ্ট ভারতবাসীকে দেখিয়া তিনি

প্রতিকারসংকল্পে সমগ্র ভারত একাকী ভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন; ইতিমধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও ধীশক্তি, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও নিঃস্বার্থ পরোপকার-স্পৃহা তাঁহাকে জনসমাজে পরিচিত করিয়াছিল। আত্মগোপন করিবার জন্য কখন 'বিবিদিষানন্দ' কখনও বা 'সচ্চিদানন্দ' নাম ধারণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার তেজোময় উন্নত ললাট, তাঁহার সুমার্জ্জিত অগ্নিময়ী ভাষা, তাঁহার ভক্তি-রসপূর্ণ উদাত্ত কণ্ঠ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিত। যেখানেই যাইতেন, সেখানকার পণ্ডিত, রাজকর্ম্মচারী ও রাজন্যবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও আলোচনার দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের অবির্জ্জনারূপ কুসংস্কারগুলি দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষিদ্ধ, এই কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি বলিতেন যে, একজন রাজার হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মভাব সঞ্চার করিতে পারিলে, সহস্র সহস্র লোকের সামাজিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

রাজপুতানার অন্তর্গত আলোয়ারের রাজা কথাপ্রসঙ্গে পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদ করিলে, স্বামিজী বলিয়াছিলেন "কাঠের, পাথরের কিম্বা মাটির মূর্ত্তিতে ভগবান্ বিশ্বাস না করিলে কিছু ক্ষতি নাই, ভগবানে বিশ্বাস থাকিলেই হইল"। এই বলিয়া মহারাজের একখানা চিত্র দেওয়াল হইতে নামাইয়া প্রবীণ মন্ত্রীকে তাহার উপর থুথু ফেলিতে বলিলেন; মন্ত্রী স্বামিজীর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, স্বামিজীও বারংবার জেদ করিতে লাগিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই এ কাজে সাহসী হইল না। সহসা হাস্যমুখে রাজার দিকে চাহিয়া স্বামিজী বলিলেন "দেখুন মহারাজ, ইহাতে একখানা কাচ, কাগজ ও রং আছে—আপনার চিত্র বলিয়া এই তুচ্ছ বস্তুর এত মান। আর কেহ যদি কাঠের দ্বারা ভগবানের একটা কল্পিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে তাহার কত মান হওয়া উচিত।" রাজা বোধহয় জীবনে এই প্রথম একটা প্রকৃষ্ট মীমাংসা শুনিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই স্বামিজী বিদেশ যাত্রা করেন। [উদ্বোধন অফিস হইতে প্রকাশিত জীবনী]

স্বামিজী বুঝিতেন যে আচারময় অন্ধ পৌত্তলিকতা আত্মার উন্নতির অন্তরায়—তাই তিনি বলিয়াছেন "যদি ভাল চাও ত ঘণ্টা ফণ্টা গুলোকে

গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক্ মানুষের পূজা করগে—বিরাট আর স্বরাট্—বিরাটরূপ এই জগৎ—তাঁর পূজা মানে তাঁর সেবা, এরই নাম কর্ম্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সাম্‌নে ধ'রে ১০ মিনিট বস্‌ব কি আধঘণ্টা বস্‌ব, ঐ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়— ওর নাম পাগ্‌লা গারদ।"

এই 'গারদ' হইতে মুক্তি দিবার জন্যই তিনি দেশে নবযুগের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যে মহাসমন্বয়-বার্ত্তা প্রচার করিবার উদ্দেশে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সেই বার্ত্তা তিনি বিদেশে থাকিয়া ও তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। জাতীয় অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় চিন্তা করিয়া তিনি যে সহজ নবযুগের ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রভাব সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন একহস্তে সত্যধর্ম্ম দৃঢ়রূপে ধরিয়া অপরহস্তে সামাজিক সংস্কার করিতে হইবে। সংস্কারকের এই ৩টী গুণ থাকা উচিত, ইহা তিনি বারংবার বলিয়াছেন—

(১) সহৃদয়তা অর্থাৎ অপরের দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি।

(২) উদারতা অর্থাৎ স্বীয় সমাজের দোষগুণ বিচার করিয়া গুণভাগটুকু গ্রহণ করিয়া অপর সমাজের গুণভাগের সহিত তাহার সংমিশ্রণের শক্তি।

(৩) নিঃস্বার্থপরতা; স্বার্থশূন্য হইলে সংস্কারকার্য্যে নির্ভীকতা ও অদম্য উৎসাহ আসিবে।

প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের এই তিনটী গুণ ছিল—তাই তাঁহারা সংস্কারকার্য্যে সফলকাম হইয়াছিলেন। সুসভ্য ব্রিটীশরাজের অধীনে আসিয়া আমাদের সমাজের বহু আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হইয়াছে। যাহা আছে তাহা কুলগত, আচারগত, মজ্জাগত। তাহাও দূর করিতে হইবে। আমরা সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু লজ্জার বিষয় যে সহমরণ, নরবলি, কাপালিকাচার, দেবতাবিশেষের তৃপ্ত্যর্থে দেহাংশচ্ছেদ ও নদীতে সন্তাননিক্ষেপ, বালিকাস্ত্রী-বিহার ও 'অন্ত্যজে'র প্রতি শাস্ত্রোচিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি ঘৃণিত পশ্বাচার ব্রিটিশ আইন প্রয়োগে নিবারিত

করিতে হইয়াছে। এদেশে লোকমত অতি মন্থরগামী—যে সকল মহাত্মা—ইংরাজ ও ভারতবাসী,—ভারতের এই সকল দুরপনেয় সামাজিক কলঙ্ক নিরাকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা ধন্য।

বিবেকানন্দ লোকমত গঠনের পূর্বেই দেখিলেন যে হিন্দুসমাজ গতানুগতিকতা ও পৌরহিত্যের প্রভাবে অসহায় বৃদ্ধের মত অদৃষ্ট ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলিতেছে। তিনি দেখিলেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বন্যায় কতকগুলি লোক অসাড়, আবার রামমোহনের ভেরীনিনাদে কতকগুলি লোক সজাগ—কিন্তু পাশ্চাত্য-সভ্যতার তীব্র সৌদামিনী ছটায় দিশাহারা-প্রায়। নূতন ও পুরাতনের জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের সেই দ্বন্দ্ববাসরে ভারতের কাঙ্গাল, ভারতের তথাকথিত নীচজাতি পিষ্ট, দলিত ও চূর্ণিত হইতেছে। তাহাদের জন্য ভাবিবার অবসর নাই।

বিবেকানন্দ বুঝিলেন তাহারাই সমাজের মেরুদণ্ড; তাহাদেরই ভারতবর্ষ। তাহাদের ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল—তিনি অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন, সমাজের গণ্যমান্য উচ্চবর্ণের তথাকথিত নেতাদিগকে এই দুঃখ দূর করিতে আহ্বান করিলেন—কিন্তু বৃথা, কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। মানুষ খুঁজিতে তিনি সমুদ্রের পরপারে যাত্রা করিলেন।

তিনি প্রাণের ভাষায় বলিতেছেন "নিরাশ হইও না, স্মরণ রাখিও 'কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়'। কোমর বাঁধ বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন। সমস্ত জীবন আমি নানা কষ্ট-যন্ত্রণা ভুগিয়াছি। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর বদ্‌মাস বলিয়াছে। আমি এই সমস্তই সহ্য করিয়াছি—তাহাদের জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস, এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষাগার-স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়—যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলে একটুও কম্পিত হয় না। যাহারা আমাকে ভণ্ড বিবেচনা করে, তাহাদের জন্য আমার

দুঃখ হয়। তাহাদের কিছু দোষ নাই। তাহারা বালক, অতি বালক, যদিও সমাজে তাহারা মহা গণ্যমান্য বলিয়া পরিচিত। তাহাদের চক্ষু নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিক্ষেত্রের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না। *তাহাদের নিয়মিত কার্য্য কেবল আহার পান, অর্থোপার্জ্জন ও বংশবৃদ্ধি। এ সবগুলি যেন ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় নিয়মিতরূপে তাহারা করিয়া থাকে—বেশ সুখী তারা"।*

অনেক দুঃখে স্বামিজী এ কথা বলিয়াছেন। হতভাগ্য দেশ—হতভাগ্য জাতি—শিক্ষাহীন, মেরুদণ্ডহীন, অন্তঃসারশূন্য।

'যুগযুগান্তরের নিরাশা-ব্যঞ্জিত-বদন' নরনারী; শিশুর মত অসহায়, প্রচণ্ড স্বার্থপর, দাসবৎ উদ্যমহীন, 'স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু'—দুর্ব্বল-দেহে, মনে।

স্বামিজী বুঝিলেন, রোগ কোথায়—তিনি বলিলেন "একটা তামাসা দেখ—ইউরোপীয়দের ঠাকুর যিশু উপদেশ করেছেন যে নির্বৈর হও, একগালে চড় মার্‌লে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম্ম বন্ধ কর, পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি বেঁধে ব'সে থাক, আমি আবার আস্‌চি, দুনিয়াটা এই দু'চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বল্‌চেন 'সর্ব্বদা মহা উৎসাহে কার্য্য কর, এগিয়ে যাও, দুনিয়া ভোগ কর'। কিন্তু উল্টা সম্‌ঝলি রাম হ'লো—ওরা, ইউরোপীয়েরা যিশুর কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লে না; সদা মহা রজোগুণ—মহা কার্য্যশীল, মহাউৎসাহে দেশ দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ ক'রে ভোগ করবে। আর আমরা, ঘরের কোণে ব'সে পোঁট্‌লা পুঁট্‌লী বেঁধে দিন রাত মরণের ভাব্‌না ভাব্‌চি আর 'নলিনী-দলগত-জলমতি-তরলং' গাচ্ছি; যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্চে; আর পোড়া যমও তাই বাগ্‌ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে"।

কথাগুলির অধিকাংশ আজও সত্য বলে মনে হয়। কেমন করিয়া ঘনীভূত অবসাদ এ দেশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে? এ দেশের শাস্ত্রেই ত আছে—

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্‌॥

অর্থাৎ শুইয়া পড়িয়া থাকিলেই তাহার কলিযুগ লাগিয়া থাকে ; যে জাগিয়া উঠিয়া বসিল তাহার দ্বাপর ; যে দাঁড়াইয়া উঠিল তাহার ত্রেতা উপস্থিত হইল ; যে মুক্তপথে যাত্রা করিল তাহার সত্যযুগ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অতএব যাত্রা কর যাত্রা কর।

"চরন বৈ মধু বিন্দতি চরন স্বাদুমুদম্বরং
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে চরন" ॥

অর্থাৎ যে চলিতেছে সেই মধু লাভ করিতেছে, যে চলিতেছে সে অমৃতময় ফললাভ করিতেছে, ঐ দেখ সূর্য্যের কি দীপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব—সে যে চলিতে চলিতে কখনও তন্দ্রাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর। কত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে—মুক্তির আনন্দ বড় আনন্দ—আমরা মুক্তি চাই, কিন্তু আমাদের গরীবদিগকে, পতিতদিগকে কি মুক্তি দিয়াছি ? তাহাদের পলাইবার কোন উপায় নাই। তাহাদের কথা কি আমরা ভাবিয়া থাকি ? স্বামিজী বলিতেছেন "ভারতের দরিদ্র ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই ; সে যতই চেষ্টা করুক তাহার উঠিবার উপায় নাই—তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে —তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। শুন সখে—প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি ; হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই—হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন— জগতের যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কর্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব, প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন, তোমাদিগকে গরীবের জন্য পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে—কয়জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে ! হে ভগবান আমরা কি মানুষ ?"

তাঁহার আবেদন বৃথা হয় নাই—আজ ভারতে সেবাধর্ম্মের প্রবাহ বহমান, এ চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে যে না অঙ্গ ভাসাইল—সে বুঝি নবমন্দাকিনীর পুণ্যসুবাস পাইল না? এ সঙ্গীতে যে না যোগ দিল, সে বুঝি জীবন-রাগিণীর মুক্তিতান শুনিল না। ঐ ত তিনি গাহিতেছেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ঈশ্বর এত নিকটে—তাঁহাকে পাওয়া এত সহজ,—এমন করিয়া আর বুঝি কেহ বুঝান নাই! তাই তাঁহার ধর্ম্ম আসমুদ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

আচার-কুশল পূজারত যাজ্ঞিক, অন্ধ নীচজাতীয় ভিক্ষুককে মন্দির সোপানে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আরে আরে অপবিত্র! দূর হয়ে যারে।"

সে কহিল—'চলিলাম'। চক্ষের নিমেষে ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।

ভক্ত কহে 'প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে!'
ভিখারী কহিল—"মোরে দূর করি দিলে!
জগতের দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী এই পুরোহিতকে অমর করিয়াছে।

স্বামিজী কর্ম্মী যুবক চাহিয়াছেন—তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছেন "তোমরাই ভারতের আশ্রয়স্থল—তাই তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন, তিনি বলিতেন, দাসবংশ বৃদ্ধি করায় ফল কি? উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করা তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, আমাদের পুরোহিতেরা বিধান দিয়া ১ঢিলে ৩পাখী মার্চেন—(১) যে ছেলেটীর সঙ্গে কচি মেয়েটীর বে দেওয়া হ'ল তার উন্নতির দফা রফা, (২য়) মেয়েটীর কপালে হয় অকাল বৈধব্য না হয় প্রসবকালীন মৃত্যু (৩) ভবিষ্যবংশের দৈহিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য। ১৯২১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্টে প্রকাশ—

BENGAL

বয়স	বিবাহিত হিন্দু বালিকা সংখ্যা	মুসলমান বালিকা সংখ্যা
১—২	৫	১৩
২—৩	১০৮	২৭
৩—৪	১৫৮	৫২
৪—৫	২৪৫	৭৪
৫—১০	১৪২৫	৬২৪
১০—১৫	১২,২০৬	৩৩৪০

যাদের সমাজে এক বৎসরের মেয়েরও বিয়ে হতে পারে, তাদের সাগরের জলে ডুবে মরা উচিত।

কেবল কলিকাতায় বালবিধবা ১০—১৫ বৎসরের।
সংখ্যা = ১৪,৭৪৯।

১৫ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা = ২৬৯৬ বালবিধবা।

তাই বহুপূর্ব্বে স্বামিজী বলিয়া গিয়াছেন "স্মৃতি ফ্‌তি লিখে নিয়ম নীতিতে বদ্ধ ক'রে এ দেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine মাত্র করে তুলেচে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের এখন না তুল্‌লে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?"

তিনি বলিতেন, "শঙ্করাচার্য্যের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধের হৃদয় নিয়ে দেশের কাজে লেগে যাও—আমরা ধনী বা বড় লোককে গ্রাহ্য করি না; হৃদয়শূন্য মস্তকসার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদ পত্র ও প্রবন্ধ সমূহকে গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি—অগ্নিময় বিশ্বাস—অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু! জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত! জয় প্রভু—অগ্রসর হও—প্রভু আমাদের নেতা।" এই আত্মবিশ্বাস তাঁহার উন্নতির মূলমন্ত্র। এই বিশ্বাসই ভিতরের ব্রহ্মকে সজাগ করিয়া দেয়—এই বিশ্বাসই ভবিষ্যতের আশা, কর্ম্মের উন্মাদনা, সাফল্যের গর্ব্ব। কার্লাইল বলিয়াছেন "There is not a leaf rotting on the highway but has force in it. how else could it rot? Force, force everywhere—force; and we ourselves are a mysterious force in the centre of that." এই মহাবাণীর প্রতিধ্বনি স্বামিজীর প্রত্যেক বক্তৃতায় পাইয়া থাকি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "গতিই সংসারের সুখ, চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য"। এই চাঞ্চল্যের অর্থ চপলতা বা হঠাৎ

দেশোদ্ধারের চেষ্টায় আত্মহত্যা নহে। যে গতি, চাঞ্চল্যের দ্বারা আত্মভাবের বিকাশ হয়, চিত্তশুদ্ধি ও পরোপকার স্পৃহায় যে চাঞ্চল্য তরঙ্গিত হইয়া উঠে, যে চাঞ্চল্য ঈর্ষা অহমিকা ডুবাইয়া প্রেম ও সত্যানুরাগ জাগাইয়া দেয়—সেই চাঞ্চল্যের কথা স্বামিজী বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "ভগবান্ অতি উত্তমরূপে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তাঁর কাজও সর্ব্বোত্তম। এইরূপ যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখ্‌তে পারেন, তিনিই সব চেয়ে বেশী কাজ কর্‌তে পারেন"।

সমাজ সংস্কার নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাবিধান ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবারূপ কত সহজসাধ্য কার্য্যই সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে—কার্য্য করিবার জন্য যে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, দুর্ব্বল দেহ সে শক্তি কোথায় পাইবে—তাই এক কথায় তিনি বলিয়াছেন "God will be nearer to you through the football than through the Gita." নেতা হইবার প্রবৃত্তি দমন করার জন্য তিনি বিশেষভাবে বলিয়াছেন "নেতা কি তৈরী কর্‌তে পারা যায়? লিডার জন্মায়—লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজার লোকের মন যোগান। ঈর্ষা, স্বার্থপরতা মোটেই থাক্‌বে না, তবে Leader। প্রথম By birth দ্বিতীয় Unselfish হওয়া। তবে লিডারের হুকুম তামিল কর্ত্তে শেখা চাই, হুকুম কর্ব্বার আগে। ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তামিল কর্ব্বার কেউ নেই।"

তিনি জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ও তাহাদের ধর্ম্ম আচারাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন—তাহা অতি সাবধানে তাঁহার দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার সারা জীবনব্যাপী সাধনা ছিল "ত্যাগ"। তিনি বুঝিয়াছিলেন—"ভোগে শান্তি নাই, অনন্ত দুঃখ—ত্যাগেই অনন্ত শান্তি।" বেদান্তের পৃষ্ঠা হইতে নিরবচ্ছিন্ন নিত্য আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তিনি প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মবীরের মত সহজ সরল সত্য কথায় তাঁহার দেশবাসীকে দীক্ষিত করিয়াছেন।

তিনি আমাদিগকে হিংসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন—কারণ হিংসা ক্রীতদাস সুলভ মনোবৃত্তি; তিনি আমাদিগকে নিজের জন্য ভিক্ষা

করিতে নিষেধ করিয়াছেন—কারণ ভিক্ষুক কখনও সুখী হয় না ; সে জানে যে গৃহস্বামী তাহাকে ঘৃণা করিয়া ভিক্ষা দিতেছে, কিম্বা নীচ ও দয়ার পাত্র ভাবিয়া সাহায্য করিতেছে ।

জগতে সর্ব্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। "সর্ব্বস্ব দিয়ে যাও—আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও ; এতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও ; কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়োনা—একমাত্র প্রার্থনা হোক, প্রভু আমায় মানুষ কর !"

এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার প্রবাসজীবন ও বেদান্ত চর্চ্চার আলোচনা সম্ভবপর নহে। তাঁহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কিম্বা তাঁহার দেশবিজয় কাহিনী কোন্ শিক্ষিত বাঙ্গালী না অবগত আছেন ? তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ নিষ্কাম সাধক, নিষ্কলুষ কর্ম্মবীর, উদারহৃদয় স্বদেশপ্রেমিক, আর কি দেখিতে পাইব—আর কি সে পবিত্র ভাস্করোপম কান্তি, সে সরল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু, সে সদা করুণাবিগলিত-প্রাণ নরদেবতাকে দেখিতে পাইব—আবার আসিও মহাপ্রাণ, বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালার অহঙ্কার—আবার আসিয়া এই দাসবৎ উদ্যমহীন, স্বজাতি নিপীড়ক, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন জাতিকে তাহার তন্দ্রাঘোর হইতে ডাকিয়া বলিও "আমি ভারতবাসী,—ভারতবাসী আমার ভাই ; মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; বলিও ভারতবর্ষ আমার প্রাণ ; ভারতের ধূলি আমার স্বর্ণরেণু, ভারতের সমাজ আমার শৈশবের শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ।

'প্রতিভা' । শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রবাসীর পত্রাংশ

(১)

P & O., S. N. Co.
S. S. Kasghar
3rd October, 1923.

আমরা 4th Oct. Adenএ যাব এবং সেখানে এই পত্র Post করিব। এই জাহাজে আমরা ৪ জন বাঙ্গালী, ২ জন মুসলমান। Bombay হ'তে ২ জন মহারাষ্ট্রবাসী সপরিবারে উঠিয়াছেন। সমুদ্র খুবই calm, তাই কাহারও sea-sickness হয় নাই। এখানে সারাদিন খাবারের ঘণ্টাই বাজিতেছে। প্রাতে ঘুম হ'তে উঠিবার পূর্ব্বে চা, Biscuits ও ২টী কলা। পরে ৮½টার সময় Breakfast, Soup (vegetable), মাছ ভাজা, Biscuits, Cake, আলু, Salad, কফি ইত্যাদি। ১½টায় Lunch, ভাত তরকারী, রুটী মাথন, জেলী ইত্যাদি। ৪টার সময় Afternoon tea ও ৬½টায় Dinner। এত খাওয়া অথচ কাজ নাই। আজ হতে cricket খেলা আরম্ভ হ'ল, তাস, দাবা, Basket throwing ইত্যাদি অনেক প্রকার খেলাই চলিতেছে তবে উহা সাহেব মেমদের জন্য। আমরা ইচ্ছা করিয়া মিশি না। আমাদের মধ্যে একজন তাস খেলায় যোগ দিয়াছেন। Porridge and Milk বেশ লাগে এবং আমি ওটা খুবই খাই।

সারাদিন এই পোষাকে খুবই কষ্ট হইতেছে। ঘরে শুধু শোবার যায়গা, বসিবার স্থান নাই। ইহাদের আদব কায়দা এত বেশী যে, চলা-ফেরা বিষয়ে স্বাধীনতা নাই বলিলেই চলে। হাসি, ঠাট্টা, কথা বলা, কাসা, হাঁচা, বসা—সবই বজ্র বাঁধনের ভিতর। তারপর এই পোষাক ও গলার Neck-tie। এইসব বিষয়ে আমিই অন্যান্য Indianদের চেয়ে বেশী অপক্ক, তাই তাঁহারা আমাকে সুবিধা পাইলেই ঠাট্টা করিতে ছাড়েন না। পরাধীনের এরূপ অনুকরণ

দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের মত শোভা পাইতেছে। এইসব কায়দা শিখিতে আমার প্রায় ৬ মাস লাগিবে। Indiansরা সবাই "Manners" "Don't" ইত্যাদি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা স্বাধীন থাকিলে এইসব শিখিতে বা অনুকরণ করিতে হইত না। এইসব আদব কায়দার কিছু কিছু আমাদের নিলে মন্দ হয় না। তবে স্বাধীন হইলে সবটা পরিবর্ত্তন করা দরকার হইত না।

এখন এখানে মন্দ নেই। তবে প্রাতে বসিবার স্থান পাই না, এই যা কষ্ট। ইতি—

---

(২)

আজ আমরা Suezএ যা'ব এবং কাল Port Said এ পৌঁছাব। খাওয়া দাওয়া ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। মাছভাজা একখানা ও আলু, বাকি সবই মাংস। তাই একটু মুস্কিলে আছি। দিনরাত এই পোষাকে বড়ই কষ্ট হইতেছে। শনিবার Marselleis যাব। ইতি—

পুঃ—Red Seaতে গরম তত বেশী নাই, একদিন শুধু 95° F উঠিয়াছিল, তবুও বেশ বাতাস ছিল, তাইতেই সাহেব যাত্রীদের খুব গরম বোধ হইয়াছিল।

---

(৩)

জাহাজের বিবরণ এবং আদবকায়দা সম্বন্ধে তোমায় লিখি। আমি Aden ও Port Saidএ নামিয়া সহর দেখিয়া আসিয়াছি, সহরগুলি বেশ পরিষ্কার, বাড়ীগুলিও সুন্দর, তবে গাছপালা নাই বলিলেও চলে। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে যাত্রীদের খাবার দ্রব্য সবই ভারতবর্ষ হইতে লয়। Bombay হইতে ছাড়বার সময় খাবার অনেক ও বেশ ভালই ছিল। এখন দিন দিনই কম ও খারাপ হইতেছে, তবে এতবার খাইতে দেয়

যে কম হইলেও অসুবিধা বোধ হয় না। আলুই আমাদের প্রধান খাদ্য। কপি আছে, তবে পাতা সিদ্ধ করিয়া দেয় আমরা নুন মাখিয়া খাই। মাছ বেশ তবে মাঝে মাঝে মাছও খারাপ হয়।

আমার ঘরটী বেশ, সমুদ্রের হাওয়া খুবই আসে। আমরা রবিবার Marsellies যাব, আজ প্রাতে Italy ও Sicilyর ভিতর দিয়া আসিয়াছি। Mount Itnaর প্রায় ১৫মাইল দূর দিয়া জাহাজ গিয়াছিল, Binocular দিয়া Erruption দেখিলাম ধূম ও গলিত Metal, বেশ দেখিলাম।

আদব কায়দা শিখিতে বড়ই বিব্রত হইতে হইতেছে। চিরকাল শীত করিলে পকেটে হাত দিতাম এখন Pantএর ভিতর হাত দিতে হবে। কাসিতে ও হাঁচিতে রুমাল চাই, মুখে দেবার জন্য। আমার এখনও এটা অভ্যস্ত হয় নাই। হাঁচি ও কাসির পর মনে পড়ে, রুমাল বাহির করা উচিৎ ছিল। যথা সময়ে ঐ কথা মনে পড়ে না। সাহেবদের মুখে, 'Sorry' 'Thanks' 'Beg your pardon' 'that's all right' ইত্যাদি কথা যেন লাগিয়াই আছে; কথায় কথায় এই সব বুলি বাহির হয়। সেদিন একটা সাহেবের সঙ্গে ঠক্কর লাগে, অবশ্য যাইতে যাইতে দুজনাই ধাক্কা খাই। তবে তাহার কিছু বেশীই লাগিল। সে বলিয়া উঠিল 'Sorry', আমার কিন্তু তখন ঐরূপ কোন বুলি মনে আসিল না, সে চলিয়া গেলে পরে মনে হ'ল আমারও 'Sorry' বা বলা উচিত ছিল। অন্যান্য ভারতীয়দের এই বিষয়ে আমার মত অবস্থা নয়। এই সব বিষয়ে তাহারা অনেকটা অভ্যস্ত। সকালে উঠিয়া Good Morning ও রাত্রে শোবার আগে Good Night বলিতে বলিতে হয়রান।

পোষাকে ক্রমশঃই অভ্যস্ত হইতেছি। আজকাল এখানে বেশ ঠাণ্ডা, সবাই গরম পোষাক বাহির করিয়াছে। পোষাক পরিয়া শরীরের কোনস্থান চুলকাইবার দরকার হইলে বড়ই অসুবিধা। আমার শরীর বেশ ভালই আছে। কোনরূপ অসুখ নাই।

খাবারের কায়দা প্রায় শিখিয়াছি, তবে হাত দিয়া না খাওয়ায় তৃপ্তি বোধ হয় না। ইতি

(৪)

21 Cromwell Road
S. W. Loudon
18-1-23.

আমি গত পরশ্ব এখানে আসিয়াছি, পথে Parisতে একদিন ছিলাম। এখানে শীত কেবল আরম্ভ হইয়াছে ; ঘরে ঘরে এখনও আগুন জ্বালে নাই, তবে Drawing Roomএ আগুন জ্বালা হয়, এবং সকালে ও সন্ধ্যায় সকলে সেখানে মিলিত হয়। কিছু মোটা Under Wear কিনিয়াই Passage ঠিক করিয়া Sweden রওনা হব। Paris ও Londonএর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কলিকাতাকে গ্রাম বলিয়া মনে হয়। এবার London সহর ভাল করিয়া দেখা হবে না, ফিরিবার পথে দেখিব। শুনিলাম একা London সহরে শুধু বাঙ্গালী ছেলেই আছে ৫০০শত। আমি ভাল আছি ; ইতি

(৫)

* * *

এখানে আরও ৪।৫ দিন থাকিব। Motor-Bus, Motor, Tram, Trains, সবই দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। বড় বড় রাস্তা Cross করাও মুস্কিল। তবে পুলিশ খুবই ভদ্র, পূর্ব্বে London পুলিশের কথা যেমন শুনিয়াছিলাম সেইরূপই। এখানকার Collegeএর বাড়ীগুলি কত বড়! শুধু Imperial Collegeটীই বোধহয় আমাদের Writers Buildings অপেক্ষা অনেক বড়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবার জিনিষও অনেক আছে। ইতি—

(৬)

Uppsala, Sweden
27-10-23.

গতকল্য এখানে আসিয়াছি। North Seaতে আজকাল খুবই ঝড় বাতাস, তাই Sea-sickness হইয়াছিল, তবে ২ দিনের জন্য।

এখানে আসিয়া দেখি যে ইহারা ইংরাজী খুব কমই জানে। দোকানদার Hotel-keepers ও কলেজের লোকেরা সবাই কিছু কিছু ইংরাজী জানে, কিন্তু এত কম ও তাহার এরূপ উচ্চারণ যে কথা কহিলে কিছুই বুঝিতে পারি না। এইজন্য আমি অত্যন্ত একাকী বোধ করিতেছি। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় যে কেন আসিলাম। এখনও কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করি নাই; হয়ত কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করিলে এরূপ মনে হইবে না। মন এখানে আসিয়া খুবই দমিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তি আর নাই। কথা বলার পর্য্যন্ত লোক নাই; আমি যে বাড়ীতে থাকি সেখানে কেহই ইংরাজী জানেন না, নেহাৎ দরকার হইলে Dictionary খুলিয়া কাজ কর্ম্ম চালাইতে হয়। এখানে স্নানের বন্দোবস্ত খুব কম বাড়ীতেই আছে। খাওয়া দাওয়া কোন রকমে চলে, ইহাতে বিশেষ অসুবিধা নাই, ডিম ও মাছ খাই; চা এত খারাপ যে খাওয়া যায় না, তবে এখানে সবাই Coffee খায়, তাও আবার ঠাণ্ডা করিয়া। ইহাই নাকি ইহাদের ধরণ। এখানকার Universityর একজন Assistant, America ঘুরিয়া আসিয়াছেন তিনিই সবচেয়ে ভাল ইংরাজী বলেন, কিন্তু শুনিলে মনে হয় আমাদের 4th বা 3rd class এর ছেলেরা ইহাপেক্ষা ভাল বলিতে পারে! তবে ইহারা সবাই ইংরাজী লেখা Dictionary লইয়া বুঝিতে পারে।

সব লেখাপড়া Swedish ভাষায় হয়। এই Universityতে B. Sc. class এ ৫০ জনা ছাত্র ও M. Sc. class এ ৪ জনা ছাত্র, এবার নাকি ছাত্র সংখ্যা বেশী! ইহাদের Laboratory, Library, ঘর বাড়ী অতি সুন্দর, খরচ পত্র সবই Govt. দেন।

Norway ও Swedenকে ইহারা Europe এর Garden বলে; যেখানে সেখানে সবুজ ঘাস ও সবুজ গাছের পাতা দেখা যায় সেই স্থান দেখাইয়া বলে "Look, Poetry"। London হতে ইহাদের বাগানের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে আসিতেছি, এবং ইহাদের Poetry আসিয়া দেখিলাম, বাংলা দেশের তুলনায় কিছুই না। গাছের পাতা ও ঘাস প্রায়ই লাল্‌চে ধরণের তাই যেখানে সবুজ সেখানেই Poetry !

ইহাদের আচার ব্যবহার ইংরেজদের মত, তবে খাবারের ধরণ আলাদা। Sir J. C. Bose আজকাল Sweden এ আছেন, ৭।৮ দিন পূর্ব্বে Uppsala ছিলেন। কিন্তু Universityতে বা Laboratory দেখিতে আসেন নাই, তাই ইহারা একটু দুঃখ প্রকাশ করিল। তিনি নাকি এখন Stockholm, Nobel Institute এ আছেন।

London এ আমরা যে Indian Hostel এ ছিল'ম, সেখানে বাঙ্গালীই বেশী তাহাদের ভিতর আবার পূর্ব্ব-বঙ্গ বেশী, তাই সে যায়গাটা কলিকাতা Mess এর মত, কোনও Formalities বা নিয়ম কানুন ছিল না, এখানে সেরূপ হবার যো নাই। Assistant এর সঙ্গে তাহাদের Hotel এ খাইতে যাই।

Townটা ফরিদপুর সহরের চেয়েও ছোট, বেশ পরিষ্কার। বড় বড় Church, Castle, ও Universityর বাড়ী, Hotel, Bank আছে। Motor, Cycle, Tram ও খুব। এই টুকুত সহর Tram Company কি করিয়া চলে বুঝি না। Townটা লম্বায় বড় জোর এক মাইলের কিছু উপর, চওড়া ½ মাইলের কিছু বেশী হবে। ইতি।

(৭)

Fiska Institution
Uneversitet
Uppsala, Sweden.

* * *

আজ ১৬।১৭ দিন এখানে; প্রথমে যেরূপ অসুবিধা ছিল এখন ততটা নাই। তবে গল্প করিবার লোক নাই। ইহারা এত কম ইংরাজী

জানে যে কথা বলা কষ্টকর তাই ২।৩ জন ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলে না।

এখানে ছাত্রদের বেশ দেখি, প্রতিদিন প্রায় ৮।১০ ঘণ্টা তাদের সঙ্গেই থাকে। তাদের Health বেশ। আমি যে দলে আছি, সে দলের মধ্যে আমার Health সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ না হলেও Last Class এর ছেলেরা বেশ লম্বা, Smart ও স্ফূর্ত্তি প্রিয়। দিনরাত স্ফূর্ত্তিতেই আছে। সবাই Boxing, Riding, Shooting, Cycling প্রভৃতি Manly Games জানে এবং কলেজ ছাড়িলেই সবাইকে ১ বৎসর অন্ততঃ Army বা Navy তে Serve করিতে হয়। আমাদের দেশের ছেলেদের সঙ্গে খুবই প্রভেদ। এ দেশে "College Student" বেশ সম্মানের বিষয়, Student বলিতে সবাই গর্ব্ব অনুভব করে। এখানকার Lecturer দের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, তাঁহারা Theoretical আমাদের চেয়ে অনেক কম পড়ান। মুখস্থ বিদ্যা খুবই সামান্য, কিন্তু Modern যন্ত্রপাতি সবই ছেলেরা ব্যবহার করিতে জানে। যে সব যন্ত্র আমরা নামে জানি, তাহা ইহাদের ছেলেরা বেশ ব্যবহার করিতে জানে। প্রত্যেককেই Workshsop Work কিছু না কিছু করিতে হয়। ছেলেদের কাজের জন্য সামান্য সামান্য যন্ত্রপাতির দরকার হলে, তাহা নিজেদেরই তৈয়ার করিতে হয়। Practical ইহারা এত বেশী জানে যে আমি এখানে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি। সম্প্রতি আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি, তাহার কোন যন্ত্রই আমি কখনও ব্যবহার করি নাই, অথচ জিনিষগুলি এত Sensitive যে সামান্য Rough Handling করিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। ইহাতে আমি বড়ই সন্তর্পণে আছি, কি জানি কখন কি হয়। বেশ Nervous হইয়াছি।

আমার খাদ্য এখানে—দুধ প্রায় ১ সের, দিনে মাছ, ডিম, রুটি মাখন, আলু ও চা বা কফি। ৩ বার খাই। আমি Beef খাই না। কারণ Hindu, এ জন্য আমার এই Sentiment ইহারা বেশ সম্মান করিয়া চলেন। আমি আজকাল Student দের Boarding House এ আছি। আমাকে ইহারা Beef এর বদলে ডিম বা মাছ দেয়। ইচ্ছা

করিলে দুধ আরও বেশী করিয়া নিতে পারি, তবে ইহারা দুধ সিদ্ধ করিয়া খায় না কাঁচা দুধই খায়।

আমি আসিবার পর Prof. একদিন সবাইকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সে দিনকার Dinnerএ আমার Sentiment এর প্রতি শ্রদ্ধার জন্য Beef-এর কোনই Preparation Tableএ আসে নাই, ইহারা অত্যন্ত ভদ্র বলিয়াই এরূপ করিয়াছিল। খাবার সময় আমি মদ খাই না, জল খাই, পরে চুরুট খাই না, আবার Dinnerএর পর Dancing জানি না ইহাতে সবাই অবাক্ হইয়াছে, বলে যে তোমরা আনন্দ কর কিসে। ইহারা শীতের জন্য এত বেশী মদ খায় যে খাবারের পর অনেক সময় কথা বলা মুস্কিল।

আজ প্রাতে এ বৎসর প্রথম ৪ ইঞ্চি বরফ পড়িয়াছে এখন বেলা ২টা এখনও সব গলিয়া যায় নাই। শীত বড় বেশী। এখানে আসার পর স্নান করি নাই, স্নানের যায়গা নাই, দরকার বোধ করিলে "Public Bathing-place" এ স্নান করিতে যায়: সেখানে আমার পক্ষে স্নান করা অসম্ভব তাই এখানে যত দিন আছি স্নান করা চলিবে না। তবে প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে হাত পা ও মাথা ধুইয়া ফেলি। আমি শারীরিক ভালই আছি।

ইতি-

অধ্যাপক ডাঃ বিধুভূষণ রায় এম্ এস্-সি, ডি এস্-সি

সাধুর ডায়রী

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আমি একবার শারদীয়া পূজার অবকাশ উপলক্ষে সাংসারিক ঝঞ্চাট হ'তে ছুটি নিয়ে কিছুকালের জন্য তীর্থদর্শনে বের হয়েছিলাম। বহুস্থান ঘুরে ঘুরে অবশেষে হরিদ্বারে এসে উপস্থিত হই। সেখানে পরিচিত কেহ না থাকায় গঙ্গার তীরবর্তী এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। আমি যে ঘরটীতে ছিলাম সেই ঘরে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমার তেমন আলাপ পরিচয়ের অবসর হয় নাই। কারণ ২।৩ দিনের মধ্যেই তাঁরা সব অন্যত্র চলে গেলেন। এদিকে আমিও হরিদ্বারে যা যা দ্রষ্টব্য ছিল সব দেখা হয়ে যাওয়ায় দেশে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। পুটলী-পাটলা সব বাধ্‌ছি এমন সময় দেখি কাছেই ছেঁড়া পাতার মত কি একটা পড়ে আছে, দেখে আমার খুব কৌতূহল হল। আমি জিনিষটা তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখলুম যে ওটা এক সাধুর ডায়রী। এখানে যে সব সাধু-সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁদেরই কারও ডায়েরী হবে, ভুলে ফেলে গেছেন। পড়ে দেখ্‌লাম তাতে সাধুজীবনের অনেক কথা এবং অপরকে দেবার মত অনেক জিনিষ আছে। সাধুটীর বাঙ্গালী শরীর ছিল বলেই মনে হয়। তাঁকে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আজ সেই ডায়রী হতে সাধুর জীবনের একটা অংশ যেরূপ লিপিবদ্ধ পেয়েছি নকল করে পাঠাচ্ছি। যদি আপনি উহা উদ্বোধনে ছাপেন, তবে কারও কারও এতে উপকার হতে পারে। ইতি।

ভবদীয়

'পূর্ণকাম'

"আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। বহু তীর্থ পর্য্যটন এবং কিছুকাল হিমালয়ে তপস্যার পর একবার জন্মস্থান দর্শনে বের হয়েছি। বায়স্কোপের

চিত্রের মত পূর্ব্বাশ্রমের কত কথা—খেলা-ধূলা, হাঁসি-কান্না এবং ঘাত-প্রতিঘাতের কত ছবি আমার মনে পর পর উঠতে লাগ্‌ল। আকাশ পাতাল ভাবৃতে ভাব্‌তে আমি জন্মস্থানের নিকটবর্ত্তী একস্থানে এসে উপস্থিত হ'লাম। সেস্থান হতে জন্মস্থান প্রায় ৮।৯ মাইল দূরে। বিস্তীর্ণ শস্য-শ্যামল মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা, কাছে এবং দূরে ছোট বড় গ্রাম। মৃদুমন্দ দক্ষিণে হাওয়া বহিতেছিল। অনেক দিন উত্তরাখণ্ড বাসের পর সোণার বাংলার স্নিগ্ধ-মধুর সৌন্দর্য্যে প্রাণ পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল, মনে পড়ল—কবির কবিতায় সেই দুই ছত্র যেখানে তিনি বঙ্গপল্লীর সৌন্দর্য্যে মাতোয়ারা হয়ে গেয়েছেন—

'অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবীড় শান্তির নীর ছোট ছোট গ্রামগুলি।'

গেরুয়া কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী আমি সহজেই পথিকদের নজরে পড়লুম। আমার সম্বন্ধে নানালোকে নানা কথা বলাবলি করে যেতে লাগ্‌ল। সূর্য্য সবুজ মাঠের কিনারায় গ্রাম্য বনরাজির অন্তরালে অস্ত যেতে সুরু কর্‌লেন। পশ্চিম দিক্‌টা রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। চারিদিকের মনোরম শোভা দেখে পথ চল্‌ছিলাম বলে আমার এতক্ষণ পথশ্রম একেবারেই বোধ হচ্ছিল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হয়ে এল এবং আরও কিছুক্ষণ চলবার পর রাত অনুমান ৮।৯টার সময় পূর্ব্বাশ্রমে পৌঁছিলাম। পূর্ব্বাশ্রমের সকলেই আমাকে দেখবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। দেখে সকলেরই আনন্দ হল। কুশল প্রশ্ন, প্রেম সম্ভাষণ-পর্ব্ব শেষ হয়ে গেলে আহারের পর সকলের নিকট হতে ছুটি নিয়ে বিশ্রাম কর্‌তে গেলাম। পরদিন গ্রামে একটা সাড়া পড়ে গেল। ছেলে বুড়ো, স্ত্রীপুরুষ অনেকেই আমায় দেখ্‌তে এলেন। নানালোকের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমি হাঁপিয়ে পড়্‌লুম। (ক্রমশঃ)

মাধুকরী

মিষ্টার এইচ্, জি ওএলস্ ১৯২০ সালে রুশ দেশ কয়েক দিবসের জন্য ভ্রমণ করিয়া আসিয়া Russia in the Shadows নামক গ্রন্থে যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহা যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে দেশবাসীকে যথাযথরূপে শিক্ষিত না করিয়া যদি হঠাৎ কোনও পরিবর্ত্তন দেশের উপর আনা যায় তাহা হইলে অশিক্ষিত জনসাধারণ পাপ ও অত্যাচার ধ্বংস করিতে গিয়া দেশের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানও ধ্বংস করিয়া বসিবে। প্রচলিত রীতি, নীতি যাহা নিম্ন সম্প্রদায়ের উপর এতকাল ধরিয়া অত্যাচার ও অবিচার করিয়াছে, তাহার ধ্বংসের সহিত সঙ্ঘগঠনে ও বিদ্যার উপকারিতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ চাষাভূষা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া নিজেরাও ধ্বংসের মুখে গমন করে।

* * *

কিন্তু বলশেভিক মতবাদ বা শাসন যতই খারাপ হউক একটী জিনিষ ভারতবাসীর—ভারতবাসী কেন সমগ্র জগতের শিখিবার আছে। একমত, এক আদর্শ, পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস লইয়া একটী ক্ষুদ্র ও নিম্ন সম্প্রদায়ও অতি বড় বলশালীকেও ভূপাতিত করিতে পারে। পাঠক, পাঠিকা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে সমগ্র রুশদেশে ঠিক ঠিক Communists (বলশেভিক মতাবলম্বী) মাত্র ৬০০,০০০ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে মাত্র ১৫০,০০০ লক্ষ মাত্র কার্য্যকরী সভ্য।

মিঃ জে, এস্টিন কারপেনটার, হিবার্ট জারনালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে চৈনিক্ পরিব্রাজক য়ুনচঙ্ এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে হিন্দুদের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা হয়। য়ুন্ চঙ্ একস্থলে লিখিয়াছেন,—

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মপালন সম্বন্ধে, সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বিখ্যাত ছিলেন। গম্ভীর, জিজ্ঞাসু, সুন্দর বেশধারী

সন্ন্যাসিগণ বিদ্যাচর্চ্চা লইয়া এত গভীর মনোনিবেশ করিতেন যে সমগ্র দিন যেন তাঁহাদের নিকট অতি অল্প বলিয়া বোধ হইত। সেখানকার রীতি নীতি অতি কঠোর ছিল। যাহারা শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ লইয়া বিচার না করিত তাহাদিগকে অপমানিত করা হইত ও পৃথক বাস করিতে হইত। বিদেশী ছাত্রেরা সমস্যার কাঠিন্য সমাধানে অসমর্থ হইয়া সাধারণতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিত। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার বিদ্যারই অনুশীলন যথেষ্ট ছিল। শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহবা গণিতের, কেহ বা ভূগোলের কেহ বা জ্যোতির্বিদ্যার এবং কেহ বা ভেষজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। সন্ন্যাসীদিগের জীব সেবা কল্পে শেষোক্ত বিদ্যা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পরমার্থ বিদ্যা বৈদিক সামগণের ন্যায় আবৃত্তিরূপে, কখনও বা বক্তৃতায় এবং কখনও বা বিচারের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইত।

* * *

ইং সিংএর বিবরণানুসারে শ্রীবুদ্ধের দেহ ত্যাগের পর তাঁহার বাণীকে অবলম্বন করিয়া খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই নানা মতবাদের উত্থান হইয়াছিল। সেই সকল মতবাদকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল বলিতেন এক মহাপ্রাণ বিশ্বাত্মা জগদন্তরালে ওত-প্রোত বর্ত্তমান তাঁহার সহিত সাজুজ্য লাভই শান্তি। অপরে সেই পূর্ণ সংকে অস্বীকার করিয়া তাহার স্থলে শূন্য অসংকে প্রতিষ্ঠা করিতেন। বিভিন্ন সময়ে এই দুই মতের একটীর প্রাধান্য ঘটিত। কিন্তু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উভয় মতেরই অনুশীলন সমান্তরাল ভাবে চলিত।

অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের প্রতিনিধি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, গানও স্তোত্র সকলের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সেই মহামানবের ধর্ম্ম-স্তম্ভ-রূপ সাধারণ ভিত্তির উপর সকলেই বর্দ্ধমান হইয়াছিল। এই বিভিন্ন সুরের মধ্যে একতানতা সম্পাদন করিয়াছিল আরও দুইটী সত্য—সাধারণনীতি ও জীব-সেবা।

* * *

বাণ তাঁহার শ্রীহর্ষচরিতে আর একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, বৌদ্ধ, জৈন, ভাগবত, সাংখ্য, লোকায়ত, বৈশেষিক, ন্যায়, দায়ভাগ, পুরাণ, মীমাংসা, ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের অনুশীলন হইত।

রয়টার সংবাদ দিয়াছেন যে রুশিয়ায় ভয়াবহ ভাবে ম্যালেরিয়া বর্দ্ধিত হওয়ায় সেখানকার বর্ত্তমান যুগো-শ্লাভ কর্ত্তৃপক্ষেরা একপ্রকার গ্যাস আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা মশকের জন্মস্থান জলে ছাড়িয়া দিলে তিন মিনিটের মধ্যেই সমস্ত মশকবীজ নষ্ট হয় পরন্তু জলের কোনও ক্ষতি হয় না। এই প্রকারে তাঁহারা সমগ্র বিষাক্ত মশককুল নির্ম্মূল করিতে চাহেন।

লোক সংখ্যার দ্বারা জাতির শক্তি নিরূপিত হয় না যুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলির লোক সংখ্যা যাহা ছিল তাহাপেক্ষা আমাদের করদরাজ্যগুলির লোক সংখ্যা অনেক বেশী; অথচ ইংরাজ উপনিবেশ সমূহ ও ইউরোপীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন ভাবে নিজেদের জাতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। কিন্তু করদরাজ্যগুলি ইংরাজ সাহায্য ব্যতিরেক রাজকার্য্য পরিচালনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। নিম্নে আমরা লোক সংখ্যার বিবৃতি দিতেছি—

ভারতীয় করদরাজ্য	বর্গমাইল	লোকসংখ্যা
গোয়ালিয়ার	২৫,১০৭	৩০,৯৩,০৮২
ত্রিবাঙ্কুর	৭,১২৯	৩৪,২৮,৯৭৫
বরদা	৮,১৮২	২০,৩২,৭৯৮
মহীশূর	২৯,৪৫৯	৫৮,০৬,১৯৩
হায়দ্রাবাদ	৮২,৬৯৮	১,৩৩,৭৪,৬৭৬
ইংরাজ উপনিবেশ		
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	৪০,০০০	২,৪০,০০০
নিউজিল্যাণ্ড	১০৫,০০০	১০,০০,০০০

নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	৩,১০,০০০	১৬,৫০,০০০
ভিক্টোরিয়া	৮৮,০০০	১৩২,০৩,০০০
কুইন্সল্যাণ্ড	৬,৭০,৫০০	৬,০৬,০০০
ইউরোপীয় ক্ষুদ্ররাজ্য		
বেলজিয়াম	১১,৩৭৩	৭৫,৭১,৩৮৭
ডেনমার্ক	১৫,৫৮২	২৭,৭৫,০৭৬
হল্যাণ্ড	১২,৫৮২	৬২,১২,৭০১
সুইজারল্যাণ্ড	১৫,৯৭৬	৩৮,৩১,২২০
মন্টিনেগ্রো	৫,৬০৩	৫,১৬,০০০
সারবিয়া	১৮,৬৫০	২৯,১১,০০১

জাতীয় শক্তির কারণ কি ?

কলিকাতায় শিশুমৃত্যুর হার কি ভীষণ তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে দেখা যাইতেছে ১৯২০ সালের তুলনায় ২১ ও ২২ সালে উহা অনেকটা কমিয়াছে।

বৎসর	মোট শিশুমৃত্যুর সংখ্যা	হাজার করা মৃত্যুর হার
১৯১৮	৫৩৯৬	২৮০
১৯১৯	৫৯২৮	৩৫৭
১৯২০	৫৯৩৫	৩৮৬
১৯২১	৫৭২১	৩৩০
১৯২২	৪৯৮০	২৮৭

কিন্তু ইহাও একটুও আশাপ্রদ নহে।

অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ এই সত্যের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এইরূপ করিয়াছেন। যাহা কর্ত্তা (Subject) তাহা কখনও একই কালে কর্ম্ম (Object) ও কর্ত্তা (Subject) উভয়ই হইতে পারে না। অতএব আত্মদর্শন সম্ভব নয়—“Introspection is impossible—Comte.

*　　*　　*　　*

পারমার্থিক সত্য (Numena—The-Thing-in-Itself—The Being) ব্যবহারিক সত্তার যখন অতীত, তখন সে তত্ত্ব কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে। বোধ-বুদ্ধির (Understanding) মধ্য দিয়া তাহাকে জানিতে হইলেই তাহাকে বিকৃত করিতে হইবে। "The true thing-in-Itself, the being, as distinguished from the phenomenon, is not the object such as we are compelled to concieve it but the object out of all relation to our faculties and as such it is manifestily unknown and unknowable"—Kant

*　　*　　*

হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়-বাদও (Agnosticism) উপযুক্ত মতের পোষক।

গান*

শিবে যাঁহার পরম পিরীতি—
　　　　মহাপুরুষ চরিত যাঁর।
তাঁহার শুভ জনম-দিবসে
　　　　কর আনন্দ ভকত তাঁর॥
পুরুষোত্তম আদরের ধন,
সরল হৃদয় প্রিয় দরশন,
জগতজীবে সম সদা ভাবে
　　　　ক্ষরিছে করুণা অমৃত ধার॥
　　　　চির রক্ষক শরণাগতরে
　　　　দুঃখীর দুঃখে হৃদয় বিদরে
ভোলার মতন ভাবে থাকে ভুলে
　　　　প্রিয়তমে করি সারাৎসার।
　　　　আমাদের তরে হে করুণানিধি
　　　　আমাদের কাছে রহ নিরবধি
ভকতি পুষ্প লহ পদতলে
　　　　কর অধিকারী তব কৃপার॥

স্বামী অসিতানন্দ

* শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ২রা জানুয়ারী বেলুড়ে গীত।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়

শঙ্করাচার্য্য—শ্রীরাখালদাস কাব্যানন্দ প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা। এতদিনে বাঙ্গলার জনসাধারণের এক মহা অভাব পূর্ণ হইল। আচার্য্য শঙ্কর বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মের এক প্রকার প্রতিষ্ঠাতা বলিলেই চলে অথচ বঙ্গবাসী তাঁহার সম্বন্ধে অতি অল্প বিষয়ই জ্ঞাত আছেন। তাঁহার প্রস্থান-ত্রয়ের ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই ভারতের এবং ভারতেতর সকল প্রদেশেই নানা দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্রের "শঙ্করাচার্য্য" নাটক হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট কিন্তু তাহাকে জীবনী আখ্যা দেওয়া যায় না কারণ তাহাতে ঐতিহাসিক ক্রম-নির্দ্দেশ এবং তৎপ্রচারিত মতের সমালোচনা নাই। পণ্ডিত প্রবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের "শঙ্কর ও রামানুজ" বিদ্বৎ সমাজের অতি আদরণীয় হইলেও জন সাধারণের নিকট তাহা দুর্ব্বোধ্য; স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী লিখিত "বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে" আচার্য্যের জীবনী ও তত্ত্ব পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে সমালোচিত হইলেও উপর্য্যুক্ত কারণেই জনসাধারণের নিকট তাহা অপরিচিত। কিন্তু এই গ্রন্থ কাব্যানন্দ মহাশয় সহজ সরল ভাষায় লিখিয়া জনসাধরণের প্রীতিভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। আর আচার্য্যের জীবনী সম্বন্ধে সকল গ্রন্থের যাহা মূল ভিত্তি এ গ্রন্থেরও সেই "শঙ্কর বিজয়ম্"ই মুখ্য ভিত্তি।

অধ্যাত্ম গীতাবলী—শ্রীরামপ্রসন্ন মোহান্ত কর্ত্তৃক রচিত, মূল্য চারি আনা, আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সংবাদ ও মন্তব্য

১। বিগত রবিবার ৩০শে ডিসেম্বর বেলুড় ও উদ্বোধন মঠে এবং জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড়ে প্রায় তিন সহস্র ভক্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হন, তাহার মধ্যে আড়াই শত স্ত্রী-ভক্ত ছিলেন এবং উদ্বোধনে প্রায় আট শত ভদ্র

মহিলার সমাবেশ হয় ও তাঁহারা প্রসাদ প্রাপ্ত হন। দ্বিপ্রহরে চণ্ডীর গান এবং রাত্রে গ্রেষ্ট্রাটের কালীকীর্ত্তন গীত হয়। উহা শ্রোতৃবর্গের নিকট অতি উপাদেয় হইয়াছিল। জয়রামবাটীতেও প্রায় ৩০০ শতের অধিক ভক্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

২। ১৪ই মাঘ, ইংরাজী ২রা জানুয়ারী, মুখ্য চান্দ্র পৌষ, গৌণ মাঘ, কৃষ্ণা সপ্তমী, সোমবার পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজি মহারাজের দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথি পূজা ও উৎসব বেলুড়মঠে সম্পাদিত হইবে। দরিদ্রনারায়ণের সেবা ইহার প্রধান অঙ্গ। ভক্তগণের উপস্থিতি ও সাহায্য বাঞ্ছনীয়।

৩। আগামী ২৪শে মাঘ, ইংরাজী ৭ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বিতীয়া শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজের তিথিপূজা ও উৎসব বেলুড় মঠে সম্পাদিত হইবে।

৪। কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯২২ সালের কার্য্য বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমিতির উদ্দেশ্য ও বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালী সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

(ক) বেদান্তের সার্ব্বভৌম তত্ত্বসকল পাঠ ও উপলব্ধি করিয়া লোক-গুরু স্বামী বিবেকানন্দ ও তদীয় আচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষার আদর্শে জীবন গঠনের চেষ্টা করা।

(খ) সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ঐরূপ জীবনাদর্শের ভাব ও শিক্ষা প্রচার করা।

(গ) মানবকে নারায়ণ বিগ্রহ-জ্ঞানে সেবা ও তাহার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করা।

(ঘ) প্রতিমাসে অন্যূন দুইটী সাধারণ ধর্ম্ম-বক্তৃতার আয়োজন, সদস্যগণের সাপ্তাহিক ধর্ম্মালোচনা ও কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে মাসিক ধর্ম্ম-সভার আয়োজন।

(ঙ) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক বা পুস্তিকার প্রকাশ ও প্রচার।

(চ) ধ্যান ধারণা ও পূজা-অর্চ্চনাদির জন্য ঠাকুর-ঘরের ব্যবস্থা, নানা সদ্‌গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া একটী পুস্তকাগার পরিচালন, অভাবগ্রস্ত

ছাত্রদিগকে অর্থ ও পুস্তক সাহায্য দানের ব্যবস্থা, প্রতিবৎসর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজায় উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থা, সাধ্যমত সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ এবং অন্যান্য সেবা-ব্রতের অনুষ্ঠান সমূহে অর্থ সাহায্য ও এই উদ্দেশ্যসকল কার্য্য পরিণত করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন।

৫। ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণমিশনের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে ১৯২০ সালে৯,০১৯, ১৯২১ সালে ৮৩৭৭ এবং ১৯২২ সালে ৮৫১০ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এই কার্য্যে জন সাধারণের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

৬। স্বামী বিবেকানন্দের মূল ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থাবলী হইতে মূল্যবান অংশ সংগ্রহ বিষয়ে প্রতিযোগিতা। ইংরাজী ও বাংলা পৃথক পৃথক হইবে। ইংরাজী প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র ইংরাজী গ্রন্থাবলী ও যিনি বাংলায় প্রথম হইবেন তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা জীবনী পুরস্কার দেওয়া হইবে। সংগ্রহের মৌলিকত্ব, বিশেষত্ব ও সংখ্যা সামঞ্জস্যের উপরও লক্ষ্য রাখা দরকার! প্রত্যেক অংশটী ৩০টী শব্দের বেশী না হয়। যাঁহারা যোগদানে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁহাদের সংগৃহীত অংশগুলি ৩০শে জানুয়ারী, ১৯২৪এর ভিতর পাঠাইতে হইবে। উদ্ধৃতাংশ গুলির পুস্তক নাম, পরিচ্ছেদ ও পৃষ্ঠাংশের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক প্রার্থীকে চারি আনা দিয়া প্রতিযোগিতা ভুক্ত হইতে হইবে।

শ্রীপরেশনাথ সেন,
৭৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত্ম্য

চিন্তিতে চিন্তিতং সর্ব্বং পূজিতে পূজিতং জগৎ।
রামকৃষ্ণে ভগবতি তদেব ব্রহ্মসাধনং ॥
প্রসন্না দেবতাঃ সর্ব্বাঃ ঋষয়ঃ পিতরস্তথা
রামকৃষ্ণ মনুস্মৃত্য ধ্যায়ন্তি প্রজপন্তি বা ॥
ধ্যানং স্তোত্র জপং বাপি যদা যো যৎ করোতীহ
নাম মন্ত্র মনুস্মৃত্য তদেব সফলং ভবেৎ ॥
দেবেদ্বিজে গুরৌ মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজ্জে তথা
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥
অচিন্ত্যতত্ত্বং তব দেব গুহ্যং জানন্তি সত্যং নহি কেঽপিন্যূনং
যথা যথা যেষু তনোসি শক্তিং তথা তথা তে স্বরূপংবিদন্তি ॥

—স্বামী মধুসূদনানন্দ।

অঞ্জলি *

যজ্ঞপ্রবর্ত্তক দেবতা।

১। হে যজ্ঞ প্রবর্ত্তক! তোমারই নামে চতুর্দিকে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। চতুর্দিকে তোমার নামের মঙ্গল-গান শতবিধ তানে সুগীত হইতেছে। তোমার মহৎ যশ লক্ষ লক্ষ নর-নারীর কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে।

২। আমরা না বলিলেও তুমি আমাদের অভাবসকল জানিতেছ এবং যথাযোগ্য উপায়ে তাহা পূর্ণ করিতেছ। আমাদের অভাবসকল বিদূরিত হওয়ায়, আহার পাইলে সুবৃহৎ পক্ষী সকল যেমন আনন্দে উল্লসিত হইয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ঘুরিতে ফিরিতে ভালবাসে, আমরাও সেইরূপ আনন্দমনে ছুটিয়া বেড়াইতেছি।

৩। তোমার মহিমা, তোমার পরাক্রম কে ইয়ত্তা করিবে? তোমার অনুচরগণ দিকে দিকে লোকসকলের মঙ্গলসাধনে নিরত রহিয়াছে। আমাদিগকেও তোমার অনুচর করিয়া লও এবং তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত কর।

৪। তুমি আমাদের গৃহ-দেবতারূপে আমাদের গৃহে অধিষ্ঠিত হও এবং আমাদের নানাবিধ যজ্ঞ ও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সহায় হও।

৫। তুমি আমাদের রিপুগণকে পরাহত করিয়া দাও। আমাদের ন্যায় আমাদের প্রত্যেকের পরিবার, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ যেন শতবিধ শত্রুগণের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া তোমার নামে অহর্নিশি জয়-ধ্বনি করিবার অধিকার ও অবসর লাভ করে। আমাদের পুত্রপৌত্রাদিকে, আমাদের কন্যাদিগকে, আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞানে বর্দ্ধিত কর।

---

* বৈদিক স্তোত্রাবলম্বনে লিখিত। উঃ সঃ।

৬। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের সখা ও সুহৃৎ। আমরা তোমাকে ছাড়িয়া অপর কাহার নিকট সহায়তা ভিক্ষা করিব? তুমিই আমাদের একমাত্র ধনদাতা, বীর্য্যদাতা। তুমিই আমাদের পরম ধন, তুমিই বীর্য্যবানদিগের বীর্য্য। তুমিই তেজস্বীদিগের তেজ এবং জ্যোতির জ্যোতিঃ পরম-জ্যোতিঃ। তুমি আমাদিগকে আবহমানকাল লালন-পালন করিয়াছ, আজ আর মধ্যপথে পরিত্যাগ করিও না।

৭। তোমার অন্নসত্র সর্ব্বত্র উন্মুক্ত আছে। তবে আমরাই কেন এখানে দরিদ্র ভিখারীর বেশে বসিয়া আছি? আমাদের দুঃখ-কষ্ট দারিদ্র্য অপমান দূর করিয়া দাও। আনন্দঘন তোমার রাজ্যে বাস করিতেছি—আমাদিগকে তুমি নিরানন্দের গভীর কূপ হইতে উঠাইয়া তোমার আনন্দ-সাগরে অবগাহন করাও। তোমারই আনন্দ চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিবার শক্তি-সামর্থ্য প্রদান কর।

৮। তুমি যখন রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও, তখন পাপী অসাধু যাহারা, তাহারা ভয়চকিত হৃদয়ে কোথায় যে লুকাইয়া পড়িবে তাহা স্থির করিতে পারে না। তোমার ভক্ত যাহারা, তাহারা তোমার রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশের মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিয়া নির্ভয় হয় এবং তোমার জয়গান করিতে থাকে।

৯। হে শ্রোত্রের শ্রোত্র তুমি! তুমি আমার মঙ্গলস্তোত্র সকল নিয়তই শ্রবণ করিতেছ। আমরা তোমাকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তকালও শান্তিতে থাকিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই। আমরাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি—আমরাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

১০। তুমি আমাদের চিরন্তন বন্ধু। তুমি আমাদের দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পূর্ব্বতন আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনদিগের নিকট শুনিয়া আসিয়াছি যে, তুমি আমাদের মঙ্গলসাধনে নিত্যকাল নিরত আছ; তুমি আবহমানকাল অসহায় আমাদের সর্ব্বপ্রধান সহায়। তোমার নিকটে আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি। আমাদিগকে বিপদজাল ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তুমি তাহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত কর।

১১। হে জীবনদাতা! সেই একদিন তুমি আমাদিগকে জীবনদান করিয়া সংসারে নামাইয়া আনিয়াছিলে। কর্ম্মক্ষেত্রে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া আঘাতে আমরা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছি। তোমার অমৃতরসে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত কর। আমাদিগকে শতবর্ষ আয়ুপ্রদান কর। আমাদিগকে নীরোগ ও ক্ষতমুক্ত কর।

১২। তোমাকে আমরা নমস্কার করিতেছি। আমাদের সঙ্গে দেব-মনুষ্যের লক্ষকোটী কণ্ঠ তোমার নামে নিনাদিত হইয়া উঠুক। মহা আনন্দধ্বনিতে ত্রিলোক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠুক। বিশ্বজগত হইতে দুঃখকষ্ট আধিব্যাধি সমস্ত বিদূরিত হউক। গাভীসকল দুগ্ধবতী হউক। মনুষ্য দীর্ঘায়ুলাভ করুক। তোমার প্রতি আমাদের প্রীতি সফলকাম হউক।

—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে

জন্ম—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী; পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি; মকর সংক্রান্তি দিবসে সূর্য্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্ব্বে ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দ ভূমিষ্ঠ হন।

অবস্থিতি—৩৯ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন।

মহাসমাধি—১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার রাত্রি ৯-১০ মিনিটের সময় মহা-সমাধি যোগে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে এই পবিত্র আশ্রমে আপনাদের সহিত সম্মিলত হইয়া আমার কেবলই মনে পড়িতেছে, তাঁর জীবনের সেই একটী দিনের ঘটনা যেদিন তাঁহাকে মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী নিখিল ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন। সে দিন যে জ্যোতিঃ-

চ্ছটা বিবেকানন্দের অন্তরে আপন সত্ত্বা বিস্তীর্ণ করিতেছিল তাহা যথাকালে শুধু আমাদের দেশে কেন, দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িল এবং সেই নব জাগরণের স্মৃতি আজও আমাদের চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। বিবেকানন্দের জীবনে এ যে কত বড় শুভদিন তাহা আমরা পরে বলিব; আরও আমাদের মনে রাখিতে হইবে, দক্ষিণদেশবাসীদিগের পক্ষে তাঁহাকে প্রচারে পাঠান একটা সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে। আপনারা সকলে অবগত আছেন কিম্বা জানেন না, যে দাক্ষিণাত্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রত্যেক মন্দিরে একই প্রকারের দুইটী করিয়া বিগ্রহ রাখা হয়। একটী মূর্ত্তি মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান থাকেন, অপরটীকে উৎসব সমাগত হইলে নগরময় প্রদক্ষিণ করান হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য, যাহাতে লোকেরা মন্দিরের দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিত্য নব নব ভাবে বিশ্বপাতার বন্দনা করিতে প্রয়াসী হন। আমার মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের চিদাকাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সত্য সত্যই ঠাকুর ছিলেন। তিনি শান্ত সমাহিত অবস্থায় দিন কাটাইলেন। দেশমাতার কোল হইতে এক পাও নড়িলেন না। তাই তাঁর প্রকাশের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি জগৎগুরু বিবেকানন্দের দেশপর্য্যটনের প্রয়োজন হইল। মান্দ্রাজ-প্রদেশের লোকেরা যাহা নিজ সংস্কারবশতঃ সহজেই বুঝিয়াছিলেন তাহা আমারা বিবেকানন্দের স্বদেশবাসিগণ তাঁর সম্বন্ধে অনেক বিলম্বে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। ঘরের ছেলে বিবেকানন্দ যে জগৎগুরু হইবেন তাহা আমরা সেকালে বুঝি নাই; ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের স্থান যে কোথায় তাহা আমরা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। কারণ আমরা দেশবিদেশের শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিয়াছি যে, যুগধর্ম্মের ক্রমান্বয়ে বিকাশ প্রকৃতির পরিহাস নহে। খৃষ্ট যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনেক পরে St. Paul দেশে দেশে ঘোষণা করিয়াছিলেন। হজরৎ মহম্মদ যে নূতন ধর্ম্ম বিস্তার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর সে ধর্ম্ম তাঁর পৌত্রদ্বয়ের রক্ত-ধারায় রঞ্জিত হইয়া সমগ্র এসিয়ায় ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল। বুদ্ধের বাণী তিন শত বৎসর পরে রাজা অশোককে মর্ম্মপীড়া না দিলে আজ অর্দ্ধ জগৎ তাঁর চরণে ভক্তি প্রণত হইয়াথাকিত কি না সন্দেহ। আমাদের বিশ্বাস সেইরূপ স্বামী বিবেকানন্দ মানবদেহ ধারণ না করিলে রামকৃষ্ণের যথার্থ পরিচয় আমাদের কাছে অতীতের গৌরব-স্তম্ভের মত অতীতেই লুপ্ত হইয়া যাইত—আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে তার কোনই সার্থকতা থাকিত না।

এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, স্বামিজীর স্মৃতি যথার্থভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে প্রথমে পরমহংসদেবকে অন্তরে অধিষ্ঠিত করিতে হইবে, পরে দেখিতে হইবে, কি ভাবে স্বামিজী তাঁহাকে আদর্শ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে আমরা বুঝিতে পারিব স্বামিজীর জীবন কিরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিল। অল্পের মধ্যে আমরা এই তিনটী বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই।

কোন সামান্য ব্যক্তিরও পরিচয় দিতে গেলে যেমন তার বংশের কথা, তার পিতা-মাতার বিষয় না বলিলে চলে না, সেইরূপ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবন-কথা স্মরণ করিতে গেলে তাঁর পিতা-মাতা, গুরু ও পরম দেবতা রামকৃষ্ণের জীবন ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা গভীর ভাবে আসিয়া পড়ে। যদি এ বিষয়টীকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়া ফেলি, ভরসা করি আপনারা আমার প্রতি বিমুখ হইবেন না। কারণ আমার অন্ততঃ বিশ্বাস রামকৃষ্ণ সহজ মানুষ ছিলেন না। সহজ ভাব তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল তাহা জানি। সাধারণের মধ্যে নিজেকে গণ্য করিতে তাঁর আনন্দ প্রকাশের কথাও আমরা অবগত আছি। অথচ তিনি যে সামান্য মানুষ ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। কারণ তিনি ভারতবর্ষের মনের মানুষ ছিলেন। যখন লোভ, হিংসা, উচ্চশিক্ষার অভিমান ও জাতীয়-ধর্ম্মের অবমাননা সমস্ত দেশময় ছাইয়া গিয়াছিল, তখন এই শান্ত-শিষ্ট ব্রাহ্মণ-তনয় নিষ্ঠার সহিত সকল ধর্ম্মের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে সাধন করিতেছিলেন। যখন সাধনা পূর্ণ হইল তিনি প্রচারে

বাহির হইলেন না। অলৌকিক ব্যবহার দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন না। সমাজ গঠনে সচেষ্ট হইলেন না। বরং বৃক্ষ যেমন নীরবে ছায়া দান করে, নদী যেমন বিনা আড়ম্বরে পানীয় দিয়া যায়, এবং মাতা যে ভাবে সন্তানের জীবনে স্নেহধারা ছড়াইয়া দিয়াও অতৃপ্ত থাকিয়া যান, পরমহংস রামকৃষ্ণ সেইরূপেই বাঙ্গলার ছায়ায় ঢাকা পল্লীপ্রান্তে ত্রিতাপ-দগ্ধ মানবের জন্য তৃষ্ণার জল ও জীবন-বৃক্ষের ফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া অপেক্ষায় দিন কাটাইলেন। যাঁহারা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করিলেন তাঁদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পরমহংসদেব তাঁর জীবন-লীলা সম্ভোগ করিয়া গেলেন। কিন্তু এরূপ আপনভোলা ত্যাগী পুরুষটীকে দেশবাসীর পক্ষে মনে রাখা বড় সহজ কথা নয়। তারপর এ সেই দেশ, যেখানে যুগে যুগে মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইতেছেন। সেই জন্য ভারতবর্ষের মনের মানুষ যাঁরা তাঁহাদিগকে গণ্ডীর মধ্যে না ফেলিয়া কিরূপে সজীব ভাবে নিত্য কাছে কাছে রাখিতে পারি তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। ইতিহাসের স্মরণ চিহ্নের মধ্যে তাঁদের তুলিয়া রাখিবার কথা বলিতেছি না। সে দিক্‌টা ত ভারতবর্ষের শ্মশানভূমি বলিলেই চলে। যেখানে ভূত পিশাচের নৃত্য অহরহঃ চলিতেছে সেখানে আমাদের মনের মনুষদের স্থান নাই বা হইল? যেখানে মুক্তি ভিখারী আর্য্য-সন্তানগণ ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে বলিতেছেন "ধন্য হোল মানব জনম ধন্য হোল প্রাণ" সেই-খানকার যাত্রী আমরা—ভারতবর্ষের মহাপুরুষদিগকে কি বুকে বাঁধিয়া গলার হার করিয়া রাখিতে পারিব না? তখনই ত আমরা সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পারিব। দুর্ব আমাদের আর পীড়া দিবে না। চিত্তের যা কিছু পূর্ণতা সেই গভীরের পথে নিবেদন করিতে পারিব যেখান হইতে সুধার ধারা অনবরত উথলিয়া পড়িতেছ এবং আর্য্য-ঋষিদিগের বাণী শুনা যাইতেছে—"হে বিশ্ববাসীগণ! তোমারা শ্রবণ কর আমরা অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি।"

সেই আনন্দের উৎসের কাছে দাঁড়াইয়া রামকৃষ্ণের জীবন-প্রদীপ আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার অব্যবহিত পরেই স্বামী বিবেকানন্দ

সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করিলেন, তাঁর গুরুদেবের তর্পণ করিবার জন্য। সে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিখিল ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে সমস্ত জগৎকে সাক্ষ্য করিয়া যথাকালে অর্পিত হইল। যাঁরা রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম-জীবনের উদ্দীপনা এতদিন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাঁহারা শিষ্যের বাগ্মিতা ও ভাবের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। যাঁরা রামকৃষ্ণের নিকট কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগের মর্ম্ম বুঝিয়াও বুঝেন নাই তাঁরা বিবেকানন্দের মধ্যে এ সমস্ত উপদেশের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিতে পাইলেন। যাঁরা রামকৃষ্ণের বাণী "সকল ধর্ম্ম এক, নিজ নিজ ধর্ম্মপালন কর, সকল সত্য অচিরেই বুঝিতে পারিবে" শুনিয়া হিন্দুধর্ম্মকে অন্য সকল ধর্ম্মের মত একটা প্রণালীমাত্র মনে করিয়াছিলেন, তাঁরা বিবেকানন্দের শৌর্য্য ও বীর্য্যে পরিপূর্ণ, জগতের হিতার্থে কথিত, হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখান শুনিয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন। অথচ বিবেকানন্দ দাম্ভিক ছিলেন না ; যদিও হিন্দু-ধর্ম্মের অভিমান তাঁর অন্তঃকরণকে দাবাগ্নির মত প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি বিদেশীয় শিষ্যদিগকে প্রাণের প্রাণরূপে স্নেহ করিতেন কিন্তু কোনরূপ বিজাতীয়তার প্রশ্রয় দিতেন না। রামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম বিবেকানন্দের জাতীয়তার প্রস্রবণকে পরিবেষ্টিত করিয়া গুরু ও শিষ্যকে ব্যক্তিগত ভেদাভেদের মধ্যে অভেদ করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বিবেকানন্দ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পাশ্চাত্য দেশ-ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে উপনীত হইলে তাঁর জীবন অন্যদিকে নিয়োজিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্মের কথা, আদর্শের কথা দেশবিদেশে প্রচার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থা তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিল। এই সঙ্গে বাঙ্গলার আর দুইজন কর্ম্মী পুরুষকেও আমাদের মনে পড়িতেছে—আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও সন্ন্যাসী উপাধ্যায়। কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; তাঁর বিশ্বাস ছিল আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নতি লাভ করিলে দেশের সুদিন আবার ফিরিয়া আসিবে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া দেশের

কার্য্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যতদিন না আমরা স্বরাজ পাইতেছি ততদিন আমাদের জাতীয় দুরবস্থা কোন মতেই ঘুচিবে না। বিবেকানন্দ বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মন দিতে পারিলেন না। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখিয়া তিনি কাঁদিয়াছিলেন আর বলিয়াছিলেন, "যে ভগবান্ আজ আমাদের একমুষ্টি অন্নের বিধান করিতেছেন না, তাঁর কাছে আমরা মুক্তির ভিখারী কেমন করিয়া হইব ?" কথাটা অবিশ্বাসীর কথা নহে। যে জাতি একমুষ্টি অন্নের জন্য ও যথার্থভাবে ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করে ইহা সেই জাতির পুরুষসিংহের মুখেই শোভা পায়। বিবেকানন্দ জানিতেন, ঈশ্বরের অধিকার যতখানি মানুষের উপর আছে, ঠিক ততখানি দাবী মানুষেরও ঈশ্বরের উপর থাকিবেই। শুধু যদি একবার একপ্রাণে সমগ্র দেশবাসীরা পরস্পরের দুঃখমোচনের চেষ্টা করি ঈশ্বর কখনই আমাদের প্রতি বিমুখ হইবেন না। সেইজন্য জাতীয় উন্নতিকল্পে বিবেকানন্দের শেষ কথা—Social Service—অর্থাৎ দেশবাসীর সেবাই একমাত্র ব্রত—যাহা দেশকে পুনর্জীবিত করিতে পারিবে। বর্ত্তমান ভারতে বিবেকানন্দের পূর্ব্বে একথা আর কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি দুঃস্থের সেবার জন্য যে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন ও স্বেচ্ছাসেবকদল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নবভারতের এই অভিনব সঙ্কল্প। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও আমরা তাঁর কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতে পারিব না। শুধু তাঁর মন্ত্রের নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। এ প্রসঙ্গে কেবল একটী কথা আরও বলিবার আছে। বিবেকানন্দকে যদি আমরা সাথের সঙ্গী করিতে চাই যেন ক্ষুধিতের জন্য অন্নবিতরণ ও ব্যথিতের জন্য সান্ত্বনা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত না হই।

বাঙ্গলার নিমাই বলিয়া গিয়াছেন—"আমাকে বিশেষ করিয়া ডাকিবার প্রয়োজন নাই, যেখানে কৃষ্ণনাম হইবে সেখানেই আমি চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়িয়াছি।" আমার আজ মনে হইতেছে, সেই নিমাই আবার আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া গঙ্গার তীরে সন্ন্যাস

লইবার জন্য নরেন্দ্র হইয়া আমাদেরই কাছে আসিয়াছেন। তাঁর বলিবার কথা "ভাই, দেশের দুঃখী ও বিপন্ন ভাই-বোনদের কথা ভুলিও না, যেখানে তাদের কাজে তোমরা আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে সেইখানে তোমরা আমার প্রেমালিঙ্গন পাইবে।" এইরূপে নরেন্দ্র ও নিমাই আমাদের একযোগে নর ও নারায়ণের সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন।

কিন্তু বিবেকানন্দের বাণী আজও আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। এখনও দুঃখ কষ্টের এদেশে অবধি নাই। বরং বাড়িয়াই যাইতেছে। তাই ভারতবর্ষের যিনি বর্ত্তমান যুগের মনের মানুষ তিনি অলক্ষ্যে আমাদের মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন, যেন আমরা ভারতবর্ষের নিপীড়িত জাতিদিগকে সেবার দ্বারা সহানুভূতির দ্বারা, উন্নতি বিধান করিতে বিলম্ব না করি। তিনি বারবার বলিয়াছেন:—"ভারতের মুক্তি যদি চাও, তাহা হইলে দেশবাসীর দুঃখে দুঃখী হও, পরিশেষে দেখিবে তাহাদের উন্নতিতে তোমাদেরও কল্যাণ হইবে।"

বিবেকানন্দের বাণী অমর হউক্। ভারতবর্ষের এ যুগের যিনি চালক, যাঁকে আমরা কাছে পেয়েও কাছে পেলাম না, তিনি আমাদের দেশমাতার কোল জুড়িয়া দীর্ঘকাল দেশের শুভচিন্তায় নিযুক্ত থাকুন। পরমেশ্বর আমাদিগকে সামর্থ্য দিন—আমরা যে সবাই ভাই-বোন আমরা যে এক মায়ের সন্তান, আমরা যে এক ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি, তাহা জ্ঞানের দিক্ দিয়া হউক্, প্রেমের ভিতর দিয়া হউক্, সেবার সংস্পর্শে হউক্, আমরা সকল ভাই-বোনেরা অন্তরে-বাহিরে উপলব্ধি করিয়া যেন পূর্ণতার পথে অগ্রসর হই।

—অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,

এম্, এ

সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিশোরীমোহন বাবু দুইজনকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, "বাস্তবিকই জীবনে কথা বলার চেয়ে কাজের দাম অনেক বেশী। কাজ ক'রে সেই কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে কথা বলে তার কথা প্রাণের এমন একটী গোপন তন্ত্রীতে আঘাত দেয়, এবং তার ফলে মানুষ এমন একটা অননুভূত অবস্থার আস্বাদ পায় যে, তখন আর সে স্থির থাক্‌তে পারে না। তখন তাঁরই অনুগামী হবার জন্যে হৃদয় মনের সব শক্তিগুলি যেন আবেগ-চঞ্চল হয়ে' নিজেকে উৎসর্গোন্মুখ করে ফেলে। কিন্তু এইখানে আবার মানুষ নিজে কর্ত্তা হতে গিয়েই সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, রসাতলে যায়। মানুষের আত্মশক্তিরও একটী অভিমানের ভাব আছে সেটা অনেক সময় নিজত্বকে বাঁচিয়ে রাখে; কিন্তু একটা মস্ত বড় ভয় যে, শেষে অহঙ্কার এসে সেই ক্ষুদ্র অহমিকাকে ভগবানের শক্তিকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। এখানে একেবারে মৃত্যু ছাড়া আর অন্য গতি নাই। পরমহংসদেব বলতেন, 'গুরু, কর্ত্তা, বাবা এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।' মানুষকে উন্নত হবার জন্যে আত্মশক্তির উপর এবং সেই শক্তির মূলাধার সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উপর অটল বিশ্বাস থাকা চাই। ভগবানকে বাদ দিয়ে সংসারের কোন কাজই 'কাজ' নয়—'অকাজ'। যিনি যে মন্ত্রেই দীক্ষিত হন না কেন, বিশ্বাসের সহিত তার সাধন করলেই ফল পাওয়া যায়। মানুষের একটী চিন্তা বা আন্তরিক কামনা সেই কল্পতরু ভগবানের কাছে বিফলে যায় না। আমরা ভগবদ্বাণীতেই দেখ্‌তে পাই—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥'

"তুমি দুঃখ চাও তাই পাবে, সুখ চাও তাও বিফলে যাবে না। কিন্তু আমরা সুখ আর দুঃখ দুটী জিনিষ বাহিরের চোখ নিয়ে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না। অন্তরের অনুভূতির দরকার। কি সুখানুভূতি নিয়ে যে আদর্শ-মানুষ সমস্ত জাগতিক কষ্ট হাস্‌তে হাস্‌তে বরণ করে' নেন তা তিনিই বুঝেন অন্যের সাধ্য কি? কিন্তু সেই আদর্শ-মানুষের পথই প্রকৃত পথ। ঠাকুর বল্‌তেন, 'যেমন চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে? তাদের মন সর্ব্বদা কাম-কাঞ্চনে আবদ্ধ থাকার দরুণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না।' তবে কি সংসার চাই না, না অর্থ সম্পদ চাই না—দরকার সবই; কিন্তু সামলিয়ে চল্‌তে হবে। যেন ওকেই সর্ব্বসার করে না ফেলি। আচ্ছা, আজ তোমাদের একটা কাজ এসেছে, প্রস্তুত হও দেখি।

"দুকড়ির মার অবস্থা বেশ ভাল বলে বোধ হলো না। এ অবস্থায় তার জন্যে একটু বিশেষ বন্দোবস্তের দরকার। এখন দেখ্‌লাম বসবার নড়বার শক্তি একেবারেই নেই, মানুষ চিন্‌তে পারে না। প্রলাপ বকছে আর Restlessও বড় বেশী হয়েছে। বিনয়! তোমায় গিয়ে সমস্ত রাত্রি দুকড়ির সাহায্য করতে হবে। আর নরেন! তোকে একটু নারায়ণ পুরের ডাক্তার নলিনী বাবুর কাছে একবার যেতে হবে। আমি লোক পাঠিয়ে চিঠি লিখে দিতে পারতাম, কিন্তু একে অন্ধকার রাত্রি—তার উপর বৃষ্টিও হবে বলে বোধ হচ্ছে—একটা আপত্তি দেখিয়ে আসাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। তুই নিজে যদি যাস তবে বোধ হয় সে আপত্তি করতে পারবেন না।" বলিয়া কিশোরীমোহন বাবু সোৎসুক দৃষ্টিতে উভয়ের মুখের দিকে লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া এরূপ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল না। কারণ নরেন ও বিনয় দুইজনেরই মুখ যেন উৎসাহে ভরিয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া উভয়েই প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। কিশোরীমোহন বাবু ভিতরে বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন,—"দাঁড়াও অত ব্যস্ত হ'লে হবে না। সকল কাজেই একটা

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই, কিন্তু না ভেবে কাজ করলে চলবে না। আর নিজের শরীরের দিকেও দেখ্‌তে হবে। তোমরা রাত্রের খাবার যা খেতে হয় খেয়ে নাও; কিন্তু সমস্ত রাত জাগতে হবে, গুরু আহার না করাই ভাল। শান্তি! এদিকে এসোত মা!” বলিয়া ডাকিতেই সে আসিয়া হাজির হইল। কারণ নিকটে দাঁড়াইয়াই সে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে আসিয়া অধোমুখে দাঁড়াইতেই কিশোরীমোহন বাবু বলিলেন, “যাও দাদাদের জন্যে কিছু জলখাবার বন্দোবস্ত করে দাও। নইলে রাত্রে ওদের আর কিছু খাওয়া হবে না।”

শান্তি ব্যাপার যা ঘটিয়াছিল সবই জানিত। কাজেই সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল; এবং মা তখন অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সে নিজেই যতদূর সম্ভব শীঘ্র কয়েকখানা লুচি ভাজিয়া, একটা তরকারী করিয়া একেবারে খাবারের জায়গা ঠিক করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহারা দুই জনেই তখন এরূপ ঔৎসুক্যের উত্তেজনায় দোলায়মান যে, খাবারের অধিকাংশই থালায় পড়িয়া থাকিল। তারপর নরেন একটী ছাতা ও ছড়ি আর গায়ে যে সার্ট ছিল তাই নিয়ে বাহির হইয়া পড়িল। পায়ে জুতা ছিল, কিন্তু বর্ষা বা শরতের প্রারম্ভে গ্রাম্য ধান-ক্ষেতের উপরিস্থিত রাস্তার কথা মনে করিয়া সে খালি পায়েই যাওয়া ঠিক করিল। এদিকে বিনয়ও আবশ্যকীয় কয়েকটী ঔষধ, কিছু পরিষ্কার ন্যাকড়া, জল গরম করিবার জন্য একটী এলুমিনিয়মের পাত্র, থার্ম্মোমিটার, একটুক্‌রা ফ্লানেল, গরম জলের বোতল ইত্যাদি লইয়া দুকড়ির বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রোগিণীর অবস্থা তখন বাস্তবিকই খারাপ। সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে অসংবদ্ধ প্রলাপের সহিত যে যন্ত্রণা-কাতর চীৎকার শুনা যাইতেছে তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সে কথা প্রকাশ করিতে না পারিলেও ভিতরে খুব যন্ত্রণা পাইতেছে।

বিনয় তাড়াতাড়ি মাথায় হাত দিয়া দেখিল, খুব গরম। একটী মলিন ন্যাকড়া দেওয়া হইয়াছে তাহা শুষ্ক প্রায়। জলও বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইল না; তাহা ছাড়া মাথার জলে চুল এবং বালিশও প্রায়

ভিজিয়া গিয়াছে। সে প্রথমে ন্যাকড়া বদলাইয়া একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া মাথায় দিয়া জল পটির ব্যবস্থা করিল। চুলগুলি শুক্‌ন গামছা দিয়া মুছাইয়া, বালিশটা বদলাইয়া দিবার জন্য নূতন বালিশ চাইলে তাহা পাইল না। তখন সে একটু মাত্র চিন্তা করিয়া বাড়ীতে একজন লোককে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, আমার বালিশ এবং একটা পরিষ্কার চাদর পাঠান নিতান্ত দরকার। ইহার পর দরকার হইতে পারে, এই ভাবিয়া গরম জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে চাদর ও বালিশ লইয়া লোক ফিরিয়া আসিল। তখন সে মলিন দুর্গন্ধযুক্ত যে কাঁথাটায় রোগিণী শুইয়াছিল তাহার উপর চাদরটা বিছাইল; এবং বিছানাটাকে যতদূর সম্ভব দরজার কাছে সরাইয়া আনিল। কারণ ঘরে কেবল একটী মাত্র দরজা থাকায় বাতাস পাওয়া বড় কষ্টকর হইতেছিল। তাহার পর নূতন বালিশটীর উপর একটুক্‌রা কলাপাতা বিছাইয়া দিয়া, ওডিকোলন মিশান একটু জল একটা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় করিয়া মাথায় দিতে লাগিল এবং এক হাতে একটা পাখা লইয়া আস্তে আস্তে মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। প্রথমে আসিয়াই একবার জ্বরের উত্তাপ লইয়াছিল এখন আর একবার লইয়া একটা নোটবুকে লিখিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে কিশোরী-মোহন বাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিনয়ের সব বন্দোবস্ত দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়া বলিলেন, "রোগের চিকিৎসার অর্দ্ধাংশ হচ্ছে শুশ্রূষা। এমন বন্দোবস্ত না হলে কি আর চলে!" তারপর যাহাতে যন্ত্রণার একটু লাঘব হয় তার জন্য ঘুমের জন্য একটী ঔষধ সাবধানে মুখে ফেলিয়া দিয়া তিনিও রোগিণীর মাথার দিকে একটী ছোট খাটুলিতে বসিলেন। এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "নলিনী বাবু যদি আসেন তবে বড় ভাল হয়। নরেনকে ত পাঠালাম—কিন্তু কি যে করে আসবে তা কিছু জানিনা।"

বিনয় বলিল, "আমার বিশ্বাস তাঁকে না নিয়ে ও আসবে না। তবে নরেন বাবুর বড়ই কষ্ট হবে। কারণ এ রকম কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস নাই ত! সঙ্গে লোক দুই একজন গিয়েছে ত?" কিশোরীমোহন সঙ্গে সঙ্গে অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "দু একজন! জন পাঁচ সাত ত

গিয়েছেই। নারাণপুরের ওরা ডাকাত না ভেবে বসে!”

তিনি একটু হাসিলেন। তারপর তাঁহার স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, “নরেন যে কষ্ট সহ্য করতে পারে না তা আমি বেশ জানি। আর সেই জন্যেই আজ আমি ওরকম ভাবে ওকে পাঠালাম। নইলে শুধু চিঠি আর লোক পাঠানই যথেষ্ট হোত। আমি তোমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনেছিলাম। তাই কথা আর কাজে যে কতটুকু প্রভেদ, জানাবার জন্যই ওকে আমি পাঠলাম। জীবনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চেয়ে বড় জিনিষ আর কিছুই নেই। তার উপর আমাদের বাঙ্গালীর ছেলে কাজে কর্ম্মেও যে রকম কোমলতা প্রিয় হয়ে পড়েছে, তাতে তাহাদের দ্বারা প্রকৃত কাজ করা বড় কঠিন। নরেনের মধ্যেও সে দোষ যথেষ্ট ঢুকেছে। এখন যদি শোধরাতে না পারে তবে শেষে বোধহয় অনুতাপ পেতে হবে। যাক্ তাঁর ইচ্ছে যা তাই হবে; আমি আর ভেবে কি করব” বলিয়া তিনি একখানা ডাক্তারী বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এক একবার রোগিনীর লক্ষণের সহিত মিলাইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ঘণ্টা দুই তিন কাটিয়া গেল। তখন তিনি দেখিলেন রোগিনীর তন্দ্রার ভাব হইয়াছে; এবং জ্বরও যেন কমিয়া আসিতেছে। তিনি ঘন ঘন উত্তাপ নিতে লাগিলেন। এমন সময় বাহিরে গোলমাল শুনিয়া অনুমান করিলেন যে, ডাক্তার আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখিলেন যে, সত্যই নলিনীবাবু আসিয়াছেন। সঙ্গে একখানি পাল্কী। নরেনকে দেখিলেন, তার সর্ব্বাঙ্গে কাদা আর জল। ছেলের অবস্থা দেখিয়া একটু দুঃখিত হইলেও—সে যে, এই অবস্থা বেশ হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে ইহাতে তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন। এমন কি অত্যধিক উচ্ছ্বাসের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে দুই একটা কথারও গোলমাল হইয়া গেল।

তিনি ডাক্তারকে বসিতে দিয়া অন্তরালে নরেনকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, নলীনবাবু রাত্রিতে আসিতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে খুব বেশী লোক থাকায় এই পাল্কী করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছে। বাড়ী থেকে যদিও পাঁচ সাত

জন লোক গিয়াছিল, কিন্তু রাস্তার দুই পাশে যাহারা খবর পাইল—ঘোষবাবুর ছেলে এই রাত্রে নিজেই দুকড়ির মার জন্য ডাক্তার আনিতে যাইতেছে, তাহারাই এক এক গাছি লাঠি লইয়া তাহার সঙ্গী হইয়া পড়িল ; কেহ কোন বাধা মানিল না। তারপর "আপনার যাবার দরকার—ঘোষবাবুর লেগে আমরা মাথায় করে পাহাড় আন্‌তে পারি—আর এত ক্ষুদ্দুর, একটা ডাক্তারকে আনা !" ইত্যাদি প্রকার গল্প গুজব করিতে করিতে নারাণপুরে পৌঁছিল। নরেনকে তাহারা এক রকম কাঁধে করে' নিয়ে যাবারই জোগাড় করেছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তারপর সেখানে ডাক্তারের আপত্তি শুনিয়া সাগরা আর গদাই বাগদী যখন বলিল, "ছুটুবাবু ! আপনি একটু হুকুম দেন, আমরা ডাক্তারের ঘর শুদ্ধ তুলে নিয়ে যাব। ওঃ ভারিত আমার ডাক্তার—আবার রেতে যাবে না ! আমাদের বাবু চলে আস্‌তে পারলেক্ আর তিনি পারবে না !" ডাক্তার বাবু বেগতিক দেখিয়া পা ব্যথার কথা জানাইলেন। কাজে কাজেই পাল্কীর ব্যবস্থা হইল। কিন্তু পাল্কা কাঁধে করিয়া আনিবার সময় সকলেই খুব উৎসাহের সহিত কাঁধ দিল, কোন আপত্তি নাই। ওর মধ্যে এমন জাতও ছিল যাদের পাল্কী কাঁধে দেওয়া সমাজিক আইনের বাহিরে। কিন্তু তারা এখন সে আইন ভুলিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক ডাক্তার বাবু কিশোরীমোহন বাবু ও বিনয়ের অক্লান্ত পরার্থ-পরতা ও পরিশ্রমের ফলে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহাদের সকল চেষ্টা সফল হইল, প্রাতঃকাল হইতেই রোগিণীর বিকার কাটিয়া গেল ও ভয়ের অবস্থা দূর হইয়া গেল। অতঃপর বেলা প্রায় সাড়ে সাতটার সময় তাঁহারা সকলেই কিশোরীমোহন বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। সকলেরই মুখ উৎসাহে ও আনন্দে ভরা। এ দিকে জলখাবারের আয়োজন হইতে লাগিল ; ততক্ষণ নলিনী বাবু জীবনে আর কতবার এইরূপ সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীর ন্যায় যমের হাত হইতে রোগীকে টানিয়া আনিয়াছেন তাহারই গল্প করিতে লাগিলেন। অথচ এ Caseটায় যে তাঁহার বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল

না সে কথা ভুলিয়াই গেলেন। যাক, তাঁহারা জলখাবার খাইতে বসিলেন এমন সময় বঙ্কু সরকারের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ আসিল—তাঁহার ছেলের অন্ন প্রাশন, সেইখানেই আজ সকলের মধ্যাহ্ন ভোজন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅজিতনাথ সরকার

সাধুর ডাইরি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'এ আবার কি রকম সাধু! মাথায় জটা নেই, গায়ে ভস্ম মাখে না, পায়ে খড়ম নেই, ঔষধ দিতে জানে না, কবচ দিতে জানে না। ঐ যে আত্মারাম স্বামী এয়েছিল। সে ছিল ঠিক সাধু—দেখ অমুকের ছেলের শক্ত ব্যায়রামটা ভাল করে দিয়ে গেল।' ইত্যাদি বলাবলি করতে করতে কেহ চলে গেলেন। কেহ কেহ রুষ্ট হয়ে আমায় বল্‌লেন, 'দেখ, দুটো উচিত কথা বল্‌ছি। সংসার থেকে কি ধর্ম্ম হয় না! বাবা মা, আত্মীয়-স্বজনের মনে কষ্ট দিয়ে এ আবার কি ধর্ম্ম! আমাদের মনে হয়, সংসার ত্যাগ কাপুরুষের কাজ। এই খানে থেকে বীরের মত ধর্ম্ম কর না! বাপ মায়ের চোখের জলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে না!' আমি তাঁদের যথাসাধ্য বুঝাতে চেষ্টা কর্‌লাম, বল্‌লাম, 'কি করি, সংসারে থেকে অনেক চেষ্টা করেও পেরে উঠলাম না বলেইত সন্ন্যাসী হয়েছি। আমায় দুর্ব্বল বলুন, কাপুরুষ বলুন, যা ইচ্ছা হয় বলুন, সংসারে থেকে আমার হয়ে উঠল না। আরও ত সব ভাইরা আছে সংসারে, তারাই ত বাপ মায়ের সেবা কচ্ছে। আমি না হয় একজন চলেই গেছি। তারপর শাস্ত্রের কথা যদি ধরেন, তাহলে মানতেই হবে—সন্ন্যাসও একটা পথ। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, বহু পুণ্যের জোরে লোক সন্ন্যাসী হতে পারে।

এই সন্ন্যাসাশ্রম অতি প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে চলে এসেছে, এ কিছু নূতন নয়। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি লোকোত্তর মহাপুরুষগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত্যাগের আদর্শ জগতে প্রচার করে গেছেন। অবশ্য, আমি নিজে সন্ন্যাসের উঁচু আদর্শ এতটুকুও জীবনে পরিণত করতে পারি নাই, চেষ্টা কচ্ছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন সফলকাম হই।' দুই এক জন কিন্তু আমায় দেখে খুসী হয়ে বল্লেন,—'বেশ করেছ। সংসারে থেকে ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হয় না, সংসারে নানা ঝঞ্ঝটে নানা দুশ্চিন্তা। আমরা জ্বলে-পুড়ে মরছি! এখানে শান্তির আশা দুরাশা ছাড়া কিছুই নয়। সংসার অসার। যে রাস্তা তুমি নিয়েছ, এই হচ্ছে ঠিক শান্তির রাস্তা। বংশে একজন সন্ন্যাসী হলে বংশ উজ্জ্বল হয়, চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। এই পথে এগিয়ে যাও—এই হচ্ছে আমাদের ভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা।' উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গোছের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। এবার তিনি এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজে দিয়ে মেজাজ চড়া করে বল্লেন, 'দেখ, আমরা সেকেলে লোক, বুদ্ধিসুদ্ধি কম। তুমি ত সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করে মস্ত ধার্ম্মিক সেজেছ। একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি, চটো না। তোমার ধর্ম্মমতটা কি!' আমি তাঁকে ঠাণ্ডা করে বল্লুম, 'সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের দেবদেবী, শালগ্রাম, তুলসী, গঙ্গা, তীর্থ এবং তাছাড়া বেদান্তের মায়াবাদ সব আমি মানি। শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত মত, খ্রীষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং তা' ছাড়া জগতে যে যে ধর্ম্ম আছে আমি সবই সম্মান ও আদরের চক্ষে দেখি। আমার মতে সব ধর্ম্মই সত্য।' সেদিন নানা জনে এই রকম নরম-গরম শুনিয়ে আমায় আপ্যায়িত করে চলে গেলেন।

দিন এক রকম কেটে যেতে লাগ্ল। নিজের পাঠ, ধ্যান, জপ ইত্যাদি একটু একটু করতে চেষ্টা করতুম। আগন্তুক লোকদের নিয়ে নানা প্রসঙ্গ হত। বিকাল বেলা ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে ফাঁকা মাঠে বেড়াতে যেতাম। ছেলেরা শুদ্ধ সত্ত্ব, সরল তাই তাদের সঙ্গ বড় ভাল লাগত। তারা কখনও মুক্ত কণ্ঠে, প্রাণ খুলে গাইত,—

'বেলা গেল তোমারি পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার কর গো খেয়ার নেয়ে॥'
ইত্যাদি।

'অথবা কখনও গাইত,—

'বাজে শ্যামের মোহন বেণু।
বেণু রব শুনে জুড়াল তনু॥' ইত্যাদি।

অবাক হয়ে আমি তাদের গান শুনতাম। সময় সময় গান শুনে আমার শুষ্ক প্রাণেও ভগবদ্ভক্তির পুলক অনুভব হত। কখনও নিরাশায় প্রাণ অবসন্ন হয়ে পড়ত, মনে হত সাধু হয়েছি, গেরুয়া, কমণ্ডলু নিয়ে লোকের কাছে সাধু বলে পরিচয় দিচ্ছি, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান অনেক ধর্ম্মের অনেক কথাই বল্‌তে পারি। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত ইত্যাদি অনেক মতবাদও জানি। তর্কযুক্তি সহায়ে পরমত খণ্ডন কর্‌তে শিখেছি, কিন্তু উপলব্ধি হল কোথায়? ভগবানের সাড়া ত পাচ্ছিনে। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। জীবন কি এই ভাবেই যাবে? কখনও আশায়, উৎসাহে প্রাণ ভরে উঠত, মনে হত সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে সৎ পথে পড়ে আছি, একদিন না একদিন সত্যের আলোক পাবই পাব। ভগবান নিশ্চয়ই দেখা দেবেন। আমরা যে তাঁর সন্তান, রাজ রাজেশ্বরের ছেলে আমরা, আমাদের অভাব কিসের, দুঃখ কিসের, ভয় কিসের? পিতার ধনে সন্তানের পূর্ণ অধিকার, সুতরাং শান্তি আনন্দ যে আমাদের নিজস্ব। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হয়ে আস্‌ত। আমিও নানা ভাবের আবর্ত্তে ঘূর-পাক খেতে খেতে বাড়ী ফিরে আস্‌তুম। কোন কোন দিন ছেলেরা পাঁচ ছয় জন মিলে এখানে সেখানে করতাল বাজিয়ে হরির নাম অথবা মায়ের নাম করত। আমি শুনতাম,—বেশ একটা বিমল আনন্দ পেতাম। ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে প্রাণের সাড়া লক্ষ্য করেছি। এদের দেখে সময় সময় আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম, আর মনে মনে বল্‌তুম, ঠাকুর, আমাদের সে সরলতা নাই, তাই বুঝি এবার ছেলেদের মন অধিকার কচ্ছ।

আমরাও যে তোমারই পথ চেয়ে পড়ে আছি। কিন্তু বয়স্ক অনেকেরই দেখ্‌লাম ধর্ম্মের আসল প্রাণ যেখানে সেদিকে নজর নাই, নজর কেবল বাহ্যিক ক্রিয়া-কাণ্ডের দিকে; খোসা নিয়ে মারামারি, বস্তুর দিকে দৃষ্টি নাই। আমি নিরামিষ খাই, কি আমিষ খাই; নিজের হাতে রান্না করে খাই, কি পরের হাতে, কুশ শয্যায় শুই, কি কম্বল শয্যায়, স্নান করি কয়বার, জাত বিচার করি কি না, ইত্যাদি, ইত্যাদি—অনেক প্রশ্ন অনেকে কর্‌তেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা কিম্ভূত কিমাকার ধারণা তাঁদের মজ্জাগত হয়ে গেছে দেখ্‌তাম।

"স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত ২।১ জন নব্যযুবকও মাঝে মাঝে আস্‌তেন এবং নানা প্রসঙ্গ তুল্‌তেন। তাঁদের কেউ কেউ আমায় জিজ্ঞাসা করতেন,—'আপনারা সাধু-সন্ন্যাসী, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কচ্ছেন সত্য, কিন্তু দেশের জন্য কি কচ্ছেন? দেখুন দেখি, দেশের লোকের পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, প্রাণে আশা ও আনন্দ নাই। রোগে, শোকে ও শিক্ষার অভাবে তারা যে পশুতুল্য হতে চলেছে। ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বন্যা প্রভৃতি উৎপাৎ দেশেত প্রায় লেগেই আছে। দেশ বাঁচলে তবে ধর্ম্ম-কর্ম্ম। আর ধর্ম্মের যে গর্ব্ব করেন, ধর্ম্মই বা কোথায়? সর্ব্বত্র দাসসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ও স্বার্থপরতা রাজত্ব কচ্ছে। হত্যা, চরিত্র-হীনতা ও ব্যাভিচার সমাজের বুকের উপর দিয়ে অপ্রতিহত গতিতে চলেছে। নিজের মুক্তির জন্য আপনারা চেষ্টায় আছেন, দেশের প্রতিও আপনাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। এই দেশের জল, বায়ু, অন্ন ও শিক্ষায় আপনারা মানুষ, দেশকে বাদ দিলে, ভুলে গেলে চল্‌বে কেন?' আমি তাঁদের স্বদেশ প্রেমের খুব প্রশংসা করতুম, বলতুম,—'দেশের সেবা আপনারা কচ্ছেন, এ খুব ভাল কথা। আমাদেরও জগতের হিতের দিকে লক্ষ্য রয়েছে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই মন্ত্র সাধু-জীবনের মূলমন্ত্র। সাধুরা নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে পীড়িতের সেবা, নিরন্নকে অন্নদান এবং অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান কর্‌তে চেষ্টা কচ্ছেন। দানের মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে ধর্ম্ম দান, আর ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। ভারতকে তুল্‌তে চান, দেশের মধ্যে আগে ধর্ম্মভাব

জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যেমন যত্নের সহিত হোমাগ্নি রক্ষা করেন তেমনি সন্ন্যাসীরা ধর্ম্ম-প্রাণ ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর আজ যে দেশের সর্ব্বত্র একটা জাগরণ—একটা স্বদেশ প্রেমের ধারা দেখতে পাচ্ছেন, তার প্রেরণা—তার মূল উৎস হচ্ছে—বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসীর মহাপ্রাণে। শুনুন, সন্ন্যাসিপ্রবর স্বদেশ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সকলকে দেশের সেবায় আহ্বান কচ্ছেন, আর বলছেন,—

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই! বল—বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, * * ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী! বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ!' এমন জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস মহাপ্রাণ ত্যাগী মহাপুরুষেতেই সম্ভব। যথার্থ সন্ন্যাসী যে সে নিশ্বাস প্রশ্বাসে নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করে। ত্যাগ ছাড়া কি স্বদেশসেবা হয়?' নব্য যুবারাও আমার কথা মেনে নিতে বাধ্য হলেন আর বল্‌লেন,—'দেখুন, ত্যাগের বড় অভাব দেশে। আমরা সবাই নিজ নিজ স্বার্থ খুঁজ্‌ছি, কেউ দেশের হিতের জন্য এতটুকু ত্যাগ কর্‌তেও প্রস্তুত নই। এই সে দিনের একটা ঘটনা বল্‌ছি—এই গাঁয়ে—আমরা কয়েকজনে মিলে একটা নৈশবিদ্যালয় খুলেছিলাম ; গরীব-দুঃখী যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করে—তাদের শিক্ষার জন্য। বিদ্যালয়টী চল্‌ছিলও বেশ কিছুকাল,

পরে একদিন গাঁয়ের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক রটিয়ে দিলেন গাঁয়ে একটা বাঘ এয়েছে। তার ফলে বিদ্যালয়টী আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।' বোধ হয় সেই ভদ্রলোকটীর চাকরটী সন্ধ্যার পর বিদ্যালয়ে পড়্তে যেত বলে তাঁর কাজের সামান্য ক্ষতি হচ্ছিল। তারপর যিনি নিজকে সমাজের চালক ও রক্ষক বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তিনি হয়ত গরীবের পরিশ্রমের ধন দশের কাজের জন্য আদায় করে নিজের সুখ-সুবিধার জন্য খরচ কচ্ছেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে এই রকম বহুঘটনার কথা শুনেছি। যারা দেশের জন্য জান প্রাণ দিয়ে খাটেন এমন লোক যে একেবারে নেই একথা বলা যায় না; তবে তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তারপর দেখুন, এই পল্লী যে একদিন ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল—এখন পরিত্যক্ত। অনেকেই বিদেশী সভ্যতা ও বিলাসিতার মোহে গ্রাম ছেড়ে সহরে আশ্রয় নিয়েছেন। এই পাড়াগাঁয়েতেই ভারতীয় মনীষীদের বহু গবেষণা ও সাধনার ফলস্বরূপ উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই পাড়াগাঁয়েতেই অধ্যাপকদের টোলে বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ, কাব্য ও ব্যাকরণের বিপুল চর্চ্চা ও আন্দোলন ছিল। বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধির আবাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবির সেই 'ছোট ছোট গ্রামগুলি' আর 'শান্তির নীড়' নাই। পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে পল্লী একদিন যাত্রা, কথকতা ও উৎসবানন্দে মুখরিত ছিল। ছেলেরা তখন নূতন জামা কাপড় পরে সর্ব্বত্র আনন্দের হাট বসাত। আজ তার স্থলে অভাব, রোগ, শোক ও দুশ্চিন্তার ছায়াপাতে পল্লী ভীষণ হইয়া দাঁড়িয়েছে। পল্লীকে তুল্তে হলে, প্রাচীন পল্লীজীবন ফিরিয়ে আন্তে হবে, তবে দেশ উঠ্বে, দেশ জাগ্বে। আপনারা ত্যাগী, আমাদের পথ দেখান, উৎসাহিত করে কাজে লাগিয়ে দিন।' আমি তাদের শুভ কামনায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলুম।

"দেখ্তে দেখ্তে জন্মস্থানে আমার ১৫।১৬ দিন কেটে গেল। বহুদিন এক জায়গায় বিশেষতঃ জন্মস্থানে পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে থাকা সাধুর অকর্ত্তব্য। স্বদেশসেবার ছুঁতো করে আসক্তি যা কালবশে শিথিল হয়ে এসেছে, আস্তে আস্তে আবার তাহাই আমাকে বদ্ধ করতে পারে।

আমার মনে পড়ল বৈরাগ্যশতকের সেই ছত্র যেখানে ভর্ত্তৃহরি বলেছেন,—সর্ব্বংবস্তু ভয়ান্বিতং, ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। মনটা কেমন হয়ে গেল। সুতরাং আর বিলম্ব না করে পরিবারস্থ সকলের অশ্রুজলের এবং দেশের একটা দুঃখ দারিদ্র্যের করুণ ছবি বুঝে নিয়ে আমি একদিন নির্ম্মম ভাবে জন্মস্থান পরিত্যাগ করে চলে এলাম।"

বর্ণ বিভাগ

বেদের সঙ্গে পারসীকদের ধর্ম্মগ্রন্থ আবস্তার যে সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, যে শ্বেতবর্ণ জাতির কিয়দংশ পারস্তানে গিয়া বাস করায় পারসীক নামে অভিহিত হন, সেই জাতি আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া আর্য্য নাম প্রাপ্ত হন। (?)

পারসীকগণ জরথুস্ত্র স্পিতিমের প্রবর্ত্তিত মত গ্রহণ করায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। উভয় জাতির ক্রিয়া-কলাপ যজ্ঞ-সূত্র ধারণ এবং দেবগণের সংজ্ঞা ও স্বরূপের বিষয় এখনও অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালে এই বেদবিদ্ জাতি 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত ছিলেন, তাই আমরা বায়ু পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে দেখিতে পাই, "কৃত যুগে কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন, ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিল।"

নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় হইতে মনে হয় যে রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

পুরাকৃত যুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ।
অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কদাচন॥

* * *

ততস্ত্রেতা যুগং নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্।
ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পূর্ব্বে ন তপসান্বিতাঃ।

রামায়ণ ৭।৭৪।১০-১২

ত্রেতায়াং ক্ষত্রিয়া রাজন্ সর্ব্বে বৈ চক্রবর্ত্তিনঃ ।
জায়ন্তে ক্ষত্রিয়া বীরাস্ত্রেতায়াং বশবর্ত্তিনঃ ॥

মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব ।

ঋক্ সংহিতার অনেক স্থলেই ‘ব্রহ্ম’ বা ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দের প্রয়োগ আছে। সায়ণাচার্য্য ‘ব্রহ্ম’ শব্দের ‘স্তোত্র’ বা ‘মন্ত্র’ অর্থ অনেকস্থানে করিয়াছেন, আবার কোন কোন মন্ত্রে ‘ব্রহ্মে’র অর্থ ‘স্তোতা’ বা ‘ব্রাহ্মণ’ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ১।১৬৪।৪৫ ঋকে “চত্বারিবাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ” এই মন্ত্রে “ব্রাহ্মণ” শব্দের অর্থ সায়ণ “বেদবিদঃ” এবং ১।১০।১ ঋকে “ব্রাহ্মণঃ” শব্দের অর্থ পণ্ডিত রমানাথ ও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা করিয়াছেন “স্তুতিকারগণ” বা “ব্রাহ্মা নামক ঋত্বিক” কিন্তু সায়ণাচার্য্যের “ব্রাহ্মণ” অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে হয়; কারণ শ্বেতবর্ণের লোকদিগকে তখন ব্রাহ্মণ বলিত, যেরূপ আজকাল খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী শ্বেতাঙ্গদের খৃষ্টান বলে, তাই “ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ” বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদসংহিতার পুরুষসূক্ত (১০।৯০।১২) ব্যতীত আর কোথায় জাতি-বাচক ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শব্দ আছে কি? ঋক্‌সংহিতার অনেক মন্ত্রে বিশ বা বৈশ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু উহা জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। কেবল অথর্ব্ববেদে (১৯।৬।৬) পুরুষসূক্তে আছে এবং এক স্থলে ৪।১৭।৯ বৈশ্য শব্দের উল্লেখ আছে।

আসল বেদ তিনটী। কারণ পূর্ব্বে আর্য্যেরা ত্রয়ীবিদ্যা (ঋক্‌সাম-যজুর্ব্বেদা এতাস্ত্রিতয়ম্ ইত্যমরঃ) শিক্ষা করিতেন এখনও লোকে “ত্রয়ীধর্ম্ম” (ত্রিবেদোক্ত ধর্ম্ম) পালন করেন। ইহার জন্য অনেকে মনে করেন যে বিখ্যাত পুরুষসূক্ত হয় পরবর্ত্তী কালে রচিত কিম্বা উহা অন্য কোন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রাচীনেরা যে বলিতেন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্ব্বিধ বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা সত্য। আমার বিশ্বাস শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ ছাড়া পঞ্চম বর্ণ আর নাই। এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের সংমিশ্রণের ফলে বর্ত্তমান ভারতবাসী।

পূর্ব্বে বর্ণ (রং) অনুযায়ী বর্ণবিভাগ হইয়াছিল, কেবল মানবী সৃষ্টিই যে চাতুর্ব্বর্ণময়ী তাহা নহে সুর অসুর নর পক্ষী পশু ক্রম লতা সমস্তই চতুর্ব্বর্ণ। "সর্ব্ব প্রজাচাতুর্ব্বণ্যময়ী।"

"এষাতু মানবী সৃষ্টিঃ সর্ব্বশোহি চতুর্ব্বিধা।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি পৃথক্ পৃথক্॥
সুরাসুর নরাঃ পক্ষীপশুক্রমলতাদয়ঃ।
এবং চতুর্ব্বিধাঃ সর্ব্বা প্রজা বর্ণ চতুষ্টয়ী॥"

হোমার্থ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবার জন্য, পূর্ব্বে ভূমি পরীক্ষা করিবার প্রথা ছিল; কারণ ব্রাহ্মী ভূমি সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদা, ক্ষত্রিয়া রাজ্যপ্রদা, বৈশ্যা ধনধান্য দায়িনী এবং শূদ্রা ভূমি নিন্দিতা। যে ভূমির মৃত্তিকা শুক্লবর্ণা তাহা ব্রাহ্মী, রক্তবর্ণ মৃত্তিকা বিশিষ্ট ভূমিকে ক্ষত্রিয়া, হরিদ্বর্ণ মৃত্তিকাযুক্তভূমিকে বৈশ্যা এবং কৃষ্ণবর্ণ ভূমিকে শূদ্রা বলে।

"শুক্লমৃৎস্না তু যা ভূমির্ব্রাহ্মী সা পরিকীর্ত্তিতা।
ক্ষত্রিয়া রক্তমৃদ্ভূমি হরিদ্বৈশ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
কৃষ্ণা ভূমির্ভবেৎ শূদ্রা চতুর্দ্ধা ভূঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"

গৌতমীয় তন্ত্র।

তন্ত্রে নবগ্রহের ধ্যানে দেখিতে পাই, রবি রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, সোম শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ, মঙ্গল রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, বুধ পীতবর্ণ-বৈশ্য, বৃহস্পতি পীতবর্ণ বৈশ্য, শ্বেতবর্ণ শুক্র ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণবর্ণ শনি শূদ্র, রাহু কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র ও কেতু শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। এস্থলেও রং অনুযায়ী বর্ণবিভাগ।

২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন অশ্বলায়ন গোত্রের এক ব্রাহ্মণ গৌতম বুদ্ধকে বলেন, "হে গৌতম, ব্রাহ্মণেরা বলেন, 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বোচ্চবর্ণ অন্যান্যবর্ণ নিকৃষ্ট; ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, অন্যান্যেরা কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণেরাই পবিত্র, যাহারা ব্রাহ্মণ নহে, তাহারা পবিত্র নহে; ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার প্রকৃত পুত্র, তাঁহার মুখ হইতে জাত, ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ব্রহ্মার দায়দ।' এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" ইহা পালি আস্সলায়ন সুত্তে আছে।

বাঙ্গলার "কালবামুন কটা শূদ্র" প্রবাদেও রংএর ইঙ্গিত দেখিতে

পাই। এইসব কারণে আমার মনে হয়, পূর্ব্বে রং অনুযায়ী বর্ণবিভাগ হয়, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যখন অন্যান্য বর্ণের জাতি ভারতবর্ষে আগমন করে এবং তাহাদের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটে, তখন বর্ণানুযায়ী জাতি বিভাগ করা কঠিন হওয়ায় গুণ কর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রম বিভাগ হয়।

মহাভারত ও পুরাণাদির মতে মনু বর্ণাশ্রম বিভাগের কর্ত্তা। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী চতুর্দ্দশ জন মনু ছিলেন। মনু হইতে ইক্ষ্বাকু বংশ প্রবর্ত্তিত হয়। শেষ মনু মহারাজ বোধ হয় ১০০০।১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়া ছিলেন এবং তাঁহারই কৃত আধুনিক মনুসংহিতা। আমি পুরাণাদি হইতে দেখাইয়াছি যে, পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে ক্ষত্রিয়গণ আগমন করেন ও আর্য্যসমাজভুক্ত হন। সমাজে ইহাদের স্থান ব্রাহ্মণের নিম্নে হয়। কিছুকাল এইরূপে যায়, তাহার পর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সংঘর্ষ হয়, ফলে অনেক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। এই সময় হইতে উভয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটে

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৌরোহিত্য লইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিবাদের কথা আছে। রামায়ণে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের বিবাদের কথা আছে। সামবেদে ও কৌষীকী ব্রাহ্মণে বশিষ্ঠ পুত্র বিনাশের কথা আছে।

ক্ষত্রিয় রাজাদের সুশাসনে দেশে দস্যু-ভীতি দূর হওয়ায় চিত্রকর ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেক বৈশ্যের সমাগম হয়। ইহারাও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও সমাজে ক্ষত্রিয়ের নিম্নে স্থান প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার হইত, তজ্জন্য ইহারা দ্বিজাতি এবং বেদ-বিরোধী যাগ-যজ্ঞ-হন্তারক কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রগণ অনেককাল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম না গ্রহণ করায় একজাতি বলিয়া কথিত হইত।

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর কৃষ্ণবর্ণ জাতির সহিত আর্য্য-সমাজের সংমিশ্রণ ঘটে। কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে যাঁহারা সৎ ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির সহিত মিশিয়া গেলেন * এবং যাহারা অসৎ তাহারা

---

* মহাভারত—বনপর্ব্ব ২১১।১২-১৩
ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (২।৩।১) এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

শূদ্র নামে পরিচিত হইতে লাগিল, "অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎ শূদ্রাঃ" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।২।৩।১)

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যে ভিন্ন বর্ণের পৃথক পৃথক জাতি ছিল তাহাতে কোন সংশয় নাই। প্রত্যেকের উপনয়ন বিবাহ নৈতিক ও মানসিক বিষয় হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা ইংরাজদের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ না করিয়া নিজেদের শাস্ত্র যদি একটু অধ্যয়ন করি, তাহা হইলে পুরাতন ইতিহাসের বিষয় অনেকটা বোধ হয় জানিতে পারি।

—শ্রীরাধারমণ সেন।

বৈদিক অধিকারী রহস্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মানবদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ স ইমমেবা ত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ, ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত"—আদিতে আত্মাই পুরুষরূপে ছিলেন; তিনি আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; উক্ত ভাগদ্বয় পতি ও পত্নীর আকার ধারণ করিল; পরে তদুভয়ের মিলন হইতে মানবদিগের উৎপত্তি হইল।" ইহার ভাষ্যে আচার্য্যেরা বলিয়াছেন—যিনি আদিতে পুরুষরূপে ছিলেন, সেই আত্মাই ভাবময় শরীরী সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা; এবং তিনি আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া যে স্ত্রী ও পুরুষ হইয়াছিলেন, সেই স্ত্রীর নাম শতরূপা এবং পুরুষের নাম মনু—মনু ও শতরূপা ক্ষত্রিয়; আর ঐ মনু ও শতরূপা হইতেই মানবদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। * বাস্তবিক, নিরঞ্জন অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্ম মায়া উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সৃষ্টির ইচ্ছা

---

* "মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ॥"

মনুসংহিতা, ৩।১৯৪

করিলে, তাঁহার সেই ইচ্ছাক্রমে যখন ঘনীভূত হইয়া জড়াকারে অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলজগদাকারে ফুটিয়া উঠে, তখন মনুই স্থূল দেহধারী মানবরূপে সর্ব্ব প্রথমে আবির্ভূত হন; অনন্তর মনু হইতে মানবদিগের উৎপত্তি হয়। মনুর পূর্ব্বে সৃষ্টির অবস্থা তখনও ভাবময়; সুতরাং মনুর পূর্ব্বে আর কেহই স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়েন নাই। অথবা মনুই স্থূল সৃষ্টির প্রথম বিকাশ আর বাস্তবপক্ষে কথাও তাই। কারণ, পরব্রহ্মকে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিবিধ উপাধিতে লক্ষ্য করিয়া ত্রিবিধ নামে অভিহিত করা হয়। কারণোপাধিতে উপহিত পরব্রহ্ম চৈতন্যকে ঈশ্বর বা নারায়ণ বলে; সূক্ষ্ম উপাধিতে উপহিত পরব্রহ্ম চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বলে; এবং স্থূল উপাধিতে উপহিত পরব্রহ্ম চৈতন্যকে বিরাট্ বা স্বায়ম্ভুব মনু বলে। এই বিরাট্ বা স্বায়ম্ভুব মনুই অস্মদাদির ন্যায় স্থূল দেহীদিগের স্রষ্টা এবং বিরাট্ শব্দে অভিহিত হওয়ায় ইনি ক্ষত্রিয়। আর আমাদের যে মানব বলে, তাহারও বিশেষ স্বার্থকতা এই যে, আমরা মনুর সন্তান; অর্থাৎ "মনু" শব্দের উত্তর অপত্যার্থে "ষ্ণ" প্রত্যয় করিয়া মানব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব মানব মাত্রেই ঐ মনু নামক এক পিতারই সন্তান; এবং ক্ষত্রিয় মনু হইতেই ব্রাহ্মণাদি সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। *

(জ্ঞানকাণ্ড)

আমরা কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারীর আলোচনায় দেখিয়াছি যে, তত্ত্বতঃ গুণভেদই অধিকারী ভেদের কারণ; আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে, তবে কেবল ব্যবহারিক ব্যাখ্যানোদ্দেশ্যেই আদিষ্ট হওয়ায় সত্যতঃ কারণ না হইলেও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ ব্যবহারিক ভাবে উপনয়ন ও বর্ণাদিকে কারণ বলিয়াছেন; এবং তাত্ত্বিক কারণ সত্ত্বেও ব্যবহারিক কারণ ব্যতীত অধিকার না দেওয়ায়, ব্যবহারিক কারণই কর্ম্মকাণ্ডীয়

* "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্নব্য ভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপ মত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি।"

বৃহ, ১।৪।১১

বেদে মুখ্য এবং পারমার্থিক কারণ গৌণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেশ্যই গুণ ব্যভিচার না হওয়া। সুতরাং সত্ত্ব, সত্ত্বরজঃ, রজস্তমঃ ও তমোগুণ যুক্ত ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে না রাখিলে, এবং বর্ণভেদ সত্ত্বেও একবর্ণের গুণ অন্য বর্ণে হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা রহিয়াছে দেখিয়া, অর্থাৎ উক্ত বর্ণাদিও তত্ত্বতঃ গুণভেদের কারণ নহে বলিয়া গুণানুসারে বর্ণাধিকার দেওয়া না হইলেও উক্ত ব্যভিচার দোষ নষ্ট হয় না। কাজেই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ উক্ত উভয়কেই কারণ বলিয়াছেন; এবং গুণানুসারে বর্ণাধিকার না দেওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত কর্ম্মাদিতে অধিকার দেওয়া হইলে বর্ণভেদের অভাব হেতু সেই পূর্ব্ব দোষই থাকিয়া যায় দেখিয়া বর্ণভেদকেই মুখ্যকারণ বলিয়াছেন। আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ওরূপ বলিবার শক্তিও আছে। কারণ, গুণলাভ হইলে গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইতে থাকিলেও তদ্দ্বারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; যেহেতু যজ্ঞাদি একমাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন সাপেক্ষ। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে ওরূপ নিষেধ সঙ্গত হয়। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে একমাত্র গুণ ব্যতীত বর্ণ, উপনয়ন, দেবতা ও গোত্রকে অধিকারীভেদের কারণ বলা যায় না; বলিলেও তাহা অসঙ্গত হয়। কারণ, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি, একমাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন সাপেক্ষ; এবং উক্ত বেদাধ্যয়নও উপনয়ন সাপেক্ষ। সুতরাং গুণ সত্ত্বেও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন ব্যতীত, যজ্ঞাদি সম্পাদিত হইতে পারে না। তাই আদৌ উপনয়ন সংস্কার না থাকায়, গুণ সত্ত্বেও স্ত্রী-জাতির কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে অনধিকার প্রযুক্ত যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। কিন্তু জ্ঞান কাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র বৈরাগ্য সাপেক্ষ—বৈরাগ্য ব্যতীত শত অধ্যয়নেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র শ্রবণেও লাভ করা যায় না।"

ছান্দোগ্যোপনিষদের নারদ-সনৎকুমার সংবাদে দেখা যায়, দেবর্ষি নারদ চারিবেদ প্রভৃতি সমুদয় অধ্যায়ন শাস্ত্র পাঠ করিয়াও ব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারিয়া, ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বাস্তবিক, বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের একমাত্র কারণ। তবে বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে শুভ প্রাক্তন বশতঃ যদি কোন সৌভাগ্যবান পুরুষের সংসারের অনিত্যতা অনুভব হইয়া আসে, তদনন্তর শমদমাদির সাধন দ্বারা বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে বলিয়া বেদাধ্যয়নকেও ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের কারণ বলা যায় বটে, কিন্তু যাবৎ না বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাবৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। আবার কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত শমদমাদির সাধন দ্বারাও বৈরাগ্য লাভ করিবার উপায় নাই; কারণ সংসারে জন্ম কর্ম্মক্ষয় জন্য; সে কারণে কর্ম্মক্ষয় না হইলেও বল পূর্ব্বক শমদমাদির সাধন করিতে যাইলে সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয়িত না হওয়ায় বৈরাগ্য লাভ ত দূরের কথা পরন্তু ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদিরূপ কঠোর কার্য্যে মৃত্যু হওয়াই সম্ভব। তাই আচার্য্য শঙ্কর তদীয় বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—

"এতয়োর্ম্মন্দতা যত্র বিরক্তত্ব মুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভাণ মাত্রতা॥"

বিষয়-বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব না থাকিলে, মরু ক্ষেত্রে জলের ন্যায় সেই ব্যক্তিতে শমাদি সম্বন্ধীয় কথা বলা বৃথা কল্পনা মাত্র হইয়া থাকে।" অতএব কর্ম্মক্ষয় হেতু যাঁহার স্বতঃই বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যথার্থ অধিকারী বলিয়া বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের একমাত্র কারণ। বাস্তবিক মনোবৃত্তির পরমোপশান্তির নামই মুক্তি বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য; তাই পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তে র্নিরোধঃ।" সুতরাং বৈরাগ্যোদয়ে স্বতঃই সাধন চতুষ্টয় * আয়ত্তীকৃত হওয়ায় ক্রমে যখন "বশীকার" অবস্থায় চিত্তের সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকে না, তখন

* কোন্ বস্তু নিত্য, কোন্ বস্তু অনিত্য, তাই বিবেচনা করা; ইন্দ্রিয়া-ঐহিক ও পারলৌকিক ফল ভোগে বৈরাগ্য উৎপাদন করা; আত্মাতে শমদমাদি ছয় প্রকার গুণের উদ্রেক করা; এবং মুমুক্ষত্ব। এই চারি প্রকার আত্মব্যাপারের নাম সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপকারী।

স্বতঃসিদ্ধ মনোলয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া একমাত্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ অধিকারী। অতএব, যখন বৈরাগ্যের চরম অবস্থায়, অর্থাৎ "পরবৈরাগ্য" উপস্থিত হইলে স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কার হইয়া থাকে, তখন আর জ্ঞানকাণ্ডীয়ে বেদে উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা ও গোত্রকে অধিকারী ভেদের কারণ বলা যায় না। কারণ, "যেন বিনা যৎ ন ভবতি তৎ তস্য কারণম্।" অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহা আত্মলাভ করেনা, সে তাহার কারণ। সুতরাং বৈরাগ্য জন্মিলেই যখন স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে—কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তখন আর বৈরাগ্য নামক পরম কল্যাণকর গুণ ভিন্ন অন্য কোন কিছুই জ্ঞান কাণ্ডীয়ে বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ভেদের কারণ নহে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম ও উপকোশলের আত্মবিদ্যায় দেখা যায়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারিণী মতি লাভ করিলে সত্যকাম ও উপকোশলের আপনা হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল। আর বাস্তবপক্ষে কথাও

নিত্যানিত্য বিচার।—একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত যাহা কিছু আছে সমুদয়ই অনিত্য এই জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধি করা।

বৈরাগ্য।—বৈরাগ্য সম্বন্ধে পাতঞ্জলের মতটি সমীচীন বোধ হওয়ায় এ স্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল। "দৃষ্ট বিষয় ও শাস্ত্র প্রতিপাদিত বিষয় যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হইতে পারিলে, বশীকার নামক বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়।" ইহা আবার অবস্থাভেদে চারি প্রকার। যথা—প্রথম যতমান, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয় ও চতুর্থ বশীকার। চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান; অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন্ অনুরাগই বা সজীব থাকিল, তাহা পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সজীব অনুরাগগুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টার নাম ব্যতিরেক; ক্রমে যখন চিত্ত আর কোন বিষয়ে অনুরক্ত হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য মাত্র জন্মে, তখন তাহা একেন্দ্রিয়; এবং যখন সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকিবে না, তখন তাহাকে বশীকার কহে। আর যখন বশীকার দৃঢ় হয়, তখন তাহা পরবৈরাগ্য নাম ধারণ করে। সেই পরবৈরাগ্যেই নির্ম্মল

তাই। কারণ, জীবই ব্রহ্ম; কেবল চিত্তমালিন্য হেতু তাহা জানিতে পারা যায় না। সুতরাং পরবৈরাগ্য উদয় হইলে উক্ত মালিন্য একেবারে দূর হওয়ায় তখন স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। এক্ষণে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, বৃহদারণ্যকে উপনিষদ্ যখন ব্রহ্মাকে "ঔপনিষদং পুরুষং" উপনিষদ্বেদ্য পুরুষ" বলিয়াছেন, তখন উপনিষদ্ব্যতিরেকে স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় বলিলে তাহাত উক্ত শ্রুতির বিরোধী হয়। বাস্তবিক উহা কোন শ্রুতিরই বিরোধী নহে। কারণ, উপনিষদ্ শব্দের অর্থ আত্মবাণী। উপ পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর অর্থ অত্যন্ত নিকটস্থ অন্তরাত্মা হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান, যদ্দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হয়। তাই কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন "নয়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন; যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" এই আত্মাকে উপনিষদাদি অধ্যয়ন দ্বারা, সুতীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা এবং বহু শাস্ত্র শ্রবণেও লাভ করা যায় না; কিন্তু এই আত্মা

জ্ঞানের চরম সীমা বা মুক্তি। তাই মহামুনি পতঞ্জলি বৈরাগ্য বলিতে বশীকারকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা "দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।"

শম। অন্তরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করা; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুপযোগী বৃথা বিষয়ে মনের গতিরোধ করা।

দম। চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গণকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয়রাশি হইতে নিবৃত্ত করা।

উপরতি। বিষয়ানুভব হইতে বিরত হওয়া; অথবা বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করা। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ অর্থে—বৈরাগ্যের প্রাবল্যে আপনা হইতে যে কর্ম্মত্যাগ হয়; নচেৎ বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ কখনই বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ নহে।

তিতিক্ষা। শীতোষ্ণ, মানাপমান ও শোক হর্ষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা; অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়া।

সমাধান। ব্রহ্মে চিত্তের একতানতা উৎপাদন।

শ্রদ্ধা। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস।

মুমুক্ষা। মুক্ত হইবার ঐকান্তিক ইচ্ছা। ইহাই সাধন চতুষ্টয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য।

যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করেন, আত্মা তাঁহারই নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। "অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানিবার ঐকান্তিক বাসনা জন্মিলে স্বীয় আত্মা হইতেই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিগূঢ় রহস্য সকল জানিতে পারা যায়; সুতরাং তখন স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মা কর্তৃক বরিত না হওয়ায় উপনিষদ প্রভৃতি বহুবিধ অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়াও নারদের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় নাই; কিন্তু সত্যকাম ও উপকোশল উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও আত্মা কর্তৃক বরিত হওয়ায় স্বয়ংই তত্ত্বদর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত উপনিষদ্বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় দেব-বাণীতে বলিয়াছেন—"নিজের ঘরে গিয়ে বস, আর নিজের অন্তরাত্মার ভিতর থেকে উপনিষদের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনন্ত খনি স্বরূপ, ভূত ভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদিন না সেই ভিতরের অন্তর্য্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব বৃথা।" অতএব, গুণলাভ হইলে যাহা স্বতঃই আসিয়া থাকে, সে বিষয়ে আর উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা ও গোত্রের অপেক্ষা আছে বলা যায় না;—বিশেষতঃ যখন শূদ্র হইয়াও বিদুর ও ধর্ম্ম ব্যাধ, স্ত্রীলোক হইয়াও মৈত্রী ও গার্গী, দেবতা হইয়াও ইন্দ্র ও অগ্নি এবং ঋষি হইয়াও গৌতম ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, আবার কঠোপনিষদে দেখা যায়, যম নচিকেতাকে ব্রাহ্মণ জানিয়াও, যে পর্য্যন্ত না বৈরাগ্যবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপদেশ করেন নাই, সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে একমাত্র গুণই অধিকারী ভেদের কারণ; আদৌ উপনয়নাদি কারণ নহে। তাই ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একোনত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন "সখে উদ্ধব! তুমি এই ব্রহ্মতত্ত্ব দাম্ভিক, নাস্তিক ও শঠকে, কিংবা শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুককে, অভক্তকে এবং দুর্ব্বিনীতকে দান করিও না; পরন্তু শ্রদ্ধালু শূদ্র এবং স্ত্রীলোককেও অর্পণ করিবে।"

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী।

পঞ্চবটী

কে তুমি ? মহান্ বৃক্ষ ! কার স্মৃতি বুকে লয়ে,
দাঁড়াইয়া আছে হেথা কার আশা পথ চেয়ে ?
মৃদু মৃদু সমীরণে কারে সদা ডাকিতেছ,
নিঝুম্ পরাণে ও-গো বল কারে খুঁজিতেছ ?
কাহারে ভুলাতে চাও এত শোভা প্রকাশিয়ে,
কাহারে প্রণতি কর দিবানিশি নত হয়ে ?
কেন গো তোমার তলে, গেলে যাই সব ভুলে
স্বপ্ন মনে হয় গো সংসার ।
কি গুণ জান হে তুমি শুনিয়া জুড়াক প্রাণী
বল বৃক্ষ ! বল একবার ।
কেন গো আসিলে হেথা, দূরে যায় সব ব্যথা
মন কোথা করে পলায়ণ ॥
তব কাছে নাহি কি গো, জরা, মৃত্যু, শোক রোগ
নাহি কি গো বিষাদ রোদন ?
বুঝিবা ধরণী পরে তপিত মানব তরে
আসিয়াছ করিতে সান্ত্বনা ।
যে যায় তোমার দ্বারে আদরে ডাকিয়ে তারে
স্থান দিয়া তব ক্রোড়ে ঘুচাও বেদনা ॥
ধন্য, তরুবর ! হৃদয় তোমার কি দিব তুলনা আমি ক্ষুদ্র নর
যাঁর তলে বসি, কত গত নিশি, করেছেন আসি জগৎ ঈশ্বর ।
তবু তব হৃদে নাহি অহঙ্কার,
জগতে মেলেনা উপমা তোমার,
সাধন শিক্ষা ওহে শিখালে সুন্দর, পরম আদর্শ রাখিলে তুমি ।
মরি, কি সুন্দর দীর্ঘ কলেবর

লুটায়ে পড়েছ ধরণী উপর,
কার প্রেমে যেন হইয়া বিভোর, পদরেণু কার নিতেছ চুমি ॥
কি এক গাম্ভীর্য্য মাখা তব ঠাঁই,
সুখ-শান্তি-পূর্ণ বিরাজে সদাই,
নীরব নিভৃত জন-মনোহরা দেখি নাই কভু এমন স্থান।
(হেথা) বিষয়-বাসনা করে পলায়ন,
হেরিলে তোমার কান্তি বিমোহন ;
শান্তি সিন্ধু যেন উথলিয়া উঠে ডুবে যায় সেথা তাপিত প্রাণ ॥
তব পাশে কিবা শোভে ভাগীরথী,
আহা, কি সুন্দর মৃদু মন্দ গতি ;
চলেছে জননী দিবস যামিনী অনন্ত সঙ্গীত গাহিয়া।
ঢলিয়া পড়েছে ঢেউ গুলি তার (যেন) কাহার সোহাগে গলিয়া ॥
হেথা নাহি হিংসা, দ্বেষ, নাহি কুটিলতা,
নাহি সুখ, দুঃখ, নাহি মলিনতা ;
এক সূত্রে যেন আছে সবে গাঁথা অতুল মাধুর্য্য ছড়ায়ে।
(তব) শাখা পরে পাখী আকুল হইয়া আনিছ কাহারে ডাকিয়ে
তোমারে সৃজন করেছে যে জন,
বল গো সে জন কোথায় থাকে ;
কেমন মূরতী, কোথায় বসতি আসে না কি সে কাতর ডাকে।
কেন নিরুত্তর ওহে তরুবর !
ব্যথিতের প্রতি নিদয় হও ?
ডাকি বার বার পাই না উত্তর মৌন ব্রতধারী বুঝি বা হও ॥
কিংবা ব্রহ্ম-ধ্যানে মগ্ন তব মন,
শুনিতে না পাও আমার বচন ;
অহরহ নিশি ভূমানন্দে ভাসি, দেহ মন প্রাণ ভুলিয়া গেছ,
(তবু) অতীব কঠোর করিছ সাধন,
ঐহিকের সুখ করিয়া বর্জ্জন ;
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব সম জ্ঞানে (তুমি) নীরবে বহন করিছ।

যোগী শ্রেষ্ঠ তুমি জগতের মাঝে,
তোমার উপমা তোমাতেই সাজে ;
অতি ক্ষুদ্র আমি, তব পদে নমি বিদায় হই গো চরণে ;
তব স্মৃতি খানি, হৃদি মাঝে যেন রাখিতে পারি গো যতনে ॥

—তিনু

শঙ্কর ও চৈতন্য

(১)

শঙ্করের ব্যষ্টির ধর্ম্ম, চৈতন্যের ধর্ম্ম সমষ্টির। কিন্তু কথা এই, সমষ্টির, ব্যষ্টি আবার সমষ্টির। সমষ্টি চাহে তাই ব্যষ্টির কল্যাণ, ব্যষ্টি আবার চাহে তাই সমষ্টির কলাাণ। একের অভিযান তাই বহুর দিকে—কৃষ্ণের অভিসার তাই গোপীর দিকে—বিভুর গতি তাই বিশ্বের দিকে ; এইরূপ বহুর অভিযান আবার তাই একের দিকে— গোপীর অভিসার তাই কৃষ্ণের দিকে—বিশ্বের গতি তাই বিভুর অভিমুখে, শিব চাহে তাই জীব হইতে, আবার জীব চাহে তাই শিবত্ব লাভ করিতে। ফলতঃ একের গতি নিম্নদিকে, অন্যের গতি আবার ঊর্দ্ধদিকে। উভয়ের মিলন হয় এই বিপরীত গতিতে। জীবের এই ঊর্দ্ধ গতিই "যমুনার উজান টান" বলিয়া অভিহিত হয়।

সুতরাং সমষ্টি এক, ব্যষ্টি বহু। যেমন মৌমাছির ঝাঁক এবং ঝাঁকের মৌমাছি। ঝাঁক সমষ্টি অতএব এক, মৌমাছি আবার ব্যষ্টি অতএব বহু। বিভু এক, বিশ্ব তাই অনন্ত। শিব এক, জীব তাই অসংখ্য। সমষ্টি, তথা নেতা এক, ব্যষ্টি তাই বহু। এক গুরুর তাই অনেক শিষ্য, এক অবতারের তাই অসংখ্য ভক্ত। *

* সমষ্টির এক—ভূমার একই যথার্থ এক, নতুবা ব্যষ্টির একের—অল্পের একের কোনও সার্থকতা নাই। রাধা সাধারণ সংসারী স্ত্রীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে শুধু তাঁহারই (অল্পের) স্বামী বলিয়া মনে করিতেন না,

শিব, তথা বিভু যেমন সমষ্টি, স্বরূপ, নেতা, গুরু, তথা অবতারও সেইরূপ সমষ্টির মূর্ত্তরূপ।

এক বিভুর যেমন অনন্ত বিশ্বরূপ, এক শিবের যেমন অনন্ত জীবরূপ, এক নেতারও সেইরূপ, বহু ব্যষ্টিরূপ। ব্যষ্টিদের মধ্যে নেতারই স্বারূপ্য বর্ত্তমান, নেতার শক্তিতেই শক্তিমান তাহারা, তাহারা বস্তুতঃ নেতারই প্রতিচ্ছবি মাত্র। অতএব, বিশ্বের স্রষ্টা যেমন বিভু, জীবের স্রষ্টা যেমন শিব, ব্যষ্টির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতাও তেমনি নেতা। ভগবান স্বয়ং পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন, তিনি নিজে নিষ্প্রয়োজন, অনন্ত জীব জগতের প্রয়োজন সাধনে সমর্থ তিনি এই জন্যই। নিজের প্রয়োজনে সর্ব্বদা ব্যস্ত যিনি, পরের প্রয়োজন সাধন করিবার অবসর তাঁহার হয় না। নেতাকেও, এইহেতু, নিষ্প্রয়োজন হইতে হয়, নতুবা নেতৃত্ব করিবার যোগ্য হওয়া যায় না। সুতরাং নেতার স্বরূপ যতই ক্ষুদ্র হউক, উহা ভগবানেরই স্বরূপ। এ কারণ, নেতৃস্থানীয় মহাপুরুষদিগকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কেন না ভগবৎ শক্তি যেমন বহুর দিকে—সৃষ্টির অভিমুখে, নেতার শক্তিও সেইরূপ বহু ব্যষ্টির দিকে, অতএব উৰ্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে "অবতরণ" করে।

এক কথায়, ব্যষ্টির সৃষ্টি করে নেতাই।

আবার অনন্ত বিশ্বের যেমন একই বিভু, অনন্ত জীবে যেমন একই শিব, বহু ব্যষ্টিরও আবার তেমনি একই নেতা। ব্যষ্টিরা তাহাদের

তিনি তাঁহাকে অনেকের স্বামী—"বহুজন-বল্লভ" বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সকলেরই একমাত্র স্বামী—জগৎস্বামী। তাই তাঁহার স্বামীকে পাওয়া সার্থক হইয়াছিল। ভক্তেরও এইরূপ, নিজের গুরুকে সকলেরই গুরু—জগদ্‌গুরু ভগবান বলিয়া মনে করিতে হয়। অন্যথা, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি বশতঃ গুরুকে শুধু নিজেরই একমাত্র গুরু বলিয়া মনে করিলে, সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হয়। এইজন্যই গুরু স্ত্রী, পুত্র স্বামী ইত্যাকার কোনও ব্যক্তিতেই মনুষ্যবুদ্ধি করিতে নাই। মনুষ্যবুদ্ধি করিলেই ক্ষুদ্র আমার জ্ঞান উপস্থিত হইয়া দৃষ্টিভ্রম ঘটায়।

আপনাপন সত্তা প্রদানপূর্ব্বক পরে তাহাই আবার একত্র সংগৃহীত করিয়া নেতার সৃষ্টি করে। এইরূপে সেই নেতার সহায়তায় তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। অতএব ভগবানের জন্মদাতা যেমন ভক্ত, ভক্ত-হৃদয়ে যেমন তাঁহার জন্ম হয়, নেতার স্রষ্টাও সেইরূপ ব্যষ্টি। বস্তুতঃ নেতৃস্থানীয় অতিমানব অবতারদিগের হঠাৎ ভুঁই ফুঁড়িয়া জন্ম হয় না। বহু ব্যষ্টির দেশকালপাত্রোচিত সমবেত চিন্তাশক্তিই তদনুরূপ মহাপুরুষরূপে মূর্ত্তিমতী হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। অতএব, ব্যষ্টিদের অবতারক আখ্যা দিলে—তাহা অশোভন হয় না।

ফলতঃ নেতার সৃষ্টি করে ব্যষ্টিই।

বস্তুতঃ নেতার কার্য্যই ব্যষ্টির সৃষ্টি—মনুষ্য সংগঠন করা, ব্যষ্টির কর্ত্তব্য আবার নেতৃসংগঠন—সমষ্টির সৃষ্টি করা। গুরুর কর্ত্তব্য তাই শিষ্যের,—অবতারের কর্ত্তব্য তাই ভক্তের, কল্যাণ সাধন করা; শিষ্যের কর্ত্তব্য তাই গুরুর—ভক্তের কর্ত্তব্য তাই অবতারের,—কল্যাণসাধন করা। ফলতঃ, একটীতে agent নেতা, patient ব্যষ্টি, অন্যটিতে আবার agent ব্যষ্টি, patient নেতা। একত্র নায়ক (master) গঠন করেন নরের (man), অতএব, মাহাত্ম্য নায়কের; অন্যত্র আবার নরগঠন করে নায়কের, অতএব মাহাত্ম্য নরের। সুতরাং একটী নেতার পালনীয় ধর্ম্ম, অন্যটী আবার নরের পালনীয় ধর্ম্ম। একটী উন্নত ব্যক্তির—জ্ঞানীর ধর্ম্ম, অন্যটী আবার সর্ব্বসাধারণের—ভক্তের ধর্ম্ম।

শঙ্করের নেতার ধর্ম্ম, ইহাতে আছে তাই নেতার কর্ত্তব্যসমূহের উপদেশ। সে উপদেশের তাৎপর্য্য এই,—নিজে যখন নিষ্প্রয়োজন হওয়া যায়, ভগবানেরও তখন আর প্রয়োজন হন না। * জীব তখন

* জীবের নিত্য অভাব, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের দয়া হইলে সর্ব্ব অভাব পূর্ণ হয়। এই জন্যই জীব ভগবানকে সাধ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সম্যক নিষ্কিঞ্চন যিনি, তাঁহার কোনও কিছুরই প্রয়োজন নাই; সুতরাং তাঁহার ভগবানেরও প্রয়োজন হয় না। তিনি স্বয়ংই তখন ভাগবৎ স্বারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ণ; অতএব সে নিজেই তখন ভগবান হইয়া যায়। তাহার নিজের কোনও অভাব না থাকায় সে তখন অন্যের (ব্যষ্টির) উপকার সাধনে সমর্থ হয় অর্থাৎ নেতা হইবার যোগ্য হয়। চৈতন্যের আবার আপামর সাধারণের ধর্ম্ম। ইহাতে আছে তাই সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্যসমূহের উপদেশ। ভক্তেরা আপনাদিগকে সমর্থ ভাবিয়া ভগবানকে অক্ষম (যশোদার ন্যায় কৃষ্ণকে শিশু) বিবেচনা করত আপনাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে সার্থক করিয়া তুলেন, অর্থাৎ নেতা সার্থক হন ব্যষ্টির সহায়তায়; চৈতন্যের উপদেশের ইহাই তাৎপর্য্য। নেতা ও ব্যষ্টি উভয়েরই কর্ত্তব্য তাই নিঃস্বার্থ হওয়া। শঙ্করের উপদেশে নেতৃত্ব করিবার, গুরু হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায়, তাঁহার উপদেশ তাই নেতাগঠনেরই উপযোগী। * চৈতন্যের উপদেশে আবার অর্জ্জন করা যায় ব্যষ্টি হইবার, ভক্ত হইবার যোগ্যতা। তাঁহার উপদেশ আবার তাই ভক্ত-গঠনেরই উপযোগী। বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলেও দেখা যায়, যেহেতু শঙ্করের উন্নত ব্যক্তির,—জ্ঞানীর ধর্ম্ম, সেই হেতু উহা দেবভাষায় লিখিত, যাহা বুঝিবার জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, চৈতন্যের সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম, সেই হেতু উহা ভাষায় লিখিত, যাহা সকলেরই সহজবোধ্য।

শঙ্কর এবং চৈতন্য উভয়েই পরম প্রেমিক, একের প্রেম আদর্শ-প্রভুজনোচিত, অন্যের প্রেম আবার আদর্শ-ভৃত্যজনোচিত।

উভয়ের ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদের একটী কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। শঙ্কর-ধর্ম্মের অন্য নাম শৈবধর্ম্ম এবং চৈতন্য-ধর্ম্মের অন্য নাম আবার বৈষ্ণবধর্ম্ম। এই দুই নামই উভয় ধর্ম্মের স্বরূপ-প্রকাশক।

শিব ভূত-নায়ক। সর্ব্বভূত তাঁহার পরম প্রিয়। তাঁহার সর্ব্বস্ব তাই পরমানন্দে সকলকে বিলাইয়া দিয়া স্বয়ং নিঃস্ব তিনি,—ভক্তের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি। তাঁহার যাহা কিছু সকলই তাই তাঁহার ভক্তের গৃহে। শিবভক্তের তাই ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। ভক্তকে রাজা

* শঙ্করের ধর্ম্ম, এইজন্যই সন্ন্যাসীর উপযুক্ত এবং এইজন্যই, সন্ন্যাসী অথবা ত্যাগী ভিন্ন অন্যের গুরু হইবার অধিকার নাই।

করিয়া নিজে ভিক্ষুক সাজিয়া ভক্তের দ্বারে দ্বারে তিনি ভিক্ষা মাগিয়া ফেরেন। শিব তাই পরমদেবতা।

পক্ষান্তরে, ভক্ত আবার ভগবানের বিষ্ণুর সেবক। ভগবান্ তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বস্ব তাই তাঁহার চরণে অঞ্জলি দিয়া নিঃস্ব তাহারা, ভগবানের জন্য সর্ব্বত্যাগী। তাহাদের যাহা কিছু সকলই তাই ভগবানের গৃহে। বিষ্ণুভক্ত তাই চিরদরিদ্র। বিষ্ণুকে প্রভু করিয়া নিজেরা ভৃত্য সাজিয়া প্রভুর জন্য তাহারা সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন। ভক্তের তাই তুলনা নাই।

শিব সন্ন্যাসী ভিক্ষুক, শিবভক্ত তাই রাজ্যেশ্বর সংসারী ; ভক্ত আবার ত্যাগী, ভগবান বিষ্ণু তাই সংসারী শ্রীমান্ * একমতে, ভগবানই বড়, তিনি "লোকনাথ"। অন্যমতে ভক্তই (ভগবানেরও) বড়, ভগবান তথায় "নারায়ণ" (নরের পুত্র মাত্র)।

অতএব, শিবনেতা, ভক্ত ব্যষ্টি। ব্যষ্টির হিতের জন্য নেতাকে হইতে হইবে শিবের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী। নেতার জন্য ব্যষ্টিকে আবার বরণ করিয়া লইতে হইবে বিষ্ণুভক্তের ন্যায় চিরদারিদ্র্য—অনন্ত দুঃখ।

সুতরাং উভয় ধর্ম্মের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, বরং একটী অন্যটীর পরিপূরক।

—শ্রীসাহাজী

---

* অতএব, পরমদাতা শিবকে হর্ত্তা বলা সঙ্গত হয় না, বরং হর্ত্তা বলা যায় বিষ্ণুকেই, কেন না, ভক্তের ধন লইয়াই তিনি ধনী হন, ভক্তের দয়াতেই তিনি ভগবান হন। অথবা, শিব ভক্তকে দেন—গ্রহণ করিবার জন্যই এবং বিষ্ণুর ভক্তের নিকট হইতে গ্রহণ করেন—দিবার জন্যই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। হরিহর তাই অভেদ।

দুঃখের ভিতর সুখ

নির্য্যাতনের পেষণ-যন্ত্রের ভেতর থেকে যে light পাওয়া যায় তাহাই বাস্তবিক স্বাধীনতার আলোক। ওর ভেতর থেকেই শত যন্ত্রণার ভিতরও কি রকম একটা সুখের আভাস পাওয়া যায়। মনে জাগে আমরা ত বাস্তবিক কাপুরুষ নই, তেজহীন-বীর্য্যের সন্তান নই। কে যেন উপনিষদের সারবাণী শুনাইল—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামাণি দিব্যাণি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

*　　*　　*

'অমৃতের পুত্র সব শুনহে সকলে!
আসিয়াছ এই ভবে রঙ্গক্রীড়া ছলে।
সূর্য্যের কিরণ যথা ধরণী উপর
বিতরি আলোক পূর্ণ করে চরাচর;
সেইরূপে জেনে সবে এ মহীমণ্ডলে
আসিয়াছ 'প্রেমসূর্য্য' কিরণের ছলে।
প্রেমের কিরণে দীপ্ত করিয়া জগত
দেখাও সে 'প্রেমময়ে' হয়ে একমত।
ইহা ভিন্ন জগতের নাহি অন্য পথ॥'

বাঁশী বাজিলেও যেন প্রাণের তন্ত্র মিশে না, অভাব অভিযোগেই প্রাণের স্ফূর্ত্তি নষ্ট করে। কিন্তু এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও আমাদিগকে জীবন

সঙ্গীত গাহিয়া প্রাণ সুশীতল করিতে হইবে। আলোক দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে। নতুবা বিষাদের ছায়ায় মুখ ম্লান হইয়া তেজ, বীর্য্য হীন হইয়া পড়িবে। জীবনের এই সংগ্রামে মরণ ভয় করিলে চলিবে কেন? রাজ্য জয় ত করিতেই হইবে। কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস থাকিতে, অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কঠোর আদেশ-বাণী থাকিতে কেন যে আমরা কাপুরুষের মত যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নপর, একথা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য রকমের দুঃখ হয়। যে দেশে এমন মহাবীর পুরুষ, প্রতাপসিংহের মত বীর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, যে দেশে চিরকাল সুমহান্ ত্যাগী পুরুষদের আত্ম-কাহিনীতে শিক্ষা উপদেশ পাওয়া যাইতেছে, যেদেশে এখনও ত্যাগের বীরত্ব বলিয়া অদ্ভুত মানবশক্তি প্রকাশ পাইতেছে সেই দেশের কিনা আজ আত্মগ্লানি-উপস্থিত। ক্ষোভ করিবার সময় নাই, লুপ্ত রাজপুতের ইতিহাস স্মরণ কর, প্রতাপসিংহের দুর্জ্জয় স্বাধীন শক্তির আদর্শ লও, চিতোরের কাহিনী একবার স্মরণ কর, মৃত্যুকে আলিঙ্গনের সামগ্রী করিয়া লও, দেখিবে চির স্বাধীনতা কাকে বলে? পৃথিবীর ইতিহাসে যাহা না আছে ভারতের ইতিহাসে তার চেয়ে ঢের বেশী আছে—শিক্ষার অনেক জিনিষ আছে; যে জিনিষ—যে ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া আজ পশুশক্তি রাজত্ব করিতেছে। আমরা সবই বুঝিতেছি জানিতেছি কিন্তু প্রতীকার করিতে পারিতেছি না। একটা গল্প আছে—

কলিকাতায় এক মাতাল মদ খাইয়া মোহগ্রস্ত অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং বন্ধুগণকে বলিতেছে 'আমার জীবন এইবার শেষ, তোরা আমাকে নিম্‌তলার ঘাটে লইয়া যা'। এই কথা বলায় তাহার সুহৃদ্‌গণ তাহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিল। পথিমধ্যে তাহারা এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল 'মহাশয়! নিম্‌তলার ঘাটে যাব কোন রাস্তায়?' ইত্যবসরে ঐ মাতালের মদের নেশা কাটিয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকটী যখন ঠিক্ উত্তর দিতে পারিল না—তখন মাতাল স্কন্ধে থাকিয়াই দুঃখেরসহিত বলিতে লাগিল 'ভাইরে! নিম্‌তলার ঘাটও চিনি, কাশীমিত্রের ঘাটও চিনি কিন্তু কি বলিব মরিয়া রহিয়াছি'।

মাতালের ঐকথা শুনিয়া বন্ধুগণ তাহাকে রাস্তায় রাখিয়া পলায়ন করিল পাছে হঠাৎ পুলিসের নিকট আসামী সাব্যস্ত হয়।'

আমাদের দশাও প্রায় সেইরূপ হইয়াছে। বিলাস-মোহে বিলাতী মদ খাইয়া চিতা-শয্যায় যাইবার উপক্রম! স্বামিজীর মত ভদ্রলোকটী ছিল বলিয়াই আমরা রক্ষা পাইলাম। যদি নিম্‌তলার রাস্তা ঠিক দেখাইত তবে জীবিতাবস্থাতেই আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। ভাগ্যে স্বামিজীর কথোপকথনে প্রাণে সাড়া জাগিয়াছে! কিন্তু কি করিব মৃত্যুশয্যায় একেবারে শায়িত অবস্থায় আছি নতুবা বাস্তবিক মরণের পথ আমরা জানি। একথাটী বেশ্ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থাটী বিচার করিতে পারিবেন। আমাদের যে আর নড়িবার-চড়িবার শক্তি নাই কারণ আমরা কঠিন মৃত্যু-বন্ধনে আবদ্ধ। বাঁচিবার পথ আছে বটে, যদি আমাদের পরম সুহৃদ্‌গণ মাতালেরর সাড়া শুনিয়া নিজের তল্পী তল্পা লইয়া রওনা হন্। বাস্তবিক ঘটনাটীও এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পতিতের উদ্ধার নিশ্চয়ই ভগবান্ করিবেন। আমরা বাঙ্গালী চিরকাল বুদ্ধিমান্ জাতি বলিয়া প্রশংসিত। কিন্তু খোঁয়াড়ে পড়িয়া ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়াছি। ব্যাঘ্র শিকারী যেমন প্রকাণ্ড বাঘটাকে খাঁচায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া খাইতে না দিয়া উহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে আর শতবার লৌহশলাকা দিয়া উহার শরীরটা ক্ষত-বিক্ষত করে তখন সে নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়া থাকে আর তাহাকে লইয়া শিকারী ব্যক্তি কত রঙ্গ-তামাসা করে ও সেই হিংস্র জন্তুর উপর যথেচ্ছা অত্যাচার করে কিন্তু যখন সে বাঘটী বুঝিতে পারে যে উক্ত শিকারীর লাঞ্ছনায়ই উহার মৃত্যু অনিবার্য্য; তখন সে মৃত্যুশক্তি লইয়া জীবনের শেষ সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হয়। তখন শিকারী ব্যক্তিও মৃতপ্রায় ব্যাঘ্রের দন্ত ভ্রূকুটী ও গর্জ্জন দেখিয়া চমকিত হয় এবং ব্যাঘ্রের স্থির সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া তাহার হাত হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। আমরা যদি মৃত্যু সন্নিকট জানিতে পারিয়া মরণ যুদ্ধে জীবন সঙ্কল্প করিতে পারি তবে শিকারী অতি সুচতুর হইলেও মরণ সমীপে যমের দ্বারে যাইতে সাহস

পাইবে না। আমাদের শেষ বিচারে হয় মৃত্যু, না হয় পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি, এ উভয়ের যে কোন একটার পরিসমাপ্তি হইবে সন্দেহ নাই।

এখন দুঃখ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত রোদন করিলে কোন ফল হইবে না। যাদের প্রাণশক্তি এখনও পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় নাই তাহাদিগকে বলি—

কিন্নাম রোদিষি সখা ত্বয়ি সর্ব্বশক্তি,
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপং।
ত্রৈলোক্যমেদখিলং তব পাদ মূলে,
আত্মৈবহি প্রভবতে নজড়ং কদাচিৎ।

হে সখে! তুমি সর্ব্বশক্তিমানের অংশ হইয়া কি জন্য রোদন করিতেছ? ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবৎ শক্তির আরাধনা কর—আবাহন কর, নিখিল ত্রিভুবনের ক্ষমতা তোমার পদতলে গড়াগড়ি যাইবে। কারণ আত্মশক্তিরই জয় চিরকাল; জড়শক্তির কখনও চির স্থায়ী প্রভাব হইতে পারে না। অমর আত্মার চিরপ্রভাব অখণ্ড। বিভূশক্তির নিকট ক্ষুদ্র জীব সাধারণ শক্তি অতি তুচ্ছ। মানবাত্মার অমরতা প্রাণের সহিত উপলব্ধি করিয়া গীতাগ্রন্থ হৃদয়ে রাখিয়া যুদ্ধস্থলে মৃত্যু আলিঙ্গনও শ্রেয়ঃ। সেই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মশক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আজিও আবার সেই ভারতের রণক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে দেশবাসীর প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত করিতে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ স্বামিজীর আবির্ভাব হইয়াছে। সেই সুমহদ্বাণী শ্রবণ করিলে জাতির পাপ বিনাশ হইবে—কার্য্যে সাধন করিলে অপূর্ব্ব তেজ ক্ষমতা বিকাশ পাইবে। কত বৎসর যাবৎ আমরা জাতির জন্য দেশের জন্য চীৎকার করিয়া মরিতেছি কিন্তু কাজের দিকে ততদূর অগ্রসর হইতেছি না। বাঁচিবার জন্য কাহার না ইচ্ছা আছে? একটা প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। জীবনের গঠন কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ, উৎসাহ ও চেষ্টা করিতে হইবে। কামার যেমন আগুনে লৌহ পুড়াইয়া হাতুড়ির দ্বারা পিটিয়া উহা ইচ্ছামত তৈয়ার করিতে পারে আমরাও সেইরূপ জীবনোন্নতির যথোপযুক্ত চেষ্টা করিলে অবশ্য সফলকাম হইতে পারিব। প্রাচীন

শাস্ত্রনীতিতে জীবনের প্রথম ভাগটা গড়িয়া উঠাইতে পারিলেই বলবীর্য্যের সঞ্চয়ে নবীন উৎসাহ প্রেম ফুটিয়া উঠিবে। এজন্য আধুনিক শিক্ষালয় পরিত্যাগ করিয়া আশ্রম শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। উহাতে যশঃ নাই বলিয়া আমাদিগকেই তজ্জন্য কিছু স্বার্থত্যাগ করিয়া খাটিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের কথাটী একেবারে ভুলিয়া বসিয়া থাকিলে কাজের দিক শূন্য হইয়া পড়িবে। শাস্ত্রই আমাদের প্রাণ। শাস্ত্রের প্রত্যেক কথাই ব্রহ্মচর্য্যের দিকে লক্ষ্য করিতেছে। উহাই জীবনের মূল। প্রতিকেন্দ্রে এক একটী আশ্রম করিতে হইবে। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়া শিক্ষা ও অন্যবিধ উপার্জ্জনের উপায় শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাতে সমবায় ক্ষেত্রে কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রাণে ভালবাসা ও মনের মিলন হইবে। আধুনিক কুশিক্ষার ফলে যেমন ফুলবাবুর দল বাড়িয়াছে, বদ্‌চরিত্রের গঠন হইয়াছে আমাদের জাতীয় শিক্ষায় যেন উহার ভাব না আসিতে পারে তজ্জন্য ধর্ম্মসংশ্লিষ্টে উক্ত সাধন করিতে হইবে। খাদ্যের প্রতি সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। তবে আমাদের নৈষ্কর্ম্য দৈন্যতা দূর হইবে, শান্তিময় ভোগ করিয়া প্রকৃতির নির্ম্মল সুখ অনুভব করিতে পারিব। এখন চাই কাজ।

কোন প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার
কাজ কর, ক'রে মর এই হয় সার।

স্বামিজীর নির্ম্মল বাণী সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইবে—

Once more the voice, that spoke to the sages on the banks of the Saraswati, the voice whose echoes reverberated from peak to peak of the 'Father of Mountains' and descended upon the plains through Krisna, Budha and Chaitanya in all carrying floods, has spoken again—'Enter ye into the realms of light, the gates have been opened once more.'

মুক্তির দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত, শুধু চাই এখন—

"Renunciation and service—these are the two great national ideals of India, intensify them in proper channels. The rest will take care of themselves."

হে প্রেমিক ! স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে করবিসর্জ্জন ! দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন ।"

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও—
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

Little must be sacrificed for the greater one ?

মহৎ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎকার্য্য হয় না' এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। দেশের যেরূপ নানা অভাব দারিদ্র্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে। দরিদ্র দেশকে খাবার দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে হইবে।

"Feed the poor and educate the Masses, teach them through the ears and not through the eyes : If the Mountain does not come to Mahamet, Mahamet must go to the Mountain.'

দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর ব্যক্তিগণ যদি তোমার নিকট না আসিতে পারে তুমি তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাও এবং মুখে মুখে গল্প করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত কর।

'Let these poor be your gods.'

সবাই বড় হইলে তবে
স্বদেশ বড় হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হ'ব তবে।
সত্য পথে আপন বলে
তু'লেশির সবাই চলিবে,

মরণ ভয় চরণ তলে
　　দলিত হয়ে রবে।
নহিলে শুধু কথাই সার
　　বিফল আশা লক্ষবার,
দলাদলি ও অহঙ্কার
　　উচ্চ কলরবে॥

"If every one would see to his own reformation, how very easily you might reform a nation."

এ জন্যই সক্রেটিস্ দেশোদ্ধারের ও সমৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গিয়াছেন

'Let him that would move the world, move first himself'

যে দেশের উন্নতি করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে প্রথমতঃ নিজের সম্পূর্ণ উন্নতি করিয়া লওয়া উচিত। নিজ নিজ জীবন তৈয়ার হইলে দেশের জীবনও তৈয়ার হইয়া আসিবে। এ জন্যই ব্রাহ্মণের উন্নতি ও উৎকর্ষ সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয়।

ধর্ম্মকোষ গোপ্তা হে ব্রাহ্মণ,
অগ্রজন্মা কর কর শীঘ্র জাগরণ।
তুমি জাগিলেই পুনঃ জগৎ জাগিবে
পুনঃ আনন্দের স্রোতে জগৎ ভাসিবে
আপনি উদ্ধারি কর অপরে উদ্ধার
করি তব পদে কোটী কোটী নমস্কার।
ধর্ম্মের আসনে বসি হে কর্ম্মী ব্রাহ্মণ!
　　জগতেরে শিক্ষা দিলে দান,
　　কেবা আছে তোমার সমান?
যেই তুমি ধর্ম্মাদর্শ জগতের
　　কি অভাব তার?
শক্তির ভাণ্ডার তুমি হে মুক্ত ব্রাহ্মণ
　　শক্তি নিজে শক্তি ভিক্ষা করে

বসে আছে কাহার দুয়ারে !
সেবাব্রত প্রচারিলে শক্তির সন্ধান,
সেই তুমি সেবাদর্শ জগতের
কর কার ভয় ?
হে কর্ম্মী, হে জ্ঞানী ত্যাগী, হে মুক্ত ব্রাহ্মণ
বারেক উঠিয়া দেখ চেয়ে,
তোমারি সাধনা ফলে জেগেছে ধরণী
তুমিই উজানে গেছ বেয়ে ।

—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গোস্বামী ।

স্বামী প্রেমানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই অদ্ভুত শিল্পী এইরূপ কত জীবনকে লইয়া কাদার তালের ন্যায় তাহাদিগকে ইচ্ছামত কতরূপে, কত ছাঁচে গড়িয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহাকে শ্রীভগবানের যে কার্য্যের বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করিতেন, তাহাকে সেই ভাবেই তিনি গড়িয়া-পিটিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেন। যিনি একবার মাত্র তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন তিনিও এই মহাপুরুষের প্রভাব নিজ জীবনে বিশেষ রূপে অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কারণ, স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন চুম্বক স্বরূপ ; লৌহকে আকর্ষণ করাই যে উঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এইরূপে আকৃষ্ট হইয়া কত শিক্ষিত ভদ্র সন্তান সংসারের সমস্ত মায়িক বন্ধন ছিন্ন করতঃ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন। আবার যাহাতে ঐ নিবেদিত অর্ঘ্য শ্রীভগবানের যথার্থ পূজায় লাগে, যাহাতে উহারা কোনরূপে অশুদ্ধ হইয়া না যায় তাহার জন্য এই অদ্ভুত পূজকের কতই না আগ্রহ, কতই না সাবধানতা দৃষ্ট হইত! ভালবাসিয়া, আবশ্যক হইলে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার ও তাড়না পর্য্যন্ত করিয়া সুদক্ষ সেনাপতির

ন্যায় তিনি তাঁহার গন্তব্য পথে পরিচালনপূর্ব্বক তাহাদিগের জীবন গঠন করতঃ যাহাতে তাহারা বর্ত্তমান যুগাবতারের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের উপযোগী হইয়া উঠে তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। স্বামী প্রেমানন্দ কখন ভাবে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত বিবেক, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা, দ্বাদশবর্ষব্যাপী তাঁহার নানাবিধ কঠোর সাধনা ও তৎপ্রসূত অলৌকিক অনুভূতি সমূহ এবং শিষ্যগণের উপর তাঁহার অদ্ভুত প্রেম, করুণা ও ভালবাসা প্রভৃতি গল্পচ্ছলে মঠের নবীন সাধু ব্রহ্মচারিগণের নিকট বর্ণনা করিতেন, আবার কখন স্বামী বিবেকানন্দের আকুমার অটুট ব্রহ্মচর্য্য, অদম্য কর্ম্ম প্রবণতা, মহা পবিত্রতা, অদ্ভুত মানবপ্রেম ও অলোকসামান্য স্বার্থ গন্ধহীনতা ইত্যাদি ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। শুধু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, যাহাতে তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর ভাবগুলি আংশিক ভাবে ও তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ হয় তদ্বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। কিরূপে চলিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে ও কথা কহিতে হইবে, কিরূপে ফল ছড়াইতে ও তরকারী কাটিতে হইবে, কিরূপে বাসন মাজা, ঔষধ দেওয়া ও গো-সেবা করিতে হইবে ইত্যাদি মঠের সমস্ত কর্ম্ম তিনি স্বয়ং সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় বলিতে পারা যায় স্বামী প্রেমানন্দ "উত্তম বৈদ্য ছিলেন।" কারণ, মঠের যদি কেহ তাঁহার নির্দ্দেশ মত ঐভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বিরত হইত তিনি প্রথমে তাহাকে অনুরোধ করিতেন, তাহাতে কার্য্যোদ্ধার না হইলে উহার ফলাফল তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন, উহাতেও নিষ্ফল হইলে তাহাকে ঐরূপে কার্য্য করাইতে বাধ্য করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আবার জননী যেরূপ কোন কারণে সন্তানকে তাড়না করিলেও অচিরেই উহার জন্য স্বয়ং ব্যথিতা হইয়া শিশুর প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ও যত্ন প্রদর্শন করেন, তিনিও তদ্রূপ মঠের কোন সাধু ব্রহ্মচারীকে বিশেষ কারণ বশতঃ তিরস্কারাদি করিলে পর মুহূর্ত্তেই উহার জন্য অত্যন্ত

অনুতপ্ত হইয়া নানাবিধ উত্তম আহার্য্য বা অসীম স্নেহ যত্ন দানে তাহাকে পরিতুষ্ট করিতেন। এইরূপে স্বামী প্রেমানন্দের তিরস্কার মঠবাসিগণের নিকট একটা উপভোগের বস্তু ছিল। যেদিন তাঁহারা উহা হইতে বঞ্চিত হইতেন সেই দিন ভাবিতেন—আজকের দিনটা বৃথা গেল, বাবুরাম মহারাজের বকুনি খাওয়া হ'ল না। এক কথায় তিনি মঠের সাধু ব্রহ্মচারিগণকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন এবং তাঁহারাও তাঁহাকে স্বীয় জননীরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করতঃ কৃতার্থ হইতেন। স্বামী প্রেমানন্দ মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যেরূপ সতত যত্ন-পরায়ণ ছিলেন বাহিরের ভক্তগণও যাহাতে নিঃস্বার্থ, শুদ্ধচিত্ত ও ঈশ্বর ভক্ত হইয়া মানব জীবন সফল করিতে সক্ষম হয় তদ্বিষয়ে উপদেশাদি দানে তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তিনি জানিতেন, কোন আলেখ্যর এক পার্শ্ব যদি মোটেই চিত্রিত না হয় তাহা হইলে উহা যেরূপ চিরদিনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় তদ্রূপ মানব সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ নারীজাতি যদি উন্নতা না হন তবে ঐ সমাজ কোন কালে পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না। সুতরাং বঙ্গমহিলাগণও পুরুষদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীস্বামিজীর ভাবে সমভাবে ভাবিতা হইয়া তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথে গমনপূর্ব্বক যাহাতে এককালে ব্রহ্মসম্পদের অধিকারিণী হইতে পারেন তজ্জন্য স্বামী প্রেমানন্দের সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অথবা আবশ্যক হইলে পত্রাদি দ্বারা তিনি ঐ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। উহার নিদর্শন স্বরূপ জনৈকা ভদ্রমহিলাকে লিখিত তাঁহার পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "* * * * তোমরা যে ভগ্নী নিবেদিতার কথা চিন্তা কর এইজন্য বার বার ধন্যবাদ দিই। শ্রীস্বামিজীর ইচ্ছা ছিল সহস্র সহস্র ঐরূপ নিবেদিতা বেরুক এই বাংলাদেশ থেকে। যাক্ ছেয়ে দেশ নিবেদিতার নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাবে। আবার উঠুক এদেশে গার্গী, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী দলে দলে। পবিত্রতায়, নিষ্ঠায়, সরলতায় মানুষ দেবতা হয়। ঠাকুর কৃপা করে তোমাদের দেবভাবে পূর্ণ করুন ইহাই প্রার্থনা। শ্রীস্বামিজী

কহিতেন মার জাত ছেলেদের যেমন শিক্ষা দিতে পারে পুরুষ তেমন পারে না। তুমি নিজে যতটুকু পার দু'চারটী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে শিক্ষা দিতে সুরু করে দাও। বিধি-নিয়ম আপনা হ'তেই হয়ে যাবে। ভিতরে ভাব থাকলে অত বিধি-নিষেধ দরকার হয় না। শক্তি সামর্থ্য সব আছে তোমার মধ্যে, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীকে চিন্তা করে লেগে যাও শিক্ষা দিতে। খুলে দাও পাঠশালা, সাহায্য প্রভুই পাঠাবেন। কলিকালে একমাত্র দানই ধর্ম্ম। বিদ্যা অপেক্ষা ভাল জিনিষ জগতে আর কি আছে? কর এই বিদ্যা দান, অবিদ্যা দূর হবে এই বিদ্যা চর্চ্চায়। খুব মন দিয়ে ঠাকুরের কথামৃত নিত্য পাঠ করবে। উহার একটী কথায় কত ভাগবত, গীতা রয়েছে দেখবে। শ্রীস্বামিজীর চিঠি ও বক্তৃতাগুলি পড়ে দেখবে উহাতে অনন্ত শক্তি নিহিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবে এক নব যুগ উপস্থিত। ছেড়ো না এ সুযোগ, দেখুক লোকগুলো সুন্দর শান্তির পথ। যে এই পথে আসবে সেই আনন্দ পাবে। সহস্র মেদিনামণ্ডল নিয়ে আমাদের একটী দল করতে হবে। এতে বাদ কেও না যায়। পর সংসারে কেউ না থাকে। যদি কেউ পর থাকে, সেটা 'আমি' 'আমার', এই 'আমি আমার' হচ্ছে মহা বৈরী। নাশ করতে হবে, মারতে হবে এই পরম শত্রুকে। তবেই সারা দুনিয়া আপনার হবে, ভগবানের হবে, সুখের, শান্তির হবে। সেই এই শিক্ষা দিতে পারবে, যে 'আমি' 'আমাকে' মারতে পেরেছে। ভগবানের নামে বিশ্বাস এলে তাঁর শক্তিতে ধ্বংস হবে এই অবিদ্যা, মোহ। ঈশ্বর শক্তিতে সব হয়, তিনি কৃপা করে আমাদের চোখের বাঁধন খুলে দেন ইত্যাদি।"

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ ভক্তদিগের মধ্যে জাতি বিভাগ মানিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেন—"ভক্তের নিকট জাতি বিচার নেই—ভক্তই ত একটী জাত।" বর্ত্তমানের ন্যায় তখনও কোন কোন সংকীর্ণহৃদয় ব্যক্তি উহা লইয়া 'কাণা ঘুসা' করিত। তিনি তৎসমস্তই শুনিতেন ও জানিতেন কিন্তু কদাপি উহাতে বিচলিত হইতেন না। কারণ, তাঁহার দেহটা এই মরজগতে আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা পড়িয়া থাকিলেও মনটা সর্ব্বক্ষণ এমন এক রাজ্যে অবস্থান করিত যথায়

পাপ, পুণ্য, সুখ দুঃখ, ও নিন্দা স্তুতির প্রবেশাধিকার নাই। তাই দেখিতে পাই ভাবুক কবি ভাব ও ভাষার তুলিকা সম্পাতে প্রেমিক হৃদয়ের যে নিখুঁত চিত্রটী আঁকিয়াছেন স্বামী প্রেমানন্দের সহিত তাহা সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া যায়—

"প্রেমিক চায় নাক জাতি, চায় না সুখ্যাতি।
সে ভাবে পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ, রট্‌লে অখ্যাতি॥
আবার চৌদ্দভুবন ধ্বংস হলে,
আস্‌মানেতে বানায় ঘর ;
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
(ও ভাই) তার থাকে নাক আত্ম পর॥"

স্বামী প্রেমানন্দ আধ্যাত্মিক সম্পদের কতদূর অধিকারী ছিলেন তাহা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, একমাত্র 'জহুরিই জহর চিনিতে পারে। তবে তাঁহার দর্শনাদি সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে যাহা বলিতেন বা উচ্চ উপলব্ধি সমূহ যাহা তিনি গোপন করিতে সতত চেষ্টা করিলেও সময় সময় আমাদিগের সমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িত তাহারই দুই একটী এখানে উল্লেখ করিব। একদিবস সন্ধ্যারতি শেষ হইলে ঠাকুর ঘরের দক্ষিণদিকের বারান্দার একপার্শ্বে স্বামী প্রেমানন্দ ধ্যান করিতে বসিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইল তথাপি তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না। পূজক, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ নিবেদন করিতে আসিয়া দেখিলেন পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ স্থাণুর মত স্থিরভাবে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার দেহ পশ্চাতদিকে ঈষৎ হেলিয়া গিয়াছে। শারীরিক ক্লান্তিবশতঃ তিনি ঐরূপে নিদ্রিত হইয়াছেন মনে করিয়া সেবক তাঁহাকে ডাকাডাকি করিলেও যখন কোন প্রত্যুত্তর আসিল না তখন তাঁহার সন্দেহ হইল বুঝি বা বাবুরাম মহারাজ শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে গোলমাল করিলে ঠাকুরের ভোগ নষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি তখন আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না ; উহা নিবেদনান্তে পুনরায় তন্নিকটে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তথাপি স্বামী প্রেমানন্দ নিরুত্তর। তখন সেবক হস্তস্থিত বাতি উজ্জ্বল

করিয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে কিছুক্ষণ ধরিলে উহা ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল। ব্রহ্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি ঘুমিয়ে ছিলেন ?" ঐ প্রশ্নের উত্তরে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ মধুর-কণ্ঠে গাহিলেন :—

"ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি ॥
যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ॥"

অন্য এক সময় তিনি উক্ত সেবককে বলিয়াছিলেন;—"ঐরূপ হতে দেখ্‌লে ডাকাডাকি চ্যাঁচামেচি না করে ঠাকুরের নাম শুনাবি।"

বেলুড় মঠের নিয়মাবলীর একস্থানে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,—"শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে এখনও সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। যতদিন তিনি পুনর্ব্বার স্থূল শরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে। সকলের প্রত্যক্ষ না হইলেও তিনি যে এই সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতেছেন উহা সকলেরই প্রত্যক্ষ ; তাহা না হইলে এই নগণ্য অত্যল্প সংখ্যক, অসহায়, পরিতাড়িত বালকদিগের দ্বারা এতাদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভূমণ্ডলে এত আন্দোলন কথনই সংঘটিত হইত না।" আমরা জানি, উপরোক্ত "কেহ কেহ"র মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ অন্যতম। একদিবস মঠের ব্যক্তি বিশেষের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্বয়ং মঠ ত্যাগ করিবেন এইরূপ স্থির সঙ্কল্প পূর্ব্বক তিনি নিজ পরিহিত বস্ত্র ও ছাতা-লাঠি লইয়া বহির্গত হইলেন। যখন দক্ষিণদিকের বড় 'গেটের' তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থূল শরীরে তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সজলনয়নে তাঁহাকে বলিলেন,—"বাবুরাম, তুই গেলে আমি মঠে থাক্‌ব কি করে ?" তাঁহার অশ্রুপূর্ণনয়ন ও বিরস-বদন দর্শনে স্বামী প্রেমানন্দের ক্রোধ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল এবং তিনি প্রফুল্লচিত্তে পুনরায় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

অন্য একদিবস পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ মঠ-প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ পায়চারি করিতেছিলেন হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর তন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া প্রেমভরে বলিলেন,—"চাঁদ, পলাবে কোথায়, নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি।" কিপ্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁহাকে ঐকথা বলিয়াছিলেন তাহা স্বামী প্রেমানন্দ আমাদিগের নিকট প্রকাশ না করিলেও আমরা অনুমান করি—যুগাবতারের সে কার্য্যে সহায়তার জন্য তাঁহার বর্ত্তমান শরীর ধারণ তাহা সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই বোধ হয় তিনি স্ব স্বরূপে অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে রজ্জুর ফাঁস তাঁহার হস্তে, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি উহা খুলিয়া দিবেন না। পাঠক নিশ্চয় মনে করিতেছেন—"বাবাজী, এতক্ষণ ত বেশ বল্‌ছিলে, এখন আবার পাগলের মত যা তা কি বক্‌ছ? দু চারিটা গাঁজাখুরি গল্প বা অলৌকিক ঘটনা না লিখলে কি আর মহাপুরুষের জীবনী হয় না? আর, তুমি ঐরূপ লিখলেই কি আমরা বিশ্বাস করব?" উত্তরে বলি সহৃদয় পাঠক, আপনি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যাহাই করুন না কেন তাহাতে লেখকের কিছুই আসিয়া যাইবে না; যখন আরম্ভ করিয়াছে তখন মহাপুরুষ সম্বন্ধে সে যৎসামান্য যাহা জানে তাহা সংক্ষেপে বলিয়া যাইবে। আর জিজ্ঞাসা করি, উহাতে অবিশ্বাসেরই বা কি কারণ আছে? আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিতে পাই না তাহারই যে কোনরূপ অস্তিত্ব নাই এইরূপ মনে করা ভুল। জন্মান্ধ ব্যক্তি চন্দ্র-সূর্য্য কখন দেখিতে পায় না বলিয়া যদি মনে করে অন্যে তাহাকে মিথ্যা বলিতেছে, তবে সে শুধু অন্ধ নহে, লোক সমাজে বাতুল বলিয়াও গণ্য হয়। অধিকাংশ ভারতবাসী কখন ইউরোপ এবং তদ্দেশীয় বহু ব্যক্তি কখন ভারতভূমি দর্শন করে নাই, সুতরাং তাহারা যদি পরস্পর এই দুইটী দেশের অস্তিত্ব স্বীকার না করে তবে আমরা তাহাদিগকে কি মনে করি? পাঠক বলিবেন—'কেন? অত্যল্প হইলেও এরূপ ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ঐ উভয় দেশেই দর্শন করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা করিলে আমিও উহা করিতে পারি। তাহা ছাড়া উভয় স্থানেরই ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি রহিয়াছে তাহা পাঠ করিয়াও অন্যে উহাদের বিষয়

অবগত হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়, আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। এই মানব সমাজে ঠিক আমাদেরই মত রক্তমাংসের দেহ-বিশিষ্ট কোন কোন ব্যক্তি তীব্র ঐকান্তিকতা, কঠোর তপস্যা ও নিরবছিন্ন একাগ্রতা সহায়ে ঐ রাজ্যে গমন করিয়াছেন এবং এখনও করেন। তাঁহারা তথায় বহু সময় বাস করিয়া এবং দেখিয়া শুনিয়া যাহা আমা-দিগের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন ও করেন, তাহাই বা আমরা বিশ্বাস করিব না কেন? তদ্ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষদর্শী-লিখিত উক্ত রাজ্যের ভূগোল ও ইতিহাস স্বরূপ শাস্ত্র চিরদিনই বর্ত্তমান। অধিকন্তু, স্বার্থের জন্য যাহাদিগের সত্য মিথ্যা জ্ঞান নাই, অনায়াসে 'হয়কে নয় ও নয়কে হয়' করিতে পারে, ঐ উদ্দেশ্য সাধনে যাহারা দেবচরিত্রে কলঙ্কক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, আপন 'গণ্ডা' বুঝিয়া লইবার জন্য যাহারা ব্যক্তি বা জাতি বিশেষকে তিল তিল করিয়া মারিতে অথবা মুহূর্ত্ত মধ্যে উহার হৃদ্‌পিণ্ড বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিতেও সক্ষম, তাহাদিগের কথা এবং লিখিত ইতিহাস আমরা অনায়াসে 'বেদবাক্য'বৎ বিশ্বাস করিতে পারি, আর, যাঁহারা সত্য লাভের জন্য জনকজননী দারা সুত ঐশ্বর্য্য ও মান যশঃ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুতেই জলাঞ্জলি দেন, অপরের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে যাঁহারা 'ক্রুশ কাষ্ঠে', বিষপানে বা অনলকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করেন এবং "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"ই যাঁহাদের উপাস্য দেবতা, তাঁহাদিগের বাক্যেই পণ্ডিত-মূর্খ আমাদিগের যত সন্দেহ ও অবিশ্বাস? আবার প্রত্যক্ষদর্শিগণ তাঁহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক চিরদিন কাহাকেও অন্ধকারে থাকিতে বলেন না; তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথে গমনপূর্ব্বক স্বচক্ষে ঐরাজ্য দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য তাঁহারা সকলকেই নির্ভয়ে আহ্বান করেন। ব্রহ্মচর্য্য ও একাগ্রতাকে সম্বল করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সাধক যখন তথাকার সমস্ত বস্তু পার্থিব পদার্থসমূহের ন্যায়ই স্থূলভাবে দর্শন করেন, তখন আর উহাদিগকে তিনি কোনরূপেই মিথ্যা, ভ্রম ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রভৃতি বলিতে সক্ষম হন না। ক্রমে ঐ সমস্ত দর্শন ও অনুভূতি স্থূলতর ও উজ্জ্বলতর হইয়া পার্থিব বস্তু সমূহকে সূর্য্যোদয়ে শশীকলার ন্যায় পরিম্লানপূর্ব্বক তাঁহার

মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। অবশেষে, যাহাকে পূর্ব্বে মিথ্যা মনে হইত তাহাই সাধকের নিকট একমাত্র সত্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট সত্যবস্তুকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে প্রতীতি করায়। (ক্রমশঃ)

—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

মাধুকরী

গ্রীণ-উইচ অবজারভেটরিতে বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া অনুমান করেন যে, আকাশে ১৬০০০০০০০০ একশত ষাটকোটী নক্ষত্র আছে। ইহার মধ্যে সাধারণ চক্ষে দেখা যায় তিন-চারি হাজার মাত্র। ফ্রাঙ্কলিন আডাম্‌স্ আকাশের ২০৬ খানি ফটো লইয়া দেখিয়াছেন, ৫৫০০০০০০ পাঁচ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ নক্ষত্র ছবিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় একটী হ্রদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার নাম মনো-লেক। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, উহাতে সোণা আছে। ঐ হ্রদে ৫০০০০০০০ টন জল আছে এবং প্রতি ১০০ টনে ৪০ ভাগ স্বর্ণরেণু মিশান আছে। অনুমান এই হ্রদে ২০০০০০০০০০ দুইশত কোটী পাউণ্ড দামের সোণা পাওয়া যাইতে পারে এবং বৎসরে ১০০ প্ল্যাণ্ট লইয়া কার্য্য করিলে ১০০০০০০ দশ লক্ষ পাউণ্ড দামের সোণা উঠিতে পারে।

শ্রীসনৎকুমার দত্ত 'প্রবাসী'তে লিখিতেছেন, "তাম্রমুদ্রার উপর রুদ্রাক্ষ স্থাপন করিয়া তদুপরি আর একটী তাম্রমুদ্রা স্থাপন করিলে সংঘর্ষণ (Friction) দ্বারা উৎপন্ন এক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাব হয়। এই পরীক্ষা ভল্‌টা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত Electrophorus নামক যন্ত্র

কর্ত্তৃক পরীক্ষার ন্যায়। আবার সঞ্চালনী শক্তি-বিশিষ্ট পদার্থ গাত্রের যে যে অংশ অধিক বহির্গত থাকে কিংবা যে যে অংশের ন্যুব্জতা তীক্ষ্ণ, সেই সেই অংশে বৈদ্যুতিক ঘনতা (Electric density) অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে ; এবং যে যে অংশের উত্তানতা অধিক সেই সেই অংশে অল্প পরিমাণে থাকে। বৈদ্যুতিক পদার্থের দ্বারা পূর্ণীকৃত একটী পদার্থের নিকটবর্ত্তী বায়ু-পরমাণু সকলও তাহার সংস্পর্শে আক্রান্ত হয় এবং প্রতিনিবৃত্তি (Repulsion) ভোগ করে। বায়ু-পরমাণু যত অধিক থাকে বৈদ্যুতিক ঘণতাও তত অধিক হয়। তীক্ষ্ণ ও বহির্গত অংশে ঘনতা অধিক থাকে এবং এই অংশে প্রতিনিবৃত্তিও অধিক। এই নিমিত্ত আক্রান্ত বায়ু-পরমাণু ঐ পদার্থের বৈদ্যুতিক আক্রমণের সহিত তাড়িত হয়। এই সকল তীক্ষ্ণ অংশের বায়ু-পরমাণু একটী পশ্চাদপসারী প্রতিঘাত (Backward Reaction) দান করে। এই প্রতিঘাতেই ঐ রুদ্রাক্ষ নিবৃত্ত বায়ু-প্রবাহের বিপরীত দিকে চালিত হয়। যদি ঐ সকল তীক্ষ্ণ অংশ মোম কিংবা এইরূপ অপর কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত করা যায় তবে ইহা আর ঘুরিবে না।"

জন্ম-বৃদ্ধির তুলনা দেখিয়া মনে হয় না, বঙ্গদেশে হিন্দু বলিয়া জাতির অস্তিত্ব আর বেশী দিন থাকিবে। হিন্দু-মুসলমান একত্রে বঙ্গদেশের কোন অঞ্চলে কত উৎপাদিকা শক্তি নিম্নে দেওয়া গেল—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে

পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে	১৮৩
মধ্যবঙ্গে	১৬০
পশ্চিমবঙ্গে	১৩৬

এক্ষণে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা—

পূর্ব্ববঙ্গে	৬৯·৯২
উত্তরবঙ্গে	৫৯·৮২
মধ্যবঙ্গে	৪৭·৩২
পশ্চিমবঙ্গে	১৩·৩৪

অতএব পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে জন্ম বৃদ্ধির হার হ্রাস হওয়ার অর্থ বঙ্গদেশে হিন্দুর অস্তিত্ব নাশের সম্ভাবনা ।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমাজ সেবক সম্মিলনীতে বলিয়াছেন, "স্বামী-বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'আমরা ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্ন জাতিদিগকে দিন দিন নিজেদের নিকট হইতে তফাৎ করিয়া দিতেছি, ফলে তারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। আর সমাজে যারা স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আছে, তারা উচ্চ সম্প্রদায়ের উপর খড়্গাহস্ত, আপনারা ত সকলেই জানেন যে, দেশের কার্য্যে দশের কার্য্যে দেশোন্নতির পবিত্র মঞ্চে সকলেরই সমান অধিকার; সকলেরই সমান প্রয়োজন—তবুও কেন মানুষ হইয়া মানুষকে মানুষের নিকট থেকে পৃথক্ করিয়া রাখার ব্যবস্থা?'

* * * *

"ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা দেশের কোনও কাজ করা যায় না, এ কথাটা নিছক মিথ্যা। পাড়াগাঁয়ের শিক্ষিত যুবকদের বর্ত্তমানে অন্যতম কর্ত্তব্য নিম্নশ্রেণী ও শ্রমিক যুবকদিগকে শিক্ষা দান করা। ৭ জন যুবক অনায়াসে একটী নৈশ বিদ্যালয় চালাইতে পারেন। প্রত্যেক সপ্তাহে ১ ঘণ্টা খাটিলেই যথেষ্ট। সপ্তাহে কি একঘণ্টা সময় পাওয়া যায় না?"

বঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক লেখাপড়ায় অগ্রসর হইয়াছে নিম্নের তুলনা-পত্রের সংখ্যা দেখিলে বুঝা যাইবে—

	মোট লিখন-পঠন ক্ষম		মোট ইংরেজী জানা	
জেলা	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
নদীয়া	৭৩১১৫	২১৭৭৬	২০২৩৫	২৭৬২
মুর্শিদাবাদ	৬২০৮১	২৫৪৯০	১৩২৭২	২৬৬০
যশোহর	৮১৫২৪	৪৯৫২৫	১৩৪৮৫	৩৩২৫
রাজসাহী	৩৭০২৫	৪২৪০২	৭৩১১	২৯১৬
দিনাজপুর	৫৫৯৫৩	৭৫৭৩৫	৬৫০৩	৩৬৭৯
রংপুর	৬৮১০৮	৭৪৮৬৬	৯৩৩৫	৫৭৮৯
বগুড়া	২৪৭৪৩	৬৪৫০১	৫৭৩৩	৬১৩৪

পাবনা	৫২৪২২	৩৮৩৭৯	১৩১৩০	৫৭৯৩
মালদহ	২৭২১৮	১৯০৪৪	৩৬০৮	১৮৮৬
ঢাকা	১৮৩৪১৯	৭৭৫১৩	৪২৮৪৭	১০৭৬৬
মৈমনসিংহ	১৪৫৫০৩	১০০২৯৯	৩০৮৩৫	১৪৪৯৬
ফরিদপুর	১২৫৯৪৭	৪৮১০৫	২৫৮৫৫	৫৫৯৩
বাখরগঞ্জ	১৬৪৭৭৫	১৩৩৭৫৫	২৪৮৫২	৬৪০৪
ত্রিপুরা	১২৪৫০৪	১১৪৪২১	২০৩৮০	১১৫৮৪
নোয়াখালী	৩৫৫৮১	৫৮৫৮৫	৭৫০৪	৫০৭০
চট্টগ্রাম	৬০৪৫৪	৪৯৫৯৭	১২৮১০	৫৫০৬

প্যারী নগরীর বিব্লিওতেক্ নাৎশিওনাল পুস্তকাগার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৯১০ খৃঃ উহাতে ৩৫০০০০০ লক্ষ পুস্তক ও ১২০০০০ হাজার পুঁথি ছিল। অপরে বলেন ব্লুমস্‌বেরী নগরীর মণ্টেন হাউসের ব্রিটিশ মিউজিয়াম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুস্তকাগার তাঞ্জোরে এবং বঙ্গদেশে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। বর্ত্তমানে উহাতে ২ লক্ষ পুস্তক ও ১৩৫০ পুঁথি আছে।

বর্ত্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গলার সমাজ-কারার কঠিন নিগড় ভঙ্গ করিয়া যেরূপ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, সেইরূপ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর একজন বাঙ্গালী অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্ম বাহিরে প্রচার করিয়া ভারতে এক অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। "প্রাচীন বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল রত্ন মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালী জাতির গৌরব। বিক্রমপুরের বৌদ্ধ নরপতি গোবিন্দ পালের রাজত্বকালে ৯৮০খৃঃ বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব নাম আদিনাথ ছিল। ইনি যোগ শিক্ষার্থ মহাত্মা ধর্ম্ম রক্ষিতের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন; অনন্তর ব্রহ্মদেশে গমন করিয়া ১২ বৎসর কাল মহাযোগী চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট যোগশিক্ষা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, এবং তদনন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক

রাজা ন্যায়পালের সময় বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ হন। তিব্বত রাজ হলানামাও তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিবার জন্য প্রভূত স্বর্ণ মুদ্রা ও একশত পরিচারক বিক্রমশীলায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তিনি যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় পরিচারকগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। হলা লামাওর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইতে সমর্থ হন। এই মহাপুরুষ ১০৩৮ খৃঃব্দেঃ ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বতে গমন করেন ও ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ তিব্বতে উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করেন। তেঙ্গুরেড় অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রন্থ অদ্যাপি তাঁহার অমর কীর্ত্তির পরিচয় দিয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত অসাধারণ পণ্ডিতও ঐ সময়ে মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং এই সময়ের বঙ্গ সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না। ইঁহার রচিত অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ ছিল, তাহার এক থানির নাম 'বজ্রাসন বজ্র-গীতি' একখানির নাম 'চর্য্যাগীতি' এবং অন্য একখানির নাম 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্ম্ম গীতিকা'।"

গ্রন্থ-পরিচয়

১। **মনুষ্যত্ব লাভ**—প্রণেতা শ্রীসত্যাশ্রয়ী, প্রকাশক অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন মিত্র, এম, এ, পি, আর, এস্, মূল্য দেড় টাকা। এই পুস্তকখানি বালক বালিকাদের নিত্যসঙ্গী হওয়া প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকতায়, উদারতায় এবং সরল ভাষায় ইহা কোমলমতি শিশুহৃদয় নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করিবে। ইহাতে নিত্য জীবনের শিক্ষা, সঙ্গ, খাদ্য আলোচিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রভাব শিশু হৃদয়ে কিরূপ কার্য্যকরী হইয়া প্রতিফলিত হইতে পারে এবং বুদ্ধ, যীশু, হজরত মহম্মদ,

কবীর, লুথার, নিত্যানন্দ, শালিগ্রাম, রামমোহন এবং বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষ চরিত্র জীবনকে কিরূপে আলোকিত করিতে পারে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাসের সহিত দেখান হইয়াছে।

২। শান্তি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মূল্য বার আনা। জগতের দুঃখের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া কবির মর্ম্মস্থল হইতে এই ছন্দের উৎস নির্গত হইয়াছে। জগতের প্রতি যাঁহার কিছুমাত্র সমবেদনা আছে তাঁহারা লেখকের "অত্যাচারী" এবং "জালিয়ানালা" পড়িয়া শান্তি লাভ করিবেন। সত্যই শ্রীভগবান বিবেকের মধ্য দিয়া অত্যাচারীকে সর্ব্বদাই সাবধান করিতেছেন,—

"কে আছ পাষণ্ড কোথা
দুর্ব্বলে করিতে দলন ?
জেনো আমি আছি সেথা
তোমারে করিতে দমন ॥
"অস্ত্র তব যত কিছু
দাগিবে বুকেতে আমার ?
দাগো তুমি—ফিরে যাবে—
আঘাত লাগিবে তোমার !!"

কিন্তু অত্যাচারীর কর্ণে সে বিবেক বাণী ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। তাহারা বুঝে না কত লোকের "কোন্ দুঃখ জাগে আজ ; হাজার হাজার বুকচেরা ধন, নিহত সম্মুখে হানিয়াছে বুকে বাজ।" কিন্তু "দিও নাক অভিশাপ—

"জালিয়ানালা ! জালিয়ানালা !
করিও নির্ভর মহান দেবতা প'রে ;
সুবিচার জেনো হবে গো নিশ্চয়—
জাগিবে নিশ্চয়—জীবন লভিবে মরে।"

৩। সাধনা (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ)—লেখক শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—প্রকাশক, শরৎ-সাহিত্য-কুঞ্জ, ৮নং রাধামাধব গোস্বামী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। লেখক সুসংস্কৃত ভাষায়

স্বামিজীর চরিত ও কথার আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় তিনি কে, তাঁহার সহিত তাঁহার গুরুর সম্বন্ধ কি? কেন তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের তথা ধর্ম্মের যুগ-নায়ক? তাঁহাদের সহিত সাধারণের সম্বন্ধ কি? লেখক তর্কের দ্বারা নিজ মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পান নাই—তিনি আচার্য্যের বাক্যগুলি—যাহার গতি straight and direct যে সকল কথার মধ্যে via media বলিয়া কোনও অবকাশ নাই, পাঠকের অতি বড় কঠিন হৃদয়কেও বিস্ফোরণের ন্যায় যাহা আঘাত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়—সাধারণের সমক্ষে সাজাইয়া ধরিয়া তাঁহার মহামানবত্ব, তাঁহার আচার্য্যত্ব সম্বন্ধে পর পর স্থির সিদ্ধান্তগুলি রচিয়া গিয়াছেন।

৪। গুরু—শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ লিখিত। তাঁহার একখানি সুন্দর চিত্র সম্বলিত। মূল্য দুই আনা। প্রকাশক শ্রীপরেশনাথ সেন, ৭৮।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পুরাতন পাক্ষিক পঞ্চম বর্ষের "উদ্বোধন" হইতে শ্রীশ্রীমহারাজের 'গুরু' শীর্ষক অমূল্য প্রবন্ধ সাধারণের অবগতির জন্য পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ নামক একখানি চিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে ঠাকুর, মা, স্বামিজী ও তাঁহাদের অপরাপর অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের হাফ্‌টোন প্রতিকৃতি মোটা আর্ট কাগজে ছাপা। মূল্য চারি আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান (১) উদ্বোধন কার্য্যালয়, (২) অদ্বৈত আশ্রম, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট এবং (৩) বিবেকানন্দ সোসাইটী, ৭৮।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

সঙ্ঘ-বার্ত্তা

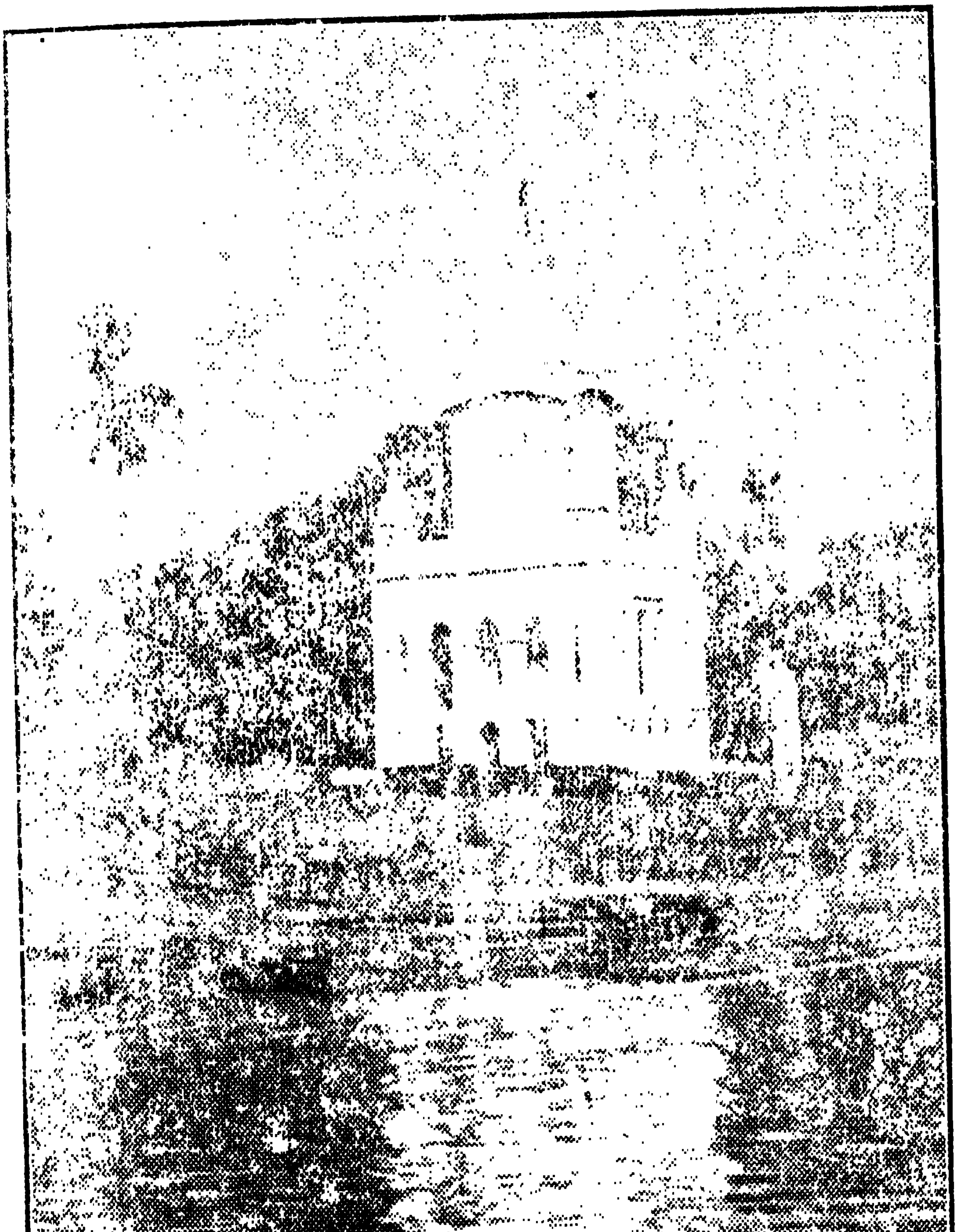

বেলুড় মঠে শ্রীবিবেকানন্দের ওঁকার-মন্দির

প্রতিষ্ঠিত—সোমবার, ১৪ই মাঘ (১৩৩০), ২৮শে জানুয়ারী (১৯২৪)

১। বিগত ২৪শে মাঘ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব দিবসে বেলুড়মঠে তাঁহার কার-মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে প্রায় ৫০০০ সহস্র দরিদ্র ও

ভক্তনারায়ণ প্রসাদ প্রাপ্ত হন। স্বামিজীর শুভ জন্মদিবসকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, ট্রিভেনড্রাম, কায়ালালুমপুর, রেঙ্গুন, ঢাকা, গৌহাটি, শ্রীহট্ট, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সম্বলপুর, কটক, ভুবনেশ্বর, দেওঘর, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, হরিদ্বার, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের বহু পল্লী জনপদে আমাদের শাখাকেন্দ্রে এবং ভক্তমণ্ডলীদের স্ব স্ব গৃহে পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

২। বিগত ২৪শে মাঘ বেলুড়মঠে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব এবং ঐদিবস তাঁহার মন্দির ও মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে প্রায় ২০০০ সহস্র ভক্ত প্রসাদ পান।

৩। বিগত ১৭ই পৌষ বেলুড়মঠে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

৪। বিগত ২৭শে পৌষ, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব উদ্বোধন মঠে সম্পন্ন হয়।

৫। স্বামী বোধানন্দজীর কলিকাতা-অভিনন্দনের পর তিনি সেখানকার নানা সমিতিতে ধর্ম্মালোচনাদি করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের পাটনা মঠে গমন করেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা ও বক্তৃতার দ্বারা তত্রস্থ জনসাধারণের ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করেন। কয়েকদিবস পূর্ব্বে বারাসতে মুচিদের একটী সম্মেলনী হয়, তিনি সেখানে গিয়া তাহাদের ধর্ম্মোপদেশ ও বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন। তিনি শীঘ্রই রেঙ্গুনে জনসাধারণের নিকট ধর্ম্মালোচনার জন্য গমন করিবেন।

৬। বিগত ১৫ই পৌষ, কটকের শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঊনবিংশ কল্পতরু উৎসব হইয়া গিয়াছে।

৭। বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বয়ণ-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক ছাত্রাবাসে এখনও চারি জন বালককে লওয়া হইবে। যাঁহারা নিজ পরিচিত বালকগণকে বয়ণ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে চাহেন তাঁহারা উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখুন।

৮। আগামী ২৪শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ শুক্রবার শুক্লা দ্বিতীয়া দিবসে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজা এবং ২৬শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ রবিবার জন্মোৎসব। সমগ্র দেশবাসী এই নবযুগারম্ভ-দিবসে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া ও প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ও স্বস্ব স্থানে তাঁহার পূজা ও বার্ত্তা আলোচনায় ধন্য হইবেন।

অবতার-তত্ত্ব

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএবচ কর্ম্মণি ॥"

'হে পার্থ, আমার ত্রিলোকে কোন কর্ত্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও কিছু নাই, কিন্তু তথাপি আমি কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছি'। ইহা স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি। আমরা মানব জাতি, কখন ত বিনা প্রয়োজনে একটু নড়িতেও চাহি না। কিন্তু ভগবান কেন কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও চিরদিন কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছেন? বেদান্তকার ইহার উত্তর দিয়াছেন "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। এই সৃষ্টি ভগবানের লীলার স্থান; লীলার জন্যই তাঁহা হইতে এই জগৎ সংসার বহির্গত হইয়াছে। লীলাতেই সৃষ্টি, লীলাতেই স্থিতি আবার লীলাতেই লয়।

আর এক দিক দিয়াও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা যায়। ভগবান অপার করুণার আধার। প্রাণিনিবহের প্রতি পদক্ষেপ এমন কি প্রতি নিঃশ্বাসে পর্য্যন্ত করুণাঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবানের অপার করুণার অদ্ভুত প্রকাশ। আর জীব জগতের প্রতি এই অদ্ভুত করুণাই জগতপিতাকে চিরদিনের জন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। তিনি এ জগতের স্নেহ-দাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা। তাই মানবের ও মানবেতর প্রাণিনিবহের দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলে। তাই তাঁর বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

সুতরাং আমরা যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, ইহা বেশ বুঝিতে পারা

যাইতেছে লীলাময়, করুণাঘনমূর্ত্তি ভগবান চিরদিনের জন্য জীব জগতের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত রহিয়াছেন। জগতের বিভিন্ন প্রয়োজনানুসারে তাহাকে অবশ্যই বিভিন্নভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। অবশ্য ইহা মানব সাধারণের ন্যায় কঠোর কর্ত্তব্যের প্রেরণা নহে কিন্তু এক কথায় বলিতে গেলে, হয় বলিতে হইবে ইহা 'অপার প্রেমের প্রেরণা' আর না হয় বলিতে হইবে 'লীলা'। তাই আমরা দেখিতে পাই যুগে যুগে শ্রীভগবান যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্য ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন ও মানবের বহু কষ্টের বোঝা নাবাইয়া দিয়া তাহাকে চিরশান্তি দান করেন। তখনই আমরা তাঁহাকে 'অবতার' এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবান নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ ও মুক্ত-স্বভাব। তাঁহাতে কোন বন্ধন নাই অথবা সসীমতার লেশ পর্য্যন্তও নাই; সুতরাং তিনি কেমন করিয়া সামান্য মানবদেহে বিরাজ করিতে পারেন? তিনি স্রষ্টা আর মানব সৃষ্ট। এই উভয় ত কখনও এক হইতে পারে না। ইহার উত্তর স্বরূপ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উক্তিটীর উল্লেখ করিতে পারি। 'শ্রীভগবান নিরাকার, যেমন জল; কিন্তু ভক্তিহিমে মাঝে মাঝে জল জমে বরফ হয়ে গেছে। জলের কোনও আকার নাই কিন্তু বরফের আকার আছে।' সুতরাং নিত্যশুদ্ধ ইত্যাদি উপাধি প্রদান করিলেও শ্রীভগবান সাকার ও সগুণতার অবলম্বন করিতে পারেন না ইহা বলা চলে না।

হিন্দু জাতির অবতার সম্বন্ধীয় এই মতবাদ এক দিনকার জিনিষ নহে। ইতিহাস যে কালের কোনও খবর রাখে না সেই অতি প্রাচীনকালের হিন্দু-সাহিত্য বেদ বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণ প্রভৃতিতে আমরা এই ভাবের বীজ ও বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণতি দেখিতে পাই। বেদ ও উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় "সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বর এক, মানবের মধ্যে গুরুশক্তিরূপে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ। সেই জন্য গুরুকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা করিতে হইবে।" পরবর্ত্তী কালে সাংখ্যকার কপিল নিত্য-ঈশ্বরের

অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাধক যখন আপন সাধনবলে ধর্ম্মরাজ্যে বহু অগ্রসর হইয়া অবশেষে মুক্তিপদে আরূঢ় হইতে বসেন তখনই তাঁহার মধ্যে লোক কল্যাণ সাধনের প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। এবং নিজ সাধন শক্তির সূক্ষ্ম প্রেরণা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রভাবে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তির সহিত নিজ অভেদত্ব অনুভব করিয়া একটী কল্পের জন্য ঈশ্বর নামধেয় পদবীতে আরূঢ় ও জগতের নিয়ামকরূপে পরিগণিত হন।

অতঃপর বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন উক্ত সিদ্ধ পুরুষগণ নির্ব্বাণমুক্তি লাভের পরও লোককল্যাণ সাধনরূপ শুদ্ধ সংস্কারবলে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করতঃ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। সাংখ্যোক্ত মতবাদের সহিত ইহার এইটুকু পার্থক্য যে বেদান্ত মতে উক্ত সিদ্ধ বা আধিকারিক পুরুষগণ সর্ব্বশক্তিমান নহেন এই পর্য্যন্ত।

এইরূপে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ, সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে মতবাদ ও লোক কল্যাণকারী সিদ্ধপুরুষগণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে অবতার সম্বন্ধীয় মতবাদের যে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে তাহার বীজ ও বীজ হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান অবস্থা এই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। অতঃপর আমরা পৌরাণিক যুগে উপস্থিত হইয়া দেখি যে শ্রীভগবান কেবল আর সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা নহেন। অথবা একটী কল্পের নিয়ামক আধিকারিক পুরুষবিশেষও নহেন কিন্তু তিনিই আবার মানব সমাজের দুঃখদৈন্যহারী যুগে যুগে অবতীর্ণ দেবমানব। বেদান্তের লোককল্যাণকারী সিদ্ধপুরুষ বা সাংখ্যের কল্প-নিয়ামক ঈশ্বর অথবা বেদোপনিষদের—সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ভগবান ইহাদের এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিতে পাই আমরা পৌরাণিক যুগে। দেখিতে পাই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মসমুদ্রে লীলার বা করুণার মৃদুহিল্লোল উত্থিত হইয়া উহা ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর তরঙ্গাকারে পরিণত হইল। নির্গুণে সগুণের অধ্যাস হইল। অথবা নিরাকার জলরাশি সাকার বরফরূপে পরিণত হইল। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ঈশ্বর

কেবল সৃষ্টি প্রভৃতিতেই সন্তুষ্ট রহিলেন না ; ক্রমশঃ যুগে যুগে অবতরণ করিয়া ধরাভার হরণের ভার পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। গীতোক্ত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীতে উপরোক্ত সামঞ্জস্যটী বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।"

"আমি যদিও অজ অব্যয়াত্মা ও ভূত নিবহের ঈশ্বর তথাপি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।" পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা, আবার অজ ও অব্যয়াত্মা ঈশ্বর ও লোককল্যাণ সাধনকারী সিদ্ধপুরুষ এইস্থলে একাধারে বর্ত্তমান। আর যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিতে পাইব। এই অভয় বাণীতে আমরা শুনিতে পাইলাম—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এইরূপে হিন্দুদিগের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনার ফলে কিরূপে অবতারবাদ ক্রমশঃ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা বেশ বুঝা যায়।

এখন আর একদিক দিয়া আমরা কথাটীর আলোচনা করিব। অবতারপুরুষ মাত্রের জীবনালোচনার ফলে দৃষ্ট হয় যেন তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত জাতি বা জাতি নিবহের অন্তঃপ্রবৃষ্ট ও সুদীর্ঘ-কালপোষিত (কিন্তু কালবশে অপ্রকাশোন্মুখ বা লুপ্তপ্রায়) ভাবরাশি প্রকাশোন্মুখ ও জমাট বাঁধা হইয়া সেই অবতার নামধেয় পুরুষ প্রবররূপে পরিণত হয়। আর সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠকেই আমরা মানব-দেহধারী ঈশ্বর-রূপে কল্পনা ও দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া থাকি। ইহার কারণ কি? দেখিতে পাই মানব যখন আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় অসীম সাহসভরে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া নিজ সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্যের পূর্ণ-প্রয়োগেও নিজ অভীষ্টের সন্ধান পায় না, যখন সে পুনঃ পুনঃ অকৃত-কার্য্যতার প্রবল প্রতিঘাতে হতোদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ে আর চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের ছায়া দেখিয়া বসিয়া পড়ে—

তখনই এক অপূর্ব্ব দেবমানব তাহার সম্মুখে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়া দেন। তাঁহার অপার করুণায় তাহার সমস্ত অজ্ঞানরাশি দূরীভূত হইয়া যায়। বহুদিনের জটিল সমস্যা-সমূহের অপূর্ব্ব সমাধান সে সেই পুরুষপ্রবরের জীবনে প্রকটিত দেখিয়া তাঁহারই পদে আত্মসমর্পণ করে। কে এই অপূর্ব্ব পুরুষ? কোথা হইতেই বা তাঁহার উৎপত্তি? মুগ্ধ মানব তাহা বুঝিতে পারে না। সে জানে না, নিজ অন্তরতম প্রদেশে পুনঃ পুনঃ প্রবল আঘাতের ফলে তাহারই নিজ অন্তস্থিত দেবভাব উদ্বুদ্ধ ও ঘনীভূত হইয়া তাহার সম্মুখে বিরাজমান! তাহারই অন্তরাত্মা তাহার সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। সত্যসত্যই আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর নাম দিয়া থাকি তাহা মানবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন পদার্থ কিছু নহে। মানব নিজেকেই নিজের স্বরূপ হইতে ভিন্ন কল্পনা করতঃ তাহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। মানব নিজেই আপনার গুরু, নিজেই নিজ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে।

ব্যষ্টি মানবের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল সমষ্টির পক্ষেও ঠিক তাহাই। কারণ সমষ্টি ব্যষ্টিরই একত্রীভূত অবস্থা। আবার সমষ্টির অংশ ব্যষ্টি। সুতরাং উভয়ের ধর্ম্মে সাদৃশ্য থাকা খুব সম্ভব। দেখিতে পাওয়া যায় কোন একটী বিশেষ অভাব যখন উপস্থিত হয় তখন উহা যে একজনের নিকট উপস্থিত হয় তাহা নহে কিন্তু কোন না কোন আকারে প্রত্যেক মানবেই সেই অভাব দৃষ্টি গোচর হয়। সেই অভাবের চরম অবস্থায় মানব সেই বস্তুটীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তাহাদের সেই ব্যাকুলতা ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। কিন্তু সে অভাবের পরিপূরণ যে কিরূপে হইবে তাহারা খুজিয়া পায় না। নানা চিন্তা নানা ভাবনায় দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। এমন কি অনেক সময় নিজ নিজ অভাবের প্রকৃত স্বরূপ পর্য্যন্ত তাহারা জানিতে পারে না। কেবল কি এক জিনিষের জন্য যেন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অবশেষে একদিন দিন ফিরিয়া যায়। তাহাদের এতদিনের অস্ফুট ভাবরাশি যেন ঘনীভূত ও স্পষ্টীকৃত হইয়া কোন এক মানব-বিশেষরূপে মানবের নয়ন-সমক্ষে উপনীত হয়। আর সেই মানবের মধ্যে তাহারা তাহাদের

পূর্ব্বতন ভাবরাশির অদ্ভুত সামঞ্জস্য ও সুমীমাংসা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় ও তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করে। মানব সমাজের উদ্ধার-কর্ত্তা জননায়কগণ এইরূপেই ধরাধামে আগমন করেন। এইরূপেই অবতার-প্রথিত পুরুষগণের সৃষ্টি। আর প্রকৃতপক্ষে মানব-সমাজই তাঁহার উৎপত্তির হেতু; এক হিসাবে মানবসমাজই অবতার ও মহাপুরুষ-গণের সৃষ্টিকর্ত্তা। অবশ্য মানব তাহা জানে না। সে জানে না তাহারই অন্তস্থিত ভাবরাশি—যাহার কোনও মর্ম্ম সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তাহাই ঘনীভূত ও সুস্পষ্টরূপে তাহার সম্মুখে কোনও বিশেষ বিগ্রহাবলম্বনে উপস্থিত। ইহাই অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবনের প্রকৃত ব্যাখ্যা। ইহাকেই নানা ব্যক্তি নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

এখন আমরা দেখিব ধর্ম্মগুরু অবতারগণ সমাজের বা জাতির কোন্ কোন্ অবস্থায় কি ভাবে ধরাধামে উপনীত হইয়া থাকেন। কোন জাতির মধ্যে কেনই বা তাহাদের অধিক আবির্ভাব হইয়াছে। সম্রাট কোনও এক বিশেষ স্থানে বাস করিয়া নিজ রাজ্যশাসন করেন বটে কিন্তু শাসন সংক্রান্ত প্রয়োজন-বিশেষ সিদ্ধির জন্য কখন কখন তাঁহারা সেইস্থল পরিত্যাগ করিয়া নিজ রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সৃষ্টির নিয়ন্তা শ্রীভগবান সম্বন্ধেও যেন ঠিক তাহাই। কারণ, দেখিতে পাই যখনই অধর্ম্মের নাশ ও ধর্ম্মস্থাপনের প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখনই তিনি ধরাধামে স্বয়ং অবতরণ করিয়া শান্তির অমৃতবারি সিঞ্চন করিয়া থাকেন। আর তাঁহাদের এই আবির্ভাব ধর্ম্মপ্রাণ জাতিসমূহের মধ্যেই হইয়া থাকে। আবার এই সব জাতির মধ্যেও হিন্দুজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ তাই ঐ জাতির মধ্যেই অবতার পুরুষদিগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবের কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই একটী বিশেষত্ব বিদ্যমান যাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সেই জাতি বাঁচিয়া আছে। উহার উন্নতিতে জাতির উন্নতি, অধঃপতনে অধঃপতন। আর হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনের এই বিশেষত্ব ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা। যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই জাতির ধমনীতে ধর্ম্মের স্রোত সমানভাবে বহিয়া আসিয়াছে—আর

এই ধর্ম্ম-স্রোতই উহাকে অমর-পদবীতে আরূঢ় করাইয়াছে। এই স্রোত যখন কোনপ্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় বা মন্দগতিতে প্রবাহিত হয় তখনই উহাকে সর্ব্বপ্রকার বাধা-মুক্ত করিয়া আপন গন্তব্যপথে প্রবলবেগে চালিত করিবার জন্য এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহার চেষ্টায় ক্ষীণপ্রায় ধর্ম্মস্রোত সহস্রগুণে বেগবান হইয়া প্রবল বন্যার ন্যায় লক্ষ লক্ষ নরনারীকে এক অজানা দেশের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। উক্ত মহাপুরুষকেই আমরা জীবদুঃখে কাতর জগতপিতার মূর্ত্ত্য বিগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি।

অতি প্রাচীনকালে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতিতে এই ভারতভূমি পাশবিকতার লীলাভূমিরূপে পরিণত হইতেছিল তখনই ক্ষাত্রশক্তির সগর্ব্ব অভ্যুত্থান—ভারত-গীতারূপ সিংহনাদকারী দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা এক দেব-মানবের পবিত্র পদস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। যাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন "কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং।" তারপর আবার লুপ্তপ্রায়, অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ডবহুল, বেদান্ত ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া জগতে শান্তি ও সত্যের বাণী প্রচার করিতে শ্রীভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎপ্রচারিত ধর্ম্মেরও একদিন সম্পূর্ণ অধঃপতন হইল। আবার সেই অধঃপতিত ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধনের জন্য শঙ্কররূপী ভগবান্ বেদান্তের গম্ভীর নিনাদে ভারত-ভারতীর মোহ-তমসা দূরীভূত করিলেন। এইরূপে যুগে যুগে যুগাবতারদিগের পবিত্র পদস্পর্শে এই ভারতভূমি তীর্থ-ভূমি রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবলতরঙ্গ একবার বহু উচ্চে উঠে তার পর আবার বহুনীচে পড়িয়া যায়। তারপর আবার দ্বিগুণ বেগে উত্থিত হয়। হিন্দুজাতিরূপ মহান সমুদ্রে ধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ এইরূপ বহুবার উঠিয়াছে বহুবার পড়িয়াছে। অল্পদিন মাত্র অতীত হইল এইরূপ এক ভয়ানক পতনের ফলে ভারতগগন নিরাশার ঘন-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই গাঢ় তিমিরাবণ অপসারিত করিয়া, ভারতে ও জগতে ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিবার জন্য আবার যে মহাপুরুষ ভারতের এক প্রান্তে বাঙ্গালার এক দীন কুটীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই মুষ্টিমেয় কয়েকটী

দিন অতীত হইতে না হইতেই সত্য সত্যই সমগ্র ভারত এবং শুধু ভারত কেন সমগ্র জগৎ তাঁহার পবিত্র আলোক স্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিত জগৎ সে আলোক পাইয়া পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। আর 'জয় গুরু মহারাজ' রবে দিগ্দেশ কম্পিত করিয়া দ্রুতপদে আপন লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে।

হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্ব্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের আহ্বান করিতেছি, গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি, লুপ্তপন্থা পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট-পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।

—ব্রহ্মচারী ঈশান চৈতন্য

নির্ব্বাণ

পরিণাম যাহা সাধুদের,
ভূমানন্দ তাঁ'দের মনের,
কাম্যমাত্র যাহাতে বিগত,
অন্তঃশক্তি যা'তে লুক্কায়িত;
—বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন
শান্তাত্মার অবস্থা নির্ব্বাণ।
ভোগ্য মাত্র কিছু নাহি চায়,
ধীর স্থির নিজের ইচ্ছায়,
কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির
নির্ব্বাপিত অগ্নি রিপুদের;

—বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন
অনুভূতি মধুর নির্ব্বাণ।
প্রলোভনে অবিক্লব প্রাণ,
পরীক্ষাতে বিজিত না হন,
সুখ দুঃখ জানি মায়াময়
আত্মাতে সতত শান্ত রয় ;
—বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন
রিপুর উপরতি নির্ব্বাণ।
পরাবিদ্যা প্রদীপ্ত ঐ জ্ঞান,
উন্মীলিত তৃতীয় দর্শন,
ব্রহ্মাত্মায় একীভূত প্রাণ
বারিবিন্দু বারিধিতে যেন ;
—বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন
নিজাত্মার সমাধি নির্ব্বাণ।
আকাঙ্ক্ষা আত্মার বিসর্জ্জন,
কর্ম্মমাত্র তাঁহায় অর্পণ,
সর্ব্বজীবেহিত নিষ্ঠ-মন,
সকলেতে সন্নিবদ্ধ প্রেম ;
—বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন
সাধুর ঐ অবস্থা নির্ব্বাণ।
মৃত্যু যদি নহে অবসান,
পুনঃ পুনঃ জন্মে অভিমান,
বিশ্বাত্মায় আত্মার প্রবেশ
ছিন্ন করে জন্মমৃত্যু পাশ ;
—বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন
আত্মার বাঞ্ছিত ঐ নির্ব্বাণ।
নদী ঐ সাগরে ডেকে কয়
ওরা যেন প্রেমে মিশে রয় ;

সসীম অসীমে ডুবে থাক ;
মানবাত্মা বিশ্বাত্মায় যাক ;
—বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন
সাধকের ভাব ঐ নির্ব্বাণ।
আমি কি, ঐ থাকি বা কোথায় ?
প্রশ্নের উত্তর যবে পায়,
আমির স্বাতন্ত্র্য ঘুচে যায়,
আমিরে ঐ তাঁহায় হারায় ;
—বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন
ভকতের ভাব ঐ নির্ব্বাণ।
সদাত্মায় বিলীন হওয়া
নিজেরে না হারিয়ে যাওয়া
নিজেরেই খুঁজিয়ে পাওয়া,
ঘুচিলে ঢেকেছিল যে মায়া,
—বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন
অংশের পূর্ণত্বে ঐ নির্ব্বাণ।
যবনিকা তুলিয়া যখন
ইষ্টদেবে করিতে দর্শন
আত্মরূপে হেরিয়া সেথায়
বিস্ময়ে আনন্দ পূর্ণ হয়
—বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন
শুহ্য জ্ঞানামোদ ঐ নির্ব্বাণ।
বহিঃ হতে আত্মা যবে কয়,
'দেহ যেতে ভিতরে তোমায়',
কক্ষের অর্গল খুলে যায়,
দুয়ে একে পরিণত হয় ;
—বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন
অদ্ভুত ঐ সাযুজ্য নির্ব্বাণ

মৃত্যুতে মানুষ আপনিই
সসীম যে যায় সসীমেই
কিন্তু যদি পশে সে ইচ্ছায়
বিশ্বাত্মায়, পশে অসীমেই ;
—বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন
ইহার সংজ্ঞায় ঐ নির্ব্বাণ।
আত্মা যে শরীরে অপিহিত
অনাদি অনন্ত অখণ্ডিত,
তাহাই ঐ মানুষ প্রকৃত,
ব্রাহ্মাত্মায় হবে প্রত্যাগত ;
—বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন
হেন জ্ঞানোদয় ঐ নির্ব্বাণ।
ব্রহ্মাত্মায় পুরাণ সম্বন্ধ
অভিজ্ঞানে মুক্ত পাপবন্ধ,
তন্ময় তদাত্মভাব যুত,
"আমি সেই" আনন্দে আপ্লুত,
—বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন,
"আমি নাই" ভাব ঐ নির্ব্বাণ।
সাধক সাধিতে লুপ্ত হয়,
তবুও সজ্ঞানে তাঁয় রয় ;
আত্মজ্ঞানে জীবমুক্ত হয়,
জীবনের ব্রত সিদ্ধ যায় ;
—বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন,
নিজের অভিজ্ঞান নির্ব্বাণ।
মনীষিরা পুরাণ কালের,
অদ্ভুত অধ্যাত্ম জ্ঞান-পর,
জানিতেন অর্থ নির্ব্বাণের,
জ্ঞাত নহে যাহা আমাদের ;
পরমাত্ম জ্ঞানে হীন যারা
নাহি জানে নির্ব্বাণ কি তারা।

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কাব্য-রত্ন, দর্শন-শাস্ত্রী

বৈদিক অধিকারী-রহস্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেহ কেহ বলেন, বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন ; সেই হেতু শূদ্র হইলেও, তাঁহাদের ব্রাহ্মণ জন্মের জ্ঞান অনিবার্য্য হওয়ায় মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ শূদ্র জন্মে ওরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রকৃতপক্ষে এটা কিন্তু সম্পূর্ণই ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় "যেমন জলায়কা তৃণান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, তদ্রূপ জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে—তদ্ যথা তৃণ জলায়কা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্র-ম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গমযিত্বান্য মাক্রমমাক্র ম্যাত্মান-মুপ সংহরতি" আবার ভগবানও বলিয়াছেন—"জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সে সর্ব্বদা তদ্ভাব ভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে—যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় যদা তদ্‌ভাব ভাবিতঃ॥" সুতরাং বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধের ব্রাহ্মণ জন্মের জ্ঞান অবিচ্ছিন্ন ভাবে শূদ্র জন্মে হওয়া শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রামাণিক অর্থাৎ বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ হইলেও মৃত্যুকালে শূদ্রোচিত কর্ম্মাশয়ের প্রাবল্য হেতু শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হওয়ায় তখন আর ব্রাহ্মণ্যভাবের সম্পর্ক বা লেশমাত্র ছিল না ; আবার যখন সম্পূর্ণরূপে শূদ্রভাবাপন্ন হইলেও তজ্জন্মেই ব্রাহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তখন অবশ্য শূদ্র জন্মেই ব্রাহ্মণ্যভাবের প্রাবল্যহেতু মুক্তিলাভ করিয়াছলেন বুঝিতে হইবে। অতএব, কর্ম্মাশয় যখন আদৌ সামাজিক বর্ণভেদের অপেক্ষা করে না, তখন অবশ্য "শূদ্রজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, অথবা ব্রাহ্মণ জন্মে লাভ করা যায়" এরূপ বলিলে তাহা ভুলই—আরও, জীবের আদি ও অন্ত, অব্যক্ত বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। তাই ভগবান্

বলিয়াছেন—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।" সুতরাং বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিলে তাহা সাহস ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফল কথা, যখন দেবতা হইতে কীট পতঙ্গ—এমন কি, স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সদসৎ কর্ম্মগুণে উচ্চনীচ যোনিতে গমন করিয়া থাকে, তখন আর শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে; কাজেই শূদ্রজন্মের জ্ঞান ব্রাহ্মণ জন্মে ঐরূপ অনিবার্য্য হইলে আর উপরি-উক্ত আপত্তির কোনই প্রামাণ্য থাকে না। বাস্তবিক, কর্ম্মাশয় অর্থাৎ গুণকর্ম্ম আদৌ দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা করে না। তাহা কোন্ সময় কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় কোন্ ফল দিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই ভগবান বলিয়াছেন—"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ" কর্ম্মের গতি বা প্রভাব অতীব গহন। আমরা যে এইমাত্র অতি উচ্চবর্ণের মধ্যেও অসদ্ভাবাপন্ন এবং অতি নীচ বর্ণের মধ্যেও সদ্‌গুণশালী ব্যক্তির পরিচয় পাইলাম, তাহার কারণ কি? তাহার কারণই—কর্ম্মাশয়। কর্ম্মাশয় দ্বিবিধ—দৃষ্টজন্ম বেদনীয় ও অদৃষ্টজন্ম বেদনীয়;—"কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টজন্ম বেদনীয়োঽদৃষ্টজন্ম বেদনীয় শ্চেতি দ্বিধা।" বর্ত্তমান দেহের কর্ম্ম যদি তদ্দেহেই ফলবান্ হয়, তবে তাহা দৃষ্টজন্ম বেদনীয় এবং দেহান্তরে ফলবান্ হইলে তাহা অদৃষ্টজন্ম বেদনীয়;—"যেন দেহেন কর্ম্ম কৃতং তদ্দেহে চেৎ তদ্বিপাকঃ তর্হি স দৃষ্টজন্ম বেদনীয়ঃ; জন্মান্তর কৃত কর্ম্মণঃ ফলং অদৃষ্ট-জন্ম বেদনীয়ম্।" এই কর্ম্মাশয় প্রভাবেই বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ নারদ ও সত্যকাম; ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তদ্দেহেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন; আবার কত শত সহস্র যোগী এই কর্ম্মাশয় প্রভাবেই যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইহার গতি বা প্রভাব বাস্তবিকই অতীব গহন। অতএব, শুভাশুভ কর্ম্মাশয় যখন আদৌ বর্ণভেদের অপেক্ষা করে না, এবং কর্ম্মক্ষয় হেতু পরম কল্যাণকর বৈরাগ্য নামক আশয় উদিত হইলে যখন স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তখন আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে বর্ণাদি অধিকারী-ভেদের কারণ নহে, আর সেই জন্যই পরম তত্ত্বদর্শী ঋষিরা বক্ষ্যমাণরূপে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী স্থির করিয়াছেন—যে ব্যক্তির চিত্ত

শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, বহিরিন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, কাম ক্রোধাদি মনোদোষ সকল দূরীভূত হইয়াছে, যথোক্ত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং আপনাতে সদ্‌গুণ চতুষ্টয় আধান করিয়াছে, এমন ব্যক্তি যদি অনুগত হয়, তবে তাহাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা অবশ্য প্রদান করিবে ; "প্রশান্ত চিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে। গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে ॥" বাস্তবিক জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে যদি উপনয়ন ও বর্ণাদি অধিকারী-ভেদের কারণ হইত তাহা হইলে পরম তত্ত্বদর্শী ঋষিরা কখনই গুণ উল্লেখ করিয়া উক্ত বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তির কথা না বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ন্যায় বর্ণোল্লেখই করিতেন। অতএব, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে গুণই অধিকারী ভেদের কারণ ; আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে।

বাস্তবিক, উপনয়ন ও বর্ণভেদাদি কেবল কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে—জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের জন্য নহে। কারণ, পরমতত্ত্বদর্শী ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম দ্বারা মানব-জীবন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তদুপযোগী গ্রন্থ-চতুষ্টয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর জন্য সংহিতা, গৃহীর জন্য ব্রাহ্মণ, বাণপ্রস্থীর জন্য আরণ্যক ও সন্ন্যাসীর জন্য উপনিষদের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই মূলভাব ভিন্ন জীবের অন্যভাব না থাকায়, বেদকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুই কাণ্ডে বিভক্ত করিয়া সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্‌কে জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে অর্পণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ব্যবহারিক হিত এবং জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা পারমার্থিক হিতসাধন করিয়াছেন। সুতরাং যাহা পারমার্থিক সৎ তাহাই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া, কেবল পারমার্থিক কারণ গুণই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে অধিকারী-ভেদের কারণ ; আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তবে ব্যবহারিক হিতার্থে উপদিষ্ট হইলেও, গুণই সত্যতঃ অধিকারী ভেদের কারণ বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ গুণকেও কারণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারিক নিয়মাদির বাহিরে অর্থাৎ অরণ্যে পঠিত এবং একমাত্র বিগত প্রবৃত্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্যই ব্যবস্থাপিত

হওয়ায় পারমার্থিক হিতোপদেষ্টা জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ তাহা বলিবেন কেন ? আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ কেবল সংসার ত্যাগী অরণ্যাশ্রয়ীদের আলোচ্য বিষয় বলিয়াই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের একটী সার্থক নাম আছে 'আরণ্যক'। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহীভূত্বা বনীভবেৎ, বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ।" -ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে, গার্হস্থ্যান্তে বাণপ্রস্থী হইবে, বাণপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা করিবে।

এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে শ্রুতি যখন ক্রমান্বয় আশ্রমত্রয়ের কার্য্যে শেষে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন, তখন আর "বৈরাগ্য ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে না" বলা যায় না। তদুত্তর এই যে, যদিও শ্রুতি ক্রমান্বয় আশ্রমত্রয়ের কার্য্যশেষে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন বটে, তথাপি কিন্তু বৈরাগ্য ব্যতীত কাহারও প্রব্রজ্যা গ্রহণের অধিকার নাই। তাই শ্রুতি "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" যদি ব্রহ্মচর্য্যকালে বৈরাগ্য জন্মে, তবে তদবস্থাতেই প্রব্রজ্যা করিবে; অথবা গার্হস্থ্য হইতে কিম্বা বাণপ্রস্থ হইতে প্রব্রজিত হইবে" ইত্যাদি বাক্যে বাণপ্রস্থীকেও বৈরাগ্য জন্মিলে তবে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন। বাস্তবিক, বৈরাগ্য জন্মিলে "উপরতি"র প্রাবল্যে স্বতঃই নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা আসিয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা আর অপর আশ্রমত্রয়ের কার্য্যাদি যথাবিধি সম্পাদিত না হওয়ায় প্রত্যবায় আছে বলিয়া শ্রুতি বৈরাগ্যবান্‌কেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, সন্ন্যাসাশ্রমে বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান নাই; বরং বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, সুতরাং বৈরাগ্য জন্মিলে আর তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা যথাবিধি অপর আশ্রমত্রয়ের কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া শ্রুতি একমাত্র বৈরাগ্যবান্‌কেই প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন। যথা—"অর্থ পুনরেবব্রতী বাঽব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎপন্নাগ্নিরনগ্নিকোবা।" "অনন্তর ব্রতাচারী হউক, অব্রতাচারী হউক, স্নাতক হউক, অস্নাতক হউক, মৃতভার্য্য হউক, অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা করিবে।" "অর্থ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি।" "অনন্তর প্রব্রজ্যা গ্রহণ, বিবর্ণবস্ত্র পরিধান,

মস্তক মুণ্ডন, চিত্তাদির স্পৃহা পরিত্যাগ, শুদ্ধস্বভাব থাকা, পরাপকার বর্জ্জন ও ভিক্ষান্ন ভোজন করায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়।" যদিও বাণপ্রস্থের পর সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখানে শ্রুতি "অর্থ" শব্দে বৈরাগ্যের অনন্তরই বলিয়াছেন। কারণ, বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে না; এবং বিধি পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ অর্থে—বৈরাগ্যের প্রাবল্যে আপনা হইতে যে কর্ম্মত্যাগ হয়। সুতরাং বৈরাগ্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাণপ্রস্থীকেও স্বাশ্রম বিহিত প্রতীকোপাসনা ও শম-দমাদির সাধন করিতে হয় বলিয়া, এখানে "অর্থ" শব্দে বৈরাগ্যের অনন্তরই বুঝিতে হইবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

—দেহাভিমানী নর স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মে রত থাকিয়া শতবর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে; মনুষ্যাভিমানীর ঐ ভিন্ন অন্য উপায় নাই, যাহাতে তদীয় আত্মা কর্ম্মলিপ্ত না হয়। আচার্য্যেরাও বলিয়াছেন—"যাবৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহামুত্রফলভোগবিরাগো যোগারূঢ়ো ভবতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি।"—যতদিন না বিশুদ্ধ সত্ত্ব, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগবিলাসে নিস্পৃহ এবং যোগারূঢ় হইতে পারিবে, ততদিন স্বাশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। আবার আশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও, স্বীয় স্বভাব-জাত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও কর্ম্মক্ষয় হেতু বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে। তাই শ্রুতি "যদি বেতরথা" বাক্যে বিকল্প অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবান্ ব্যাসও তাই বলিয়াছেন—"অন্তরাচাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।" অর্থাৎ আশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও স্বতঃই বৈরাগ্যোদয় হেতু ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়—যেহেতু, ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যেও আমরা সিদ্ধ-পুরুষ দেখিতে পাই। অতএব, আরণ্যক ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ বৈরাগ্য ও ব্রহ্মবিদ্যা যখন জাতি বর্ণনির্ব্বিশেষে স্বতঃই আসিয়া থাকে, এবং ক্রমান্বয় গার্হস্থ্য শেষ করিয়া বাণপ্রস্থ আশ্রমে বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিতে অথবা ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা গার্হস্থ্যকালে স্বতঃই বৈরাগ্য জন্মিলে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে সমাজত্যাগ অবশ্যম্ভাবী,

তখন অবশ্য উপনয়ন ও বর্ণাদি তত্ত্বতঃ কারণ নহে বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে উপনয়ন ও বর্ণাদি গৌণভাবেও কারণ নহে। তাই ব্রাহ্মণ জানিয়াও, যম নচিকেতাকে যে পর্য্যন্ত না বৈরাগ্যবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপদেশ করেন নাই; আবার প্রবল বৈরাগ্য দর্শনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তদীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে শেষ কথা এই যে, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের মতে ভেদবুদ্ধিই সমুদয় অশুভের কারণ এবং তাহা পারমার্থিক নহে; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক অভেদ বুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। তাই জ্ঞানকাণ্ডীয়বেদের চরম উপদেশ—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—এখানে ভেদ নাই—সবই এক।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি—যে এখানে ভেদ দেখে, সে পুনঃ পুনঃ অশুভই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" মহাবাক্য রত্নাবলীর আধ্যাত্মিক বাক্যেও উক্ত চরম অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—আত্মানমাত্মনা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা সুনিশ্চলম্। দেহ জাত্যাদি সম্বন্ধান্ বর্ণাশ্রম সমন্বিতান্। বেদশাস্ত্র পুরাণানি পদপাংশুমিব ত্যজেৎ। অর্থাৎ "নিজের আত্মাই ব্রহ্ম" এই প্রকার সুনিশ্চল জ্ঞান হইলে, বর্ণাশ্রমে সম্যক্ প্রকারে অন্বিত দেহ ও জাত্যাদির সম্বন্ধ, এবং বেদশাস্ত্র ও পুরাণ সকল পদধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। অতএব, সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগই যাহার চরম অভিপ্রায়, তাদৃশ বেদান্তে কখনই ব্যবহারিক ভেদবুদ্ধি দ্বারা অধিকারী নির্ব্বাচিত হইতে পারে না—বিশেষতঃ বেদান্তে যখন পারমার্থিক হিতার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই শুক্লযজুর্ব্বেদের শাখায় উক্ত হইয়াছে—

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারনায়॥"

এক্ষণে আমরা বৈদিক অধিকারী রহস্যালোচনায় ইহাই দেখিলাম যে, কর্ম্মকাণ্ডই হউক আর জ্ঞানকাণ্ডই হউক, গুণই পরমার্থ বলিয়া

সর্ব্বত্র গুণেরই পূজা বা আদর হইয়া থাকে—জাত্যাদির পূজা বা আদর নাই ;—

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"

—শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী ।

(সমাপ্ত)

মহিমা

বসি পঞ্চবটী তটে, আমার এ হৃদি পটে
অঙ্কিত হ'ল কার ছবি ।
কি এক অজানা প্রেমে পাগল করিল মোরে
মন প্রাণ গেল সেথা ডুবি ॥
কখন দেখিনি তারে তবু প্রাণ তার তরে
দিবানিশি কাঁদিতেছে হায় !
হেথা কেহ নাই যেন, গৃহ কারাবাস সম
প্রাণ সদা কোথা যেতে চায় ॥
দিবস যামিনী যেন, যুগ বলে হয় ভ্রম
না জানি কার পড়িলাম ফাঁদে ।
কারে বা জানাই ব্যথা, কেবা শোনে মোর কথা
মরি সদা হরিষ বিষাদে ॥
হৃদয় নিভৃত স্থানে গোপনেতে আঁকিয়াছি
কিন্তু চোখে দেখি নাই কভু ॥
অলক্ষ্যে আসিয়া সে যে বসেছে হৃদয় মাঝে
দেখা কেন নাহি দেয় তবু ।
এক দিন সেই নাকি, দক্ষিণেশ্বরেতে থাকি
পেতেছিল আনন্দের মেলা,
ধরণীর মহাভার ঘুচাইয়া এককালে
হ'রেছিল শোক দুখ-জ্বালা ।

কে তুমি কে তুমি ওগো ? বার বার হৃদে জাগো
কর মোরে পাগলিনী প্রায়।
যে তোমার আশা করে চির-প্রথা তার তরে
আঁখি-জল মাত্র কি ধরায় ?
(তবে) প্রিয়ার পবিত্র প্রেম, মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম
তুচ্ছ করি, বল সবে কেন তোমা ভজে ?
কি আছে তোমার পাশে, জগবাসী ছুটে এসে
সেই হেতু তব প্রেমে মজে ?
ত্রিবিধ তাপের জ্বালা যদি না জুড়াতে পার
শান্তিময় নাম কেন তবে।
ত্রিগুণ-অতীত ধামে বসিয়াও কেন হায় !
বার বার আসিতেছ ভবে ॥
জীবের দুর্দ্দশা দেখি সত্য কি গো তব হৃদি
কাঁদে দেব ! ক্ষণিকের তরে ?
মলিনতা ঘুচাইতে, যুগধর্ম্ম প্রকাশিতে
তাই কি আসিলে পুনঃ নর-রূপ ধরে ?
ঢালিয়া অনন্ত শক্তি রামকৃষ্ণ নামে, আহা !
রাখিয়া গিয়াছ ধরাধামে।
তব কৃপা বলে আজ সারাটী ভুবন খানি
নব বল পেয়েছ পরাণে ॥
ধন্য, হে করুণাময় ! অপার করুণা তব
আত্মহারা হয়ে যাই ভেবে।
তোমারি রচিত বিশ্ব তুমি না রক্ষিলে প্রভু,
বল কেবা রক্ষা করে তবে ॥
বিশ্বাধার ! তব কাছে কাতরে প্রার্থনা করি
দরশন দাও একবার।
যাহা কিছু আছে দেব ! সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর
আমি যেন হই গো তোমার ॥
তোমার পবিত্র স্মৃতি, বুকে লয়ে দিবারাতি
তব ধ্যানে হই যেন ভোর।
রামকৃষ্ণ নাম যেন হয় গো অজপা সম
কাটে যেন মোহ ঘুমঘোর ॥

—তিনু

স্বামী প্রেমানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী প্রেমানন্দ বৎসরের অধিকাংশ সময় বেলুড় মঠে অবস্থান করিলেও প্রচার-কার্য্য ব্যপদেশে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বঙ্গের নানা স্থানে যাইতে হইত। তিনি যে স্থানেই পদার্পণ করিতেন তথাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁহার সপ্রেম আচরণ ও অসাম্প্রদায়িক-ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইত। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের কথা দূরে থাক্, আমরা জানি বহু মুসলমান ভক্তও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতাশূন্য মহদুদার উপদেশ লাভ করিয়া ধর্ম্মান্তরের উপর বিদ্বেষভাব চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছেন।—কেনই বা না করিবেন? হিন্দুর "ভগবান" আর মুসলমানের "আল্লা" কি পৃথক বস্তু? হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সেই দিক্‌দেশ-পরিশূন্য অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রেরই এক এক দিক দর্শন করতঃ নিজ নিজ উপলব্ধি লইয়া কলহ করিতেছে মাত্র। তাই এই বিবাদের মূল কারণ অজ্ঞান ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টিকে শতধা বিচূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে এক বিরাট মিলন মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধন সহায়ে স্বয়ং উপলব্ধি পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন—একই সীমাহীন ব্রহ্ম-সমুদ্র সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকিয়া সকলেরই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। যাহারই একাংশ হিন্দু ও বৌদ্ধের "ভগবান," বা "নির্ব্বাণ" নামে অভিহিত তাহারই অন্যাংশ মুসলমানের "আল্লা," এবং খৃষ্টানের "God" রূপে প্রসিদ্ধ। স্বামী প্রেমানন্দ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের এই মহান সার্ব্বভৌম আদর্শ ই বঙ্গের আপামর সাধারণকে বহুদিন যাবৎ শ্রবণ করাইয়াছেন। হায়! কবে আমরা উহা সম্যক ধারণা পূর্ব্বক পরস্পর সংঘর্ষ-জনিত বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে বিরত হইয়া শান্তির পতাকাতলে

আসিয়া মিলিত হইব? লীলাবসানের প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে ভক্তগণ কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ব্ববঙ্গ গমন করেন। শারীরিক অসুস্থ থাকিলেও ভক্তগণের আগ্রহাতিশয় অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তথাকার বহু পল্লী ও জনপদে ভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি মঠে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উহাকে দুরারোগ্য কালাজ্বর স্থির পূর্ব্বক বায়ুপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলে অবিলম্বে তাঁহাকে দেওঘর পাঠান হইল। নিরন্তর সেবা ও চিকিৎসাদিতে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ বহুল পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এরূপ সময় পুনরায় ইনফ্লুয়েঞ্জা কর্ত্তৃক তিনি ভীষণভাবে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হইল। কিন্তু তাঁহার জীর্ণদেহ এবার আর কাল-ব্যাধির প্রকোপ সহ্য করিতে পারিল না। অবশেষে একদিন পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণের সম্মুখে, এবং পুত্রস্থানীয় সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লোকপাবন নাম শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ মহা-সমাধিতে প্রবিষ্ট হইলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে স্বামী প্রেমানন্দ "ঈশ্বরকোটী" পুরুষ ছিলেন। শাস্ত্র বলেন, "ঈশ্বরকোটী" পুরুষগণ তপস্যা প্রভাবে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন করিলেও "নুনের পুঁতুলের" ন্যায় উহাতে একেবারে বিগলিত হইয়া যান না; জরামরণগ্রস্ত এবং অহরহ দুঃখ-যন্ত্রণা-প্রপীড়িত মানবকে উহার সন্ধান দান করিবার নিমিত্ত পুনরায় মায়ারাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মায়িক জগতের সম্পর্কে আসিলেও কিন্তু তাঁহাদিগের সমাধিলব্ধ জ্ঞানের কথন বিচ্যুতি ঘটে না; উহার জ্যোতিঃতে তাঁহাদিগের হৃদয়-কন্দর সর্ব্বদাই আলোকিত থাকে। যে জন্মে "ঈশ্বরকোটী" পুরুষগণ ঐরূপ জ্ঞানের অধিকারী হন, শুদ্ধ যে সেই জীবনই লোক-কল্যাণ সাধন পূর্ব্বক পরে দেহান্তে মহা-নির্ব্বাণে প্রবেশ লাভ করেন তাহা নহে, যখনই প্রয়োজন হয় তখনই তাঁহারা জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অথবা, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলিতে পারা যায়—"সরকারী লোক—জগদম্বা তাঁহার জমীদারীর

যেখানে যখনই গোলমাল উপস্থিত হয় তাঁহাদিগকে সেইখানেই তখন গোলমাল থামাইতে পাঠান।" এই পুরুষসকলের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী শাস্ত্র তাঁহাকেই "ঈশ্বরাবতার" নামে অভিহিত করেন—অবশিষ্টগণকে তাঁহার পার্শ্বদ বলা যায়। যখনই প্রয়োজন হয় তখনই ঈশ্বরাবতার সপার্শ্বদ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এইরূপে জগত ভূতকালে বারংবার তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং বর্ত্তমানেও করিয়াছে। এইবার উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যুগাবতার, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পূজক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এবং শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীব্রহ্মানন্দ ও শ্রীপ্রেমানন্দ প্রমুখ অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের সহায়তায় দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী হইতে যে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন তাহা অত্যল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী ও অতলস্পর্শী সিন্ধুরূপে পরিণত হইয়া প্রচণ্ডবেগে কত নগর নগরী ও দেশদেশান্তর ভাসাইয়া ক্রমে সমস্ত পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। শ্রীশ্রীজগদম্বার চিহ্নিত পুরুষ, ঈশ্বর-কোটী স্বামী প্রেমানন্দ বর্ত্তমান যুগাবতারের পার্শ্বদরূপে ধর্ম্মপ্লাবনরূপ তাঁহার মহাকার্য্যের কতখানি সাহায্য করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করিতে আমরা অক্ষম। তবে, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি তিনি আমাদিগের ন্যায় বহু বৃক্ষ-সদৃশ জড়-বস্তুকে টানিয়া আনিয়া ঐ স্রোত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং আমরাও উহার বিপুল প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি। কতদিনে উহার পরিসমাপ্তি হইবে ও কোথায় গিয়া ঠেকিব তাহা একমাত্র প্লাবনকর্ত্তা শ্রীভগবানই বলিতে সক্ষম। গগনচুম্বী তরঙ্গসমাকুল ও বহু আবর্ত্তময় এই প্রবল ধর্ম্মপ্লাবনে অঙ্গ ভাসাইয়া ইহার প্রলয়ঙ্করী শক্তি ও গতি উপলব্ধি করতঃ আমরা মানব-মণ্ডলীকে অতি দৃঢ়স্বরে বলিতে পারি—"এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?" জগতের কোন শক্তিই উহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। আর, এই বিপুল জলোচ্ছ্বাসের শীর্ষদেশে দেখিতেছি —জ্যোতির্ম্মণ্ডিত তনু সেই যুগকর্ত্তা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তৎপশ্চাতে তদীয় ভৃত্য, পুত্র, সখা ও সহায়ক শ্রীস্বামী প্রেমানন্দ। অধিকন্তু অনুভব করিতেছি, ব্রহ্মবিদ্ এবং ব্রহ্মভূত স্বামী প্রেমানন্দ যেন অনন্তরূপে ও অনন্তভাবে এই বিরাট বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। বর্ত্তমান ধর্ম্ম-

প্লাবনের প্রতি লহরী-বক্ষে সলিলরাশির প্রতি বিন্দুতে এবং তরঙ্গ-ভঙ্গের প্রতি কল্লোলে তাঁহার সত্তা আজ আমরা জাগ্রত দেখিতেছি। তাঁহার শক্তি যে এত অনন্ত ও গতি যে এত বিচিত্র তাহাত আমরা পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারি নাই! তাঁহাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া আমাদের বাক্যসমূহ "অপ্রাপ্য মনসা সহ" ফিরিয়া আসিতেছে। তাই, পরিশেষে অনন্ত ভবাময় বিগ্রহ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের শ্রীচরণোদ্দেশে শিশুর মত অর্থশূন্য ও অস্ফুট ভাষায় বলি,

"মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোন দিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে;
সমুদ্র-স্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট তোমারে ভরিতে না পারে।
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

(সমাপ্ত)

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ।

ঈশ্বর

ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বস্তু কথার বস্তু নন। সে প্রত্যক্ষ আমাদের চাক্ষুষ দেখা (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ) নহে, মনে মনে বুঝিয়া দেখাও নহে। আসক্তির খরস্রোত-ভীষণা বাসনা-তরঙ্গ-ভঙ্গাভিঘাত-মথিতা মোহ-পারাবার-স্বরূপা জগত-বুদ্ধি উত্তীর্ণ হইলে যে চেতনরূপী জ্ঞাননেত্র উদ্ভাসিত হয় তাহারই প্রত্যক্ষের বস্তু ঈশ্বর।

তোমার আমার মত মানুষ মান-হুঁষ হইয়া উঠিলে যে চোখ পায় তাহারই দ্বারা প্রত্যক্ষের বস্তু ঈশ্বর। সে চোখ কেমন বুঝিতে পারিবে কি? দেখা, কাজ, দেখিবার বস্তু তিন লইয়া সে চোখ প্রণালী-মত হিসাবে চলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে জানে না। তিন সেখানে এক। বুঝিতে পারিবে কি সে চোখই বা কেমন, তার দেখাই বা কেমন, দেখিবার বস্তুই বা কেমন?

উপদেষ্টা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াই চলিয়া যান। সত্যটা স্মৃতিপথে জাগিয়া থাক্—বুঝিবার সময় হয় বুঝিতে পারিবে এমনই ভাবিয়াই বোধ হয় এক কথায় সারিয়া দেন—ঈশ্বর যোগসাধ্য। "দেখেন ভোলা যোগে যাগে!" ঋষিরাও ধ্যানে বসিতেন সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিতেন এমনই বিবরণ তাঁহাদের উপাখ্যানে পাইয়া থাকি। জড়ের এলাকা মধ্যে আসিয়া তাঁহারাই দেবতারাও আবার এমন সব কর্ম্ম করিতেন—যাক্ সে কথা ছাড়িয়া দাও। ও সব দেব-ঋষি চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক স্পষ্ট কথা বুঝিবার মত আমাদের জাতীয় মন হয় ত হইয়া উঠে নাই, হইলে ঐ সকল আজগুবির মধ্যে যে বিপুল সত্য রহস্যাবৃত হইয়া আছে তাহার স্বরূপ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম।

বক্ষ্যমাণ বিষয়ে যেটুকু বুঝিলে চলিবে সেটুকু এই, যে অন্ধেও অনুভব নামক শক্তির দ্বারা লিখিতে পড়িতে পারিতেছে অতএব চোখ বুজিলেই প্রত্যক্ষের সকল উপায় হারাইতে হইবে—এ কথা ত বলা চলে না; হয়ত হইতে পারে দৃষ্টিশক্তির আয়ত্তের বহির্ভূত বহুদূরস্থিত বস্তুকে দেখিবার একটা পন্থা আছে তাহাই ধ্যান—সকলে জানে না জিনিষটা কি? আমরা যতক্ষণ একটা জিনিষকে সেটা কি, না জানিতে পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সত্য-মিথ্যা বিচার করিতে পারি কি? বক্ষ্যমাণ বিষয়ে আমাদের ইহা স্বীকার করিলেই চলিবে যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার—জ্ঞানের মণিকোঠা আমাদের মধ্যে আছে। এ কথা অনেকেই বুঝিয়া স্বীকার করিতে পারে যে জগতের শত শত অভিজ্ঞতা সংস্কার তোমারে জ্ঞানী করিতে পারিত না যদি না ঐ সকল অভিজ্ঞতার আলোকে তোমার অন্তরের মণিকোঠা উদ্ভাসিত হইত। কোনরূপ আকস্মিক কারণে ভিতরের এই সহজাত জ্ঞান-স্থানকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করাতে পণ্ডিতের আজীবন অধ্যয়ন-সঞ্চিত বিদ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলোপ পাইয়াছে, এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নহে। আবার কোনও রূপ আকস্মিক কারণে কখনও পড়ে নাই কখনও শিখে নাই এমন বিষয় মানুষের মনে আসিয়া উদিত হইয়াছে, এমন ঘটনাও বিরল নহে।

জড়ের স্থান ও চেতনার স্থান এই দুই বিভিন্নতার সঙ্গে পাশাপাশি

করিয়া জগতে জ্ঞানও দুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে,—পরা ও অপরা জ্ঞান।

এই পরা ও অপরা তত্ত্বের মূলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সকল রহস্য নিহিত আছে ; কিন্তু অতিপ্রয়োজনীয় একটা কথা এখানে ছাড়া চলে না। আবার জ্ঞান জিনিষটাকে সকল দিক দিয়া বুঝিবার আগেও তাহাকে বুঝান অসম্ভব—তাহা এই যে জ্ঞান-ক্ষেত্রে ঈশ্বর উদ্ভাসিত হয়েন, সুতরাং ঈশ্বর জ্ঞানপদার্থ তাহা নিঃসংশয় মীমাংসা নহে। সাধন জগতে ঈশ্বর-লাভের জ্ঞান কর্ম্ম-ভক্তি তিন পথ আছে। এই তিনের দ্বারাই যোগসাধ্য ঈশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়। তিনটীই যোগ, তিনটীই সাধনা, তিনেরই সাধ্য ঈশ্বর।

চলিত কথায় আমরা বলি না, অমুক কাজ রামের সাধ্য নয়—হরির সাধ্য বটে, এখানে 'সাধ্য' কথাটার সার্থকতা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। সাধ্য বলিতে কি এমন মূল্য বুঝিলাম, যাহা হরির আছে—সে তাহা দিয়া অমুক কাজে সার্থকতা কিনিতে পারে—রাম পারে না, রামের তাহা এখনও সঞ্চিত হইয়া উঠে নাই। সেটা যাহাই হউক জ্ঞানগম্য ক্ষয়-ব্যয়শীল একটা কিছু যে তাহা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ঈশ্বরলাভের পথে এমনি একটা কিছু বিশিষ্ট বস্তু আছে যাহা বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানে নাই, রাজনীতিজ্ঞের অবধারণায় নাই, তার্কিকের তর্কে নাই, সাহিত্যিকের প্রতিভায় নাই, আছে কেবল যোগীর যোগে। এই যোগ নাক টেপা, পা মোড়া, চোখ বোজা নহে—হইতে পারে exercise হিসাবে উহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে—আসল প্রাণবস্তু হিসাবে এই যোগ জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি। ইহারাই যোগের অন্তর্নিহিত সেই মূল, যোগীর মধ্যে যোগারূঢ় অবস্থায় যাহা সঞ্চিত হইতে থাকে।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং" কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানেরই আশ্রিত। ফলতঃ তিনই এক একই তিন। বস্তুতঃ জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব। তাহার কারণ এই যে কর্ম্ম ও ভক্তি পথেও জ্ঞানের খানিকটা অবলম্বন আমাদের গ্রহণ করিতে হয়।

এখানেও জ্ঞান সম্বন্ধে এতখানি বলিতে হইতেছে তাহার কারণ

ঈশ্বরকে সত্য করিয়া দেখিবে, পাইবে, আপনার করিবে—সে ঐ তোমার পরাজ্ঞানের মধ্যে। কর্ম্মপাশ হইতে ছাড়া পাইয়া তাঁহার কাছে যাইতে হইবে, তিনি ভক্তির কাঙাল ভক্তিধনে তাঁহাকে কিনিতে হইবে, সকলই যথার্থ কিন্তু তিনি আসিয়া যে আসন-পীঠে বসিবেন তাহা পরাজ্ঞান। তোমার ঘর সংসারে আগন্তুকরূপে ডাক শুনিয়া তিনি কোনও দিন আসিয়া দাঁড়াইবেন না।

অনন্ত সৌরজগতের কথা ভাবিয়া এই বিপুল পৃথিবী দেখিয়া ইহার সভ্যতা বাণিজ্য শিল্প বিজ্ঞান প্রজাতন্ত্র রাজনীতি সমস্তের জটীলতায় বিপুলতায় মনুষ্য-চক্ষু যখন বিমুগ্ধ হয় তখন চিন্তাশীল মন ভাবিতে বসে—এ সমস্ত করিতেছে কে?—এই যে আমি মানুষ, ইহার মধ্যে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছি আমার আদিই বা কোথায় অন্তই বা কোথায়? খানিকটা ভাবিয়া তারপর 'থেই' হারাইয়া সে বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়—ঈশ্বর এই জগতের কারণ, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই নিয়ন্তা, তিনিই রাজার উপর রাজা। যে ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার উপরকার বস্তু পায় সে ত' পরাজ্ঞানের কোঠায় চলিয়া গেল—কিন্তু যে ভাবনা-রাজ্যের পারে যাইতে পারে না, অথচ এই-খানেই একটা কিছু খাড়া করিতে হইবে এমনি তাহার জিদ্, সে তাহার ঐ সৃষ্টিকর্ত্তা-নিয়ন্তা-রাজার উপরের রাজাকে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত শাসিত দেশে—এই পারেই অপরাজ্ঞানভূমিতেই আপনার নির্ণয়ের মত স্থাপিত করিয়া বসে। এইরূপে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন নির্ণয়ে এক ঈশ্বর দুই হইতে বহু হন, অবশেষে ত্রিশকোটী মানুষের তেত্রিশ কোটী দেবতা; মাটীতে মানুষ তাই মাটীর উপরকার আকাশটীতে আপনাদের স্বর্গ-উপনিবেশ স্থাপনা করিয়া বসবাস আরম্ভ করে। নির্ভীক সত্য সতেজে এই কল্পনা-বিলাসকে চূর্ণ করিয়া বলে, এ তোমার সত্যকার ঈশ্বর নয়। এ ভাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে কোনও দিনই তুমি তাঁহাকে পাইবে না। এ তো ঈশ্বরের নামে তোমাদের রাজা কিংবা বড়লোকের খুব উন্নত অবস্থার কল্পিত ছবি। এতো পাপ পুণ্য নাম দিয়া তোমাদের ভাল মন্দের বিধি নিষেধই নিখুঁত ও প্রবলরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। আমি এ ঈশ্বর চাহিনা, এ পাপ-পুণ্য কোনটাতেই অভিভূত হইব না। আমি চাই সত্য।

তোমার এ মনগড়া ধর্ম্মকে কষিবার পাথর আমার হাতে আছে। অন্তরের মণিকোটায় এই দেখ, জাগিয়াছে আমার চেতনা। ইহাই ঈশ্বরত্বের ভিত্তি।

জগত তাহাকে চোখ রাঙ্গাইয়া মারিয়া ধরিয়া পীড়িত করিয়া শাসন করিতে চায়—বলে, অবিশ্বাসীকে দণ্ড দিবার অধিকার আমাদের আছে।

কিন্তু জগতের বুক হইতে একটা সংশয়কে কে মুছিয়া দিতে পারে? মানুষের মুখ না হয় বন্ধ করা যায়, মনটা ত নীরবে কাজ করিতে থাকে।

চেতনাকে জড় ত পরাজয় করে না; আলোকের অভাবে যেমন অন্ধকার, তেমনি জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞান, চেতনার অভাবে জড় রাজত্ব করে মাত্র। চেতনা যখন জাগে তখন আবার তাহার স্থান কোথায়?

প্রকৃতপক্ষে যোগপথ পরিত্যাগ করিয়া মন-গড়া ঈশ্বরের সহিত রফা করিয়া চেতনাকে জীবনের সর্ব্বাবস্থায় জয়ী করিবার সঙ্কল্পকে ধর্ম্মানুষ্ঠান নামে মাত্র বলা যায় অপর কিছু ধরিয়া বিবেককে ঠকান, ইহাই ত অবিশ্বাস। বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিয়া জড়ত্বের আসক্তিতে বিষয়কেই refined করিয়া অবলম্বন। এমনি করিয়া একটা জিনিষকে আঁকড়ান, তাহাতেই মজিয়া থাকা, ইহা ত বিশ্বাস বলা চলে না।

ঈশ্বর প্রেমময় ঈশ্বর মঙ্গলময় অথচ তাঁহারই হাতে নিত্য হিংসা অমঙ্গলের আগার বিশ্ব সৃজিত হইয়াছে কেন? তৃপ্ত পূর্ণ তিনি, তবে তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়েরই বা ইচ্ছা হয় কেন? অতৃপ্ত-অপূর্ণ জনেই ত ইচ্ছার দাস—তাহারাই ইচ্ছা-চালিত হইয়া কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে ভ্রমণ করিতেছে। ন্যায়বান ঈশ্বরের রাজ্যেই বা তাঁহার এমন বিধান কেমন করিয়া চলে, যে কেহ জন্ম-দুঃখী কেহ চির-সুখী—সুন্দর স্বাস্থ্যবানের পাশে পঙ্গু ক্লীব বিকলাঙ্গ ম্লান-মুখে আপনার অবস্থার সহিত তাহার তুলনা করিতেছে। কেন একজন রাজা, অন্যজন ভিখারী, একজন ঘাতক, অন্যে তাহার বধ্য হয়? চিরসুন্দর রসময় ঈশ্বরের রুচিতে পাপ-ব্যাভিচার-নরক-দুর্গতি এই সমস্ত সৃষ্টির কল্পনাই বা কেমন করিয়া জাগিল! এমনি সব বিচারের স্রোত খরতর বেগে বহিলে নরলোকের ঈশ্বর-কল্পনা কোথায় ভাসিয়া যায়। তখনই স্পষ্ট ধরা

পড়িয়া যায় যে কোনও একটা ধর্ম্মমতের উপর আসক্তিকে বিশ্বাস বলা কিছুতেই যাইতে পারে না। বিশ্বাস নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ।

হিন্দুদের মতে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ অনুভূতি মত প্রমাণ। তুমি পরাজ্ঞান লাভ করিয়াছ কি না, তুমি সত্যই ঈশ্বর লাভ করিয়াছ কি না তোমার ভিতরকার বিশ্বাসই তাহা প্রমাণ করিবে। হয়ত তুমি তোমার চেষ্টা বা আয়াস দ্বারা তাহা পারিবে না। সে প্রমাণ তোমার অজ্ঞাতেই হইয়া যাইবে।

সত্য কথা এই, যে পৃথিবীতে মানুষ দয়া প্রেম শক্তি জ্ঞান প্রভৃতি আপনার মধ্যের যে সব উপাদানকে তাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাছাই করিয়াছে তদ্দ্বারা ঈশ্বরকে ভূষিত করে। আপনার মধ্যের নিকৃষ্ট উপাদানই ত তাহার দুঃখ। স্বভাবতঃ সে সুখ চায়, আর যে সুখ অনাদিকাল হইতে জগত আপনার মধ্যে অন্বেষণ করিয়া পায় নাই তাহারই আশায় একটা Super-world for humanity—of imagination and hope—of love and symbol মানুষ রচনা করিয়াছে। প্রত্যেক জাতির অন্তর্নিহিত এই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যই দেশে দেশে ঈশ্বর ও তদীয় পারিপার্শ্বিক নামে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে।

কেবল ভারতের যোগী নিভৃত হিমাচল-ক্রোড়ে আত্মস্থ হইয়া দেখিয়াছিলেন—জড়-ঈশ্বর জীব-ঈশ্বর কেহই ভিন্ন নয়। এমন কি জড়ে জড়ে জীবে জীবে জীব-জড়ে তাহাও ভিন্ন নয়। যোগী সর্ব্ববিশ্ব আত্মময় দেখিয়াছিলেন। সেই উপলব্ধি বলে তাঁহারা 'সোঽহং' শব্দে জাগিয়া উঠিয়া বিশ্বকে বলিয়াছিলেন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

সেই উপলব্ধি যে ঈশ্বরের কথা প্রচার করিল, 'আমি জীব তুমি ঈশ্বর' এমনি ধারণায় অনন্ত জীবন ঐ দ্বৈত-জ্ঞান-রূপ সমুদ্র সন্তরণ কর, কোনও দিনই পরপার হইবে না।

এ যে বড় বড় কথা! ক্ষুদ্র মাথায় কেমন করিয়া ধারণা করিব? কিন্তু মাথা ত ধারণা করিবে না, মাথার ত ও কাজ নয়। এ কাজ চেতনার, সে তোমার মাথা নয়, মন নয়, অহঙ্কার নয়—সে তোমার চেতনা। হে

মানুষ, যাহার কাজ সে করিবে যাহার নয় তাহাকে দিয়া করাইতে গিয়া কাজ কর নাই, অকাজ বাড়াইয়াছ।

তোমার মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃতি। সে সৃষ্টি করিতেছে সংসার। চৈতন্যের কোঠায় উঠিলে পরাজ্ঞানে পৌঁছিলে তাহাকে আধ্যারোপ বলিয়া চিনিবে—হুঁষ হইবে রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত সচ্চিদানন্দে সংসার ভ্রম হইতেছিল। চৈতন্যের কোঠায় যতক্ষণ না উঠিতেছ প্রকৃতিতে বসিয়া ততক্ষণের মধ্যে কি করিয়া রজ্জু দেখিতে পার? চৈতন্যের-সৃষ্ট ঈশ্বর আর জড়ের-সৃষ্ট সংসার। চৈতন্য সর্ব্বভূতে অনুপ্রবৃষ্ট। সকলকেই ঈশ্বর দেখিতে পাইতেছেন, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী—কিন্তু জড়, সে ত আপনার চৈতন্য-স্বরূপ ভুলিয়া তাহার এই জড়রূপেই আধ্যারোপিত হইয়াছে চৈতন্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিলেও তাহার স্পর্শ বোধ ত ক্ষণকালের জন্যও চৈতন্যকে বুঝিতে পারিবে না, সে ঈশ্বরকে দেখিবে না ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা।

যতক্ষণ তোমার হুঁষ জড়ত্বের মধ্যে অর্থাৎ চৈতন্য যতক্ষণ আচ্ছাদিত, আপনাকে চৈতন্য হইতে ভিন্ন জানিতেছ ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বর তোমার মধ্যে থাকিলেও তুমি ত ঈশ্বরের মধ্যে নাই। 'হা ঈশ্বর হা ঈশ্বর' করিয়া চীৎকার করিতে পার, কিন্তু বলিতে পার না—ঈশ্বর কোথায়।

এই জন্যই বলে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতকে দেখিতেছেন কিন্তু তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইতেছে না। তিনি সর্ব্বত্র তথাপি মূর্খ তীর্থে তীর্থে দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা কবে কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে চিৎস্ফূর্ত্তি হইয়া যায়, মানুষ আপনার মধ্যের সেই মহাসন্ধিক্ষণে দাঁড়ায় যখন সে দেখে, তাহার বোধ-রূপী সত্ব একদিকে অনন্ত-অপার-মহিমাময় আর একদিকে ক্ষুদ্র, প্রকৃতির প্রভাবরূপী গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ, তাপ ক্লেশ প্রভৃতিতে নিরন্তর প্রপীড়িত। সেই সন্ধিক্ষণে আপনার সেই সন্ধিস্থল চিনিলে সে বুঝে, সকলি তাহার আপনার ইচ্ছা। জীবত্বের শক্তিহীন সঙ্কুচিত অবস্থাকে আত্মশক্তির স্ফুরণে প্রস্ফুরিত করিবার তাহার অধিকার আছে। জড়ে জীবে, জীবে ঈশ্বরে প্রভেদ ত নাই। সে সম্পূর্ণরূপে জড়ত্বের দিকে

আসিয়াছে, আপনার জীবরূপকেই তন্ময় হইয়া দেখিতেছে, ঈশ্বর রূপও ত তাহারই। সে রূপে সে আপনার বোধ যদি সংলগ্ন করে? জীবত্বের সঙ্কোচে যাহাতে পীড়িত হইতেছি আত্মার স্ফূর্ত্তিতে তাহাতেই তাহার প্রফুল্লিত হইবার সম্ভাবনা।

তারপর যাহাই চলিবে তাহাই ঈশ্বরলাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া থাকে। তারপর সে যতই সচেতন হইতে থাকে, যতই আসক্তির রাজ্য ছড়াইয়া মহত্ত্বের রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকে, প্রকৃতির সৃষ্টি দিনে দিনে তাহাকে আপনার নির্ম্মম বজ্র-বাঁধন শ্লথ করিয়া দিতে দিতে শেষে একেবারে আপনার প্রভাব হইতে তাহাকে ছুটী দেয়।

প্রকৃতির প্রভাব হইতে ছাড়া পাইয়া সে কি দেখে? সে দেখে যে, সংসারে সে নিরূপায় ছিল; দুঃখে দুঃখিত না হইলে থাকা যাইত না, আর সে দুঃখকে বর্জ্জন করিবার উপায় ছিল না। সুখ আপাতঃ মনোরম ছিল,—আছে অথচ থাকিবে না, এই ভয়ে তাহাই দুঃখের আবার স্বরূপ হইত; তাহাকে পাইয়াও তৃপ্তি নাই অথচ তাহাকে পাইবার জন্য ছুটাছুটি না করিলেও পার নাই! জীবন একটা অতৃপ্ত আশার সমষ্টিমাত্র ছিল; সে থাকিলে শান্তি নাই, অথচ পাছে যায়, সেই অশান্তিতে দগ্ধপ্রায় হইতে হইত। প্রকৃতির প্রভাব হইতে ছাড়া পাইয়া সে দেখে, সেই সব অত গুরুতর, অত হৃদয়-শোণিত-শোষী ব্যাপার অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া গিয়াছে। ওসব কতকগুলি নিয়মপরম্পরার খেলা মাত্র; খেলা যেমন সত্যকার জীবনের কোনও ভাবকে স্পর্শ করে না, তেমনি ও সমস্ত তাহাকে স্পর্শ করে না। সে দেখে, চৈতন্যের এক উত্তমস্থানে তাহার অমর অপরিণাম সত্তা রঙ্গতামাসা দেখিতেছেন, আর প্রকৃতির মধ্যে আসক্তির অধম স্থানে অজ্ঞানের আবরণে বিবিধ পরিচ্ছদে সেই সত্তাই সংসার নাট্যলীলায় দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় করিতেছে। ধর, তুমি বিয়োগান্ত নাটকে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছ, তোমার অভিনয় দর্শনে দর্শকে কাঁদিতেছে, নাট্যকলা প্রদর্শন-ছলে তাহাদের দেখাইয়া তুমিও কাঁদিতেছ, কিন্তু তোমার গোপনমন চোখের অশ্রুর অব্যর্থ ফল দেখিয়া আপন কৃতিত্বের পুলক চাপিতে পারিতেছে না।

শুধু প্রকৃতির প্রভাব হইতে তখন সে ছাড়া পায় তাহা নহে, যে প্রভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় সম্পাদিত হইতেছে, তাহার মধ্যেও সে আপনাকে মেলিয়া দিবার পথ খুঁজিয়া পায়। একদিকে সে যেমন মরে, জন্মায় অপর দিকে সে তেমনি আপনিই যে সে আপনার জন্মমৃত্যু ঘটাইতেছে, তাহাও উপভোগ করিতে থাকে।

জড়ে-জীবে জীবে-ঈশ্বরে প্রভেদ নাই, তবে জড়, জীব, ঈশ্বর তিনের স্বাতন্ত্র্যের স্থান কোথায়? এ কথার উত্তর, স্বাতন্ত্র্যের স্থান এই অধ্যারোপের মধ্যে। যেখানে কেবলমাত্র জড়, কেবলমাত্র জীব, সেইখানে স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে সে স্বাতন্ত্র্য তখন আর অবশিষ্ট থাকে না। জড়, জীব, ঈশ্বর, তিন আপনাদের ভিত্তির স্থানে এক। যে শক্তির তাহারা প্রকাশ, সে শক্তিটা এক। বিকাশের তারতম্য। মূল শক্তির ভাণ্ডারে হিল্লোল বহিলে, ছোট বিকাশের বড়র সহিত সমান আয়তন ধরিতে কতক্ষণ? দুটা ঢেউ একরূপ উঁচু হইয়া উঠিবে, সে আবার বিচিত্র কি?

ঈশ্বর জল আর শক্তি সেই জলরাশির আলোড়ন। তাহারই ফলে যে জলকণা জলবুদ্বুদ তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে, তাহাই চরাচর জগতের মণিমালা। জলকণা প্রভৃতি জলেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি, আলোড়নের বেগে সৃজিত হইয়া বিচিত্রাকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তেমনি ঈশ্বর প্রকৃতির চেষ্টায় সংসারাকারে ব্যক্ত হইতেছেন। তুমি প্রকৃতির স্থানে থাকিয়া সংসারের প্রভাবে প্রভাবিত হইতে পার, আবার চেতনার স্থানে থাকিয়া সংসার-প্রভাব-মুক্ত অবস্থায় লীলা-বিলাস-রসে প্রকৃতিকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিতে পার।

তুমি জড়, তুমিই চেতন। তুমি জীব, তুমিই ঈশ্বর। তুমি যোনিসম্ভব, তুমিই অযোনিসম্ভব। তুমি সৃষ্টি, তুমিই স্রষ্টা। আবার তুমি কেহই নহ, সমস্ত ঈশ্বর ও প্রকৃতি।

হায়! কোথায় সেই সংবোধি, সেই পরাজ্ঞান, যে চৈতন্যময় ঘরে বসিলে, চৈতন্যময় ঈশ্বর আমার সঙ্গী হইবেন? কতদূর হইতে অনুমান করিতেছি তাঁহাকে! ওগো কোন্ নীরব তপস্যায় সেই শক্তি গরজিয়া আমার মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, তখন এই সঙ্কুচিত জীবভাব বিপুল আনন্দে স্ফুরিত হইয়া

বিপুল প্রেমে বিগলিত হইবে। যেখানে 'আমি' বলিয়া এই সংসার ও মুমুক্ষুত্বের মাঝামাঝি অবস্থায় বদ্ধ একটা জীবকে অনুভব করিতেছি, সেই মহৎ সেই সর্ব্বময়কে প্রত্যক্ষ করিব সেইখানটা জুড়িয়া। এই রূপ-বিশ্বাস স্বচ্ছন্দ হইয়া আপনাকে সর্ব্বগ্লানিহীন সর্ব্বআসক্তিশূন্য মহিমাময় স্থানে বজ্রের দাঢ্যে ধরিয়া রাখিবে। হায়! কোথায় সেই সম্বোধি! কোথায় সেই পরাজ্ঞান! চৈতন্যের ভাবোত্তাপেই মাথা গরম করিলাম বুককেও ফোঁপরা করিয়া ফেলিলাম, সে চৈতন্যময় আমার ত হইলেন না!

তবুও আমি জ্ঞানী। লোকশিক্ষার জন্য প্রবন্ধ রচনা করিতেছি! এমনি জ্ঞানমায়ায় মূঢ় কত বড় বড় পাগল ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষা দিতে মানুষের মাথায় তরবারি চালাইয়াছে পর্য্যন্ত। কি বিচিত্র প্রহেলিকায় ঘেরা এই জগৎ!

জ্ঞানমায়ায় মূঢ় নীতিবিশারদ, একাদশবর্ষীয়া বিধবার নির্জ্জলা উপবাসের ব্যবস্থা দেয়। আর নিজে ষষ্টিবর্ষে বিপত্নীক হইলে নবম বর্ষীয়ার স্বামীত্বে বসিয়া তাহাকে সোহাগ সম্বোধন করিবার সময় একেবারেই একথা স্মৃতিপথে আনিতে পারে না যে হয়ত ইহাকেই একাদশ বর্ষে নির্জ্জলা একাদশী পালন করিতে হইবে!

উচ্চ জীবনের পিপাসায় বড় বড় কথা বলা, উচ্চ জীবনের মোহে দুর্ব্বলের উপর অকথ্য নৈতিক জুলুম করা, ইহাই জগতে একটা স্তর রচনা করিয়াছে। সত্যকার উচ্চজীবনকে ঢাকিয়া সে যেন যবনিকা খানির মত ঝুলিতেছে। তোমরা মুখে যে উচ্চ-জীবনের কথা বল সে জীবনের নেতা নিয়ন্তা যে ঈশ্বর! হায় মানুষ, তুমি কি করিবে? হয়ত অকপট অধৈর্য্যেই তুমি যাও, কিন্তু স্বভাব দোষে 'ভণ্ডামি'রই সৃষ্টি হইয়া যায়। হায় রে, সবই যে প্রকৃতি, প্রকৃতির মায়াজাল কে ছিন্ন করিবে? যে স্বভাবের অধীন তুমি, উচ্চভাব উচ্চ-সঙ্কল্পের পিছনে লুকাইলেই সে তোমায় ছাড়িবে কেন?

রাবণ ত অতবড় যোগী—অতবড় তপস্যায় যে দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল তার উপর আসনে সে ত বিষ্ণুর সেবক তাঁহারই বৈকুণ্ঠের দ্বারী! সেই রাবণ রামের সীতা হরণ করিল আর সেই সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী! অনন্ত কালের এই

মাতৃ সম্পর্ক অতবড় যোগী অতবড় তপস্বী রাবণের স্মৃতিপথে একদিনের জন্য কি ভাব জাগে নাই? জানিয়াও কি সে মায়ের উপর এই অত্যাচার স্পৃহা তেমনি জোরে পুষিতে পারিয়াছিল?

কথিত আছে, সোনার-লঙ্কা প্রায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে তখন অবশেষে একদিন মন্দোদরী কাঁদিয়া রাবণকে বলিলেন, আর পারি না, রামকে সীতা দিয়া তুমি সন্ধি কর।

রাবণও নাকি তেমনি কাঁদিয়া উত্তর দিয়াছিল—মন্দোদরি! অন্তর্যামী জানেন তাহাই করিবার জন্য আমার প্রাণ আগ্রহে ফাটিয়া যাইতেছে! পোড়া অদৃষ্ট তাহা হইতে দিবে না, সে যে রামের হাতে আমার মৃত্যু লিখিয়াছে। তবে শোন, রাম কে সীতা কে আমিই বা কে! তবুও আমরা প্রতিযোদ্ধা—এ যুদ্ধ আমি ত বাধাই নাই, আমার অদৃষ্ট-কৃত পাপের শাস্তি দিবে বলিয়া এ যুদ্ধ বাধাইয়াছে। শাস্তি শেষ না হইলে আমার সাধ্য কি সন্ধি করি। দেবগণের উপর, জগতের উপর যে অত্যাচার করিয়াছি, সেই অত্যাচার আমার যে ভীষণ রাক্ষস-স্বভাব গঠন করিয়াছে তাহার হাত হইতে ত আমার পরিত্রাণ নাই।

এই রাবণের মত আমরাও উচ্চজীবন পাইলেই পোড়া অদৃষ্ট তাহা ধরিতে দিবে কেন? জন্ম জন্মান্তরের আসক্তি বিষয়-সঙ্গ যে স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছে সেই স্বভাব ঈশ্বরের জন্য হৃদয়াসন সাজালেই অমনি তাঁহাকে সে পীঠ জুড়িয়া বসিতে দিবে কেন? সে আপনার অধিকার আপনিই ছাড়িবে তাহা কখনও হয় কি?

জগতের ঈশ্বর যিনিই হউন, রাবণের ঈশ্বর তাহার রাক্ষস-স্বভাব, তেমনি তোমার স্বভাব এক্ষণে কিছুদিন পর্য্যন্ত তোমার ঈশ্বর থাকিবে! আসল রাজার আসনে এই নকল রাজার হুকুম এ একটা নীবিড় জগৎ রহস্য। সংসার-কুহকের একটা বৃহৎ আশ্রয়-স্তম্ভ? তাই মানুষ! ভাব-ভূমিতে তুমি গিরিরাজের মত হইলেও জ্ঞান-ভূমিতে আপনার বামনাকার দেখিলে তোমাতে অনন্তের সম্ভাবনা ঈশ্বরত্বের দাবী সম্বন্ধে নিরাশ হইও না! ভাবিও না সংসারটাই সত্য। ভাবিও না পরমেশ্বরের অধিকার তোমার নাই। বরং উল্টা কথা ভাবিও।

ভাবিয়ো সংসার-তরঙ্গে গা ভাসাইয়া এতদিন কি করিয়াছি'—এই দীর্ঘ-জীবনে কত আবর্জ্জনা আত্মার উপর আসিয়া জমা হইয়াছে।

—শ্রীসত্যবালা দেবী

সংসার

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৈকেয়ী যখন রাজা দশরথের নিকট হইতে রাম-বনবাসের বর প্রার্থনা করিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত সমগ্র অযোধ্যা নগরী অভিষেকোৎসব-মুখরিতা, আনন্দ প্রবাহে প্লাবিত হইয়া আজ অতুল সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষত্রিয়কুলাধিপ মহারাজ দশরথের নয়নমণি রামচন্দ্র আজ পিতৃসিংহাসনের অধিকার লাভ করিবেন—তাই রাজ্যের সকল প্রজাই সে আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়া হৃদয়ের সহিত মহারাজকে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বের উপযুক্ত কুমারকে অভিনন্দিত করিতেছে—আর নীরব ভাষায় হৃদয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে। কুমার শ্রীরামচন্দ্র আজ যে প্রজারঞ্জনরূপ কঠোর দায়িত্বপূর্ণ ব্রতে অভিষিক্ত হইতে চলিয়াছেন, সেখানে রাজনীতি বিশারদ, বাহুবলশ্রেষ্ঠ প্রজাহিতৈষী আদর্শ নৃপতি এবং স্নেহময় পিতা অভিষেক কর্ত্তা;—পুত্রবৎসলা জননী স্নেহাশীষের ডালি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। রাজপুরুষেরা সকলেই সেই উপযুক্ত কুমারকে অযোধ্যার সিংহাসনে বরণ করিবার জন্য পুলকিতচিত্তে স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রস্তুতপরায়ণ। সর্ব্বোপরি শান্তিবিধায়িনী প্রেমময়ী ভার্য্যা আদর্শ রমণী সীতাদেবী তাঁহার অভিষেকরূপ সুখোৎসবের সঙ্গিনী। এ হেন নির্ব্বিবাদ নির্ব্বৈর রাজসিংহাসনের বিনিময়ে সহসা যখন বনবাসাজ্ঞা প্রচারিত হইল, তখন শ্রীরামচন্দ্র—

"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্॥"

—বলিয়া একমুহূর্ত্তে মণি-কাঞ্চনময় দুর্ল্লভ সুখ-সামগ্রীর বাস্তবপুরী হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হৃদয় টলিল না, স্বর্গ হইতে সহসা অন্ধকারময় ভূগর্ভে পতিত হইয়াও ধীশক্তি বিকৃত হইল না। তেমনি সদানন্দময় মূর্ত্তি লইয়াই শোকাতুর পরিবারবর্গ ও সন্তান-প্রতিম প্রজাদের সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। আর একদিন এমনি ইন্দ্রপ্রস্থের ইন্দ্রপুরী (?) ছাড়িয়া ভিখারীর বেশে মহারাজ যুধিষ্ঠির হাসিমুখে বনবাস ক্লেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দিগ্বিজয়ী শক্তির অন্যায় প্রয়োগ করিয়া মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেন নাই। তাহার পরিবর্ত্তে দেবত্ব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন।

এইরূপে একদিন আমার দেশের আমার পূর্ব্বপুরুষেরা একে একে মানুষ হইতে দেবতা হইয়াছিলেন,—আর বুঝিয়াছিলেন, "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" তাই ত্যাগই ভারতের আদর্শ। যদি আমরা আকস্মিক উত্তেজনায় বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়া তাহা অস্বীকার করি তবে তাঁহারা যেখানে মানুষ হইতে দেবতা হইয়াছিলেন, আমরা সেইখানে মানুষের নিম্নস্তর হইতে আরও নীচেই যাইব। এমন কি কার্য্যতঃ যদিও তাহাই হইতেছে তথাপি বুঝিবার উপায় নাই। কারণ যার কখন সুখের অনুভূতি নাই, আনন্দের অনুভূতি নাই,—দুঃখ নিরানন্দও সে বেশ বুঝিতে পারে না। আমাদেরও দিন বেশ চলিয়া যাইতেছে। আবার কি চাই? ভোগের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নিত্য নূতন বিলাস সামগ্রীর ছড়াছড়ি, আদর সম্মান, পদমর্য্যাদা আরও কতরকমের গৌরব, তারই সঙ্গে দুই চারিটা দেশী বিদেশী মিষ্টান্ন ত কোন বিষয়েরই ত্রুটী নাই। একেবারে ভরপুর। কারণ 'পেটে খেলেই পিঠে সয়'। এই সব অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের দেবত্বের আদর্শও আজকাল পরিবর্ত্তিত নূতন মূর্ত্তিতে বিরাজমান। আর "প্রতিজ্ঞা-মনুপালয়ন"এর দিন নাই। সে সব অতীতের স্মৃতি অতীতের বক্ষেই বিলীন হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এ গৌরবের মহিমাময় স্মৃতি-স্তম্ভ কি

বিলীন হইবার মত সামগ্রী? তাহাতে যে সকল প্রকার রত্নসম্ভারের একত্র সমাবেশ হইয়াছে—তাই ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না, মরিয়াও মরে না। আজ যদিও আমরা এই অনন্নভূত সুখের আস্বাদন ভুলিয়া গিয়াছি তথাপি ইহাকে ফিরিয়া পাইতেই হইবে, নতুবা গত্যন্তর নাই। যাহা আমার অস্থিমজ্জাগত,—শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহের সঙ্গে সঞ্চালিত, তাহাকে বাহিরে অস্বীকার করিলেও ছাড়িবার উপায় নাই। যে দুই পয়সার ত্যাগ দেখাইতে পারে না, সে রাজৈশ্বর্য্যের ত্যাগে যে কি আনন্দ তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? এ কথা অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু না বুঝিয়াই বুঝার সত্যকে অস্বীকার করিতে যাওয়াই যত অনর্থের মূল। যাহা আমার সাধ্যাতীত তাহাই অসম্ভব বা মিথ্যা এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

আজ আমরা ত্যাগের যে একটা বিকৃত মূর্ত্তি কল্পনার চক্ষে দেখিয়া থাকি তাহাই সর্ব্ববাদীসম্মত একমাত্র আদর্শ, একথা না মানিলেও সকলের পক্ষে কিছু যায় আসে না। তবে তাহাকে সমূলে বাদ দিলে আমরা বাঁচিতে পারি না। আমাদের সকল প্রকার সাধনার মূলমন্ত্রই ত্যাগ। কিন্তু ইহা কেবলই যে গেরুয়া আর বিভূতির দ্বারাই প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই। ভাই এর প্রতি ভাই এর স্বার্থত্যাগ, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের স্বার্থত্যাগ, দরিদ্রের প্রতি ধনীর স্বার্থত্যাগ;—ইত্যাদি সকল প্রকার ত্যাগই যখন আমাদের সন্তানের প্রতি মায়ের স্বার্থত্যাগের ন্যায় স্বাভাবিক ও মধুর হইয়া উঠিবে তখনই ত্যাগের প্রকৃত আনন্দ বুঝিতে পারিব। তখনই বুঝিতে পারিব, ত্যাগের দ্বারা হৃদয়ে কত শান্তি কত আনন্দ পাওয়া যায়। তখন আরও বুঝিতে পারিব যে, একটা অনাহারী পথের ভিখারীকে নিজের গ্রাসের অন্ন দিয়া উপবাসী থাকায় কত আনন্দ,—দুঃখীর দুঃখে দু ফোঁটা চোখের জল পড়ারও কত আনন্দ। এ সব আনন্দ মানুষ যে হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারে তাহা আশৈশব প্রতি পদে পদে ঐ ত্যাগ মন্ত্রের সাধনায় গড়িয়া উঠে। শেষে তাহার দ্বারাই মানুষ বিশ্বপ্রেমিক হয়, ভগবানকে ভালবাসিতে শিখে। আমার দেশের আমার ঋষি তপস্বী পূর্ব্বপুরুষেরা

এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াই বুঝিয়াছিলেন,—"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"।

সেই মন্ত্রই কত নূতন ছন্দে নূতন সুরে আজ পর্য্যন্ত শুনিয়া আসিতেছি। তাই আচার্য্য বলিয়াছেন,—

"মা কুরুধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥"

আবার কখন কবির ভাষায় শুনি,—"তোহে বিসরী মন তাহে সমাপনু, অব মঝু-হব কোন কাজে। কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা। তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত সাগর-লহর সমানা॥" সেই আদি সেই অন্ত, মধ্যের পথটুকু আমাদিগকে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া যাইতে হইবে; এবং প্রকৃত আনন্দের অবস্থাটুকু খুঁজিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে আর পথের ক্লান্তি সেই লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিতে বাধা দিবে না।

সমাজচ্যুত কিশোরীমোহন বাবু পুত্র নরেন্দ্রনাথকে এই সব কথা শুনাইতেছিলেন। বক্সু সরকারের বাড়ীতে যেদিন তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হন, সেই দিনই গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি সপরিবারে এবং বন্ধুবান্ধব সহিত সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। সেই দিন প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহার যেরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার-ব্যবহার তাহাতে কোন নিষ্ঠাবান হিন্দু তাঁহাকে লইয়া সমাজে চলিতে পারেন না। কিন্তু তিনি যদি বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং কৃত-অনাচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে সমাজে লওয়া যাইতে পারে। তিনিও প্রকাশ্যেই বেশ ভাল করিয়া শুনাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন যে, আমি আপনাদের সমাজে থাকিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ি নাই; সুতরাং অতটা অনুগ্রহ না দেখাইলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। সেইদিন হইতে তিনি গ্রামের ভদ্র সন্তানদের সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক নূতন প্রণালীতে দিন

কাটাইতে লাগিলেন। পুরোহিত তাঁহার বাড়ীতে পূজা বন্ধ করিলেন, নাপিত ক্ষৌর কার্য্য বন্ধ করিল, এমন কি গ্রামের সকলেই ছেলে মেয়ে পর্য্যন্ত তাঁহাদের বাড়ীর কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলিত না। কৃষক-শ্রেণীর অধিকাংশের উপর কিশোরীমোহন বাবুর একটা আন্তরিক দাবী ছিল তাই তাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। তিনি এখন তাহাদিগকে লইয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে লইয়া নানারূপ সদুপদেশ দান ও সরল ভাষায় ধর্ম্মচর্চ্চা ইত্যাদিও করিতেন। কিন্তু তাহারা যাহাতে আত্মিক শক্তি লাভ করিতে পারে ও নিজেরা বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগকেও উচ্চ জাতির ন্যায় একই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাহাদেরও মানুষ হইবার অধিকার আছে, এই বিষয়েই সমধিক চেষ্টা করিতেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি একটী কৃষক-সঙ্ঘ স্থাপিত করিয়াছিলেন; সেখানে মধ্যে মধ্যে সকলকে সমবেত করিয়া বক্তৃতাদি দিতেন।

গ্রামের অধিকাংশ ভদ্রলোকের অমত হওয়ায় ইন্‌সপেক্টর সাহেব কতকটা বাধ্য হইয়া বিনয়কে হেড্‌মাষ্টারের পদ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। সেই সঙ্গে হেড্‌পণ্ডিত মহাশয়ও পদচ্যুত হন, এবং স্কুলটী সম্পূর্ণভাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দলের অধীনে আসে। কিশোরী-মোহন বাবু অধিকাংশ গরীব লোকের ছেলে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া-ছিলেন। নিজেদের জেদ বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা ঐ সকল ছাত্রদের পূর্ব্বের ন্যায় অবৈতনিক ভাবেই থাকিতে দিলেন। কিন্তু কৃষক সম্প্রদায় তাহাদের ছেলেগুলিকে স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে কিশোরীমোহন বাবু তাহা হইতে দিলেন না। কারণ তিনি মনে করিলেন যে, কোন একটা প্রতিষ্ঠান গড়া যত কঠিন, ভাঙ্গিয়া ফেলা তত কঠিন নয়। এত যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি যে স্কুলটী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা যাহাতে কোন রকমে ভাঙ্গিয়া না যায় পরোক্ষভাবে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজে-কাজেই স্কুলটীর ছাত্রসংখ্যা আপাততঃ কম হইল না। কিন্তু দিন দিন শ্রীহীন হইতে লাগিল।

এই সকল ঘটনার পর দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসরের বেশী গত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে দুইবার শান্তির বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল, কিন্তু পাত্রপক্ষীয়েরা গ্রামে আসিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে তিনি সমাজচ্যুত তখন অগত্যা সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া গেলেন। এদিকে হেড্‌মাষ্টারীর পদ ছাড়িয়া দিয়া বিনয় দিনকতক হরিপুরেই ছিল। তারপর একদিন সেও সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত তাহার আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। নরেন এম, এ, পরীক্ষা দিয়া আসিয়া সম্প্রতি বাড়ীতেই ছিল, এবং কোন একটী চাকুরীরও চেষ্টা করিতেছিল।

মানুষের জীবনে যখন প্রতিকূল ঘটনা আসে তখন একেবারে উপর্য্যুপরি আসিতে থাকে এবং তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং কিশোরীমোহন বাবুরও সে বিষয় ত্রুটী হইল না। নিকটবর্ত্তী গ্রাম কালীপুরের জমিদার বাবুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া বিপক্ষদল তাঁহার নামে এক মিথ্যা মোকৰ্দ্দমা খাড়া করিল। তাহার ফলে তাঁহার অনেকগুলি অর্থ ব্যয় ও কতকটা ভাল জমি হস্তচ্যুত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি দমিয়া যাইবার পাত্র ছিলেন না। বিপদকে কিরূপ ধীরবুদ্ধিতে পদদলিত করিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাই এত করিয়াও কেহ তাঁহার প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায়ই, ধীর-স্থির ও সদানন্দচিত্তে দিন কাটাইতেন। আজ হঠাৎ দেশ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়ায় তিনি নরেনকে কতকগুলি উপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময় পিওন কয়েকখানি চিঠি দিয়া গেল। তাহার মধ্যে দুই খানি চিঠি নরেনের নামে লিখিত। একখানিতে তাহার এম, এ পরীক্ষার ফল,—তাহারই কোন সহপাঠী লিখিয়াছিল। তাহাতে জানিতে পারিল যে সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর একখানি চিঠি তাহাদের একজন অধ্যাপক লিখিয়াছিলেন। নরেন পরীক্ষায় ভালরূপে কৃতকার্য্য হওয়ায় তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং আরও লিখিয়াছিলেন যে, সে যদি এখানে আসে তবে কোন

একটী প্রাইভেট কলেজে একটী লেক্‌চারারের পদ যোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন। ইহার পর বেশ আনন্দেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

কৃতকার্য্যতার আনন্দ নরেনকে আজ বেশ একটু উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু তার বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল যে, শান্তিকেও এই সঙ্গে লইয়া গিয়া বেথুনে ভর্ত্তি করিয়া দিবে। অনেক রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে কিশোরীমোহন বাবুর নিকট এই কথা উত্থাপন করিল। কিশোরী-মোহন বাবু যে ইহাতে সম্মতি দিবেন ইহা সে ভাবে নাই, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, ভাবিয়াই কথাটার উত্থাপন করিল।

কিশোরীমোহন বাবু নরেনের প্রস্তাব শুনিয়া একটু গম্ভীরভাবে নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"তোর মতলব কি বল্ দেখি? আমি ত ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। ওকে শিক্ষা দেওয়াই ত উদ্দেশ্য, না আর কিছু? আমার বোধ হয় তুই ওকে সার্টিফিকেট পাওয়াবার জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে চাস্। কেমন?"

নরেন অতিমাত্র সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—"ঠিক সার্টিফিকেট পাওয়ার কথাই বল্‌ছি না। তবে শিক্ষার সঙ্গে ওটারও একটু সম্বন্ধ আছে বৈ কি? কারণ কৃতকার্য্যতার চিহ্নস্বরূপ আমরা সার্টিফিকেট পাই বলেই তার সঙ্গে যেন সেই সফলতার আনন্দ জড়িত থাকে। তারপর ...."। কিশোরীমোহন বাবু আর বলিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ সফলতার আনন্দ ঐ সার্টিফিকেটের সঙ্গে জড়িত থাকে বলেই ত আমরা কোন রকমে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে'—অধিকাংশ জায়গায় নিজেকেই নিজে ফাঁকি দিয়ে দৌড়বাজীর সীমানায় পৌছতে চাই! কিন্তু অলক্ষ্যে আর একটা জিনিষ আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যা-বুদ্ধিকে অভিভূত করে রাখে, সেটা হচ্ছে চাকুরীর মোহ। মোহাচ্ছন্ন শিক্ষা কখনও শিক্ষা নামের যোগ্য নয়, তাই বড় বড় পাশ করে'ও আমাদের মধ্যে প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠে খুব কম। শিক্ষার মহিমা সেইখানেই প্রকাশ, যেখানে তার উদ্দেশ্য কেবলই শিক্ষা। বিশেষতঃ

মেয়েদের শিক্ষায় সেই উদ্দেশ্য থাকাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ তারা ত আর চাকুরী করতে যাবে না? ভগবান না করুন,—শান্তির যদি উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে না পারি, তাহলেও অন্ততঃ তার জীবিকানির্ব্বাহের মত একটা কিছু উপায় আমি করে' যেতে পারব। সেজন্য বোধ হয় বেথুনের সাহায্য না নিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। দেখ্ নরু! আমাদেরও একদিন তোদের মতই স্ফূর্ত্তিময় জীবন ছিল; সে সময় আমরাও অনেক রকম জল্পনা কল্পনা করেছি, অনেক রকম অলীক স্বপ্নও দেখেছি। কিন্তু এখন বুঝ্তে পারছি—তার মূল্য কতটুকু। আজকাল আমরা মেয়েদের যে শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে ইচ্ছুক, সেটা কি খাঁটি—ছেলেদের এই গোলামী শিক্ষার অনুকরণেই নয়? আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার যতই কেন সদ্‌গুণ থাকুক, তার সঙ্গে আমাদের জীবনসমস্যার অনুপযোগী অনেক অকেজো জিনিষ উদরস্থ করে' থাকি। আমরা আজকাল জগতের অনেক বড় বড় জাতির প্রিয় আদব-কায়দা অনুকরণ করে' থাকি। অবশ্য, বড় আদর্শের অনুকরণ করলে মানুষ নিজে বড়ই হয়ে' থাকে একথা সত্য; কিন্তু আমরা তা পারি কি? কোন একটা শক্তিশালী জাতির জাত্যাভিমান, তার অটল অধ্যবসায়, তার স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম, তার অজেয় শক্তি, তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-পালনের ক্ষমতা আমরা কয়জন অনুকরণ করি বা অনুকরণ করতে চেষ্টা করি? তবে যেটাতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাব সেটার অনুকরণ করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। মেনে নিলাম শান্তি 1st divisionএ ম্যাট্রিক বা I. A. পাশ করলে। তারপর—? তারপর যতই কেন না বড় পাশ করুক,—আমি বেঁচে থাক্‌তে কোনও দুর্ব্বল মনুষ্যত্বহীন—বাবু Certificate-holderএর সঙ্গে তার বিয়ে দিব না। কারণ তাকে যদি আমি প্রকৃত গৃহিণী ক'রে তুল্‌তে পারি, তবে তার উপযুক্ত গৃহস্থের সঙ্গেই বিয়ে দিব। সেখানে সে মায়া-কাননের ফুলের দেবী হয়ে বসে থাক্‌বে না। তাকে সংসারের সুখ-দুঃখের ভাগিনী হ'তে হবে, কঠোর সংযম শিখ্‌তে হবে, দেব-দ্বিজ অতিথির প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে হবে;—সকলের উপর তাকে

একটী বৃহৎ সংসারের স্নেহময়ী মা,—বোন,—অধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপা—আবার কখন বা সেবার পরিচারিকা হ'তে হবে। পারবে কি? Certificate কি এত শক্তি দিতে পারে? সেখানে লেখাপড়ায় যদি সে খুব ভাল ফল লাভ করে, তবেই তার ইতিহাস, গণিত, ভাষা—কাব্য অলঙ্কার ইত্যাদির স্থির লক্ষ্য হবে—শতকরা যাট নম্বরের বেশী কি উপায়ে রাখা যায়—আর যদি তা না হয়, তবে সুকুমার ফুলের র'ণীটী সেজে তেত্রিশের আশাতেই কোন রকমে অমূল্য সময়টুকু কাটিয়ে দিবে। উপরন্তু কতকগুলি অর্থনাশ ক'রে সংগ্রহ করিবে কি?—না জীবনের সঙ্গে যা মিল্ খায় না, এরূপ কতকগুলি অনিয়ন্ত্রিত ভাবের খিচুড়ি। আমি এতে কখনই সম্মত হ'তে পারি না।"

নরেন এতক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল এবং পিতার এই কঠোর যুক্তিপূর্ণ তীব্র উপদেশগুলি শুনিতেছিল। অথচ প্রতিবাদ করিতেও সাহসে কুলাইতেছিল না। আজ এতগুলি কথা শুনিয়া সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। কারণ তাহার উচ্চশিক্ষিত পিতা যে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে এতটা বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন তাহা সে কোনদিনই বুঝিতে পারে নাই। বরং শান্তির শিক্ষার প্রতি কিশোরীমোহন বাবুর আন্তরিক যত্ন দেখিয়া সে মনে করিয়াছিল যে, বেথুনের প্রস্তাবে তিনি অনেকটা সুখী হইবেন। এখন এতগুলি মন্তব্য শুনিয়া সে বড় হতাশ হইয়া পড়িল; এবং বেথুনের প্রস্তাবের পশ্চাতে তাহার মনে যে আর একটী প্রস্তাবের রঙ্গীন কল্পনা উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল তাহা সহসা অনেক দূরে সরিয়া পড়িল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেইরূপ হতাশ ব্যঞ্জক স্বরেই বলিল,—

"তবে কি আমাদের আধুনিক শিক্ষা প্রণালী—বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার ধারাটা একেবারেই ভুল রাস্তায় চলেছে? এর দ্বারা কি আমরা কিছুই উপকার পাচ্ছি না?"

কিশোরীমোহন বাবু বলিলেন,—সেত আগেই বলেছি,—উপকার হয়ত পাচ্ছি; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নয়। উপকার পেয়েও সেটা কোন কাজে লাগাতে পারি না। আমি অস্বীকার করতে পারি না যে বর্ত্তমান

শিক্ষা আমাদের অনেক ঋণ দিয়েছে। সেটা আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের সম্বন্ধে। কিন্তু আমাদের আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী আগাগোড়াই ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ; এতে আর কোনও সন্দেহ নাই। এ ভ্রমের বিষময় ফল আমাদের ছোট বড় সকলকেই অল্প বিস্তর জর্জ্জরিত করতে আরম্ভ করেছে। এখনও যদি এর কোন প্রতিকার না হয় তবে ভবিষ্যতে যে কি হবে, তা ভগবানই জানেন। কারণ যে দেশের শিক্ষা-দীক্ষার গুণে মানুষ একদিন জীবন্ত দেবতা হয়েছিল; সেখানের নারী আজ প্রাতঃ-স্মরণীয়া দেবী,—সেখানকার সেই উপাদন দিয়ে যদি আমরা শুধু মালাকারের ভূষণে সজ্জিতা মাটীর প্রতিমা গড়ি, তবে আক্ষেপের আর বাকী কি?"—" কিশোরীমোহন বাবু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় কয়েকখানি চিঠি লইয়া আসায় তাঁহাদের আলোচনা ঐখানেই বন্ধ হইল। এক্ষণে চিঠির দিকেই মন দিতে বাধ্য হইলেন। কারণ একখানি চিঠি আজ বহুদিনের পর বিনয়ের কাছ হইতে আসিয়াছিল। অপর দুইখানির মধ্যে একখানি তাঁহার ভাবী বৈবাহিক অর্থাৎ শান্তির ভবিষ্যৎ শ্বশুর এবং অপরখানি নরেনের বন্ধু ইন্দুভূষণ মিহিজাম হইতে নরেনকে লিখিয়াছিল। সব চিঠিগুলিই তাঁহাদের দুই জনেরই আকাঙ্ক্ষনীয় ছিল, তাই সমস্ত মনোযোগ নিমেষের মধ্যে তাহাতেই বিলীন হইয়া গেল; এবং এখনকার মত সব আলোচনা নিস্তব্ধ হইল। একটু পরেই নরেন ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"ষ্টেশনে একখানা গাড়ী পাঠাতে হবে; আজ ভোরের ট্রেণে ইন্দুবাবু আসবেন" বলিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

—শ্রীঅজিতনাথ সরকার

ধর্ম্মের স্বরূপ*

১

সমস্ত সমাজেই সময় সময় লোকের ধর্ম্মের আদর্শ এরূপ হীন হইয়া যায় যে, মানুষ ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মটা তখন শুধু আচার পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ করে, কাজেই ধর্ম্মের প্রভাব তাহাদের জীবনে অতি সামান্যই পরিদৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মের ঈদৃশ দুরবস্থার সময় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি প্রচলিত ধর্ম্ম শিক্ষার প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। ইঁহারা মনে করেন সাধারণ লোককে একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত করাইবার জন্যই ধর্ম্মটার যা প্রয়োজন রহিয়াছে। আর সাধারণ লোকও জড়তা হেতুই যেন প্রচলিত ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম পদ্ধতিগুলি পালন করিয়া যায়,—তাহারা প্রাণের টানে কখনও ধর্ম্মানুরাগী হইয়া জীবন গঠন করিতে প্রস্তুত হয় না, শুধু রাজকীয় বিধি অথবা সমাজের প্রথা লঙ্ঘনে অসমর্থ বলিয়াই ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকে। মানব সমাজে এই নিয়ম সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্যদেশের ধনকুবের ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাহারও কাহারও মতে ধর্ম্মটা শুধু যে একটা অকাজের জিনিষ তাহা নহে। ইহা বরং সমাজের ক্ষতিকর একটা ব্যাধি বিশেষ। ধর্ম্ম যে একটা উপলব্ধির জিনিষ, ইহা তাঁহারা কখনও মনে করেন না। বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া লোক যেমন রোগ নির্ণয় করিয়া থাকে, তাহারাও সেরূপ লোকের বাহির দিক দেখিয়াই ধর্ম্মের মাত্রা ওজন করিতে চাহেন।

আবার কেহ কেহ বলেন, বিভিন্ন প্রকৃতির অবস্থার মধ্যে আত্মা পরিকল্পনা হেতুই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারো কাহারো মত—পরলোকগত পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সহিত সংযোগ রাখিবার কল্পনায়ই মানুষ

---

* ঋষিকল্প টলষ্টয়ের "What is Religion" নামক নিবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছে। প্রাকৃতিক ব্যক্তির প্রতি ভয়-বশতঃই ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, একথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এগুলির অনুরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া একেবারে ধর্ম্ম জিনিষটা উড়াইয়া দিতে চাহেন। ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হেতুই লোকের অবনতি ঘটিতেছে, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এই সকল বিজ্ঞ লোক বলিয়া থাকেন, লোক যখন অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ছিল, তখনই ধর্ম্মের যুগ গিয়াছে। এখন আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করিতেছি, শুদ্ধ বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস আছে। বিজ্ঞান আজ ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং মানব জাতিকে শীঘ্রই উন্নতির চরম সীমায় লইয়া যাইতে পারিবে—যাহা কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Berthelot এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—ধর্ম্মের দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন ধর্ম্মের স্থান বিজ্ঞানেরই অধিকার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এমন একজন পণ্ডিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের আবাসস্থল একটা প্রসিদ্ধ নগরে এমন একটা কথা বলিয়া সরিয়া গেলেন, কেহ ইহাতে একটু প্রতিবাদও করিল না—সে জন্যই এই কথাটী উল্লেখযোগ্য।

Berthelot বলিতেছেন জগৎ পূর্ব্বে একটা প্রাকৃতিক শক্তি ও ধর্ম্মের বলেই পরিচালিত হইত, কিন্তু সেগুলির স্থান বিজ্ঞানই আজ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি বিজ্ঞান কথাটী 'সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান' এই ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞান সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত, কাজেই এই সঙ্কীর্ণ অর্থবোধক বিজ্ঞান ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবে, একটা অসম্ভব ব্যাপার।

ধর্ম্ম আজকাল আর কাজের জিনিষ নহে। বিজ্ঞান ব্যতীত জগতে অপর কোন বিষয়ে শুধু অজ্ঞেরাই বিশ্বাসবান। বিজ্ঞানবলে আমাদের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই আমরা লাভ করিতে পারিব। সুতরাং শুধু বিজ্ঞানে বিশ্বাস রাখিয়াই আমরা জীবন গঠন করিতে পারিব—এ কথাই বিজ্ঞানবাদীরা প্রচার করিতেছেন, আর যাহা

কখন বিজ্ঞানের বিন্দু-মাত্র জ্ঞানও লাভ করে নাই এমন শত শত লোকও এই কথার ধূয়া ধরিতেছে।

যদিও আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ধর্ম্মকে একেবারে জগত হইতে তাড়াইয়া দিতে বদ্ধপরিকর, তথাপি ধর্ম্ম ব্যতীরেকে এ পর্য্যন্ত কোন মানব-সমাজ বা বিচারক্ষম ব্যক্তি বাঁচিতে পারিয়াছে, একথা কি কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন? বিচার-ক্ষমতা আছে বলিয়াই মানুষ পশুজীবন যাপন না করিয়া ধর্ম্মের জন্য সতত লালায়িত। মক্ষিকা মধু আহরণ করিয়া নিজেদের উদর পূরণ করে, সন্তানকে খাওয়ায়, আর ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে, ইহাতে অপরের লাভ কি ক্ষতি হইল, এমন চিন্তাও কদাপি তাহার মনে উদিত হয় না। কিন্তু মানুষ শস্য সংগ্রহ করিবার সময়ই ভাবিবে, তদ্দারা ভাবী ফসলের কোন অনিষ্ট হইবে কিনা, প্রতিবেশীর খাদ্যের অনটন ঘটিবে কিনা। ইতর প্রাণীগণের বুদ্ধিবৃত্তির একটা সীমা রহিয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় না। কিন্তু মানুষের সেই শক্তির কোন সীমা নাই। মানুষের বিচার-শক্তি প্রবল, কিন্তু ইতর প্রাণীর তাহা মোটেই নাই। কাজেই ইতর প্রাণী যাহা নিয়া সন্তুষ্ট থাকে মানুষ তাহাতে তৃপ্ত থাকিবে কিরূপে? মানুষ ভাবে, তাহার জীবনে নিত্য যে সব ঘটনা ঘটিতেছে তাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ রহিয়াছে কিনা, আর তার চেয়েও অধিক ভাবে—অনাদি অনন্ত বিরাট শক্তির সহিত তাহার কি সম্পর্ক বর্ত্তমান, তৎসম্বন্ধে। সে নিজকে এই অনন্ত পুরুষের অংশ বলিয়া মনে করে এবং প্রতিকার্য্যের জন্য উহার নিকট হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে—ইহারই নাম ধর্ম্ম। কাজেই এই ধর্ম্ম ব্যতীত মানব সমাজ পরিচালিত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

ধর্ম্মই ঈশ্বর ও মানবের সংযোগের একটী শৃঙ্খল। একজন দার্শনিক বলিয়াছেন, যদ্দারা আমরা ঈশ্বরে নির্ভরশীলতার প্রয়োজন বোধ করি, তাহারই নাম ধর্ম্ম। অপর একজন কহিয়াছেন, যদ্দারা মানুষ মানবের অসাধ্য একটা রহস্যময় শক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধটুকু উপলব্ধি করিতে পারে—যে শক্তির নিকট তাহার সর্ব্বদা মস্তক অবনত রাখিতে হয় তাহাকেই ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যায়।

ধর্ম্ম মানব জীবনেরই একটা সূত্র। মানবের আত্মা এবং রহস্যময় স্বর্গীয় আত্মার সহিত যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে তদুপরিই ইহা প্রতিষ্ঠিত। ঐ রহস্যময় পদার্থই যে প্রত্যেক মানবের উপর এবং সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আছে, এবং তাহার সহিত প্রত্যেক মানুষই যে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ, ইহা সকলে না হইলেও জগতের অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করিতে পারে।

যে ধর্ম্ম মানুষের জীবনের সহিত অনন্তের সংযোগ করিয়া না দিতে পারে, তাহা ধর্ম্মই নহে।

যে অনন্ত জীবন মানুষের জীবনকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার সহিত মানুষ যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করে এবং যাহা তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ইহাই ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা যায়।

কোন সমাজই ধর্ম্মব্যতীত বাঁচিতে পারে নাই এবং কস্মিনকালেও পারিবে না। তবে সময় সময় ধর্ম্মের আদর্শ হীন হইয়া যায় মাত্র, কিন্তু তাহাই আবার নববলে সঞ্জীবিত হইয়া নূতন আদর্শে গঠিত হইয়া সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। (এদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সন্ধিক্ষণে সমাজের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল।) গ্রীক ও রোমীয় ধর্ম্মের অবনতির সময়ও একই অবস্থা ঘটিয়াছিল, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম তখন নূতন আকারে সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিল। কোন ধর্ম্মই সেই অনাদি অসীমের ক্ষমতার কথা উপেক্ষা করিতে পারে না এবং ইহারই সহিত নিজ ক্ষুদ্রত্বের তুলনা করিয়া মানুষ জীবনকে সুপথে পরিচালিত করিতে ব্যগ্র হয়। সেই শক্তিকে জীবন্ত বা মৃত মানুষ বা ঈশ্বর বায়ু বা বিদ্যুৎ যাহাই মনে করুক না কেন কিন্তু তাহার অমানুষিক ও অসীম ক্ষমতার বিষয় কেহই সন্দীহান নহে।

২

ভাব বা অনুভূতি বিচারশক্তি ও কল্পনার বলেই মানুষের যত কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর চিকিৎসকগণের মতে যাদুবিদ্যাটা এই—কল্পনার আতিশয্যমাত্র। মানুষ যখন অনুভূতিরবশে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তখন সে কোন একটা জিনিষ পাওয়ার বাসনা করে,

কিন্তু ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারে না। কেবল বিচার শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ কি করা শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝিয়া লইতে পারে মাত্র। আর কখন কখন মানব নিজের কল্পনার-বলে অথবা অন্যের কল্পনার আশ্রয় লইয়া আপনা আপনিই কাজ করিয়া যায়' কেন করে সে যেন কিছুই টের পায়না। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের সকল কাজেই অনুভূতি, বিচারশক্তি ও কল্পনা—এই তিনটী বৃত্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানুষের অনুভূতি তাহাকে কোন একটা দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু বিচার-শক্তি ভূত-ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া দেখে, ইহা সম্পন্ন করা সঙ্গত কিনা, তার অনুভূতি যাহা উদ্বুদ্ধ করে, যুক্তি যাহা অনুমোদন করে, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কল্পনা মানুষকে পরিচালিত করিয়া থাকে। অনুভূতি না থাকিলে মানুষ কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইত না, বিচার শক্তি না থাকিলে মানুষ বিরুদ্ধভাবের কার্য্য করিয়া ফেলিত ; তাহার নিজের পক্ষেও অনিষ্টজনক হইত, অপরেরও হানিকর হইয়া দাঁড়াইত। যদি মানুষের কল্পনা শক্তি না থাকিত অথবা মানুষ অপরের কল্পনায় চালিত হইতে নারাজ হইত, তবে সে অনুভূতির প্রেরণায় 'আজ এটা কাল সেটা' করিয়া শুধু ব্যর্থতার মধ্যেই জীবন যাপন করিত। সুতরাং এই তিনটী মানসিক বৃত্তির কোনটীরই প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। অনুভূতির প্রেরণায় মানুষ একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে চায়, তখনই বিচার-শক্তি তাহা অনুমোদন করিয়া তৎসম্পাদনের উপায় উদ্ভাবন করে এবং শরীরের পেশীগুলিও তদনুযায়ী কার্য্য করে, তখনই লোকটী অপরের প্রদর্শিত-পথে চলিতে আরম্ভ করে। গমনকালে তাহার অনুভূতি এবং বিচারশক্তি অপর কাজের জন্য মুক্ত থাকে। লোক কল্পনার বশীভূত না হইলে এরূপ ঘটিত না। সমস্ত জাগতিক কার্য্য সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। আর সব চেয়ে বেশী খাটে ইহা আধ্যাত্মিক কর্ম্ম সম্বন্ধে। মানুষের অনুভূতিই পরমেশ্বরের সঙ্গে তাহার একটা সম্বন্ধস্থাপন করিতে ব্যগ্র হয় এবং বিচারশক্তি সেই সম্বন্ধটা কি তাহাই বুঝাইয়া দেয়, আর কল্পনা সেই সম্বন্ধানুযায়ী কার্য্যে মানুষকে প্রবর্ত্তিত করে।

যতদিন পর্য্যন্ত লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবল থাকিবে, ততদিন এই তিনটীর কার্য্য সমভাবেই চলিতে থাকিবে; কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গেলে, কল্পনা মানুষের সম্মুখে কত আকাশ পাতাল সৃষ্টি করিবে, তখন অনুভূতি এবং বিচারশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। মানুষ যখন শুধু কল্পনার বশীভূত হইয়া পড়ে, তখনই যত বিপদ। সকল ধর্ম্মের অবনতিকালেই লোকের এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আর ঠিক তখনই এমন কতিপয় লোকের সৃষ্টি হয়, যাঁহারা সাধারণ লোক এবং ভগবানের মধ্যে একটা সংযোগ-স্থাপন করিতে আসেন, আর তাঁহারা কিছু অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তখন কতকগুলি পুস্তকের বাক্যকে ভগবানের অপরিবর্ত্তনীয় বাণী বলিয়া গ্রহণ করা যায়, সেগুলি অতি পবিত্র ও অমোঘ বলিয়াই গৃহীত হয়। যখন যাদুমন্ত্রের মত লোকজন ঐ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখনই তাহারা ভগবান ও মানুষের মধ্যে সংযোগ-স্থানীয় ঐ সমুদয় লোকের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে—তাঁহারাও তখনই সকল লোকই যে ভগবানের চক্ষে এক, এই সাম্য মত গোপন করিয়া থাকেন। তাহাতেই ধর্ম্মের অবনতির বীজ উপ্ত হয়। ইহা হইতেই ক্রমান্বয়ে জাতিভেদের সৃষ্টি হয়, মানুষ উচ্চ নীচ, পাপী পুণ্যাত্মা ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

মানুষ নিজ বিশ্বাসের বলেই জগতে যত কিছু কার্য্য করে। বিশ্বাস একটা ভ্রান্ত ধারণা নহে, কোন কিছু প্রাপ্তির আশায় মানুষের বিশ্বাস বিচলিত হয় না। ধর্ম্মপুস্তকে কিছু লিখিত রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ সে কথা মানিয়া লয় না, বিশ্বে তাহার স্থান কোথায় এই ভাবনা হইতেই মানুষের বিশ্বাস গঠিত হয়। কৃষক চাষবাস করে, নাবিক সমুদ্রযাত্রা করে—তাহাদের প্রবৃত্তি সেদিকে তাহাদিগকে পরিচালিত করে বলিয়া—কোন ধর্ম্মবিশ্বাসের বলেও নয়,—অদৃষ্ট পুরুষের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়াও নয়, অথবা কোনরূপ পুরস্কার লাভের আশায়ও নয়। একজন ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক যে একটু স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করেন, ইহার কারণ তাঁহার অদৃষ্ট পুরুষে বিশ্বাস জন্মিয়াছে বলিয়া নয়, বিশ্বে তাঁহার

কোথায় স্থান, এ বিষয় ভাবিয়া স্বভাবতঃই যেন তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। সমাজে যার যার স্থান সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই এক এক জন এক এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যে মনে করে—ভগবান অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শ্রেষ্ঠজীবরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার আশ্রয় লাভ করিতে হইলে আমাকে তাঁহার ইচ্ছা বা আদেশানুযায়ী কাজ করিতে হইবে—সে সেইভাবেই কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতেছে। আবার যে মনে করে,—আমি অনেক বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি—আমার স্বীয় কার্য্যের উপরই পরবর্ত্তী জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করিবে, সে সেইভাবেই জীবন-যাপনে চেষ্টিত আছে। আর যে এই দুইটীর কোনটীতেই বিশ্বাসবান নহে যে মনে করে,—মানুষের জীবন কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি-মাত্র—মানুষের সৎকার্য্য বা অসৎ কার্য্যের জন্য তাহাদের জীবনের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে—ইহা নিতান্ত অলীক কথা—সে আবার একটা ঔদাসীন্যময় জীবন যাপন করিতেছে—'ঋণং কৃত্বা' ঘৃতপান করিতেছে।

জগতে এরূপ বিভিন্ন লোকের বিভিন্নরূপ বিশ্বাস বর্ত্তমান। কেহ কেহ মনে করিতেছে, তাহাদের এখানে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এই যে বিশ্বাস তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। তবে তন্মধ্যে প্রভেদ এই, ধর্ম্ম বলিতে আমরা আমাদের বাহিরে দ্রষ্টব্য কিছু মনে করি, আর বিশ্বাসটা নিজের অন্তরে উপলব্ধি করিবার জিনিস। অনন্ত বিশ্বের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তৎজ্ঞানের নামই প্রকৃত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলেই মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কাজেই প্রকৃত বিশ্বাস কখনই যুক্তি-সম্মত না হইয়া পারে না, এবং আধুনিক জ্ঞানের সহিতও তাহার কোন অনৈক্য ঘটিতে পারে না।

যে প্রাচীন ইহুদিরা অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট পুরুষে বিশ্বাসবান ছিলেন এবং তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি পালনে তিনি জীবের মঙ্গল করেন, ইহা যাহাদের ধারণা ছিল, তাঁহাদের বিশ্বাসও অজ্ঞানতা-প্রসূত বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

(সেই একইরূপ বিশ্বাসের বলেই হিন্দু জীব-মাত্রেই আত্মা উপলব্ধি করেন, এবং জীব নিজ কর্ম্মের বলে উচ্চজীব হইতে নীচ জীবে পরিণত হয় বা নীচ জীব হইতে উচ্চজীবে উন্নীত হইয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে।)

যাঁহারা এ জীবনটা একটা অমঙ্গলের আগার বলিয়া মনে করেন এবং চরম শান্তিলাভের জন্য বাসনা-জয়ই জীবনের লক্ষ্য স্থির করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসও যুক্তি-বহির্ভূত কিছু নহে।

৩

খৃষ্ট-ভক্তেরা মনে করেন, ভগবান সকলের আধ্যাত্মিক জনক। যাঁহারা আপনাকে ভগবানের তনয় এবং জগজ্জনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহারাই ইহজগতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন,—এ কথার মধ্যেও সেই একইরূপ বিশ্বাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোনটাই যুক্তি বহির্ভূত নয়, কাজেই যিনি যেভাবেই বিশ্বের সহিত নিজের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া জীবনটাকে শান্তিময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করুন না কেন, সবটারই একটা নৈতিক সুফল রহিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের অবনতি ঘটিলে লোক ভ্রান্ত-ধারণার বশীভূত হইয়া—নিজের সংকার্য্যের আশু ফললাভের জন্য ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকে, এবং ভগবানকে যেন তাহার কথামত চালাইবার প্রত্যাশা করে। এরূপ বিশ্বাস অন্ধতামূলক সন্দেহ নাই। প্রকৃত বিশ্বাস কি? প্রকৃত বিশ্বাস শুধু ভগবানের আদেশ পালনেই লোককে নিযুক্ত রাখে, মানুষ তখন কোন কিছুর আশা না রাখিয়া নিজকে ভগবানের চরণে বিকাইয়া দেয়।

আজকাল ধর্ম্মের আদর্শ সকল সমাজেই ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের সার মর্ম্মগুলি আওড়াইয়া অথবা বাহ্যিক আচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াই মানুষ নিজকে বিশ্বাসবান বলিয়া প্রচার করিতে চায়, ভিতরটা শুদ্ধ পবিত্র হইল কি না সেদিকে লক্ষ্য করিতেও চায় না।

দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও ধনাঢ্যেরাই ধর্ম্মের নাম শুনিতে পারে না,—দরিদ্র, অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রায় সকলেই প্রচলিত ধর্ম্মই পালন করিয়া যায়। মানুষ যে মানুষের উপর নৃশংস ব্যবহার করে, তাহার

কারণ শুধু ধর্ম্মহীনতা নয় জীবনের জটিলতাও তাহার অন্যতম কারণ। চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর মানব জাতির শত্রু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারাও বোধ হয় হাতে ধরিয়া মানুষ মারিতে দ্বিধা বোধ করিত। কিন্তু আজকাল আমরা এই জীবনের জটিলতাকে এতদূর সংক্রামিত করিয়া ফেলি যে, আমরা ইহার নির্দ্দয় আক্রমণটা একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারি না, কাজেই ইহা আরো বিভীষিকাময়ী হইয়া দাঁড়ায় এবং লোকের নির্দ্দয়তা ক্রমেই বাড়িয়া চলে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

মাধুকরী

সমুদ্রে একপ্রকার জীব আছে যাহাদের গায়ে আলো জলে এবং এই আলোক উত্তাপ-বিহীন। বৈজ্ঞানিকেরা এই উত্তাপহীন আলোক একত্রিত করিয়া সাধারণ কাজ-কর্ম্মে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা এই আলোকের নাম লুসিফারিন্ (Luciferin) দিয়াছেন। আমাদের দেশের জোনাকীর পশ্চাতেও উহা দেখা যায়। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই, নিউটন হারভে উক্ত লুসিফারিন একীভূত করিবার এক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাইপ্রেডিনা (Cypridina) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব হইতে তিনি এরূপ উজ্জ্বল উত্তাপবিহীন আলোক নিষ্কাসিত করিয়াছেন যে, তাহাতে খবরের কাগজ প্রভৃতি বেশ পড়া যায়। উক্ত জীবগুলিকে জল হইতে তুলিয়াই শুষ্ক করিয়া গুঁড়াইতে হয়। জল হইতে তুলিয়া অপেক্ষা করিলে উহাদের গায়ের লুসিফারিন্ বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া যাইবে এবং উহা কোনও কাজে আসিবে না। লুসিফারিন্ নিজে আলোক দিতে অসমর্থ। উহা লুসিফারেসের (Luciferase—অম্লজানের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণ বিশেষ) সহিত মিশ্রিত হইলে উহা ফসফারেসেন্স

(Phosphorescence) নামক পদার্থের সৃষ্টি করে। এক্ষণে এই হরিদ্রাবর্ণের গুঁড়া একটী কিঞ্চিৎ জলপূর্ণ পাতলা কাচের বোতলে নিক্ষেপ করিয়া খুব ঝাঁকাইলে নীল ও কিঞ্চিৎ সবুজ বর্ণের আলোক ঐ বোতলের মধ্যে দেখা যাইবে। উহা হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হয়, তাহাতে পড়া চলে। ঐ বোতলের মধ্যে তাপমান যন্ত্র কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দেখা যায় যে, উহার উত্তাপ এক ডিগ্রীর সহস্রভাগের একভাগও বৰ্দ্ধিত হয় নাই। সেইজন্য উহা হইতে শতকরা ৯৯ ভাগ আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে সাধারণ প্রদীপ হইতে আমরা মাত্র ৪ ভাগ আলোক প্রাপ্ত হই এবং বাকী ৯৬ ভাগ উত্তাপরূপে বহির্গত হইয়া যায়।

* * *

পরমাণু-বিজ্ঞানের সহিত আজ এক নূতন জগৎ লোক-সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। "পরমাণুকেও বিভক্ত করা যাইতে পারে" এই সত্য আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, আধারের বৃহত্ত্বের উপর শক্তির আধিক্য নির্ভর করে না, অর্থাৎ পদার্থ বৃহৎ হইলেই তাহার ভিতর অধিক শক্তি থাকিবে এমন কোনও নিয়ম নাই—অণুর ভিতরও অনন্ত শক্তি থাকিতে পারে। পরমাণু পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা অনুমান করেন যে, একটী পরমাণু ঠিক একটী ক্ষুদ্রায়তন সূর্য্য। ঠিক সূর্য্যের ন্যায় ইহার ভিতরও অসংখ্য ইলেক্‌ট্রন্ কণা (Electrons) প্রচণ্ডবেগে আন্দোলিত হইতেছে। একটী পরমাণুকে যদি ১০০ ফিট বৰ্দ্ধিত (magnified) করা যায়, তাহা হইলে তাহার অন্তর্গত প্রতি ইলেক্‌ট্রন্ কণা এক ইঞ্চির ১০০ ভাগের ১ ভাগের সমান হইবে। কাজেকাজেই পরস্পর তাহাদের গতি প্রতিহত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহাদের গতির নিমিত্ত পরমাণুর মধ্যে অপরিমিত অবকাশ আছে। এই গতি হইতেই উত্তাপের সৃষ্টি।

* * *

দৃষ্ট পদার্থের মধ্যে রেডিয়াম (Radium) ২,০০০ সহস্র বৎসর ধরিয়া আলোক দিতে সমর্থ। এক পাউণ্ড কয়লার মধ্যে ১০,০০০ উত্তাপ জন্মাইবার কেন্দ্র (Calorie) বৰ্ত্তমান, আর এক পাউণ্ড

রেডিয়ামের মধ্যে ১,০০০,০০০,০০০ বৃন্দ গুণ উহা বেশী। সেই হেতু বৈজ্ঞানিকদের এক সুখ-স্বপ্ন যে লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা পুড়াইয়া যে সহর আজ আমরা আলোকিত করি, ভবিষ্যতে হয়ত একটী আলপিনের মাথায় যতটুকু রেডিয়াম ধরে, তাহার দ্বারা কোটী বৎসর ধরিয়া একটী সহরকে আলোকিত করিতে পারা যাইবে।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেরাল্ড বেনড্ (Gerald Wendt), সি-ই, আইরণের সাহায্যে অখণ্ড পরমাণুকে খণ্ডিত করিয়া পাশ্চাত্যের প্রাচীন কুসংস্কার যে বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের (Elements) পরমাণু বিভিন্ন অথচ নিরবয়ব (Indivisible)—একেবারে উল্টাইয়া দিয়াছেন। একই ভৌতিক পদার্থের অন্তর্গত ইলেকট্রনের সন্নিবেশ পরিবর্ত্তিত করিয়া (Rearrangement of the Combination) বিভিন্ন তথাকথিত ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন (Transmutation of Elements)। তাঁহারা টানষ্টেনের (tungsten) পরমাণু সন্নিবেশ পরিবর্ত্তিত করিয়া হেলিয়াম (Helium) নামক তথাকথিত ভৌতিক পদার্থে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আবার রেডিয়ামের পরমাণুর সন্নিবেশ পরিবর্ত্তনে সীসকের (Lead) উৎপত্তি হইয়াছে।

পৃথিবীতে যাহা ধরা উচিৎ তাহা অপেক্ষা জন্মায় অধিক। এখানে জীবনী-শক্তির প্রকাশ অধিক কিন্তু তদুপযোগী পর্য্যাপ্ত আহার বাতাস ও বাস করিবার স্থান নাই। হাউয়ার্ড মুর (J. Howard Moore) তাঁহার Savage Survivals (বর্ব্বরতার অস্তিত্ব) নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে এক জোড়া চড়াই, যদি তাহার একটীও সন্তান না মরে, তাহা হইলে, তাহারা কুড়ি বৎসরে সমস্ত ইণ্ডিয়ানারাজ্য (State of Indiana) ছাইয়া ফেলিতে পারে। প্রতি ঋতুতে চিংড়িমাছ ১০০০০ হাজার করিয়া ডিম পাড়ে এবং ঝিনুক ২০০০০০০ লক্ষ করিয়া ডিম পাড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী উইয়ের একটী গর্ত্তে বসিয়া ডিম পাড়া ছাড়া আর কোনও কাজই থাকে না। সে প্রত্যহ ৮০০০০০ হাজার

করিয়া ডিম পাড়ে এবং একজোড়া হাঘরে পোকার (Gypsy moth) বংশ যদি নাশ না হয়, তাহা হইলে আট বৎসরে তাহারা যুক্ত রাজ্যের (United States) সমস্ত গাছপালা খাইয়া ফেলিতে পারে। বান ও কুঁচে জাতীয় মাছ জীবনে একবার প্রসব করে কিন্তু সেই একেবারেই বড় ছোট আকৃতি অনুসারে ৫০০০০০ লক্ষ হইতে ২০০০০০০ লক্ষ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। সমুদ্রে এক প্রকারের চ্যাপটা রকমের জীব আছে যাহাদের বংশ না নষ্ট হইলে অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র সাগর জলেও তাহাদের সঙ্কুলান হইবে না। Cod মাছের প্রত্যেক ডিমটী হইতে যদি একটী করিয়া প্রাণী বাহির হয় তাহা হইলে একযোড়া Cod তাহাদের সন্তানের দ্বারা ২৫ বৎসরে পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ স্তূপ সাজাইতে পারে।

* * *

প্রাণী-তত্ত্ববিদেরা মাত্র ১০০০০০০ জীবের সন্ধান পাইয়াছেন ও নামকরণ করিয়াছেন—বাকী জীব-জাতি (Living species) মানবের নিকট অজ্ঞাত এবং যাহা জানা গিয়াছে তাহা অপেক্ষা ২০ হইতে ১০০ গুণ অধিক জাতি বিশেষ (Species) জীবন-যুদ্ধে পরাভূত হইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে। যাহারা ধরায় এক কালে বাঁচিয়াছিল, বিহার করিয়াছিল তাহাদেরই সমাধি আজ আমাদের পদক্ষেপের কঠিন মৃত্তিকা।

২

কালাজ্বর—(Kala-Azar)—আদম সুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় যে বাঙ্গলার অধিকাংশ জেলাতেই লোকসংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে এবং হিন্দুদের মধ্যে। সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে। বোধ হয় শীঘ্রই পল্লীগ্রামের চিহ্নগুলিও ধূলিতে মিশিয়া যাবে। তাহার কারণ, জন্ম-হার অপেক্ষা মৃত্যু-হার দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে। যে কোন পল্লীগ্রামে যান, দেখিবেন প্লীহা-যকৃতগ্রস্ত, জীর্ণ-শীর্ণ কতকগুলি কলের পুঁতুলমাত্র, দিন নাই রাত নাই, খাটিতেছে। না আছে উৎসাহ, না

আছে উদ্যম, না আছে কোন স্ফূর্ত্তি ! এই অসংখ্য "মনুষ্য-জীবন" অপচয়ের প্রধান এবং অন্যতম কারণ—

কালাজ্বর—এই ব্যাধি দিনের পর দিন এবং বৎসরের পর বৎসর যে কত শত পল্লীগ্রাম ধ্বংস করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে পরিবার একবার এই রোগে আক্রান্ত হয়—তাহা প্রায়ই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি একটী রমণী তাহার একটী মাত্র পুত্র-সন্তান লইয়া চিকিৎসার্থ আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"আমার স্বামী এই রোগে মারা গিয়াছেন, আমার দুই পুত্র এই রোগে মারা গিয়াছে—অবশিষ্ট এই সন্তানটী আপনার কাছে আনিয়াছি, যাহা হয় করুন !" কি করুণ কাহিনী ! এই রকম কত শত পরিবার—বিশেষতঃ পল্লীগ্রামস্থ—অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে কে তাহার হিসাব রাখে !

পল্লীগ্রামে যাহাকে কুইনাইন-আটকান-জ্বর বলে, তাহা আমার মতে অধিকাংশ কালাজ্বর। কারণ বাস্তবিক কুইনাইনে এই ব্যাধির কোনই উপশম হয় না। ফলে কুইনাইন উপযুক্ত রোগে ব্যবহার না হওয়াতে দূষিত হয়। এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদেরও কুইনাইনের উপর আস্থা কমিয়া যায়। কারণ, সাধারণের চক্ষে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া তফাৎ করা শক্ত। সুতরাং প্রত্যেকেরই উপযুক্ত পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া জ্বর বিরাম না হইলে, ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া উচিত।

অনেক দিন ভুগিয়া ভুগিয়া রোগীর গায়ে একপ্রকার কালো ছায়া পড়ে। যিনি একবার কালাজ্বরের রোগী দেখিয়াছেন, বিশেষতঃ অনেক দিনের ভোগা রোগী, তাঁহার মানসপটে সে করুণ-চিত্র চিরাঙ্কিত হইয়া থাকে। কঙ্কালবিশিষ্ট দেহ, অথবা সোথ হওয়ার দরুণ সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত দেহ, কাঠির মত সরু হাত-পা, স্ফীতোদর—কতকটা প্লীহা যকৃতের দরুণ, এবং (অনেক সময়) পেটে জল হওয়ার দরুণ নৈরাশ্যব্যঞ্জক রক্তহীন মুখ।

আসাম দেশের গারো পাহাড় সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার প্রথম উৎপত্তি। রেল লাইন হওয়ার পর হইতে যাতায়াতের ফলস্বরূপ ইহা এখন

সমস্ত বাঙ্গলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নদীয়া, যশোহর এবং ২৪পরগণায় ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

এই ব্যাধির আক্রমণে ২।১ বৎসর না ভুগিয়া, রোগী মারা যায় না। বেশী দিন ভোগার দরুণ, প্রায়ই রোগীর সমস্ত অঙ্গ ফুলিয়া পড়ে। শেষে হয় রক্ত আমাশয়, নয় নিউমোনিয়া প্রভৃতি অন্য কোন রোগে মারা যায়। অনেক রোগীরই শেষাবস্থায় দাঁতের গোড়ায় ঘা হয়। এবং ক্রমশঃই তাহার চিবুক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সে সময় রোগীর চেহারা এরূপ ভয়ানক হয় যে, তাহা দর্শনে প্রাণে অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এই ব্যাধি শত শত মৃত্যুর কারণ তো বটেই, তাহা ছাড়া কত শত লোককে জীর্ণ শীর্ণ অকর্ম্মণ্য করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই গরীব দেশে—যেখানে অধিকাংশ লোকই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না!—সে দেশে এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী রোগের চিকিৎসা করান সম্ভবপর নয়। কিন্তু বাধ্য হইয়া নিজের স্বামী পুত্র, পিতা মাতা প্রভৃতির জন্য ঋণ-কর্জ্জ করিয়াও চিকিৎসা করাইবার দরুণ এই ব্যাধি গৌণভাবে আমাদিগকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে। ইহাও বিশেষ চিন্তার বিষয়। সুস্থ এবং সবলকায় ব্যক্তির উপরেই জাতির সজীবতা নির্ভর করে। কাজেই যে জাতির অধিকাংশ লোকেই দারিদ্র্যে হউক বা কোনও ব্যাধির দরুণই হউক, জীর্ণ-শীর্ণ এবং অস্থিচর্ম্ম-সার, সে জাতির উন্নতি সুদূর-পরাহত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পারিবারিক সামাজিক এবং জাতীয় হিসাবে এই দুষ্ট-ব্যাধির সমূলে নিবারণ-চেষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশেষতঃ ডাক্তারদের সর্ব্বতোভাবে করা উচিত। দুঃখের বিষয়, ম্যালেরিয়ার ন্যায় এই ব্যাধির উৎপত্তি ও প্রতিনিষেধের কারণ আমরা জানি না। কাজেই এই ব্যাধির করাল কবল হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার একমাত্র উপায়, প্রত্যেক রোগীর বিজ্ঞান-সঙ্গত চিকিৎসা—"এন্টিমোনি" শিরার ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া।

বাংলা দেশে গরীবের সংখ্যাই বেশী। কে ইহাদের চিকিৎসার আয়োজন করিবে? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, কেন সরকার বাহাদুর!

—জিজ্ঞাসা করি কেন ? চিরকালই কি করুণ-দৃষ্টিতে অপরের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হইবে ? চাতক পাখীর মত এক ফোঁটা জলের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা, অপেক্ষা কি মৃত্যুই শ্রেয়ঃ নয় ! নিজের পায়ে নিজে দাড়ানই তো মানুষের কাজ। আমরা সকলেই যদি একটু একটু চেষ্টা করি—বিশেষতঃ আমার সমব্যবসায়ীরা—তবে সরকারী সাহায্যের কিছুই প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ে রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয় এবং Bengal Health Association পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন। ঘনীভূত অবসাদ ত্যাগ করিয়া এবং কিছু কিছু নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়া সেই প্রদর্শিত পথে চলিলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। ভুলিলে চলিবে না—"কলির প্রধান ধর্ম্ম ত্যাগ ও সেবা"। বক্তৃতায় কোন দিন দেশ উদ্ধার হইবে না।

নদীয়া যুবক-সঙ্ঘের উদ্যোগে—তাঁহারা আমাকে সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচন করিয়াছেন—এই জেলার মূড়াগাছা গ্রামে এবং গোয়াড়ি সহরে দুইটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই দুই কেন্দ্রে প্রথমতঃ ১ মাস আমরা বিনা পয়সায় কালা-জ্বরের ইন্‌জেক্‌সান ও ম্যালেরিয়া চিকিৎসা করি। পরে নিজ আয় হইতে, ব্যয়-বহন করিবার ভরসায় প্রত্যেক ইন্‌জেকসানে /• এক আনা করিয়া লওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। বলিয়া রাখি যে মূড়াগাছার নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম, যথা বেজপাড়া প্রভৃতি এই রোগে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আশাতিরিক্ত রোগী বহুদূর হইতে আসিয়া এখানে ইন্‌জেক্‌সান লইতেছে। এইরূপ কেন্দ্র প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে খোলা উচিত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যদি দেশকে বাঁচাইতে চাও, জাতির সজীবতা রক্ষা করিতে চাও, তবে এস কর্ম্মী—বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক—সকলে মিলিয়া কার্য্যে অগ্রসর হও। "স্বরাজ স্বরাজ" করিয়া চীৎকার করিয়া গগন ফাটাইলে কি হইবে ? যদি স্বরাজ পাইতে চাও তবে এই অনক্ষর অসহায় এবং দুষ্টব্যাধি-ক্লিষ্ট পল্লীবাসীদের বাঁচাইবার চেষ্টা কর। কারণ "The nation dwells in huts & cottages." এখনও সময় আছে।

শেষে যেন স্বরাজ লাভ ক'রে শৃগাল ব্যাঘ্রাদির রাজ্য হইতে না হয়। সমব্যবসায়িগণের প্রতি আমার বিশেষ নিবেদন এই যে, সামান্য একটু চেষ্টা করিলে, সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করিলে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে এইরূপ কেন্দ্র খুলিতে পারেন। মনে রাখিবেন, দেশের এবং দশের উন্নতি অবনতির সহিত—বিশেষতঃ পতিত এবং দরিদ্রের সহিত আমাদেরও উন্নতি বা অবনতি একসূত্রে-গ্রথিত।

—ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়, এম-বি

৩

* * *

Fysiska Institution Uppsala Universitet, Sweden

এখানে আসিয়া আপনাকে যে পত্র দিয়াছি, তাহা বোধহয় পাইয়াছেন। এতদিন পর এখানে সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে পারিয়াছি।

*   *   *

এখানে খুবই শীত। অনেক দিন হল বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। রাস্তা, ঘাট, মাঠ, সবই বরফে ঢাকা। এইভাবে Jan. পর্য্যন্ত চলিবে। রাত্রিতে—18°c পর্য্যন্ত হয়, তবে দিনে—4°c উপরে আর যায় না। এত শীত, যে ঘরের বাহির হলেই কাণ জ্বালা করে। আজকাল সকাল হয় ৭½।৮টায় এবং সন্ধ্যা ৩½। কলিকাতার সঙ্গে এখানকার সময়ের তফাৎ ৫ঘণ্টা; কলিকাতা ৫ ঘণ্টা fast

এখানে আসিয়া মনে হইতেছে, যে না আসিলেই ভাল হ'ত। কি সুখে ছিলাম, এখন বুঝিতেছি। কলিকাতার দিনগুলি এখন স্বপ্নের মত মনে হইতেছে।

আমি এখানে আছি, অনেকটা ছাত্রভাবে। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে আমাদের যে কত অমিল, তাহা বেশ বুঝিতেছি। ইহারা এমন এক civilisation গড়িয়াছে যে মানুষকে সুস্থির হইতে দেয় না, সকাল ৭½ হইতে রাত্রি ১০ পর্য্যন্ত সময় পাওয়াই মুস্কিল। পোষাক পরা, সুবিধা পাইলেই tie ঠিক করা, চুল ঠিক স্থানে আছে কিনা দেখা, এই সব কাজে সময় যে কত যায়, তাহা আর বলিবার নহে। তারপর ইহারা

যে সব বিষয়ে আনন্দ পায়, যে সব বিষয় খুব আলোচনা করে—তাহাতে আমাদের ঘৃণা হয়। আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। ২৪ ঘণ্টাই সাবধানে থাকি, কি জানি কি করিয়া ফেলি। ইহার পর নিজের জন্য কিছু করিবার অবসর মোটেই পাই না, এক সময়—রাত্রি ১০টার পর। এই সব দেখিয়া আমার মনে হয় যে যাহাদের চাকুরী বা এই সব বিদ্যাশেখা ছাড়া আরও কিছু শিখিবার বা করিবার আছে, তাহাদের এ সব দেশে না আসাই ভাল। আমি ছাড়া অন্য যে কয়েকজন ভারতবাসী এখানে আছে তাহারা মন্দ নাই, কারণ তাহাদের সব ভাবই ইহাদের ন্যায় material। তাহার বাহিরে তাহাদের চিন্তা নাই।

ইহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই শুধু আছে। সামাজিক বা লৌকিক স্বাধীনতা মোটেই নাই, আমাদের দেশে ঐ সব এক রকম হলেই হ'ল। কিন্তু ইহাদের তাহা হবার যো নাই, দেখিয়া মনে হয় যেন সব জাতিটাই তালে তালে drill করিতেছে।

ইতিমধ্যে Prof. একদিন Dinner এ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ও আর একদিন Coffee Houseএ লইয়া গিয়াছিলেন। সেই তালে তালে মদ খাওয়া, তালে তালে মাথা নাড়া, যত বাজে গল্প, তারপর ঘণ্টাখানেক ধরিয়া Coffee ও চুরুট খাওয়া—এই সব এক ব্যাপারই দেখিলাম। এই দেখিয়া ফল এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে কেহ Dinner বা Coffee House এ নিমন্ত্রণ করিলে যাই না, কোন রকমে নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া দেই। তারপর ইহারা এত formalities এর মধ্যে থাকে যে মনে কি আছে, কথায় প্রকাশ পাবে না। সবারই কথার এক গদ্ আছে, সেই বুলি সবাই বলে। মাঝে মাঝে এই সব এত অসহ্য হয় যে মনে হয় দেশে চলিয়া যাই। কথা বলা, হাস্য, খাওয়া—সব ব্যাপারেই নিয়মের বাহিরে যাওয়া খুব অসভ্যতা।

* * *

—অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিধুভূষণ রায় এম, এস-সি, ডি, এস-সি

বরণ

প্রভু, আমারে বরিয়া লহ তুমি,
আমার জীবন মাঝে হও নাথ, প্রকাশিত
শ্রাবণের ধারা সম নামি।

কত দিন কত নিশি প্রতীক্ষায় আছি বসি
কত যুগ কেটে গেল মরি,
কত রবি খসে যায় কত সিন্ধু মরু হয়
কত তারা উঠে নভ-ভরি।

তোমারি পরশ আশে জীবনের মধুমাসে
বিকচ বকুল তলে বসি,
কত মালা গেঁথে ছিনু পথ পানে চেয়েছিনু
মালা শুধু হয়ে গেল বাসি।

কত লোক আসে যায় শত মুখে গান গায়
কত চেনা আসে মম ঘরে,
কত পর উঁকি মারে আমার আঙ্গিনা পরে
কত জনা মোর পাশে ফিরে।

সবার মুখের পানে সবার গানের তানে
চেয়ে দেখি, শুনি সযতনে,
তুমি যদি একবার মুছা'তে নয়ন ধার
এসে থাক অতি সঙ্গোপনে।

মিছাই আমার আশ দীর্ঘ প্রবাস-বাস
দীর্ঘ যামিনী জাগা শুধু,
তোমারে যে ভালবাসা আগুনে রচিয়া বাসা
দিবা নিশি পুড়ে মরা বঁধু।

তোমা তরে ছাড়িয়াছি চীর খণ্ড পরিয়াছি
ছাড়িয়াছি বন্ধু পিতা মাতা
ছাড়িয়াছি সব আশ সুখের সংসার বাস
কত জনা কয় কত কথা।
কত ঝড় বয়ে যায় আমার এ দরিয়ায়
কত ঢেউ উঠে নভ চুমি,
সার্থক সকলি হয় কোন কিছু বৃথা নয়
শুধু,—যদি দেখা দাও তুমি।
শুধু, যদি তুমি এস, আমার হৃদয়ে বস
স্তিমিত সমাধি জলে নামি,
ভাষা নাই, রূপ নাই এ জগত কিছু নাই
কেবলি, কেবলি নাথ তুমি।
তোমারি পরশ শুধু তোমারি চুম্বন বঁধু
তোমারি অমিয়া মাখা হাসি
গান গাওয়া সে তোমার তব যাহা সে আমার
তোমা হেরে সবে ভালবাসি।
আমার সকল কাজে আমার জীবন মাঝে
তুমি সদা থাক প্রকাশিত,
সুখে দুঃখে, ভাল মন্দে, পূরিবে কুসুম গন্ধে
তব গন্ধ করে আমোদিত।
সেই দিন এনে দাও আমারে বরিয়া লও
যারে বর, সে তোমারে পায়,
যে তোমারে পায় বঁধু, আনন্দ, আনন্দ শুধু
নাচে কাঁদে হাসে, গান গায়।

—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

গ্রন্থ-পরিচয়

১। শ্রীকৃষ্ণ (চরিতামৃত) প্রথম খণ্ড—ব্রজলীলা—শ্রীমন্মথনাথ নাগ প্রণীত—বহু রঙ্গীন ছবি সমন্বিত—উৎকৃষ্ট বস্ত্রে বাঁধাই, মূল্য ২৲ টাকা। কাগজে বাঁধাই ১৸৹ আনা— প্রাপ্তি-স্থান—মেদিনীপুর হিতৈষী কার্য্যালয়—মেদিনীপুর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত লেখা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা আমরা আচার্য্য শ্রীধরের বাক্য হইতেই অনুভব করি। তাঁহার ন্যায় সন্ন্যাসী বিদ্বান-ভক্তও টীকা প্রারম্ভে বলিতেছেন—

কাহং মন্দমতে ক্কেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ
কিং তত্র পরমাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ ॥

—কিন্তু যে দেশের "গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণ নাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণ নামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণ নাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করে না, কেহ কৃষ্ণ নাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করে না। ভিখারী 'জয় রাধেকৃষ্ণ' না বলিয়া ভিক্ষা চায় না, কোন ঘৃণার কথা শুনিলে 'রাধেকৃষ্ণ' বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করে; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে 'রাধেকৃষ্ণ' নাম শেখায়।"—সে দেশে সেই ভগবানের জীবনী আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ করিবে সন্দেহ নাই। ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত আছে, তাহা সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য। যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত হইয়াও সংস্কৃততে অনভিজ্ঞ—স্বদেশী হইয়াও স্বদেশীয় আচার্য্যদের ভাষায় অপরিচিত, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বদেশী ধর্ম্মের ভাব কিছু কিছু প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

২। সচিত্র সাধন বিজ্ঞান—প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীমদ্ যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী প্রণীত। শ্রীযুত সত্যচরণ মল্লিক মহোদয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও সাহায্যে পরিচালিত। প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রকুমার সান্যাল, উকীল, হাইকোর্ট, বেনারস। মূল্য

এগার আনা। এই গ্রন্থে ব্রহ্ম, মায়া, প্রাণ, পুরুষ, প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, হিরণ্যগর্ভ, অহংতত্ত্ব প্রভৃতি সহজ সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।

৩। ফুলের তোড়া—শ্রীরামলাল সুর প্রণীত— মূল্য আট আনা। ছোট ছোট ভক্তি-সিক্ত উপদেশে পূর্ণ।

সঙ্ঘ-বার্ত্তা

১। বিগত ২৬শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসব বেলুড় মঠে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রায় দেড় লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়, তাহার মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার স্ত্রী-ভক্ত ছিলেন। বিশ হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। যেরূপ ভাবে লোক-সমাগম বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে বোধ হয় আর দুই চারি বৎসরের মধ্যে বেলুড়ে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। বহু কীর্ত্তনের দল আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে আঁতুলের কালী কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তরঞ্জক হইয়াছিল। এবার বৈঠকীসঙ্গীত হয় নাই। যাত্রী পরিচালনের ব্যবস্থা সকল বিষয়েই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে ষ্টীমার ঘাটের ব্যবস্থা আমাদের আরও সুবিধাজনক করা দরকার।

ঐ দিবসে মালয় উপদ্বীপ হইতে সিন্ধু দেশ পর্য্যন্ত প্রায় ভারতের সকল স্থানেই তাঁহার জন্মের সুসমাচার বিশেষরূপে ঘোষিত হইয়াছিল।

২। মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী চণ্ডীপুর গ্রামে স্বামিজীর উৎসব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী বেদানন্দ, অমলানন্দ, রামেশ্বরানন্দ এবং বিজয়ানন্দ গমন করিয়াছিলেন। স্বামী বিজয়ানন্দ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করেন। স্থানীয় মঠের ব্রহ্মচারী শুদ্ধ চৈতন্য পূজা পাঠাদি করেন।

৩। বোষ্টন মঠের অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দ কালিফোর্ণিয়া হইতে লস-এঞ্জেলসে 'আনন্দ-আশ্রম' স্থাপনের সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা-নিবন্ধন ডাক্তারেরা তাঁহাকে নয় মাসের জন্য সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর লইতে বলিয়াছেন। সেই হেতু ঐ স্থলের কার্য্য কিছুদিনের জন্য একটু মন্দগতিতে চলিবে।

৺প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ দর্শনে

যথায় কালিন্দী শ্যামা সিতধারা জাহ্নবীর সনে
প্রেমে অঙ্গ মিলাইয়া ছুটিয়াছে সাগর-সঙ্গমে,
অভেদাত্মা হরিহর যেন প্রেমে একাঙ্গ হইয়া
অরূপে হইতে লীন চলেছেন ভক্ত বিমোহিয়া ;
পুণ্যা সরস্বতী সেই সম্মিলন দরশনে
ফেলেছেন আপনারে হারাইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে ;
এ পুণ্য ত্রিবেণীতীরে,—পুনঃ আজি মনে পড়ে হায় !
ভরদ্বাজ মহাঋষি বেঁধেছিলা কুটীর যথায়,
আজিও বাঁধিছে সেথা শত শত মুমুক্ষু পরাণ,—
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম সীতাপতি রাম ভগবান্
করেছিলা পদার্পণ, প্রেমেতে পূজিল মহামুনি,
যেই স্থান পুণ্য রজঃ শিরে ধরি' বহুভাগ্য মানি ;—
নহে বহুদিন গত যে স্থানের তপস্যার বল
হেরিয়া নুইল মাথা দুরমদ্ দুর্ব্বার মোগল ;—
সে মহা পবিত্র তীর্থে হেরি আজি কি সুন্দর লীলা,
বসিয়াছে ভারতের সাধুদের অর্দ্ধকুম্ভ মেলা।
সনাতন বেদবৃক্ষে কত শাখা কে করে গণন,
মঞ্জুরিত ফলে পুষ্পে দশদিশি ছেয়েছে গগন ;
দিশেহারা নরবুদ্ধি হেরিতে সে বিরাট মূরতি,
সভয় ভকতি ভরে যুক্তকরে জানায় প্রণতি ;

প্রেম বায়ুভরে উড়ে সে বৃক্ষের কতগুলি ফল
সম্মিলিত এককক্ষেত্রে,—সৌরভেতে পরাণ বিকল,
ধর্ম্ম-আত্মা ভারতের সুগভীর প্রাণের স্পন্দন
মূর্ত্তিমান হয়ে যেন নরবক্ষে দিল দরশন !
না জানি কি প্রেরণায় শত কষ্টে নহে মুহ্যমান
লক্ষ লক্ষ নরনারী পুণ্যজলে করিবারে স্নান ।
শত শত নরনারী দীনভাবপূর্ণিত বদনে
আঁচলে বাঁধিয়া অর্ঘ্য ছুটিয়াছে সাধু দরশনে ;
জ্ঞানী ধনী বহু মানী ত্যজি বিদ্যাগর্ব্ব অভিমান
মহাজন পদরজঃ শিরে ধরি করে ধন্য জ্ঞান ;
অকাতরে করে ব্যয় লক্ষমুদ্রা সাধুর সেবায়,
সাধুর ভাণ্ডারী মাত্র হয়ে যেন জন্মেছে ধরায় ।
আপনার মোক্ষকামী, সাধুগণ নরহিত তরে
যে আসিছে ধর্ম্ম আশে উপদেশ দেন বারে বারে ;
তুলি হাত ফুল্লপ্রাণে আশীর্ব্বাদ করেন জ্ঞাপন,
ধন্যমানি করে সবে নিজ নিজ আবাসে গমন ।
স্মিত হাসে মধুভাষে সাধুগোষ্ঠী করে পরস্পর
বিবেক-বৈরাগ্য-ভক্তি-প্রীতি-ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রখর,
উথলে সে কথা মাঝে, শুনি হয় বিমোহিত প্রাণ,
ভাগবত ভক্তরূপে বিরাজিত নিজে ভগবান্ ।
কাহারো বা জ্যোতির্ম্ময় স্মিতহাস্য প্রফুল্ল আনন
মৌনভাষে সবে ঘোষে,—'ত্যাগ নিত্য-আনন্দ-কানন,
'ত্যাগে শান্তি, মোহ ভ্রান্তি চিরতরে হয় অবসান,
'ত্যাগ মাত্র ভারতের ধন, ত্যাগ দেহ আত্মা প্রাণ ।'
মহামেলা কুম্ভমেলা, সম্মিলিত সাধুর দরবার,
ভারতের শ্রেষ্ঠ মেলা ! বার বার তোমা নমস্কার ।

—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

শঙ্কর-দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২। ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত ও অদ্বৈতবাদের সহিত তাহাদের সম্পর্ক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শঙ্কর দর্শন বুঝিতে হইলে ভারতীয় সমুদায় দর্শন শাস্ত্রেরই অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক; সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অদ্বৈতবাদ বিচারে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে দেখা যাউক চার্ব্বাক, সৌগত, আর্হত, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের সিদ্ধান্ত সমূহ, পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথবা কোথাও তাহাদের কোনরূপ মিল আছে।

১। চার্ব্বাক দর্শন—চার্ব্বাক মতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই এই চারিটি তত্ত্ব। দেহাকারে পরিণত চতুর্বিধ ভূতগ্রাম হইতে, শর্করা ও তণ্ডুলাদি হইতে জাত মদশক্তির ন্যায় চৈতন্য আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং উহাদের বিনাশের সহিত ইহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। উক্ত চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি প্রত্যক্ষকেই অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় সুতরাং উহারা প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত। বেদ পৌরুষেয় ও ধূর্ত্ত বিরচিত, অতএব প্রমাণপদবী আরোহণ করিতে পারে না। তাই উক্ত হইয়াছে—

"অগ্নি হোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥

অপিচ

"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তার ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ" ইত্যাদি। শরীর পোষণ ও তাহার সুখ সাধনের নিমিত্ত অর্থ ও কামই পুরুষার্থ। ধর্ম্মে বা মোক্ষে

পুরুষার্থের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। লোকান্তর বা জীবাতিরিক্ত ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই। কণ্টকাদি জন্য দুঃখই নরক ; লোক সিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর এবং দেহাবসানই মোক্ষ। অতএব উক্ত হইয়াছে :—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥" ইতি।

"আমিকৃশ," "আমি স্থূল" ইত্যাদি বাক্য সামানাধিকরণ্য হেতু দেহেই প্রযুক্ত হইতে পারে। "আমার শরীর" ইত্যাদি বাক্য "রাহুর শির ও শিলাপুত্র" প্রভৃতির ন্যায় ঔপচারিক। ইষ্টানিষ্ট ও জগদ্বৈচিত্র্যাদি স্বাভাবিক, ইহার মূলে অন্য কোন শক্তি নাই। কথিত হইয়াছে :—

"অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শ স্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥"

চার্ব্বাকগণ পরলোক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিয়া নাস্তিক পদবাচ্য হয়।

২। বৌদ্ধদর্শন—ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘকাল তপস্যার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, প্রব্রজিতগণ বিষয় ভোগ ও শরীর নিগ্রহ এ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিবেন। এই মধ্য-পথই জ্ঞান, শান্তি, অপরোক্ষানুভূতি, নির্ব্বাণের হেতু! আর্য্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গ বা চতুরার্য্য সত্যই এই মধ্যপথ। ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলভিত্তি। বুদ্ধদেব যুক্তিযুক্ত না হইলে শুধু আপ্ত বাক্যেই বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। তিনি বলিতেন—

ন হ্যাপ্ত বাদান্নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ।
যুক্তি মদ্বচনং গ্রাহ্য·ময়ান্যৈশ্চ ভবদ্বিধৈঃ॥

দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় এই চারিটি চতুরার্য্য সত্য।

(ক) দুঃখ—জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, দৌর্ম্মনস্য, প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ ইত্যাদি দুঃখপদবাচ্য। সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান স্কন্ধই দুঃখ। স্কন্ধ কতকগুলি কার্য্যের সংহতি মাত্র। ইহারা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ভেদে পঞ্চবিধ। সবিষয়-ইন্দ্রিয় রূপস্কন্ধ; আলয়-বিজ্ঞান ও

প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান প্রবাহ বিজ্ঞান-স্কন্ধ *; পূর্ব্বোক্ত স্কন্ধদ্বয়ের সম্বন্ধ জন্য সুখ দুঃখাদি প্রত্যয় প্রবাহ বেদনা-স্কন্ধ; গাভী ইত্যাদি শব্দাবগাহী বিজ্ঞান প্রবাহ (গোত্ব ইত্যাদি) সংজ্ঞা স্কন্ধ; বেদনা স্কন্ধ জন্য রাগদ্বেষাদি ক্লেশ ও মদ মানাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার-স্কন্ধ। মনুষ্য মাত্রেই এই স্কন্ধপঞ্চকের সমষ্টি। নিদানানুযায়ী স্কন্ধের উৎপত্তি ও তদ্বিনাশে ইহার বিনাশ হয়।

(খ) দুঃখ সমুদয়—প্রবৃত্তি বা বাসনাই জন্মাদির হেতু। কাম তৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণাভেদে বাসনা তিন প্রকার †। বুদ্ধদেব নিম্নলিখিতরূপে সংসার উৎপত্তির হেতু বিবৃত করিয়াছেন। অবিদ্যা সংস্কারের, সংস্কার বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান নামরূপের, নামরূপ ষড়ায়তনের, ষড়ায়তন স্পর্শের, স্পর্শ বেদনার, বেদনা তৃষ্ণার, তৃষ্ণা ভবের ও ভব জন্মাদির উৎপত্তি কারণ। ইহারই নাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ।

(গ) দুঃখ নিরোধ—তৃষ্ণার উচ্ছেদই দুঃখ নিরোধের হেতু। বাসনার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হইলে ছিন্ন স্কন্ধ তরুর ন্যায় ইহা পুনরায় প্ররূঢ় হয়। নির্বাণই পরমার্থতঃ দুঃখ নিরোধ। এই নির্বাণ হইতেই শাশ্বত পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। শশবিষাণের ন্যায় নির্ব্বাণ বাঙমাত্রে পর্য্যবসিত নয়; ইহা বস্তুসৎ। স-উপাদি-শেষ ও অনুপাদি-শেষ ভেদে নির্ব্বাণ দ্বিবিধ। লোভাদি ক্লেশ নির্বাণকে সউপাদি শেষ ও স্কন্ধ পঞ্চক নির্বাণকে অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ বলে। প্রথমটি বর্ত্তমান দেহে ও দ্বিতীয়টি দেহ বিনাশের পর লাভ হয়। নির্ব্বাণ শাশ্বত, অসৎ ও অবিমিশ্র! ইহার স্রষ্টা নাই। মন পবিত্র ও বাসনাশূন্য হইলে স্বচ্ছ ও শুদ্ধ হয় এবং নিবাত নিষ্কম্প সরসীর ন্যায় স্থির ও দ্বন্দ্বাতীত হয়। অর্হৎগণের পূর্ব্বসংস্কার বিনষ্ট হয় ও নূতন সংস্কার উৎপন্ন হয় না।

(ঘ) দুঃখ নিরোধের উপায়—আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গই দুঃখ নিরোধের উপায়। ইহারা সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক কার্য্য,

---

* তৎস্যাদলয় বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদম্।
তৎস্যাৎ প্রবৃত্তি বিজ্ঞানং যন্নীলাদি কমুল্লিখেৎ ॥

† পুত্রৈষণা তথাবিত্তৈষণা লোকৈষণা তথা।
এষণাত্রয়মিত্যুক্তং তদ্বিদ্যাৎ বন্ধ-কারণম ॥

সম্যক আজব, সম্যক উদ্যম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই অষ্টাঙ্গ মার্গ অবলম্বন করিয়া ভিক্ষু ক্রমে চারিটি অবস্থায় উপনীত হন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার স্বীয় সত্তা সম্বন্ধে ভ্রম, বুদ্ধ দেব ও তাঁহার মত সম্বন্ধে সন্দেহ এবং যজ্ঞাদি বৈদিক কার্য্য কলাপ মুক্তি লাভের কারণ—এই তিনটী ভ্রম দূরীভূত হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় ভিক্ষু ভ্রম প্রমাদ শূন্য হন কিন্তু মনুষ্যকুলে একবার জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় অবস্থায় আত্যন্তিক ও ঐকান্তিকভাবে কামের বিনাশ হয়, কিন্তু নির্বাণলাভের পূর্ব্বে একবার ব্রহ্মলোকে জন্ম-গ্রহণ করিতে হয়। চতুর্থ অবস্থা জীবমুক্তির অবস্থা। এ অবস্থায় পার্থিব বা অপার্থিব জন্মের বাসনা থাকে না, ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যাশূন্য হইয়া শুধু জগতের জন্যই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে—শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। শীলের দ্বারা সমুদয় পাপ বিধৌত হইয়া মন সমাধিতে রত হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি প্রজ্ঞালাভ করিয়া সর্বপ্রকার সংস্কারের অনিত্যাদি বুঝিয়া থাকেন।

আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গও তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে,—শীলস্কন্ধ, সমাধি-স্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ। সম্যক বাক্য, সম্যক কার্য্য ও সম্যক আজীব শীলস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত; সম্যক উদ্যম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি, সমাধি স্কন্ধের অন্তর্গত; সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সঙ্কল্প প্রজ্ঞাস্কন্ধ সংগৃহীত।

সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসা ইহার মূলনীতি। ক্ষমা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান ভূষণ।

বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করেন। ইঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। সমুদয় ক্ষণিক, জগৎ দুঃখময়, প্রত্যেক বস্তুই স্ব স্ব লক্ষণাক্রান্ত ও সমুদয়ই শূন্য—বুদ্ধদেব-কথিত এই ভাবনা চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া তদীয় শিষ্যগণ, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক ভেদে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ইহারা যথাক্রমে সর্ব্বশূন্যত্ব, বাহ্যশূন্যত্ব, বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব ও বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষত্ববাদ আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহাদের মত যথাক্রমে হিউম (Hume), বার্কলি অথবা মিল (Berkley or Mill), ব্রাউন

(Brown) এবং হ্যামিলটন (Hamilton)এর মতের সহিত তুলিত হইতে পারে। বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়া ইহাদের নাম বৌদ্ধ।(?)

৩। জৈন দর্শন—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর ভেদে জৈন সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত। আচারগত বিভিন্নতাভিন্ন ধর্ম্মগত বিভিন্নতা এ দুই সম্প্রদায়ে অতিশয় অল্প। নিম্নলিখিত চারিটি অনুযোগই জৈন ধর্ম্মের মূলভিত্তি। ইহাদের নাম দ্রব্যানুযোগ, গণিতানুযোগ, চরণ-করণানুযোগ ও ধর্ম্মকথানুযোগ।

অ। দ্রব্যানুযোগ—অনুযোগ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা। অতএব দ্রব্যানুযোগ অর্থ দ্রব্যের ব্যাখা। দ্রব্য ছয় প্রকার,—জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় ও কাল।

(ক) জীবাস্তিকায়—যে কাজ করে, কর্ম্মফল ভোগ করে, কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ গতিপ্রাপ্ত হয় এবং সম্যক্ জ্ঞানাদি অর্জ্জনের দ্বারা কর্ম্মসমূহ নাশ করিতে সমর্থ, সেই আত্মা বা জীব পদবাচ্য। এতদ্ভিন্ন আত্মার আর দ্বিতীয় কোন লক্ষণ নাই।

(খ) ধর্ম্মাস্তিকায়—ইহা এক অরূপী পদার্থবিশেষ। ইহার সাহায্যেই জীবাস্তিকায় ও পুদ্গলাস্তিকায়ের গতি হইয়া থাকে। জীব ও পুদ্গলের চলচ্ছক্তি আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মাস্তিকায়ের সহায়তা ব্যতিরেকে ইহারা ফল প্রসব করিতে পারে না। ধর্ম্মাস্তিকায়ের স্কন্ধ, দেশ ও প্রদেশ এই তিন প্রকার ভেদ আছে। এক সমূহাত্মক পদার্থকে স্কন্ধ বলে, দেশ উহার নানা অংশ এবং যাহা বিভক্ত হইতে পারে না তাহা প্রদেশ।

(গ) অধর্ম্মাস্তিকায়—ইহাও এক প্রকার অরূপী পদার্থ। ইহা জীব ও পুদ্গলের স্থিরত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। ধর্ম্মাস্তিকায় ও অধর্ম্মাস্তিকায় লোক ও আলোকের ব্যবস্থাপক। ইহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বে অলোক ও তৎপরে লোক হইয়া থাকে। অলোকে একমাত্র আকাশের সত্ত্বা থাকে। অধর্ম্মাস্তিকায়েও পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিভাগ থাকে।

(ঘ) আকাশাস্তিকায়—এই অরূপী পদার্থ জীব ও পুদ্গলের

অবকাশস্থান। ইহা লোক ও অলোক উভয় স্থানেই বর্ত্তমান আছে। ইহাতে স্কন্ধ, দেশ ও প্রদেশের বিভাগ আছে।

(ঙ) পুদ্গলাস্তিকায়—ইহা সংসারের রূপবান জড় পদার্থ। ইহার স্কন্ধ, দেশ, প্রদেশ ও পরমাণু ভেদে চারি বিভাগ আছে। যে নির্বিভাগ অংশ মিলিত থাকে তাহা প্রদেশ ও যাহা অযুক্ত অবস্থায় থাকে তাহা পরমাণু।

(চ) কাল—ইহা এক কল্পিত পদার্থ মাত্র। চলস্বভাব গ্রহাদির গতি দ্বারা ইহার বিভাগ কল্পনা হয়। উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী ভেদে কাল দ্বিবিধ। যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের ক্রম ক্রমে বর্দ্ধিতহয় তাহা উৎসর্পিণী এবং যাহাতে উহাদের ক্রম ক্রমে হ্রাস হয় তাহা অবসর্পিণী।

আ। চরণকরণানুযোগ—ইহাতে চারিত্র ও ধর্ম্মনীতির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

ই। গণিতানুযোগ—ইহার দ্বারা লোকস্থিত অসংখ্য দ্বীপ ও সমুদ্রাদির সংস্থান নিরূপিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

ঈ। ধর্ম্ম কথানুযোগ—ইহাতে ভূতপূর্ব্ব মহাপুরুষগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল চরিত্রের মননের দ্বারা জীব উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিয়া থাকে। জৈন মতে ধর্ম্মে চারিবর্ণেরই সমান অধিকার এবং উপযুক্ত হইলে সকলেই ধর্ম্মোপদেষ্টা হইতে পারে। প্রমাণ ও নয়ের দ্বারা অনুযোগ সিদ্ধ হয়। 'প্রমাণ' সর্ব্বাংশে এবং 'নয়' একাংশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভেদে প্রমাণ দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ আবার সাংব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে দ্বিবিধ। সাংব্যবহারিক ইন্দ্রিয় নিমিত্তক ও ইন্দ্রিয় অনিমিত্তক ভেদে দুই প্রকার। মন নিমিত্তক প্রত্যক্ষ ও তদনিমিত্তক আত্মা দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান পারমার্থিক। ইহাও 'বিকল' ও 'সকল' ভেদে দ্বিবিধ। যাহার দ্বারা শ্রুতার্থ প্রমাণ বিষয়ীকৃত অর্থের অংশ, তদিতরাংশে ঔদাসীন্য প্রযুক্ত, গ্রহণ করা প্রতিপত্তার অভিপ্রায় হয়, তাহাই 'নয়'।

পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত জীব ধর্ম্মের অধিকারী। সাধুধর্ম্ম ও গৃহস্থ

ধর্ম্ম ভেদে ধর্ম্ম দুই প্রকার। ক্ষান্তি, মার্দ্দব, আর্জব, মুক্তি (লোভাভাব), তপ, সংযম, সত্য, শৌচ, অকিঞ্চন (পরিগ্রহত্যাগ) ও ব্রহ্মচর্য্য, এই দশবিধ সাধু ধর্ম্ম। জৈনগণ অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রত পালন করিয়া থাকেন। গৃহস্থধর্ম্ম দ্বাদশ প্রকার—পঞ্চ অনুব্রত, তিন গুণব্রত ও চারি শিক্ষাব্রত। অহিংসা, সুনৃত, অদত্তাদান, মৈথুনাভাব ও অপরিগ্রহ—ইহারা অনুব্রত নামে কথিত। স্বার্থের জন্য নিয়মের অনুল্লঙ্ঘন, ভোগোপভোগ ও অনর্থ দণ্ডবিরতি—এই তিনটি গুণব্রত। সাম্য, বৃত্তিসংকোচন, সাধুসঙ্গ ও অতিথিসংবিভাগ শিক্ষাব্রত বলিয়া খ্যাত।

জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ুষ্ক, নাম, গোত্র ও অন্তরায় ভেদে কর্ম্ম আট প্রকার। ধর্ম্মানুযোগের পালনের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইলে মোক্ষ হয়। আকাশ হইতে দীপক পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থই বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। ইহারই নাম স্যাদ্বাদ বা অনেকান্ত-বাদ। জিনাচার্য্য এই বাদেরই প্রবর্ত্তক। এই দ্বন্দ্বের অতীত হওয়ার নামই কর্ম্মবন্ধনের ছেদ।

জৈনগণ বেদের প্রামাণ্য বা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীবন্মুক্তগণ জিননামে কথিত। ইঁহাদের সংখ্যা চতুর্বিংশতি। ইহারা জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্বাধীকার স্বীকার করেন। কেহ কেহ বা সপ্ত অথবা নবতত্ত্বস্বীকার করেন। ইহারা জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব (কর্ম্মবন্দ), সংবর, বন্ধ, নির্জ্জর ও মুক্তি।

৪। **বৈশেষিক দর্শন**—মহর্ষি কশ্যপগোত্রোৎপন্ন কনাদ এই দর্শনের প্রণেতা। বিশেষ পদার্থের অঙ্গীকার হেতু এই দর্শন বৈশেষিক দর্শন নামে পরিচিত। সূত্রকারের মতে পৃথিবী, অপ, তেজঃ ও বায়ু এই দ্রব্য চতুষ্টয় নিত্যানিত্য ভেদে দুই প্রকার। পরমাণুনিত্য ও তদ্ভিন্ন সমুদয়অনিত্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিব্যাদি দ্রব্য চতুষ্টয় পরমাণুরূপে বিদ্যমান থাকে। অদৃষ্টবশতঃ বায়বীয় পরমাণুতে ক্ষোভ বা আলোড়ন উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ পরমাণুদ্বয়ের মিলনে দ্ব্যণুক ও দ্ব্যণুকত্রয়ের সমবায়ে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয় ও ক্রমে স্থূল অবস্থায় বায়ু আমাদের দৃষ্টির

বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া অনুসারে জলীয়, তৈজস ও পার্থিব পরমাণু হইতে স্থূল জল, তেজ ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা ব্যুৎক্রমে পরমাণুতে পরিণত হইলেই প্রলয়াবস্থা উপস্থিত হয়। আকাশের পরমাণু নাই, ইহা নিত্য। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে পৃথিব্যাদি কার্য্যদ্রব্য তিন প্রকার। শরীর যোনিজ ও অযোনিজভেদে দ্বিবিধ। যোনিজ শরীর জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জভেদে চারি প্রকার। মরীচ্যাদি অযোনিজ। দ্ব্যণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত বিষয়। পরমাণুগত অণুত্ব ও আকাশাদিগত মহত্ত্ব নিত্য তদ্ভিন্ন সমুদয় অনিত্য। ঐশীশক্তি পৃথিবীর উপাদান কারণ হইতে পারে না; তাহা হইলে চৈতন্য ইহার একটি গুণ হইত।

বুদ্ধি সংশয় ও নিশ্চয়ভেদে দুই প্রকার। ইহা পুনরায় প্রমা ও অপ্রমা এবং অনুভব ও স্মরণভেদে দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি ভেদে প্রমা দুই প্রকার।

সূত্রকার দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই পদার্থ ষট্কের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদেরই মধ্যে অন্য সমুদয় পদার্থ অন্তর্ভুক্ত। প্রশস্তপাদাদি বৈশেষিক আচার্য্যগণ অভাব নামে সপ্তম পদার্থও কণাদের সম্মত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। এই সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের উপর মোক্ষ নির্ভর করে।

আত্মা চৈতন্যের আশ্রয়। শরীরের কারণ পরমাণুতে চৈতন্য না থাকায়, চৈতন্য শরীরের নহে। কখনও শরীরাদি কার্য্যে জ্ঞান দেখা যায়, আবার কখনও বা ঘটাদিতে উহা উপলক্ষিত হয় না, সুতরাং বিশেষ কারণ স্বীকার করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যও প্রত্যাখ্যাত হইল। কথিত কারণে মনও আত্মা নয় সুতরাং আত্মাদেহাদি ব্যতিরিক্ত। সংসার অবস্থায় উপাধিভেদে আত্মারভেদ ও সুখদুঃখাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে; পরমার্থতঃ আত্মা এক ইহা শাশ্বত ও সর্ব্বব্যাপী। অনুভবের অস্তিত্ব হইতেই আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নহে কিন্তু ইহার গুণ। গুণ হইতে আত্মার বিভাগের নামই মোক্ষ।

আত্মা অনাদি মিথ্যাজ্ঞান ও বাসনাদ্বারা শরীরাদিকে আত্মা মনে করতঃ তদনুকূলে অনুরক্ত ও প্রতিকূলে বিরক্ত হন। অনুরক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে ও প্রবৃত্ত হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। সেই কর্ম্মানুসারে জন্ম ও দুঃখাদির ভোগ হইয়া থাকে। যখন আত্মাকে পৃথিব্যাদি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া তত্বতঃ অবগত হওয়া যায়, তখন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে মিথ্যাবাসনা অপসৃত হয়। তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয়ে মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হইলে রাগ ও দ্বেষ সৌরকরস্পৃষ্ট অন্ধকারের ন্যায় পলায়ন করে। ইহাদের অপগমে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির অপগমে জন্ম, ও তদপগমে দুঃখ দূরীভূত হয়। এই দুঃখাতীত অবস্থাই মুক্তি বা পরা নির্ব্বাণ।

বৈশেষিকগণ শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। ক্ষিতাঙ্কুরাদির উৎপত্তি দেখিয়া ইঁহারা ঈশ্বরে অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

৫। ন্যায় দর্শন—এই দর্শন প্রায়ই বৈশেষিক দর্শনের অনুরূপ। ইহারা অনুমানের অতিরিক্ত শব্দের প্রামাণ্যও স্বীকার করিয়া থাকেন। এই দর্শনে, ন্যায় তর্ক ও অনুমানের রীতি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাকে ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র কহে। ইহাদের মতে দুঃখোচ্ছেদই মুক্তি। মুক্তি তত্ত্বজ্ঞান হইতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান পদার্থ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ন্যায় মতে পদার্থের সংখ্যা ষোড়শ। সূত্রকার প্রথমতঃ "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি ও নিগ্রহ স্থান": এই ষোড়শ পদার্থের তত্বাজ্ঞানে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি বলিয়া তাহাদেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর ও পরলোকেও ইঁহাদের বিশ্বাস আছে।

৬। সাংখ্য দর্শন—সাংখ্যকারগণ শোক দুঃখমোহান্বিত সাম্যাবস্থাপন্ন সত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ সংস্কার দ্বারা প্রকৃতিতে ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ পুরুষ আপনাকে সুখদুঃখমোহান্বিত বলিয়া মনে করে ইহাই বন্ধ। যখন

পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া জানে তখনই সে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। জন্মমৃত্যু প্রভৃতির বিভিন্নতা হেতু জীবভেদে পুরুষ অসংখ্য। পুরুষের একত্ববাচক শ্রুতি জাতিপর, অদ্বৈতপর নহে। এই দর্শনে পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান হইলেই পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত বলিয়া জানিতে পারে। তাই কথিত হইয়াছে :—

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্রতত্রাশ্রমেবসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

সাংখ্য দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ও স্বতন্ত্র। আর সমুদয় তত্ত্বই নশ্বর। এই দর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা নাই। এইজন্য অনেকে সাংখ্য দর্শনের কর্ত্তা মহর্ষি কপিলকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া থাকেন।

৭। **পাতঞ্জলদর্শন**—এই দর্শন সাংখ্যদর্শনেরই অনুরূপ। পতঞ্জলি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর রূপতত্ত্ব বিশেষও স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্য এই দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্যদর্শন কহে। পতঞ্জলি কপিলের ন্যায় অষ্টযোগাঙ্গকে জ্ঞানের সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান বা ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার বা নির্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে, ইহাই মোক্ষ।

৮। **পূর্ব্বমীমাংসা**—জৈমিনিমতে বৈদিক যজ্ঞাদিই মুক্তির সাধন। বৈধ পশু বধে কোন প্রত্যবায় নাই, প্রত্যুত ইহা স্বর্গেরই পথ পরিষ্কার করে। এই দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব ও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাদের মতে জীবভেদে আত্মা অসংখ্য এবং পুরুষ স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। মন্ত্র ব্যতীত তাঁহারা ঈশ্বরের বিভিন্ন আকৃতি স্বীকার করেন না। বেদের কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া এই দর্শনের প্রবৃত্তি।

৯। **উত্তরমীমাংসা**—এই দর্শন বেদের জ্ঞানকাণ্ডের

উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদান্তিকগণ দৃশ্যমান সমুদয় বস্তুকেই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া বলেন। প্রপঞ্চের সত্তা ব্যবহারিক—পরমার্থতঃ ইহার কোন সত্তা নাই। মায়াই এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করে। এই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভই মোক্ষ। জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কোন ভেদ নাই। উপাধিভেদে জীবের বহুত্ব কল্পিত হইয়া থাকে।

(ক) মাধ্বসম্প্রদায়—ইহাদের মতে জীব অনুপরিমাণ ও ভগবানের দাস, জগৎসত্য, পঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্র জীবের আশ্রয়নীয়, বেদ অপৌরুষেয় ও শাশ্বতঃ। ইহারা স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্রভেদে দুইটি তত্ত্বের স্বীকার করেন। অশেষগুণসম্পন্ন ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্রতত্ত্ব এবং জীব ও জড় জগৎ অ-স্বতন্ত্র তত্ত্ব। জীব, "আমি ভগবদ্দাস" এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করতঃ ভগবৎসাম্য ইচ্ছা করিয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। পরমসেব্য ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। সেবা প্রধানতঃ তিন প্রকার—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। ভজন দশ প্রকার—দয়া, ভগবৎস্পৃহা ও শ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক; সুনৃত, হিতবাক্য, প্রিয়বাক্য স্বাধ্যায়, এই চারি প্রকার বাচিক এবং দান, পরত্রাণ ও পূজা এই তিন প্রকার কায়িক। স্বতন্ত্র ভগবানের প্রসন্নতা লাভই অস্বতন্ত্র জীবের পরমপুরুষার্থ। ভগবানের গুণোৎকর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান হইলেই এই পুরুষার্থের লাভ হয়। সারূপ্য, সালোক্যাদি মুক্তিই পরমার্থ। ইঁহারা দ্বৈতবাদী।

বল্লভিসম্প্রদায়—জীব অনু, সেবক; জগৎ সত্য, এই সকল বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের সহিত একমত। প্রভেদ এই যে, মধ্বাচার্য্য মতে বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণু মুমুক্ষু জীবের সেবনীয়—বল্লভাচার্য্য মতে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষু জীবের সেব্য। ইনি বলেন ফলরূপা ও সাধনরূপাভেদে সেবা দ্বিবিধ। কৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ—মানসীসেবা ফলরূপা এবং দ্রব্যার্পণাদি শারীর ব্যাপারসাধ্য কায়িকসেবা—সাধনরূপা। বল্লভ বলেন—ভগবদনুগ্রহে বৃন্দাবনে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ডরাস রসোৎসবে পতিভাবে ভগবান্‌কে সেবা করাই মোক্ষ। জ্ঞান বা ভক্তিমার্গ দ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রীতিমার্গই মোক্ষের একমাত্র

সাধন। এই দর্শনে জীব ও পরমাত্মার শুদ্ধতা স্বীকৃত হওয়ায়, ইহা শুদ্ধ দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

(খ) রামানুজিসম্প্রদায়—রামানুজ, জীব, ঈশ্বর ও জগতের অন্যভেদ স্বীকার না করিলেও স্বগত ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। বৃক্ষ একবটে, কিন্তু শাখা, কাণ্ড ও পত্রপুষ্পাদি ভেদে ইহার যেরূপ ভেদ আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার জীব ও জগদ্রূপ ভেদ আছে। ব্রহ্ম সেব্য, জীব তাঁহার সেবক। রামানুজ চিৎ, জড় ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ তত্ত্ব স্বীকার করেন। চিৎজীব, জড়প্রপঞ্চ এবং ঈশ্বর পরমাত্মা হরি। জীবভোক্তা; জড়ভোজ্য ও ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা। দৃশ্যজগৎ ভোজ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন ভেদে ত্রিবিধ। ঈশ্বর এই জগতের উপাদান, কারণ ও কর্ত্তা। তিনি ভক্তবৎসল ও করুণাময়। তিনি উপাসকগণকে তাহাদের উপসনার অনুরূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। ঈশ্বর অর্চা (প্রতিমাদি), বিভব (অবতার সমূহ), ব্যূহ (সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনুরুদ্ধ), সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামিরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া লীলা বিশেষের বশবর্ত্তী হন। বাসুদেবই বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত। সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামিমূর্ত্তি জীবস্থ ও জীব প্রেরকরূপে জ্ঞাতব্য। অর্চা ও উপাসনার দ্বারা কলুষ বিগত হইলে অন্তর্যামী পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। তৎপর বিভবের উপাসনা দ্বারা বূাহ অপাস্ত হইলে মন অন্তর্যামীতে নিবদ্ধ হয়। এই উপাসনা অভিগমন (দেবগৃহ মার্জ্জনাদি), উপাদান (গন্ধ পুষ্পাদি অর্পণ), ইজ্যা (পূজা), স্বাধ্যায় (জপ ও নাম কীর্ত্তনাদি) ও যোগ (একান্তচিত্তে ভগবদনুধ্যান) ভেদে পাঁচ প্রকার। এই পঞ্চবিধ উপাসনার প্রভাবে ভক্তির আবির্ভাব হয়। ভক্তির চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ জীবকে আবৃত্তি রহিত আনন্দধাম প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই শাস্ত্রান্তরে মোক্ষ বলিয়া পরিচিত। এই মতে ভক্তিই একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়। আহারাদির শুদ্ধি হইতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইতে বৈরাগ্য ও বৈরাগ্য হইতে ভগবদ্ভক্তি উৎপন্ন হয়। রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে প্রখ্যাত।

(গ) শ্রীকণ্ঠি সম্প্রদায়—ইহাদের মতে পরমেশ্বর মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম

বিশিষ্ট। যেহেতু ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ থাকিয়া জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় সংসাধিত হয়, সুতরাং প্রপঞ্চের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা স্বীকৃত হইতে পারে না। প্রপঞ্চরূপা, আনন্দরূপা পরমাশক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ। প্রপঞ্চ ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীকণ্ঠ মতে পরব্রহ্মের বাহ্যেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ মন আছে, যদ্দ্বারা তিনি আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে বিশুদ্ধ বাগীন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধহেতু মুক্তপুরুষ প্রাকৃত প্রপঞ্চ দর্শন করেন না। পরব্রহ্মই প্রপঞ্চাকার প্রাপ্ত হইয়া তদীয় নয়ন সম্মুখে প্রতিভাসিত হন। সুখস্বরূপ ভূমাতে অবস্থিতিই এরূপ দর্শনের কারণ। শ্রীকণ্ঠ বলেন প্রপঞ্চাদি দর্শন জনিত সুখ ব্রহ্মানন্দেরই কণা বিশেষ সুতরাং ব্রহ্মেতে দ্বৈতনিষেধ নিরর্থক।

উপরি উল্লিখিত দর্শন-সমূহের মতবাদগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে, ইহাদের প্রত্যেকেরই পরম্পর উপযোগীতা আছে। মানুষ স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি-পরায়ণ বলিয়া আস্তিকপ্রবর বৃহস্পতি প্রভৃতি আচার্য্যগণ চার্ব্বাক মত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে দেহসর্ব্বস্ব মানব বারবার দুঃখের কষাঘাত সহ্য করিয়া ভোগে সুখ নাই জানিতে পারিয়া, অবশেষে দুঃখোচ্ছেদের প্রকৃত পন্থার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত চার্ব্বাক দর্শনের উৎপত্তি প্রসঙ্গের প্রণিধানও এস্থলে অসঙ্গত হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতিবাক্য প্রতিপাদিত জীবাভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ সমর্পণে এই দর্শন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপযোগী না হইলেও পরম্পর সম্বন্ধে উপকারী।

বৌদ্ধসম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানের ক্ষণিকবাদ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিরোধী হইলেও, বাহ্যজগৎ জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মতে কল্পিত এ বিষয়ে অদ্বৈত তত্ত্বের অতিশয় সন্নিহিত ; সুতরাং ইহাও অবিসংবাদিত ভাবে অদ্বয়তত্ত্বের অনুকূলে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধগণ শরীর ব্যতিরিক্ত বুদ্ধিকে আত্মারূপে গ্রহণ করিয়া, আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন এই দ্বিতীয় ভূমিকায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি যে, কেহ কেহ আচার্য্য শঙ্করের বৌদ্ধবাদ খণ্ডন সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহারা

বলেন যে, আচার্য্যের বৌদ্ধবাদ তদীয় স্বকপোল কল্পিত, প্রকৃত বৌদ্ধবাদ সম্বন্ধে শঙ্করের ঠিক ধারণা ছিল না। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আচার্য্য যে বৌদ্ধবাদ নিরসন করিয়াছেন, তাহা শুধু গৌতমপ্রোক্ত মতবাদ নহে, অপিচ তদীয় পূর্ব্বতন মতবাদও (যাহা রামায়ণাদিগ্রন্থে* শ্রমণ ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে) বিচারবাসরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ইহার সামান্য অনৈক্য দৃষ্ট হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আচার্য্যের জ্ঞান প্রতিসিদ্ধ হইতে পারে না। গৌতম বুদ্ধের বহুপূর্ব্বেই বৌদ্ধ মতবাদ "অসদেব সৌম্য ইদমগ্র মাসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে।

অতএব যদি কেহ আচার্য্যের খণ্ডন রীতিতে দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলেই উহা দোষযুক্ত বিবেচিত হইবে, অন্যথা নহে। অপিচ বুদ্ধদেব যে মতবাদ প্রচারিত করিয়াছেন তাহা তদীয় স্বানুভূত সত্য হইলেও, উহা যে সাংখ্য ও যোগদর্শনের ছায়া মাত্র তাহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধদর্শন প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে ইহার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

জৈনগণ জীবকে আত্মা স্বীকার করিয়া বৌদ্ধগণ হইতে আর এক স্তর উপরে উঠিয়াছেন। জীব সুখদুঃখের অতীত নয় এ বিষয়ে বেদান্তমতের বিরুদ্ধবাদী হইলেও জৈনদর্শন পূর্ব্বোক্ত কারণে অদ্বৈততত্ত্বের আনুগুণ্য প্রদর্শন করিতেছে।

বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন জীবের বহুত্ববাদী হইলেও আত্মতত্ত্ব বিনির্ণয়ে শ্রবণ মননাদির সাধনতা স্বীকার করিয়া ইহারা অদ্বৈত মতেরই অনুকূলে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাংখ্য ও যোগদর্শন প্রকৃতিকে পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বহুত্ব স্বীকার করিলেও জীব শুদ্ধ, মুক্ত ও বুদ্ধস্বরূপ ইহা স্বীকার করিয়া বেদান্তের অতিশয় সন্নিহিত হইয়াছে; এই দর্শনদ্বয়ও বেদান্তের অনুকূলে।

---

* "আর্য্যেণ মম মান্দাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম।
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া ॥" রামায়ণ

দ্বৈতবাদী মধ্ব, বল্লভ প্রভৃতি জীবেশ্বরের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা ঈশ্বরকে সগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সর্ব্বভূতান্তরাত্মা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহাকে পরিণত করেন এবং স্বয়ং উহাদের নিয়ন্তা হইয়া বহুধা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি অধিকারী এবং তদীয় প্রকাশ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও শক্ত্যাত্মক। ইঁহারা—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ॥"

ইত্যাদি কঠশ্রুতি স্বীয় অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া দ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণকে এই সকলই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে; সুতরাং আলো বুঝাইতে অন্ধকারের ন্যায় অদ্বৈতমত বুঝাইতে দ্বৈতবাদের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। অতএব ইহা অদ্বৈতবাদেরই অনুকূলে।

এতদ্দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমুদয় পূর্ব্বাচার্য্যের মতই অদ্বৈতবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আরও দেখা যায় যে তৈত্তিরীয় সংহিতা উক্ত "অন্নময়ত্বাদি" শ্রুতির সাম্প্রদায়িক দ্বৈত সিদ্ধান্ত কোনওরূপে লোকায়তিক ও দ্বৈতবাদীর অনুকূলে পরম্পর প্রযুক্ত হইতে পারে কিন্তু অদ্বৈত শ্রুতি ও অদ্বৈত সিদ্ধান্ত তদিতর মতবাদে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সমুদ্রে নদী সমূহের ন্যায় অদ্বৈতবাদে অন্যমতবাদ সমূহের সমাবেশ হইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ন্যায়-রত্নাবলীতে সমুদয় দর্শনের মধ্যে অদ্বৈত মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সকল দর্শন সমূহের প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের গুরুত্ব অনুধাবন করিলেও শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য অদ্বৈত-বাদেই পর্য্যাপ্ত হয়। দ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তক আনন্দতীর্থ বায়ুর অবতার বলিয়া কথিত; বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্য অনন্তাবতার বলিয়া প্রখ্যাত। অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য ত্রিমূর্ত্তির অন্তর্গত ভগবান শঙ্করের অবতার, অতএব প্রভব অনুসারেও শঙ্করের উৎকর্ষ প্রতিত হয়। ভগবান বিষ্ণুর অবতার ব্যাসদেবের সূত্রের তাৎপর্য্য

গ্রহণে ভগবান শঙ্করই সমর্থ, এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। অতএব বেদান্ত দর্শন যে সর্ব্বদর্শন শিরোমণি ইহা প্রতিপাদিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দ্বৈতবাদিগণের ব্যাখ্যা জাগ্রদবস্থার সমুচিত। এস্থানে ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে রামানুজ সম্প্রদায় ও শৈব সম্প্রদায় যথাক্রমে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার দ্যোতনা করে। শঙ্কর সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা এ তিনের অতীত এবং উহা তুরীয় নামে কথিত হইতে পারে। মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম ভূমিকায় দৃশ্যমান জগতে, দ্বিতীয় ভূমিকায় মানস জগতে, তৃতীয় ভূমিকায় জ্ঞানমাত্রাবশেষ জীবে এবং এ তিন অবস্থার অতীত ভূমিতে তুরীয় ব্রহ্মের স্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই সম্প্রদায় সমূহের ভেদ ভ্রূণ বিস্তার সহিত অতি সুন্দররূপে তুলিত হইতে পারে। গর্ভোপনিষদে দেখা যায় যে, ঋতুকালে সম্প্রয়োগ হেতু একরাত্রে কলল, সপ্তরাত্রে বুদ্বুদ, পক্ষান্তরে পিণ্ড, একমাস মধ্যে ভ্রূণ কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় মাসে শির, তৃতীয় মাসে পাদপ্রদেশ; চতুর্থ মাসে গুল্ফজঠর ও কটিপ্রদেশ, পঞ্চম মাসে পৃষ্ঠবংশ, ষষ্ঠ মাসে মুখ, নাসিকা, অক্ষি ও শ্রোত্র উৎপন্ন হয়। সপ্তম মাসে জীবের সহিত সংযুক্ত হয় এবং অষ্টম মাসে ভ্রূণ সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন হয়। এই বিভিন্নাকারের পর পর গঠন যেরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গঠন ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতবাদত একই সিদ্ধান্তের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা। অদ্বৈতবাদ সুকুমার অপত্যের ন্যায় ইহাদের পরিণতি।

"অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় বেদান্তের এক এক দেশ দর্শন করিয়া ভাষ্য রচনা করাতে বেদান্তবাদিগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন" একথা যে নিতান্ত যুক্তিশূন্য তাহা দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ বিচারে পরিস্ফুট হইবে।(?)

দার্শনিকগণ দৃক্ এবং দৃশ্য অথবা চিৎ এবং জড় এই দ্বিবিধ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আত্মা দৃক্ পদার্থ এবং প্রপঞ্চ দৃশ্য। অধ্যারোপের দ্বারা এই পদার্থদ্বয়ের নানাত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। তত্ত্ব

বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কেহ প্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং তৎসমস্তই স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌রূপে অবস্থিত এইরূপ মানিয়া লইয়া তদ্বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানশক্তি ও মনোবৃত্তির পরিচ্ছন্নতা বশতঃই মানব বাহ্য দৃষ্টিতে জড়তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হয় না ; সুতরাং একমাত্র বহির্দৃষ্টির উপর নির্ভর না করিয়া অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জ্ঞান শক্তি ও মনোবৃত্তির পরীক্ষা বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন তত্ত্বের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া নানামত প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে বিজ্ঞান তত্ত্ব (Ideal world), দ্বৈততত্ত্ব, বিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্ব ও অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে।

প্রপঞ্চের অস্তিত্ব বাদিগণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ প্রকারে তাহাদের মতবাদের আলোচনা করেন। (১) স্বতন্ত্র বস্তুবাদ এই মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদায় পদার্থের পারমার্থিক সত্ত্বা আছে। (২) অনুভূতিবাদ—এই মতে যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভূত হয় তাহাই সত্য, অপর সমুদায়ই প্রতিভাসিক। (৩) তৃতীয়তঃ যুক্তিবাদ—এই মতে মূল প্রকৃতিই সত্য, তদ্ভিন্ন অপর সমুদয়ই কল্পিত। এই সকল ব্যতীত সামঞ্জস্যবাদ নামে একটী চতুর্থবাদও প্রচলিত আছে।

স্বতন্ত্র বস্তুবাদ জড় ও চৈতন্যের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করে। সুতরাং Platoর বিজ্ঞানবাদ ; Aristotleএর সদ্বস্তুবাদ ; Kantএর অব্যক্তবাদ ; Spencerএর অজ্ঞেয়বাদ, চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনবাদ ; ন্যায় বৈশেষিকের অণুবাদ এবং সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষবাদ প্রভৃতি সমস্তই এই বাদের অন্তর্ভুক্ত।

সদ্বাদিগণ—স্বতন্ত্র বস্তুবাদী, মূল প্রকৃতিবাদী এবং অচিন্ত্য কারণবাদী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

বিজ্ঞানবাদ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানবাদ (Subjective Idealism) স্বতন্ত্র বিজ্ঞানবাদ (Objective Idealism), এবং পূর্ণবিজ্ঞানবাদ (Absolute Idelalism)। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানবাদ অনুসারে প্রপঞ্চ মানবের ধারণারই সমষ্টি, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। স্বতন্ত্র বিজ্ঞানবাদ অনুসারে মানব ধারণা ঈশ্বরের ধারণা হইতেই

উৎপত্তি হয় এবং উহা ঈশ্বরজ্ঞানে বর্ত্তমান আছে। এই ঐশ্বরিক ধারণা সমূহ মনুষ্য জ্ঞানের বহির্ভূত। পূর্ণ বিজ্ঞানবাদ অনুসারে প্রপঞ্চ মনুষ্য ধারণা সম্ভূত সত্য, কিন্তু সেই ধারণা ঈশ্বর ধারণা হইতে অস্বতন্ত্র, যেহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভেদ। এই সকল বাদ হইতেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে।

আমরা আগামী প্রবন্ধে উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত বিষয় অধিকার করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস চক্রবর্ত্তী সাংখ্যতীর্থ, এম, এ

ধর্ম্মের স্বরূপ*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪

ইতিবৃত্ত পাঠে আমরা জানিতে পারি কোন্‌দিন একাদশ লুইয়ের পাকযন্ত্রের পীড়া জন্মিয়াছিল, কোনদিন এলিজাবেথের রাজ্যে গোলযোগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু জগতের এই যে হাজারকরা ৯৯৯ জন লোক সর্ব্বদা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের জীবনটা কি ভাবে চলিতেছে—একথা কোন ইতিহাসেই ত ঘুণাক্ষরেও লিখিত হয় নাই।

আবার এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক লিখিয়া থাকেন, ঐ দেশে ঐরূপ লোক বাস করিত—অশন বসন তাহাদের এরূপ ছিল, তাহাদের আচার-ব্যবহার এমত ছিল; যেন খাদ্য ও ভূষণাদিতেই তাহাদের আচরণ গঠিত হইতেছে। শ্রমজীবিগণ কিভাবে আজও জীবনধারণ করিয়া

* ঋষিকল্প টলষ্টয়ের "What is Religion" নামক নিবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

আছে, এ কথার উত্তর দেওয়া আমাদের অসাধ্য—যতদিন না আমরা বিশ্বাস করি যে ধর্ম্মই জাতির প্রাণ। ইহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মালোচনাই বুঝিতে পারা যায়, ইহারা কি নিয়া বাঁচিয়া আছে।

প্রকৃতি বিজ্ঞান পাঠে প্রাণিজগতের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লোকের ধারণা জন্মিয়াছে, জীবন সংগ্রামে যে বাঁচে তাহারই জয়। সবল দুর্ব্বলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবেই, তাহা অনিবার্য্য—জগতের ইহা চিরন্তন প্রথা।

শিশু বিজ্ঞান বা চিকিৎসা শাস্ত্র কোনটাই ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে পারিতেছে না। শিশু বিজ্ঞান লোকের শ্রম লাঘবের ব্যবস্থা না করিয়া এমন কতকগুলি সাংসারিক উন্নতি সাধন করিতেছে, যদ্দারা শুধু ধনাঢ্যেরাই উপকৃত হয় এবং তদ্দারা কেবল ধনী-দরিদ্রের, প্রভু-ভৃত্যের পার্থক্যটা আরো বৃদ্ধি পাইতেছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা। তদ্দারা ধনীরই জীবন রক্ষিত হইতেছে, দরিদ্র ঔষধের মহার্ঘতার জন্য কাছেও ঘেঁসিতে পারিতেছে না, কাজেই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিভাবে সাধিত হইল!

আমাদের কি করা কর্ত্তব্য, দর্শন শাস্ত্রও এই কথার উত্তর না দিয়া গা ঢাকা দিয়া চলিয়া শুধু জীবন-সংগ্রাম নীতিরই সমর্থন করিতেছে,—যেহেতু কি প্রাণি জগৎ কি উদ্ভিদ জগৎ সর্ব্বত্রই ইহাই বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে; কাজেই দুর্ব্বলের বিনাশ সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতেছে। তবেই আমাদের কি করা কর্ত্তব্য, একথার উত্তরে দাঁড়ায়—সকলেই যদৃচ্ছা চলিতে থাক, অপরের জীবন ইহাতে থাকে কি যায়, সেদিকে তোমার লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই।

জগতের সকলেই স্বীকার করিবে ইন্দ্রিয় দমনই ধর্ম্মের সোপান, ত্যাগই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। কোন ধর্ম্মেরই এবিষয়ে মতভেদ নাই। হয় ত একদিন এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া বলিতে পারেন—আত্মত্যাগ, বিনয়, প্রেম—এগুলিই মানবকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে—সুতরাং এগুলি ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। আজকাল জগতের

তথাকথিত শিক্ষার আলোকে আলোকিত অনেক সুবিখ্যাত লোকই জ্ঞান ও প্রেমের মাহাত্ম্য স্বীকার না করিয়া এগুলির স্থানে অহংভাব, দাম্ভিকতা, নিষ্ঠুরতাকেই স্থান দিয়া থাকেন। সুতরাং অপরের অনিষ্ট সংসাধন করিয়া নিজের সুখ বৃদ্ধিই ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মকে জগৎ হইতে এভাবে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলে, এরূপ জঘন্য জীবনযাপনই লোকের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে। সকল ধর্ম্মের মূলেই সাম্যবাদ নিহিত আছে। কিন্তু মানুষ গোঁড়ামির বলেই তাহা স্বীকার করিতে চায় না। বিজ্ঞান বৈষম্যের সমর্থক—জীবন-সংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। অতএব মুষ্টিমেয় শাসক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য সহস্র সহস্র লোকের জীবন নাশ করিতেও লোক পরাঙ্মুখ হয় না। নিত্যই সংসারে এরূপ ঘটিতেছে।

বিগত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে, যাহা পূর্ব্বে কস্মিনকালেও হয় নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও এত নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে যে, তাহাও বলিয়া শেষ করা যায় না। মানুষের হীনবৃত্তিগুলি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহার পথে কোনরূপ বাধা জন্মাইবার চেষ্টা মোটেই করা হইতেছে না। বিজ্ঞানের উন্নতি ও নৈতিক অবনতির জন্য সংসারে এত ক্ষতি সংসাধিত হইতেছে যে, জেঙ্গিস খাঁ, এটিলা, নিরোর মত লোকও জগতের এত অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই।

টানেল, রেলপথ, রঞ্জন-আলোক প্রভৃতি লোকের মহৎ উপকার করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এগুলি নির্ম্মাণেও কতলোকের প্রাণনাশ হইতেছে। জগজ্জনকে আপনার ভাই বলিয়া মনে না করিতে পারিলে, তাহাদের জীবন নাশে হৃদয়ে ব্যথা না লাগিলে মানুষের কিছুই কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল না। মানুষের জীবনে ধর্ম্মভাব জাগরিত না হইলে, মানুষ নিজের হিতের জন্য অপরের জীবন নাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। চিকাগোর রেলপথে প্রতি বৎসর শতাধিক লোকের প্রাণনাশ হয়, তজ্জন্য রেল কর্তৃপক্ষ তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে ক্ষতিপূরণ দিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাতে ঐরূপ দুর্ঘটনা না হয় তজ্জন্য কোনই বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত

হয় না। কারণ ইহাতে যে ব্যয় লাগিবে মানুষের জীবনের ক্ষতিপূরণ দিতে ইহার সুদের চেয়েও কম খরচ পড়ে। হায় মানুষের কি নীচ অন্তঃকরণ! হয়ত লোক লজ্জার ভয়ে ইঁহারা এক দিন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু ধর্ম্মভাব হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ না হইলে—মানুষের উপরেও যে একজন দর্শক রহিয়াছেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে তাঁহারা হয়ত অন্যভাবে লোকের ধনপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিজেদের আর্থিক ক্ষতি পূরণ করিবেন।

৫

শারীরিক ও মানসিক শক্তির একটা সংযোগ আনয়নের জন্য মানুষ স্বভাবতঃই ব্যস্ত। নতুবা তাহার চিত্তে সুখ জন্মে না। আর সেই সুখসম্পত্তি দ্বিবিধ উপায়ে লাভ করা যায়; প্রথমতঃ মানুষের কোন ধর্ম্ম সম্পাদনের বাসনা জন্মিলে অথবা তাহা সম্পাদনের আবশ্যকতা হইয়া পড়িলে, মানুষ যুক্তির সাহায্যে মনে মনে বিচার করিয়া দেখে ইহা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তৎপর তদনুসারে কাজ করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ কোন কর্ম্মসম্পাদনের বাসনা জন্মিবা মাত্রই অথবা তাহার সম্পাদনের আবশ্যক বোধ করা মাত্রই ভাবের প্রেরণায় কাজটি করিয়া বসে, বিচার-যুক্তি তখন তাহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে না। আর কাজটি সম্পন্ন করিয়া তৎপর হয়ত অনেক চিন্তা করিয়া ইহার সমর্থনযোগ্য কতকগুলি যুক্তি বাহির করিয়া থাকে।

যাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব নিহিত আছে বিচারবুদ্ধি তাহাদিগকেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সাহায্য করে। আর যাহাদের মানবধর্ম্মের বিন্দুমাত্র স্থান নাই, তাহারাই নিজের খেয়ালের বসে কাজ করিয়া পরে অলীক যুক্তিদ্বারা ইহা সমর্থনের প্রয়াস পাইয়া শান্তির অন্বেষণ করে। কিন্তু শান্তি তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। কারণ ইহারা সততই বাসনার বশীভূত, যুক্তিকে তাহারা কোন দিন উপরে স্থান দিতে চায় না। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বিচার-যুক্তি ব্যতীত কোন ধর্ম্মই করেন না। তাই তিনি নিরাপদ। ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত ব্যক্তি যে কোন রূপ অন্যায় কর্ম্ম করিয়াই তাহা সমর্থনের জন্য যুক্তি বাহির করিয়া বসে।

মানুষ অন্যায় কর্ম্মে গা ভাসাইয়া চলিয়া আমোদ লাভ করে বলিয়াই আলোক অপেক্ষা অন্ধকারেই তাহার অধিক আনন্দ; অন্ধকারই আপাততঃ তাহার দুষ্কর্ম্মকে আবরণ দিয়া রাখিতে পারে।

সুতরাং জগতের ধর্ম্মজ্ঞান হীন অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মানবই যত নৃশংস, যত নীতি বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া বসে, আর সেগুলি গোপনের জন্য এমন কতকগুলি অলীক কর্ম্ম করিয়া জীবনটাকে জটিল করিয়া তোলে যে, তখন আর তাহার ইষ্টানিষ্ট সত্য মিথ্যা জ্ঞান থাকে না।

আধুনিক বিজ্ঞান আসল জিনিস বাদ দিয়া বাজে জিনিসের তত্বানুসন্ধানেই ব্যস্ত। জীবনের আধ্যাত্মিক পিপাসার শান্তি ত বিজ্ঞান করে না—বিজ্ঞান ত আমাদিগকে কখনও বলিয়া দেয় না এটা করা কর্ত্তব্য—ওটা নহে, ইহা করা উচিত আগে, উহা পরে। আজকাল সমাজ নীতিই বলি, সর্ব্বত্রই কি রাজনীতিই বলি—সর্ব্বত্রই একপ্রশ্ন—জগতে কতকগুলি লোক কেন বসিয়া থাকে আর কতকগুলি লোক কেন দিনরাত খাটিয়া মরে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, লোকজন কেন পৃথক পৃথক ভাবে কর্ম্ম করিয়া একে অন্যের বিঘ্ন জন্মায়?—একত্র কাজ করিয়া অধিক লাভবান হইতে চাহে না? এই প্রশ্নটিকে প্রথম প্রশ্নেরই অঙ্গীভূত করা যায়। কারণ লোকের মধ্যে অসমতা না থাকিলে ঝগড়া-ঝাঁটি লোপ পাইত। এই প্রশ্নটিই সকল প্রশ্নের সেরা। ইহার উপর কোনই প্রশ্ন থাকিতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞান ইহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহে—ইহার উত্তর দেওয়া বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত।

একথার উত্তরে এই দাঁড়ায় যে, যেহেতু মানুষ পরস্পরের ভাই ও প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমান, একজনের অপরের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা উচিত, যেন অপরের নিকট হইতে তদ্রূপ ব্যবহার পাইলে তাহার কোন ক্লেশ না জন্মে। সুতরাং মন হইতে ধর্ম্মের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন না করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের বীজ উপ্ত না করিতে পারিলে ইহার প্রতীকার হইবে না।

রাজবিধি-বিজ্ঞান (Jurisprudence), দণ্ডবিধি আইনেও সেই একই কথা—কেন লোক একে অন্যের উপর অত্যাচার করে,—অন্যের জীবন নাশ

করিয়া আমোদ উপভোগ করে? ইহার উত্তর ধর্ম্ম জ্ঞানের অভাব; হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জন্মিলেই মানুষ পাড়া প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। সুতরাং শৈশবেই আমাদের মন হইতে ভ্রান্ত কুসংস্কার কুযুক্তি বিতাড়িত করিয়া দিতে হইবে—যাহা নাকি আমাদের কুকার্য্যে প্রশ্রয় দেয়; তারপর যদি আমাদের অন্তরে অহিংসা মূলক ধর্ম্মবীজ নিক্ষিপ্ত হয়, তবেই কালে উহা ফল-প্রসূ হইয়া জীবন মধুময় করিয়া তুলিবে। প্রাপ্ত-বয়স্ক লোক কিন্তু তাহাদের আচরিত ধর্ম্ম পথ হইতে এক তিলও সরিয়া দাঁড়াইতে চাহিবে না।

জ্ঞানবৃদ্ধ লোক ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, দণ্ডবিধি প্রভৃতির রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়া যাইতেছেন, এবং মনে করিতেছেন তাঁহারা জগতের একটা মহৎ উপকার সাধনে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু যে মানুষ একই রূপ অধিকার লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা কেন একে অপরের উপর জুলুম করিতেছে একথার উত্তর ত ঐ সকল গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান জ্ঞান রাজ্যের সম্রাটগণও কদাপি এরূপ বৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশে মাথা ঘামান না।

প্রকৃত ধর্ম্ম কোথায় মিলে? ধর্ম্ম বিভিন্ন; কিন্তু সকলেরই মূলতত্ত্ব এক। মানবগণ অনেককাল যাবতই জগতে বাস করিতেছে এবং কতই আবিষ্কার করিয়া নিজেদের উন্নতি বিধান করিয়াছে, আধ্যাত্মিক নীতি-গুলিও সেইভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। যদি অন্ধলোক তাহা না দেখিতে পায়, তবে বুঝিতে হইবে না যে, ইহাদের অস্তিত্ব জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

আধুনিক ধর্ম্মে গোঁড়ামির স্থান থাকিতে পারে না, সকল ধর্ম্মে একই প্রকার মূলতত্ত্ব নিহিত। কিন্তু মানুষ সেগুলি বিশ্বাস না করিয়া যে এখনও পশুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার কারণ কতিপয় উদার মতাবলম্বী লোকের অবস্থান—যাহারা ধর্ম্মের সার তত্ত্বই গ্রহণ করিয়া থাকে। পুরোহিত সম্প্রদায় ও বৈজ্ঞানিকেরাই প্রকৃত ধর্ম্মে বিশ্বাসপরায়ণ নহে। (ব্রাহ্মধর্ম্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম সব ধর্ম্মেরই অন্তরাকার এক, কিন্তু বাহিরের আকারটা বিভিন্ন)। সকল ধর্ম্মই স্বীকার করে—ঈশ্বর

আছেন এবং তিনিই সকল পদার্থের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং সেই স্বর্গীয় অনাদি পুরুষের ভিতর হইতে জাত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া মানবের অন্তরে অবস্থান করে এবং মানুষ নিজের কর্ম্মের দ্বারা সেই তেজোময় পদার্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস সাধন করে। আর ইহা বৃদ্ধি করিতে হইলে মানুষকে ইন্দ্রিয় সংযমী হইতে হইবে, হৃদয়ের ভালবাসা বাড়াইয়া তুলিতে হইবে, আর সর্ব্বোপরি অন্যে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে আমরা তৃপ্তিলাভ করি অন্যের প্রতিও আমাদের তদ্রূপ আচরণ প্রদর্শন করা উচিত ইহাও জানা প্রয়োজন বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বরের কোন সংজ্ঞা না দিতে পারিলেও এ কথা স্বীকার করে যে, মানুষ একটা কিছুরই সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র অথবা নির্ব্বাণ লাভ করিলে একটা কিছুর মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। সেই অনাদি বস্তুকেই আমরা সকলে ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করি।

কিন্তু আজকালকার লোক ধর্ম্মের এই নূতন সংজ্ঞায় পরিতৃপ্ত নহে। তাহারা মনে করে ধর্ম্মের নামে অজ্ঞেয়, অমানুষিক কোন পদার্থকে বুঝায়।

সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি স্থলের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ তাহারই নাম ধর্ম্ম। এবং এই সম্বন্ধ হইতেই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মানবের—বিরাটের সহিত অংশের সম্বন্ধ বুঝায়। ইহাতেই মানুষ আপনার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে পারে, আর স্বীয় অন্তর নিহিত আধ্যাত্মিক ভাবটা বাড়াইয়া তুলিতে পারিলেই যে মানব জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছান যায় তাহাও সে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে—তখনই মানুষ বুঝিতে পারে, অপরের নিকট হইতে আমরা যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি, অপরের প্রতিও আমাদের তদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত। আর যদি তাহাই আমরা পালন করিতে পারি, তবে সংসারে নরহত্যা, জিঘাংসা, ব্যভিচার, স্বার্থপরতা, কপটাচার ইত্যাদি কিছুই বর্ত্তমান থাকিতে পারিবে না।

সকল ধর্ম্মেই যে সত্য নিহিত আছে, তাহা অতিসহজ, সুবোধ্য ও

মানুষের পক্ষে অনায়াসে পালনীয়। অবতারবাদে বালক বিশ্বাস করুক বা না করুক—আমাদের মধ্যে ভগবৎশক্তি বিরাজিত, আমরা অপরের নিকট হইতে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করি, অপরের প্রতিও আমাদের তদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত—এই সহজ সরল অবশ্যপালনীয় বিষয়টি যদি বালকের মনের মধ্যে একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে পরিণত বয়সে ইহা নিশ্চয়ই বদ্ধমূল হইয়া পড়িবে। যদি সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া যায় যে, ভগবৎশক্তি আমাদের মধ্যেই নিহিত আছে, এবং আমাদের নিজের জীবনের কার্য্য দ্বারা আমরা তাহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারি, তবেই পূজা-প্রার্থনা-পদ্ধতি-শিক্ষা আপনা আপনিই হইয়া যাইবে, হিংসা বিসম্বাদ ধরার পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে, এক ধর্ম্মের ছায়ায় আমরা একত্রিত হইয়া শান্তি-সুখে জীবন যাপন করিতে পারিব। কিন্তু অধুনা আশৈশব সেরূপ শিক্ষা না দিয়া একটা মিথ্যা ধর্ম্মের আবরণে লোকদিগকে আবৃত করিয়া রাখিয়া তাহাদের অন্তরে একটা ধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণারভাব জাগাইয়া তোলা হয় যাহার অপনোদন নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

মানুষ কেন এই সহজ সরল পথ ধরে না—তাহার একমাত্র কারণ লোক ধর্ম্মবিহীন জীবনযাপন করিতে করিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, লোকে অন্যায় অত্যাচরাই আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র বলিয়া মনে করিতেছে, এবং নিজেও এরূপ উৎপীড়িত হইয়া, কি কুহকে পড়িয়া যেন সব ভুলিয়া যাইতেছে।

মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে তাহার অন্তরের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নৈতিক উন্নতি বিধান করিয়া তাহাকে পূর্ণতার পথে ধাবিত করিতে হইবে।

অত্যাচার উৎপীড়নাদি বাহিক ক্রিয়ার দ্বারা মানুষ স্বীয় উন্নতির চেষ্টা করিলে তাহার পতন অনিবার্য্য।

যাঁহাদের উপর শান্তি ও নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার ন্যস্ত, তাঁহারা যদি অন্যায় অত্যাচার দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করেন, এবং প্রচলিত মিথ্যাধর্ম্মও যদি তাহা সমর্থন করে, তবে মানুষের ধারণা

জন্মিবে যে জীবনের লক্ষ্য পরস্পরকে ভালবাসিয়া তাহাদের সাহায্যার্থ আত্মনিয়োগ নহে—জীবনের উদ্দেশ্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া একে অন্যের শোণিত পান ; আর এরূপ ভ্রান্ত ধারণা যতই লোকের মনে দৃঢ়ীভূত হইবে, ততই মানুষ ও পশুর পার্থক্য দূরীভূত হইবে এবং মানুষ মিথ্যাধর্ম্মের কুহকে ভুলিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া জীবনটা দুর্বিসহ করিয়া তুলিবে। মানুষে পশুভাব প্রবল হইলে এই সকল কুহক হইতে নিজেকে মুক্ত করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে ; কাজেই সত্য ধর্ম্মের ছায়ার আশ্রয় লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় ; তখনই মানুষ যাহা স্বাভাবিক সুসাধ্য সময়োপযোগী তাহা না করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে।

৬

সাধারণ লোক পুরোহিতের হাতের এরূপ একটা ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের প্রচারিত ভ্রান্ত ধর্ম্মকেই তাহারা প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া পুরুষ পরম্পরা মানিয়া আসিতেছে। এই মোহবন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি ইহাদের নাই। আর যদি বা ইহারা এরূপ ধর্ম্মযাজকদের হস্ত হইতেও পরিত্রাণ পায় তবুও বিজ্ঞান আবার তাহাদের মাথায় গোল বাধাইয়া দিবে, কারণ বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে চায় না।

সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোক মুখে নিম্ন শ্রেণীর হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া গাহিয়া বেড়াইলেও ভ্রান্ত ধর্ম্মের মোহ হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিতে অগ্রসর হয় না, আর নিম্নশ্রেণীর লোকও সমাজের নানা বাধ্য বাধকতার ভয়ে অসার ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহসী হয় না।

কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ লোক করেন কি? তাঁহারা সমাজের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া প্রাণপণে হৃদয়ে ধর্ম্মবহ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিবার চেষ্টা করেন, এবং তাহারই ফলে লোকজন আজকালও ধরাধামে বাঁচিয়া আছে, নিশ্চিতই মনে করিতে হইবে।

সমাজে এই সমুদায় লোকের আদর প্রতিপত্তি নাই, তাঁহারা হয়ত ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সমাজ হইতে দূরে কারাগৃহের রুদ্ধ বায়ুতে নিঃশ্বাস

ফেলিতে বাধ্য হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমুদায় ক্ষণজন্মা পুরুষই সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ঈদৃশ মুষ্টিমেয় ধর্ম্মপরায়ণ লোকই সমাজের উচ্ছৃঙ্খলা দূরীকরণার্থ সমাজের অসত্য অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দিন দিন হৃদয়ে বল সঞ্চয় করে। স্বর্গীয় সত্যের প্রচার—ধর্ম্মের মিথ্যা-বরণে আবৃত অসত্যের বিনাশের জন্য প্রাণপাত করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরের সেবাই তাঁহাদের জীবনের মূল মন্ত্র,—দুর্নীতি-পরায়ণ সমাজের দাস হইয়া থাকিয়া বাহবা লাভ করাকে ইঁহারা নিতান্ত হেয় মনে করেন। সমাজের চোখ রাঙানিতে তাঁহাদের কিছুই আসে যায় না, ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। যাঁহারা ধর্ম্মের জ্যোতিঃতে জ্যোতিষ্মান তাঁহারা অনন্ত জীবনের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশ ইহজীবনের দুঃখ ক্লেশ মোটেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনয়ন করেন না। তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে, মৃত্যুও তাঁহাদের অনন্তজীবনের ধ্বংস সাধন করিতে পারে না।

এ সমুদায় পূতাত্মা মহাত্মাগণই সমাজের মোহবন্ধন অচিরাৎ ছেদন করিয়া দিতে অগ্রসর হন। ইঁহারা উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ না করিলেও—সমাজে ইঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি না থাকিলেও এমন কি বাগ্দেবীর কৃপা লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে না ঘটিলেও, স্বীয় অন্তরস্থ সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা ধর্ম্মপিপাসু মানব হৃদয়ের চির সঞ্চিত মলিন আবর্জ্জনা বিদগ্ধ করিয়া তাহাদের হৃদয় স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে আলোকিত করিয়া দিতে একমাত্র ইঁহারাই সক্ষম। সমাজে পুরোহিত ধর্ম্মাচার্য্যগণ মনে করেন, তাঁহারা অপরাপর লোক হইতে শ্রেষ্ঠ। আপামর-সাধারণ এই ভেদনীতি ভ্রান্ত ধর্ম্ম শিক্ষার বলেই মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতেছে।

শরীরের জোরে রেলগাড়ী চালান অসম্ভব, কিন্তু এঞ্জিনে বসিয়া যথারীতি চালনা করিলে ইহা সহজেই চলিতে পারে। বাষ্পের বলে গাড়ী চলে, মনুষ্য জীবনের এই বাষ্পই ধর্ম্মভাব। প্রকৃত ধর্ম্মভাবের অভাবেই মানুষ অপরের দাস হইতে দ্বিধা বোধ করে না।

তুরস্কের সুলতানই বলুন, রুসিয়ার জারই বলুন, জার্ম্মেনীর সম্রাটই বলুন, কে না বিশ্বাস করে ধর্ম্মের উপরই তাঁহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত,

ভগবানের নামে কার না অন্তরে অভিনব ভাবের উদয় হয়? ধনিগণও কেন ভজনালয়ে অন্ততঃ লোক দেখানর জন্যও—যাতায়াত করে? মানুষ বিশ্বাস করে বংশ রক্ষা করিতে হইলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা নানাজাতির উন্নতি অবনতির বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়া কত তত্ত্বই না আবিষ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতীত যে কোন জাতিরই উন্নতি অসম্ভব, এই মোটা কথাটি তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না; অথবা লোক সমাজকে প্রতারিত করার জন্যই যেন ইহাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞ রাখিতে চাহেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের নিজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। যদি তাহা একান্তই ইচ্ছাকৃত হয়, তবে ইহার ন্যায় গুরুতর অপরাধ আর কি আছে? ধর্ম্ম অর্থে অস্বাভাবিক কোন কিছুতে বিশ্বাস বুঝায় না, ধর্ম্ম অর্থে শুধু উপাসনা ক্রিয়াকাণ্ডও বুঝায় না, বৈজ্ঞানিকগণ যে ধর্ম্ম অর্থে শুধু প্রাচীন কুসংস্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে—মানুষের সহিত তাহার অনন্ত জীবনের ও পরমেশ্বরের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান—যুক্তি এবং আধুনিক জ্ঞানও যাহা অস্বীকার করিতে পারে না—ধর্ম্ম অর্থে তাহাই বুঝায়। এবং একমাত্র ধর্ম্মই মানুষকে তাহার গন্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

"The soul of man is the lamp of God"—মানুষের আত্মাই ভগবানের দীপ যে পর্য্যন্ত ভগবানের আলোতে এই প্রদীপটি প্রজ্বলিত না হয় সে পর্য্যন্ত মানুষ দুর্ব্বল, দুর্ভাগ্যই থাকিয়া যায়। যখন ভগবৎ রশ্মিতে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে, তখন তাহার দেহে অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হয় যে শক্তির নিকট জগতের সমুদায় শক্তি পরাভূত হয়। আর তাহা না হইবে বা কেন?—

—এশক্তি ত মানুষের আত্মশক্তি নয়—ইহা যে ভগবৎ-শক্তি!

—শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

মাধুকরী

১

দেবীদুর্গা।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ত্রেতার আগেও প্রমাণ যোগাইয়াছে। এই পুরাণের মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য শরতে দুর্গার আরাধনা করিয়া ফল পাইয়াছিলেন। দেবীভাগবত আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন, ভারতে সুযজ্ঞ রাজা সর্ব্বপ্রথম দেবীর পূজা করেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমপাদে রাজা দনুজমর্দ্দন বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, তিনি অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বেও দুর্গোৎসব তত্ত্ব আছে; কাজেই রঘুনন্দনের সময় দুর্গোৎসব হইত। আকবরের চোপদার রাজা কংসনারায়ণ বাঙলার দেওয়ান হইয়াছিলেন, ইঁহার পিতার নাম বিখ্যাত টীকাকার কল্লুকভট্ট, পিতামহের নাম উদয়নারায়ণ,—রাজা গণেশের শ্যালক। ইনি এক মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর-রাজাদের পুরোহিত। তাঁহাদের মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী বাঙলা-বেহারের সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—মহাযজ্ঞ চারিটি—বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ, গোমেধ। একালে এ সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব। তিনি তাঁহাকে দুর্গোৎসব করিবার ব্যবস্থা ও আদেশ দেন। আট নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে এই দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। রমেশ শাস্ত্রী দুর্গোৎসব-পদ্ধতি লেখেন। এই পূজা-পদ্ধতি দেখিয়া জগৎনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পূজা করেন। এ পূজা হইল বাসন্তীপূজা। তারপর সাঁতোড়ের রাজা ও আরও অনেক লোকে দুর্গোৎসব প্রচলিত করেন। সেই পূজা আজও চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশে প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়। বাঙলার বাহিরে কোন

কোন দেশে সুধু নব-পত্রিকার পূজা হয়। নেপালে নবপত্রিকা পূজা হয়।

ঋগ্বেদে (২য় মণ্ডল, ২৭শ সূক্ত, ৯ম ঋক) উপদেশ করিতেছেন—

ওঁ ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে। দক্ষস্য পিতরং তনা॥

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদি বা কুণ্ডের নাম যে "দক্ষ তনয়া" ছিল, এইটি বোধ হয় তাহার একটি কারণ। যজ্ঞবেদিতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অথবা দক্ষতনয়া অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া, লোকে বৈদিক যুগের শেষদিকে ধারণা করিয়া লইল, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি ব্যতীত আর কেহ নন। কেন না, "রুদ্র" শব্দে অগ্নি ও মহাদেব উভয়ই বুঝাইত। তা'ছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নির পৌরাণিক আখ্যায়িকায় অষ্টমূর্ত্তির নাম—রুদ্র, সর্ব্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব, ঈশান পাওয়া যায়। শিবের সহিত দক্ষকন্যা সতীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকার মূলে এই বৈদিক ব্যাপার। অগ্নির সহিত বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এইটুকু বুঝাইবার জন্য বোধ হয় পুরাণে শিব-দুর্গার বিবাহ-ব্যাপার।

প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদি রক্ষা করিতেন। ঋগ্বেদে (১।১৩৬।৩) উপদেশ করিতেছেন।

"জ্যোতিষ্মতী মদিতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং সর্ব্বতীম,"—

"যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণ লক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন"। ঋষিরা এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবিঃ প্রভৃতি দানের দরকার হইল। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর অর্থাৎ 'দক্ষকন্যার' উপর পীতবর্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিতেন। এই মূর্ত্তিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে

"হব্য বাহণী" বলিতেন। ঋগ্বেদেও তাই (১০।১৮৮।৩) ঈরিত হইয়াছে।

"যারুচো জাত বেদসো দেবত্রা হব্যবাহণীঃ। তাভির্ণো যজ্ঞমিন্বতু॥"

অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবতার নিকট হব্যবহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। এই মূর্ত্তিই আমাদিগের দুর্গা। কুণ্ডের দশ দিকে দুর্গার দশহাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটী দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইঁহাদের একজন যোদ্ধা কুণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকেন; একজন যজ্ঞের সূচনা করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার চারি হাত। একটি দেবী যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী, আর একজন যজ্ঞের জন্য অর্থাগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্গার সঙ্গে আরও কয়েকটী ছোট দেবতা থাকায় নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণস্বরূপ। মূর্ত্তিমান বেদজ্ঞান হইতেছেন সরস্বতী। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহাই লক্ষ্মী। যোদ্ধা কার্ত্তিকেয় যজ্ঞ রক্ষা করিতেন—আর গণেশ যজ্ঞের সূচনা করিয়া দিতেন, তাই তাঁর চার হাত। বৈদিক যজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক্, পুরোহিত ও যজমান, এই চারি হাত। দুর্গার পক্ষে এ গুলি ঠিক খাটে। এ ছাড়া আমরা পাই—

বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ ৩।১৫।১

"তুমি বিস্তীর্ণ তেজোদ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর।" আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদিক মন্ত্রে অগ্নি-দেবতার নিকট অসুরগণকে বধ করা হইতেছে। দুর্গাই যে বৈদিক অগ্নি তাহার আর একটী প্রমাণ এই—দুর্গাদেবীর অর্চনাকালে আমরা সামবেদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করি—

"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎ সি বর্হিসি।"

বৈদিক যুগের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, 'দক্ষকন্যা' ক্রমশঃ 'উমাতে' পরিণত হইলেন, 'উমা' 'অম্বিকা'য় এবং 'অম্বিকা' 'দুর্গা'য় পরিণত হইলেন। এই সময় আর তিনি যজ্ঞবেদি রহিলেন না। যজ্ঞবেদি ও অগ্নির সম্মিলিত শক্তি স্ত্রী দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ (৩।৫৭) [বাজসনেয়ী সংহিতা] বলিতেছেন—হে

রুদ্র, এই তোমার হবির্ভাগ তুমি তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আস্বাদন কর—'এষতে রুদ্রভাগঃ স্বস্রা অম্বিকায়া তং জুষস্ব স্বাহা।' তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আমরা দুর্গা, মহাদেব, কার্ত্তিক, গণেশ, নন্দীকে একসঙ্গে পাইয়াছি। এই সময় রুদ্র ও মহাদেব অভিন্ন হইয়াছেন। উমা, অম্বিকা ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাদেব রুদ্র তখন উমাপতি, অম্বিকাপতি। তখন উমা বা অম্বিকা মহাদেবের ভগ্নী নন। আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উক্তিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

১। পুরুষস্য বিদ্মহে সহস্রাক্ষস্য ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। [১০ম প্রপাঠক। ১ম অনুবাক। ৫] তন্নো নন্দীঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় মহাসেনায় ধীমহি। তন্নো ষন্মুখঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।১।৬]

২। কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।৭] নারায়ণোপনিষৎ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছে—"কাত্যায়ন্যৈঃ বিদ্মহে, কন্যাকুমার্য্যৈঃ ধীমহি, তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।" * [সায়ণ ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদে লিঙ্গব্যত্যয় হইয়া থাকে। তাই দুর্গা বুঝাইতে 'দুর্গি'র প্রয়োগ হইয়াছে। 'দুর্গিঃ দুর্গলিঙ্গাদিব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্রো ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।']

৩। নমো হিরণ্য বাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায়
হিরণ্যপতয়েঽম্বিকাপতয় উমাপতয়ে নমো নমঃ। ১০।১৮।

বৃহদ্দেবতা বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইহাতে (২।৭৮।৭৯) আমরা দেখিতে পাই, অদিতি বাক্ সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্ন। আমরা যে দুর্গার পূজা করি, তাঁহার বাহন সিংহ। দেবী বাক্ নিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং দেবতার বিশেষ সাধ্য সাধনায় তাঁহাদের নিকট গমন করেন। এই বাক ও সিংহ যে অভিন্ন, শাস্ত্রে (Shakti and Sakta by Sir

---

* এইরূপ পাঠ নারায়ণ উপনিষদে দৃষ্ট হয় না তবে আধুনিক পূজা পদ্ধতির মধ্যে দৃষ্ট হয় বটে। (উঃ সঃ

John Woodroffe PP 456—457) তাহার প্রমাণ আছে। বাক্ এবং দুর্গা যে অভিন্ন বৃহদ্দেবতা তাহার প্রমাণ। আমরা যতটুকু পাইলাম, তাহা হইতে দুর্গার সহিত সিংহের সংশ্রবের একটা কারণ স্থির করা যাইতে পারে। ঋগ্‌বিধান ব্রাহ্মণে (৪।১৯) রাত্রিসূক্তবাচনের নির্দ্দেশ আছে। পূজাকালে স্থালিপাক যজ্ঞরাত্রির পূজা করিতে হয়। দেবী বাক ও যজ্ঞরাত্রি মূলতঃ এক হইলেও রূপতঃ বিভিন্ন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৪।৬।১০) উল্লেখ আছে যে, ইঁহারা কখন কখন সম্পূর্ণ অভিন্ন। রাত্রিসূক্ত ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে (২৫) রাত্রিদেবীকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হইয়াছে, আর এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১) স্থান পাইয়াছে। এই আরণ্যকে তিনি হব্যবাহনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুর্গা, হব্যবাহনী ও অগ্নি এ তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুর্গা ও অগ্নি অভিন্ন বলিয়া দুর্গাকে জিহ্বাশালিনী বলা হইয়াছে। এই জিহ্বা সাতটি। তাহাদের নাম কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং সুচিস্মিতা। এই সপ্ত জিহ্বা প্রকট করিয়া যে দুর্গা বলি গ্রহণ করেন, গৃহ্যসংগ্রহ (১।১৩।১৪) তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক যুগে অনেকগুলি দেবতার পূজা হইত। সেই দেবতাগুলি বৈদিক যুগের শেষ দিকে দুর্গা নামে প্রচারিত ও পূজিত হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাজসনেয়ী-সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রভগিনী, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) দুর্গা রুদ্রপত্নী। এই আরণ্যকে (১০।১) আবার দুর্গাদেবীর আরাধনা আছে, সেইখানে তিনি বৈরচনী। বিরোচন সূর্য্য বা অগ্নির নাম। অন্যত্র (১০।১।১৭) যেখানে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেখানে দুর্গার (দুর্গির) আরও দুইটি নাম আছে—একটি কাত্যায়নী অপরটি কন্যাকুমারী। কেনোপনিষদে (৩।২৫) পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞা দেবী হিমবানের কন্যা উমা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) রুদ্রকে উমাপতি বলা হইয়াছে। এই আরণ্যকের (১০।২৬।৩০) সরস্বতীকে বরদা, মহাদেবী ও সন্ধ্যাবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরে আবার এগুলিকে দুর্গাদেবীর গুণরূপে প্রযুক্ত হইতে

দেখা যায়। বৈদিক যুগ হইতে পরযুগে সাহিত্য আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে দুর্গাতত্ত্বের আরম্ভ হইয়া রামায়ণ মহাভারত যুগে ইহা সম্পূর্ণ হয়।

(যমুনা, কার্ত্তিক) —শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

২

বাঙ্গলার সমস্যা।—বাঙ্গলার তথা সমস্ত ভারতবর্ষে প্রধান সমস্যা, নষ্ট পল্লীগ্রাম সমূহের পুনরুদ্ধার। সকলেরি এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে যে অনশনে-জীর্ণ-শীর্ণ,—ব্যাধিক্লিষ্ট পল্লীবাসীদিগকে বাচাইতে না পারিলে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। আরাম ও বিরাম উপভোগের জন্য, অনেক সময়ে পেটের দায়ে, দলে দলে শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিতে আরাম্ভ করিয়াছিলেন। ফলে এতাবৎ কাল ধরিয়া জাতীয় সমস্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান সহরে হইতেছিল। এই পশ্চাত্য অন্ধ-অনুকরণ ফলে পর্ণকুটীরবাসীদিগকে আমরা অবহেলা করিয়া আসিয়াছি কাজেই তাহারা এখন আমাদিগকে অবজ্ঞা চক্ষে দেখে। তাহাদের ধারণা যাহা কিছু ভাল সকলি সরকারই করিয়া থাকেন। লাভে তাহাদের সহিত ভদ্রলোকদের ব্যবধান বাড়িয়া যাইতেছে। বহুদিনের সঞ্চিত এই সমস্ত ভুল ও ভ্রান্তিগুলির প্রায়শ্চিত্তের সময় আসিয়াছে।

সমগ্র জাতির প্রাণ শক্তি আজ স্পন্দন হীন, কারণ ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনী-শক্তি "সমাজি অন্তরনিহিত" এই পল্লীগ্রাম গুলি সেই সমাজের কেন্দ্র স্থল। কাজেই ইহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিরই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধি প্রাণে প্রাণে এই সত্যটি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই Bardoli Resolutionএর অবতারণা করিয়াছিলেন। Council প্রবেশের জন্য যে শক্তি প্রয়োগ করা

হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ এই পল্লীর সংস্করণে ব্যয়িত হইলে এতদিন কাজ অনেক আগাইয়া যাইত। বিশেষতঃ যখন দেশে কাজ করিবার প্রেরণা আসিয়াছে। মাহাত্মা গান্ধি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এই সব নিরক্ষর অন্নাভাবে পীড়িত পল্লীগ্রামবাসীদেগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে না পারিলে, তাহাদের বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাকর্ষণ না করিতে পারিলে স্বরাজ লাভের আশা অনেক দূরে—বিশেষতঃ যখন সাম্প্রদায়িকতা এখনও পূর্ণ বর্ত্তমান। সুখের বিষয় যে, যাবতীয় বৈষম্য ও সংঘর্ষ দূর করিয়া যাহাতে সর্ব্বজাতির এবং সম্প্রদায়ের মিলন হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বত্র হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় বিধান আজ নবযুগের সাধনা এবং পরমপূজ্য পরমহংস দেবই সেই যোগের হোতা।

কি কি অভাবে পল্লী গ্রামগুলি নষ্ট হইতেছে ইহা গভীর চিন্তার বিষয়। আমার মতে অন্নাভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এবং শিক্ষার অভাবই দিন দিন এই পল্লীগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে।

অন্নাভাব

পল্লীগ্রামবাসী বলিলে আজ আমরা বুঝি কতকগুলি কৃষিজীবী এবং শ্রমীকের দল। কারণ যে কোন কারণেই হউক তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ প্রায় সমস্তই পল্লী ত্যাগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন—বিশেষতঃ জমিদারবর্গ। এই সব কৃষিজীবী এবং শ্রমীকেরা অধিকাংশ প্রায় ঋণগ্রস্ত। মহাজন ও জমিদারেরা ইহাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা উৎপাদিত ফসল ও দ্রব্যগুলি নামেমাত্র দামে কিনিয়া লন। ফলে বৎসরের পর বৎসর বৃষ্টিতে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া মর্ম্মান্তিক পরিশ্রম করিয়াও ইহাদের পরণে কাপড় নাই এবং কুটীরে আচ্ছাদন থাকে না। ইহাদের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের ফলভাগী হন এইসব জমিদার এবং মহাজনেরা। পূর্ব্বকালে এইসব মহাজন ও জমিদার পল্লীগ্রামে বাস করায় কৃষিজীবী ও শ্রমিকগণেরা কতকটা প্রতিদান পাইত। তাঁহারা নিজ সুবিধার জন্য পুষ্করিণী খনন এবং বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সৎকর্ম্ম করিতেন। কাজেই দরিদ্র প্রজাদেরও অনেকটা সুবিধা হইত। তখন

এইসব ধনী লোকদের মধ্যে এত বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। এখন দেখিতে পাই অনেক সময়ে নিঃস্ব, অসহায় পল্লীবাসীদের শোষিত অর্থে অনেক ধনী লোকই তাঁহাদের কামানলের আহুতি দেন। এখনও এইসব লোকদের চক্ষু ফোটা উচিত এবং এইসব দরিদ্র নারায়ণেরা যাহাতে দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পারে এবং তাহাদের মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

এইসব শ্রমিকদের বাঁচাইতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের "অভিঃ" মন্ত্রে ইহাদের দীক্ষিত করিতে হইবে এবং পল্লী সমাজ যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই আত্মনির্ভরশীলতার একমাত্র উপায় গ্রামে গ্রামে সমবায়-পদ্ধতিতে, কৃষিজীবী ও শ্রমিকদের মধ্যে, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন ও ধর্ম্মশালার প্রচলন। শ্রমিকদের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি—কুটীরশিল্প যাহাতে ভাল দরে বিক্রয় হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। গোয়াড়ীতে Industrial Union & Co-operative Bank ঠিক এই উদ্দেশ্যে খোলা হইয়াছে। এখানে প্রায় সর্ব্বপ্রকার কুটীরশিল্পীদের প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের সূতা প্রভৃতি কিনিবার জন্য সমবায় পদ্ধতিতে টাকা দাদন দেওয়া হয়। এই রকম ব্যাঙ্ক প্রত্যেক মহকুমায় মহকুমায় হওয়া উচিত। সমবায় পদ্ধতির একটী প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে না। একের ব্যক্তিগত চেষ্টায় যাহা না হয় দশের সমষ্টিগত চেষ্টায় তাহা সহজ হইয়া পড়ে।

মহাত্মা গান্ধি প্রচলিত চরকা ও তূলার চাষও এই অন্ন সমস্যা কতকটা সমাধান করিতে পারে। বৎসরের পর বৎসর কত কোটী টাকা আমাদের পোষাক পরিচ্ছদের জন্য যে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহার হিসাব কয়জন লোকে রাখে? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক কৃষিজীবী এবং শ্রমিকেরা যদি তাহাদের অবসরের সময়ে চরকা কাটে তাহা হইলে নিজ পরিবারের কাপড় কিনিবার দরকার হয় না এবং সেই অনুপাতে আয়ও বাড়ে। আগে দেখিতাম আমাদের ঠাকুর মা প্রভৃতিরা অবসরের সময় পৈতার সূতা কাটিতেন। আর এখন পৈতার জন্য এমন কি নিজেদের স্ত্রীলোকদের উলঙ্গতা নিবারণের জন্য আমরা

Manchester এর মুখাপেক্ষী। যুদ্ধের সময় বেশ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে Manchester ইচ্ছা করিলেই আমাদের অধিকাংশকেই বস্ত্রহীন করিয়া রাখিতে পারে। অথচ এমন দিন গিয়াছে যখন ঘরে ঘরে চরকা চলিত, নিজেদের বস্ত্রাভাব মোচন করিয়াও এই ভারতবাসী অনেক উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে! কথায় চলিত আছে,—

"চরকার দৌলতে মোর দোরে বাঁধা হাতী"

এইসব কাজ করিতে হইলে চাই কতকগুলি স্বদেশপ্রাণ স্বার্থত্যাগী সেবকের দল। তাঁহাদের সহরে থাকিয়া কাজ করিলে চলিবে না। পল্লীগ্রামকে তাঁহাদের চেষ্টার কেন্দ্র করিতে হইবে। চাষার সঙ্গে চাষী হইয়া তাহাদের কাজ শিখাইতে হইবে। আমাদের শিক্ষিতদের প্রতি নষ্ট-প্রায় বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে। যাহাতে গ্রামে গ্রামে চরকার কাজ আরম্ভ হয় এবং সমবায় পদ্ধতিতে নিজেদের উদ্যমে Bank প্রভৃতি স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্থির পদে গন্তব্যের দিকে যাইতে পারিলে শীঘ্রই আমরা সফলকাম হইব। বক্তৃতার সময় গিয়াছে এখন কর্ম্মের সময়।

পরবর্ত্তী মাসে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা আছে।　　(ক্রমশঃ)

—ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্-বি

৩

বাঙ্গলার গ্রাম ঃ—এবার নদীয়াজেলা-সম্মিলনীর ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে, শ্রীযুত বসন্তকুমার লাহিড়ী যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কেন না বসন্তবাবু যে সমস্ত সমস্যা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কেবল নদীয়া জেলার নয়—সমগ্র বাঙ্গলারই সমস্যা। বাঙ্গালী আজ মরিতে বসিয়াছে—তাহার জাতীয়-জীবনে ভীষণ ভাঙ্গন

ধরিয়াছে। দারিদ্র্য ও ব্যাধি—তাহার অস্থি-মজ্জা-মাংস দিনের পর দিন শোষণ করিতেছে। এই জীবন-মরণ-সমস্যাই বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে আজ প্রধান বা একমাত্র সমস্যা। যদি জাতিহিসাবে আমরা ধরাপৃষ্ঠে টিকিয়া থাকিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে এই জীবন-মরণ-সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গলার তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়—ধনী মানী জ্ঞানীর দল কি করিতেছে? তাহারা পাশ্চাত্য রাজনীতির গোটা কয়েক বাঁধাগৎ আওড়াইয়া আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছে, সভা করিতেছে, বক্তৃতা করিতেছে, দল পাকাইতেছে। এদিকে যে তাহাদের চোখের সম্মুখে সোনার বাঙ্গলা শ্মশান হইয়া গেল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।

বসন্তবাবু বলিতেছেন:—আমরা মরিতে বসিয়াছি। পল্লী সকল শ্মশানে পরিণত করিয়া পেটের দায়ে সহরে ছুটিতেছি। সকলেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং দেশ কিসে বাঁচে, সে ভাবনা তথাকথিত শিক্ষিতদের মনে এখনও স্থান পাইতেছে না। যাহারা অন্ন যোগাইতেছে, তাহারাই রোগে, শোকে, অনাহারে, অদ্ধাহারে পল্লীবাসে দিন কাটাইতেছে। ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" যত লোক মরিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বেশী লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে। স্বাস্থ্যই মানবের প্রধান সম্পদ্, আমরা স্বাস্থ্যহীন হইয়া চাকুরী ও ব্যাপার করিয়া (ব্যবসায় করিয়া নহে) ধনশালী হইবার চেষ্টা করিতেছি।

নদীয়া জেলা শত বৎসর পূর্ব্বেও ধন-ধান্যের আধার, কমলার লীলাভূমি সরস্বতীর প্রিয় নিকেতন ছিল। তখনকার দিনে এই নদীয়াই ছিল বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সভ্যতায়, শালীনতায় বাঙ্গলার শীর্ষস্থান। কিন্তু সেই নদীয়া জেলার এখন কি শোচনীয় অবস্থা! ১৮৭২ সালে এ জেলার লোকসংখ্যা ছিল ১৫০০৩৯৭, আর ১৯২১ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪৮৭৫৭২; অর্থাৎ অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে জনসংখ্যা ৮৬৫৩৯ হ্রাস হইয়াছে। ১৯১১ সালের সঙ্গে ১৯২১ সালের লোক-সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, নদীয়া জেলার লোকসংখ্যা দশ বৎসরে ১৬ লক্ষ হইতে ১৪ লক্ষে নামিয়াছে অর্থাৎ শতকরা ৮জন হিসাবে কমিয়াছে। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার এখানে বেশী। জেলার প্রায় প্রত্যেক থানাতেই

গত দশ বৎসরে লোক সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। কোন কোন থানাতে আবার হ্রাসের পরিমাণ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে :—

থানার নাম	লোকসংখ্যা শতকরা হ্রাস
কৃষ্ণগঞ্জ	২০
দামুরহুদা	১২
গাঙ্গনি, মীরপুর, ভেড়ামারা	১২
চুয়াডাঙ্গা	১২
করিমপুর	১১
হাঁসখালি	১১

কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড লিটন নদীয়া জেলায় সফর করিতে যাইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, নদীয়াতে মোটের উপর লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। আমরা তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ নদীয়ার প্রত্যেক থানার গত দশ বৎসরের লোক সংখ্যার তুলনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলাম যে লর্ড লিটনের কথা একেবারে অমূলক, নদীয়ার ২০টী থানাতে লোক সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে।

নদীয়া জেলার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বসন্তবাবু ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছেন :—

"আজ নদীয়া সর্ব্বপ্রকারে রিক্ত। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই অভাবের হাহাকার, দৈন্যের নগ্নমূর্ত্তি দেখিতে পাই। আজ আমাদের অভাব ধনে-মানে-জ্ঞানে, সমস্যা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের, অন্ন এবং বস্ত্রের।"

এই সমস্যা কেবলই কি নদীয়া জেলার? বাঙ্গলার সকল জেলাতেই কি এই সমস্যা কুৎসিৎ নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই?

এই সমস্যা সমাধানের জন্য এতকাল আমরা কি করিয়াছি? পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে, এতকাল আমরা বাঙ্গলার পল্লীকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বিলাতের মত আমাদের সভ্যতার কেন্দ্র, জাতীয়-জীবনের আধার—সহরে নহে; আমাদের জাতীয় সভ্যতার কেন্দ্র, জীবনীশক্তির আধার পল্লীতে। তাই পাশ্চাত্যের অনুকরণে—ভিক্ষামাত্র

সম্বল "পলিটিক্যাল এজিটেশন", দ্বারা এতকাল আমরা আসর জমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। বসন্তবাবু বলিয়াছেন :—

"এই দুর্দশার প্রতিকার করিবার জন্য বহুকাল ধরিয়া আমরা বিদেশী প্রভুশক্তির মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। দরখাস্তের নৌকা সম্বল করিয়া আমরা জগতের কঠোর পরীক্ষা-সমুদ্রে পাড়ি জমাইতে চাহিয়াছিলাম। তারপর একদিন সেই ভুল আমাদের ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তাহা আমাদিগকে কর্ম্মপ্রবণতার দিকে লইয়া গেল না। নেশার ঝোঁক এখনও আমাদের কাটে নাই; তাই একদিন যাহার জন্য প্রবলের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির দুয়ারে ধন্না দিয়াছিলাম, আজ তাহার জন্য চোখ রাঙ্গাইয়া, অভিমান করিয়া, সেই প্রবলের দ্বারেই আর এক রকমের খেলা সুরু করিয়াছি।"

কিন্তু এই লোকচুরি খেলায়, এই মান-অভিমানে আর চলিবে না। আজ "বিদেশী রাজশক্তির সিংহদ্বার হইতে লুব্ধ মনকে ফিরাইয়া আনিয়া" প্রকৃত জাতি-গঠন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

বসন্তবাবু মনে করেন (এবং আমরাও মনে করি)—যে, "আত্মনির্ভরশীল পল্লীসমাজ গঠনই আজ আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। ইহাই দেশের ও সমাজের উন্নতির ভিত্তি।" এইরূপ আত্মনির্ভরশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীসমাজ বা পল্লীকেন্দ্রসমস্ত বাঙ্গলাময় গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই পল্লীকেন্দ্রগুলিতেই আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত শক্তি সংহত করিতে হইবে। কিন্তু এ কার্য্য করিবে কে? ইহাতে উত্তেজনার মদিরা নাই, দেশব্যাপী নাম ও কীর্ত্তির মোহ নাই। তবুও একদল আত্মোৎসর্গী নীরব কর্ম্মী চাই—যাহারা খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভুলিয়া এই 'দীর্ঘ ও দুর্গম পথে' চলিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। কেবল তরুণ ও নবীনদের দ্বারাই এই কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, ইহাতে প্রবীণ ও পুরাতনদের যোগও অপরিহার্য্য। বসন্তবাবু বলিতেছেন :—

"পল্লী-সমাজ সংগঠন যজ্ঞে নবীন প্রবণ-সংহতিই পুরোহিত। কৃষিজীবী ও শ্রমশিল্পজীবী যজমান। সমবায় পদ্ধতি দেবতা। আহুতি পঞ্চমকার

—তান্ত্রিকের পঞ্চমকার নহে। আধুনিক বাঙ্গলায় পল্লীসমাজের পঞ্চমকার—ম্যালেরিয়া, মহাজন, মামলা, মামুলি ও মোহ।...এই যজ্ঞে জাতিবিচার নাই, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নাই, পরিবর্ত্তন বিরোধী ও পরিবর্ত্তন-কামীর বাগবিতণ্ডা নাই, সহযোগী ও অসহযোগীর ঝগড়া নাই। ইহা লোভ, ক্রোধ ও বিদ্বেষের উত্তেজনা-বর্জ্জিত নির্ম্মল কাজ।”

শ্রীযুত বসন্তবাবু মনে করেন যে, এই “পঞ্চমকার সাধনের” প্রধান উপায় সমবায়-পদ্ধতি বা সঙ্ঘবদ্ধতা (Co-operative system)। একবার এই সমবায়পদ্ধতিতে কাজ করিতে শিখিলে বাঙ্গলার ‘মানুষ মেষগুলিই অচিরে নরসিংহ রূপ ধারণ করিবে।’ ডেনমার্ক, জার্ম্মানী, জাপান, আয়ালণ্ড প্রভৃতি দেশে এই সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জনসাধারণের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে—তাহারা বর্ত্তমান জগতে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। বাঙ্গলার অনাহারী, অর্দ্ধাহারী, ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর পীড়িত নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিকেরাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করিলে, আমাদের জীবন-মরণের সমস্যার শীঘ্রই সমাধান হইবে।” এক একটী পল্লীকেন্দ্র—কৃষক, শিল্পী ও শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পল্লীর সমস্ত অভাবই পূরণ করিতে চেষ্টা করিবে। তাহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নতি করিবে, কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন করিবে, সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবে, পল্লীর জলাভাব দূর করিবে, ম্যালেরিয়া নিবারণ করিবে। এক কথায় “জাতির প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে, জীবন-যাত্রার সকল দিকে, সকল ক্ষেত্রে তাহাকে কাজে ফলাইয়া তুলিতে হইবে।”

আনন্দবাজার

উৎসব *

যদি বিদেশ থেকে কোন ঐতিহাসিক বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসখানা আলোচনা করে দেখে, তা' হ'লে জাতীয়তা হিসাবে বিজয় টীকা পড়্‌বে বাঙ্গালীর ললাটে। যে বাঙ্গালীর নামে লোক সমাজে দুর্ব্বলতার চিহ্ন পরিস্ফুট হত, আজ সেই বাঙ্গালী শুধু ভারত কেন সমগ্র বিশ্বকে শিক্ষা দিতে বসেছে "যেনাহং অমৃতংসাৎ তেন কিংকুর্ব্বান্"—যাদ্দ্বারা আমি অমৃত হব না, তাদিয়ে কি করবো? আর যিনি এই বাঙ্গালীর ললাটে বিজয়-তিলক পরিয়ে দিয়েছেন, আজ তাঁরই স্মৃতি-উৎসবে আমরা বাঙ্গালী ভায়েরা এখানে সমবেত হয়েছি। তাঁর গৌরব নিয়ে গৌরব কর্‌বার জন্য নয়—তাঁর ত্যাগের দাবী নিয়ে জগতে সম্মান পেতে নয়—আজ আমরা সমবেত হয়ে সেই মহান্ ঋষির কাছে প্রার্থনা করে বল্‌বো "হে ভারত গৌরব—হে তপস্বী আজ আমাদের মানুষ কর—আজ আমাদের অন্তর-তলের নীরব প্রেমিককে জাগিয়ে তোল তোমার ঐ সাধনা সম্ভূত তেজ দিয়ে।" যে নিত্য নবীন ছন্দ তাঁর বদন দিয়ে বিঘোষিত হয়েছে—আর্য্য ঋষিদের যে তপঃমন্ত্র চিরভোগীদেরও মাথা চরণতলে লুটিয়ে দিয়েছে—আজ সেই মন্ত্র—সেই পতাকা নিয়ে বিশ্ব দুয়ারে ভেরী বাজিয়ে প্রভাত-কাকলী সনে গেয়ে যেতে হবে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

যে মহাপুরুষ সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় রূপ এক তার ও বিশ্ব-বাঁধনকে জগতে অখণ্ডের ছবি বলে নির্দ্দেশ করেছেন—যিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আপনার তপোলব্ধ তেজঃকে খণ্ড খণ্ড করে আচণ্ডালে বিলিয়ে দিয়েছেন—যিনি অচিন্তনীয় ও অবিশ্বাস্য ঋষি তেজঃ ও সাধনাকে শত নাস্তিকের মাঝখানেও ফুটিয়ে তুলিয়েছিলেন—যিনি "মা" বলে এই শক্তিহীন শিবময় দেশকে, কেমন করে শক্তিকে চিন্‌তে ও আরাধনা কর্‌তে হয় জানিয়ে দিয়েছেন—যিনি সেবার কঠোর ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আপন মস্তক কেশেও ময়লা ঘর পরিষ্কার করে গিয়েছেন, সেই দেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আজ

* ময়মনসিংহ বাৎসরিক উৎসবে জনসভায় পঠিত।

আমাদের প্রাণের কাণে দীক্ষা দিয়ে বলে গিয়েছেন ভোগে ও ত্যাগে কেমন করে সাধনা করা যায়। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, কেমন করে জীবদেহে শিবকে পূজা করতে হয়—কেমন করে আত্মাকে অপর আত্মায় বরণকরে প্রকটীত কর্‌তে হয়—কেমন করে সারা জীবনের কর্ম্ম বিষাদের হৃদয়কে শান্ত সমাহিত করা যায় ঐ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষের প্রেমে। আজ আমাদের গণ্ডির ভেতর যেয়ে ফাঁদে পড়্‌লে চলবে না—আমরা আজ বিশ্বকে আহ্বান করে সমুন্নত শিরে বল্‌বো—আজ হৃদয় কোণের জমাট অহঙ্কারকে চূর্ণ করে শান্ত-সরল অন্তঃকরণে বলবো হে বিশ্ববাসী ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ—অল্পে সুখ নেই ভূমাতেই সুখ। এমন করে বলবো যেন বিশ্বের মোহময় দৃঢ় লৌহ কবাট হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে আমাদের প্রাণের আলোর সনে মিশে সেই নিত্যের ছবি ফুটিয়ে তোলে।

নির্দ্দিষ্ট দিনের উৎসব যেন আমাদের এমন সোনার জীবনে বিদায় না নিয়ে যায়। হে বাঙ্গালী তোমার উৎসব হবে প্রতিদিন উষার আলোক আঘাতে—প্রতিদিন সাঁঝের আকাশে রাঙ্গা গোধূলীর পাগলামীর বেলা—তোমার উৎসব হবে জীবনের প্রতি মিনিটে—কারণ আজ তোমাকেই বশিষ্টের মত বিশ্ববাসীর স্কন্ধে পবিত্র উপবীত গঠন করে গায়ত্রী ছন্দে পরিয়ে দিতে হবে। আজ বাঙ্গলার যুবক এই উৎসবের পরশ নিয়ে নব বর্ষের নূতন হরষে মেতে উঠুক—তাদের অখণ্ড আত্মাকে দেখ্‌তে ঐ বহুরূপী জীবের ভেতর দিয়ে।

পরমহংসদেবকে চিন্‌তে হলে স্বামিজীকে বেশ করে বুঝে দেখা উচিত। যদি রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে দেশের কর্ত্তব্যের হিসাবটুকু কষে দেখ্‌তে হয়, তাহলে সর্ব্বপ্রথমেই "ভারতে বিবেকানন্দ" ও পত্রাবলী কয়টী পড়ে দেখা উচিত। কারণ জাতি বলে যে কয়টা অঙ্গ বুঝা যায়—যদি সেই সব কয়টার উন্নতি ও পুষ্টতা একাধারে সম্পন্ন না হয় তাহলে জাতি উঠ্‌তে পারে না। তিনি প্রথমতঃ দেখেছিলেন দেশের স্বভাবজাত পদবীর হিংসা ও অনর্থক অহঙ্কার আইনের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর—কারণ এই ভেদ ও দূরত্ব অপসারিত হলে আইন-কানুনের জন্ত

মুহূর্ত্ত কালের জন্যও ভাব্তে হবে না। তাই তিনি জীবে শিব ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। তারপর মীমাংসা করে গিয়েছেন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে। শক্তি শক্তি বলে চীৎকারে কিছু ফল হবে না বলে বিলাতাগতা সিষ্টার নিবেদিতাকে নীরবে এই মহাব্রতে নিয়োজিত কর্‌লেন। তৃতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক ভাবকে ভারতের উন্নতির পথে প্রধান কণ্টক বলে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই "যত মত তত পথ" রূপ সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় মত প্রচার করে গিয়েছেন।

দেশের কাজে রামকৃষ্ণ মিশনের কথা নিয়ে যারা আলোচনা করেন তাদের বলে দিচ্ছি, আমরা ৬মাস কিম্বা একবৎসরে স্বরাজের পক্ষপাতী নই। আমাদের স্বরাজ লাভ কর্‌তে হলে জন্ম জন্মান্তর পার হয়ে যেতে পারে, তবুও আমরা দেশকে মাপকাঠি নিয়ে ওজন কর্‌তে বসবো না। কি করে বল্‌বো ? এযে বহুদিনের প্রাচীন এমারত জীর্ণ শীর্ণ হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে,—কত ঝড় যে এর উপর দিয়ে বয়ে গেল! এর ভেতরের আলো জ্বালাতে হলে চাই সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের মেরামত। একদিক বাদ দিলে যে 'নেশন' ভবিষ্যতে রোমের মত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে!

সেই মহাপুরুষ নয়ন উদ্ভাসিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন—জাতি বলে কেমন করে দাবী কর্‌তে হয়। দেশের সেবার বর্ত্তমান ধারা যেন বাস্তবিকই নিরাকারের সামিল হয়ে পড়েছে তাই স্বামিজী আমাদের নির্ম্মল চিত্র দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—ঐ শস্য শ্যামলা বলে চীৎকার কর্‌লে হবে না—ঐ বৃক্ষলতা সব জিনিষ আর স্বাধীন হয়ে মুক্ত হবে না—মুক্তি পাবি তোরা।

স্বদেশ বল্লে বুঝ্‌তে হবে ঐ নীরিহ—বুবুক্ষিত—প্রপীড়িত দেশবাসী—যাদের কটিতে চীর বস্ত্র—যাদের উদরে ক্বচিৎ তণ্ডুলকণা অর্পিত হয়—যাদের বুকের পাঁজর গুঁড়া হয়ে গিয়েছে ঐ বসন্ত ম্যালেরিয়ার চিরনিষ্পেষনে তিনি কেবল দেশের দোহাই দিয়ে ক্ষান্ত হন নাই—তিনি আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

তিনি আরও বলেছেন—"তোদের ধর্ম্মকর্ম্ম—তোদের উন্নতি হয়ে

থাক ঐ দরিদ্র—ঐ নিষ্পেষিত জাতদের সেবায়—ঐ খানেই বাস কর্‌ছে—ভারতের ভবিষ্যত জাতি—ভবিষ্যত ব্রাহ্মণ, তাই আজ বাঙ্গালীকে ত্রিসন্ধ্যার গায়ত্রী করে নিতে হবে "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

আবার আমরা যেন কাজের হিসাব খতিয়ে গৌরবের নেশাটুকু দাবী করে না বসি—কারণ ঐ যে আমাদের পথের কাঁটা—মোহের বাধন। স্বামিজীর গম্ভীর বাণী কয়টী আমাদের অন্তরের পরতে পরতে গেথে রয়েছে। তিনি বলেছেন "জগৎকে সাহায্য কর্‌বার তুই কে? জগৎ কি তোর আমার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে থাকেরে? ওটা কুকুরের লেজের মত—যতই টানিস্ না কেন, বাকাই রবে। যার যা দেবার আছে দিয়ে নে—দাতাই ধন্য—গৃহীতা ধন্য নহে।"

ধন্য স্বামিজী—ধন্যপ্রভু রামকৃষ্ণ, তোমাদের কঠোর সাধনা ও ত্যাগের ফলেই দেখ্‌তে পাচ্ছি ভারত-রবি উদ্ভাসিত হয়েছে ঐ জমাট মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে—তাই আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি ভারত মাতার বুকে শত নরেন্দ্র শত রাখাল, বিবেকানন্দ—ব্রহ্মানন্দ হয়ে বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলছে।

আয় ভাই বাঙ্গালী যুবক, আজ কবির ভাষায় সমস্বরে গেয়ে আমরাও তাঁদের স্মৃতি অনুসরণ করে তপের আলোককে বরণ করে নিচ্ছি। আমাদের মিলিত কণ্ঠ হতে এই রাগিণী বেজে উঠুক—

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে।
আয় রে ছুটে টান্‌তে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড় গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নে রে কোন মতে—
* * * *।

সেই মহাপুরুষের চরণতলে অবনত মস্তকে আমরা মিলিত কণ্ঠে বল্‌বো হে পিতঃ!

শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দ্দা
ঘুচায়ে দাও তার ।
না রাখ তায় ঘরের আড়ালে,
না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায়
কর আকিঞ্চন ।
না থাকে তার মান অপমান
লজ্জা সরম ভয় ।
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্ব ভুবনময় ।

—শ্রীমধুসূদন মজুমদার

সংসার

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নরনের বন্ধু ইন্দুভূষণ এবং তার একটি ছোট বোন সুশীলা হরিপুরে আসিয়াছে। সুশীলা ইহার পূর্ব্বে কখন পাড়াগাঁ দেখে নাই; কিন্তু পাড়াগাঁ সম্বন্ধে অনেক কথা সে শুনিয়াছিল।

'পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী,
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি, পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে।—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।'

এ সবই নাকি বঙ্গ মাতার পল্লী ভবনের—অপার্থিব দৃশ্য। তাই কবি সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের রাণী তাঁর পল্লী মাতার উদ্দেশ্যেই প্রাণের

ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন, এ সকল কথা সে অনেকেরই মুখ হইতে শুনিয়াছিল। তারপর মিহিজামে আসিয়া সে এ সত্যের অন্ততঃ কিছু অংশ উপলব্ধি ক'রেছিল। কিন্তু মিহিজামে সে খেলিয়া বেড়াইবার বেশ সুবিধা পাইলেও সঙ্গী পায় নাই। সেই জন্য এখন সুন্দর সুন্দর শালবন ও মাঠের সৌন্দর্য্যটা একলাটি উপভোগ করিতে তাহার ভাল লাগিত না। তারপর দুই একদিনের মধ্যেই সে এক নূতন রকমের উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। এখন হইতে সময় পাইলেই সে ষ্টেশনে ছুটিয়া আসিত। এবং প্রত্যেক ট্রেনের সময় নানা দেশের যাত্রীদের বিচিত্র অবস্থা দেখিয়া বেশ আমোদ পাইত। আজ আবার নূতন জায়গায় আসিয়া আরও কিছু নূতনত্ব দেখিবার আশা করিয়াছিল ;—কিন্তু সে হরিপুরে আসিয়া যে নূতনত্ব দেখিল, তাহাতে তাহার সব আশা-ভরসা এক মুহূর্ত্তে জল হইয়া গেল। প্রথমতঃ তাহার বয়সী কোন মেয়েকে সে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা বা কথা বার্ত্তা বলিতে ত দেখিলই না, উপরন্তু তাহারা যেন এক একটি জড়পিণ্ড। তাহাদের অধিকাংশই কখনও দেশের বড় বড় লোকের নাম পর্য্যন্ত শুনেনি। কথাবার্ত্তা যা বলে তার প্রায় সমস্তই নিজের নিজের সংসার লইয়া। তাহাদের গ্রামের বাহিরে যে জগতের আর কোথাও কিছু আছে, তাহা তাহারা জানে না। তাহার উপর তাহারা যেরূপ নোংরা যে, সুশীলা তাহাদের কাছে যাইতেও ঘৃণা বোধ করিত। মোটের উপর সে আসিয়া বড়ই অসোয়াস্তিতে পড়িল। এখন তাহার একমাত্র ভরসা শান্তি।

শান্তি যদিও সুশীলা অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট, তথাপি একটু বেশী মাত্রায় গম্ভীর বলিয়া তাহাকে তাহার বেশ ভাল লাগিত না। সুশীলা High স্কুলে পড়ে। সে সেখানকার অনেক রকম কথা বলিত। Teacher দের ব্যবহার, পড়া-শুনা পরীক্ষা ইত্যাদি কত কথাই বলিত ; কিন্তু শান্তি তাহার সবগুলি বেশ মনোযোগের সহিত শুনিত না। কিংবা বুঝিতে পারিত না। কাজে কাজেই সুশীলার কাছে এটা বেশ ভাল লাগিত না। একদিন কথায় কথায় শান্তি সুশীলাকে বলিল,—"হাঁ ভাই! তুমি যে কলেজে ইংরেজি পড়ছ, তারপর যখন পাশ করবে তখন কি করবে ?"

সুশীলা বেশ উৎসাহের সহিত জবাব দিল, "আমার ভাই ইচ্ছে আছে, আমি Teacher হবার জন্য চেষ্টা করব। দাদাও একথা বলেছেন। তিনি বলেন, সুশী তুই যদি ভাল ক'রে বি, এ, পাশ করতে পারিস, তবে তোকে একটা স্কুলের Head Mistress ক'রে দিব।" এই কথা শুনিয়া শান্তি বিস্ময় দৃষ্টিতে সুশীলার মুখেরদিকে চাহিয়া থাকিল। সে মনে মনে ভাবিল এরা বোধ হয় খৃষ্টান? কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। শেষে সে কথায় কথায় তার বাবাকে সব কথা বলিল। কিশোরী মোহন বাবু এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। তারপর বলিলেন, "বেশত মা ক্ষতি কি? মেয়েরা শিক্ষিতা হ'য়ে যদি দেশের অন্যান্য মেয়েদের শিক্ষা না দেয় তবে আর কে দেবে? সকলেরই এরূপ উচ্চাশা রাখা ভাল।" শান্তি অতিমাত্র হতাশ ভাবে বলিল,—"তা বাবা। আপনি যাই বলুন, আমার ওসব ভাল লাগে না। মেয়েরা আবার চক্‌রী করবে কি!" কিশোরীমোহন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তা তোকে ত আর চাক্‌রী করতে বলছিনে। তবে যদি কেউ করে, বা তেমন যোগ্যতা লাভ কর্‌তে পারে ক্ষতি কি।" বলিয়া তিনি তাহাকে সুশীলার কাছে যাইতে বলিলেন।

আর একদিন প্রাতঃকালে শান্তি গোবর দিয়া উঠানের যেখানে হরিমন্দির আছে, তার চারিদিকের খানিকটা জায়গা নিকাইতে ছিল, এমন সময় সুশীলা সেখানে গিয়া বলিল,—"কেন ভাই কষ্ট করছ? একটা চাকরকে বল্‌লেই ক'রে দেয়! আচ্ছা তোমাদের এউঠানটা পাকা ক'রে নিলেই ত সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। আমার কিন্তু গোবর ছুঁতে বড় ঘেন্না করে। তোমাদের এখানে দেখ্‌ছি যেখানে সেখানে গোবর প'ড়ে, আর তার মধ্যে কত পোকা। এই জন্যই তোমাদের গ্রামে এত ব্যায়রাম হয়। তুমি ত আবার ইচ্ছে করেই দেখ্‌ছি গোবর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ।"

শান্তি বলিল,—"এটা আমার পূজার জায়গা, তাই গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিচ্ছি। গোবর ছাড়া আমাদের কোন স্থান শুদ্ধ হয় না। তা ছাড়া তোমরা বোধ হয় জান না, পাড়াগাঁয়ের এই সব চালাঘরের মেজেতে গোবর নেপলে অনেকটা পাকার মতই করে। আমরা পূজার

দালানে প্রতিদিন একটু ক'রে জায়গা গোবর দিয়ে নিকিয়ে আসি।" সুশীলা বলিল,—

"যাইহোক ভাই! বড় নোংরা তোমরা। ঠাকুর দেবতার স্থান সেখানে আবার এ জিনিসগুল কেন? গ্রামের সব লোক মিলে পূজার দালানটা পাকা করতে পারে না? আসল কথা তোমরা কিছু ব্যবস্থা জাননা।" শান্তি আর কিছু জবাব দিল না। সে আপনার কাজ শেষ করিয়া স্নান করিতে গেল। স্নান সারিয়া আসিয়া যথাবিধি পূজা-পাঠ, প্রার্থনা, শ্লোক-আবৃত্তি প্রভৃতি করিয়া কিছু খাবার খাইল। তারপর সুশীলার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে গেল। সুশীলা তখন একখানা ইংরাজি বই লইয়া পড়িতেছিল। শান্তি সেখানে যাইতেই সে খুসী হইয়া তাহাকে বসাইল; এবং পড়িয়া বুঝাইতে লাগিল। শান্তিও ইংরাজি পড়িয়াছিল। সাধারণ কথাবার্ত্তা বেশ বুঝিতে পারিত, মোটামুটি লিখিতে পড়িতেও পারিত। তবে সকল ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের উপর তাহার একটু ঝোঁক বেশী ছিল। ইহারই মধ্যে সে প্রবেশিকার পাঠ্য শেষ করিয়া কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার উপর সময় পাইলেই কিশোরীমোহন বাবু তাহাকে ভগবদ্গীতা ইত্যাদিও পড়াইতেন।

ইহার পর কথায় কথায় সুশীলা শান্তিকে বলিল, "হাঁ ভাই তোমার বাবা তোমাকে কেন স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেন না? তোমার কি স্কুলে পড়তে ইচ্ছে করে না?" শান্তি ইহার জবাব কি দিবে ঠিক করিতে পারিল না; তারপর একটু ভাবিয়া বলিল, "দাদা বাবাকে বলেছিলেন যে, আমাকে কোন একটা স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবার জন্যে। কিন্তু বাবা তা দেবেন না। তিনি বল্লেন 'মেয়ে মানুষের আর পাশের দরকার কি! নানা বিষয় প'ড়ে জ্ঞানলাভ করলেই যথেষ্ট। ওত আর চাকরী ক'রতে যাবে না?"

সুশীলা একটু ব্যঙ্গ-সুরে বলিল—"ওমা তাই নাকি! পাশটা বুঝি পুরুষদেরই করতে আছে আর মেয়েদের নেই? চাকরী করাও তাদেরই বুঝি একচেটিয়া, মেয়েদের বুঝি আর তা করতে নেই? তোমরা একেবারে পাড়াগেঁয়ে—।" আরও কি বলিবার ইচ্ছা ছিল তাহা সামলাইয়া

লইয়া সুশীলা বলিল,—"আচ্ছা আমি তোমার বাবাকে বল্‌ব তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিবার জন্য। তোমার ইচ্ছা আছে ত?"

শান্তি বলিল,—"কখন কখন আমার স্কুলে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, সেখানে ত আর নিজের ইচ্ছামত পড়াশুনা করতে পারব না? পরীক্ষার বইগুলি নিয়েই বসে থাক্‌তে হবে। আমি যে সংস্কৃত আর বাঙ্গলা বই গুল পড়ি, সে গুল নাকি অনেক উঁচু ক্লাশে পড়া হয়।"

"ঐটা বুঝি তোমার সংস্কৃত পড়ার বই?" বলিয়া সুশীলা শান্তির হাতের বইখানা নিয়ে পাতা উল্টাইয়া ফেলিল। শান্তি বলিল,—"না ওটা আমার পড়ার বই নয়, আমি এখন 'রঘুবংশ' আরম্ভ করেছি। তবে প্রায়ই সময়মত বাবার কাছে ওখানা পড়ি। ওটা আমার বড় ভাল লাগে। যদিও ওটা খুব শক্ত, কিন্তু বাবা এমন সরলভাবে বুঝিয়ে দেন যে আমার বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।" ইতাবসরে সুশীলা গীতাখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাঝখানের একটা জায়গা দেখাইয়া শান্তিকে বলিল, —"কই এই জায়গাটা আমায় বুঝিয়ে দাও দেখি?"

শান্তি বইটা হাতে লইয়া দেখিল, সেটা 'জ্ঞানযোগের' শ্লোক। তারপর সুশীলাকে বলিল,—"এ জায়গাটা বুঝবার আগে আরও কয়েকটা বিষয় তুমি জান কি না, সেটা আমার জানা দরকার! কারণ গোড়াকার কথা না জান্‌লে শেষ বুঝতে পারবে না।" এই কথা শুনিয়া সুশীলার অভিমানে বেশ একটু আঘাত লাগিল। সে মনে করিল, এই সামান্য পাড়াগাঁয়ের মেয়েটা আবার আমায় পরীক্ষা ক'রতে চায়! রহস্য মন্দ নয়। তারপর একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া প্রকাশ্যে বলিল,—"কি বল্‌তে চাও বল?"

শান্তি বেশ উৎসাহের সহিত বলিল,—"আমি জানতে চাই যে, তুমি মহাভারত পড়েছ কি না?" সুশীলা শান্তির প্রশ্নে একটু হাসিল, তারপর তাচ্ছিল্যস্বরে বলিল,—"ওঃ এই কথা? তা মহাভারতের কথা আবার স্কুলের মেয়েদের কে পড়ে নি? সেত আমরা কতদিন আগেই পড়েছিলাম। মহাভারতের History আমরা 4th ক্লাশে পড়েছি। তার

আগেই বাঙ্গলাতে কত বই পড়েছি।” উত্তর শুনিয়া শান্তি বুঝিল, সে আসল মহাভারত পড়ে নি। তবে ‘ছেলেদের মহাভারত’ বা কোন ইতিহাসে যে দুই পৃষ্ঠা মহাভারতের কথা আছে তাই পড়েছে। যাই হোক একটুখানি বুঝান দরকার বিবেচনা করিয়া বলিল;—“বেশ! তাহলে তুমি অবশ্যই জান যে, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কে? এবং কি অবস্থায় তাঁদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হচ্ছে! সুশীলা একটু বিরক্তভাবেই বলিল, “তা তোমাকে Historyর কথা আর আমায় বল্‌তে হবে না; ঐ শ্লোক গুলো Explanation ক’রে আমায় বুঝিয়ে দাও।” শান্তি আর বাজে কথা না বলিয়া সুমিষ্টস্বরে আবৃত্তি করিল,—

“বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥”

অর্থাৎ কথাটা এই যে, অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেখিলেন, তিনি যাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, তারা সকলেই আমার নিজের লোক;—সুতরাং যদি তাঁহাকে যুদ্ধে জয় লাভ করে দুর্য্যোধনের কাছ থেকে রাজ্য নিতে হয় তবে এদের সকলকেই মারতে হবে। কিন্তু আপনার জনকে মেরে ত আমরা কিছুতেই সুখ-শান্তি পাব না। সেই জন্য তিনি যুদ্ধ করব না, এইটাই স্থির কর্‌তে লাগ্‌লেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখ্‌লেন যে, যদি অর্জ্জুন যুদ্ধ না করে, তাতে বড় ক্ষতি হবে? কাজেই তিনি অনেক বুঝাতে লাগ্‌লেন। ‘যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য; কারণ তুমি ক্ষত্রিয়। তোমাদের ধর্ম্মই যুদ্ধ। প্রত্যেক জাতির ও মানুষের সংসারে কতকগুলি কর্ত্তব্য কাজ আছে, সে গুলি করতেই হয়, না করলে অধর্ম্ম; এবং ঠিক ভাবে করলে ধর্ম্মই হয়।’ ইত্যাদি সংসারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝানর পর এখন জ্ঞানযোগের কথা এসেছে। এখানে শ্রীভগবান বল্‌ছেন,—“হে অর্জ্জুন! তোমার এবং আমার উভয়েরই বহুজন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সে সমস্তই জানি; কিন্তু তুমি জান না। তারপর......।” আর বলিতে না দিয়া সুশীলা বলিল, “এটাত তুমি বাঙ্গলা মানে দেখে বলে দিলে। আমাকে বুঝিয়ে দাও। ভগবান কেন অর্জ্জুনকে বল্‌লেন যে,

'আমি সব জানি, তুমি জান না'। তারপর তুমি ত এখনই বল্‌লে যে, অর্জ্জুন আর শ্রীকৃষ্ণে কথা বার্ত্তা হচ্ছে,—আবার ভগবান কোত্থেকে এসে পড়ল?"

শান্তি সেইরূপ ধীরভাবেই বলিল,—"ঐ শ্রীকৃষ্ণকেই আমরা ভগবান বলি। তিনি যে স্বয়ং ভগবান তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তারপর তিনি যদি ভগবান হয়ে মানুষ জন্ম নিয়াছেন, তবে সব কথা জান্‌বেন না কেন?" সুশীলা বলিল,—"তুমি না হয় শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে বিশ্বাস কর, তা বলে সবাই করবে কেন? তিনি যে ভগবান তার প্রমাণ কি? আর ভগবান একটা লড়াই লাগিয়ে দিয়ে লড়াই করতে যাবেন কেন? আমাদের Teacherরা প্রার্থনার সময় বলেন, 'ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময়, প্রেমময়, মঙ্গলময় এই সব। তোমার এই আজগুবি লড়ায়ে ভগবানের কথা ত আমি কারুর কাছে শুনিনি বাপু!"

শান্তি খুব উৎসাহের সহিত বলিল,—"তিনি যে ভগবান তার প্রমাণ ত তিনি নিজেই দিচ্ছেন। এই দেখ তারপর ৭।৮ শ্লোকে বল্‌ছেন, 'যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি আর অধর্ম্মের উত্থান হয়, তখন তখন আমি নিজেকে সৃজন করি। অর্থাৎ সেই সময় ভগবান মানুষ হয়ে আসেন এবং সংসারের লোককে পাপ থেকে উদ্ধার করেন। সকল সময়েই ভগবান সাধুদের দুষ্ট লোকের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তিনি জগতে মানুষরূপে আসেন। দুর্য্যোধন যে রকমের দুষ্ট ছিল, তাতে সে যদি বেশী দিন বেঁচে থাকৃত তবে দেশের অনিষ্ট হত। তাই শ্রীকৃষ্ণ বা স্বয়ং ভগবান তাকে বিনাশ করবার জন্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজনা দিচ্ছেন। আর সে সময় ক্ষত্রিয়েরাই দেশের রাজা, শাসন পালন সবই তাঁদের হাতে ছিল; তাই শ্রীকৃষ্ণ ওঁদের দ্বারাই এই কাজটা করাতে চান। তারপর এটা যে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ নয়, তার সহজ প্রমাণ,—একজন ডাকাতকে মারলে বা ফাঁসী দিলে যদি দেশের শত শত লোক সুখে থাকৃতে পারে এবং নিরপরাধীকে প্রাণ দিতে না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে বিচারক অনায়াসে নরহন্তা ডাকাতের ফাঁসীর হুকুম দিতে পারেন; তাতে পাপ নেই, বরং এটা একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভগবান মঙ্গলময়

বলেই ত তিনি মানুষ হয়ে কত কষ্ট সহ্য করে এই সব মঙ্গলজনক কাজ করে থাকেন ?"

সুশীলা আর ধৈর্য্য রাখিয়া শুনিতে পারিল না। সে বলিল,—"হতে পারে তোমার পক্ষে মঙ্গলময়। আমরা ওসব বুঝি না বাপু! আমরা এবয়সে অত তত্ত্ব কথা জানি না।" শান্তি বলিল,—"শিখনা বলেই জান না। আচ্ছা তোমাদের স্কুলে কি এসব আলোচনা কখন হয় না ?" সুশীলা একটু বিরক্ত হইয়াছিল, তাই বলিল,—

"কেন হবে না ? এর চেয়ে অনেক কথা হয়। এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সকলে বলে,—মেয়েটার বড় পাকামি হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা দেখ্‌ছি খুব পাকামি' শিখে!" সুশীলার কথায় শান্তি হাসিয়া ফেলিল! তারপর বলিল,—"তুমি রাগ করছ কেন ভাই ? তোমাকেও আর আমি পাকামি শিখ্‌তে বল্‌ছি না! এস আমার খেলাঘর দেখ্‌বে" বলিয়া সুশীলাকে টানিয়া লইয়া গেল; এবং একটি ঘরের মধ্যে গিয়া সুশীলা দেখিল,—একটি পুরাতন, একটি আধুনিক উন্নত ধরণের চরকা, তুলার পাঁজ সেলাইএর কল প্রভৃতি পরিপাটিরূপে সাজান রহিয়াছে। অনেকখানি সূতাও কাটা হইয়াছে, কিন্তু এখনও খুব ভাল হয় নাই। ঘরটির আর একদিকে কতকগুলি দেবদেবীর ছবি টাঙ্গান; এবং তাহারই নীচে একটা তাকে অনেকগুলি বই সাজান রহিয়াছে। তাহার মধ্যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বইএর সংখ্যাই বেশী। সুশীলা দুই চারিখানা বই উল্টাইয়া দেখিয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এমন সময় শান্তির মা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"কিরে পাগ্‌লী! তোর খেলাঘর দেখাচ্ছিস!" এই কথা শুনিয়াই সুশীলা বলিল,—"হাঁ খুড়িমা! আমি শান্তির খেলাঘর দেখ্‌ছি। আপনার শান্তি কিন্তু বড় বুড়ি হ'য়ে পড়েছে খুড়ি মা ? ওকে একবার আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিন তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই মরা, নির্জ্জীব ভাবটাব সব ঘুচে যাবে।" শান্তি বলিল;—"ওঃ তাই বুঝি দাদা বল্‌ছিল,—'তোকে যে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেব, সেখানে দেখ্‌বি কেমন দৌড়ে দৌড়ে খেলবি ফূর্ত্তি করবি, শরীরটা একটু ভাল হবে'। তোমরা বুঝি

সব বেটাছেলের খেলা খেল ভাই? আমার কিন্তু ওসব ভাল লাগে না। যখন পরিশ্রম করতে ইচ্ছে হয়, তখন কলসীতে ক'রে জল আনি, কাপড় কাচি, উঠান নিকুই এইসব। আমি কতকগু'ল শাক-সবজীর গাছ লাগিয়েছি নিজের হা'তে ঐ গু'লর যত্ন করি। আমার ফুল বাগানটা বোধহয় দে'খেছ? সবকাজ আমি করতে পারি, নির্জীব কেন হ'তে যাব ভাই! তবে বাবা ব'লেছিলেন যে, সহরের মেয়েরা নাকি ভারি বাবু। কেবল বাবুগিরি নিয়েই থাকে। এই জন্যেই ত বাবা আমায় কল্‌কাতার স্কুলে দেন নি। বলেন,—'তুই পাশ ক'রে যখন বাবু হবি, তখন তোর পিছনে চাকর রাখ্‌বার তোর গরীব বাবা পয়সা পাবে কোথায়? আমাদের এখন উচিত হচ্ছে লেখাপড়া শিখব, জ্ঞানলাভ করব, সংসারের সবকাজ নিজে করব আর মোটামুটি খেয়ে প'রে গরীবানা ভাবে থাকব"।......এই সব কথা শুনিয়া ক্রমেই সুশীলার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, গৃহিণী তাহা বুঝিতে পারিয়া শান্তিকে একটু ধমক দিয়া বলিলেন,—"নে তোর বক্তৃতা রাখ্‌। মেয়ে যেন দিন দিন ওস্তাদ হ'য়ে পড়ছে। এস মা সুশীলা খাবার খাবে এস"। বলিয়া তাহাকে আদর করিয়া লইয়া গেলেন। শান্তিও তাহাদের সঙ্গে গেল।

এদিকে ইন্দুভূষণের বাবা তাহাদিগকে শীঘ্র মিহিজামে ফিরিয়া যাইতে লেখায়, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া তার পরের দিন যাত্রা করিতে হইল। হরিপুর ছাড়িয়া সুশীলা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে মনে মনে করিল,—'বাবা! এ সব জায়গায় কি ভদ্র লোকে থাকতে পারে?' তারপর প্রকাশ্যে ইন্দুভূষণকে বলিল,—"দাদা! আমি যদি কোন দিন Teachery করি তবে এই পাড়াগেঁয়ে মেয়েগু'লকে দুরস্ত করব। বাপ্‌রে এদের ভিতরটা কি সঙ্কীর্ণ।" ইন্দুভূষণ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল। সে সেইরূপ ভাবেই বলিল, "তাই হবে।" তারপর একটু ভাবিয়া বলিল,—"কেনরে! শান্তির সঙ্গে তোর মেলেনি বুঝি! ও ত বেশ মেয়ে!"

—শ্রীঅজিতনাথ সরকার

মিলন ও বিচ্ছেদ

(১)

শরতের বিমল উষায়
দেখা হ'ল তোমায় আমায়।
তখন চাঁদের আলো নিভে গেছে আকাশের কোলে,
ভাদরের ভরা নদী আছাড়ি পড়িছে কূলে কূলে,
তিমির বসনা নিশি, নিবিড় কাননে পশি
পূরব গগন পানে চায় ;
দেখা হ'ল তোমায় আমায়।

(২)

সে দিন বিজন প্রাতে
মধুর মলয় বাতে
স্বরগের যত হাসি রূপ ধরে উঠেছিল ফুটি,
পড়েছিল ঝরে ঝরে শ্যামার চরণ পরে ছুটি,
বিহগ কাকলি রবে মুখরা কানন সবে
বসুধার মিলন সভায় ;
দেখা হ'ল তোমায় আমায় !

(৩)

প্রেমের আনন তুলি
করুণায় আঁখি মেলি
প্রসারিয়া দুই বাহু ধূলি ঝেড়ে কোলে নিলে মোরে,
তোমার মরম ব্যথা অশ্রু হয়ে পড়েছিল ঝরে,
তখন মাধবী বনে ভ্রমরা মদিরা পানে
মূরছিত বিবসা ধরায় ;
দেখা হ'ল তোমায় আমায় ।

(৪)

কত কাছে নিয়ে ছিলে
কত ভাল বেসে ছিলে

কত স্নেহে মুছেছিলে নয়নের ধার,
তুমি মাগো অপরূপা জীবন আমার !
তোমার অমিয় হাসি আমার মরমে পশি
স্বরগের সুষমা ছড়ায় ;
দেখা হ'ল তোমায় আমায় ।

(৫)

তারপর কত দিন
কত শশী বিমলিন,
কত রবি উষা শেষে হাসি পরকাশি
ছড়ায় সরসী নীরে ফাগুয়ার রাশি,
সাজি ভরা ফুল নিয়ে নয়নাশ্রু মাখাইয়ে
ঢেলে দিছি তব রাঙ্গা পায় ;
দেখা হ'ল তোমায় আমায় ।

(৬)

কুসুম কাননে পশি
কুড়ায়ে শেফালি রাশি
বিনা সূতে মালা গেঁথে দিছি তব গলে,
ঝরা ফুল বেঁধে দিছি তব নীলাঞ্চলে,
তুমি মোরে কোলে নিয়ে বদনে চুম্বন দিয়ে
জুড়াইলে তাপিত হিয়ায় ;
দেখা হ'ল তোমায় আমায় ।

(৭)

তোমারে লভিয়া আমি
স্বরগ নগণ্য মানি,
জগতের যত সুখ মম হৃদে ফুটেছিল আসি
তাই তোমা নিশিদিন পরাণ সহিত ভালবাসি,
তুমি কাছে না থাকিলে তিলেক অন্তর হলে

ত্রিভুবন হেরি শূন্যময় ;
দেখা হ'ল তোমায় আমায়।

(৮)

শ্রাবণের ঘোরা নিশি,
মন্দির দুয়ারে বসি
চারিদিকে হেরি শুধু আঁধারের অনন্ত বিলাস
ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে প্রলয়ের রুদ্র পরিহাস,
অশনি কাঁপায় ধরা খসে যায় গ্রহ তারা,
মৃত্যু হাসে অট্ট অট্ট হাসি ,
শ্রাবণের ঘোরা অমানিশি।

(৯)

সহসা গো কে বলিল মোরে
'মা তো নাই মন্দির মাঝারে,'
সঘনে সহস্র বাজ পড়ে যেন আমার মাথায়,
দাবানল জ্বলে উঠে ধূ ধূ করে আমার হিয়ায়,
মন্দির দুয়ার খুলি আঁধারে নয়ন মেলি
হেরি তুমি ত্যজেছ আমায় ;
আজি এই প্রলয় নিশায়।

(১০)

আঁধারের বুক চিরি,
প্রলয়েরে তুচ্ছ করি,
খুঁজি তোমা চারিদিকে, গিরি, নদী, বন, উপবনে,
ভূলোক, দ্যুলোকে কত, সীমাহীন অনন্ত গগনে ;
তোমারে মা খুঁজি যত সরে তুমি যাও তত
একি লীলা তব পুত্র সনে
ব্যথা দিয়ে সুখ পাও মনে।

(১১)

খুঁজি তোমা দেশে দেশে,
কভু রাজা, যোগী বেশে,

কভু করি শ্মশান আলয়, নদীতীর, গহ্বর, কানন,
দিবানিশি থাকি উপবাসি সাধিয়াছি কঠোর সাধন
দেখিয়াছি কিসে কিবা হয়, লভিয়াছি সব পরিচয় ;
তুমি যারে কর গো বরণ,
তারি হৃদে তোমারি আসন ।

(১২)

মৃত্যুরূপা, তুমি এলোকেশে
অসিধরা ভয়ঙ্করী বেশে,
বাজাইয়ে প্রলয় বিষাণ, ছড়াইয়ে দুঃখ ভারে ভার
রক্তে হৃদি রাঙ্গা করে দিয়ে, জ্বালাইয়ে অনল উদ্গার
তুমি ওগো মরণরূপিণী, স্নেহময়ী আমার জননী
চূর্ণ করি সকল সাধন
মম হৃদে পাতগো আসন ।

—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

গ্রন্থ-পরিচয়

সৎকথা ঃ—২য় খণ্ড শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ মুখ নিঃসৃত বাণী বাহির হইয়াছে ।

পতিতার সিদ্ধি ঃ—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রণীত । মূল্য আড়াই টাকা । এই পুস্তকখানিতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সমাজের ধর্ম্ম ও ব্যক্তির ধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া বলপূর্ব্বক সমাজ-ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছেন । কিন্তু প্রতি পাঠক পাঠ সমাপনান্তে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্যক্তির ধর্ম্মের জয় ও তাহার অপ্রতিহত প্রভাব অনুভব করিবেন । গল্পটি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রী সম্বন্ধে লিখিত । যৌবনোন্মুখ স্ত্রী স্বামীকে পছন্দ করিত না কারণ সে তাহার সমবয়সী কাজেকাজেই নিতান্ত ছেলেমানুষ । একথা সকলেই জানে যে ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা আর ষোড়শ বর্ষীয় বালকে

আকাশ পাতাল তফাৎ। ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা ত্রিশ বৎসরের যুবক অপেক্ষাও অধিক সংসার বুঝে পক্ষান্তরে সমবর্ষীয় বালক তখনও লেখা পড়া, খেলা ধূলা ছাড়া কিছুই জানে না। সেইহেতু এরূপ ধর্ম্মবন্ধনের ফল যাহা তাহা ফলিল—দারিদ্র্য, বিলাসের উত্তেজনা এবং আত্মীয়ার প্ররোচনায় সে কুল ত্যাগ করিল। মাসী প্রচার করিয়া দিল রাখু কালীঘাটের গঙ্গায় স্বামীর কল্যাণ কামনায় ডুবিয়া মরিয়াছে।

দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়াছে। রাখুর স্বামী রাখোহরি যৌবন-প্রাপ্ত হইয়াছে—দেখিতে সুশ্রী সবল। অন্নচেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়া পৌরহিত্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। একদিন সন্ধ্যাকালে প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া চিৎপুরের কোন গৃহের বারান্দার তলে আশ্রয় লইল। নায়কের খোঁজে বাটীর বাহিরে আসিয়া রাখু (এক্ষণে চারু) বিদ্যুতের আলোয় চিনিল তাহার স্বামী। তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। বায়স্কোপের ছবির মত সারা জীবনের সংস্কার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া বিবেকের তাড়নার শত বৃশ্চিক জ্বালা তাহার অন্তরে ছড়াইয়া দিল। পাঠক হয়ত মনে করিবেন ইহা লেখকের মনঃপ্রসূত অতিরিক্ত দয়ার প্রকট মাত্র। কিন্তু বেদান্ত বলিতেছেন, আত্মা সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, কখন কোন সময় কাহার ভিতর সত্যজ্ঞান আনন্দ স্ফুরিত হইবে, "কোন ভেকে" তাঁহাকে পাওয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। যুগে যুগে ত মহাপুরুষেরা একই কথাই বলিতেছেন, "মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে" তাঁর কৃপা হলে ; ইতিহাসও ত তাহার সাক্ষ্য দেয় ; অম্বাপালি, বাসবদত্তা, চিন্তামণি, খেতড়ীর বাইজীর কথা আমরা সকলেই ত জানি। তবে অবতার পুরুষদের জীবন-প্রসঙ্গে তাহাদের জীবনী আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা আজ অমর—আর লোক চক্ষের অন্তরালে তাঁহার কৃপা যেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা জগত জানে না।

রাখু পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তাহার বৃদ্ধ সঙ্গীত গুরু গঙ্গাজলে ও দীক্ষা-হোমের পূর্ণাহুতির মধ্য দিয়া তাহার সকল পাপ স্খালন ও দগ্ধ করিয়া তাহাকে নিজ দুহিতার পদে স্থাপন করিলেন। গোঁসাইজীর গোপন আশ্রয়ে ও কৃপায় রাখু ভগবত-পথে অগ্রসর হইতে

লাগিল। এই গোসাইজীই বৈদান্তিক গুরুর আদর্শ। যাঁহারা সর্ব্বভূতে অভয় দান করেন, অসৎকে সতের পথে যাইতে সাহায্য করেন, স্নেহের দ্বারা পতিতকে "প্রেয়ের" দিক হইতে টানিয়া আনিয়া "শ্রেয়ঃকে" দেখাইয়া দেন—তাঁহারাই ধন্য। কেহ হয়ত বলিবেন ইহাতে পতনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে ত? আমরা বলি, সম্ভাবনা আছে কিন্তু তাহা আদর্শের দোষ নয়, তাহা ব্যক্তিগত দোষ। পশু হইয়া যাহারা গুরুর আসন দাবী করিতে যায়, পতন তাহাদের অবশ্যম্ভাবী—ইহা আমরাও স্বীকার করি।

এ পুস্তকের আর একটি বিশেষ চরিত্র নির্ম্মলা—ব্রজেন্দ্রের স্ত্রী। এই ব্রজেন্দ্রই রাখুকে পাপ পথে প্রবর্ত্তিত করে। রাখুর স্বামী ইঁহাদের বাড়ীতেই পৌরহিত্য করিতেন। যেমন সকল বাবুর বাড়ীতে মোসায়েব চাকর থাকে যাহারা গুপ্তচর ও ভৃত্য উভয়েরই কার্য্য করিয়া থাকে, সেই-রূপ ব্রজেন বাবুর সেই পার্ষদ-ভৃত্য আসিয়া খবর দিল রাত্রে রাখুর বাড়ীতে অপর লোক দেখিয়া আসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি পত্র রাখুর নিকট হইতে আনিয়া বাবুর নিকট দিল। পত্রখানির ভিতর নির্ম্মলাকেই সম্বোধন করিয়া লেখা হইয়াছিল। কোনও স্ত্রীলোকের রাখুর প্রতি যে বিষদৃষ্টি থাকা উচিত, নির্ম্মলারও রাখুর প্রতি তাহাই ছিল। কিন্তু পত্র পড়িয়া সে অশ্রুমোচন ত্যাগ করিতে পারিল না। রাখু তাহার স্বামীর কথা, তীব্র অনুশোচনার বৃশ্চিক জ্বালার কথা লিখিয়াছে। স্বামী যখন অন্য পুরোহিতের সন্ধান করিতে বলিলেন, কারণ রাখহরি বেশ্যাবাড়ী রাত্রি যাপন করিয়াছে, তাহাকে ত আর ঠাকুর ছুঁইতে দেওয়া যায় না, আর না হয় নিজেই পূজা করিবেন স্থির করিলেন, তখন তেজস্বিনী নির্ম্মলা স্বামীর কথার উত্তর দিলেন, "তুমি পণ্ডিত মানুষ, মন্ত্র তন্ত্র সব জানতে পার, কিন্তু বামুনকে যদি ঠাকুর ছুঁতে দিতে তোমার আপত্তি, তুমি নিজে কোন্ সাহসে ছুঁতে যাও? ঠাকুর কি তোমার বাড়ার খানসামা নাকি? না, পাঁচটা পাশ কোরে টোরনি হয়েছ বলে তোমার কোনও কাজ আটকায় না?" ইতিমধ্যে বুদ্ধিমতী নির্ম্মলা রাখুর চিঠি স্বামীকে দেখাইলেন। ব্রজেন্দ্র হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। চারু এক্ষণে প্রকৃতির পরিশোধ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কারণ সে বুঝিয়াছিল,

"যদি ব্রাহ্মণ তার পত্নীর সঙ্গে তার স্বামীর এই অপবিত্র সম্বন্ধের কথা কোনও প্রকারে জানিতে পারে,—পারে কেন, তার এমন বিশ্বাস হয় সে পারিয়াছে, নয় তার পারিতে বিলম্ব নাই—তখন তার ছিন্নভিন্ন মর্ম্ম হইতে যে অনল শ্বাস বাহির হইবে, তাহা তার স্বামীর দেহমন অদগ্ধ রাখিয়া শীতল হইবে না।" সে শ্বাশুড়ীকে রাখুর পত্র দেখাইল এবং তাঁহার করুণাসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "মা! প্রায়শ্চিত্তের কি আমাদের উপায় আছে?" অবশেষে নিজ উদারতা ও সহানুভূতি বলে সকলকে পরাভূত করিয়া নিজ ননদ শুভাকে রাখু ঠাকুরের হাতে সমর্পণ করিয়া স্বামীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন।

৩। এই পুস্তকগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,—(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীক—মূল্য এক আনা, (২) বিদ্যার উৎসাহদাতা স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রণীত, মূল্য দুই আনা এবং (৩) স্বদেশবান শ্রীবিবেকানন্দ—'নব্যবাঙ্গালার শক্তিপীঠ স্থাপনা'র লেখক ব্রহ্মচারী কুমার চৈতন্য প্রণীত, মূল্য দুই আনা। প্রাপ্তিস্থল—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

৪। বাংলার পল্লী-সমস্যা—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রাপ্তিস্থল—সরস্বতী লাইব্রেরী ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পুস্তক পাঠ করিয়া যথার্থই বোধ হয় যে লেখক পল্লী আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া হাতে কলমে পল্লীর শিক্ষা বিস্তার, কৃষি ও সমবায় সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। প্রত্যেক প্রবন্ধটিই অমূল্য এবং কি শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেরই এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা, দেশের উন্নতিকল্পে একান্ত প্রয়োজন।

সংঘ-বার্ত্তা।

১। শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ কাশী হইতে বিগত ৩০শে মার্চ্চ কলিকাতায় আসিয়াছেন। স্বামী বোধানন্দ কাশী অদ্বৈতাশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন এক্ষণে তিনিও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামী গঙ্গেশানন্দ,

সচ্চিদানন্দ, বিশ্বাত্মানন্দ এবং ঈশানানন্দ রেঙ্গুন কেন্দ্রে গমন করিয়াছেন এবং সেখান হইতে স্বামী ধ্যানানন্দ বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামী শর্ব্বানন্দ গুজরাট এবং বোম্বাই ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছেন।

২। স্বামী রামেশ্বরানন্দ এবং ঈশানানন্দ ঘাঁটালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গমন করিয়া বক্তৃতাদি করেন।

৩। স্বামী রামেশ্বরানন্দ এবং স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মস্থান কুলীনগ্রামে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে গমন করিয়াছিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু দিল্লী হইতে লিখিতেছেন, 'এখানকার সকলের ইচ্ছা যে দিল্লীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে একটি বেদান্ত college ও একটি সেবাশ্রম হয়। তাহার জন্য স্বামী পরমাত্মানন্দজী যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। Council State ও Assembly'র প্রায় সমস্ত মেম্বরদের মত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট কিছু যায়গা জমি ও বাটীর জন্য দরখাস্ত করিতে ইচ্ছুক। অধিকাংশ রাজা ও যাঁহারা মেম্বর দরখাস্তে সই করিতে ইচ্ছুক। এক্ষণে সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের President এবং Secretary'র মতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

৫। নিম্নলিখিত স্থান হইতে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়াছি,—দিল্লী (সভাপতি অনারেব'ল দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী), সাতক্ষীরা—খুলনা (সভাপতি—শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী), জোরহাট, আসাম (সঃ পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী এবং মৌলবী কেরামত আলি), কোয়ালালুমপুর, মালয় উপদ্বীপ (সঃ এস, বীরস্বামী), ডিবরুগড়, আসাম (সঃ ডাঃ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), ভারুকাঠী নারায়ণপুর (বরিশাল), সারগাছী (মুরসিদাবাদ), দৌলতপুর (পাবনা), পাটনা, বেহার (সঃ শ্রীমথুরানাথ সিংহ), পঞ্চখণ্ড (শ্রীহট্ট), ক্র্যাডক টাউন, নাগপুর (সভাপতি সার জি, এম, চিতনভিস্ কে, সি, আই, ই, মাইলাপুর (মাদ্রাজ), উয়ারী (ঢাকা), জামালপুর (কটক), ব্যাঙ্গালোর (মাইসোর), লাক্‌সা (বেনারস), নরোত্তমপুর (বরিশাল), বেলিয়াটী (ঢাকা), হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট (সঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল), সিরাজগঞ্জ (পাবনা)।

৬। আগামী ২৪শে বৈশাখ ইং ৭ই মে বুধবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া জয়রামবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মস্থানে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার ২য় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন [illegible] শ্রীশ্রী মাতৃদেবীর ভক্ত এবং সন্তানগণের উপস্থিত প্রার্থ

সাধনা ও তাহার ক্রম

মুখবন্ধ

অধিকারভেদে ভাবের পার্থক্য হিসাবে বিভিন্ন কামনার উৎপাদন করিয়া অর্থ, অনর্থ, স্বার্থ পরার্থ, ও পরমার্থ লক্ষ্য করিয়া বা অলক্ষ্যে অর্থাৎ সংস্কার দ্বারা বা অভ্যাসবসে কর্ম্ম সৃষ্ট হয়।

এক পক্ষে যেমন বিভিন্ন অধিকার বিভিন্ন কর্ম্ম সৃষ্টি করে, পক্ষান্তরে তেমনি বিভিন্ন কর্ম্ম বিভিন্ন ফলোৎপাদন করিয়া নিয়ত বিভিন্ন অধিকার প্রদান করে। অধিকারী না হইয়া বাঞ্ছা করা বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহার যেমন অধিকার তিনি তদনুযায়ী ধ্যান ও ধারণাদ্বারা কর্ম্মের সোপান অবলম্বন করিয়া ক্রমে কর্ম্মান্তর গ্রহণপূর্ব্বক ধাপে ধাপে উঠিতে থাকেন। মূল ভিত্তি ব্যতিরেকে প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত হয় না। সঙ্গ ও সংযোগ অনুসারে যাঁহার যেরূপ কর্ম্মগতি তাঁহার তদনুরূপই অবস্থিতি ঘটে। বীজে কর্ম্ম-শক্তি নিহিত করিয়া প্রকৃতি বিশ্বব্যাপার পরিচালন করিতেছেন বটে, কিন্তু সঙ্গ ও সংযোগে তথ্য কিরূপভাবে তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন-সাধন করে, তাহা জ্ঞানিজনের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের বিষয়ীভূত। এই প্রবন্ধে তাহারই প্রতিপাদন-চেষ্টা করা হইয়াছে। সদাচার সদনুষ্ঠান ও সৎসঙ্গ যেমন একদিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলে, পক্ষান্তরে তেমনি অসদাচার, অসদানুষ্ঠান ও অসৎসঙ্গ নিম্নগামী ও মলিন করে। ইহার বিশদ আলোচনার দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক-জ্ঞানে মূল ব্যাপারের অবতারণায় নিযুক্ত হইলাম। ইহা ভগবৎ-ইচ্ছা ও ভগবৎ-কৃপাই বলিতে হইবে।

ব্যক্তিগত মুক্তির যথাক্রমে নিম্নলিখিত কয়টি ক্রম দেওয়া হইল। ক্রম শব্দের অর্থ—অধিকার বলিলে বিষয়টি সহজ হয়।

মুক্তি— বন্ধন-মোচন।

কাহার বন্ধন—জীবের বন্ধন।

কিসের বন্ধন—ভ্রান্তি-রজ্জুদ্বারা সংস্কার অর্থাৎ বদ্ধমূল ভ্রান্তিগ্রন্থি।

বন্ধন—অষ্টপাশ-মুক্তি—তাহার ছেদন।

আমি যাহা নহি বা যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে অন্যরূপ অজ্ঞানতা উপস্থিত হওয়ার নাম ভ্রান্তি।

বেদান্তমতে আমি যাহা নহি, আমি তাহা এবম্বিধ ভ্রান্তি—স্মৃতি-বিভ্রম।

মুক্তি—সম্যক্ স্মৃতি।

মুক্তির ক্রম

সাধনা দ্বারা সংস্কারশুদ্ধি হয়।

সংস্কারশুদ্ধি হইলে সংকল্প-শুদ্ধি হয়।

সংকল্পশুদ্ধি হইলে ভাবশুদ্ধি হয়।

ভাবশুদ্ধি হইলে দেহশুদ্ধি হয়।

দেহশুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়।

চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মজ্ঞান হয়।

আত্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মনিরূপণ হয়।

ব্রহ্মনিরূপণ হইলে জ্যোতিঃ দর্শন হয়।

জ্যোতিঃদর্শন হইতে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়।

ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হইলে চৈতন্যের উদ্রেক হয়।

চৈতন্যের উদ্রেক হইলে মায়া বা প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন হয়।

প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন হইলে দুঃখের নাশ হয়; দুঃখের নাশ হইলে মায়াতীত পুরুষ আনন্দধামে পঁহুছে। তথায় স্থিতিলাভ হইলেই সিদ্ধি লাভ হয়।

সাধনা

মানবের জীবন-লীলা আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিব। জীবন

শব্দের অর্থ কর্ম্ম (action)। যেখানে জীবন সেখানেই কর্ম্মের অভিব্যক্তি। এই কর্ম্ম ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমের মিশ্রণে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং এই তিন গুণের মধ্যে যে গুণের ভাবটি কর্ম্মে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, আমরা তাহাকে তদ্‌গুণানুযায়ী কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লই। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহার অন্যবিধ নাম দেওয়া গেল। পশুত্ব, নরত্ব ও দেবত্ব। কর্ম্মের অবসানে নিষ্ক্রিয়তায় বা উদ্বেগ-বিহীনতায় যেখানে সকল কর্ম্ম লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই ব্রহ্মত্ব। ব্রহ্মত্বেই স্থিতি আর গতি নাই, তাহাই চরম গতি।

জীব জগতে জাতিবিশেষের এক একটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম আছে। যেমন ব্যাঘ্রের ধর্ম্ম, কুক্কুরের ধর্ম্ম, শৃগালের ধর্ম্ম, বিড়ালের ধর্ম্ম বলিলে তজ্জাতীয় জীবের প্রকৃতিগত বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি; তদ্রূপ মনুষ্যধর্ম্ম বলিলে তাহার মনুষ্যত্বের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। দেশ কাল পাত্র ভেদে ধর্ম্মের আচারভেদ ও মাত্রাভেদ পরিলক্ষিত হইলেও তাহার বিশেষত্বের পরিবর্ত্তন ঘটে না।

এই কর্ম্মময় জগতে কর্ম্ম না করিয়া কাহারও নিষ্কৃতি নাই, ইহ জগতে সকলই ক্রিয়াশীল; এবং প্রকৃতিভেদে কর্ম্মমাত্রই ধর্ম্ম বা কর্ম্মই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মই কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম করাই জীবের ধর্ম্ম।

সাধারণ ভাবে দেখা যায় মন যখন দ্বন্দ্বাবস্থায় * থাকে, তখন কোনও কার্য্য করে না। কারণ তখন বুদ্ধির স্থিরতা থাকে না; মনস্থির হইলে বুদ্ধিস্থির হয়, বুদ্ধি স্থির হইলে কর্ত্তব্যনিরূপণ হয়, কর্ত্তব্য-নিরূপণ হইলে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ফললাভ হয়। এই অবস্থায় সৎ ও অসৎ সকলবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়

---

* কর্ম্ম মনদ্বারাই সম্পন্ন হয়, শরীর তাহার সম্পাদন উপায়মাত্র। মন যখন বুদ্ধির সহিত অভিন্ন না থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া কোনও কর্ত্তব্য নির্ণয় জন্য উৎকণ্ঠিত হয় ও অস্থিরতা অর্থাৎ করি কি না করি, এটা করি বা ওটা করি, এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি হয়, তাহাই দ্বন্দ্বাবস্থা।

ও তদনুরূপ সৎ ও অসৎ ফললাভ হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকে সাধনা বা ধর্ম্ম কহে, অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকে অধর্ম্ম বা পাপ কহে।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সৎই বা কাহাকে কহে, অসৎই বা কাহাকে কহে। পূর্ব্বকথিত মতে দেখা যায় যখন কর্ম্মইধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম করাই জীবধর্ম্ম বলা হইল, তখন কার্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে পার্থক্য করা কিরূপে সম্ভব পর হয়? এবং এই সদা-পরিবর্ত্তনশীল জগতে সত্যই বা কিরূপে প্রমাণিত, স্থিরকৃত ও স্বীকৃত হইতে পারে!

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, আমার এই দেহ আছে; 'আমার এই দেহ আছে' ইহা স্বীকার না করিলে আমার অস্তিত্বজ্ঞান অসম্ভব হয় এবং সকলই একটা কিছু-না হইয়া যায়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান কিছু-না কি করিয়া বলিব। তবেই দেখা যাইতেছে যে, অমি আছি, আমার দেহ আছে ও এই জ্ঞানও আছে। ইহা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য এবং অঙ্গীকৃত শুদ্ধজ্ঞানই সত্য—যাহার সত্তা স্বীকার করা হইল তাহাই সৎ; যাহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ রহিল, তাহাই অসৎ। সেইরূপ আমার ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু তাহা আছে ও সেই সেই সমুদয় বস্তু যাহা আছে—তাহা আছে, যাহা নাই—তাহা নাই, ইহাই সত্য ও কর্ত্তব্য। yea yea & nay nay।

এক্ষণে দেখা গেল যখন কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং আমি বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জীব বিচার সাহায্যে মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সত্যের অনুশীলন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাই আমার পুরুষত্ব, বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব—অন্যথা ভীরুতা বা পশুত্ব।

এই যে মিথ্যা ত্যাগ করিবার এবং সত্য অনুশীলন করিবার প্রবৃত্তি ইহাকেই আমরা বিবেক বলিয়া থাকি। এই বিবেকের উদ্রেক না হইলে সত্যপ্রিয়তা, সত্যানুসন্ধান ও সত্যানুশীলনে ইচ্ছা জন্মে না। এই যে সত্যপ্রিয়তা, সত্যানুসন্ধান ও সত্যানুশীলন ইহাকেই সাধনা বলিয়া অভিহিত করে এবং এইরূপ সাধনা দ্বারা ক্রমে সংস্কারশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সংস্কারশুদ্ধির চরম অবস্থায় ভাব (চিন্তা), ভাষা ও কার্য্যদ্বারা আর সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রকাশ হয় না।

"যদি দাগাবাজি ছাড়ি, হরি পেলেও পেতে পারি।"

"সত্যরূপং পরব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ
সত্যমূলা ক্রিয়া সর্ব্বা সত্যাৎ পরোতরো নহি।"

ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়

সত্যই ভগবানের স্বরূপ, সত্যই জগতের সার, সত্যই সত্য এবং সত্যের আরাধনা করিলেই ভগবানের আরাধনা করা হয়। কারণ সত্যই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সত্য। সংস্কারশুদ্ধি ব্যতিরেকে সত্যস্বরূপ ভগবানের অস্তিত্ববোধ সম্ভব নহে।—স্বচ্ছ আধার ব্যতিরেকে কোনও রূপ প্রতিবিম্বিত হয় না।

যাঁহারা কেবল বিচারসাহায্যে ঈশ্বর নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে বিচার সাপেক্ষ অর্থাৎ স্থূল সত্যের অনুসন্ধান ও তাহার অনুশীলন দ্বারা সংস্কারশুদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যাঁহার ঈশ্বর (চৈতন্যের) ধারণা নাই, তাঁহাকে সত্যের ধারণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

যেমন চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্রতম পদার্থ দেখিতে হইলে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবশ্যক হয়, এবং তাহা ব্যতিরেকে ঐ ক্ষুদ্র পদার্থ দর্শন করা যায় না; তবেই ঐ পদার্থ দেখিতে হইলে যে কোনও উপায়েই হউক একটি অণুবীক্ষণযন্ত্র সংগ্রহ করিতেই হইবে, নচেৎ তদ্দর্শন সম্ভবপর হইবে না। সেইরূপ ঈশ্বর নিরূপণ ঈশ্বরানুভূতি ও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার—সংস্কারশুদ্ধি ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। এই সংস্কারশুদ্ধি চিত্তবৃত্তির নিরোধদ্বারা, বৈরাগ্যের উদ্রেক দ্বারা, প্রেমদ্বারা ও ভক্তিদ্বারা স্থূল সত্যানুসন্ধান ও সত্যানুশীলনদ্বারা, পূজাদিদ্বারা, নামজপদ্বারা নাম-গুণ-শ্রবণদ্বারা, সৎচিন্তাদ্বারা, পরার্থ কর্ম্মদ্বারা, ইত্যাদি অসংখ্য উপায়ে সর্ব্বদা সাধিত ও সিদ্ধ হইতেছে। যেখানে এই শুদ্ধির ভাব যত অধিক, সেখানেই কার্য্যকুশলতা তত অধিক। ইহাকেই অধিকারভেদ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যেমন যে সত্য কথা কহিবে, তাহাকে বৃথা ভাবনা করিতে হইবে না, কি কহিব বলিয়া অস্থির হইতে হইবে না; কারণ সে সত্যই কহিবে, অতএব কি কহিতে

হইবে, তাহা তাহার স্থির আছে। তাহার কার্য্য কত সংক্ষেপ, কত ক্ষিপ্র, কত সরল—কাজেই কত সুকৌশলময়। তবেই দেখা গেল, মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সত্যানুশীলনদ্বারা ক্রমে সংস্কারশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। স্থূল সত্যের নিরূপণ তাহার সাধন ও তৎশুদ্ধিলাভ বিচারসাহায্যে কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা বলা হইল। এই অবস্থায় না পঁহুছিয়া ঈশ্বরানুসন্ধান ঈশ্বরানুভূতি ও ঈশ্বর সাক্ষাৎকার প্রয়াসী হইলে কেবল বিফলমনোরথ হইয়া অবিশ্বাসী সাজিয়া সুখ-দুঃখের নিয়ত আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া দুঃখবহ জীবনভার বহন করিয়াই চলিতে হইবে।

প্রকৃতির আইন অলঙ্ঘনীয়; আমরা যে একটা আইনদ্বারা অনুশাসিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মই আমাদিগকে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ ও জরার অবস্থায় আনয়ন করিতেছে, ইহার গতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। কিন্তু প্রতি অবস্থাতেই একটা সুখ-দুঃখের সাধারণভাব আমরা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছি। অর্থের সাহায্যে পার্থিব সুখ-সচ্ছন্দতা বহুপরিমাণে সাধিত হইতেছে দেখিয়াই আমরা প্রাণপণে অর্থের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি; এবং কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, সত্য-মিথ্যা জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রলুব্ধ হইয়া কুকুর-সদৃশ বৃত্তির লাভ করিয়া সুযোগ ও সুবিধার আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ও সুখের আশায় পথভ্রষ্ট হইয়া ক্রমাগত দুঃখ ভোগ করিয়া ও লালসা দুষ্প্রবৃত্তিকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইতেছি না। কুকুর কদন্নই ভোজন করে—দেবভোগ তাহার প্রাপ্য নহে। কুকুর হইয়া দেবভোগ বাঞ্ছা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল লোলজিহ্বা বাহির করিয়া দূরে অপেক্ষা করিতে হইবে, মন্দিরদ্বার লঙ্ঘনে শক্তি সঞ্চিত হইবে না।

এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পন্থায় অনন্ত পথিক অনন্ত দিকে বিচরণ করিলেও প্রকৃতিগত সত্য হইতে একটি কণাও বিচ্যুত নহে। যে আধারে সত্যের ভাব যতটুকু আধেয় হইয়াছে, তাহা সত্যের ভাবে ততটুকু ধৃত, বিকশিত ও স্থিত রহিয়াছে। যে দেশে একদিন সত্যের ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া ঋষিগণ সমদর্শন ও সর্ব্বদর্শন লাভ করিয়া কল্প কল্পান্তের ভূত ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্তের চাক্ষুষ প্রমাণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের

সাহায্যে দর্শনলাভ করিয়া বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশ পরপদদলিত পরপদাশ্রিত পর মুখাপেক্ষী ও পরান্নভোজী কেন? হায় সকলই আছে, কিন্তু মানুষ নাই। মানুষের খোলস পরিলেই মানুষ হওয়া যায় না; মনুষ্যত্বের বিকাশ যাহাতে নাই, সে মানুষ নহে। যাহার বিচারবুদ্ধি নিরপেক্ষভাবে কর্ত্তব্য পালন করে নাই, যে শুদ্ধজ্ঞান লইয়া সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হয় নাই, তাহার মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। সাধনায় সিদ্ধি আনয়ন করে, ইহার ব্যতিক্রম নাই। যে যেভাবে যাহা সাধন করিতেছে, তাহার সেই ভাবে তাহাই সিদ্ধ হইতেছে। সাধনা একরূপ সিদ্ধি অন্যরূপ ঘটে না। শীতল জলে নামিলে শরীর স্নিগ্ধ ও সূর্য্যের উত্তাপে অবস্থান করিলে শরীর উত্তপ্ত হইবেই হইবে। আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলে আম্রই ফলিয়া থাকে। সত্যানুসন্ধান ও সত্যানুশীলনদ্বারা সংস্কারশুদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী। যিনি বা যে জাতি যে পরিমাণে মিথ্যার সাপেক্ষতা রক্ষা করেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে পশুভাবাপন্ন। যিনি যে পরিমাণে সত্যবান্ তিনি সেই পরিমাণে মানহুষ্ বা মানুষ।

এক্ষণে সংকল্পশুদ্ধির বিষয় বলিবার চেষ্টা করিব।

যখন সত্যই গ্রহণীয়, সত্যই পালনীয় ও সত্যই করণীয় বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইল, এবং তৎসম্বন্ধে মনোমধ্যে কোনও সন্দেহের ভাবোদয় হইল না ও সত্য পথ হইতে বিচলিত হইয়া মিথ্যা বা কল্পনার সাহায্য লইতে প্রবৃত্তি জন্মিল না, সেই অবস্থায় স্থিরবুদ্ধির উপর দাঁড়াইয়া যে কর্ম্মেচ্ছা তাহাকেই সংকল্প বলিতে হইবে। প্রবৃত্তি বলিয়া অভিহিত করা চলিবে না। যেহেতু সে অবস্থায় আর স্বার্থপ্রণোদিত শুভাশুভ দেখিতে পারে না, সত্যই দেখিতে থাকে। সত্যই তখন তাঁহার বর্ত্তিকার স্বরূপ হয় এবং সেই আলোক যেদিকে পড়ে, তাঁহার গতিও সেই দিকে হইয়া থাকে, তখন আত্মপর শুভাশুভ দেখিবার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তবু কর্ম্ম করিতেই হইবে—কর্ম্ম না করিয়া নিস্তার নাই। এই কালের কর্ম্মকেই সংকল্প বলা হইয়াছে। ক্রমাগত কর্ম্মেচ্ছা জন্মিতেছে, কর্ম্ম সাধিত ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত,

সত্যে সংকল্পিত ও সত্যে পরিচালিত হইয়াই ক্রমাগত অনুষ্ঠান দ্বারা অভ্যাসবসে চরমোৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীতারিণীশঙ্কর সিংহ

মায়ের স্মৃতি

১। তোর স্নেহের আশীষ বুলিয়ে দে মা
দুখনত এ অন্তরে ;
বিষাদ সুরা জীবন বীণা,
অবুঝ ছেলে বুঝ্ মানে না,
জগৎ থেকে চাইছে বিদায়
আর কি হেথায় মন সরে,
নীরব নিঝুম অন্দরে।

বদ্ধ মনের অন্ধ বনে ভাস্ছে
তোমার শান্ত নয়ন,
অতীত স্মৃতি জড়িয়ে দিয়ে,
পশ্লো সে মোর শূন্য হিয়ে ;
গভীর রাতের ব্যর্থ কাজে
আদরহারা তিক্ত প্রাণে,
পড়্লো তোরে পড়্লো মনে।

ওমা, তোর মধুর আহ্বান আস্ছে
যে ঐ ওপার থেকে ;
অজানা এক সুরের রেশে,
আকুল চোখে অশ্রু ভাসে,
অসীমতীরে দাঁড়িয়ে আজি
মায়ের ডাকে আত্মহারা,
কর্ম্ম বাঁধন ঘুচ্লো ত্বরা।

ক্লান্তি হরণ শান্তি তোমার
দীর্ঘ এ মোর বক্ষে ঢালো ;
আনন্দেরই নিত্য খেলায়
মৃত্যু যেথা শূন্যে মিলায়,
তোমার চরণ-বন্দরে সেই
জীর্ণতরী আজ্‌কে টানো,
(মাগো) সর্ব্ববাধায় বজ্র হানো ।

— শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল বি-এ

স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্ম্মজীবনে বেদান্ত

বসন্তকালের প্রাতঃকাল যখন মেঘনির্ম্মুক্ত পূর্ব্বগগনে তরুণ ভাস্করের বিমল কনককিরণ অপরূপ ভাবে রঞ্জিত করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, শরৎকালে রজতধবল জ্যোৎস্না যখন বৃন্দাবনের কুঞ্জসমূহের মধ্যে প্রেমধারা বর্ষণ করিয়া উদাস আকুল ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়, তখন ঐ প্রাকৃতিক মধুরিমা সম্ভোগ করিতে করিতে মানব ভুলিয়া যায় তাহার অস্তিত্ব, ভুলিয়া যায় তাহার সনাতন অবিনশ্বর স্বরূপ—সে সেই সময়ের জন্য যে আনন্দ পায়—হউক তাহা ব্রহ্মানন্দের এক কণা, কিন্তু তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, সে আর সেই কোমল আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বিরত হইতে চায় না, সেখানেই ডুবিয়া যাইতে চায়, আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে চায়।—ইহাই কবিত্ব।

এখানে কিন্তু ভাবিবার অনেক কথাই নিহিত রহিয়া গিয়াছে। আমরা উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছি যে, যে কোন ভাবের সম্যক্ স্ফুরণে ব্যষ্টির এবং সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত উন্নতির পক্ষে সহায়ক। যখনই সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করিবার প্রচেষ্টাকে অবমাননা করিয়া কোনও জাতি বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়, তখনই কালের অনিবার্য্য নিয়ম উহাকে ধ্বংসপথে টানিতে থাকে। যদি আমরা

একটু বিচার করিয়া দেখি যে, জাতি কেন তাহার চিরন্তন উন্নতিপথ পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, একটি উৎকট ভাবের সম্মোহনী মায়ায় উহা মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে,—তাই তাহার গতিতে প্রাণশক্তির রাহিত্য সম্ভবপর হইয়াছে, কোনও মায়ার প্রহেলিকা আশ্রয় করিয়াই নিশ্চয় জাতি সম্মোহিত হয়—ঐ মায়ার বিজৃম্ভনে পূর্ব্ব বর্ণিত কবিত্বের ভুল অনুকরণ ও মোহিত আত্মার সম্ভোগ বাসনা হইতে সঞ্জাত হয়। এতাদৃশ কবিত্বের মোহ প্রহেলিকার প্রভাবই জাতিকে ক্ষীণশক্তি, উত্তমহীন করিয়া তুলে; অধিকন্তু মত্ততাসুরা পান করাইয়া অবশেষে হিতাহিত জ্ঞানবিরহিত উন্মাদ না করিয়া অব্যাহতি দেয় না। সমগ্র রোম নগরে সর্ব্বভুক্ হুতাশন প্রজ্বলিত করাইয়া দিয়া Nero বেশ মজা সম্ভোগ করিয়াছিল। এতাদৃশ কবিত্বের উন্মাদনা একবার জাতীয় রক্তে মিশিয়া যাইতে পারিলে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করা এক প্রকার অসম্ভব।

কিন্তু জাতিবিশেষের তৎপ্রসূত জড়তা ঘুচাইয়া কর্ম্মশক্তির উদ্বোধন করিবার জন্য প্রকৃতির স্বভাবানুযায়ী অমিততেজোবীর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষগণ জগতে শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। আজ আমরা যাঁহার জীবনী কীর্ত্তনে উপস্থিত সেই মহাভাগ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে পারমার্থিকতার অনুশীলনেই যে জাতীয় উদ্বোধন সম্ভব তাহা প্রচারকল্পে কর্ম্মোন্মাদনা শক্তির জাগরণের নিমিত্ত ভারত ভারতীর কর্ণে পাঞ্চজন্য-নিনাদে ডাকিয়া বলিতেছেন,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে মহাজাগরণের বোধন-সঙ্গীত তখনই প্রথম জগতের আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া উঠিয়াছিল, যখন এই ভিক্ষু স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে বেদান্তের অন্তর্নিহিত মহিমা নিজ জীবনে সম্যক্ উপলব্ধি এবং পরিশেষে মানব সাধারণে বীরদর্পে প্রচার করিয়া ত্যাগের ও শান্তির গৈরিক পতাকা জগৎসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই কথাগুলিই এখন আমরা সাধক অরবিন্দের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি,—

"It was in religion first that the soul of India triumphed.

There were always indications, always great forerunners, but it was when the flower of the educated youth of Calcutta bowed down at the feet of an illiterate Hindu ascetic, a self-illuminated ecstatic and "mystic" without a single trace or touch of the alien thought or education upon him that the battle was won. The going forth of Vivekananda, marked out by the Master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sing to the world that India was awake not only to survive but to conquer."

স্বামী বিবেকানন্দ যে মহতী বাণী (Message) লইয়া ধরাধামে শান্তি মৈত্রী স্থাপন করিবার জন্য শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই কয়েকটি কথায় বিবৃত করা যাইতে পারে—"Let the lion of Vedanta roar. Let me tell you strength, strength is what we want. And the first step in getting strength is to uphold the Upanishads and be'ieve that " I am the Atman" বেদান্তের মহামন্ত্রে তিনি যে অভিনব আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যুগপ্রয়োজন অনুভব করিয়া এই বেদান্তের অদ্বৈতভাব ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। বেদান্তের তিনি যে অংশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কেবল সেই সময়ের জন্যই গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই যে ঐ প্রভাব অস্তাচল-গমনোন্মুখী দিবাকরের ক্ষীণরশ্মির ন্যায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গভীর অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছিল, তাহা ইতিহাস প্রখ্যাত। তাঁহার বেদান্ত প্রচার যে অবশেষে তামসিক মায়াবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহাও সাক্ষ্য দিতে ইতিহাস বর্ত্তমান। কিন্তু এই বর্ত্তমান যুগে নানাভাব সমষ্টির মধ্যে একতার সূত্র গ্রথিত করিতে, বহুধা বিভক্ত ধর্ম্মখণ্ড সমূহের একৈকোদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের কার্য্যপ্রণালী

স্বামী-বিবেকানন্দের ধর্ম্মপ্রচারে সম্যক্ প্রস্ফুটিত ও পরিপুষ্ট হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাসমন্বয়ের বার্ত্তা জগতে আনয়ন করিয়াছে, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ইহা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন,—

"Sankara's great and temporarily satisfying as it was, is still one synthesis and interpretation of the Upanishads. There have been others in the post which have powerfully influenced the national mind and there is no reason why there should not be a yet more perfect synthesis embracing all life and action in its scope, that the teachings of Sri Ramakrishna and Vivekananda have been preparing."

আমরা কথাগুলি আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব। শ্রীশঙ্কর স্বীয় বিশেষ কার্য্যসম্পাদন করিবার নিমিত্ত দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন—প্রথমতঃ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সম্বলিত ত্রিমূর্ত্তির পূজা, দ্বিতীয়তঃ উচ্চ অধিকারীর নিমিত্ত অখণ্ডনীয় যুক্তিপ্রতিষ্ঠিত বেদান্ত-প্রচার। তাঁহার সমুদয় কার্য্য অতীব সুফলপ্রসূ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বভাবকে আশ্রয় করিয়া তৎপ্রচারিত বেদান্ত-ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়াই অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-লীলা স্বামিজীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রেরণা ছুটাইয়া দিয়া তাঁহাকে সম্যক্ পরিজ্ঞাত করাইয়া দিয়াছিল যে, বর্ত্তমান জগতে বহুবিধ বিভিন্নতার (Diversities) মধ্যে একটি একতার (Unity) পত্তন করিতে হইবে। তাই, স্বামিজী-প্রচারিত বেদান্ত কেবল অদ্বৈতবাদ-মূলক নহে, পরন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞানের শেষ তত্ত্ব 'তত্ত্বমসি'-রূপ আদর্শের পূর্ণ অনুশীলনের জন্য দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদসমূহেরও যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি জগতে প্রথম প্রচার করিয়া গেলেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'-রূপ সূত্র দ্বারা তিনি শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আপাত দৃষ্টে বিবদমান বেদান্তভাষ্যসমূহকে একত্র গ্রথিত করিয়া একটি অপরূপ মাল্য রচনা করিলেন; তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশে তাহার উপযুক্ত সংস্থাপন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন

—ঠিক হইয়াছে, অনন্তভাব-ঘনমূর্ত্তি ঠাকুরই বাস্তবিক সকল সম্প্রদায়ের সকল সাধকের আদর্শ।

"...........if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart, and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written, inspite of their resistance : "Help and not Fight", "Assimilation and not Destruction", "Harmony and Peace and not Dissension."

চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় স্বামিজীর এই শেষ সত্যপ্রচার ঠাকুরের জীবন-প্রচার বই আর কিছুই নহে।

এই মহাসমন্বয় বার্ত্তার সংরক্ষণ, অনুশীলন ও প্রচার জন্য স্বামিজী দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, পরার্থে সর্ব্বত্যাগী সহস্র সহস্র যুবকের জীবনোৎসর্গ প্রয়োজন অনুভব করিলেন। প্রাচীন ভারত ও ব্রহ্মচর্য্য এবং সন্ন্যাসাশ্রমের ঐকান্তিক প্রয়োজন অনুভব করিয়া চিরকাল মানবকে ত্যাগধর্ম্মে শিক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শমদমাদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া যুবকবৃন্দ ধর্ম্মরাজ্যের সন্ধান জানিয়া লইতেন; এবং উচ্চাধিকারিগণ ঐ আশ্রমেই ত্যাগসর্ব্বস্ব ধর্ম্মের অনুশীলনে গৈরিকের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া কাষায় বস্ত্র ধারণ করিতেন—ধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক যে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার ভারত এবং ভারতেতর দেশে সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে উত্তমরূপে বিবৃত রহিয়াছে; এবং উক্ত ধর্ম্মের প্রভাবে দেশে কীদৃশ শিল্প-কলা-বিজ্ঞান-সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে সমষ্টিশক্তির সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াই অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়াই সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপিত হইত। বৌদ্ধযুগের অবসান হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমষ্টিশক্তিকে প্রধান অবলম্বন রাখিয়া জাতীয় সাধনার অনুশীলন বিশেষ ভাবে ঘটিয়া উঠে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান যুগের আহ্বান-ভেরী আমাদিগকে সমাজের মুখ্য ও গৌণ

প্রয়োজনাদির সাধনায় জ্ঞাতসারে ও সমবেতভাবে ব্রতী করিতে বজ্রগম্ভীর নিনাদে বাজিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রচলনে ভারতবর্ষে যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং এই আহ্বানভেরীর তান ছন্দও অশ্রুতপূর্ব্ব। আমাদের মনে তাই প্রথম প্রথম ভয় হয়, বুঝি আমরা আমাদের সনাতন ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলাম, কিন্তু দোলায়মান চিত্ত তখনই আশ্বস্ত হইয়া যাইবে, যখন একটু বিচার দ্বারাই বুঝিতে পারিব যে, ভোগৈকসর্ব্বস্ব প্রতীচ্যসভ্যতার আগমনে ভারতের সনাতন ধর্ম্মপথ অজ্ঞান অমানিশায় আবৃত হইয়া যাওয়াতে ত্যাগালোক বিকিরণ করাই এ সময়ে একমাত্র সমীচীন কার্য্য।

ত্যাগের বিমল, শুভ্র, পবিত্র জ্যোতিঃতে সমস্ত পাপ-অন্ধকার এককালে বিদূরিত করিয়া দিতে বিবেকানন্দ স্বামিজী ত্যাগ-প্রভায় মণ্ডিত হইয়া যুবকগণকে তূর্য্যনিনাদে ডাকিয়া বলিতেছেন—"Awake, awake, great souls. The world is burning in misery. Can you sleep?" সন্ন্যাসের ত্যাগাগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকগণই ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তৃত্বে বিশেষ সহায়ক। মহান কর্ম্মিগণ যুবকসম্প্রদায় হইতে বাহির হইয়া দেশকে ত্যাগ-পবিত্রতার বন্যায় ভাসাইয়া দিবে;—ইহাই স্বামিজীর ভবিষ্যদ্‌বাণী। স্বামিজী বলিতেছেন,—"ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নহে,—শক্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর বেশ সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।" ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া জাতীয় উদ্বোধন কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা সহজ নহে; কিন্তু বৌদ্ধযুগকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—ধর্ম্মের নিকট জাগতিক সমুদয় মহামূল্য পদার্থও নিবীর্য্য এবং অসার।

স্বামিজী, কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান-রূপ বিবিধ বিচিত্রমাল্য বিভূষিত বেদান্ত-বিগ্রহ, ত্যাগ-পবিত্রতা-রূপ বেদীর উপর সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন—এই বিগ্রহের পূজা কেবল যে হিন্দুরা করিয়াই ধন্য হইবে, তাহা নহে; এই পূজাতে আমুসলমান সকলকে যোগদান করিতে হইবে;

ইহা কোনও সাম্প্রদায়িক পূজার ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান নহে, সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকিলে ইহা তাহারই পূজা—এ পূজাতে জাতিবর্ণবিশিষ্টতা নাই, কলহদ্বন্দ্ব নাই, আছে শুধু উদার প্রেমের মধুর স্ফূর্ত্তি, আর ব্রহ্মাবগাহী ভাব-সমুদয়ের চিরন্তন সাধনা। হে মানব! এ সাধনায় যোগদান করিয়া জাতীয় সমস্যার নিরাকরণ কর—তোমার জীবন ধন্য হইবে। স্বামিজীর এই মহা উদারবার্ত্তা তোমার মনে সমদর্শন, উদারতার ভাব আনিয়া দিয়াছে কি? "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত থেকে।"—এ কথা লোককে হুজুগে মাতাইয়া তুলিবার জন্য উক্ত হয় নাই, এই কথার মধ্যে উদার সনাতন ধর্ম্মের একটি মূলমন্ত্র রহিয়া গিয়াছে; স্বামিজী ইহার মধ্য দিয়া কর্ম্ম-কৌশল ইঙ্গিত করিয়াছেন;—গীতার ভাষায় তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে,' আবার তিনি চণ্ডাল সকলকে কর্ম্মজীবনে সনাতন বেদান্ত-ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে ঐ কথা দ্বারা আহ্বান করিতেছেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (৩য়ঃ অঃ, ৯ শ্লোক)

যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম না করিলে বন্ধনই সৃষ্ট হয়, তাই মুক্তসঙ্গ হইয়া কার্য্য করা সঙ্গত। শঙ্করভাষ্যে 'যজ্ঞ' অর্থে ভগবানের নিমিত্ত যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই বুঝান হইতেছে। স্বামিজীও চাহিতেছেন, নিজ নিজ কর্ম্মের মধ্য দিয়া যেন ভগবানের অদৃশ্য হস্তের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া মানব ধন্য হইতে পারে। বেদান্ত চাহিতেছেন, যেন আমাদের সমগ্র জীবন ভগবানের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ প্রদত্ত হয়। যে বেদান্তধর্ম্ম বহু-শতাব্দী যাবৎ মুষ্টিমেয় মানবের নিকট কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা আজ এই পুণ্যশ্লোক ঋষি বিবেকানন্দের কৃপায় হাটে ঘাটে, সর্ব্বাবস্থায়

অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। তিনি এ যুগে যে নূতন চক্র প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের অনুবর্ত্তন করিতেই হইবে। যুগে যুগে এরূপ চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে—ইহার অনুবর্ত্তনে সুনিশ্চিত মঙ্গল। তাঁহার মহান্ কার্য্যে সাহায্য করিতে তিনি আমাদের ডাকিতেছেন—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

এই চক্রপ্রবর্ত্তনে সহায়তা করিবার বাসনা হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে জাগ্রত হইলেও জড়ভাবাপন্ন মানব পুনরায় মায়ান্ধ হইয়া জগতের সুখদুঃখ ভোগ করিতে থাকে—মায়ার করাল কবল হইতে নিস্তার পায় না। বাস্তবিকই জগৎরূপ প্রহেলিকা ধূমে মুক্তিদ্বার সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে; স্পষ্ট-ভাবে কিছুই দেখা যাইতেছে না, আর এই ভীষণ অন্ধকারে আমরা আমাদের চির অভিপ্সিতের সন্ধানে নিয়ত উন্মাদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই বন্ধনের কারণ কি?—মনে পড়িতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত সেই কথা,—তিনি বলিতেছেন যে, মুক্তিদ্বার যদ্যপি তিনি সর্ব্বপ্রকার মানবের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি কামিনী-কাঞ্চনের সৃষ্টি করিয়া মানবকে মোহগ্রস্ত করিবারও উপায় তৎসঙ্গে করিয়া রাখিয়াছেন। এই আপাতসুখকর পরিণামবিষময় মায়ার প্রহেলিকায় মানব উন্মত্তপ্রায়। এই অবস্থা হইতে বাহির হইবার কি কোনও উপায় নাই? ভগবান্ তাহারও উপায় করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। গীতায় আমরা শুনিতে পাই, পার্থসারথীর মুখে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

এই দৈবী ও গুণময়ী আমার মায়া দুস্তরা, যাহারা আমাকেই আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। বর্ত্তমানে যুগভাবকে আশ্রয় করিয়া মোহগ্রস্ত জীবকে মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণের পথ নির্দ্দেশ করিতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ধরাতলে অবতীর্ণ; তাঁহার মহতী বাণী শ্রীবিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। আর বিলম্ব করা কি সঙ্গত?—বিদ্যুচ্চলং জীবিতম্।

তাঁহারা অমৃতের সিন্ধু লইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত—মূর্খ, আলস্য-

পীড়িত আমরা দেবতাকে বিমুখ করিতে যাইতেছি। মরীচিমালি-সূর্য্য যখন অন্ধকাররাশি সমূলে বিনাশ করিয়া আকাশে প্রভাময় হইয়া উদিত হন, তখন সকল পদার্থই আলোকসম্পাতে আলোকিত হয়; কিন্তু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী পদার্থই অধিক আলোক পাইয়া ধন্য হয়। আজও অজ্ঞান-অমানিশা জ্ঞানালোকসম্পাতে এককালে বিদূরিত করিয়া ধর্ম্মগগনে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাস্করের উদয় দেখা যাইতেছে, তাহার পুণ্যকিরণে—জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক—সকলই স্নাত হইতেছে ও হইবে সুনিশ্চিত; কিন্তু ঐ পবিত্র কিরণসাগরে নিমজ্জিত হইয়া স্বর্গরাজ্যের শান্তিময় আলেখ্য দর্শন করিতে আমাদের বাসনা কোথায়? এই শুভপুণ্য-মহেন্দ্রক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া যেন আমাদের নূতন জীবনের সূচনা হয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—শ্রীসুশীলকুমার দেব

ধনি-দরিদ্র-সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপায়

রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিত, শ্বেত ও কৃষ্ণ, মালিক ও মজুর, জমিদার ও রায়ত, মহাজন ও খাতক, বাবু ও মেথর, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল,—একদিকে প্রবল, অন্যদিকে দুর্ব্বল,—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বর্ত্তমান জগতের নিত্য ঘটনা। এই বিরোধকে এক কথায় ধনি দরিদ্রের বিরোধ বলিয়া অভিহিত করিলে অসঙ্গত হয় না। কেননা, ধনের উপরেই বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি কিন্তু ছিল জ্ঞান। এবং উহার পতনও হইয়াছিল তাই জ্ঞান বৈষম্য বশতঃ। জ্ঞান অথবা ধনমূলক যেরূপই হউক, বৈষম্য মাত্রেই দূষণীয়। উৎকৃষ্ট দ্রব্য দুগ্ধ যেমন একবিন্দু গোমূত্র পড়িলে নষ্ট হইয়া যায়, বৈষম্য দুষ্ট হইলে, জ্ঞানও সেইরূপ অশেষ অকল্যাণেরই হেতু হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি আমাদের

কিন্তু মনে হয়, ধন অপেক্ষা জ্ঞান বৈষম্য মন্দের ভাল। কেননা, জ্ঞান উচ্চতর বিষয়। এইজন্যই, প্রাচীন ভারতে অত্যাচার অনাচার যতই অধিক হউক, বর্ত্তমান প্রতীচ্য জগতের তুলনায় ঐ সকল সাগরে গোষ্পদেরই তুল্য। যাহা হউক, এই যে ধনি দরিদ্র বৈষম্য, ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান অপূর্ণতা (Draw back)।

ধনী ও দরিদ্র উভয়েই সমাজের। সুতরাং উভয়েই এক, উভয়েরই তুল্য অধিকার। কিন্তু সমাজে ধনী যে সুবিধা ভোগ করে, দরিদ্র চিরদিনই তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। ধনীর চেষ্টা হয় তাই, দরিদ্র যাহাতে মাথা তুলিতে সমর্থ না হয়। পক্ষান্তরে, দরিদ্রেরও চেষ্টা হয়, ধনীরও যাহাতে শক্তির হ্রাস হয়। এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তখন দরিদ্রের পক্ষ অবলম্বন করেন। "দরিদ্রান্ ভর,"—দরিদ্রের উপকার করাই তখন তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। ইঁহারা এরূপ এক দেশদর্শী যে, ধনী দরিদ্র সমস্যা নিবারণের প্রকৃত উপায় জানিতে না পারিয়া তাঁহারা দরিদ্রেরই পক্ষপাতিত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন।* ফলে, ধনী, দরিদ্র

* ভক্তদের নিকটে ইঁহারাই অবতার নামে অভিহিত হন। জ্ঞানীদের মতে, অবতার কিন্তু নিরর্থক। "ন ধর্ম্মো ন চার্থো নচ কামোমোক্ষঃ—ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।" যাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মই নাই, তাঁহাদের গুরু বা অবতারের প্রয়োজনও না থাকিবারই কথা। অবতারেরা লোক হিতার্থে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে সমাজের সাময়িক কল্যাণ হয় সত্য, কিন্তু অন্যপ্রকার অকল্যাণের বীজ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া যায়। কালক্রমে সেই বীজ হইতে পুনরায় এক মহান অনর্থ অশ্বথের উৎপত্তি হয়। উহারই বিনাশ সাধন করিবার জন্য তখন আবার এক নূতন অবতারের প্রয়োজন হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গা গড়ার লীলা চলিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণকেও, তাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ফলতঃ, কল্যাণ অকল্যাণ "দুই ভাই, সদা থাকে এক ঠাঁই, কেহ নাহি ছাড়ে কারো সঙ্গ।" অকল্যাণ না করিয়া কল্যাণ করা তাই অসম্ভব। সুতরাং অবতারেরা এই যে একদিকে গড়েন এবং অন্যদিকে আবার ভাঙ্গেন, এই যে উন্মাদের ন্যায় ভাঙ্গা ও গড়া—doing and

ও হিতৈষী, এই ত্র্যহস্পর্শ যোগে সমাজের যে দুর্দ্দশা হয়, বর্ত্তমান জগতে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান ।

সকলেই সমাজের, এইরূপ জ্ঞান হইলে কাহারও ধন আত্মসাৎ* করিয়া কাহারও ধনী হইবার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু মানবের ভূমার জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, সকলেই সকলের পর, এইরূপ ক্ষুদ্র জ্ঞান উদিত হয়, তাই তাহারা একে অন্যের ধন আত্মসাৎ করিয়া ধনী হয়। সহজ কথায়, একে অন্যের খাইয়া জীবন ধারণ করে। সমাজ নিজের রক্ত নিজেই পান

undoing, জ্ঞানীদের মতে ইহা নিরর্থক। যেহেতু, অবতারদের কৃত উপকারও যেমন মহৎ, তাঁহাদের কৃত অপকারও আবার তেমনই ব্যাপক ও ভীষণ, সেইহেতু, মোটের উপর, সমাজের ইহাতে লাভ কিছুই হয় না। এই আদর্শবাদীদের মতে, নৈষ্কিঞ্চন্যই তাই পরম ধর্ম্ম। এবং যেহেতু অবতারেরাও নিষ্কিঞ্চন নহেন, বরং তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা আরও অধিক, (কেননা তাঁহারা সমষ্টির কল্যাণকামী) সেইহেতু তাঁহারা মানবের আদর্শ হইবার অনুপযুক্ত, ইহাই জ্ঞানীদের অভিপ্রায়। নির্ব্বাণ লাভ করাই তাই তাঁহাদের মতে সমাজের যথার্থ উপকার করা—সেখানে পৌঁছিলে মানব নিষ্কিঞ্চন হইয়া যায়, জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, সর্ব্বপ্রকার ভববন্ধ হইতে চিরমুক্তি লাভ করে, সুতরাং নিজেও দুঃখ পায় না, অন্যেরও দুঃখের কারণ হয় না।

বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্ম্ম ব্যষ্টিপ্রধান, ইহাতে তাই নরপূজার স্থান নাই। হিন্দুদের বর্ত্তমান অন্ধ গুরুভক্তি বৌদ্ধধর্ম্মেরই আনুষঙ্গিক ফল। সর্ব্বাগ্রে বৌদ্ধেরাই নরপূজার প্রচলন করেন। "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি," ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উচ্চস্তরের হিন্দুধর্ম্মে তাই অবতারবাদের স্থান নাই। তথায় গুরু ও শিষ্য, অবতার ও ভক্ত, সকলেই "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্।"

* নিজের প্রকৃত প্রয়োজন যাহা, তাহার অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করার নামই অন্যের ধন আত্মসাৎ করা। কেন না, ঐ ধন তাহার নিজের অথবা অন্যের, কাহারও ভোগে আইসে না। এইজন্য, ভারতীয় মনীষীরা বলেন, মা ধনংগৃধ্র। ধন উপার্জ্জন কর কিন্তু সঞ্চয় করিও না, অথবা উপার্জ্জন কর—নিজের ভোগের জন্য নহে, "বিশ্বজিৎ" যজ্ঞে সর্ব্বস্বান্ত অথবা "সন্তোষক্ষেত্রে" নিঃস্ব হইবার জন্য। ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ।

করে। ইহাই তাহার ছিন্নমস্তারূপ* অথচ ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই দৃষ্টি এরূপ সংকীর্ণ, স্বার্থবুদ্ধি এতই প্রবল যে, নিজেরা অশেষ দুঃখ ভোগ করে, তথাপি সামর্থ্য সত্ত্বেও উহার প্রতীকার করিতে যত্নপর হয় না।

ধনী দরিদ্রের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াই ধনী হয়। সে আপনাকে অভাবগ্রস্ত অতএব অপূর্ণ বলিয়া মনে করে, তাই তাহার ধনসঞ্চয়ে ঐ প্রকার প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং বস্তুতঃ কিন্তু অতি দীন, দরিদ্রেরও অধম সে। দরিদ্রের ন্যায় সেও তাই কৃপারই পাত্র। অতএব তাহাকে ধনী মনে করা সঙ্গত হয় না। এইরূপ "যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপেই ধনী ধনবান্ হয়," এই যে কথা শুনা যায়, তাহাও সত্য নহে। কেন না, ধনী যেমন একদিকে যোগ্যতর, অন্যদিকে দরিদ্র ও আবার তেমনি যোগ্যতর। ধনী অর্থশক্তিতে বলবান্, দরিদ্র আবার বলবান্ শ্রমশক্তিতে। সুতরাং কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। পরন্তু দরিদ্র না থাকিলে ধনীর অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না। অতএব, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া ধনীর অবশ্যকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, যে দেশের ভগবান্ দীনবন্ধু, সেই দেশের ধনীদেরও তাই (ভগবান্ যাহাদের বন্ধু) তাহাদেরই অনাদর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কেন না, উহাতে ভগবানেরই অনাদর করা হয়।

---

* বিশ্ব প্রকৃতিই এই প্রকার ছিন্নমস্তারূপিণী। উদ্ভিদ্ মানবের ভোজ্য, স্ত্রী পুরুষের ভোগ্য ইত্যাদি। বিশ্ব-ব্যাপিয়া এই ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ। প্রকৃতির এই যে রাক্ষসী প্রবৃত্তি, ডারউইনের মতে, জীবের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু ভারতীয় ঋষিরা বলেন, জীব স্বরূপতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা, কামনা বাসনার অতীত, প্রকৃতির বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত সে, ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ তাহার কাহারও সহিত নাই। সে স্বয়ংই ভূমা-স্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতির মায়ায় অন্ধ হইয়া সে তাহার এই আত্মস্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয় না। তাই তাঁহার এই রাক্ষসী প্রবৃত্তি। প্রকৃতিকে জয় করিবে সে, ইহাই স্রষ্টার অভিপ্রায়। সুতরাং এই যে ভোক্তৃ ভোগ্য সম্বন্ধ, ইহা তাহার অবশ্য পরিত্যজ্য। ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্য এইখানেই। একের লক্ষ্য ভুক্তি ও ভোগ, অন্যের লক্ষ্য মুক্তি ও ত্যাগ।

† "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন," ডারউইনের এই নীতির মূল্য অধিক

পক্ষান্তরে, দরিদ্রও যদি ত্যাগ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়, অন্ততঃ সেও যদি ধন লোভ ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে ইন্ধনের অভাবে ধনীর ধনাকাঙ্ক্ষারূপ অগ্নিও কালক্রমে আপনাআপনিই নিবিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সন্ন্যাসীও দরিদ্র, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সংসারীর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত নহেন। সংসারী অধিক ভোগ করিয়া যে পাপ অর্জ্জন করেন, উহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই সন্ন্যাসীরও তদনুযায়ী অধিক ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয়, সংসারী অধিক ভোগী হইয়া পড়েন বলিয়া যে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে অসমর্থ হন, তাঁহার পরিত্যক্ত সেই সকল অসম্পন্ন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার জন্যই সন্ন্যাসীকেও তদনুপাতে অধিক ত্যাগী হইতে হয়। তবে, সন্ন্যাসী স্বেচ্ছায় দরিদ্র, দারিদ্র্য তাঁহার নিকটে ব্রত স্বরূপ। তাই, সংসারীর প্রতি তাঁহার বৈষম্য বুদ্ধির উদয় হয় না। এবং এই জন্যই

নহে। জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমেরই জয় হয়, এ কথা না হয় সত্য, কিন্তু কে যোগ্য কে অযোগ্য, উদর ও মস্তকের মধ্যে কে বড় কে ছোট, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। মানব যোগ্যতর, তাই উদ্ভিদ তাহার খাদ্য। কিন্তু তাই বলিয়া উদ্ভিদ রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করা তাহার কর্ত্তব্য হয় না, বরং যেহেতু উদ্ভিদ তাহার খাদ্য, সেই হেতু উদ্ভিদ বংশের যাহাতে উন্নতি হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করাই সঙ্গত। কেন না, উদ্ভিদ বংশের লোপ হইলে মানব সমাজেরও আসন্নকাল উপস্থিত হয়। সুতরাং যোগ্যের কর্ত্তব্য অযোগ্যকে বাঁচাইয়া রাখা,—তাহার নিজেরই স্বার্থের জন্য। ডারউইনের সংকীর্ণ স্বার্থ দৃষ্টি, বৈষম্য বুদ্ধি, ভূমাজ্ঞান রহিত ভোগবাদী তিনি। তাই তাঁহার এই প্রকার অনুদার মত। ভ্রমাত্মক না হইলেও তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যে মারাত্মক, তাহা নিঃসন্দেহ। ফলতঃ, কে যোগ্য কে অযোগ্য, এ প্রকার প্রশ্নের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই। "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন"-নীতি বস্তুতঃ কিন্তু প্রবলের স্বার্থসাধনের কৌশলমাত্র। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদই শুধু মানবের ভোজ্য নহে, মানবও উদ্ভিদেরই ভোজ্য, যেহেতু মানব উদ্ভিদের খাদ্য কার্ব্বণ (Carbon) যোগায়। তবে, উদ্ভিদ মানবের খাদ্য, ইহার যে প্রকার অর্থ, মানব উদ্ভিদের খাদ্য, ইহার অর্থ সে প্রকার নহে। এই জন্যই, সাধারণ হিসাবে, উদ্ভিদ মানবের খাদ্য, এইরূপ বলা হয়। বস্তুতঃ কিন্তু উভয়েই উভয়েরই ভোক্তা ও ভোগ্য, উহাদের মধ্যে ছোট বড় নাই। যাহা Patient তাহাই আবার Agent, তবে Agentএর Positive power এবং Patientএর

তিনি হন সংসারীরও গুরু।* ধনী যাহাই করুন, অন্ততঃ দরিদ্রেরও মনোভাব যদি এই প্রকার হয়, তাহা হইলেও আর ধনিদরিদ্র বৈষম্য তাদৃশ প্রবল হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দরিদ্রের মনোভাব বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে সে প্রকার হয় না। ধনী দরিদ্রের ধন আত্মসাৎ করিয়াই ধনবান হয়, অথবা ধনীর আছে, দরিদ্রের নাই, অতএব ধনী দরিদ্রের সাহায্য করিতে বাধ্য, এই প্রকার চিন্তা করত সে ধনীর প্রতি বিদ্বেষ-

Negative power, এই মাত্রই যাহা কিছু পার্থক্য ; নতুবা উভয়েই এক। সুতরাং যোগ্য অযোগ্য বলিয়া বিশেষ কোনও কথা নাই।

আকাশ হইতে পৃথিবীর, পৃথিবী হইতে উদ্ভিদের, উদ্ভিদ হইতে পশুর, পশু হইতে মানবের, মানব হইতে দেবতার সৃষ্টি। আকাশ তাই পৃথিবীর, পৃথিবী উদ্ভিদের, উদ্ভিদ পশুর, পশু আবার মানবের, মানব আবার দেবতার ভোগ্য। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, ভোগ্যের শক্তিই অধিক, ভোক্তার স্রষ্টা, সেই স্বয়ং। অতএব, অগ্রে ভোজ্য, পরে ভোক্তা, অগ্রে জননী, পরে সন্তান, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং যোগ্যের নিজেরই যদি বর্ত্তিয়া থাকিতে হয়, তবে তথাকথিত অযোগ্যের যাহাতে অধিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করাই তাহার অধিক কর্ত্তব্য। ফলতঃ, ডারউইন যাহাকে অযোগ্য বলেন, বস্তুতঃ কিন্তু সেই সমধিক যোগ্য। এবং এই সিদ্ধান্তই মানবতার অনুকূল।

সিংহ খায় মেষের রক্ত, সেজন্য উহার পাপ হয় না। কিন্তু মনুষ্য যখন অন্যের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করে, তখন সুস্থ মানব মাত্রেরই মনে করুণার উদ্রেক হয়। মানব পশু হইতে উন্নত এইখানেই। করুণা আত্মার ধর্ম্ম, যাহা একমাত্র মানবেরই আছে কিন্তু পশুর নাই। পক্ষান্তরে ক্ষুধা কিন্তু দেহেরই ধর্ম্ম, যাহা পশুর নিজস্ব এবং সর্ব্বস্ব, অথচ যাহা মানব কিন্তু আত্মিক ধর্ম্ম বলে জয় করিতেও সমর্থ হয়। এবং এইরূপ হওয়াই তাহার সুস্থতার পরিচায়ক। ক্রমঃ-বিকাশবাদ যদি সত্য হয়, পশু হইতে মানব উন্নত, এ কথা যদি মানিতে হয়, তবে মানবের পশু না হইয়া দেবতা হইবার জন্য চেষ্টা করাই সঙ্গত এবং তাহা হইলে পশূচিত দেহধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া দেবোচিত আত্মিক ধর্ম্মের অনুশীলন করাই তাহার যথার্থ কর্ত্তব্য। অতএব, যোগ্যের অযোগ্যকে ভোগ্য মনে করা অন্যায়।

* প্রাচীন ভারতে দারিদ্র্য এই জন্যই সম্মানের বিষয় ছিল কাঞ্চন-কৌলিন্য সে সময়ে অজ্ঞাত ছিল।

ভাবাপন্ন হয়।* ফলে, ধনীর নিকট হইতে তাহার যাহা কিছু সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়! অতএব, এ প্রকার চিন্তা করত ধনীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া, ধনী কেন ধনবান হয়, ধন অর্জ্জন ও রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে কত দুঃখ, কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, এই সকল কথা সে যদি ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে আর তাহার ক্ষোভের কোন কারণই থাকে না। আবার, ধনী দরিদ্রের সাহায্য করে না বলিয়া অভিযোগ করিবার পূর্ব্বেও তাহার ভাবিয়া দেখা উচিত, দরিদ্রই যদি দরিদ্রের দুঃখ না বোঝে, তাহা হইলে ধনী তাহা না বুঝিলে তাহাকে দোষী করা কতদূর সঙ্গত। ফলতঃ, নিজের দারিদ্র্যের জন্য ধনীকে দোষী না করিয়া নিজের অক্ষমতার বিষয় স্মরণপূর্ব্বক উহারই প্রতীকার সাধনে যত্নপর হওয়াই মনুষ্যোচিত কার্য্য। ইহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অধিক, অথচ ইহাতে ধনীর সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু হায়! ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই এক্ষণে ভোগদৃষ্টি। মামাও কাণা, ভাগ্নেও চোখে দেখে না। ধনীর থাকিয়াও দারিদ্র্য, দরিদ্রের না থাকিয়াও দারিদ্র্য। ফলতঃ ভোগ্য পদার্থের পরিমাণের দ্বারা, কে ভোগী, কে ত্যাগী, তাহা নির্ণীত হয় না। স্বভাব যাহার ত্যাগপ্রবণ সে না থাকিলেও ত্যাগীই থাকিয়া যায়। অন্যের ভোগ্য বস্তুর দিকে ফিরিয়াও চাহে না। আবার, স্বভাব যাহার ভোগপ্রবণ, তাহার যতই থাকুক, কাঙলামী তাহার কদাপি ঘুচে না। ধনীর দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়, উহারই ফলে দরিদ্রের দৃষ্টিও সংকীর্ণ হইয়া যায়, সেও আত্মস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ধনীর দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ববৎ হইয়া দাঁড়ায়। ধনী বিদ্বেষবশতঃ যে প্রকার মুখভঙ্গী করে, সেও তদুত্তরে তদনুরূপ মুখবিকৃতি প্রদর্শন করায়। ধনী অত্যাচারী হইয়াছে বলিয়া সেও অত্যাচারী হয়। ফলে, বিরোধ আরও বাড়িয়া যায়। ফলতঃ, হিংসারদ্বারা হিংসারনিবৃত্তি হয় না, হয় প্রেমের দ্বারা; অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার হয় না, হয়

* সমাজের এই প্রকার চিন্তা করিবার অধিকার থাকিলেও, দরিদ্রের নাই। যাহার যাহাতে অধিকার, তাহার তাহাই করা কর্ত্তব্য। অন্যথা কাহারই শুভ হয় না।

ন্যায়ের দ্বারা, কার্য্যক্ষেত্রে একথা কিন্তু দরিদ্রও ভুলিয়া যায়। * * * রাবণ কংস প্রভৃতি অত্যাচারীরা বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয়েরই অবতার। অতএব, হোক শত্রুভাবে, তথাপি বস্তুতঃ কিন্তু তাহারা ভগবানেরই ভক্ত, সুতরাং তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফল সর্ব্বফলদাতা ভগবান স্বয়ংই দিবেন,—পূর্ব্বে এদেশের লোকের মনে এই প্রকার বিশ্বাস * ছিল। এই প্রকার বিশ্বাস থাকিলে দুষ্টের অত্যাচার উপেক্ষা করা সহজসাধ্য হয়। বস্তুতঃও, 'যে সয়, সেই রয়, যে না সয়, সেই নাশ হয়', এই মহাজনবাক্য অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। ধনীকে ছাড়িয়া দরিদ্রকেই বিশেষ করিয়া এতকথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, দরিদ্র ভোগ্য,--ডারউইন্ যাহাই বলুন, প্রকৃত শক্তিমান কিন্তু সেই। ভোগ্য যে, প্রকৃতি তাহাকেই অধিক শক্তিদান করিয়া থাকেন, ভোক্তার অত্যাচার সহ্য করিবার জন্য—তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্য। God is always with the oppressed—এ কথার তাৎপর্য্যও ইহাই। এই জন্যই, দরিদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য—ধনীকে অন্ততঃ কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করা। গান্ধির অহিংস-অসহযোগের মূলনীতিও ইহাই। দরিদ্রেরা যে দুঃখ ভোগ করে, তাহার কারণ স্বয়ং তাহারাই। জগতে ধনহীনের সংখ্যাই অধিক, ধনী মুষ্টিমেয় মাত্র। তবে, ধনীরা যতই ভোগী হউক, নির্ধনদের ভোগাকাঙ্ক্ষা বস্তুতঃ কিন্তু আরও অধিক। "যে ছেলে যত খায়, সে ছেলে তত চায়" ধনীদের সম্বন্ধে একথা সত্য হইলেও, "যার ঘরে যত নাই, তার ঘরে তত খাই-খাই"

* এই প্রকার বিশ্বাসই ধর্ম্মবিজ্ঞানসম্মত, কেন না, ভালমন্দ দুয়েরই কারণ ভগবান, লীলার পুষ্টিসাধন জন্য ভালমন্দ দুয়েরই প্রয়োজন। একমেবাদ্বিতীয়ম্—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর (Satan) কল্পনা করা অযৌক্তিক। এইজন্যই পুরাণ বলেন, হরি ও হিরণ্য, (নৃসিংহ ও হিরণ্যকশিপু) রাম ও রাবণ, কৃষ্ণ ও কংস, উভয়েরই উৎপত্তিস্থান "বৈকুণ্ঠ"। মহাপুরুষেরাও তাই হেয়োপাদেয়তা বুদ্ধি রহিত হইবারই উপদেশ দিয়া থাকেন। ফলতঃ, ভাল ও মন্দ একই সত্যের দুই দিক। আবার, এই প্রকার ধারণাও আমাদের স্বার্থবোধ হইতেই উৎপন্ন। কেন না, যাহা আমাদের স্বার্থের অনুকূল, তাহাই আমরা ভাল বলিয়া মনে করি, এবং তদ্ভিন্ন যাহা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূল, তাহাই আমাদের মন্দ বলিয়া—অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়।

দরিদ্রদের সম্বন্ধে একথাও আবার ততোধিক সত্য। তাহাদের ভোগ্য বস্তুর অসদ্ভাব, তাই তাহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা আরও অধিক প্রবল, এবং এইহেতুই, তাহারা ধনীদের পদলেহনে প্রবৃত্ত হয়। ফলে, তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে সমর্থ হয় না। ধনীদেরও তাই, তাহাদের উপর আধিপত্য করিবার সুবিধা হয়। তাহাদিগকেও তাই অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। অতএব, সংঘবদ্ধ হইবার অন্তরায় যে ভোগাকাঙ্ক্ষা, তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতঃ * ধনীদের সহিত বিরোধ করিবার জন্য নহে, আপনারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য,†—তাহারা যদি মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্যও অতি সহজেই সিদ্ধ হয়, অথচ ধনীদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষও উপস্থিত হয় না।

* শঙ্কর বলেন, মানব সংঘবদ্ধ হয় স্বার্থের জন্য, সুতরাং সংঘবদ্ধ হইও না। চৈতন্য আবার বলেন, মানব সংঘবদ্ধ হইতে পারে না স্বার্থের জন্য, সুতরাং স্বার্থত্যাগ কর, সংঘ আপনিই গড়িয়া উঠিবে। ক্ষেত্র বিশেষে উভয় মতেরই যে সার্থকতা আছে, তাহা কদাপি অস্বীকার করা যায় না। তবে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, নিজেদের বেলায় নিঃস্বার্থ হইব, অথচ অন্যের বেলায় স্বার্থপর হইব, প্রতীচ্য জগতের সংঘবদ্ধ হইবার এই যে রীতি, ইহা সাধুজন গর্হিত নীতি। এই নীতির দ্বারা প্রকৃত সংঘশক্তি অর্জ্জন করা যায় না। পরকে যে হিংসা করে, সে আপনার জনকেও যথার্থ ভালবাসিতে পারে না, একথা ধ্রুবসত্য। বর্ত্তমান প্রতীচ্য জগতের কর্ত্তব্য, রেমেঁা রোঁলা অথবা শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা এবং ভারতের কর্ত্তব্য, চৈতন্যের শিষ্য হওয়া।

† গান্ধির এই আন্দোলনের নাম Non-violent Non-co-operation against the British Government না বলিয়া Co-operation amongst the Indians এইরূপ বলাই সঙ্গত। তাহা হইলে উহাতে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বিন্দুমাত্রও প্রকাশিত হয় না, সুতরাং Non-violent শব্দটীরও আর প্রয়োজন হয় না। ধনী ও দরিদ্র, প্রবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে যাহাতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব না আইসে অথচ দরিদ্র এবং দুর্ব্বলের দুঃখও যাহাতে দূরীভূত হয়, সেই জন্যই বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণবাদের প্রতিষ্ঠান—দরিদ্রকে নারায়ণ বলিয়া ঘোষণা করিবার ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব, বিবেকানন্দের policy অধিকতর উচ্চাঙ্গের।

গান্ধির অসহযোগ মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই। অধিকদিনের কথা নহে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও, এদেশের দরিদ্রেরা ধনের আদর জানিত না। অল্পে তুষ্ট ছিল তাহারা। তাহারা তাই ধনাদেরও অর্থের মাহাত্ম্য বুঝিতে দেয় নাই এবং এই কারণেই ধনারাও তখন অর্থ উপার্জ্জন করতঃ সমাজের হিতার্থে তাহা অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে তখন শান্তি ছিল। ফলতঃ, অনর্থকর এই ধনবৈষম্য নিবারণ করিতে হইলে পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থলালসা—ধনী ও দরিদ্র, উভয়েরই। আবার দরিদ্রের হিতৈষীদেরও এক্ষেত্রে ভাবিয়া দেখিবার বিষয় যথেষ্ট বর্ত্তমান। "দরিদ্রান্ ভর," এ কথা শুনিতে যতই ভাল হউক, কার্য্যক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা কিন্তু বড় অধিক নহে। কেন না, সমাজের কেহই যদি ধনসঞ্চয় না করে, তাহা হইলে আর ধনবৈষম্য উপস্থিত হয় না, কেহ ধনী হইবার ফলে, সমাজে ধনভাণ্ডার বস্তুতঃ কিন্তু বর্দ্ধিত হয় না। সমাজের প্রকৃত ধনসম্পত্তি যাহা তাহা চিরদিন একই থাকিয়া যায়। তবে যে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র হয়, তাহা শুধু অর্থের হাতফিরি হইবার ফলে—'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ে বলিয়া। ধনের এই প্রকার অসমবিভাগ যদি না হয়, তাহা হইলে আর ধনীরও সৃষ্টি হয় না, দরিদ্রেরও সৃষ্টি হয় না। সুতরাং দরিদ্রের উপকার করিবারও আর প্রয়োজন হয় না। অতএব, "দরিদ্রান্ ভর" সমাজের এই যে ব্যবস্থা, ইহা যেন 'জুতা মারিয়া গরুদান' অথবা 'সাপ হইয়া কামড়াইয়া ওঝা হইয়া ঝাড়রই' দৃষ্টান্ত। সমাজের এই Double dealing অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এই জন্যই, ধনিদরিদ্র সমস্যার সমাধান যদি করিতে হয়, তবে তাহাই করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ধনী ও নির্ধন ইত্যাকার বৈষম্যের সৃষ্টি না হয়। ঔষধ দিতে হইলে রোগের গোড়া ধরিয়া ঔষধ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু নির্ব্বোধ হিতৈষীরা এ কথার গভীর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া দরিদ্রেরই উপকার-সাধনে প্রবৃত্ত হন। দরিদ্রও যাঁহার, ধনীও তাঁহারই, উভয়েই সমাজের—তথা বিশ্বের,* এইহেতু উপকার

---

* এই জন্যই, রবীন্দ্রনাথ গান্ধির আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। তবে, মহাত্মাজীরও এই আন্দোলনের কুফল নিবারণের জন্য

করিতে হইলে, ধনি-দরিদ্র উভয়েরই, সমস্ত সমাজেরই—তথা সমগ্র বিশ্বেরই, যাহাতে উপকার হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা না করিয়া শুধু দরিদ্রেরই উপকার সাধনে যদি প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে উহাতে শুধু যে ধনীরই উপকার করা হয়, তাহা নহে, দরিদ্রেরও যথার্থ উপকার উহাতে হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসাহাজি

স্বদেশ-প্রেম

১

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলেন স্বদেশ হিতৈষী হইতে গেলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। "প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা আন্তরিকতা ..আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র; কিন্তু হৃদয়-দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে, জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ! হে ভাবী স্বদেশ হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটী কোটী দেবঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে কোটী কোটী লোক অনাহারে মরিতেছে, এবং কোটী কোটী ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অৰ্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিতেছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ, এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা তোমাদের রক্তের

চেষ্টার ত্রুটি নাই। মহাত্মাজীর মাহাত্ম্য এইখানেই ডি, ভেলেরা অথবা লেলিনের সহিত গান্ধির প্রভেদ বিস্তর। একজন ভারতের অন্যজন প্রতীচ্যজগতের তাই এই পার্থক্য। ফলতঃ রবীন্দ্রনাথকে শঙ্কর এবং গান্ধিকে চৈতন্যের শিষ্য বলা যাইতে পারে।

সহিত মিশিয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে, এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম, যশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয় সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশ হিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।"

"মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দ্দশা প্রতীকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবনমৃত অবস্থা অপনোদনের জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কোন সান্ত্বনা বাক্য শুনাইতে পার কি? কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্ব্বতপ্রায় বিঘ্ন-বাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রীপুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধনমান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্ত্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, "নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা যুগান্তরেই হউক, তিনিই ধীর যিনি সত্য হইতে একবিন্দু বিচলিত না হন।" সেইরূপ নিজপথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি দৃঢ়ভাবে তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এই দৃঢ়তা আছে? তোমাদের যদি এই তিনটি জিনিস থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য্যসাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদ পত্রে লিখিবার বা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃধারণ করিবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশহিতৈষিতার যে মাপ কাঠির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমাদের যুবকগণের নিজ নিজ হৃদয় পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত, তাহারা স্বদেশহিতৈষী হইবার যোগ্য কিনা। আমাদের যুবকগণ পরোপকারী, দয়াদ্রচিত্ত, ত্যাগী, সাহসী সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যতটা নির্ম্মল স্বদেশপ্রেম আমরা পাইতে আশা করি ততটা নির্ম্মলপ্রেম তাহাদের মধ্যে দেখি না। তাহারা ভাব-প্রবণ, পরের দুঃখে কাতর হইয়া তাহারা অনেক অর্থ দান করিয়া ফেলেন কিন্তু দুঃখীর দুঃখ স্থায়িভাবে দুর করিতে চেষ্টা করেন না। আমাদের যুবকগণ অভিনয় করিতে ভালবাসেন, তাহারা স্বদেশ-সেবাতেও সেই অভিনয়ের ভাব আনিয়া ফেলেন। বঙ্গীয় যুবকগণের স্বদেশপ্রেমের অভিনয়গুলি, তাহাদের সংঘবদ্ধভাবে প্রকাশ্য সভায় আইন অমান্য প্রভৃতি দেখিতে বেশ, মনোমোহকর এবং সাহসেরও স্বার্থত্যাগের পরিচায়ক বটে! ইহাদের কার্য্য দেখিলে আনন্দ হয়, ইহাদের কথা পড়িলে ইহাদিগকে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু নিরন্নকে অন্ন দিতে, বস্ত্র-হীনের বস্ত্র যোগাইতে, অজ্ঞকে বিদ্যাদান করিতে ইহারা অক্ষম। আমাদের যুবকগণের অভিনয়গুলি আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে গর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করে সত্য কিন্তু উহা কোনও প্রকার স্থায়িকার্য্য করিতে অপারগ। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত নীরবে কোন কার্য্যকরিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। যে কার্য্যে 'বাহবা' নাই, উত্তেজনা নাই, সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই, সে কার্য্যে রত হওয়া তাহাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এমন কি তাহাদের স্বদেশপ্রেমও বিদ্বেষভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র। বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র শাসন প্রণালীর প্রতি বিজাতীয় বিরক্তি ও বিদ্বেষভাব তাহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান। বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়গণ হইতেই এই বিদ্বেষভাব যুবকগণে সংক্রামিত হইয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরের অধিকাল যাবৎ আমলাতন্ত্র শাসন প্রণালীর ভুল, কঠোরতা, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষাবলীর তীব্র সমালোচনা করিতে কংগ্রেস আমাদিগকে শিখাইতেছে। আমরা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কংগ্রেস সেবীদের কাছে জানিয়াছি আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রকার অবনতির মূলকারণ আমলাতন্ত্র শাসন-

প্রণালী। কংগ্রেস-সাহিত্য পড়িলেই আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। কংগ্রেস কর্ম্মিগণই ছিলেন স্বদেশসেবা বিষয়ে আমাদের আদর্শ, তাঁহারা কংগ্রেস মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দ্বারা ও নানা প্রকার পুস্তক লিখিয়া আমাদিগকে ইহাই বুঝাইতেন যে বর্ত্তমান শাসন প্রণালীই আমাদের দেশের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, ইহার অতিরিক্ত কার্য্যে তাঁহারা কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন নাই। শাসক সম্প্রদায়ের সাহায্য বর্জ্জিত হইয়া দেশকে উন্নত করিবার পথ তাঁহারা দেখাইয়া দিতেন না। কংগ্রেস কর্ম্মীদের হৃদয়ে বিরাজিত ইংরেজ বিদ্বেষ নানা প্রকারে প্রকাশিত হইত ; যদিও মনের ভাব গোপন করিয়া কথা বলাই তখনকার রীতি ছিল, সেই বিদ্বেষভাব যুবকগণের প্রাণে মুদ্রিত হইয়া পড়িত। সেই সব যুবক এখন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়। এই সকল বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় কংগ্রেস কর্ম্মিগণেরই পদানুসরণ করিয়া ঘাটে পথে বৈঠকখানায় অন্দরমহলে এবং সভাসমিতিতে ইংরেজদের ও তাহাদের পরিচালিত শাসন-যন্ত্রের যুবকগণ তীব্র সমালোচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়গণের এই বিদ্বেষভাব ক্রমশঃ যুবকগণে সংক্রামিত হইয়াছে সুতরাং রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিতে অবতীর্ণ হইলে আমাদিগের প্রাণে সেই অন্তর্নিহিত বিদ্বেষভাবই যে প্রথমতঃ জাগরিত হইবে ইহাইত স্বাভাবিক !

প্রেম প্রকাশিত হয় পরসেবায়, গঠনে। বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয় পরপীড়নে, অত্যাচারে, ভাঙ্গায়। বৎসর বৎসর কংগ্রেস দেশে ইংরেজ-বিদ্বেষ ছড়াইতে লাগিলেন। দেশের হৃদয়ে বিদ্বেষাগ্নি সঞ্চিত হইতে লাগিল। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গে তাহা সর্ব্বপ্রথম ভীষণভাবে প্রকাশিত হয়। গুপ্তসমিতি, বোমা, ডাকাতি অত্যাচার, নিপীড়ন ইহাতে প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় বিদ্বেষ ভাবের। এই সব কার্য্যের মূল কোথায় বাহির করিতে হইলে কংগ্রেস সাহিত্য-পাঠ করা আবশ্যক। বোমা, গুপ্তসমিতি প্রভৃতি দেখিয়া প্রাচীন কংগ্রেস নেতৃগণ শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন না এবং এখনও বোঝেন নাই যে উহা তাঁহাদেরই রোপিত বৃক্ষের বিষময় ফল ! তাঁহাদেরই লিখিত পুস্তক-পাঠের ফলে এতবড় একটা স্বদেশী আন্দোলন কিছু গঠন না করিয়া

ডাকাতি ও বোমানিক্ষেপে নিঃশেষ হইয়া গেল। তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্য ও সঙ্গিগণকে ত্যাগ করিয়া নীচবৃত্তি অবলম্বনে অতীব নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কাজের ফল এখনও ফলিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে একদিকে প্রাচীনগণের বিদ্বেষভাবের মন্ত্র, অপরদিকে মহাত্মা গান্ধীর প্রেমের মন্ত্র, এই দুই মন্ত্রে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীনগণ কাজ করিয়াছেন ৩০ বৎসর,—বিদ্বেষভাব দেশের শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। মহাত্মার সকল চেষ্টা যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। তাই দেখি চৌরিচৌরাতে মহাত্মা হতশ্রী,—পুরাতন দল জয়ী। বঙ্গদেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে এখনও বিদ্বেষভাবই প্রবল। তজ্জন্যই আমরা আইন অমান্য ভালবাসি বিদ্বেষভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সব কাজ করা স্বাভাবিক সেই সব কার্য্যেই বঙ্গীয় যুবকগণের আমোদ, উৎসাহ, সাহসিকতা ও স্বার্থশূন্যতা প্রকাশিত হয়। প্রেমমূলক কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ কম। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রেমের বার্ত্তা লইয়া এদেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই দেশ বিদ্বেষভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মার গুণে সেই বিদ্বেষভাই দূরীভূত হইতেছে বটে, কিন্তু এতদিনের ঘনীভূত দৃঢ়মূল একটা ভাব কি সহজেই দূর হইতে পারে? যুবকগণের হৃদয়ে এখনও ইংরেজ বিদ্বেষভাব প্রবল। তাহাদের হৃদয়ে প্রেম খুব কম। সেইজন্য বরদলই নির্দ্দেশিত গঠন কার্য্যে তাহাদেব মন আকৃষ্ট হইতেছে না। হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত না হইলে এই গঠন কার্য্য আরম্ভ হইবে না। বিদ্বেষভাবকে প্রেম বলিয়া ভুল করিয়া বসিলে দেশের অমঙ্গল। যতশীঘ্র সম্ভব হৃদয় হইতে অহিংসার ভাব সমূলে উৎপাটিত করিয়া সেই স্থানে প্রেমকে স্থান দিতে হইবে। নতুবা আমাদের যুবকগণের স্বার্থত্যাগ, সাহসিকতা, জেলে যাওয়া সবই বৃথা। হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হইলে তাহাদের "মুখ এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে।" তাহাদের মুখে আমরা এই জ্যোতিঃ দেখিতে চাই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন স্বদেশহিতৈষী হইতে হইলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন—হৃদয়বত্তা, কৃতকর্ম্মতা, ও দৃঢ়তা। হৃদয়বত্তার সঙ্গে সঙ্গেই

কৃতকর্ম্মতা ও দৃঢ়তা আপনি আসিয়া পড়ে যে প্রেমে মানুষকে পাগল করিয়া ফেলে, সেই প্রেম তাহাকে কর্ম্মকুশল ও দৃঢ় করিবেই। যুবক-গণের হৃদয়ে প্রেম যদি সঞ্চারিত হয়, তবে স্বদেশহিতৈষণার অন্যান্য গুণের অধিকারী তাহারা আপনা আপনিই হইবে। সর্ব্বপ্রধান জিনিসই প্রেম। আবার সেবাই প্রেমের ইন্ধন। যদি যুবকগণের প্রাণে স্বদেশ প্রেম জাগাইতে হয়, তবে তাহাদিগকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত কর। দেশের সেবা করিতে করিতে তাহারা দেশকে ভালবাসিতে শিখিবে, সেবা করিতে করিতে তাহারা বুদ্ধি অর্জ্জন করিবে এবং কার্য্যকুশল হইবে। সেবা করিতে করিতে তাহারা সংযমী হইবে এবং চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ করিবে। মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট গঠন কার্য্য তখন একমাত্র কাজ। সেবার ভাবে এই কাজ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান ভারতের দুই মহাপুরুষ ভারতীয় যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড!" একজন স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় জন মহাত্মা গান্ধী। একজন আদর্শ-সন্ন্যাসী, অপরজন আদর্শগৃহী, একজনের জন্ম পূর্ব্বভারতে অপর জনের জন্ম পশ্চিম ভারতে। উভয়ে একই বাণী ভারতে প্রচার করিতেছেন। সন্ন্যাসী বলিতেছেন, "যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা যায়, যদি এমন দেশ থাকে যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া, সমগ্র জগৎকে বারাংবার সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন। এখান হইতেই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোক-সর্ব্বস্ব-জড়-সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয় দহনকারিজড়বাদরূপ অনল নির্ব্বান করিতে যে অমৃত সলিলের প্রয়োজন তাহা এইখানেই বর্ত্তমান—বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন ভারতই জগতকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।"

"এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট জগত যতদূর ঋণী আর কোনও জাতির নিকট তত নহে। জগতের অন্যান্য স্থানে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে সত্য। প্রাচীন কালে ও বর্ত্তমান কালে অনেক শক্তিশালী বড় বড় জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাব বাহির হইয়াছে সত্য; প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব একজাতি হইতে অপর জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে সত্য কিন্তু বন্ধুগণ ইহাও দেখিবেন ঐ সকল সত্য প্রচার রণভেরীর নির্ঘোষে ও রণ-সাজে সজ্জিত গর্ব্বিত সেনাকুলের পদ বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল—রক্ত রঞ্জিত না করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারীর অজস্র রুধির স্রোত না বহাইয়া, কোন জাতিই অপর জাতিকে নূতনভাব প্রদান করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। * * * * প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভাবের পর ভাব তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসূত হইয়াছে। কিন্তু উহার প্রত্যেকটিই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্ব্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরাই কখন অপর জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা জয় করি নাই। সেই শুভ কর্ম্ম ফলেই আমরা এখনও জীবিত গ্রীসদেশের গৌরব রবি আজ অস্তমিত। রোমের নামে আজ ধরা আর কাঁপে না—কিন্তু ভারত এবং ভারতীয় সভ্যতা আজও জীবিত।"

"প্রত্যেক জাতিরই একটা না একটা যেন বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জীবনোদ্দেশ্য নহে—কখন ছিল না। কখন হইবেও না। তবে আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই, সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টীভূত শক্তির বন্যায় জগৎকে প্লাবিত করা। যখনই পারসিক, গ্রীস, রোম, আরব বা ইংরেজেরা তাঁহাদের অজেয় বাহিনিযোগে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত

করিয়াছে, তখনই ভারতের দর্শন ও আধ্যাত্মিক বিদ্যা এই সকল নূতন পথের মধ্য দিয়া জগতের বিভিন্ন জাতির শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তি প্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে। আধ্যাত্মিক আলোকই জগৎকে ভারতের দান।”

“রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে। ধর্ম্মই কেবল—ধর্ম্মই যথার্থ ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ।”

“আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ অনেক ঘুরিয়াছি। জগতের সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ, রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপ, কাহারও কাহারও আবার মানসিক উন্নতি বিধান, কাহারও বা অন্য কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম্ম, একমাত্র ধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।”

“যদি তোমরা ধর্ম্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্ম্মকেই জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।” * * * * “ভারতে সমাজসংস্কার প্রচার করিতে হইলে দেখাইতে হইবে সেই নূতন সামাজিক প্রথাদ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার কি কি বিশেষ সাহায্য হইবে। রাজনীতি প্রচার করিতে হইলেও দেখাইতে হইবে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি কতদূর পরিমাণে অধিক সিদ্ধ হইবে।”

“প্রত্যেক মানব এই জগতে আপন আপন পথ বাছিয়া লয়। প্রত্যেক জাতিও তদ্রূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্ব্বে আপনাদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতেই হইবে। আর আমাদের নির্ব্বাচনকে বিশেষ মন্দ বলিতে পারা যায়না। জড়ের পরিবর্ত্তে চৈতন্য মানুষের পরিবর্ত্তে ঈশ্বর চিন্তা করাকে কি বিশেষ মন্দ

পথ বলা যাইতে পারে? তোমাদের মধ্যে সেই পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশক্তি, এবং ঈশ্বরে ও অবিনাশী আত্মায় দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান। কই, ইহা ত্যাগ কর দেখি? তোমরা কখনই ইহা ত্যাগ করিতে পারনা। তোমরা জড়বাদী হইয়া কিছুদিন জড়বাদের কথা বলিয়া আমায় ধাঁধা লাগাইবার চেষ্টা করিতে পার। কিন্তু তোমাদের স্বভাব জানি। যেই তোমাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব অমনি তোমরা পরম আস্তিক হইবে। স্বভাব বদলাইবে কিরূপে? তোমরা যে ধর্ম্মগত প্রাণ।"

উপরি উদ্ধৃত অংশগুলি পড়িয়া আমরা ইহাই বুঝিতে পাই যে স্বামিজী ধর্ম্মকে মেরুদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াই আমাদিগকে দেশের উন্নতি ······সমস্ত কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেছেন। স্বামিজীর বক্তৃতাবলী ধীরভাবে পাঠ করিলে তাঁহার মত পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় বটে। কিন্তু আমরা তাঁহার উপদেশ বুঝিয়াও বুঝি নাই। আমরা এতদিন বুঝি নাই, রাজনীতি ক্ষেত্রে কিরূপে ধর্ম্মই মেরুদণ্ডরূপে গৃহীত হইবে। স্বামিজী ছিলেন সন্ন্যাসী। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই, কি প্রকারে এই ক্ষেত্রের সকল কার্য্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া করিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা ধর্ম্মকে বাদ দিয়া গুপ্ত সমিতি প্রভৃতির সহায়ে নানাপ্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যদ্বারা দেশের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাতে ফল কি হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। "চালাকিরদ্বারা কোন মহৎকার্য্য সিদ্ধ হয় না।" তখন আমরা ইহা বুঝি নাই, ধর্ম্মসহায়ে সকল কার্য্য করিতে হইবে, এই সত্য যখন স্বামিজী সমগ্রভারতে প্রচার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন গৃহী ধর্ম্মকেই—ভিত্তি করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতেছিলেন। মহাত্মাগান্ধী নানা পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া এই সত্যই নূতনভাবে এবং স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন যে ধর্ম্মই ভারতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। কেমন করিয়া ধর্ম্মকেই মেরুদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে হয় তাহা তিনি নিজ জীবন দ্বারা দেখাইতেছেন। তাই তিনি দক্ষিণ

আফ্রিকা হইতে ভারতে আসিয়া বঙ্গীয়যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "Misguided zeal that resorts to dacoities and assassinations can not be productive of any good. These dacoities and assassinations are absolutely a foreign growth in India. They cannot take root here and cannot be a permanent institution here. The religion of this country, the Hindu religion is abstention from Himsa, that is taking animal life. * * Be fearless, sincere and be guided by the principle of religion. এই বক্তৃতাতেই তিনি বলিয়াছিলেন Politics shou'd not be divorced from religion.

স্বামিজীর কথায় যদি কাহারও অবিশ্বাস বা সন্দেহ বা ধাঁধা জন্মিয়া থাকে তবে সেই অবিশ্বাস বা সন্দেহ বা ধাঁধা মহাত্মা একেবারে দূর করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাত্মা তাঁহার বক্তৃতায় বারবার বলিয়াছেন এবং কার্য্যে দেখাইয়াছেন ধর্ম্মসহায়েই ভারত উঠিবে। অতি প্রাচীন কালে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর এই যুগে মহাত্মা গান্ধী। প্রাচীন স্বদেশসেবিগণ পাশ্চাত্য অনুকরণে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার জন্য কংগ্রেস গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন না ভারতের প্রাণ পাখী কোথায়। দেশের সর্ব্বসাধারণের প্রাণ তাঁহারা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। যেই মুহূর্ত্তে মহাত্মাগান্ধী বলিলেন ধর্ম্মসাহায্যে দেশের উন্নতি করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে নামিতে হইবে। অমনি দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার পদতলে উপনীত, সমগ্রভারত রাজনীতি বুঝিল, মহাত্মার কার্য্যে যোগ দিল। এতদিন মহিলাগণ রাজনীতি বুঝিতেন না —তোতাপাখীর মত পুরুষের ভাষায় রাজনীতিক বুলি আওড়াইতেন মাত্র আর এখন তাঁহারা হইতেছেন অগ্রণী—কেননা, হিন্দু রমণী ধর্ম্মপ্রাণা, যে যুদ্ধে ধর্ম্মবলই প্রধান অস্ত্র সেই যুদ্ধে মহিলারাই প্রধান যোদ্ধা।

স্বামিজী বলিতেছেন "সুদীর্ঘ রজনী প্রভাত প্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসান প্রায় প্রতীত হইয়াছে। * * * অন্ধ যে সে

দেখিতেছেনা, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছেনা যে আমাদের মাতৃভূমি তাঁহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগরিত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না কোন. বহিস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেনা—কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।”

“আবার আমাদিগকে বড় বড় কাজ করিতে হইবে, অদ্ভুতশক্তির বিকাশ দেখাইতে হইবে, অপর জাতিকে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। * * * এখনও আমাদিগকে জগৎকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। এই কারণেই শত শত বর্ষ অত্যাচারে ও প্রায় সহস্র বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিক শাসনে ও পীড়নে এই জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত—কারণ এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্ম্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই। আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও যে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বিদ্যারূপ নির্ঝরিণী বহিতেছে এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়া রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও প্রতিদিন নূতনভাবে সমাজগঠনের চেষ্টায় প্রায় অৰ্দ্ধমৃত হীন দশাপন্ন পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদা করিবে।” ইংরেজ যদি আমাদিগকে রাজনীতি শিখাইতে চাহেন, তবে ধর্ম্মের মধ্য দিয়া আমাদিগকে রাজনীতি শিখাইতে হইবে। আবার ভারত যদি পাশ্চাত্যকে ধর্ম্ম শিখাইতে চাহে তবে রাজনীতির মধ্য দিয়া ধর্ম্ম শিখাইতে হইবে। এতদিন পরে যেন ইংরেজ আমাদের ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন! মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংসা নীতি যদি সফলতা লাভ করে—এবং ইহা সফলতা লাভ করিবেই—তবে ইংরেজ এই সফলতার মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে এবং তখন ইংরেজ আমাদের ধর্ম্ম বুঝিবে এবং পাশ্চাত্যের রাজনীতি-জগতে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা প্রবেশলাভ করিবে। স্বামিজী কি এইরূপে আধ্যাত্মিকতা দানের কথাই তাঁহার বক্তৃতায় বার বার উল্লেখ করেন নাই? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন যে ভারত জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দান করিবে। আর

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতেছি সমগ্র জগৎ মহাত্মা প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে অহিংসা নীতি, প্রেম এবং ভারতের আধ্যাত্মিকতা এবং অসহযোগ আন্দোলন বুঝিতে হইলেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বুঝিতে হইবে। মহাত্মা প্রবর্ত্তিত অহিংসামূলক রাজনীতি পাশ্চাত্যদেশ সমূহে প্রবেশ করিলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ধর্ম্মভাব, ভারতের আধ্যাত্মিকতা তথায় ছড়াইয়া পড়িবে—এইরূপ একটা ভাব বিনিময়ের আভাস কি আমরা চারিদিকে পাইতেছি না? (ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনী রঞ্জন সেন, বি-এ, বি-টি

বড় ও ছোট

বনানীর সে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ দাঁড়িয়ে মাঝে, বনের সেরা,
সবাই তারে লক্ষ্য করে, দীন দুর্ব্বারে পুছে কারা?
পাপীয়ার সে কুহু শুনে কবি লিখে পাতায় পাতা
তারে যে কাক পুষ্ট করে, তার কোথাও নেই বারতা।

রাজপ্রাসাদে বাস করে যে, হাজার পিছু পিছু তার,
ঐ যে যত গরীবগুর্ব্বো কেবা ধারে তাদের ধার?
লক্ষপতি, রক্তচোষা, সবাই তাদের দেয় যে মান;
রক্তচুষে খায় সে যা'দের, তা'র তরে কার কাঁদে প্রাণ?

সোনা সে তো উজ্জল বরণ, বিত্তবানের চিত্তহরা;
রাজারাণী আদরে তায়, রাখে করে মাথার চূড়া।
লোহা সে যে দীনের ধন, গরীব যত্ন করে তার,
লোহায় তাহার জীবন-যাত্রা, লোহাই তাহার অলঙ্কার।

সোনা হ'তে চাইনে ওগো শোভাপেতে মাথার' পরে।
লোহা হ'য়ে চাই থাকিতে দীন ভিখারীর কুটীর দোরে।

—সত্যকাম

সংসার

নবম পরিচ্ছেদ

কিশোরীমোহন বাবুর ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন,—সেখানি যেন অনেকটা দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত। তাহার মধ্যে ভদ্রতাও আছে;—আবার তাহাকে প্রচ্ছন্ন চা'ল-বাজী বলাও চলে। বরপণ সম্বন্ধে তিনি প্রথমাবধিই বলিয়াছিলেন যে, ওতে তাঁহার কোনরূপ আপত্তি বা দাবী নাই। কিন্তু এই পত্রখানি পড়িয়া মনে হয়,—তিনি বিনাপণে ত বিবাহ দিতে রাজীনন‌ই, আবার নিতান্ত সস্তা মূল্যেও পুত্রটি চিরদিনের জন্য দিতে চান না। ইহার কতকগুলি কারণও ছিল। প্রথমতঃ তিনি ঘর হিসাবে খুব উচ্চ; একেবারে সেরা কুলীন। তাহার উপর ছেলেটি ইংরাজি পাশ করা, নিতান্ত কুরূপ নয় এবং ভূসম্পত্তিও সংসার চালাইবার মত বেশ আছে। মোটের উপর চাকুরীর পয়সার ভরসা না করিলেও ক্ষতি নাই। এহেন বরকর্ত্তা কৃষ্ণপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পত্রের ভাষা কিশোরীমোহন বাবুর মত লোকও ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলেন না, এতে বিস্মিত হবার কিছুই নাই। বরপণ সম্বন্ধে তিনি একটা ইঙ্গিত এই দিয়াছেন যে,—"আমার সমান ঘরের এক ভদ্রলোক সাড়ে তিন হাজার পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছেন, আর তাঁর মেয়েটিও পরমা সুন্দরী। কিন্তু আমার ইচ্ছা নাই যে, আপনার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও পূর্ণচন্দ্রের সম্বন্ধ ঠিক করি। আপনি অতি সজ্জন ব্যক্তি; আর মেয়েটিও রূপে গুণে হীনা নয়। তবে কিনা জানেন—একটা লৌকিকতা আছে। ছেলেরও লোকের কাছে একটা গৌরব, আর—আপনারও সেটা জলে পড়িবেনা। সমস্তই কন্যা-জামাতার ভোগেই লাগিবে। তা সেটাকে বরপণও বল্‌তে পারেন, কিংবা যৌতুকও বল্‌তে পারেন।" ইত্যাদি নরম গরম বিবিধ প্রকারের ছন্দোবন্ধে তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

কিশোরীমোহন বাবু পত্রখানি পড়িয়া অতিমাত্র বিরক্তি বোধ করিলেন। একবার মনে হইল পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া,—উত্তর দেওয়াই উচিত যে, আপনার বাড়ীতে মেয়ে দিতে চাই না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, টাকার কথাত আমায় কিছু বলেন নাই। সুতরাং যদি কোন রকমে সম্বন্ধটি স্থির হয়, তবে মেয়ের অন্নকষ্ট হইবে না। তাহা ছাড়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও শিক্ষিত লোকের বাড়াতেই হইবে। বিশেষতঃ তাঁহার শ্বশুরের ইচ্ছা নয় যে কুলীন ছাড়া অন্য কোন ঘরে শান্তির বিবাহ হয়। নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বৈবাহিক মহাশয়ের সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একটা দিন স্থির করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

এদিকে আর একটা বিষয় লইয়া কিশোরীমোহন বাবুর মনে একটা চিন্তা তরঙ্গ বহিতে আরম্ভ করিল। শান্তিকে কোন High স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য নরেনের একান্ত ইচ্ছা। তাঁহার নিজেরও ইচ্ছা ছিল না এমন নহে; কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্যই তাঁহার আপত্তি ছিল। প্রথমতঃ তিনি ভাবিতেন শান্তির মনে তাহার স্বভাব সুলভ কোমলতার মধ্যে তিনি যে ধর্ম্মভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা বোধ হয় নষ্ট হইয়া যাইবে; এবং সে বোধ হয় কোন গৃহস্থের বাড়ীর উপযুক্ত কষ্ট সহিষ্ণুতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না। তাহার পর ইহাও ভাবিয়াছিলেন যে, আরও দুই এক বৎসর তাহার বিবাহ না দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। আর এই দুই এক বৎসর তাহার শিক্ষা-জীবনের একটা মূল্যবান সময়। এই মূল্যবান সময়টুকু যদি সে কেবল ব্যাকরণ মুখস্থ এবং কতকগুলি নূতন শব্দ ও তাহার অর্থ মুখস্থ করিয়াই কাটাইয়া দেয়,—যদি সে প্রকৃত শিক্ষার ভাব গ্রহণ না করিয়া কেবল কতকগুলি বাজে মেকি জিনিস সংগ্রহ করে, তবে কি ফল হইবে? তিনি বুঝিয়াছিলেন, কোন শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে অর্থাৎ উপাধি-ধারীর সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে শান্তির শিক্ষার প্রমাণ স্বরূপ একটা সার্টিফিকেটের দরকার হইতে পারে। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিতে হইলে নরেনের কথাটা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। আবার

পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল,—'যাহারা মেয়ের প্রকৃত গুণ না বুঝিয়া কেবল সার্টিফিকেট দেখিতে চাহিবে, এমন বাড়ীতে শান্তির বিবাহ দেওয়াত আমার পক্ষে সম্ভব নহে ? বরং সে চিরকুমারী হইয়া থাকিবে, কিন্তু অমানুষের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব না। এখন বিবাহের কথা থাক্ ; তাহার শিক্ষার দিকেই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।'

এই দিন সুশীলার সঙ্গে শান্তির মেলা-মেশার মধ্যে একটী বিষয়ের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। শান্তি অপেক্ষা সুশীলা বড়, কিন্তু তাহার মধ্যেও যে বাল-সুলভ চপলতা এবং সারল্য দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। তাহা ছাড়া সে অনেক বিষয়ে যেন শান্তি অপেক্ষা একটু বেশী পরিমাণে জাগ্রত। দেশ বিদেশের খবর কথাবার্ত্তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে শান্তি একটু পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্য ইতিহাস-ভূগোলও শান্তি সুশীলা অপেক্ষা কম পড়ে নাই, তাহা যে ভাষার সাহায্যেই হউক না কেন। কিন্তু তাহা হইলেও সে যেন একটু পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বুঝিলেন, এই টুকুই স্কুলের মেয়েদের পরস্পরের ভাব বিনিময়ের ফল। আদব-কায়দায় সুশীলা শান্তি অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। কিন্তু শান্তির প্রতিভা সে সব স্পর্শ না করিয়াই ক্রমে গভীরতারদিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিশোরীমোহন বাবু ভাবিলেন,—'ইহা প্রকৃত পথ কিনা ? স্কুলে অনেক মেয়ের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া থাকিলেই তাহার প্রতিভা আরও তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে। সে সকল বিষয়েই আরও অনেক পরিমাণে সতর্ক এবং জাগ্রত হইবে। তাহার জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনেক অংশ হয়ত অবস্থানুরূপ শিক্ষা-ক্ষেত্র না পাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাতে ত ক্ষতি অনেক ? যদি আমি মেয়েকে শিক্ষা দিতে চাই তবে তার ঐ সকল বৃত্তির মুখে বাধা না দিয়া তার অনুকূলে শক্তি যোগাইতে হইবে। পরন্তু আরও অনেক অচিন্তিত, অননুভূত নূতন অবস্থার সঙ্গে পরিচিত করিতে হইবে ; তবেই তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি গুলি পূর্ণতারদিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। কিন্তু আরও একটি চিন্তা, যদি সে নিজত্ব হারাইয়া ফেলে ? অবশ্য এই বয়সের মেয়ের আবার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য কিছু না থাকিলেও

তাহার কোমল দুর্ব্বল প্রকৃতি যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রকৃত শিক্ষার মহিমা অবহেলা করিয়া একটা লক্ষ্যহীন পথে ধাবিত হয়, তখন উপায় কি হইবে? যাহা আমি গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা যদি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ধূলায় বিলীন হইয়া যায়, সে দুঃখ মনে বড় আঘাত দিবে? আমার জীবনের একটা নূতন সাধ ত অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে?

এইরূপ নানা চিন্তায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তারপর মনে করিলেন,—'নরেনের প্রস্তাবের অনুকূলে মত দেওয়ার আগে শান্তির হৃদয় আরও একটু পরীক্ষা করা দরকার। অবশ্য আমার দেখা উচিত তাহার অন্তরের গভীরতম অংশেও কোন একটা প্রবল তৃষ্ণা আকুলতা লইয়া জাগিয়া আছে কিনা? এই সঙ্গে তাঁহার মনে স্বামিবিবেকানন্দের একটা অমর বাণী যেন সাড়া দিয়া উঠিল।—"মাথার ভিতর কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রবেশ করাইয়া দেওয়াইলেই মানুষ যদি সারাজীবনে সেই গুলিকে আয়ত্ত না করিতে পারে, তবে উহাকে শিক্ষা বলা যায়না। চিন্তা ধারা গুলিকে এমন ভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে যে প্রকৃত জীবনধারণ, মানুষ ও চরিত্র গঠিত হইতে পারে। তুমি যদি মাত্র পাঁচটা ভাব-ধারাকেও জীবনে প্রতিফলিত করিতে পার, তবে তুমি—যাহারা একটা সমগ্র পুস্তকাগারকে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের অপেক্ষাও বিদ্বান।"

'কিন্তু হায়! আমাদের জীবন-ধারায় কি জিনিস দেখিতে পাই? চরিত্র থাকুক বা না থাকুক, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ থাকুক বা না থাকুক ক্ষতি নাই। পুস্তক মুখস্থ করিয়া সার্টিফিকেট যোগাড় করিতে পারিলেই আমরা বিদ্বান পদবীতে আরোহণ করিতে পারি। না কখনই আমি এমন মেকি জিনিসের জন্য আমার মার অমূল্য সময় নষ্ট করিবনা।' এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়াই কিশোরীমোহনবাবু বৈবাহিক বাড়ী যাত্রা করিলেন।

* * * * *

শান্তির বিবাহের দিন স্থির হওয়ার পর কিশোরীমোহনবাবুর জীবনের আর একটা নূতন পর্ব্বের অভিনয় হইয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির

হওয়ার পর হইতেই শান্তির ভাবান্তর বেশ স্পষ্ট তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে যেন আহার নিদ্রা সব পরিত্যাগ করিয়া বসিল। অথচ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,—'শরীর ভাল নেই' ছাড়া আর বিশেষ কোন উত্তর দিত না। ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি একদিন গৃহিণীকে শান্তির মতামত জানিবার জন্য একটী কৌশল অবলম্বন করিতে বলিলেন।

মা কথায় কথায় শান্তির কাছে বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া ছেলেটির এক আধটু সুখ্যাতিও প্রচ্ছন্নভাবে করিতে লাগিলেন। শান্তি সঙ্গে সঙ্গেই সেস্থান হইতে সরিয়া যাইবার মতলবে একটা অছিলা ধরিয়া রান্না ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু গৃহিণী দেখিলেন বিবাহের কথায় তাহার মুখ যেন নিবিড় বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় ভার হইয়া চোখ দুটিও সজল হইয়া আসিল। মুখে কেবল মাত্র—"যাও! তোমাদের সব বাজে কথা আমার কাছে কেন?" বলিয়াই সরিয়া পড়িল। কিশোরীমোহন বাবু এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"তবে কি শান্তির এ বিবাহে মত নাই? হে ভগবান্! আমায় একি কঠোর পরীক্ষায় ফেল্‌লে?" গৃহিণী বলিলেন,—"সে আবার কি কথা? মা বাবা বিয়ে দেবে তাতে আর মেয়ের মতামত কি? তোমার যেন সব কাজের মধ্যেই একটা নূতন কিছু থাকা চাই। বলি একি স্বয়ম্বর যে মেয়ের মতামত নিয়ে কাজ কর্‌তে হবে? সেই জন্যেই না আমি বলেছিলাম - মেয়ে বড় ক'রে রেখোনা।" কিশোরীমোহন বাবুর বিশাল বক্ষ সজোরে কাঁপাইয়া একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। তিনিও হতাশভাবে বলিলেন,—"তোমরা সব কথা বেশ তলিয়ে বুঝনা। যাকে আমি এতদিন বুকে রেখে মানুষ কর্‌লাম, যার সুখ-দুঃখের কথা ভাব্‌তে আমি নিজেকেই ভুলে বসে থাকি, তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাটুকু না পেলেই আমি কেমন ক'রে তাকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করব?" "ওমা! মাটি! নির্ব্বাসিত আবার কি গো? মেয়ের বিয়ে দেবে শ্বশুরবাড়ী যাবে, তাতে আবার নির্ব্বাসিতের কথা কি আছে? তুমি ঘর বর দেখে বিয়ে দিবে, তারপর ওর অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। তার জন্যে ত আর মা বাবা দায়ী নয়! কই বাপু! আমাদের সময়ে এসব কথা ত শুন্‌তাম না? দিন দিন যত নূতন

আজগুবি কাণ্ড তোমাদের।" কিশোরীমোহন বাবু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ আজগুবি কাণ্ডই বটে। বলি তোমাদের সময় যা দেখনি তাকি এখনও দেখ্‌বেনা? দুনিয়া চিরদিন এক রকম থাকে না। পরিবর্ত্তন অবশ্যই হবে। আমরা যদি শান্তির মন পরীক্ষা না ক'রে তার বিয়ে দিই, সেকি আর বলবে যে—'আমি বিয়ে করব না?' যার সুখেরই জন্যে আমরা এই শুভ বিবাহের আয়োজন করছি, তার ভাগ্যে যদি কেবল বিষের জ্বালাই পড়ে, তবে বিবাহে দরকার কি? আমরা সকল সময় ছেলেমেয়েদের অবস্থা না বুঝেই একটা যা তা ব্যবস্থা ক'রে বসি তার ফলে তাদের ঘাড়ে সুখ মনে ক'রে হয়ত একটা দুঃখের বোঝাই চাপাইয়া দি। আমি কিছুতেই তা পারব না।" "তবে যা ভাল হয় তাই কর। কিন্তু অমনি একটি কুলীন পাত্র খুঁজে আন্‌তে হবে, নইলে আমি বিয়ে দেব না।" বলিয়া গৃহিণী সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

কিশোরী মোহন বাবু আবার ভাবিলেন,—'তবে কি শান্তির এ বিবাহে মত নাই? তবে কি আমার অনুমানই সত্য? শান্তি বিনয়কে বড় শ্রদ্ধা করিত। আমার মনে হয়, বিনয়কে সে আত্মীয়ের মতই ভালবাসিত। যদি তাই হয়, তবে তাহার জীবন কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে না? বিনয়ের সঙ্গে শান্তির বিবাহের মধ্যে কয়েকটি কঠিন সমস্যা বর্ত্তমান। বিনয় কুলীনের সন্তান নয়। কিন্তু আমি তথা-কথিত কুলীনের কৌলীন্যে আদৌ আস্থা স্থাপন করি না। সুতরাং ভয় কি? ভয়ের প্রধান কারণ তার কোনও সম্পত্তি নাই, এবং আমারও এমন সঙ্গতি নাই যে, তাহার চিরদিনের সংস্থান করিয়া দিতে পারি। তারপর হয়ত শান্তি ও বিনয় দুইজনই পরস্পরকে ভাল বাসে; তাই বলিয়া হইতে পারে এরূপ কল্পনাও তাহাদের মনে হয়ত আসেনি। এ অবস্থায় বিনয় হয়ত রাজী নাও হইতে পারে। তারপর সেই বা এখন কোথায়? সেত একরূপ নিরুদ্দেশ। বহুদিন হইল তাহার কোন খবর পাইনি, কোথায় আছে তাও জানি না। তবে উপায় কি? এরূপ অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে থাকা যায়? যে ছেলেটি আমি ঠিক করেছি, সেটি অবশ্যই উপযুক্ত

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন অদৃশ্য বিধিলিপি না থাকে, তবে এ বিবাহে অসুখের কোন কারণ নাই।'

এদিকে দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন চলিয়া আসিল। বৈবাহিক কৃষ্ণপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় প্রায় জন পঞ্চাশ বরযাত্রী লইয়া হরিপুরে উপস্থিত হইলেন। কিশোরীমোহন বাবু তাঁহাদিগকে ষ্টেশন হইতে আনিবার বন্দোবস্ত রীতিমত ভাবেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। বরযাত্রী-দিগের মধ্যে আন্দাজ বিশজন স্বজাতি বাকী অন্যান্য। ইহার মধ্যে ভৃত্য, বাদক প্রভৃতিও ছিল। বিবাহের দিন দিনের বেলাতেই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহের এখনও অনেক সময় বাকী আছে দেখিয়া ভবিষ্যৎ জামাতা পূর্ণচন্দ্রের সহপাঠী প্রভৃতি বন্ধুরা মেয়ে দেখিতে ইচ্ছা করিল। কিশোরীমোহন বাবু প্রথমে আপত্তি করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত ভদ্রতার অনুরোধে সম্মত হইলেন।

পূর্ণচন্দ্রের বন্ধুগণ মেয়ে চাক্ষুষ করিতে সমবেত হইয়া প্রথমতঃ অসঙ্গত আলাপ, হাস্য-কৌতুকের অট্টরোলে বাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিল। ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলেদের দেশকাল অনুযায়ী উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দেখিয়া কিশোরীমোহন বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বৈবাহিক মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি নিজে এখানে না আসেন—আমার কন্যা দেখান হইবে না। এই সংবাদে শিক্ষিত বরযাত্রীর দলে একটা মস্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। বরকর্ত্তা কৃষ্ণপ্রসন্ন সিংহ এবং আরও দুই চারিজন প্রবীণ ব্যক্তি তাহাদিগকে একটু শান্ত করিয়া নিজেরাই ছেলের দল সঙ্গে লইয়া মেয়ে দেখিতে গেলেন। শান্তি প্রথমে কিছুতেই তাহাদের সম্মুখে বাহির হইতে চাহিল না। সে সজল চোখ্ দুটি পিতার মুখের দিকে রাখিয়া বলিল, —"বাবা! আমায় ওখানে নিয়ে যাবেন না? আপনার পায়ে পড়ি, বাবা আমায় ক্ষমা করুন!" বলিয়া সে কিশোরীমোহন বাবুর পায়ের উপর পড়িয়া যাইতেই তিনি দুই হাতে ধরিলেন এবং আদর করিয়া ধুতির আঁচল দিয়া চোখের জল মুছাইতে গিয়া দেখিলেন. তাহার দুইটি চক্ষু জলভারে টলটল করিতেছে। হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল হইতে

একটা তীব্র বেদনার তপ্ত উচ্ছ্বাস তাহার মুখমণ্ডল যেন বিষাদের ঘন-ছায়ায় ঢাকিয়া দিয়াছে। কি জানি কিশোরীমোহন বাবুর হৃদয়-বেগও যেন বাধাহীন হইয়া তাঁহার সমস্ত বক্ষ আলোড়িত করিয়া তুলিল। তিনি শান্তির কপালের চুল কয়গাছি সরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"একি, কাঁদিস কেন মা? তবে কি তোকে আমি সত্যি সত্যিই ভাসিয়ে দিতে চলেছি নাকি?" বলিতেই তাঁহার দুই গণ্ড দিয়া দুইটা তপ্ত-অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িল। শান্তিও পিতার বক্ষের উপর মুখ চাপিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরবে পিতা-পুত্রীর এইরূপ অশ্রুবিসর্জ্জনের পর কিশোরীমোহন বাবু শান্তির অশ্রু-প্লাবিত আরক্ত মুখখানি উঠাইয়া বলিলেন,—"মা! এই জন্যেই কি আমি তোকে এত যত্ন ক'রে মানুষ ক'রেছি,—লেখাপড়া শিখিয়েছি? হে ভগবান্! একি কর্‌লে? আজ আমার এই শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেন আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হ'ল প্রভু! জানি না ইচ্ছাময় তোমার ইচ্ছা কি! কিন্তু আমার স্নেহের পুতুলটি আমি অকূল জলে ভাসিয়ে দিব না।" বলিয়া তিনি কাপড় দিয়া চোখ মুছিয়া শীঘ্র একজন লোককে তারণ মুখোপাধ্যায়কে ডাকিতে বলিলেন। তিনি বাহির বাড়ীতে বরযাত্রীদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।

তারণ মুখোপাধ্যায় আসিলে কিশোরীমোহন বাবু বলিলেন,—"ভাই তারণ! আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর ভাই! তুমি ওঁদের একটু বুঝিয়ে বল, কোন অনিবার্য্য কারণে এখন মেয়ে বাহিরে আনা অসম্ভব। বল্‌বে—বোধ হয় উপবাস ইত্যাদির জন্য তার শরীর এখন খুব অসুস্থ। একটু সুস্থ হ'লে বিবাহ-সভাতেই দেখ্‌বেন। তারপর বরকর্ত্তা নিজে ত বেশ ভালরূপেই দেখেছেন?"

তারণ মুখোপাধ্যায় চলিয়া গেলে, কিশোরীমোহন বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; এবং বিপদ-সঙ্কুল পথে নিঃসহায় বিপন্ন পথিকের ন্যায় কতকগুলি বিশৃঙ্খল বৃথা চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন। এখনও তিনি ঠিক করিতে পারিতেছেন না, কি করা উচিত? এদিকে মেয়ের গাত্র-হরিদ্রা ইত্যাদি শেষ হইয়াছে, সুতরাং চিন্তার অবসর কোথায়?

এ কথা তাঁহার মনে স্থিরভাবে আসিয়াও আসিতেছে না। প্রায় উন্মাদের ন্যায় গৃহিণীকে বলিয়া বসিলেন,—"যদি এ বিবাহ না হয় তবে ক্ষতি কি?" গৃহিণী অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি? বিয়ের আর বাকী কি? সবই যে হ'য়ে গিয়েছে। এখন ত কেবল দানের কাজ আর সিঁদূর দানই বাকী?" তিনি কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে তারণ মুখোপাধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আপনি একবার বাহিরে চলুন, ওঁরা বড় বিরক্ত হ'য়ে পড়েছেন। আবার শুন্‌লাম, ভট্টাচার্য্যের চরও বৈঠকখানায় দেখা দিয়েছিল। বোধ হয় কিছু অনর্থ ঘটিয়ে গিয়েছে।" এই কথা শুনিয়া কিশোরীমোহন বাবু নিতান্ত আর্ত্তভাবে ছুটিয়া বাহির বাড়ীতে গেলেন। তখন বরযাত্রিমহলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যাইতেই ছেলে ছোক্‌রার দল একেবারে বিষম চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কি মশায়, আপনার এ কেমন অভদ্রতা? আপনি মেয়ে দেখাতে চান না,—তার জন্য কত ছল-চাতুরী? আবার শুন্‌লাম নাকি আপনি সমাজচ্যুত? আপনি ত আমাদের জাত মেরেছেন দেখ্‌ছি? ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।" আর একজন প্রৌঢ় বলিলেন,—"আপনি নাকি কুলীন? কুলীনের এই ব্যবহার? ছি ছি ছি!" ক্রোধে—অপমানে—দুঃখে কিশোরীমোহন বাবুর আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। তিনি তথাপি যথাসম্ভব সংযত ভাবেই বলিলেন,—"কেন আমার সব কথাই ত বৈবাহিক মহাশয়কে বলেছি? আমার কোন কথাই ত গোপন নেই? কেন বৈবাহিক মশায় এখন কথা বলেন না যে?" বরকর্ত্তা মহাশয় তখন মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন,—"তা অনেকটা গোপনই হ'য়েছিল বৈকি? আপনি ত আর খু'লে বলেননি যে—"আমি সমাজচ্যুত? তবে দলাদলি আছে এই পর্য্যন্ত।" আর একজন সেই সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিল—"হাঁ ভাই কৃষ্ণপ্রসন্ন বুঝা গেল, লোকটা ফাঁকিবাজ। আর বোধ হয় মেয়েরও কিছু দোষ থাক্‌বে, নইলে এখন দেখালেন না কেন? বিবাহ-সভাতেই বা দেখাতে চান কেন?" কিশোরীমোহনবাবুর এ

কটূক্তি আর সহ্য হইল না। তিনি কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"মুখ সাম্‌লিয়ে কথা বল্‌বেন। এত অপমান আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌ব না।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বরযাত্রীর দল একেবারে আঘাত-প্রাপ্ত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। কেহ বলিল,—"চল বর নিয়ে, এখানে বিয়ে দেওয়া হবে না।" কেহ বলিল,—"লোকটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে।" ইত্যাদি। কিশোরীমোহন বাবুর সকল আত্মীয়-স্বজন এমন কি তাঁহার গুরুদেব ব্রজমোহন গোস্বামী পর্য্যন্ত অনুনয়-বিনয় সহকারে তাঁহাদের তুষ্টি-সাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই তাঁহাদের তোষামোদ করিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহারা রুদ্রমূর্ত্তি ধরিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধের পর কি জানি হঠাৎ তাঁহারা বেশ শান্ত মূর্ত্তি ধরিলেন,—ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। বর সভাস্থ হওয়ার পর কন্যাপক্ষ অনুমতি চাহিতে আসিলে তাঁহারা বলিলেন,—"একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের দুই একজন অনুপস্থিত আছেন। তাঁহারা আপনাদের গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাক্‌তে গিয়েছেন। কারণ তিনি যখন গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তখন অবশ্যই তাঁর সম্মান রক্ষা ক'রে চলা আমাদের উচিত।"

কিশোরীমোহন বাবু এবং তাঁহার নিজের লোকেরা ষড়যন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। গুরুদেব ব্রজমোহন গোস্বামী মহাশয় করযোড়ে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া কাতর-স্বরে বলিলেন,—"মহাশয়গণ! অনুমতি দিন কন্যা পাত্রস্থ করা হোক্,—লগ্ন যে বয়ে যায়। আপনারা কি ভদ্রলোকের জাতি নষ্ট কর্‌তে চান?" একজন নবীন শিক্ষিত যুবক বলিয়া উঠিল,—"ওঁর আবার জাতি, ভয় কি মশায়? ওঁর জাতি ত আগে থেকেই ম'রে রয়েছে। বরং আমাদেরই জাত মে'রে তিনি নিজের জাত বাঁচাবার যোগাড় ক'রেছিলেন। এখন তার ফল ভোগ করুন। আমরা বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের বিধান না ক'রে বিয়ে দিতে রাজী নই।" উত্তর শুনিয়া কিশোরীমোহনবাবুর অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। এদিকে অন্তঃপুরে কান্না-কাটি আরম্ভ হইয়া গেল, দেখিয়া

কিশোরীমোহনবাবুর বৃদ্ধ শ্বশুর সেখানে আসিয়া বরযাত্রীদের প্রত্যেকের পায়ে ধরিয়া সাধ্য-সাধনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তবুও কঠিন—পাষাণ-দেবতার প্রাণ গলিল না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"যদি কন্যাকর্ত্তা নিজে সকলের নিকট ক্ষমা চান, বিনোদ ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধরিয়া এখানে আনিতে পারেন, এবং সকল রকম অপরাধের দণ্ডস্বরূপ নগদ এক হাজার টাকা পনের উপর আনিয়া দেন তবেই আমরা বিবাহ দিতে রাজী আছি। নতুবা বর নিয়ে ফিরে যাব।"

একদিকে কিশোরীমোহন বাবুর এত বড় বিপদ, আর একদিকে তাঁহার বিপক্ষদলের প্রতিশোধ লইবার নির্ম্মম ষড়যন্ত্র! তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই নগদ একহাজার টাকা কিরূপে বাহির করিবেন? বরপণ-স্বরূপ তিন হাজার টাকার কিছু দেওয়া হইয়াছিল, বাকী এখন দিবার কথা। তাহার উপর আরও একহাজার। শুধু তাহাই নয়, আবার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা। যাহারা বিনা অপরাধে একজন ভদ্রলোকের অনায়াসে সর্ব্বনাশ করিতে পারেন, তাঁহাদেরই কাছে ক্ষমা! কি অপরাধ করিয়াছেন তিনি? গো-ব্রাহ্মণ স্ত্রী-হত্যা ইহার একটাও ত করেন নাই? তবে কিসের জন্য এ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা! এদিকে বিবাহের লগ্ন অতীত হইয়া গেল। কিশোরীমোহনবাবু উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ধর্ম্ম! তুমি আছ? সনাতন-হিন্দু সমাজ! তোমার নাম পর্য্যন্ত জগতের বুক থেকে লোপ পেয়ে যাক্। এই নররূপী পিশাচের দল নিয়ে যদি তোমাকে 'সনাতন' নাম বজায় রাখ্‌তে হয়,—সে নামে কাজ কি? জগতের সবাই শু'নে রাখ, আমি হিন্দু নই—আমি বিধর্ম্মী—আমি ম্লেচ্ছ! আমার মেয়ে আজ লগ্নভ্রষ্টা—উঃ আর পারি না। বেরোয় সয়তান পিশাচের দল আমার বাড়ী থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নরেন এবং তাহার দুই একজন বন্ধু আস্তিন গুটাইয়া বরযাত্রীদের সম্মুখীন হইল, এবং সজোরে বলিল,—"কে কোথায় আসিস রে! একবার আয় ত!

আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন বাগ্দী প্রভৃতি

শূদ্র জাতীয় কৃষক এক একটা লাঠি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কিন্তু কিশোরীমোহনবাবুর আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিল। তিনি তাহাদের ফিরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা এত বড় প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগটা ছাড়িতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া মনের ক্রোধ মনেই চাপিয়া একে একে অন্তর্দ্ধান করিল। বরযাত্রীরাও সে-গতিক দেখিয়া আপনার গন্তব্য পথ ধরিল। কিশোরীমোহনবাবুর তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। বাড়ীতে স্ত্রীমহলের অবস্থা আরও শোচনীয়। গৃহিণীর মূর্চ্ছা হইতেছিল। শান্তি কিন্তু ঠিক পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল, নীরব হইয়া বসিয়া ছিল। ইহার ভিতর যে কি একটা গুরুতর অনর্থপাত হইয়া গেল, তাহা সে বুঝে নাই; কিন্তু মা বাবার ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া সে একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় ব্রজমোহন গোস্বামী আসিয়া বলিলেন,—"বাপ কিশোরী! ওঠ্ কিছু ভাব্‌তে হবে না, তোর মেয়ের বিয়েতে আমি পৌরোহিত্য করব। তোর সঙ্গে আজ আমিও এ সমাজ পরিত্যাগ কর্‌তে সঙ্কল্প কর্‌লাম। ভয় কি? কে বল্‌বে তোর মেয়ে লগ্ন ভ্রষ্টা? ওরে আমার মা! মা আমার সকল শুভলগ্নের বরণ ডালা নিয়ে আমাদের কৃতার্থ কর্‌তে এসেছে। সে লগ্ন কি আর নষ্ট হয় বাপ? তোকে শিষ্য ক'রে আমি ধন্য হ'য়েছি, আজ এই শেষ দশায় তাই আজ সনাতনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর্‌লাম। আমি মার জন্যে জ্যান্ত কুলীনের ছেলে নিয়ে আস্‌ব, তারপর নিজে মন্ত্র পড়িয়ে বিয়ে দিয়ে তোর সঙ্গে বিধর্ম্মী হব। শ্যামসুন্দর! তোমার লীলা বুঝে সাধ্য কার প্রভু?" (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅজিতনাথ সরকার

মাধুকরী

শক্তি-পূজা—শক্তি শব্দের যৌগিক অর্থ ক্ষমতা বা সামর্থ্য। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী। রাজাদের তিন প্রকার শক্তি—প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি। আবার শব্দের অর্থবোধানুকূল বৃত্তিবিশেষের নাম শক্তি। এই শব্দশক্তির জ্ঞান ব্যাকরণ, উপমান, অভিধান, আপ্তবাক্য ও ব্যবহার দ্বারা উৎপন্ন হয়।

অথর্ব্ববেদে ইন্দ্রের শক্তির (সামর্থ্যের) বিষয় উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (১।৩) দেবাত্ম-শক্তির উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে (৫।৪৬।৭-৮) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৩।১৩।১) আমরা দেবপত্নীর উল্লেখ পাই; কিন্তু তাঁহারা দেবশক্তি বলিয়া কুত্রাপি বর্ণিত হন নাই। এই শক্তি ত্রিবিধা:—ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি।

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র চতুর্থ পটল।

ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞানশক্তি নামক শক্তিত্রয় বিদ্যমান আছে। তাহাদিগকে গৌরীশক্তি, ব্রাহ্মীশক্তি ও বৈষ্ণবীশক্তি বলা যায়। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম এই শক্তিত্রয়ের অতীত।

"ইচ্ছা তু বিষ্ণবে দত্তা ক্রিয়াশক্তিস্তু ব্রহ্মণে।
মহ্যং দত্তা জ্ঞানশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী॥"

—যোগিনীতন্ত্র।

ইচ্ছাশক্তি বিষ্ণুকে প্রদত্ত হইয়াছে (বৈষ্ণবী); ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাকে প্রদত্ত হইয়াছে (ব্রাহ্মী); আমাকে (শিবকে) জ্ঞানশক্তি (গৌরী) প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী। এই ত্রিবিধা শক্তির মূল উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায়:—ঐতরেয়োপনিষৎ, ১।১-২, এখানে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ের বিকাশ দেখা যায়। ঐতরেয়োপনিষৎ,

২।৩, এইখানে আত্মার জ্ঞানশক্তির বিষয় বলা হইয়াছে। এ বিষয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২।২৩।১, ৬।২।৩ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মানন্দবলী ১৬।৭, প্রশ্নোপনিষৎ ৬।৩, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।১।২৭, ১।৪।১০, ১।৪।১৭ দ্রষ্টব্য।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ (১-৪) ও ১২৯ সূক্ত পাঠ করিলে ঐ ক্রিয়াশক্তির ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুত ঋগ্বেদে 'শাক্ত' শব্দের উল্লেখ আছে—"বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ" (৭।১০৩।৫)। সায়ণ বলেন, 'শাক্ত' মানে শক্তিমান্ শিক্ষক। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় (১৫) প্রকৃতিকে কারণ-শক্তি বা শক্তি বলা হইয়াছে। আমরা ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিলেও শক্তির আভাষ দেখিতে পাই (১।৪।৩)। পঞ্চদশী, ভূতবিবেক, ৪২-৪৪, বলেন—এই জগতের আদিকারণ সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন সত্তাশূন্য পরমাত্মার শক্তি বিশেষকেই মায়া বলিয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য্যদৃষ্টে তাহার দাহিকা শক্তির অনুমান হয়, সেইরূপ জগতের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অনুমান হইয়া থাকে। কার্য্যদর্শন না করিলে কখন কোনও পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি কার্য্যজনন-শক্তি তাহাই মায়া। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না। কারণ, আপনি আপনার শক্তি এ-কথা নিতান্ত অযুক্ত। (?) যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে—এই নিমিত্ত দাহিকাশক্তিকে কখনই অগ্নি বলা যায় না, সেই প্রকার পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কখনও পরমাত্মা বলা যায় না। তাহা হইলে শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি ? শূন্য সেই শক্তির স্বরূপ এ-কথা বলিতে পার না, যেহেতু শূন্য সেই শক্তির কার্য্যস্বরূপ বলিয়াছি। সুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয়া শক্তিস্বরূপা স্বীকার করিতে হইবে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শক্তিতত্ত্ব এইরূপে লেখা আছে,—

"অপ্রমেয়স্য শাক্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
সৌম্য চিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্যানাকৃতেরপি ॥

ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈবচ।
তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত ॥
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতাপি চ।
ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ ॥"

অপ্রমেয় শক্তিযুক্ত শুভময় সৌখ্য চিন্মাত্রস্বরূপ আকৃতিবিহীন হইলেও তাহা ইচ্ছাসত্তা, ব্যোমসত্তা, কালসত্তা, নিয়তিসত্তার ক্রমশঃ বিকাশ হয়। ইচ্ছাসত্তাদির অনুগতাসত্তা মহাসত্তা। পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি আছে। শিবাত্মা হইতে পৃথক সত্তা নাই, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্ব্বাণপ্রকরণের উত্তর ভাগ ৮১ সর্গে লিখিত আছে —তারপর দেখিলাম, সেই মহাকাশে বিশালদেহ রুদ্রদেব মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন * * * দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে ছায়ার ন্যায় একমূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে নির্গত হইল। প্রথমে সেই মূর্ত্তিটি ছায়া ধারণা হওয়াতে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। * * তাহার পর ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, ছায়া নহে; একটি ত্রিলোচনা রমণী মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। সেই রমণী কৃষ্ণবর্ণা, কৃশা, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শিরা পরিব্যাপ্ত, তাঁহার বিশালদেহ জীর্ণ, তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে সতত বহ্নিজ্বালা নির্গত হইতেছিল, তিনি বাসন্ত বনরাজীর ন্যায় পুষ্পপল্লব রমণীয় শেখর ধারণ করিয়াছিলেন। * * * * তিনি এত কৃশা যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থা; এইজন্য যেন বিধাতা সুদীর্ঘ শিরারূপ রজ্জুদ্বারা তাঁহার পতনোন্মুখ বিশীর্ণ দেহ একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার আকৃতি এতদীর্ঘ লম্বমান যে তাঁহার মস্তক ও চরণ-নখ দেখিবার জন্য আমাকে একবার অতি ঊর্দ্ধে একবার অতি নিম্নে গমনাগমন করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শিরা ও অন্ত্রতন্ত্রী দ্বারা গ্রথিত। খদির প্রভৃতি কণ্টকবল্লীর ন্যায় মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত শরীর সূত্র দ্বারা বিজড়িত। সূর্য্যাদিদেবের ও দানবগণের বিবিধবর্ণের মস্তক কমলমালা দ্বারা মালা গ্রন্থণ করিয়া সেই মালা তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে বায়ুসন্ধুক্ষিত উজ্জ্বল শিখাসম্পন্ন বহ্নির

সংযোগে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার লম্বমান কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল, নরমুণ্ড দ্বারা তিনি কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল স্তনদ্বয় বিশুষ্ক দীর্ঘ অলাবুর মত লম্বমান উরু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার খট্টাঙ্গ মণ্ডলে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর পুচ্ছে ও ব্রহ্মার কেশজালে বিশোভিত ইন্দ্রাদি দেবগণের মস্তক ঝুলিতেছিল। তাঁহার দন্তপংক্তিরূপ চন্দ্রশ্রেণী হইতে নির্ম্মল-কিরণপুঞ্জ বিনিঃসৃত হইতেছিল; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন অন্ধকারসাগরের ঊর্দ্ধরেখা উঠিয়াছে।

* * * দেখিলাম, তিনি কখনও একবাহু, কখনও বহুবাহু হইতেছেন। কখনও তিনি একমুখী, কখনও বহুমুখী, কখনও মুখ-বিহীনা হইতেছেন। কখনও বা অনন্ত-ভয়ঙ্কর মুখ দেখাইতেছেন। কখনও একপদে অবস্থান করিতেছেন; কখনও বহুপদা, কখনও বা অনন্তপদা কখনও বা একেবারে পদশূন্যা হইতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমি তাঁহাকে কালরাত্রি বলিয়া অনুমান করিলাম। সাধুগণ ইঁহাকেই ভগবতী কালী বলিয়া থাকেন।

নির্ব্বাণ প্রকরণ, উত্তরভাগ ৮৪ সর্গে—রাম কহিলেন, হে মুনিবর, ভগবতী কালী নৃত্য করেন কি নিমিত্ত? আর তিনি শূর্প, ফাল, কুদ্দাল মুষলাদির মালা ধারণ করেন কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন—সেই ভৈরব যাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া বলিলাম, তাঁহার যে মনোময়ী স্পন্দন-শক্তি তাঁহাকেই তুমি মায়া বা কালী বলিয়া জানিও। ঐ মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দনশক্তি জীবার্থীদের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্য নামে সৃষ্টির প্রকৃতি বা মূল কারণ বলিয়া 'প্রকৃতি' নামে দৃশ্যাভাসে অনুভূতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া 'ক্রিয়া' নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বাড়বাগ্নি জ্বালার ন্যায় দৃশ্যমান আদিত্যমণ্ডল তাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া 'শুষ্কা' নামে অভিহিত হন। উৎপলবর্গ অপেক্ষা প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি 'চণ্ডিকা' নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অনুষ্ঠান বলিয়া ইঁহার নাম 'জয়া'। সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রম বলিয়া ইঁহার নাম 'সিদ্ধা'। সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করেন বলিয়া ইঁহার নাম 'বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া'। বলে

কেহ ইঁহাকে পরাজিত করিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম 'অপরাজিতা'। ইঁহার মহিমা কেহ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম 'দুর্গা'। প্রণবের সারাংশ শক্তিও ইনি; এইজন্য ইঁহার নাম 'উমা' (উ, ম, অ=ওঁ)। নাম-জপকারীদিগের পরমার্থস্বরূপ বলিয়া ইঁহার নাম 'গায়ত্রী'; সর্ব্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইঁহার নাম 'সাবিত্রী'। স্বর্গ, মোক্ষ, প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইঁহা হইতে প্রবাহিত বলিয়া ইঁহার নাম 'সরস্বতী'। ইনি গৌরাঙ্গী বলিয়া 'গৌরী'; যখন শিবশরীরের অনুসঙ্গিনী হন, তখনই 'গৌরী' নামে অভিহিতা। মস্তকের ভূষণবিন্দুরূপ ইন্দুকলা বলিয়াও ইঁহার নাম 'উমা'। উক্তকাল ও কালী আকাশস্বরূপা বলিয়া উঁহাদের বর্ণ কৃষ্ণ।

উক্ত নির্ব্বাণ প্রকরণের পূর্ব্বভাগে অষ্টাদশ সর্গে হরের আলয়ে অষ্ট-মাতৃকার আবাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাতৃকা যথা :—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বুষা ও উৎপলা।

যজুর্ব্বেদেও "অম্বিকা" দেবীর নাম আছে; তিনি তথায় রুদ্রের ভগিনী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাকে উমা হৈমবতী বলা হইয়াছে। উমা ব্রহ্মবিদ্যা হইতে কালে ব্রহ্মশক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে মহেশ্বরকে মায়া বলা হইয়াছে। দেব্যুপনিষদে মহাদেবী ব্রহ্মস্বরূপিণী, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ, শূন্য ও অশূন্য, আনন্দ ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

বহ্বৃচোপনিষদে দেবী সর্ব্বাগ্রে একমাত্র ছিলেন এবং তিনিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদ পরিশিষ্টের রাত্রি পরিশিষ্টে দুর্গাদেবীর স্তোত্র পাওয়া যায়।

কৈবল্যোপনিষৎ—

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।

ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৭॥"

এখানে শিবকে 'উমা'-সহায় বলা হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম ও অষ্টাদশ অনুবাকে দুর্গা ও অম্বিকা বা উমার উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গা অগ্নির সহিত অভিন্ন; তাঁহার কালী, করালী, মনোজবা

সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, শুচিস্মিতা নামে সপ্তজিহ্বা (গৃহ্য সংগ্রহ ১।৩।১৪ ; (?) মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।৪)। পাণিনির ব্যাকরণে (৪।১।৪১,৪৯) ইন্দ্রাণী, বরুণানী, শর্ব্বানী, রুদ্রানী, মৃড়াণী, পদ পাওয়া যায়। এই সকলের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও বরুণানী শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে কথিত আছে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে কথিত আছে, অর্জ্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ রচনাকালে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনাকালে দেবপত্নীগণ দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতেন। উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যাকেই বলিত, কিন্তু অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ক্রমশঃ পরব্রহ্মের শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল এবং উমা মহেশ্বরের পত্নী ও মায়াশক্তি স্বরূপে উপাসিত হইলেন। সাংখ্যমতাবলম্বী ও অদ্বৈতবাদিগণও পরব্রহ্মের এই শক্তি স্বীকার করিলেন।

মহাভারত রচনাকালে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরীতে দুর্গার মন্দির স্থাপিত হইয়া তাঁহার পূজা হইত। এইরূপ নগরে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া অগ্নিপুরাণে ১০৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। "কারণ দেবালয়শূন্য নগর গ্রাম দুর্গ ও গৃহাদি পিশাচাদি কর্ত্তৃক ভুক্ত ও রোগাদি দ্বারা অভিভূত হইতে পারে।" ১৬-১৭। মহাভারতেও দুর্গাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে। উত্তরকালে পরিচিত অনেক নামও মহাভারতে পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রচনার সময়ে শক্তি-রূপিণী দুর্গাদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পত্নীর কল্পনা যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাও পাইলাম। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।২৯০-২৯১—

বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততোঽম্বিকাম্।
দূর্ব্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দত্বার্ঘ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্॥
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥"

অনন্তর বিনায়ক জননী অম্বিকাকে দূর্ব্বা সর্ষপপুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য ও

পূর্ণাঞ্জলি প্রদান করিয়া মূলের কথিত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করিবে। কাত্যায়ণ সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মাতৃগণকে যত্ন পূর্ব্বক পূজা করিবার বিষয় উল্লেখ আছে। বিষ্ণুসংহিতার ষটপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দুর্গা সাবিত্রীর দ্বারা পূত হইবার উল্লেখ আছে। এই দুর্গা সাবিত্রী তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে। (কাতায়নৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ)—তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নবম অনুবাক। নারায়ণোপনিষৎ মতেও এইরূপ।

ললিত বিস্তরের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় পাঠ করিলে চারিদিকে চারি শ্রেণীর অষ্ট শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড় পুরাণের পূর্ব্ব খণ্ডে (অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে) দুর্গাদেবী অষ্টবিংশতিভুজা, অষ্টাদশ-ভুজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টভুজা এবং চতুর্ভুজারূপে পূজিত হইবার উল্লেখ আছে। নবম্যাদি তিথিতে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি এবং তাঁহাদের অসিতাঙ্গাদি ভৈরবের পূজা বিধানও আছে।

(চতুর্বিংশ অধ্যায়)। কুব্জিকাপূজারও বিধান আছে (ষড়বিংশ অধ্যায়)। ত্রিপুরা ও জ্বালামুখীর পূজাবিধান আছে (২০৪ অধ্যায়)।

অগ্নিপুরাণে (অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে) গৌরী দেবীর প্রতিষ্ঠার প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। উমাপূজার বিবরণ ৩২৬শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সঙ্কট হইতে তারণ করেন বলিয়া দুর্গা নাম হইয়াছে (৩২৩শ অধ্যায়)। তিনি বেদ-গর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ক্ষেমঙ্করী, বহুভুজা নামে প্রসিদ্ধা (১২শ অধ্যায়)।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী গৌরীর পূজা করিবে। ইহার নাম গৌরী নবমী ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে কন্যাতে সূর্য্য ও চন্দ্র মূলা-নক্ষত্রে সংক্রমণ হইলে তাহার নাম অঘার্দ্দনা নবমী। তৎকালে চণ্ডা, প্রচণ্ডা, রুদ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতি চণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা ও মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করিবে ইত্যাদি (১৮৫ অধ্যায়); জয়ার্থী হইয়া আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে পটে ভদ্র-

কালীর মূর্ত্তি লিখিয়া এবং আয়ুধকার্ম্মুকাদিশস্ত্র ও ধ্বজছত্রচামরাদি যাবতীয় রাজচিহ্ন স্থাপন করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া বলি-প্রদান করিয়া পরদিবস পুনরায় পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে—হে ভদ্রকালি! মহাকালি! দুর্গে! দুর্গতি হারিণি! ত্রৈলক্যবিজয়ে! চণ্ডি! মাতঃ! প্রসন্ন হইয়া আমার শান্তি ও যশোবিধান করুন। (২৬৮ম অধ্যায়)।

(মাধবী, আশ্বিন) শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

২

ভারতীয় সঙ্গীতের সংস্কার—আমাদের সঙ্গীতের বিকাশ অনুপম ও মহৎ হলেও তার সংস্কার আজ বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ বাস্তবিকই সঙ্গীত রাজ্যে অনুপম, কিন্তু কোনও ভূত গরিমাকে শুধু কোলে করে নিয়ে বসে থাক্‌লে এ সঙ্গীত আমাদের বরাবর সমান আনন্দ দিবে না। এ আনন্দের সরলতা বজায় রাখতে হলে নূতন নূতন সৃষ্টি—আমাদের কর্‌তেই হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে যা আমরা পেয়েছি তাই কোনও মতে বজায় রেখে দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া একটা আদর্শ হতে পারে না। সে সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, কারণ জীবন-বিধাতার আমাদের কাছে এইটিই পাওনা।

কিন্তু সময় ও মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতকেও কমবেশী পরিবর্ত্তনে রাজী হতে হবে, কেননা আমাদের মন-বস্তুটি অল্প অল্প করে বদলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও অন্যান্য ললিতকলার (art) ধারণাও পরিবর্ত্তিত হবে কারণ ললিতকলার স্ফুরণ ত মনের উপরই নির্ভর করে!

আমাদের সঙ্গীত আজ বহুকাল স্থাণুর ন্যায় স্থিতিশীল হয়ে রয়েছে অর্থাৎ পশ্চাদ্‌গামী হয়েচে কেননা বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে গতি দুইটি—পশ্চাদ্‌গামী ও অগ্রগামী, স্থিতিশীল—গতি নেই।

সঙ্গীতের ইতিহাসে দেখা যায় ধ্রুপদের পর খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি

সৃষ্টি হয়েছিল—আমার খসরু প্রভৃতি গুণীদের দ্বারা। সেই একদিন ছিল যেদিন আমাদের সঙ্গীত ছিল জীবন্ত নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সাধনা ও সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আনন্দ ও প্রাণের আধার। কিন্তু আজ? আজ প্রায় ৫০।৬০ বছর ধরে যে সঙ্গীতকলার কোনও সৃষ্টি হয় নি তা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে আমরা সঙ্গীতকে ললিতকলা হিসেবে বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি।

কিন্তু এরূপ অবস্থা কি বাঞ্ছনীয়? শুনেছি আমাদের সঙ্গীত নাকি আজ বহুদিন হল উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে তাই আমাদের আর নূতন কিছু করবার নেই। ভূত গরিমাকে অত্যন্ত বড় করে দেখার ফলে চিত্তবিভ্রম যে কিরূপ হতে পারে এ উক্তিটি তার মস্ত প্রমাণ। এটা অত্যন্ত বাজে কথা, কারণ সময়ের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সঙ্গীত মানুষের সৌন্দর্য্য অনুভূতির অভিব্যক্তি যে এক-ভাবেই কায়েম হয়ে থাকবে—তা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়।

এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন আমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মহত্ত্ব অস্বীকার করছি আমি শুধু এই বলতে চাই যে সে ধারা মূলতঃ বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় হলেও তার অভিব্যক্তিকে এক অপরিবর্ত্তনীয়রূপ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থাৎ তার প্রকাশকে বিচিত্র করা ও ভঙ্গীকে বহুধা করার স্বাধীনতা গায়কের থাকা উচিত। তা'ছাড়া নূতন সুরের সঙ্গীতেরও উদ্ভাবন হওয়া উচিত। অপিচ; আমাদের রাগরাগিনী গুলির রূপকে বজায় রাখা দরকার কেবল তার চাতক বা প্রকাশ ভঙ্গীর জন্য যেন একটি অনড় কাঠাম তৈরী করে দেওয়া না হয়, যার বাইরে যাওয়া একেবারেই চলবে না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার হয় না।

প্রত্যেক আর্টেরই বিকাশ ও পতন হয়; আবার নূতন শিল্পীর দরকার হয় পুরাতনের ভগ্নমন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য। আমাদের রাগরাগিনীর মধ্যে নূতন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় এসেছে।

এই জন্যই চাই প্রাণহীন তানালাপের বর্জ্জন—গানের তানালাপ যত বিস্ময়করই হোক না কেন।

আসল কথা, সঙ্গীতকে নূতন করে অনুভব ও বিচার করতে হবে ও নূতন করে তার মূল্য ধার্য্য করতে হবে। তাছাড়া নূতন সৃষ্টিকে অভিনন্দন করে তাকে বিশ্লেষণ করে যোগ্য পুরস্কার দিতে হবে।

কোনও নূতন ভঙ্গী বা তালের মধ্যে সঙ্গীতের সত্যকার সৌন্দর্য্য থাকলেও আমাদের ওস্তাদেরা যে তা উপলব্ধি কর্ত্তে অক্ষম এটা সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই কাছে আক্ষেপের বিষয় হওয়া উচিত।

সনাতন কিছুর মূল্য অনেক স্থলেই যথেষ্ট থাকে সত্য কিন্তু তাই বলে যা কিছু আধুনিকতাই যে অসার একথা শুধু অসত্য নয়, অশ্রদ্ধেয়। বর্ত্তমানকে ছোট করে দেখা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়াই ভূত মহিমার সম্যক উপলব্ধি করার একমাত্র উপায় নয়।

আমি এবার গান বাজনার সময় গায়কের দেহের বা মুখের ভাবভঙ্গী সম্বন্ধে দু'চার কথা বলব। সঙ্গীতে মুখের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রত্যেক মনোজ্ঞ ভঙ্গীর একটা স্বতন্ত্র দাম আছে সঙ্গীতে যার নাম "শুদ্ধ মুদ্রা"। আমাদের ওস্তাদেরা কিন্তু ওমুদ্রা প্রায়ই এমন মুদ্রার সঙ্গে প্রকাশ করেন যার দরুণ গানের শ্রী ও সৌষ্ঠব বাড়ার সম্ভবনা সুদূর পরাহত হয়। এ সম্বন্ধে ওস্তাদদের উদাসীনতার প্রধান কারণ এই যে আমাদের দেশে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও নির্ভীক, অভিজ্ঞ অথচ সমজদার লোকমত আজও তৈরী হয় নি।

সুস্থ লোকমত যে এরূপ স্থানে কত খানি কাজ কর্ত্তে পারে তা য়ুরোপীয় গায়ক দলের মুদ্রা দেখিলেই বোঝা যায়। গানে শুদ্ধ-মুদ্রার প্রতি তাঁরা এতই সচেতন য তাঁরা আয়নার সম্মুখে দাড়িয়ে গান অভ্যাস করেন, কেন না তাঁরা জানেন অসহিষ্ণু শ্রোতৃবৃন্দ কোনও বিসদৃশ মুদ্রা দোষ দেখলে তাদের হেসেই উড়িয়ে দেবে।

কিন্তু শুধু মুদ্রাদোষ সংশোধন করলেই চলবে। মুদ্রাদোষ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ শুদ্ধমুদ্রা অভ্যাস করা দরকার। ফলকথা, আমাদের সঙ্গীতের অনেক রকম সংস্কার কর্ত্তে হবে, তার মধ্যে একটি এই যে মুদ্রাদোষ গানের সৌন্দর্য্যের যে কত হানি করে তা উপলব্ধি করে সুন্দর ভাবভঙ্গী ও শুদ্ধ মুদ্রার প্রচলন কর্ত্তে হবে—শুধু গানকে

লোকপ্রিয়তার ছোট আদর্শ থেকে নয় গায়কের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যরূপ উচ্চতর আদর্শ থেকেও বটে।

[রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত বক্তৃতার সারাংশ।

আত্মশক্তি —শ্রীদিলীপ কুমার রায়

আঁধার ও আলোক

সীমাহীন নীলিমার কোল হ'তে আসি,
গেছে ক'য়ে কে যে কানে কানে ;
অনাবিল জলধির শান্ত গরজনে
প্রাণের নিভৃতে কিবা দিয়াছিল এনে।

কিন্তু ভুলে যাই আচম্বিতে,
কিবা সেই গোপন বারতা ;
সংসারের বিভীষণ রুদ্র-কোলাহলে,
নাশিয়াছি ইন্দ্রিয়ের শ্রবণ পটুতা ॥

পিশাচের কলহাসি পৃথ্বী বিদারিয়া,
উঠিতেছে প্রেতিনীর বিকট-হুঙ্কার ;
ভুলিয়াছি লক্ষ্য পথ, থরথরি কাঁপে হিয়া,
দিশাহারা হয়ে যাই কভু আরবার ॥

কণ্টকিত পথ মাঝে চির অসহায়,
চলি তবু অন্ধ পথ হারা ;
ঘনঘোরে আবরিত হয়ে গেছে সেই,
জীবনের চিরধ্রুব তারা ॥

আশা এই অভাগার তপ্তচিত্ত মাঝে,
পেয়েছি ঋত্বিক্ কণ্ঠে স্নিগ্ধ সুধাধারা ;
জাগরণে স্বপনের মোহন আবেশ,
সন্ন্যাসী সঙ্গম এবে শরণ আমার ॥

সেদিনের সুপ্রভাত কবে হবে আর,
উদ্ভাসিত হবে হায় তরুণ তপন ;
রুদ্ধ জীবন পথ ঘুচিবে চকিতে,
পুলক প্রবাহে হায় শিহরিবে প্রাণ ॥

উৎকর্ণ শ্রবণ যুগে রহিব হেথায়,
উদ্বোধনে অভাগার বাণী-শুনিবারে ;
দূর হতে নিবেদিব হৃদয়ের গ্লানি ভার।
ধৌত করি আবিলতা দূর করিবারে ॥

—শ্রীগিরিশচন্দ্র সরকার

গ্রন্থ-পরিচয়

[illegible]—ভূতপূর্ব্ব সানক্রান্ সিসকো মঠের অধ্যক্ষ পরমহংস-দেবের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের একটি প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যখন উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সেই সময়ে পাক্ষিক উদ্বোধনে ইহা প্রকাশিত হয়। মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তি স্থান উদ্বোধন কার্য্যালয়।

[illegible]—শ্রীভগচ্চন্দ্র দাস প্রণীত—চিন্তা করিবার জিনিস।

[illegible]—শ্রীসত্য চরণ মিত্র প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজের জীবনের এবং গৃহস্থ ভক্তদের অনেক কথা আছে। মূল্য বার আনা।

সংঘ-বার্ত্তা

১। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি মহারাজ স্বামী বোধানন্দজিকে সঙ্গে লইয়া উটাকমণ্ড (মান্দ্রাজ) বিগত ৮ই এপ্রিল যাত্রা করিয়াছেন। স্বামী শর্ব্বানন্দ তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছেন। মধ্যপথে তিনি ভুবনেশ্বর এবং ওয়ালটারে বিশ্রাম করিবেন।

২। স্বামী মেঘেশ্বরানন্দ রেঙ্গুন হইয়া কোয়ালালামপুর (সিঙ্গাপুর) মঠে যাত্রা করিয়াছেন।

৩। পাঞ্জাব প্লেগ-মহামারীতে সেবাকার্য্য—লাহোর মিউনিসিপ্যালিটী হইতে একটি অস্থায়ী হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে এবং যাহারা সহরে বাস করিতে ভয় পাইতেছে কিম্বা যাহাদের আত্মীয়স্বজন মারা গিয়াছে তাহাদের বাসস্থানের জন্য "মিণ্টোপার্ক" নামক বাগানে থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যে সমস্ত বাড়ীতে প্লেগ হইয়াছে সেই সমস্ত বাড়ীগুলিকে নানা উপায়ে সংক্রামণের হস্ত হইতে রক্ষা করা হইতেছে এবং গৃহস্থগণের বস্ত্রগুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া নানাস্থানে প্লেগের টীকা দেওয়ার জন্য অনেক কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

প্লেগ হইলে এই সকল স্থানে সংবাদ দিবার বন্দোবস্ত আছে। গরীবদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী ; তাহার কারণ, প্লেগ হইলে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা কিম্বা হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত কিছুই তাহারা করিতে পারে না। অনেকস্থলেই রোগীদিগকে বিধাতার হস্তে ছাড়িয়া দিয়া আত্মীয়স্বজন পলায়ন করে ; তৎপর মৃতদেহ সৎকারেরও কেহ থাকে না। মুসলমানদের মধ্যেও রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী ; কারণ, যদিও তাহাদের আত্মীয়স্বজন রোগীদিগকে বিধাতার হাতে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করে না, কিন্তু রোগীদের মৃতদেহ মিছিল করিয়া কবরে লইয়া যায়, এইরূপে তাহাদের মধ্যে ভীষণভাবে রোগ সংক্রামিত হইতেছে। অর্থাভাবের দরুণ গরীব লোকেরা মিউনিসিপ্যালিটির কাছে কোন সহায়তা করিতে চায় না ; কারণ ভয় আছে যে রোগের কথা জানিতে পারিলে, কর্ত্তৃপক্ষ গৃহের সমস্ত বস্ত্রাদি জ্বালাইয়া দিবে। এ পর্য্যন্ত মিশন হইতে ১০ জন সেবক পাঞ্জাবে গিয়াছেন। দুঃস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে নূতন বস্ত্রাদি দান করিয়া রোগীদিগকে ঔষধপথ্যাদি দ্বারা সেবাশুশ্রূষাদি ও আর্থিক সাহায্য করিয়া নানা ভাবে তাঁহারা সেবা করিতেছেন। রোগের ভীষণ প্রকোপ ও বিস্তৃতির দরুণ মিউনিসিপ্যালিটি ও সরকার পক্ষ হইতে যে সাহায্য করা হইতেছে, তাহা ছাড়াও মিশনের পক্ষ হইতে সেবাকার্য্য করিতে গেলে কিরূপ অর্থের প্রয়োজন তাহা সহৃদয় দেশবাসী সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

৪। বীরভূম অগ্নিকাণ্ডে সেবাকার্য্য :—ফতেপুর গ্রামে প্রায় ২০০শত ও ভেলিয়ান গ্রামে প্রায় ৫০০ শত গৃহস্থ গৃহহীন হইয়াছেন। ক্রমাগত ৮ দিন ধরিয়া একই সময়ে আগুন লাগিতে থাকে, কিন্তু ইহার কারণ কিছুই জানা যায় নাই। গ্রামবাসীর বিপদের উপর বিপদ—এই অগ্নিকাণ্ড শেষ হইতে না হইতেই পরদিনই আবার ঝড় হইয়া যে কয়খানা গৃহ অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তৎসমস্তের খড় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। এই অগ্নিকাণ্ডে একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও একটি ৮।৯ বৎসরের বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এখানেও মিশন হইতে যথাযথ সেবাকার্য্য চলিতেছে।

৫। গৌহাটী অগ্নিকাণ্ডে সেবাকার্য্য :—আমাদের সেবকগণ গৌহাটীতে পৌঁছিয়াছেন কিন্তু সবিশেষ খবর এখনও কিছু দেন নাই।

আমরা সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা দেশের দরিদ্র ও দুঃস্থ ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর এই দুঃসময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। উপরিউক্ত সেবাকার্য্যের জন্য যে কোনওরূপ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।—ইতি

স্বাক্ষর—স্বামী সারদানন্দ,

ঠিকানা :— প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন ; বেলুড় পোঃ, জিলা হাওড়া।

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার পোঃ কলিকাতা।

৬। বিগত ২৮শে চৈত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী বাসুদেবানন্দ, ব্রজেশ্বরানন্দ, ত্র্যম্বকানন্দ এবং ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথ দিনাজপুর গমন করিয়া আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ঘোষের আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঙ্কুর দে (ডিঃ মাজিষ্ট্রেট) এবং সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ গুপ্ত (সিভিল সার্জ্জন) মহাশয়দ্বয়ের উৎসাহে এই শুভকার্য্য সম্পাদিত হয়। ৩১শে চৈত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ ও রামনাম কীর্ত্তন হয় এবং ৪০০ শত ভক্ত প্রসাদ পান। ১লা বৈশাখ প্রায় ৮০০ শত দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হয়। ২রা বৈশাখ স্থানীয় ড্রাম্যাটিক হলে এক সভার অধিবেশন হয় এবং শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ "জগতে বর্ত্তমান ভারতের বাণী" সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল ব্যাপী বক্তৃতা করেন। পরে অপরাপর স্থানীয় লোকেরাও ধর্ম্মালোচনা করেন। ৩রা বৈশাখ স্বামী বাসুদেবানন্দ ড্রাম্যাটিক হলে ছাত্রদিগকে তাহাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ করেন এবং রাত্রে স্থানীয় বালকগণ পরিচালিত নাইট স্কুলে গমন করিয়া সমবেত কুলী বালক ও যুবকগণকে লেখা পড়া শিখিবার জন্য উৎসাহিত করেন। ৫ই বৈশাখ ছাত্রেরা ইন্‌ষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র দেয়। ৮ই বৈশাখ সহরের মেথর নরনারীকে একত্রিত করিয়া ধর্ম্মোপদেশ ও লেখাপড়া শিখিবার জন্য উৎসাহিত করেন এবং ৯ই বৈশাখ স্থানীয় বালকদের সাহায্যে মেথর পাড়ায় একটি নাইট স্কুল খোলা হয়। মেথরেরা ৫০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া তাহাদের স্কুল গৃহ নির্ম্মান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

বিবেকানন্দ-প্রণতিঃ*

(সংস্কৃত-সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম্-এ বিরচিত)

যদা যদা নির্ম্মল ধর্ম্ম দর্পণে কলঙ্করেখা নিপতত্যহো তদা।
প্রজায়তে শ্রীভগবান্ দয়ার্ণবো বিশোধনার্থং খলু দর্পণস্য চ॥
যদা স্মার্ত্তাচার্য্যাঃ শ্রুতিমত বিরোধেন হি পুন-
র্ভজন্তে সাঙ্কীর্ণং প্রভবতি মতং ভেদ বিষয়ে।
বিবেকানন্দোয়ং কথয়তি কথাঞ্চোপনিষদীম্
অভেদো জীবানাং প্রতি ঘট পটং ব্রহ্ম বসতিঃ॥
ন জাতি ভেদো ন চ বর্ণ দুষ্ট র্যেনাপি কেনাপি পথা ভজস্ব।
দয়ার্ণবস্তে শরণং তথা স্যাৎ যথা নদীনাং শরণং সমুদ্রঃ॥
যা ভেদবুদ্ধির্বিহিতা তু শাস্ত্রে আজ্ঞান লাভং বিহিতান পশ্চাৎ।
জ্ঞানে প্রজাতে নহি বিদ্যতে সা সমন্বয়ঃ সর্ব্ব গতো বিভাতি॥
উদারতা যস্য হি সার্ব্বভৌমিকী ন দ্বেষ লেসোঽপি চ যস্য মানসে।
সর্ব্বাস্তু নার্য্যো জননীব পূজিতাঃ নরাশ্চ নারায়ণবদ্ বিমানিতাঃ
বেদান্ততন্ত্রাদি কথা বিচারে, যস্যৈব বুদ্ধিঃ কুশবৎ সুতীক্ষ্ণা।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং সংগৃহ্য যো যচ্ছতি সর্ব্বজীবে॥

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর বিবেকানন্দোৎসব সভায় রচয়িতাকর্ত্তৃক পঠিত।

Estd. 1886 LIBRARY

দরিদ্র-নারায়ণ সেবন ব্রতং লক্ষং হি যস্যৈবচ নিত্যমাসীৎ।
শ্রীরামকৃষ্ণস্য বরেণ্য শিষ্যং নরেন্দ্রনাথং প্রণতাঃ নমামঃ॥
ধন্যোঽসি হে ধর্ম্ম সমন্বয়ার্থিন্ ধর্ম্মে গুরুর্ভারতবর্ষ ভূমিঃ।
ত্বয়ৈব দেশান্তর সংস্থিতেন সংস্থাপিতং ধর্ম্ম মহাসভায়াম্॥
বীরাবয়ং নো যদি শস্ত্রযুদ্ধে শ্রেষ্ঠা বয়ং ধর্ম্মময়ে চ সংখ্যে।
সন্দেহ বিন্দুর্নহি বিদ্যতেস্মিন্ ভবৎ প্রসাদাদধুনা পৃথিব্যাম্॥
শ্রীরামকৃষ্ণঃ খলু ধর্ম্ম বৃক্ষ স্তস্যাপি মূলং শ্রুতিবাক্ সুনিত্যা।
স্কন্ধো বিবেকঃ সমুদারচেতাঃ আনন্দরূপা বহবশ্চ শাখাঃ॥
অস্য প্রশাখাঃ প্রসৃতাঃ পৃথিব্যাং ছায়াদিদানৈঃ সকলানবন্তি
স্কন্ধাৎ প্রজাতাঃ ফলপুষ্পবত্যঃ শাখাস্ততঃস্কন্ধমিমং নমামঃ॥

সাধনা ও তাহার ক্রম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৃক্ষ যেমন বাড়িলেই তাহার শেষ হয় না বৃদ্ধি সমাপ্তান্তে দীর্ঘকালে অন্তঃসারবান হয়, সেইরূপ সংস্কার লাভ করিলেই হইল না সত্যে প্রতিষ্ঠিত সত্যে সংকল্পিত ও সত্যে বিচরিত হইয়া কর্ম্মদ্বারাই মানব শুদ্ধ হইতে পরিশুদ্ধ হইতে থাকে।

শিশু যেমন চলিবার চেষ্টায় বার বার শত সহস্র বার উঠিয়া পড়িয়া ক্রমানুশীলন দ্বারা স্থিরভাবে দাঁড়াইতে শিখে ও ক্রমে সুন্দরভাবে চলিতে ফিরিতে সমর্থ হয়, সাধকও তদ্রূপ সত্যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ক্রমাগত উত্থিত পতিত হইয়াও শুদ্ধির দিকে অগ্রসর হন। প্রথম কার্য্যে, দ্বিতীয় বাক্যে, তৃতীয় চিন্তাতে শুদ্ধ হইতে পারিলেই বহিঃশুদ্ধি হইয়া থাকে। জীবভাবের ইহাই চরমোৎকর্ষ বা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ ইহাকেই কহা যায়।

এক্ষণে ভাবশুদ্ধির বিষয় বলিবার চেষ্টা করিব।

সংকল্প যথা হইতে উত্থিত হয় সেই ভাব সমুদ্র স্বতঃই আলোড়িত ও আন্দোলিত হইয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত করিতেছে। ঐ এক একটি তরঙ্গ এক একটি কামনা বা ইচ্ছা।

For the time being under certain circumstances being influenced by our surroundings we desire, and that desire being developed inclinds us to make an attempt.

উহার অধিকাংশই উত্থিত হইয়াই নিমিলিত হইয়া যাইতেছে; যেটি বহু তরঙ্গের আঘাত-প্রতিঘাতে পুষ্ট হইয়া উঠিয়া কূলে আসিয়া নিপতিত হইতেছে সেইটিই বীজ হইতে বৃক্ষে পরিণত হওয়ার ন্যায় ইহজগতে ক্রিয়মান হইতেছে।

মনোনদ সর্ব্বদাই গতিহীন ও তরঙ্গ সমাকুল। অভাবের প্রেরণায় অস্থির হইয়া সর্ব্বদাই একটা কিছু পাইবার জন্য ছুটিয়াছে, ছুটাছুটির বিরাম নাই। যখন সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হইল তখন আর ছুটাছুটি নাই যেখানকার জন্য ছুটাছুটি তাহা শেষ হইয়াছে, নিজ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সত্যের জন্যই যে তাহার ছুটাছুটি সত্যের অভাবেই যে তাহার বিড়ম্বনা, ভাব সমুদ্রে আসিয়া তাহা সে বুঝিল ও সত্য সান্নিদ্ধ হইয়া বৃথা ছুটাছুটি হইতে বিরাম লাভ করিল। কিন্তু এখনও তরঙ্গের শেষ হয় নাই। অভাবের বিড়ম্বনা দিয়া ভাবের হিল্লোলে দুলিতেছে, এখানে দারিদ্র্য নাই কিন্তু দুঃখ আছে। শুভাশুভ সত্যমিথ্যা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান কর্ম্মের প্রেরণা আনয়ন করিয়া কর্ম্মে ব্রতী করাইতেছে, ও কর্ম্ম ফলানুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করাইতেছে। এই ভাব-সমুদ্রের কিনারা হইতে ক্রমে যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে থাকি ততই নিঃসন্দেহ গভীরতম সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হই ও কূলের কথা ভুলিতে থাকি। কূলের কথা ভুলিয়া না গেলে সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না, (মন্ময়) বা তন্ময় হইতে না পারিলে সেই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। কূল ও তরঙ্গান্বিত সমুদ্রের পরে ক্রমে যেমন বহুদূরে সেই প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়া পৌঁছিতে পারাযায় তদ্রূপ দেহাতিক্রান্ত মন সত্যানুসরণ দ্বারা ভাব-সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রশান্ত চিত্তক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়।

কর্ম্ম করিতে করিতে যখন কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করে, যখন সত্যই স্বভাব স্বরূপ হইয়া যায়, তখন সত্যমিথ্যার প্রান্তরে সেই প্রশান্ত চিত্তক্ষেত্রে দেহমন ভুলিয়া সাধক আসিয়া উপস্থিত হন।

সাধারণতঃ আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই ক্রিড়া কৌতুকচ্ছলে অনেকেই মিথ্যা কথা কহেন, কিন্তু সপথ করিয়া বা আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া আর মিথ্যা বলিতে পারেন না; সেখানে বুঝা যায় যে তাঁহার কর্ম্মে সংস্কারশুদ্ধি আছে কিন্তু ভাষায় বা বাক্যে নাই। অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায় যে অমুক ভুলিয়াও একটি মিথ্যা কথা কহেন না সেখানে বুঝিতে হইবে তিনি কর্ম্মে ও বাক্যে উভয়বিধ শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেইরূপ যিনি চিন্তাতেও মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহার ভাব শুদ্ধি হইয়াছে।

এক্ষণে দেহশুদ্ধির বিষয় বলিবার চেষ্টা করিব। অভাব ছাড়িয়া যখন ভাবে আসিয়াছি ও মিথ্যা বর্জ্জন করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছি, মিথ্যার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজকে কৃতার্থ বা সিদ্ধার্থ জ্ঞান করিতেছি, মনের গতি তখন উচ্চদিকে, মন আর নীচে নামিতে চাহে না; যাহাতে মন্দের ভাব আছে তাহাতেই দুঃখ বোধ করে ও সত্য মিথ্যার পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া সত্যের ভাবে বিভোর হইয়া, আমি সত্যবান আমি জ্ঞানবান ইত্যাদি অজ্ঞাত অভিমান ভরে নিজেকে অন্য হইতে পৃথক দেখিতেছেন, নিজকে একটু স্বতন্ত্র দেখিতেছেন, জগৎ দুঃখময় অনুভব করিতেছেন ও জগতের কদাচার কুঅভ্যাস ও দুঃখ দারিদ্র্য দেখিয়া কাতর হইতেছেন তখন নিজেতে ভাব দেখিতেছেন কিন্তু অন্যত্র অভাব দেখিতেছন —এক্ষণে সেই অভাব পূরণের জন্য কর্ম্ম।

বুদ্ধদেব সিদ্ধার্থ নাম ধারণ করিয়া কর্ম্মে ব্রতী হন তাঁহার দয়াপরবস জীবনের ইতিহাস আরম্ভ এখান হইতে।

অবস্থায় অভাবজ্ঞান আনয়ন করে ও তাহার পূরনেচ্ছা কর্ম্মে নিযুক্ত করে, আমাদের এই জীবন কর্ম্মময় হইলেও দুঃখময় নহে। কর্ম্মের অবশান নাই কিন্তু দুঃখের অবশান আছে। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যাহা আমরা পিতমাতা হইতে লাভ করিয়াছি, ইহাই আমাদিগের

যথাসর্ব্বস্ব। এই দেহ আছে বলিয়াই আমি আছি ও আমার যাহা কিছু তাহা আছে। এই দেহের জন্যই আমি কাঙ্গাল (অভাবগ্রস্ত) আবার এই দেহ আছে বলিয়াই আমি ধনী অর্থাৎ আমার কিছু আছে। এই পাঞ্চভৌতিক দেহই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আবাস ভূমি, ইহারাই দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া বুঝিয়া দ্বন্দ্ব আনিতেছে দ্বিধা আনিতেছে দ্বৈত স্বীকার করিতেছে, প্রীতিকর পদার্থে আকৃষ্ট ও অপ্রীতিকর পদার্থে বিতৃষ্ণ হইতেছে, ইহাদিগের কার্য্য শেষ না হইলে ইহারা বিদায় গ্রহণ করিবে না, ইহারাই দেহের রাজা সাজিয়া দেহটিকে লইয়া নানারূপে নাচাইতেছে এই নর্ত্তনের নিবৃত্তি না হইলে দেহ শুদ্ধ হইতে পারে না।

দেহ বুদ্ধিই ভেদজ্ঞান আনয়ন করে এবং যেখানে ভেদজ্ঞান সেখানেই হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, সঙ্কোচ আসিয়া প্রাচীর স্বরূপ প্রতীয়মান হয় ও পার্থক্য প্রমাণিত করে। এই পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া একত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই দেহশুদ্ধি হইল উপায় যেরূপেই হউক।

যিনি সত্য হইতে যাহা যত অধিকদূরে অবস্থিত তাহা ততোধিক আবৃত দেখিয়া সেই মিথ্যার আবরণ উন্মোচন করিয়া দিবার জন্য প্রথমে সমজীব মনুষ্যের কাতরতায় ব্যথিত হইয়া তাহার দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে গিয়া যতই তাহার ভাবে বিগলিত হইতেছেন, ততই তাহার জন্য নিজ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া তাহার দুঃখ বিমোচনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদিকে নানারূপে ভোগ বিরত রাখিয়া কায়মনোবাক্যে পরার্থে আত্মোৎসর্গ দ্বারা একের দুঃখ দুয়ের দুঃখ তিনের দুঃখ দেখিতে দেখিতে ক্রমে অনন্তের দিকে অগ্রসর হইয়া নিজেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করিয়া ফেলেন ও নিজত্ব বিস্মৃত হইয়া যান।

দেহজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া সাধক যখন আপনাকে বিশ্বব্যাপী অনুভব করিতে থাকেন তখন মন দেহগণ্ডি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চিদানন্দ সাগরতীরে উপনীত। কূল ও তরঙ্গায়িত সাগরপারে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছিয়া বিশ্বব্যাপী জলরাশি ও অনন্ত আকাশ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না বা দেখিবার বাসনা পর্য্যন্ত অনেক স্থলে থাকে না, সেইরূপ দেহ মন ভুলিয়া প্রশান্তচিত্ত ক্ষেত্রে যখন উপনীত হওয়া যায়

তখন চরাচর বিশ্বের সর্ব্ব জীবে নিজেরই স্বরূপ উপলব্ধি হয় ও নিজত্ব বা পার্থক্য মনোমধ্যে স্থান পায় না। এই অবস্থাকেই দেহ শুদ্ধির অবস্থা বলা যাইতে পারে। এতদবস্থায় কে কর্ম্ম করিতেছে, কেন করিতেছে ও তাহার ফলাফলই বা কি তাহা চিন্তনের আর অবসর থাকে না, তখন তদ্বিধ কর্ম্মই স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়।

এখানে সন্দেহ হইতে পারে দেহেরই ক্রিয়া আহার, নিদ্রা ও সঙ্গ; দেহই আহার নিদ্রা ও সঙ্গে রত হন, দেহের বাহিরে কুত্রাপি ইহার বিকাশ নাই। এই অবস্থায় আহার নিদ্রা ও সঙ্গ বাসনা না থাকিলেও সংস্কার সংযোগ করে এবং সংব্যতীত অসৎ সঙ্গে সংযোগ ঘটে না। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। "যোগ্যং যোগ্যেন যুয্যতে।" এখানে আহার্য্য, তন্ময়তাময় ভগবৎ প্রসাদ; নিদ্রা চৈতন্যে সমাহিত; সঙ্গ, ভক্ত। ত্যাগ অর্থ আশক্তি পরিহার। যেখানে যে ভাবের অভাব সেখানে সেই ভাবেরই পূরণ অবশ্যম্ভাবী।

"Nature avors vaccuum"

এক্ষণে বুঝা যায় সাধক এই অবস্থায় না পৌঁছিলে দেহজ্ঞানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না।

এক্ষণে চিত্তশুদ্ধির বিষয় বলিবার চেষ্টা করিব। যেখানে চিত্ত বিস্তীর্ণ হইয়া প্রশস্ততা লাভ করিয়াছে ও ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার লক্ষ্য করিবার জন্য স্থিরস্বভাব হইয়াছে সেখানে উঁচু নীচু খাল খন্দ ভালমন্দ সকল এক তুলাদণ্ডেরই পরিমাপক হইয়া গিয়াছে। এই দেহ সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অনন্ত সেই উন্মুক্ত চিত্ত বিহঙ্গম দেহপিঞ্জর ভুলিয়া অনন্তের ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া অনন্তে স্থিতি লাভ করিতে করিতে ঘনীভূত ভাবে অনন্তে বিচরণ করিয়া আপনাতে অনন্ত ও অনন্তে আপনি অনুভব করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন ও আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন, ও দেখেন "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"।

নবীন দম্পতীর নব অনুরাগে কামুক যেমন পুলক অনুভব করেন, বিষয়-বিতৃষ্ণ-চিত্ত এখানে আসিয়া প্রথম মিলনের সূত্রপাতে যে কি অনুপম সুধাস্বাদের আভাষ মাত্র প্রাপ্ত হয়েন তাহা বচনাতীত।

দেহ দেহের জন্য পিপাসিত হয়, মন মনের মতন মন খোঁজে, হৃদয় হৃদয় মাগে, প্রাণ প্রাণ পাইবার জন্য লালায়িত হয়, শুদ্ধ প্রাণ মহা প্রাণে বিক্রীত হয়। এই ক্রিয়মান জগতের সর্ব্বত্র, অবস্থা ও অধিকার ভেদে অভাব পূরণের অনুসরণে ছুটিয়াছে। যতক্ষণ অভাব, ততক্ষণ আমি, আমার অভাব পূরণে তুমি। তুমির সহিত আমির যে মিলন ইহার সূত্রপাত হইতেই সুখোৎপত্তি ভাবের গাঢ়তানুযায়ী প্রাণের বন্ধন, আত্ম-বিস্মৃতিতেই তাহার পরিসমাপ্তি।

সত্যের জন্য যে উন্মত্ততা, সত্যাস্বাদ বাসনার তীব্রতা সাধককে যখন এখানে আনয়ন করে তখন সে সত্যস্বরূপের সন্ধান পায়।

"তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ"—পাতঞ্জল

সূর্য্য সান্নিধ্য হইলে যেমন সূর্য্য টানিয়া লন, চন্দ্র সান্নিধ্য হইলে যেমন চন্দ্র টানিয়া লন, পৃথিবী সান্নিধ্য বস্তু যেমন পৃথিবীতেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সত্য সান্নিধ্য জীবও সেইরূপ সত্যদ্বারা আকৃষ্ট হন। এখানে পৌঁছিলে তবে ভগবান টানেন তখন আর আমার নিজস্ব গতি নাই। "মা যা করেন"—রামকৃষ্ণ কথামৃত। এখানে প্রকৃতির খেলা দেখিতে পাওয়া যায় ও প্রকৃতির খেলা কথার অর্থ উপলব্ধি হয়। এক্ষণে পুরুষ ও প্রকৃতির সহিত পরিচয় হইতে থাকে। এস্থলে চেতন স্বভাব স্বপ্রকাশ পুরুষ ও পরিবর্ত্তনশীলা মায়া বা প্রকৃতি একের রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যের রাজ্যপ্রবেশ পথে আসিয়া উপস্থিত।

একটি স্বরূপ, অপরটি ভ্রান্তি। এই অবস্থায় কেবল কৃপাই উপায়, তুমিই সর্ব্বস্ব আমি ভ্রান্তি। "তমেবশরণং ব্রজ" এইভাব যাঁহার যে পরিমাণ স্থির তিনি সেই পরিমাণ অগ্রসরে সমর্থ। অন্যথা আমি তুমির খেলা পুরুষ প্রকৃতির মেলা। কেবল অনন্যশরণ জীব গুরুকৃপায় ভগবৎ কৃপা লাভ করেন ও এবম্বিধ স্বচ্ছহৃদয় ভগবান টানেন। তখন হৃদয় হৃদয়নাথের সন্ধান পায়, নাথ আপনার জনে টানিয়া লন।

সবদিয়া তারে　　　তাহারি হবরে,
বাসনা কামনা　　　একই তাই।

যে যা বল বল ভালকি পাগল
আমি হব তাঁর ইহাই চাই ॥
সে হবে আমার সহেনা আমার
আমি হব তার সেই যে ভাল।
সেই আঁখি তারা বিনে দিশে হারা
যাহার মিলনে জীবন আলো ॥
সবদিয়া তারে তাহারি হবরে
বাসনা কামনা সকলি হীন।
আমিত্ব আমারি তাহারি তাহারি
হবে আমি তুমি তোমাতে লীন ॥

স্বচ্ছচিত্ত, শুদ্ধ সত্তা বা আত্মা সত্য সাগরের বারিবিন্দু মাত্র ; সত্য সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়াবলম্বন দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হন। বারিবিন্দু উত্তপ্ত বায়ু অবলম্বন করিয়া বাষ্পাকার ধারণ করিয়া আকাশ পথে বিচরণ করে, পুনরপি সুশীতল বায়ু স্পর্শে বারি বিন্দুতে পরিণত হইয়া সাগরে সম্মিলিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ সাগর হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া জ্ঞান কণা মায়াবলম্বন দ্বারা জীবন পথে বিচরণ করিয়া জীব নামে আখ্যাত হন। সৎগুরু কৃপা বলে জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্জলিত হইলে জ্ঞানকণা আত্ম সাক্ষাৎকার বা আত্মজ্ঞান লাভ করেন, ও ক্রমে মায়ামোহ বিদূরিত হইয়া স্বরূপে প্রকটিত হইতে থাকেন। এক্ষণে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বলিবার চেষ্টা করা যাইবে। আমির সহিত আমার পরিচয় বা আত্মজ্ঞান একই কথা। আমি প্রকৃতির সহিত একীভূত থাকিয়া জড় আবরণে আচ্ছাদিত, বা প্রকৃতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ ; এই পাশ মুক্তির চেষ্টার নাম পুরুষকার। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন পদানুসরণ বা আবিষ্কৃত পন্থা অতিবাহিত করিয়া লক্ষ্য স্থানে পৌছিবার জন্য যে কর্ম্ম তাহাই সাধনা, ও এবম্বিধ সাধনার দ্বিতীয় নাম মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে যাইবার পন্থাবলম্বন।

পূর্ণ মনুষ্যত্ব কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বলা বাহুল্য মনুষ্যত্বের পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া দেবত্বের পথে বিচরণ ইচ্ছা বা চেষ্টা পণ্ডশ্রম

মাত্র—কিন্তু অসম্ভব নহে। যিনি বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন ব্যবস্থা বা সোপান তাঁহার জন্য; যিনি দেবকৃপা লাভে সৌভাগ্যশালী তাঁহার গতি স্বতন্ত্র। যেমন সিঁড়ি বাহিয়া বা বিদ্যুৎ বাহনে চলা। (Staircase & Electric lift) তাহাও অহৈতুকী হইতে পারে না তাহারও মূলে হেতু বিদ্যমান আছে। ইহার আলোচনা অতি বৃহৎ এবং অধিকার ভেদে নানাবিধ, অতএব অনাবশ্যক।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতম্ গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ।"

সরল সুবৃহৎ রাজপথ সম্মুখে পতিত থাকিতেও উদ্দেশ্য ভেদে অপ্রসস্ত পুতিগন্ধ বিশিষ্ট বন্ধুর, নিয়ত বঙ্কিম, অন্ধকার মার্গ অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক জীব বহুভাবে জীবনলীলা সাঙ্গ করিতেছেন বলিয়া রাজপথ বা কুটিলপথ দায়ী নহে, দায়িত্ব গ্রহণকারীর। যেরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইবে তৎপন্থানুমোদিত ফলাস্বাদ ভিন্ন গত্যান্তর কোথা। অন্ন প্রস্তুত উপায় অবলম্বন করিয়া পিষ্টকাস্বাদ-বাসনা দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

যাহা হউক আমাদিগের আলোচ্য বিষয় আত্ম সাক্ষাৎকার বা আত্মজ্ঞান লাভ। বসনাবৃত আমি আমি নহি। আমি রাজবেশে রাজা, সৈনিক বেশে সৈন্য, গৈরিক বেশে সন্ন্যাসী ও উলঙ্গ বেশে উন্মাদ। তবে কোন্‌টি আমার আসল বেশ, ইহার নির্ব্বিশেষ গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীতারিণীশঙ্কর সিংহ।

মাতৃ বন্দনা

গর্জে রুদ্র, আর কি ক্ষুদ্র, আর কি শূদ্র বিশ্বে রয় ?
মাতৃ চরণে যে দেয় অর্ঘ্য, স্বর্গ তাহার তুল্য নয় ।
লক্ষ সিন্ধু মন্থন ধন মা যে অযুত চন্দ্রালোক,
সপ্ত ভুবন মায়ের নামে ভুলে যায় যত দুঃখ শোক ।
মা যে আমার, মা যে আমার বিশ্বরূপিণী সর্ব্বময়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনা স্বর্গ মা বিনে সকলি মিথ্যা হয় ।
আদি প্রণব অনাদি বাণী এ, অনাহত এ যে মায়ের নাম,
সপ্তভুবনে তুলনা মেলেনা,—পুত্রকণ্ঠে মায়ের গান ।
মুক্তি মিলিবে, ভুক্তি মিলিবে, ভক্তি অর্ঘ্য করিলে দান,
নিঃস্ব নগ্ন র'বিনে বিশ্বে, সর্ব্ব সুখদ মায়ের নাম ।
ডাক্‌রে সন্তান, মা মা বলিয়ে, ওরে রে মূর্খ, কিসের ভয় ?
মায়ের সন্তান, মা বলে ডাকিলে দুঃখ দৈন্য আর কি রয় ?

—শ্রীসাহাজী

জীবন-রহস্য

মানব জীবন এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা। প্রহেলিকা দুর্ভেদ্য হইলেও ইহাতে যে প্রভূত পরিমাণে সত্য নিহিত আছে তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই অনুভব করিতে পারা যায়। জীবন অর্থাৎ জীবিত কাল, সত্য একথা যেমন যথার্থ ; জীবন স্বপ্ন একথাও তেমনি সত্য। জীবন সত্য, যেহেতু জীবনের অস্তিত্ব আছে ; জীবন স্বপ্ন কারণ ইহা ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং জীবন সত্যও বটে, স্বপ্নও বটে—অর্থাৎ সত্য স্বপ্ন।

সত্যও বটে, স্বপ্নও বটে ;—এইজন্য জীবন রহস্যময়। রহস্যময় বলিয়াই ইহার উদ্দেশ্য সহজে অনুভূত হয় না। তাই ভাবুক কবি বিহ্বল চিত্তে গাহিয়াছেন—

"মোরা কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই
ভাব দেখি ভাবুক সুজন, বুঝিতে পার কি তাই।"

জগতের যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। প্রাণী জগতের রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ক্রমবিবর্ত্তনবাদ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সুতরাং বহুজন্ম জন্মান্তরের পরিণতি যে মনুষ্য জীবনে তাহা অনুধাবন করা কঠিন নহে। এক পরম তত্ত্বদর্শী কবিও সেই কথা বলিয়াছেন।

"আশি লক্ষ যোনি করিয়া ভ্রমণ
পেয়েছ সাধের মানব জনম
এমন জনম আর পাবে না।"

এমন যে দুর্লভ জীবন ইহার উদ্দেশ্য কি? কেমন করিয়া এই জীবন লাভ করিলাম সে কথা ভাবি অথবা নাই ভাবি, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; কিন্তু কেমন করিয়া যাপন করিলে এই জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়—ইহার সার্থকতা ঘটে, সে রহস্য সকলেরই উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য।

ষড়ৈশ্বর্য্যময় ঈশ্বর মানব জীবনকে প্রচুর পরিমাণে ঐশ্বর্য্যময় করিয়াছেন। সে সকল ঐশ্বর্য্য কি, কেমন করিয়া তাহা আয়ত্ত করিতে পারা যায় এবং কি প্রকারে তাহাদিগকে উপভোগ করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া জীবনের লক্ষ্য স্থির করা কর্ত্তব্য। গভীর পরিতাপের বিষয় যে স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া দিন অতিবাহিত করা ব্যতীত অতি অল্প সংখ্যক লোকেই এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দান করেন। অথচ সকলেরই লক্ষ্য এক—কেমন করিয়া এই অমূল্য জীবন সুখে অতিবাহিত করা যায়। কিন্তু সুখ কি? সুখ কাহাকে বলে? পণ্ডিতেরা বলেন, দুঃখের অভাবের নামই সুখ

কিন্তু দুঃখের অভাব হইলেই কি যথার্থ সুখ হয়? উপযুক্ত আহার এবং লজ্জানিবারণোপযোগী বসন হইলেই ত আমাদের দুঃখের শান্তি হওয়া উচিত,—কিন্তু তাহাতে কি আমাদের যথার্থ সুখ হয়? আহার মিলিলে, আমরা আরাম চাই; বসন জুটিলে আমরা ভূষণ চাই। একটির পর একটি করিয়া আমাদের অভাব যেমন পূরণ হয়, তেমনি নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়, এ সৃষ্টির অন্ত নাই। উপার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হইলে আমরা অশন বসনের ব্যবস্থা করি; তৎপরে আবাস এবং বিলাসের অভাব দূর করিতে প্রবৃত্ত হই। অশন, বসন, এবং আবাসের ব্যবস্থার একটি সীমা নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু ভোগ-বিলাসের কোন সীমা নির্দ্ধারিত নাই। এক ঘোড়ার গাড়ী হইলে, দুই ঘোড়ার গাড়ীর অভাব অনুভূত হয়; আবার দুই ঘোড়ার গাড়ী হইলে, মোটর গাড়ীর প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। অতএব এই আকাঙ্ক্ষাকে সংযত না করিতে পারিলে সুখের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। তবে সুখ কিসে?

প্রবৃত্তি মার্গে সুখ নাই, সুখ নিবৃত্তি মার্গে। অর্থাৎ ভোগে সুখের পরিতৃপ্তি হয় না—লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যথার্থ সুখ ত্যাগে—আত্মসংযমে। সুখের প্রকৃত নাম শান্তি। এই শান্তি সংযমশীল ব্যতীত অন্যের লভ্য নহে। তাই বলিয়া কি ভোগ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে? তাহা নহে। ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে, যতটুকু ভোগ শরীর ধারণের পক্ষে প্রয়োজন—অর্থাৎ যতটুকু পরিমাণ ভোগে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়—শরীর সুস্থ এবং সবল থাকে, ততটুকু ভোগের অবশ্য প্রয়োজন। তদতিরিক্ত ভোগে, উপকারের পরিবর্ত্তে শরীরের অপকার হয়; স্বাস্থ্যের হানি হইয়া শরীর অপটু হয়; এবং শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি; এমন সুন্দর সুখভোগ্য জীবনকে কলুষিত—কণ্টকিত করিয়া তুলে। সুতরাং সুখ বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি তাহা যথার্থ সুখ নহে।

সুখের কোন সংজ্ঞা নাই। সুখ কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। একের যাহাতে সুখ অপরের তাহাতে অসুখ। যানের যাত্রীর যাহাতে

সুখ, যানবাহকের তাহাতে অসুখ। একের যাহাতে শ্রমের বিরতি, অপরের তাহাতে প্রচুর পরিশ্রম। সুতরাং সুখের আদর্শ এবং পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কাহার সত্যে সুখ; কাহার অসত্যে; কাহার সাহিত্যে; কাহার সঙ্গীতে; কাহার সৌন্দর্য্যে কাহারও কদর্য্যে; কাহার শৌর্য্যে; কাহার চৌর্য্যে।

সুখের যেমন কোন নির্দ্দিষ্ট, অথবা বিশিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তেমনি সুখের কোন সীমাও নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুখের আদর্শের ন্যায় সুখের পরিসীমাও ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করে। কেহ সুখী মত্ততায়, কেহ বা উন্মত্ততায়। কেহ স্বল্পে তুষ্ট, কেহ বা পর্য্যাপ্তেও রুষ্ট। সুতরাং সুখ প্রত্যেকের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির অনুরূপ, অর্থাৎ সুখ সম্পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্তাধীন।

যাহার যেরূপ রুচি, তাহার সুখের আদর্শও সেইরূপ। কেহ সুখী ভোজনে, কেহ সুখী শয়নে, কে সুখী ভ্রমণে, কেহ সুখী বাচালতায়, কেহ সুখী মৌনব্রতে, কেহ সুখী ধর্ম্মে, কেহ সুখী অধর্ম্মে; কেহ সুখী কুটিলতায়, কেথ সুখী সরলতায়; কেহ সুখী বাল্যে, কেহ সুখী যৌবনে; কেহ সুখী প্রৌঢ়ে, কেহ সুখী বার্দ্ধক্যে; কেহ সুখী পিতৃত্বে, কেহ সুখী মাতৃত্বে; কেহ সুখী পুত্রে, কেহ সুখী কন্যায়; কেহ সুখী অর্থোপার্জ্জনে, কেহ সুখী অর্থবিতরণে; কেহ সুখী ইষ্টসাধনে, কেহ সুখী অনর্থ-সংঘটনে; কেহ সুখী দাম্ভিকতায়, কেহ সুখী দারিদ্রতায়; কেহ সুখী ধনে, কেহ সুখী মানে; কেহ সুখী আত্মশ্লাঘায়, কেহ পরনিন্দায়; কেহ সুখী নিজের সুখে, আবার কেহ সুখী পরের অসুখে। এইরূপ আরও কত বলিতে পারা যায়। সুতরাং সুখের সংজ্ঞাও নাই, সীমাও নাই।

সুখকে আয়ত্ত করিতে হইলে, প্রথমে আপনাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। আপনাকে আয়ত্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় আপনার চিত্তকে বশ করা। মনুসংহিতায় আছে—যাহা কিছু আত্মবশে তাহাতেই সুখ; আর যাহা কিছু পরবশে তাহাতেই দুঃখ। ইহা অতীব সত্য। এই সহজ সত্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এত

দুঃখ ; অর্থাৎ এত সুখের অভাব। অতএব সুখ কিসে? কি করিলে সুখ পাওয়া যায়?

অনিত্য বস্তুতে সুখ নাই ; সুখ নিত্য বস্তুতে। সুখ সত্যের সন্ধানে। সত্যে যাহার প্রতীতি আছে এবং সত্য যাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে, —তিনিই যথার্থ সুখী। পরিমিত আহারে তৃপ্তি এবং পুষ্টি ; সুতরাং পরিমিত আহারেই সুখ। এই সহজসত্য যিনি অনুভব করিতে শিখিয়াছেন, তিনি কদাচ অপরিমিত আহারে আসক্তি দেখাইবেন না—তা হউক না কেন যতই সুমিষ্ট এবং সুরসাল সেই পরিমাণাতিরিক্ত ভোজ্য-পেয়। রসনায় তৃপ্তি হয় ততক্ষণ, যতক্ষণ না পরিমিত আহার হয়। পরিমিত আহারের পর যে আহারের প্রবৃত্তি তাহার নাম লোভ। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। রসনা তৃপ্তিপূর্ব্বক স্বাদগ্রহণ করে ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয় ; অর্থাৎ ততটুকু যতটুকু শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর—সার—সত্য। অতএব মানবজীবন যথাযথরূপে উপভোগ করিবার পক্ষে প্রধান এবং পরমোপযোগী সম্পদ হইতেছে সত্য। সত্য ব্যতীত তৃপ্তি নাই—সত্য ব্যতীত শান্তি নাই ; সত্য ব্যতীত সুখ নাই। সত্যের সেবা—সত্যের আশ্রয়,—ইহাই পরম ধর্ম্ম। এইজন্য ধর্ম্মের সহিত শরীরের এবং স্বাস্থ্যের এত নিকটসম্বন্ধ। আমাদের মুনি ঋষিরা দেহ ও দেহীর নিগূঢ় সম্পর্ক সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া আহারের সহিত ধর্ম্মেরসমন্বয় ও সামঞ্জস্যবিধান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দৃষ্টি অতি স্থূল, তাই আমরা তাঁহাদের মহৎ আদর্শের গূঢ় উদ্দেশ্য অনুভব করিতে না পারিয়া যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেই এবং শরীর ও মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করি। বিশ্ববিধাতার বিপুল সাম্রাজ্য বিধিনিয়ন্ত্রিত। তাঁহার প্রত্যেক বিধি এবং বিধান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য ব্যতীত জগতে কিছু নাই। যাহা সত্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা সত্য নহে, এবং যাহা সত্য নহে, তাহা সৎ হইতে পারে না। যাহা অসত্য, তাহা অসৎ। অতএব জীবনের প্রথম এবং প্রধান আদর্শ হইতেছে সত্য। এখন এই সত্যের সন্ধান এবং কি প্রকারে সম্ভব তাহাই বিবেচ্য।

জীবনে সুখ অথবা শান্তিলাভ করিতে হইলে, সত্যের সেবা করিতে হইবে। সত্যের সেবা করিতে হইলে, প্রথমতঃ সত্যের সন্ধান পাওয়া চাই। সত্যের সন্ধান যেমন দুর্ল্লভ, তেমনি সুলভ। কেহ কেহ যাবজ্জীবন সত্যের অনুসন্ধান করিয়াও সত্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়েন না। আবার কেহ কেহ মুহূর্ত্তের মধ্যে সত্যকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে আশ্রয় করেন। এই যে সত্যানুসন্ধিৎসা ইহার মূলে চাই নিষ্ঠা,—একান্তিক চেষ্টা। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জনের তদপযুক্ত নিষ্ঠা এবং একান্তিক চেষ্টা আছে? আমরা ওস্তাদের নিকট কষ্ট করিয়া গান শিখিতে চাহি না;—আমরা সাধ মিটাইতে চাই কলের গান শুনিয়া; অর্থাৎ যাহা আয়াস অথবা সাধনা সাপেক্ষ তাহা হইতে থাকিতে চাই দূরে। কিন্তু অশেষ কষ্টোপার্জ্জিত ওস্তাদের নিকট হইতে অর্জ্জিত সঙ্গীতের মধ্যে যে সত্য আছে,—ঐ কলের গানের মধ্যেও সেই সত্য আছে। প্রভেদ এই,—প্রথম ক্ষেত্রে সত্য আমাদের নিজেদের আয়ত্ত; দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও সত্য আমাদের আয়ত্ত বটে; কিন্তু সে অন্যের সাহায্যে। সহজে লাভ হয় অবিদ্যা। বিদ্যা অথবা জ্ঞান সহজে লাভ হয় না; সহজে লাভ করিতে হইলে অন্যের সাহায্যে লইতে হয়; কিন্তু অন্যের সাহায্য লইতে যাওয়া পরবশতা,—অর্থাৎ দুঃখ। সুতরাং আমাদের সঙ্কল্প দৃঢ় হওয়া চাই—যে আমরা সত্যকে যেমন করিয়া পারি আত্ম চেষ্টায় আয়ত্ত করিব; নতুবা আমাদের সকল শ্রম পণ্ড হইবে।

সত্য কঠোর সাধনা সাপেক্ষ; কেন না, সত্যই ধর্ম্ম। সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম নাই। সুতরাং দেবদুর্লভ সত্যের জন্য যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তাহাতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে কেন? যাহা আয়াস ব্যতীত আয়ত্ত করা যায়, তাহার মূল্য অতি কম,—তাহার জন্য লোকে আগ্রহান্বিত হয় না। কিন্তু এই সত্যের জন্য দেখিতে পাই, মহা মহা জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গও দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এই পরিশ্রমের পুরস্কার এমন মহার্ঘ্য যে, যখন সেই ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়, তখন সেই ফললাভ জনিত আনন্দে সকল কষ্ট দূর হইয়া যায়। সন্তানের মুখ দেখিয়া জননী যেমন প্রসব বেদনা বিস্মৃত হয়েন, সত্যসন্ধী

তেমনি সত্যলাভ করিয়া অতীত দুঃখ ভুলিয়া যায়েন। সত্যলাভ করিলে, বিষাদ দূর হইয়া যায় ; বিমল আনন্দে মনঃপ্রাণ বিভোর হয়।

আয়াস ব্যতীত আয়াস-লভ্য দ্রব্য লাভ করা যায় না,—সুতরাং সত্য-লাভ করিতে হইলে আয়াস,—অর্থাৎ অনুশীলন,—প্রয়োজন। অনুশীলন অভ্যাস করিতে হয়। এক দিনে যাহা আয়ত্ত করিতে না পারা যায়, অভ্যাস দ্বারা দশ দিনে তাহা অতি সহজে আয়ত্ত হইয়া যায়। যাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে, তাহারই অনুশীলন করিতে হয়। সত্যের সন্ধান করিতে হইলে—সত্যকে আয়ত্ত করিতে হইলে—সেই সত্যকেই আশ্রয় করিতে হইবে—সত্যেরই অনুশীলন করিতে হইবে ; যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। সকল ধর্ম্মের অনুশাসন—সদা সত্য কথা কহিবে। সত্য লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ সত্যবাক্ হইতে হইবে। মিথ্যা বলা যেমন সহজ, সত্য বলাও তেমনি সহজ ;—অভ্যাস-সাপেক্ষ মাত্র। আমরা বহুকাল পরাধীন অবস্থায় আছি, সেইজন্য আমাদের সৎসাহস বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে। যে যত পরাধীন, সে তত কাপুরুষ ; কারণ, প্রভুর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত তাহাকে নিয়ত অসত্য কথা বলিতে হয়। মনো-রঞ্জনের জন্য মিথ্যা কথা বলিতে বলিতে, মিথ্যা-কথন সহজ এবং স্বাভা-বিক হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমে বিবেকের কশাঘাতের তীক্ষ্ণতা মন্দীভূত হইয়া এমন অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, যখন বিবেকও বিকল হইয়া পড়ে। আমাদের বিবেক বিকল হইয়াছে—তাহাকে স্বভাবে পুন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সে অতি আয়াস সাধ্য ব্যাপার।

বহুদিন মুসলমানের এবং তৎপরে বহুদিন ইংরাজের শাসনাধীন হইয়া আমরা মনোরঞ্জন ব্যবসায়ে এমন পাকা হইয়াছি যে, মনোরঞ্জন করিতে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, এবং মিথ্যা অনন্তনিরয়গামী করে, সে কথা আমরা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। ফলে, আমাদিগকে মেকলের দুর্ব্বাক্য এবং কার্জ্জনের কুকথা নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। এখন আমরা এমনই মিথ্যাবাদী হইয়াছি যে, এই সনাতন সত্যের দেশে মহাত্মা গান্ধীকে সত্যাগ্রহের পুনঃপ্রচার করিতে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কি পরিতাপের বিষয় !

কেহ কেহ আমার এই লেখা পড়িয়া খড়্গহস্ত হইবেন; কেননা জগতে আমরাই যে একমাত্র মিথ্যাবাদী জাতি তাহা নহে। সকল জাতিই অল্পবিস্তর মিথ্যাবাদী;—আবার সকল জাতির মধ্যেই বহু কঠোর সত্যবাদী ব্যক্তিও বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে আমাদের এমন গুরুতর অপরাধ কি? আমাদের অপরাধ এই যে, আমরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াও মিথ্যাবাদী হইয়াছি। সোনার ভারত সত্যের আকর। ভারতের আদিম যুগ হইতে সত্যের প্রতিষ্ঠা—সত্যের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ; আমরা সেই প্রতাপ খর্ব্ব করিয়াছি। আমরা দেবতার সন্তান হইয়া দানব হইয়াছি।

ভারতবর্ষে যেমন সত্যের আদর্শ এমন আদর্শ পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে নাই। আমাদের অভিধানে সত্য এবং মিথ্যা এই দুইটি মাত্র আছে। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য; আর যাহা মিথ্যা, তাহা চিরকালই মিথ্যা। সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে কোন স্তর নাই। কিন্তু—নাম করিবার প্রয়োজন নাই—কোন কোন দেশে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে অনেকগুলি স্তর আছে। যথা,—সত্য, অর্দ্ধসত্য, পূর্ণ সত্য; মিথ্যা—শুভ্র মিথ্যা, কৃষ্ণ মিথ্যা। এই সকল আধুনিক সভ্যজাতির আদর্শ রাজনৈতিক চাতুরী, আর ভারতবর্ষের আদর্শ সনাতন সত্য। সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম নাই; এবং অসত্যাপেক্ষা অপকৃষ্ট অধর্ম্ম আর নাই। পরিমাণানুযায়ী সত্য, অথবা মিথ্যার, আদর কিংবা অনাদর এই শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্যের দেশে কখনই প্রচলিত ছিল না। সত্যের ঈষৎ অপলাপ যেমন মিথ্যা—সত্যের বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জনও তেমনি মিথ্যা। তবে স্থান, কাল এবং পাত্র হিসাবে কখন কখন মিথ্যা বলিবার ব্যবস্থা আছে—তাহা ব্যবহারিক শাস্ত্র। তাহাও এমন ক্ষেত্রে—যেখানে মিথ্যার সাহায্যে মিথ্যাপেক্ষা সহস্রগুণেশ্রেষ্ঠ প্রাণ, অথবা ধর্ম্ম, রক্ষা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু আর্য্যগণ কখনই সত্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই; অথবা সত্যের আবরণে মিথ্যাকে প্রচলিত করিতে ব্যর্থপ্রয়াস পান নাই।

সত্যের মহিমা ভারতবর্ষ কিরূপে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার দুই একটি

উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য বিষয় বিশদ হইবে। সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে মনে পড়ে। পিতার ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধন নিমিত্ত রাজপুত্র দেবব্রত আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জীবনে কখন সত্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। যে বিমাতার পুত্রের রাজ্যলাভ হেতু তিনি চিরকৌমার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর সেই বিমাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যেও তিনি সে সত্য ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহাপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্ট বস্তু থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুর রস পরিত্যাগ করে, জ্যোতিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা পরিত্যাগ করে, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" সত্যপরাক্রম ভীষ্মের এই সত্যানুরাগের নিকট পৃথিবীর যাবতীয় সত্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায়

তত্ত্বকথা

প্রেম আর ভক্তি দুটি অপার্থিব ধন।
বহু ভাগ্যে মিলে কভু এ হেন রতন ॥
অথচ এ প্রেম ভক্তির এত ছড়াছড়ি।
কথায় কথায় লোকে যায় গড়াগড়ি ॥
কেবা ভণ্ড, কেবা খাঁটি, চেনা বড় দায়।
ধরা পড়ে সব, শুধু ত্যাগের বেলায় ॥
ত্যাগের কষ্টি পাথরে ঘষ যদি সবে।
ভণ্ড হবে চুপ, শুধু খাঁটি টিকে রবে ॥

—বিজ্ঞানী।

স্বদেশ-প্রেম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধর্ম্মকেই রাজনীতিক আন্দোলনের ভিত্তি করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য দেশের উন্নতি করা। দেশের উন্নতি করা অর্থ দশের উন্নতি করা। দেশের রাজনৈতিক উন্নতি যাহারা প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগকে দেশবাসীর সেবা করিতে হইবে। পরসেবা জীব-সেবা ইহাই পরমাত্মার সেবা ; সুতরাং ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সাধন। অতএব রাজনীতি কিরূপে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহাদ্বারাই প্রমাণিত হইল। জীবের সেবা করাই ধর্ম্মের অঙ্গ, ইহা স্মরণ রাখিয়া ধর্ম্মকেই ভিত্তি করিয়া স্বদেশসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

"আগামী পঞ্চাশৎবর্ষ ধরিয়া সেই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন। অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন। এই দেবতা একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্ব্বত্রই তাহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাহার কর্ম্ম, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে, আর তোমার সম্মুখে তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না ? যখন তুমি ঐ দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে। তোমার প্রথম পূজা বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা ; ইহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে। এই সব মানুষ, এই সব পশু ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে।"

জননী-জন্মভূমিরূপ বিরাট দেবতার উপাসনা করিতে হইবে এবং এই দেবতার উপাসনা করিবার যোগ্য হইবার নিমিত্ত দ্বেষ, হিংসা পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র, সাহসী, নিঃস্বার্থপর হইতে হইবে। দেশসেবা ও ঈশ্বর সেবা একই, ইহাই স্বামিজী বুঝাইতেছেন। দেশসেবা করিতে গেলেও পবিত্র সত্যবাদী দ্বেষশূন্য ও সাহসী হইতে হইবে। যদি মহাত্মাপ্রবর্তিত আন্দোলনকে একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে এই যুদ্ধকে ধর্ম্মযুদ্ধ মনে করিতে হইবে। এই যুদ্ধে যাহারা যোগ দিবেন, তাঁহাদের বুকের পাটা, দৈর্ঘ্য, শারীরিক শক্তি মাপিতে হইবে না। কিন্তু তাঁহাদের সংযম, পবিত্রতা, ত্যাগের পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া যোদ্ধশ্রেণী-ভুক্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত হইয়া এই যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই মহাত্মা যাকে তাকে ভলান্টিয়ার শ্রেণীভুক্ত করিতে নারাজ। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশাবলী প্রত্যেক মানুষের পাঠযোগ্য—তাঁহার উপদেশ পড়িলে ধর্ম্মমন্দিরে যাইয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার ফল হয়। তাঁহার উপদেশ পালন করিলে মানুষ দেবতা হয়। আমি তাঁহাকে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, সেমতে আমার মনে হয়, তাঁহার রাজনীতির সারমর্ম্ম এই—

আমি রাজনীতি বুঝি না, বুঝি জীবে প্রেম। আমি জানি, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" আমি আমার প্রতিবেশীকে, আমার স্বদেশবাসীকে ভালবাসিব। তাহাদিগকে ভালবাসিয়া পাগল হইয়া যাইব। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া আমি কাতর, আমি অস্থির। তাহাদের দারিদ্র্য, তাহাদের অজ্ঞানতা স্থায়িভাবে দূর করিতে হইবে; ইহাদিগকে মনুষ্যত্বদান করিতে হইবে। আমি স্বাধীনতা বুঝি না, আমি রাজনীতি বুঝি না, আমি ভোট বুঝি না, আমি ইলেকশন্ বুঝি না। আমার দুঃখী দরিদ্র অজ্ঞ ভাইদের আমি জানি, তাহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা না করিলে যে আমার হৃদয়ের জ্বালা দূর হয় না। আমার প্রাণে শান্তি আসে না, তাই আজ আমি গৃহী হইয়া সন্ন্যাসী, ধনকুবের হইয়াও পথের ভিখারী। বুদ্ধদেব আমার আদর্শ—যিনি রাজপুত্র হইয়াও দুঃখী-দরিদ্রের প্রেমে পাগল হইয়া পথের ভিখারী

সাজিয়াছিলেন।—এইত মহাত্মার জীবন, এই স্বামিজীর বাণী। এই ভাব নিয়াই আমাদের স্বদেশসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে।

পাশবিক বল শ্রেষ্ঠ, না আধ্যাত্মিক বল শ্রেষ্ঠ এই পরীক্ষা ভারতে চলিতেছে। মহাত্মাগান্ধী প্রবর্ত্তিত আন্দোলন মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণে উদ্ধৃত একটী গল্পের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। গল্পটী এই :—

"রাজা সেকন্দর ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মমত শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দন্দমিসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কারণ তিনিই এই সম্প্রদায়ের গুরু ও শিক্ষক ছিলেন। অনীসিক্রাটিস তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। তিনি মহাত্মা দন্দমিসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণকুলের শিক্ষক, কল্যাণ হউক, মহানদেব জিয়ুয়ের পুত্র সমগ্র মানব জাতির প্রভু, রাজা সেকন্দর আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। আপনি তাঁহার নিকট গমন করিলে প্রচুর মহার্ঘ্য উপঢৌকন প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু যদি না যান, তিনি আপনার শিরশ্ছেদন করিবেন।"

দন্দমিস্ মৃদুমধুর হাস্যসহকারে সমুদায় কথা শুনিলেন। তিনি পর্ণশয্যা হইতে মস্তকও উঠাইলেন না; কিন্তু তাহাতে শয়ান থাকিয়াই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, 'মহান্ রাজা পরমেশ্বর কখনও স্পর্দ্ধাপ্রসূত অন্যায়ের সৃষ্টি করেন না; তিনি আলোক, শান্তি প্রাণবারি মানবদেহ ও আত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা। একমাত্র তিনিই আমার প্রভু ও দেবতা। তিনি নরহত্যা ঘৃণা করেন এবং কখনও যুদ্ধের জন্য কাহাকেও উত্তেজিত করেন না। সেকন্দর ঈশ্বর নহেন; * * * যিনি এখন পর্য্যন্ত আপনাকে সমগ্র পৃথিবীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বের প্রভু হইবেন? সেকন্দর যাহা কিছু দিতে চাহিতেছেন ও যাহা কিছু উপঢৌকন দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন, সেই সমুদয়ই আমার নিকট অকিঞ্চিৎকর। এই পত্রগুলি আমার গৃহ, পুষ্পপল্লবশোভিত উদ্ভিজ্জ আমার উপাদেয় খাদ্য, জল আমার পানীয়, আমার পক্ষে এই সমুদয়ই মনোরম, মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয়। আর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি—লোকে আকুল হইয়া এত যত্নের সহিত যাহা সঞ্চয় করে—সঞ্চয়ীর বিনাশের

কারণ; তাহাতে দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নাই; মানবমাত্রেই এই দুঃখে পরিপূর্ণ। মাতা যেমন সন্তানকে দুগ্ধ দেন, পৃথিবী তেমনি আমাকে প্রয়োজনীয় সমুদয়ই দিতেছে। আমি কিছুর জন্যই উদ্বিগ্ন নহি এবং কিছুরই অধীন নহি। সেকন্দর যদি আমার শিরশ্ছেদন করেন, তিনি আমার আত্মাকে বিনাশ করিতে পারেন না। * * যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য ধনৈশ্বর্য্যের জন্য লালায়িত ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত, সেকন্দর তাহাদিগকেই এই সকল বিভীষিকা প্রদর্শন করুন; কেননা, আমাদের বিরুদ্ধে এই দুই অস্ত্রই ব্যর্থ; কারণ, ব্রাহ্মণগণ, ধনের আকাঙ্ক্ষা করেন না ও তাঁহারা মৃত্যুভয়কেও ভয় করেন না। তবে যাও, সেকন্দরকে বল, "আপনার কোন বস্তুতেই দন্দমিসের আবশ্যক নাই; সুতরাং তিনি আপনার নিকট যাইবেন না, কিন্তু আপনার যদি দন্দমিসের আবশ্যক থাকে, আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন।" সেকন্দর অনীসিক্রাটিসের প্রমুখাৎ এই সমুদায় শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অধিকতর ব্যগ্র হইলেন; কারণ একমাত্র এই নগ্নদেহ বৃদ্ধ, বহু জাতির বিজেতা সেকন্দরকে পরাজিত করিয়াছিলেন।"

কোথায় দিগ্বিজয়ী সেকন্দর আর কোথায় নগ্নদেহ বৃদ্ধ দন্দমিস। আবার এই যুগে একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, অপরদিকে কটীমাত্র বস্ত্রাবৃত মহাত্মা গান্ধী। পার্থক্য, সেকন্দর শাহ গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি মহাত্মা দন্দমিসকে দেখিতে ব্যগ্র হইলেন, এবং তাঁহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলেন না কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আজ শারীরিক স্বাধীনতায় বঞ্চিত।

অনেকে আশঙ্কা করেন যে, গবর্ণমেণ্টের নিপীড়ন-নীতির ফলে বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় উদ্ভূত বিপ্লববাদিগণ আবার তাহাদের হিংসা-নীতি-সহায়ে দেশসেবা করিতে আয়োজন করিতে পারেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসের প্রাচীন সেবকগণের বক্তৃতাদির ফলে ইংরেজ বিদ্বেষভাব দেশের শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এখনও দেশ হইতে সেই ভাব অন্তর্হিত হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের বিপ্লববাদিগণ এখনও জীবিত, তাহাদের মতের যে

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কংগ্রেস যখন আইন-অমান্যের উপর খুব ঝোঁক দিয়াছিলেন, তখন দলে দলে যুবক জেলে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু বরদলইতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির ফলে যুবকগণ যখন গঠনকার্য্যে অর্থাৎ প্রকৃত দেশসেবার কার্য্যে আহূত হইলেন, তখন তাঁহারা সাড়া দিলেন না ; ইহাও কি ভীতিজনক নহে ? যুবকগণের এই উদাসীনতা, ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে যে, আমাদের দেশের যুবকগণ সেই সব কার্য্যই ভালবাসেন, যাহাদ্বারা তাঁহারা ইংরেজবিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে পারেন। বঙ্গীয় যুবকগণের প্রাণে স্বদেশপ্রেম অপেক্ষা বিদ্বেষভাবের আধিক্যই বর্ত্তমান। তাহারা গড়া অপেক্ষা, ভাঙ্গা অধিক ভালবাসেন। তাহাদের প্রাণে নিহিত এই বিদ্বেষাগ্নিকে বাতাস দিয়া জাগাইয়া তুলিবার লোকেরও অভাব নাই। বঙ্গীয় যুবকগণের হৃদয় এখন ফাঁকা, নিষ্ক্রিয়—আইন-অমান্যের হুজুগ নাই, আবার গঠন-কার্য্যেও তাহাদের আকর্ষণ নাই। সুতরাং এ অবস্থায় যে কেহ একটা উত্তেজনা-পূর্ণ আদর্শ তাহাদের সম্মুখে খাড়া করিয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ। তাহারা বরদলই প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়া যদি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিতে মনোনিবেশ করে, তবে তাহার নেতৃরূপে পুরাতন বিপ্লববাদি-গণের যে সহানুভূতি ও সহায়তা পাইবে না, তাহার বিশ্বাস কি ?

এমন কি নরমপন্থিগণও মনে করিতে পারেন যে যুবকগণ যদি বিপ্লববাদীদের সঙ্গে যুক্ত হন তবে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন যুবকগণের সাহায্য বঞ্চিত হইয়া অতিশীঘ্র হীনবল হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে এবং অসহযোগ আন্দোলন নষ্ট হইয়া গেলে, তাহারা (নরমপন্থিগণ) গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিপ্লববাদিগণকে ধ্বংস করিতে পারিবেন। এই সব কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে হয় বঙ্গীয় কাউন্সিলের জনৈক সভ্যের পকেটে গুপ্ত সমিতি বিষয়ক সংবাদ একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে তিনি যে সামান্য কথাটুকু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেন আমাদের নেতৃবর্গ ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া না দেন। আবার যাহাতে গুপ্ত সমিতি, বোমা সমিতি প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া দেশে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া না দেয় সেই চেষ্টা এখন হইতেই

করা উচিত। গুপ্তসমিতির গুপ্ত চরগণ যেন আবার গ্রামে গ্রামে লুক্কায়িত ভাবে বিচরণ করিয়া অল্পবুদ্ধি বালকগণকে স্বাধীনতার প্রলোভন দেখাইয়া বিপথে লইয়া যায় না। দেশের যাহারা হিতৈষী, তাহাদের এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কংগ্রেসের দল হইতে অকর্ম্মণ্য লোকগুলিকে বাছিয়া পৃথক করিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি...... সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বালকগণ ও যুবকগণকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সংযমী, সত্যবাদী, সৎ ও স্বদেশ প্রেমিক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। অকর্ম্মণ্য লোকগুলি বক্তৃতা করিয়া 'বাহবা' পাইবে এই কাজেই তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখা দরকার। তাহা হইলে গঠন কার্য্যে তাহারা মিশিয়া সব কাজ পণ্ড করিতে পারিবে না।

যুবকগণের কাছে নিবেদন এই যে, স্বামিজী ও মহাত্মা উভয়েই বুঝিয়াছেন যে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতের মঙ্গল হইবে না। হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকেই ভারতের রাজনীতির মেরুদণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করিতে উভয়েই উপদেশ দিতেছেন। বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন এবং হিংসামূলক গুপ্ত সমিতির প্রবর্ত্তন উভয়ই পাশ্চাত্য জগৎ হইতে ভারতে আমদানি। উভয়ই পাশ্চাত্যের অনুকরণ মাত্র। উভয়ই ত্যাজ্য। বর্ত্তমান যুগের দুই মহাপুরুষের উপদেশ অমান্য করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণ কি বাস্তবিকই আবার দেশে হিংসার নীতি আনয়ন করিবেন? যুবগণের অবগতির জন্য মহাত্মা বঙ্গীয় বোমার দলকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন পুনরায় উদ্ধৃত করিতেছি—

"Politics should not be divorced from religion. * * * Some of the students of my country are fired no doubt with zeal in their minds and with love for their motherland but they do not know how they should love her best * * I must say that misguided zeal that resorts to dacoities and assassinations cannot be productive of any good. These dacoities and assassinations are absolutely a foreign growth in India. They cannot take root here and cannot

be a parmanent institution here. I would advise my young friends to be fearless, sincere and be guided by the principle of religion. If they have a programme for the country let them place it openly before the public. If they are prepared to die, I am prepared to die with them, I am ready to accept their guidance. But if they want to terrorise the country I will rise against them."

দেশের অভাবগুলি বুঝিয়া উহা দূর করিতে চেষ্টা করা দেশ-সেবকের কর্ত্তব্য। অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব এই চারিটিই দেশের প্রধান অভাব। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণই আমাদের মনুষ্যত্বলাভের প্রধান অন্তরায়। পাশ্চাত্যকে আমরা গুরুস্থান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। পাশ্চাত্যের অনুকরণ শিক্ষিত-সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। কেহ অনুকরণ করিতে চান গুপ্ত সমিতির, বোমা সমিতির ; কেহ বা অনুকরণ করিতে চান পোষাক-পরিচ্ছদের, চাল-চলতির। এই দাস-সুলভ অনুকরণ-স্পৃহা সমাজে সুন্দরভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে। স্বাধীন চিন্তা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনের বিরোধী—সরল, পবিত্র, সাধু ও আনন্দপূর্ণ জীবনের পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্জ্জন করিতে তিনি বার বার উপদেশ দিতেছেন—আর স্বামী বিবেকানন্দ অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন—

"পাশ্চাত্য অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইয়াছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধিবিচার, শাস্ত্র বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের যে আচারের প্রশংসা করে তাহাই ভাল ; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি ?"

"পাশ্চাত্য নারী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল ; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ম্বরা অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান ;

পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে, মূর্ত্তিপূজা অতি দূষিত সন্দেহ কি? পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্য-বিবাহ সর্ব্ব দোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।"

"বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে লাগে দুর্ব্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইয়োরোপীয় বেশভূষা মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়; বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন, দরিদ্র, ভারতবাসার সহিত আপনাদের জাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত।"

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতার সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে;—ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়া মাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল,—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ,

ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন বি-এ, বি-টি

অখণ্ড বেদ *

(১)

রুদ্ধ দ্বারের পাশে.
পান্থ দাঁড়িয়ে এসে,
        কর'ল আঘাত জোরে।
ভিতর হ'তে যেন ;
একটী হ'ল প্রশ্ন ;
        "কে তুমি হে মোর দো'রে" ?
পান্থ কহিল ধীরে
হ'বে আলাপ পরে
        দোর খুলে দাও আগে'।
উত্তর হ'ল যেন,
"স্থান নাই যে কোন ;
        হেথায় তোমার লে'গে"।

(২)

রুদ্ধ দ্বারের পাশে,
দ্বিতীয় পান্থ এসে ;
        পুনঃ করাঘাত করে।

* সুফী কবি হাফেজের কবিতা অবলম্বনে। উঃ সঃ

হ'ল প্রশ্ন আবার,
ভিতর হ'তে তার ;
"কে তুমি হে মোর দো'রে ?"
কহিল পান্থ ধীরে,
'জান যে তুমি মোরে ;
চেন মোরে খুল দ্বার'।
উত্তর এল দ্বারে,
"এস খানিক পরে,
স্থান হ'বে তোমাকার"।

(৩)

রুদ্ধ দ্বারের পাশে,
তৃতীয় পান্থ এসে ;
ক'রল আঘাত যেই।
"কে তুমি মোর দ্বারে ?"
জিজ্ঞাসা হ'ল তারে,
একই প্রশ্নটি সেই।
কহিল পান্থ—'আমি—
তুমি, তুমিই—আমি
কিছুই নাই'ক ভেদ'।
দ্বার খুলিয়া গেল,
দু'য়ে একই হ'ল—
একই অখণ্ড বেদ।

—শ্রীনিবারণচন্দ্র নন্দী

সংসার

দশম পরিচ্ছেদ

বরযাত্রীদের চলিয়া যাওয়ার পর কিশোরীমোহনবাবু ব্রজবাবুকে ডাকিয়া তাঁহার পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলেন, এবং নিতান্ত আর্ত্তস্বরে বলিলেন,—"গুরুদেব! এখন উপায় কি হবে? আমি কাণ্ড-জ্ঞান-হীন মূর্খের মত একি ক'রে বস্‌লাম? আমার প্রাণের চেয়েও যে বেশী যত্নের ধন, তারই সর্ব্বনাশ করলাম প্রভু! এর কি কোনও প্রতিবিধান সনাতন ধর্ম্মে নেই?" গোস্বামী মহাশয় সস্নেহে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন, এবং অভয়দান করিয়া বলিলেন,—"দেখ কিশোরী! তুমি একজন উচ্চপ্রকৃতির শিক্ষিত লোক, তোমার কি এত অধীর হওয়া চলে? একবার ভেবে দেখ দেখি, তোমার এরূপ ব্যবহারে মেয়েদের অবস্থা কি হবে? শুধু তাই নয়,—যার জন্য তুমি এরূপ আকুল হ'য়েছ, সেও নিতান্ত ছোট নয়। সে গীতা-ভাগবত-রঘুবংশ পড়েছে, সুতরাং সংসারের অবস্থা যে একেবারে না বুঝে, তাও নয়। এ অবস্থায় সে হয়ত আর একটা অনর্থপাত ক'রে তোমায় হয়ত একেবারে পাথর বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিতে পারে। আজকালকার যা দিন-কাল পড়েছে—বাবা বল্‌বার নয়! খবরের কাগজে প্রায় রোজই ত পড়ি,—অমুক জায়গায় অমুকের মেয়ে আত্মহত্যা ক'রেছে। সবদিক্ বুঝ;—আর মনে কর এটা কিছুই নয়।"

কিশোরীমোহনবাবু বলিলেন,—"অবশ্যই আমি সে ভাব্‌তে বাধ্য, এবং আমি তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ও মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কি হবে?" গোস্বামী মহাশয় একটু জোরের সহিত বলিলেন, —"আরে বাপু বিয়ে নাই বা দিলে? কেন আমাদের দেশে কি ব্রহ্মচারিণী হওয়া নিতান্ত আকাশ-কুসুম তুমি ভাব? মেয়েকে শিক্ষা দাও, সে অন্তর্জগতের সার উপলব্ধি ক'রতে শিখুক। আমরা বুড় সেকেলে লোক।

আর তোমরা ইংরেজি পড়া সেদিনের মানুষ হ'য়ে এ ভুল বুঝ না? বিয়ে—আর—বিয়ে! আরে বাবা! নাই বা হলো বিয়ে ক্ষতি কি তায় হ'য়েছে? তুমি মেয়েকে যে শিক্ষার পথ ধরিয়েছ, সেত সত্যি সত্যিই আমার মা হ'য়ে উঠ্‌বেন। মার ধর্ম্মভাব দে'খে বড় সুখী হ'য়েছি। আমার বিশ্বাস তুমি এই বিবাহের আয়োজন ক'রে তার হৃদয়ের উপর মস্তবড় একটা জোর-জবরদস্তী আরম্ভ ক'রেছিলে। কিন্তু মঙ্গলময় হরি আজ মঙ্গলের জন্যই তোমাদের দুই জনকেই এই শুভ-লগ্নে তাঁর আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন। তুই ভাবিস কেন বাবা? এ শুভ-লগ্ন-ভ্রষ্ট নয়, কুলগ্নের হাত থেকে পরিত্রাণ! শ্যামচাঁদকে ডাক, কোন ভয় নাই; তিনি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিবেন। কিশোরী! আজ আমারও চোখ ফুটেছে। আমি ওর ভিতর একটা মস্তবড় জিনিসের সন্ধান পেয়েছি। অবশ্য বাহ্য দৃষ্টিতে তোমার আমার কাছে যাই হোক, কিন্তু ঠিক পথে চল্‌তে দিলে ওটা ফেলার জিনিস নয়। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—মেয়ে যখন একটু বয়স্থা হয়েছে, তখন বিবাহে তার সম্মতি লওয়া হয়েছিল কি? অবশ্য এটা আমাদের দেশে এখন নিন্দনীয় প্রথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটার মধ্যে যে একটা মহান্ উদারতা আছে, তা কি অস্বীকার করতে পার? যদি তুমি নয় বৎসর বয়সে মেয়ের বিয়ে দিতে,—আমি বল্‌তাম, ওসবের কিছুরই আবশ্যক নেই। কারণ তখন ধূলা-খেলাই যে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ-চিন্তা সব। সে তখন নিজের বিষয়ে কিছুই ভাবতে জানে না, খাওয়া-খেলা ছাড়া জগতের আর কাকেও চিনে না। কিন্তু যে কৈশোর উত্তীর্ণা হ'য়েছে, যাকে তুমি গীতা মহাভারত, আরও কত বাঙ্গলা—সংস্কৃত কাব্য-ইতিহাস পড়িয়েছ, যার সম্মুখে সতী-সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী প্রভৃতি ভারত-নারীদের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে পথ চিন্‌তে শিখিয়েছ, যাকে তুমি ভারতীয় আদর্শের মহিমা বুঝিয়ে দিয়ে চিন্তা করতে অবকাশ দিয়েছ, তার উপর এখন ত আর জোর-জুলুম চল্‌বে না বাপ! মানুষের শরীরের উপর জোর চলে, হৃদয়ের উপর কারও জোর চলে না। যদি জোর করতে যাও, তবে তা চিরদিনের মত বিদীর্ণ হ'য়ে কেবল তপ্ত-অনলই বর্ষণ করবে,

আর তার জীবনের সমস্ত সুখের কল্পনা,—যাকে তুমি আমি লোভনীয় ব'লে মনে করি, সেগুলি সব তার কাছে জ্বালার উপর দ্বিগুণ জ্বালা বই আর কিছু হবে না। যদি বল মত নেওয়াই বা সম্ভব কিরূপে ? সে মত দিবেই বা কেন ? কথাটা ঠিক ; কিন্তু যার সুখের আয়োজন করছ, তার অন্তর সে আয়োজনে সুখ বোধ করছে কিনা এটা বুঝে ওঠা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নয়। আমি মাত্র এই কয়দিন এখানে থেকেই বেশ বুঝেছি, তুমি ভয়ানক জোর-জুলুম দ্বারাই শুভানুষ্ঠানকে সম্পন্ন ক'রতে চেয়েছিলে,—ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওনি।”

কিশোরীমোহনবাবু নির্ব্বাক-বিহ্বল হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের সমস্ত কথা শুনিয়া শ্রদ্ধায় অবনত-মস্তক হইয়া তাঁহার চরণ ধূলি গ্রহণ করিলেন, এবং মনে মনে বলিলেন,—‘এইত আমার উপযুক্ত গুরু’ ! তারপর প্রকাশ্যে বলিলেন,—“গুরুদেব ! আপনার কথা আমি সবই বুঝ্‌লাম। আর এ সম্বন্ধে যে আমি পূর্ব্বে কিছুই চিন্তা করিনি, এমনও নয় ; কিন্তু নানা কারণে আমার মনের চিন্তা মনেই মিলিয়ে গিয়েছিল। বল্‌তে কি আমি কোন ভরসা খুঁজে পাইনি ; আজ আপনার কথায় আমার হৃদয় এক নূতন বলে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। আপনি আমার পিছনে শক্তি যোগালে আমি জগতের আর কাকেও ভয় করি না। আপনি আমার কাণ্ডারী, —তাই আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত নই।”

কিশোরীমোহনবাবু আজ বহুদিন হইতে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য, কিন্তু তাঁহার এত উদার-প্রশান্ত হৃদয়ের খবর ত তিনি রাখেন নাই ? তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিলেও সেকেলে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা যে তাঁহার করুণ-হৃদয় এত উচ্চে সে কথা জানিতেন না। গোস্বামী মহাশয় একজন বৈষ্ণব-শিরোমণি এবং পণ্ডিত ছিলেন। তবে তিনি শাস্ত্রের নানারূপ কুটীল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক অধিকাংশ স্থানেই উদার-ভাব গ্রহণ করিতেন। তাহা ছাড়া তিনি একজন ভক্তি-সাধনের উপযুক্ত পূজারী ছিলেন। এককালে তিনি গৃহীই ছিলেন ; কিন্তু ভগবান সে সব পার্থিব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার জ্বালা-যন্ত্রণা-হীন চির-শান্তিময় পথে

টানিয়া লইয়াছেন। তাই তিনিও আজ অনন্ত পথের নির্ব্বান্ধব একলা-পথিক হইয়া সেই মুখেই চলিয়াছেন,—যেখানে তাঁহার সব পিপাসা মিটিয়া যাইবে।

তাঁহার সন্তানের মধ্যে দুইটি মাত্র কন্যা,—তা দুই জনেরই বিবাহ দিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মাঝে মধ্যে তাহাদের তল্লাস-তত্ত্ব লইতেন, এই পর্য্যন্ত। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাঁহার পূজা-পাঠ গীত-বাদ্য ইত্যাদিতেই কাটিত। মধ্যাহ্নে একবার মাত্র স্বহস্তে পাক করিতেন; তাও আবার একপাকে যা হ'ত তাহাতেই পরম তৃপ্তির সহিত শ্যাম-চাঁদের ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতেন। তবে বাড়ীতে তাঁহার লোকের অভাব ছিল না; কারণ তিনি একজন খুব ভাল কীর্ত্তনের গায়ক এবং খোলের বাদ্যও বেশ ভাল জানিতেন। নবদ্বীপ অঞ্চলে এবং অন্যান্য স্থানে তাঁহার এ সম্বন্ধে বেশ খ্যাতি ছিল; তাই প্রায়ই দশ-পাঁচ-জন শিষ্য তাঁহার নিকট সকল সময় থাকিত। তিনি যখন ভাব-বিহ্বল হইয়া কীর্ত্তন গাহিতেন তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকিত না; দর-বিগলিত ধারায় বক্ষস্থল সিক্ত হইত এবং ভক্তি-উচ্ছ্বসিত মধুর কণ্ঠস্বর আবাল-বৃদ্ধ শ্রোতার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া মুগ্ধ-তন্ময় করিয়া ফেলিত।

এহেন গোস্বামী মহাশয়কে কিশোরীমোহনবাবু তাঁহার বিপদের কাণ্ডারিরূপে পাইয়া বড়ই কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার চিন্তা-প্রপীড়িত আকুল-হৃদয় কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। তিনি গোস্বামী মহাশয়কে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুরুদেব! আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই। আমার ইচ্ছা শান্তিকে কিছুদিনের জন্য একটী উচ্চ-ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিন। কারণ বাড়ীতে থাক্‌লে হয় ত এই সব ঝঞ্ঝাটের একটা প্রতিক্রিয়া তার মনকে বিচলিত করতে পারে। এ অবস্থায় তাকে চিন্তার প্রচুর অবসর না দিয়ে কোন কাজে নিযুক্ত করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত।" গোস্বামী মহাশয় অতিমাত্র চিন্তা-গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"সে কিগো! চিন্তার অবসর দিবে না ব'লে যে একেবারে কালেজে পাঠাতে হবে তার মানে কি? আমি ত দেখ্‌ছি তুমি ওকে কালেজের উপাদানে প্রস্তুত করনি। এখন কি

আর ওর মনে সেখানকার শিক্ষায় বেশ সামঞ্জস্য ঠেক্‌বে? কি জন্য একথা বল্‌লে আমি ত বুঝতে পারলাম না।"

কিশোরীমোহন বাবু বলিলেন,—"বাড়ীতে আমি ওকে শিক্ষার অবসর যথেষ্ট দিয়েছি। আমার মনে হয় ঐ বয়সে স্কুলে থাক্‌লে তার এত বেশী শিক্ষা হ'ত না। শান্তির ধারণা-শক্তি এবং মনের সূক্ষ্ম-অনুভূতি তার সমবয়সী যে কোন স্কুলের মেয়ের চেয়ে বেশী। কিন্তু তা হ'লেও কোন সুযোগে আমি তুলনামূলক বিচারের অবকাশ পেয়ে দেখেছি যে, তার হৃদয় উচ্চভাব গ্রহণ করতে পারলেও কোন কোন বিষয়ে যেন একেবারে অপূর্ণ। স্কুলের অনেক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে সাধারণতঃ স্কুলের মেয়েরা সব বিষয়েই যেমন সপ্রতিভ হয়ে উঠে শান্তি তা পারেনি। বাড়ীতে প্রত্যেক বিষয় বই প'ড়ে যা শিখ্‌বে, স্কুলে শুধু মেলামেশার ফলেই আপনি সেই শিক্ষার বীজগুলি অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠ্‌বে। আমার মনে হচ্ছে—আমার এতদিনের যত্ন-পরিশ্রম বোধ হয় সফল হবে।"

কিশোরীমোহন বাবুর যুক্তি শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় যেন ঈষৎ বিরক্তির ভাবে বলিলেন,—"কিম্বা একেবারে নিষ্ফলও হ'তে পারে। কিশোরী! তুমি যা বল্‌তে চাও আমি তা বুঝেছি। কিন্তু সেরূপ উচ্চাঙ্গের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কোথায় বাপ? সম্প্রতি আমি দেশে যে সকল উচ্চ স্ত্রীশিক্ষালয় দেখ্‌ছি, সেগুলি কেবল পুরুষদের গোলামী শিক্ষার অনুকরণেই গঠিত। ও শিক্ষালয়ে আমাদের দেশের নারী তৈরী হওয়া একবারেই অসম্ভব। তোমার আমার মত গরীব বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে ওসব বিলাসের শিক্ষালয়ে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা। তবে বিলাসী বড়লোকের কথা স্বতন্ত্র। আমি জানি বাড়ীর শিক্ষায় আর স্কুলের শিক্ষায় অনেক তফাৎ; কিন্তু উপায় কি? তোমার মেয়েকে যদি তুমি প্রকৃত নারী—স্নেহময়ী জননী করতে চাও, যদি দেশের অবস্থানুযায়ী গরীব গৃহস্থের গৃহিণী ক'রতে চাও, তবে তোমার দেওয়া এই বাড়ীর শিক্ষাই যথেষ্ট। যে সকল অপূর্ণতা আছে, বয়সের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনে আপনি পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে। আর যদি সহরের ফুরফুরে বিবি বানাতে চাও তবে স্কুল কালেজে যেখানে খুসী দিতে পার। আমি অস্বীকার করি না যে,

স্কুলে অনেক নূতন কার্য্যকরী বিদ্যা শিখ্‌বে; কিন্তু তার সঙ্গে আরও এমন কতকগুলি অভিনব আদব-কায়দা চাল-চলন উদরস্থ ক'রবে যে, তা আমাদের দেশের গরীব গৃহস্থের পক্ষে সম্পূর্ণ বিড়ম্বনাময়। এখানে এখন স্ত্রীশিক্ষার নিতান্ত আবশ্যক হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তাই ব'লে থান-কতক ইংরেজী কিতাব পড়লেই সে শিক্ষার অভাব পূর্ণ হবে না। একটী গৃহস্থের উপযুক্ত গৃহিণী হ'তে হ'লে তাকে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, স্কুলে তার অনেক বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সকল শিক্ষার সার যে শিক্ষা,—সেই ভারতীয় সংযম, আচার-নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা স্কুলে আদৌ নাই। তাই যা এক আধটু শিখে সব ম্লান হ'য়ে পড়ে। মনে হয় এশিক্ষা যেন আমার অন্তরের শিক্ষা নয়, শুধু বাহিক চাকচিক্যময় নকল আড়ম্বর মাত্র। আমরা চিরদিন জানি, 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।' কিন্তু আজকালকার বিদ্যার মহিমায় আমাদের মা জননীরাও বিষধর সাপের মত ফণা বিস্তার করতে শিখ্‌ছেন। এসব দেখে মনে হয়, বুঝিবা সেকেলে দিদি-ঠাকুমার দলই ছিল ভাল। মনে ক'র না বাপ যে আমি আধুনিক সভ্যতাকে নিন্দা করছি। পরিবর্ত্তন আমিও খুব চাই। কিন্তু সামঞ্জস্য রেখে যেতে হবে। আমি যদি দেশের জল-হাওয়ার কথাটাও না ভাবি একেবারেই বিদেশী সেজে বসে থাকি, তবে কি নিজের বাড়ীতে থেকে নিজের কাছেই পর হব না? আজকালকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার যে সকল উচ্চাঙ্গের শিক্ষালয় হয়েছে, সেগুলি একমাত্র বড়লোকের জন্য। ওসব স্বপ্নের কল্পনা আমাদের বাড়ীতে সাজে না। এখন আমাদের নিতান্ত দরকার, এই রোগ-শোক-দৈন্য-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাঙ্গলীর জীর্ণ-কুটীরে—তার কুটীরের উপযুক্ত শিক্ষার আবশ্যক। জনকতক বাবুর জন্য যে শিক্ষা-প্রণালী বর্ত্তমানে চল্‌ছে, তার অনুকরণ যদি এই দুঃখের জ্বালায় অস্থির অন্ন-বস্ত্রের কাঙ্গালেরা করতে যায়, তারা বাঁচবে কেমন ক'রে! খবরের কাগজে বা বক্তৃতায় অনেক বড় বড় কথা শুন্‌তে পাই, কিন্তু তোমার আমার কথা ঐরূপ শিক্ষিত দলের কয়জনে ভাবে? তুমি একটু খুঁজলেই দেখ্‌তে পাবে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা নারী কখন এরূপ সঙ্কটাবস্থার ত্রিসীমানাতেও

আসেনি, যে সঙ্কটে প'ড়ে এই গরীবের ঘরের অশিক্ষিতা নারীসমাজ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত কেবল সংগ্রামেই কাটিয়ে দেয়। নীরবে সব যাতনা সহ্য করিয়াও তারা নিজেদের এতটুকু সুখ-সুবিধা চায় না,—প্রাণের সব ভালবাসা নিঃশেষ ক'রে ঢেলে দিয়ে, হৃদয়ের সব শক্তি সেবায় নিযুক্ত ক'রে নিজেরা 'দুর্ব্বলা'—'অবলা' হ'য়ে স্বামীর বুকে একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস দেখ্‌বার প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে; সন্তানের মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখ্‌বার জন্য আত্মহারা হয়।

তবুও বলি এই কি আমাদের যথেষ্ট? না যথেষ্ট ত নয়ই, এমন কি কোন রকমে দিন কাটাবার মতও পর্য্যাপ্ত নয়। উপাদান সবই আছে, কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে। তাকে সময়ের উপযোগী ক'রে, অবস্থার উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হবে। তবে এর জন্য আপাততঃ আমাদের মত গরীবের পক্ষে 'প্রাসাদ'-শিক্ষার আবশ্যক দেখি না। এই কুটীর থেকেই 'কুটীর' শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। আমার মনে হয়, শান্তি তোমার সেরূপ শিক্ষায় নিতান্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী নয়। হাঁ অবশ্য কায়দা-করণ, সভ্যতা-মূলক বোল্-চাল্ এসবে যথেষ্ট ত্রুটী আছে;—তা কালের প্রভাবে সেসব আপনি এসে যাবে, তখন দেখ্‌বে সামাল দিতে পারবে না। জড়-উপাসনা কি আর মানুষকে শিক্ষা দিতে হয়রে বাপ? সংসার চালাবার জন্য নিতান্ত পক্ষে সেটুকু না নইলে নয় অবশ্যই শিখ্‌তে হবে; বাকী সময় তাঁরই কাজে ব্যয় কর। তা সে ছেলেই হোক্ আর বুড়োই হোক্।"

কিশোরীমোহন বাবু এতক্ষণ স্থিরভাবে গোস্বামী মহাশয়ের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। নরেনও একটু দূরে বসিয়া তাঁহাদের আলোচনাগুলি সব শুনিতেছিল। বলা বাহুল্য সে গোস্বামী মহাশয়ের সব কথায় একমত হইতে পারে নাই; এমন কি মাঝে মাঝে তাহার মনটাও বিদ্রোহ ঘোষণার ইচ্ছা জানাইতেছিল। কিন্তু নিতান্ত মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের ভয়ে চুপ করিয়াছিল। এখন হঠাৎ গোস্বামী মহাশয়ের শেষ কথাগুলির পর বলিয়া উঠিল,—"জড়-উপাসনা শিক্ষা দিতে হয় না বল্‌ছেন; কিন্তু জড়-বিজ্ঞানের প্রভাব কি অবহেলা করতে পারেন? আধুনিক জড়-বিজ্ঞান অবশ্যই মানুষের সাধনার ফল। কিন্তু সেটা মানুষকে তার জীবন সংগ্রামে

যে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, তাকি অস্বীকার করতে পারেন ? এই একটা সহজ কথাতেই বলি,—আপনি যখন নবদ্বীপ থেকে শিষ্যবাড়ী যান, তখন ট্রেণের অপেক্ষায় বসে থাকা অন্যায় মনে ক'রে পদব্রজেই যাত্রা করেন কি ? অবশ্যই করেন না, সে কথা বলা বাহুল্য। তা হ'লেই প্রকারান্তরে কি জড়-উপাসনা আপনি স্বীকার কর্‌ছেন না ? এমনই প্রত্যেক বিষয়েই বলা যেতে পারে। আমরা জড়ের উপাসনা নিতান্ত নিন্দনীয় ব'লেই আবহমান কাল থেকে ঘোষণা করি, অথচ তার প্রভাব এড়াতে পারি না ; বরং অনেক সময় সাদরে সম্ভাষণ করি। আচার্য্য শঙ্কর প্রত্যেক সাংসারিক বিষয়েই "ততঃ কিম্ ততঃ কিম্" ক'রে তার অসারতা প্রমাণ ক'রতে যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছেন। আমরাও অনেকে তার প্রতিধ্বনিও ক'রে থাকি, কিন্তু কার্য্যতঃ সেই "ততঃ কিম্" এর সম্পদ কাছে পেলে সানন্দে ভোগ করি। এটা কি বাস্তবের কাছে একটা প্রতারণা মাত্র নয় ?"

গোস্বামী মহাশয় সস্মিত-মুখে বলিলেন,—"কে বলেছে প্রতারণা নয় ? শ্রীভগবান নিজমুখেই বলেছেন,—যতক্ষণ মানুষের অন্তর ও ইন্দ্রিয় পরিচালনার উদ্দেশ্য এক না হয়, ততক্ষণ সে নিজেকে প্রতারণা করছে বৈকি ? কারণ, ভোগ ত্যাগ করা নিতান্ত সোজা নয় বাবা ! শরীর ত্যাগ করলেও মনত্যাগ করে না। সুতরাং একজন কার্য্যতঃ পাপানুষ্ঠান করছে, আর একজন কার্য্যতঃ অনুষ্ঠানে বিরত থাকলেও মনে অনুষ্ঠানের কল্পনা-সুখ বর্ত্তমান ; এস্থলে দুই জনই সমান অপরাধী। তবে ব্যাপারকি জান ? ত্যাগ করাটা সোজা ব্যাপার নয় বলেই আমরা তার শান্তি ও আনন্দের রসাস্বাদনে বঞ্চিত। কাজে কাজেই যে কাজটা আমি সহজেই পারি অর্থাৎ ভোগের জ্বালাময়ী আনন্দ ও ক্ষণিক তৃপ্তিকেই জগতের সার পদার্থ ব'লে মনে করি। তারপর সব ছেড়ে দিয়ে ফকিরী অবলম্বন করতে ত কেউ বলে না ? সংসারে সংসারী জীব হ'য়ে এসেছি, সুতরাং তার কর্ত্তব্য পালন করতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। শুধু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ উপলক্ষ ক'রেই হিন্দুশাস্ত্রের সার ভগবদ্গীতার অবতারণা। কে বলে সংসারে ভোগ করতে হবে না ? আচার্য্য শঙ্কর "ততঃ কিম্ ততঃ কিম্" ক'রে পার্থিব সুখের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করেছেন ব'লে আজ-

কালকার সভ্যসমাজের নিকট তিনি হাস্যাস্পদ, তা আমিও জানি। কিন্তু এরূপ না করলে যে অনন্ত পথের কূল-কিনারা করা যায় না রে বাবা? তোমার পিপাসাও মিট্‌বে না, দুঃখের নিবৃত্তিও হবে না। তাই উদ্দেশ্য, যা তুমি ভোগ করছ, তার মধ্যে সার কিছু আছে কিনা বিবেচনা ক'রে দেখ এবং আগিয়ে চল। শুধু শুধু খোসা নিয়েই বসে থেকো না, ভিতরের সুমধুর রসাল সারাংশের অন্বেষণ কর,—বড় সুখ পাবে।

মানুষের সুখ দুই রকম—একটা সুখ জন্মে বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগে, আর একটা সুখ জন্মে আত্মার সহিত ভূমার সম্মিলনে। কিন্তু এই শেষের সুখটাই হচ্ছে নিত্য—নির্ম্মল—অনুপম। এ সুখ পেলে মানুষ জগতের কথা, বিষয়েন্দ্রিয়ের কথা সব ভুলে যায়। কিন্তু এতটা উচ্চে যেতে হ'লে আমাদের অবশ্যই কতকগুলি অসার বস্তুর সম্মোহনী শক্তিকে অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। অর্থাৎ যদি আমি পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা বুঝতে পারি, তবেই অপার্থিব বস্তু লাভ করতে পারব। নতুবা এই খানেই ডুবে যাব! এই জন্যই আচার্য্য প্রমুখ মহাজনেরা বলেছেন,—তোমার যশঃ লাভ হ'ল, বিদ্যালাভ হ'ল, ধনলাভ হ'ল, রাজৈশ্বর্য্য-লাভ হ'ল—"ততঃকিম্?" অর্থাৎ দেখ দেখি তোমার আশা কি মিটেছে? তুমি শান্তি কি পেয়েছ? যদি না পেয়ে থাক,—ফির—অন্যপথ দেখ; দেখবে পরমানন্দে মনপ্রাণ প্লাবিত হ'য়ে যাবে, জন্ম সার্থক হবে। পথের ক্লান্তি চিরতরে মিটে যাবে।

তোমরা বলবে,—'সেকি? জগৎ ত ক্রমেই ক্রমোন্নতির দিকে চলেছে? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছেন,—দশ হাজার বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষের অস্থি দেখ, বানরের সঙ্গে প্রভেদ নাই। আর এখন দেখ কেমন সুন্দর সুগোল—সুঠাম কমনীয়-নমনীয় চেহারা খানি! এসব কি কখন ছিল?' তাই আমরাও ভাবি সত্যিই ত বৈরাগ্য—ত্যাগ এসব বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রলাপ! কিন্তু তা নয়—ঐ সব বিকৃতমস্তিষ্ক থেকে যা প্রসূত হয়েছে, তা এখনকার পারিপাট্যময় ধীর মস্তিষ্কের ধারণার অতীত—কল্পনার অতীত! চোখের সাম্‌নেই দেখনা,—একটা ত্যাগের দান—প্রশান্ত অথচ তেজোগরিমাময় মূর্ত্তি কেমন ক'রে

বিশ্ব-গ্রাসী জ্বলন্ত—ভোগ-ব্যাকুল ক্ষাত্রশক্তিকে স্তব্ধ, অবনত ক'রে দিয়েছে? তাই বল্‌ছি, এযে ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু শৃগালের ভোগে আসেনি বলে এ অমৃত আজ অম্লরস পরিপূর্ণ দ্রাক্ষাফল হইয়া—কাজে কাজেই—অবহেলায় বর্জ্জিত।"

নরেন বলিল,—"আজ্ঞে না—আমি তা বল্‌ছি না। আমার উদ্দেশ্য এই যে, যারা সবে মাত্র জীবন-যাত্রা আরম্ভ করেছে, যারা এখন ভোগ-সুখের একটা কল্পনা-ছবি সৃষ্টি ক'রে পূর্ণোদ্যমে সংসারে ঢুকেছে, তাদের কাছে বৈরাগ্যের মন্ত্রগুল যেন একটা বাজে বক্‌নি ব'লেই সাধারণতঃ মনে হবে। সুতরাং যদি তাদের ভোগের তৃষ্ণাই মিটিয়ে দেওয়া ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে সাংসারিক অনটন, দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতি ভীষণ বাধা যাতে অতিক্রম ক'রে শুধু সাংসারিক সুখেরই একটু আস্বাদ পেতে পারে, এরূপ চেষ্টা করাও বোধ হয় অন্যায় নয়। কারণ যেটা কল্পনায় রয়েছে, সেটা যতক্ষণ না কার্য্যে পরিণত হয়, ততক্ষণ শান্তি পাওয়া অসম্ভব। আর ততক্ষণ 'ত্যাগ' তার কাছে শুধু শব্দের আবৃত্তি মাত্র। ভাল অশন-বসন যে কখন চক্ষে দেখিনি, বা দেখবার মত সঙ্গতিও নেই,—সে যদি চীর-বসন প'রে আর উপবাস ক'রে বলে—আমি সব ত্যাগ ক'রেছি, তার কি কোন মূল্য আছে? বরং সেটা বাতুলতারই নামান্তর।"

গোস্বামী মহাশয় সেইরূপ প্রশান্ত মনেই বলিলেন,—"ঠিক কথা! আমারও বক্তব্য তাই। আর সেই জন্যই আমি বল্‌ছি সংসারে ভোগ করতে হবে, এবং সেই ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্য আমাদিগকে তার উপযুক্ত শিক্ষালাভ ক'রে স্বয়ং কর্ম্ম করতে হবে। শুধু তাই নয়,—কর্ম্ম এরূপ উদ্যমের সহিত করতে হবে, যেন বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে তোমার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পার। কিন্তু এইখানেই যত সমস্যা। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিয়েই আমাদের বড়বড় আচার্য্যেরা মাথা ঘামিয়ে গিয়েছেন। শুধু কর্ম্ম থেকেই আমরা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবই পেতে পারি, যদি কর্ত্তব্য ঠিকভাবে পালন করিতে পারি। যদি বলা যায়, কর্ত্তব্য কর্ম্ম আবার সংসারে কে না করে? যারা চাকুরী করে তারাও কর্ত্তব্যসম্পাদন করে, যারা কৃষি-বাণিজ্য অবলম্বন করে, তারাও যথাসময়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে।

সুতরাং এত অতি সোজা ব্যাপার! কিন্তু এই কর্ত্তব্য যদি তুমি 'কর্ত্তব্য' বলেই সম্পাদন কর, তবে ক্রমেই তার ফল নিশ্চয়ই ভাল হবে। আর যদি নিজের মনে কামনার স্বর্গ রচনা ক'রে সেই স্বর্গভোগরূপ ফল আশায় কর্ম্ম কর,—পদে পদে দুঃখ এবং অশান্তিকেই ডেকে আনবে। আমি জানি, এর উত্তরে তুমি বলবে,—'তবে কি উচ্চাশা ব'লে একটা জিনিস মানুষ মনে রাখবে না? যদি কোনরূপ সুখের আশা না থাকে মানুষের কাজে মন লাগবে কেন?' কথাটা অবশ্যই সহজ ধারণায় খুবই সত্য; কিন্তু তা হ'লেও আমাদিগকে সুখ দুঃখ সুফল কুফলকে সমানভাবে বরণ ক'রেই কার্য্য করতে হবে, ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের এমন কি আমার বিবেচনায় সমগ্র মানবশাস্ত্রের সার উপদেশ। কারণ যেখানে মিলনের আশা সুখ সেইখানেই বিরহের সম্ভাবিত বেদনা আছেই। তুমি যদি সুখ পাব বলেই সংসারে জড়িত হও, তবে এতটুকু অঙ্গহানি হ'লেই দুঃখে নুইয়ে পড়বে। আর রোগ-শোক-মৃত্যুর হাহাকারপূর্ণ নশ্বর জগতে তোমার সাংসারিক সুখের অঙ্গহানি হওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে। সুতরাং যখন তুমি মিলনকে ডাকছ, তখন বিরহকেও ডাকছ,—দুইই সমান।"

নরেন একথায় সন্তোষলাভ করিতে পারিল না। সে আবার তর্কের সুরেই প্রশ্ন করিল,—"তা বলে কি আর মিলনের আনন্দ কাম্য নয়? সংসারে কে চায় যে আমি কেবল অভাবের দুঃখেই জ্ব'লে মরি। এমন অবস্থা যদি কারও হয় যে, সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সবই সমান, সে হয় পাগল কিংবা মানুষের উপরের স্তরের অতিমানব বা দেবতা, কিংবা এর একটাও নয় একেবারে জড় পদার্থ। আমি মানুষের পার্থিব সুখোপকরণ এবং সে গুল পাবার ইচ্ছাকে অসার বল্‌তে পারি না। কারণ সে সুখটা একেবারে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত সুখ। সে সুখের ব্যাকুলতা মানুষের স্বাভাবিক। আর যা স্বাভাবিক,—প্রামাণিক সত্য তাকে অস্বীকার ক'রে, স্পষ্ট প্রতীয়মান আলোকোজ্জ্বল বাস্তব পদার্থ— যা আমাকে এই মুহূর্ত্তেই স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, তাকে ছেড়ে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ান বা অদৃশ্য ধারণাতীত জিনিসকে ধরতে যাওয়া আমি কখনই মঙ্গল-জনক বল্‌তে পারি না।

আমাদের এ যুগেরই সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন ব'লে গেলেন, ভিখারীর আবার ত্যাগ কি? ভোগের জন্যও মানুষকে সচেষ্ট হ'তে হবে। দেশে রাজসিক ভাবকে প্রথমে সজীব ক'রে তুল্‌তে হবে। আর সেই জন্য তিনি জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতিকে এ বিষয়ের আদর্শ ব'লে গেছেন। আমার মনে হয় তাঁর উপদেশ খুবই সত্য।

নরেনের কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, —"সত্যিই ত! আমি তা অস্বীকার করি না। আমিও বলি রাজসিক ভাবের প্রাবল্য থেকেই ক্রমে সাত্ত্বিক ভাব আপনি এসে পড়বে। কারণ বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সকলকে ভোগ-বিরত রাখলেও ইন্দ্রিয়ের পরিচালক মন ত মানে না! আর যদি মন না মানে তবে ইন্দ্রিয়ভোগ-বিরত থাকলেও ফল একই; এ কথা ত আমি আগেই বলেছি!

তারপর তাঁর কথা যে বলছ, সে অনেক দূরের জিনিস। অনেক সময় আমরা তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য না বুঝে কেবল শব্দ বা ধ্বনি থেকে নিজেদের অপরিপক্ক মলিন বুদ্ধির দ্বারা একটা মন-ভোলা অর্থ ঠিক ক'রে নিই। আমি বল্‌তে পারি ভারতের কোন সন্ন্যাসী আজ পর্য্যন্ত ব'লেননি বা বলবেন ব'লে আশাও করি না যে,—কেবল রাজসিক ভোগে মানুষ শান্তি পাবে। তবে ভোগের নিবৃত্তির জন্য ভোগ করা দরকার। যদি বল কেন? তার ঐ একই উত্তর,—ভোগ কর আর বুদ্ধি-শক্তির সাহায্যে বিচার ক'রে দেখ যে, ভোগ ত করছি কিন্তু 'ততঃ কিম্'।

ভগবান গীতায় আমাদিগকে কর্ম্ম করতে উপদেশ দিয়েছেন। নিয়ত কর্ম্ম কর। এই নিয়ত কর্ম্মের মীমাংসা করতে গিয়ে আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন, যাহা শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং যে কর্ম্মে যার অধিকার বা যে কর্ম্ম যার পক্ষে নিশ্চিত ফলপ্রদ তাই তার নিয়ত কর্ম্ম বা অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি বলি আমরা যেদিন নিয়ত কর্ম্ম করতে পারব, সেদিন আমাদের সব অভাব নষ্ট হ'য়ে যাবে। আর এই হ'ল জীবনের সার শিক্ষা। এরই জন্য আমাদের শিক্ষা জীবনে কঠোর সংযম ও নৈতিক বল অর্জ্জন করতে হবে। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার

মতই আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দরকার। আমরা পঠদ্দশায় শাস্ত্র-পাঠ করি না। কোন ছেলে বা মেয়ের একটু ধর্ম্মে মতি থাক্‌লে আমরা, তাকে অতিশয় কৃপা-চক্ষে দেখি এবং নিতান্ত অনাদরের সহিত উপেক্ষা করি। এর কারণ কি? কারণ একমাত্র এই যে, আজকালকার শিক্ষার আদর্শ এদেশে 'আদর্শ' নামের অযোগ্য। তোমাদের যদি একটুও অন্তর্দৃষ্টি থাকে সহজেই বুঝ্‌তে পারবে, এমন কি চর্ম্মচক্ষেও দেখ্‌তে পাচ্ছ ত্যাগের শক্তি কত মহিমাময়। ত্যাগের মূর্ত্তি, ভোগের জ্বালাময়ী অন্তর্ম্মলিন মূর্ত্তির চেয়ে কত উজ্জ্বল, কত সুন্দর। স্বামিজী কি বলেন নি,—এদেশ এখনও বেঁচে আছে শুধু ধর্ম্মের জোরে। আমাদের ধর্ম্মাচার্য্যগণ আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে বলেছেন। আমরা তা করি কি? এখন যজ্ঞের কদর্য্যের সাহায্যে প্রাণহীন প্রতিমা পূজা করি, তাও আবার বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য।

মানুষের নিকট, সমাজের নিকট আমরা বিশেষ ভাবে ঋণী। সমাজ না থাক্‌লে, মানুষ না থাক্‌লে আমরাই বা 'মানুষ' হতাম কেমন ক'রে? কিন্তু সে ঋণ কি আমরা স্বীকার করি? আমরা সমাজের মঙ্গলের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য কি করি? একটু মনের চিন্তাও যে কাজে লাগাই না; অতিথি, বিপন্ন, দরিদ্রের সাহায্যের জন্য আমাদের বিলাসের কড়ির এক কপর্দ্দকও খরচ করি কি? এই সকল কর্ত্তব্যকেই আমাদের শাস্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠান ব'লেছেন। এইরূপ সমাজের—দেশের—লোকের হিতকর অনুষ্ঠানের নামই নৃ-যজ্ঞ। এইরূপ যে সকল পশু বা ইতর জীব আমাদের জীবন ধারণের হেতু, তাদের যত্নে পালন করার নামই ভূত-যজ্ঞ। তারপর আমার সুখ-শান্তি দাতা, ভূমি-জল-বায়ু-তাপ প্রভৃতি-জীবনী শক্তির উপকরণ দাতা দেবগণ, জ্ঞান-বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ঋষিগণ বা জন্মদাতা পিতৃগণের প্রতি কি আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই? অবশ্যই আছে। এই সকল কর্ত্তব্যের যথাযথ পালনের নামই যজ্ঞানুষ্ঠান। এইজন্যই দেব-যজ্ঞ, ঋষি-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা। আর এ সকল যজ্ঞের ধারেও না গিয়ে যদি আমি নিজের পিপাসা নির্ব্বাণের জন্য সব গ্রাস

ক'রে বসি, তবে আমি কৃতঘ্ন,—নরাধম—পাপাচারী, আমার শান্তি কোথায় ? স্বামিজী যে দরিদ্রকে নারায়ণ ব'লে পূজা করতে উপদেশ দিয়েছেন তার মূলে এই শাস্ত্রীয় যজ্ঞানুষ্ঠান। স্বামিজীর হৃদয়ের কোন্ আলোড়ন থেকে এই অমৃতময় উপদেশ উদ্ভূত হ'য়েছিল, তাকি আমরা বুঝতে পারি ? শুধু তাঁর দুট কথা নিয়ে মারামারি। দেখ্‌তে পাই আজকালকার অনেক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও এ সকল কথা থেকে সার নিতে পারেন না। আবার বিষদন্তের দংশনে নির্ম্মল দেহে কলঙ্কের দাগ সৃষ্টি করতে যায়। বাবা, সবদিকেই আমাদের দুর্দ্দশা। নইলে এমন অবস্থা হবে কেন ?

তাই বার বার বল্‌ছি শিক্ষা চাই। এমন তেমন শিক্ষায় চল্‌বেনা, এমন শিক্ষা চাই যাতে ভোগের প্রচুর উপকরণ মজুত থাক্‌তে থাক্‌তে তার অনিত্যতা বুঝতে পারি। এই যে এখনই তোমার বোনটিকে স্কুলে দিবার কথা হচ্ছিল, কিন্তু দিয়ে কি করবে ? বিলাসিতা শিখ্‌তে দিবে ত ? যাদের কাছে শিখ্‌তে যাবে সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের দুর্দ্দশা দেখে এসত ! যেখানে ফলমূলাহারী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ পারমার্থিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই পার্থিব অপার্থিব সব শিক্ষাই পূর্ণ মাত্রায় দিতেন, সেখানে আজকালকার সৌখীন শিক্ষাদাত্রীগণ কি শিক্ষা দেয় ? না কতকগুলি শব্দের অর্থ, আর দেশী বিদেশী রং বেরংএর আদব-কায়দা এবং ধ্বংস-পুরীর সোজাপথ। চরিত্র, সংযম, ধর্ম্ম ও নৈতিক বল তাঁদের নিজেদেরই নাই ত অপরকে কি দিবে ?"

গোস্বামী মহাশয়ের কঠোর যুক্তিপূর্ণ উপদেশগুলি নরেনের মনে একটা গোলমালভাবের সৃষ্টি করিয়া দিল। সে বুঝিয়াও বুঝিল না, কেবল একটু বেশী মাত্রায় বিরক্তি ভাবই পোষণ করিয়া ফেলিল। কোন কোন কথায় গোস্বামী মহাশয়কে তাহার উদার ভাবাপন্ন বলিয়াই মনে হইয়াছিল, আবার শেষের কথাগুলিতে মনে করিল ইনি একজন গোঁড়া-প্রাচীন-ব্রাহ্মণ। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণ মনে করিলেও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দলে ফেলিবার অবকাশ পাইল না। আবার সে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে খবর আসিল শান্তির শরীর বিশেষ অসুস্থ

তাঁহাদের সেখানে যাওয়া দরকার। কাজে কাজেই তিন জনেই ভিতরে যাইতে বাধ্য হইলেন।

বরযাত্রীদের বিদায়ের পর কিশোরীমোহন বাবু এবং তাহার মার নিতান্ত কাতর মূর্ত্তি দেখিয়া শান্তি একেবারে ভয়-বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর কখন সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া নিজের পড়ার ঘরে মেঝেতে শুইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ অমূলক চিন্তায় নিজেকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, 'আমারই জন্য ত তাঁদের এত দুঃখ—অশান্তি? আরও কত কথা, কত কল্পনার অতীত-স্মৃতি তাহার মনে একএক খণ্ড ছত্রভঙ্গ মেঘের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া যেন সব অন্ধকারময় করিয়া ফেলিতেছিল। শেষে সে নিজের অঞ্চলে মুখ চাপা দিয়া শুইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। প্রায় আধঘণ্টাখানেক চোখের জলে কাপড় ভিজাইয়া সে যেন বড় আরাম পাইল। তাহার অন্তরের কি যে দারুণ বেদনা তাহার বুকে একটা পাষাণের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছিল তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন পাষাণ ফাটিয়া রুদ্ধবেগ বাহির হইয়া পড়ায় অনেকটা শান্তি পাইল। তাহার মনে হইল ভগবান বোধ হয় আমাকে চির-জীবনের মত কাঁদিতেই পাঠাইয়াছেন। বেশত ক্ষতি কি? কান্নায় ত আমার কোন দুঃখ নেই! বরং হাসির অপেক্ষা কান্নাই আমার কাছে বেশী আরামের জিনিস। ক্রমে একটা অবসাদ আসিয়া শরীরটা অবসন্ন হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেন একটু তন্দ্রার ভাব আসিল। তারপর সেই তন্দ্রার ঘোরে কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠায় বাড়ীর মেয়েরা সেইখানে উপস্থিত হইল, এবং কেহ বা তাহার ভয় পাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল, কেহ কিশোরীমোহনবাবুকে ডাকিতে বাহিরের ঘরে গেল।

গোস্বামী মহাশয়, নরেন এবং কিশোরীমোহনবাবু তিন জনেই তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া দেখিলেন, শান্তি তখনও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। মা তাহার মাথা কোলের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন, সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে

এবং সেজন্য দুইটি চোখ ফুলিয়া উঠিয়া লাল হইয়াছে। আদরের কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া কিশোরীমোহনবাবুর বুকে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ নীরবে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন,—"গুরুদেব! আমি নিজের হাতেই একে হত্যা ক'রতে ব'সেছি। এখন কি উপায় হবে? তার এই তিলে তিলে আত্মহত্যার কারণ একমাত্র আমি। আপনি একটা উপায় করুন।"

গোস্বামী মহাশয় অভয় দিয়া বলিলেন,—"কিছুই ভয় নাই বাবা! শ্যামচাঁদকে ডাক তিনিই সব বন্দোবস্ত ক'রে দিবেন। বয়স হয়েছে, কাজেই তার নিজের এবং তোমাদের অবস্থাটা সে বেশ বুঝতে পেরেছে। এরূপ অবস্থায় ছেলে মেয়েদের এরূপ বিহ্বল হ'য়ে পড়া নিতান্ত অসম্ভব নয়। যাক্ ওকে একটু কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা কর দেখি?" বলিয়া তিনি গুন্-গুন্-স্বরে গান করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন। তখন আর রাত্রি নাই প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। স্নিগ্ধ-শান্ত ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সমাগত দেখিয়া ভক্ত-সাধক তদ্গত-চিত্তে গান ধরিলেন,—

"জয় জয় জগ-জন-লোচন-কান্দ। রাধারমণ বৃন্দাবন চান্দ॥
অভিনব নীল-জলদ তনু ঢল ঢল, পিচ্ছ মুকুট শিরে সাজনিরে।
কাঞ্চন-বসন রতনময় আভরণ, নূপুর রণরণি বাজনিরে॥

সঙ্গে সঙ্গে বিগত-ক্লান্তি বিহগ-কুল সুখের নীড়ে বসিয়া যেন তান ধরিল,—"নূপুর রণরণি বাজনিরে"।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅজিতনাথ সরকার।

যোগেন মা

বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার রাত্রি ১০টা ২০ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্টা স্ত্রীভক্তগণের অন্যতমা পরমভক্তিমতী শ্রীশ্রী যোগেন মাতা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাগবাজারের বাটীতে ৭৩ বৎসর বয়সে মহাসমাধিযোগে শ্রীপ্রভুর পদপ্রান্তে মিলিত হইয়াছেন। যোগেন মাতা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী খড়দহের সুবিখ্যাত ধনাঢ্য জমিদার ঘরের গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার স্বামীর নাম স্বর্গীয় অম্বিকা চরণ বিশ্বাস। ইঁহারই পূর্ব্ব পুরুষ স্বনামধন্য প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস সুপ্রসিদ্ধ প্রাণতোষিণী তন্ত্র সঙ্কলন করেন।

নানা কারণে স্বামীর সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া যোগেন মাতার মনে প্রথম জীবনেই তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, এবং এই সময় হইতে তিনি কলিকাতা বাগবাজারে তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু সম্পর্কে যোগেন মাতার আত্মীয় ছিলেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট লইয়া যান। শ্রীশ্রী-ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি অচিরেই তাঁহার কৃপালাভ করেন এবং অদ্ভুত ত্যাগ ও তপস্যা সহায়ে ধর্ম্মজীবনে দিন দিন উন্নতি করিতে থাকেন।

দক্ষিণেশ্বরে দুই চারি বার যাতায়াতের পর পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী-মাতা ঠাকুরাণীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়েই প্রায় সমবয়সী ছিলেন। এই হেতু প্রথম দর্শনেই শ্রীশ্রীমার সহিত তাঁহার "খুব ভাব ও পরস্পর টান"। শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়া-ছেন "আমি যখনি যেতুম মা আমাকে নিজের সব কথা বল্‌তেন, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতেন। আমি মায়ের চুল বেন্ধে দিতুম, তা, আমার হাতের চুল বান্ধা এম্‌নি ভালবাসতেন যে তিন চারি দিন পরেও নাইবার সময়ে মাথার চুল খুলতেন না। বল্‌তেন "ও যোগে-

নের বান্ধা চুল, সে আবার আস্‌লে সেই দিন খুল্‌বো।' আমি সাত আট দিন পর পর যেতুম। দক্ষিণেশ্বরে কখন কখনো রাত্রে থাকতুম, নহবতে, আমি আলাদা শুইতে চাইতুম, মা কোন মতেই ছাড়তেন না, কাছে টেনে নিয়ে শুতেন। সেই প্রথম দর্শনের কিছু কাল পরে মা যখন দেশে রওনা হ'লেন, যতদূর নৌকা দেখা গেল দাঁড়িয়ে রইলুম। নৌকা অদৃশ্য হ'তে নহবতে এসে খুব কান্দতে লাগলুম। ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে আস্‌তে তা দেখতে পেয়ে ঘরে গিয়ে আমাকে ডাকালেন। বল্লেন 'ও চলে যেতে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে'। এই সব বলে আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ঠাকুর তাঁর তান্ত্রিক সাধনার সব ঘটনা বল্‌তে লাগ্‌লেন। এক দেড় বছর পরে মা যখন এলেন ঠাকুর মাকে বলেছিলেন 'সেই যে ডাগর ডাগর চোক মেয়েটী আসে, সে তোমাকে খুব ভাল বাসে। তুমি যাবার দিন নবতে বসে খুব কান্দছিল' মা বল্লেন 'হাঁ; তার নাম যোগেন।'

শ্রীশ্রীঠাকুর বাগবাজারে যোগেন মার বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। 'কথামৃতে' উহা 'গন্নুরমার বাড়ীতে' বলিয়া উল্লেখ আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত যোগেন মার অনেক সময় অনেক কথা বার্ত্তা হয়েছে। 'লীলা প্রসঙ্গে' স্থানে স্থানে "জনৈক স্ত্রীভক্ত বলেন" এইরূপে উহার ইঙ্গিত আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেন মাকে বলিয়া ছিলেন "তোমাদের আর কি বাকী গো! (নিজের শরীর দেখাইয়া) তোমরা দেখলে, খাওয়ালে, সেবা করলে!"

শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ অসুখের সময় যোগেন মা বৃন্দাবনে ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী বৃন্দাবনে যান। যোগেন মা বলেন "মার সঙ্গে আমার দেখা হতেই 'ও যোগেন গো' বলে মা আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বিহ্বল হয়ে কান্দতে থাকেন। বৃন্দাবনে আমরা দুজনেই খুব কান্নাকাটি কর্‌তাম। একদিন ঠাকুর দেখা দিয়ে বল্লেন 'হ্যাঁগা তোমরা এত কান্দছ কেন? এইত আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? এই এ ঘর। আর ও ঘর!'

এই সময় যোগেন মা বৃন্দাবনে ভগবৎধ্যানে এত তন্ময় হইতেন

যে একদিন লালাবাবুর ঠাকুর বাটীতে বসিয়া সন্ধ্যার পরে ধ্যান করিতে করিতে গভীর সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। স্থির ভাবে বসেই আছেন। রাত্রির ভোগারতি শেষ হবার পর যখন মন্দিরের বহির্দ্বার রুদ্ধ হইবে তখনও ইনি উঠছেন না দেখে সেবায়িৎগণ ডাকিতে থাকেন "ও মায়ি ওঠ, ও মায়ি ওঠ"। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হুঁস হইল না। এদিকে অত রাত্রি হতেও বাসায় ফিরছেন না দেখে শ্রীশ্রীমার আদেশে যোগানন্দ স্বামী আলো লইয়া খোঁজে বাহির হন, এবং যোগেন মা অনেক সময় পূর্ব্বোক্ত মন্দিরেই বসিয়া ধ্যান জপ করিতেন জানিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন তাঁরা হুঁস আনিতে পারেন নাই। যোগানন্দ স্বামী ঠাকুরের নাম শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কথা প্রসঙ্গে এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি ইদানীং কালে বলিয়াছিলেন "তখন আমার এমন মন হয়েছিল যে, জগৎ আছে কি নাই এও যেন আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল"।

তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতেও আর একবার সমাধি হয়। স্বামিজী তাইতে বলিয়াছিলেন "যোগেনমা, তোমার দেহও সমাধিতে যাবে। যার একবারও সমাধি হয়, দেহ ত্যাগের সময় তার সেই স্মৃতি আবার আসে"।

আর একবার দর্শনাদির কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে এক সময়ে তাহার এমন এক অবস্থা হয়েছিল "যখন যে দিকে চাই সর্ব্বত্রই ইষ্ট দর্শন। তিন দিন অমন ছিল"। যোগেনমার দুইটী বাল গোপাল মূর্ত্তি ছিল। কত সস্নেহে সেবা পূজা করিতেন। এবং ভাবাবস্থায় দর্শনাদি পাইতেন। বলিয়াছিলেন "একদিন পূজা কালে ধ্যান করিতে করিতে দেখি কি দুইটী অনুপম সুন্দর বালক হাস্‌তে হাস্‌তে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়িয়ে বল্‌ছে 'আমরা কে চেন ?' বল্লুম 'তোমাদের আবার চিনি না ? এই তুমি বীর বলরাম, আর তুমি কৃষ্ণ। ছোটটী (কৃষ্ণ) বল্লে 'তোর মনে থাক্‌বেনা' 'কেন ?' 'না, এ ওদের জন্তে' এই বলে আমার নাতিদের

দেখালে"। বাস্তবিক যোগেন মার একমাত্র কন্যার মৃত্যু হওয়ায় নিরাশ্রয় দৌহিত্র তিনটীর উপর কিছুকালের জন্য মন পড়ে এবং ঐ উচ্চ ভাবাবস্থা ক্রমশঃ অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করে।

গৃহীর ন্যায় থাকিলেও তিনি তন্ত্রমতে পূর্ণাভিষিক্ত ছিলেন, এমন কি, সন্ন্যাস মতে বিরজা হোমও করিয়া ছিলেন। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুয্যের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা যখন পঞ্চতপা করেন তখন যোগেন মাও এই সঙ্গে পঞ্চতপা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা বলিতেন "যোগেন খুব তপস্বী, এখনও কত ব্রত উপবাস করে"। বৈধী পূজার্চ্চনা বিষয়ে তাঁহার যেরূপ নিষ্ঠা ও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, স্ত্রীলোকদেরত কথাই নাই, পুরুষদের মধ্যেও খুব কম লোকেরই সেরূপ দেখা যায়। তিনি কখনও বৃথা সময় ক্ষেপ করিতেন না ; অবসর সময়ে গীতা ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ ও পুরাণাদি, কখনও বা শ্রীশ্রী-ঠাকুরের সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মৃতি শক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে এই সব গ্রন্থ, বিশেষতঃ চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি অনেক স্থলে তাঁহার যেন কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, এবং পুরণাদি গ্রন্থের আখ্যায়িকা সমূহ যথাযথ বিবৃত করিতে পারিতেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার "হিন্দু ধর্ম্মের আখ্যান সমূহ" (Cradle tales of Hinduism) প্রণয়ণে পূজনীয়া যোগেন মার গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পৌরাণিক জ্ঞান হতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। নিবেদিতা নিজেই পুস্তকের ভূমিকায় তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও তাঁহার জপধ্যানে এত অনুরাগ ছিল যে শত কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যেও তিনি যে সময়ে যতক্ষণ জপধ্যান করিতেন তাহার একটুও ব্যতিক্রম হইত না। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের পর ঘাটে বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা তন্ময় হইয়া জপধ্যান করিতেন। দুরন্ত শীত বর্ষায়ও তাহা একদিন বন্ধ যাইত না। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতাম লোকেরত একদিনও বাদ যায়, আলস্য হয়! জপধ্যানের সময় এমন তন্ময় হইতেন যে অনেক সময় চোকের ভিতর (ধ্যানের সময় তাঁর চক্ষু ঈষদুন্মুক্ত থাকিত) মাছি

ঢুকিয়া খুঁটিত তাহা টেরই পাইতেন না। শ্রীশ্রীমা ইদানীংয়ের স্ত্রী ভক্ত দিগকে বলিতেন "যোগেন গোলাপ এরা কত ধ্যান জপ করেছে সেসব আলোচনা করা ভাল—এতে কল্যাণ হবে"।

এই শেষ অসুখের সময়ও যখন উঠে বসিবার শক্তি ছিল না তখনও তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিতে হইত নিয়মিত জপধ্যানের জন্য এবং কথামৃত লীলাপ্রসঙ্গ চৈতন্য-চরিতামৃত ভাগবত প্রভৃতি পাঠ শুনিতেন। আবার এত সব ধ্যান ধারণার অনুরাগ থাকিলেও তিনি দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্ম্মে উদাসীন ছিলেন না। নিত্য স্নানাহ্নিক অন্তে শ্রীশ্রীমার বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের ভোগের দুই বেলার তরকারী পত্র কুটিতেন এবং আবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম সারিয়া দ্বিপ্রহরে গৃহে ফিরিয়া নিজের ও বৃদ্ধামায়ের রন্ধনাদি করিতেন। আবার বৈকালে শ্রীশ্রীমার নিকট আসিতেন। রাত্রের ভোগ হলে তবে ফিরিতেন এবং যখন যেমন আবশ্যক যথাসাধ্য শ্রীশ্রীমার সেবা তত্ত্বাবধান করিতেন।

যোগেন মার আর একটি স্বভাব ছিল যে, যথায়ই দেবস্থান বা তীর্থাদিতে যাইতেন যথাসাধ্য দীন দুঃখীকে পয়সা দিতেন, কেহ শুধু হাতে ফিরিত না। গোলাপ মা বলেন "যোগেন পয়সা দিয়ে দিয়ে এমন করেছে যে এখন ভিখারী এলেই পয়সা চায়। বলে "মা এখানে আমরা একটা করে পয়সা পেয়ে থাকি"। এ ছাড়া তীর্থাদিতে গেলে সঙ্গী লোকজনদের খাওয়াতেন, আবার জয়রামবাটী কামারপুকুর গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার সম্পর্কিত গণকে যথাসাধ্য কিছু না কিছু দিতে ভুলিতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যোগেনমাকে কত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ যোগেনমাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। যোগেনমাও কত সযত্নে মহারাজকে খাওয়াতেন। দেখেছি হয়ত কোন দিন মহারাজকে যখন শ্রীশ্রীমার বাটীতে খাওয়াবার নিমন্ত্রণ হইত যোগেন মা আনন্দে অধীর হইতেন। কত রকম রান্নার ব্যবস্থা করিতেন নিজেও দু একটি তরকারী রান্না

করিতেন। স্বামিজী যোগেন মাকে এত আপনার মনে করিতেন যে হয়ত যোগেনমা গঙ্গার ঘাটে স্নান কচ্ছেন, স্বামীজী মঠ হতে কলিকাতা আস্‌ছেন, নৌকাহতে নেমেই বল্‌ছেন "যোগেন মা আজ তোমার ওখানে দুটী খাবগো, পুঁই শাক চচ্চড়ি কোরো"। যোগেন মার মুখেই শুনেছি, একবার তিনি যখন কাশীতে ছিলেন, স্বামিজী কাশী গিয়াছেন, যোগেন মাকে গিয়া বল্‌ছেন" "যোগেন মা এই তোমার বিশ্বনাথ এল গো! যোগেন মার রান্না খেতে এত ভালবাসতেন যে আবদার করে বলছেন "আজ আমার জন্মতিথি গো! আমাকে ভাল করে খাওয়াও, পায়েস কর।

যোগেন মাতা সকল দেবতার প্রতিই ভক্তি সম্পন্না ছিলেন। সকলেরই সমান পূজা অর্চ্চনা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে শরণ লইলেও তাঁহার কোন রূপ গোঁড়ামী ছিল না। হিন্দুধর্ম্মের উদার ভাব সম্পন্ন হইয়া তিনি শীতলা ষষ্ঠী প্রভৃতি সব দেবতারই পূজা করিতেন। একদিকে যেমন বৈধীপূজা, নিষ্ঠা, ব্রত, উপবাস, সদাচার এবং সর্ব্বোপরি রাগানুগাভক্তি ছিল, তেমনি আবার গম্ভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানীর ভাব সম্পন্না ছিলেন। ঠাকুর তাই বলিয়াছিলেন" মেয়ের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী"।

বাস্তবিক যোগেন মার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন, ভারতের সেই প্রাচীন কালের আদর্শের নারীজীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে শ্রীশ্রীঠাকুরের যোগেন মার সম্বন্ধে এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল "ও কুঁড়ি ফুল নয় যে একটুতেই ফুটেযাবে—ওর যে সহস্র দল পদ্ম ধীরে ধীরে ফুটবে। শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতির সহিত যোগেনমা গোলাপমার স্মৃতি জড়িত। মা যে বলিতেন "আমার জীবনে যা সব হয়েছে এই গোলাপ যোগীন এরা সব জানে"।

যিনি যাঁর তিনি তাঁর কাছে চলিয়া গেলেন! শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর 'কলমীরদল'কে ত প্রায় টানিয়া লইলেন। হে চুনো পুঁটি জীব এখনও তোমার জুড়াইবার আশ্রয় দু একটী হেথা সেথা রহিয়াছে।

—স্বামী অন্নপানন্দ

মাধুকরী

বাঙ্গলার কথা—বাঙ্গলার পল্লী ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। জনকয়েক তথাকথিত শিক্ষিত ও ধনী লোক সহরে বসিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতেছেন, বিদেশী আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবিত কাউন্সিল গৃহে ঢুকিয়া তর্কযুদ্ধ করিতেছেন, অথবা সভাসমিতি ও বক্তৃতাদি করিয়া দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখিতেছেন; কিন্তু এদিকে আসলে দেশটা যে রসাতলে যাইতে বসিয়াছে, তাহার প্রতি কাহারও খেয়াল নাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে রাজনীতিকগণের দৃষ্টি একবার পল্লীর দিকে পড়িয়াছিল, পল্লীগঠন ও পল্লীরক্ষার কথাও শোনা গিয়াছিল। কিন্তু ভাটার টানে গঙ্গার জল যেমন তটভূমি হইতে সরিয়া যায়, অসহযোগ আন্দোলনের ভাববন্যা হ্রাস হওয়াতে, আজ দেশের তেমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। নেতারা পল্লীকে ত্যাগ করিয়া আবার সহরের দিকে ঝুকিয়াছেন, অনাদৃত উপেক্ষিত পল্লীগুলি পূর্ব্বের মতই মরণের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

*　　*　　*　　*

বাঙ্গলার পল্লীর কথা কেহই শুনিতে চায় না; দুঃখ, দারিদ্র্য অনাহার, মৃত্যু, অত্যাচার, অবিচারের বিষাদময় কাহিনী শুনিবার মত ধৈর্য্যও কাহারও নাই। কিন্তু তবুও আমাদের সেই কথা বলিতে হইবে,—রোগীকে যেমন জোর করিয়া তিক্ত ঔষধ খাওয়াইতে হয়, ধ্বংসোন্মুখ পল্লীর কথাও মরণোন্মুখ বাঙ্গালীজাতিকে তেমনই করিয়া শুনাইতে হইবে।

*　　*　　*　　*

বাঙ্গলার পল্লীকে আজ চারিদিক হইতে নানা শত্রুতে আক্রমণ করিয়াছে। যে নদীমাতৃক বাঙ্গলা দেশ একদিন ধনধান্য-পূর্ণ ছিল,—কবি যাহাকে "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং" বলিয়া বন্দনা করিয়া-

ছেন, আজ সেই পুণ্যভূমি মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাঙ্গলার পল্লীতে আজ জল নাই ; গ্রীষ্মারম্ভে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ চারি দিক হইতেই জলের জন্য ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছি। এই চৈত্র-বৈশাখ মাসে পল্লীর অভ্যন্তরে যাও, দেখিবে দশ-বারখানি গ্রাম খুঁজিলেও সহজে জল মিলিবে না। উড়িষ্যার কোন কোন স্থানে গ্রীষ্মকালে গ্রামের লোক জলের জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি করে দেখিয়াছি। বাঙ্গলা দেশেও শেষে কি সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হইবে ?

* * * *

জলাভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি ও অকাল-মৃত্যু বাঙ্গলার মাটীতে স্থায়ী আড্ডা গাড়িয়াছে। গত অৰ্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ম্যালেরিয়া বাঙ্গালী জাতিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে। প্রতি বৎসর প্রায় দশ লক্ষ লোক এক ম্যালেরিয়াতেই উচ্ছন্ন যাইতেছে। আর যাহারা কোন মতে বাঁচিয়া আছে, তাহারাও অৰ্দ্ধমৃতবৎ। "একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর!" ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক ভীষণ ব্যাধি—কালাজ্বর আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়াছে। ইহার বিক্রমও কম নয়। ইতিমধ্যেই শুনিতেছি, বাঙ্গলাদেশের শতকরা ২৩ জন লোক কালাজ্বরাক্রান্ত। কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা প্রভৃতির কথাও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। মোটকথা যমরাজার এই সমস্ত দূতে মিলিয়া বাঙ্গালীকে শীঘ্র শীঘ্র ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিতেছে, তাহার আয়ুর পরিমাণ কমাইয়া আনিয়াছে, তাহার জন্মহার অপেক্ষা মৃত্যুহার বাড়াইয়া তুলিয়াছে এবং অতীতের বলিষ্ঠ ও বীর বাঙ্গালী জাতিকে তাহারা বামনের জাতিতে পরিণত করিতেছে।

* * * *

দারিদ্র্য বাঙ্গালীর আর এক মহাশত্রু। বাঙ্গালীর অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা তুলিয়া কাজ নাই। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শতবর্ষ পূর্ব্বেও তাহারা পৃথিবীর অন্যতম ধনীজাতি বলিয়া গণ্য ছিল। আর আজ বাঙ্গলার পল্লী দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত, পল্লীবাসীদের দিনান্তে একবারও অন্ন জুটে না ; তাহার শিল্প-

বাণিজ্য লুপ্ত—কৃষি শ্রীহীন, বিদেশী বণিকের অবৈধ প্রতিযোগিতায় সে হৃতসর্ব্বস্ব, গুরুকরভারে সে কুব্জপৃষ্ঠ। দারিদ্র্য ও ব্যাধি,—অন্ন-সমস্যা ও রোগসমস্যা—কে কাহার জন্য দায়ী,—কোনটি আগে, কোনটি পরে বলা যায় না। বোধ হয় দুই জনেই যমজ ভাই। একজন আসিলেই আর একজন সঙ্গে সঙ্গে আসে।

*　　*　　*　　*

এই ত গেল বাহিরের অবস্থা! সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও বাঙ্গলার পল্লী অরাজক হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে আজ 'মাৎস্য-ন্যায়' চলিতেছে। যাহারা রুগ্ন, অনাহারক্লিষ্ট, বলহীন, আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কোথা হইতে? তাই যাহারা একটু প্রবল, তাহারা দুর্ব্বলের উপর অনায়াসে অত্যাচার করিতেছে। বাঙ্গলা দেশের চারিদিক হইতে প্রায় প্রত্যহ ডাকাতির সংবাদ পাইতেছি। ডাকাতেরা দল বাঁধিয়া নিরীহ ব্যবসায়ী ও গৃহস্থদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে,"আইন ও শৃঙ্খলার" স্তম্ভস্বরূপ পুলিশ,পল্লীবাসীদের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিতেছে না। চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে লিখিত হইয়াছে যে, ভদ্রলোক গুণ্ডারাই এই সমস্ত ডাকাতির মূলে থাকে, পুলিশ তাহাদের কথা জানিলেও প্রমাণাভাবে ধরিতে পারে না। 'প্রবাসী' আরও বলেন যে, অন্নাভাবই শিক্ষিত ভদ্র গুণ্ডাদের এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছে। একথা সত্য হইলে ইহার পরিণাম কল্পনা করিতে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে।

*　　*　　*　　*

কেবল যে গৃহস্থের প্রাণ ও সম্পত্তিই এই 'মাৎস্য-ন্যায়ের' অধীন তাহা নয়; নারীর সম্মানও বাঙ্গলার পল্লীতে রক্ষা করা অসম্ভব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। রঙ্গপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, যশোর, হুগলী—চারিদিক হইতেই অসহায়া নারীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছি; দুর্ব্বৃত্ত পশুরা—পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়স্বজনের চোখের সম্মুখ হইতে রোরুদ্যমানা নারীকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। রেল ষ্টেশনে, ষ্টীমার ঘাটে, নদীতীরে,

কূপ-প্রান্তে, গ্রামসীমায় এমন কি গৃহ মধ্যে—কোথাও নারী নিরাপদ নহে। বাঙ্গলার অক্ষম পুরুষ নারীকে বাহুবলে রক্ষা করিতে পারিতেছে না কৌরব সভায় অসহায়া দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্তৃক লাঞ্ছিতা হইয়া ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—'এ সভায় কি একজনও পুরুষ নাই—যে নারীর সম্মান রক্ষা করিতে পারে?' বাঙ্গালার দ্রৌপদীরূপিণী নারীশক্তিও আজ যেন তেমনি ভাবে ডাকিয়া বলিতেছে—'এ বাঙ্গলাদেশে কি পুরুষ নাই—যে নারীকে অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে—জায়া, কন্যা, ভগ্নীদের মান রাখিতে পারে? কিন্তু দুর্ব্বল, দুর্ব্বল—আমরা নিতান্তই দুর্ব্বল! এ ডাকে সাড়া দিবার সাধ্য আমাদের নাই। যেসব পুরুষ নারীকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদের জীবনের মূল্য কি—তাহারা স্বরাজ চায় কোন লজ্জায়? অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া নদীগর্ভে ডুবিয়া মরাই তাহাদের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

* * * *

যাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাহারাই কিন্তু আবার দরিদ্র ও দুর্ব্বলের প্রতি সিংহবিক্রম। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, তাহারাই ছুঁৎমার্গের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া একে অন্যকে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিতেছে। আজ ভ্রান্ত জাত্যাভিমান ও শোণিতের গর্ব্বে, এক ক্রীতদাস আর এক ক্রীতদাসকে 'নীচ জাতি, অস্পৃশ্য' ইত্যাদি বলিয়া নাক সিটকাইতেছে। ইহারই নাম আত্মহত্যা। একদিকে দারিদ্র্য ব্যাধি, অক্ষমতা, দৌর্ব্বল্য—অন্যদিকে নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, ভেদবুদ্ধি—যখন কোন জাতি,কোন মনুষ্য সমাজকে, এমনভাবে চারী দিক হইতে ঘিরিয়া ধরে, তখন জানিতে হইবে, তাহার মৃত্যু আসন্ন। বাঙ্গালী জাতির মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় সে এই চরম অবস্থা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না!

* * * *

এই মরণোন্মুখ হতভাগ্য জাতিকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় নাই?

আনন্দবাজার পত্রিকা।

সারদামণি দেবী—শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রশংসা আছে, সন্ন্যাসীরও প্রশংসা আছে। শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে এবং সহজ বুদ্ধিতেও ইহা বুঝা যায় যে, গার্হস্থ আশ্রম অন্য সব আশ্রমের মূল। কিন্তু গৃহস্থ মাত্রেরই জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় নহে, সন্ন্যাসী মাত্রেরই জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দার্হ নহে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভগবদ্দত্ত শক্তি, হৃদয়-মনের গতি, প্রভৃতি দ্বারা স্থির হয় যে, ভগবান্ কিরূপ জীবন যাপন করিয়া কি কাজ করিবার নিমিত্ত কাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। যিনি আশ্রমে আছেন, তদুচিত জীবন-যাপন করেন কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ বা আত্ম-গ্লানি অনুভব করিতে পারেন। যিনি যে আশ্রমের মানুষ, কেবল সেই আশ্রমের নামের ছাপটি দেখিয়া তাঁহার জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষ, সার্থকতা ব্যর্থতা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসের বা সন্ন্যাসাশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিবেচিত হইতে পারে না।

সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা হয় কখনও বিবাহই করেন নাই, কিংবা বিবাহ করিয়া থাকিলে পত্নীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে যখন তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না তখন, কিংবা তাঁহার অনভিমতে, কেহ তাঁহার বিবাহ দেন নাই। তাঁহার বিবাহ তাঁহার সম্মতিক্রমে হইয়াছিল—তাঁহার জীবন-চরিতে লিখিত আছে যে, তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে পাত্রী নির্ব্বাচন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি একদিকে যেমন পত্নীকে লইয়া সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ঘর করেন নাই, তাঁহার সহিত কখন কোন দৈহিক সম্বন্ধ হয় নাই, অন্য দিকে আবার তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন নাই; বরং তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া স্নেহ, উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে নিজের সহধর্ম্মিণীর মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা তাঁহর জীবনের একটি বিশেষত্ব।

কিন্তু কেবল রামকৃষ্ণের নহে। তাঁহার পত্নী সারদামণি দেবীরও বিশেষত্ব আছে। সত্য বটে, রামকৃষ্ণ সারদামণিকে শিক্ষাদি দ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ; কিন্তু যাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা উপকৃত ও উন্নত হইবার ক্ষমতা তাঁহার থাকা চাই। একই সুযোগ্য গুরুর ছাত্র ত অনেকে থাকে, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী ও সৎ হয় না। সোনা হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, মাটীর তাল হইতে তেমন হয় না।

এইজন্য সারদামণি দেবীর জীবন-কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন জীবনচরিত নাই। পরমহংসদেবের জীবন-চরিত প্রসঙ্গক্রমে সারদামণি দেবী সম্বন্ধে স্থানে স্থানে অল্প অল্প যাহা লিখিত আছে, তাহা দ্বারাই কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে হয়। সম্ভব হইলে, রামকৃষ্ণ ও সারদামণির ভক্তদিগের মধ্যে কেহ এই মহীয়সী নারীর জীবন চরিত ও উক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই অনুরোধ জানাইতেছি। হয় ত একাধিক জীবনচরিত লিখিত হইবে। তাহার মধ্যে একটি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সরল ও অবিমিশ্রিভাবে কেবল তাঁহার চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা, টীকা টিপ্পনী, ভাষ্য থাকিবে না। রামকৃষ্ণের এইরূপ একটি জীবনচরিতের প্রয়োজন। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বাহিরের লোকদিগেরও রামকৃষ্ণ ও সারদামণিকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। মণ্ডলিভুক্ত ভক্ত-দিগের জন্য অবশ্য অন্যবিধ জীবন-চরিত থাকিতে পারে।

গৃহস্থাশ্রমে রামকৃষ্ণের নাম ছিল গদাধর। "সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা ও নিরন্তর উন্মনা-ভাব দূর করিবার জন্য" তাঁহার "স্নেহময়ী মাতার অগ্রজ উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার পরামর্শ স্থির করেন"।

"গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে, এজন্য মাতা ও পুত্রে পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুর গদাধরের কিন্তু ঐ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি উহাতে

কোনরূপ আপত্তি করেন নাই ; বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালক-বালিকারা যেরূপ আনন্দ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

চারিদিকের গ্রাম-সকলে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন গদাধর বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সন্ধান বলিয়া দেন। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা ঐস্থানে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন, সন্ধান মিলিল। অল্পদিনেই সকল বিষয়েই কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। সন ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষভাগে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ষীয়া একমাত্র কন্যার সহিত গদাধরের বিবাহ হইল। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তখন গদাধরের বয়স ২৩ পূর্ণ হইয়া চব্বিশে চলিতেছে।

গদাধরের মাতা চন্দ্রাদেবী "বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য জমীদার বন্ধু লাহা বাবুদের বাটী হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়া বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, কয়েকদিন পরে ঐগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্যচিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নববধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন ! বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন প্রাণে খুলিয়া লইবেন এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু তখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে খুলিয়া লইয়াছিলেন যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিল, "আমার গায়ে যে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল।" চন্দ্রাদেবী সজলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা প্রদানের জন্য বলিয়াছিলেন, 'মা ! গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কারসকল ইহার পর কত দিবে।"

চন্দ্রাদেবী যে অর্থে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সে অর্থে না হইলেও অন্য অর্থে ভবিষ্যৎকালে কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

"এইখানেই কিন্তু এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্যার খুল্লতাত তাহাকে ঐদিন দেখিতে আসিয়া ঐকথা জানিয়াছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক ঐদিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতার মনে ঐ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গদাধর তাঁহার ঐ দুঃখ দূর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, উহারা এখন যাহাই বলুক করুক না, বিবাহ ত আর ফিরিবে না।"

ইহার পর সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সারদামণি সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিলে, কুল-প্রথা অনুসারে স্বামীর সহিত পিত্রালয় হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কামারপুকুর গ্রামে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন।

অতঃপর বহু বৎসর রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ছিলেন না। ১২৭৪ সালে তিনি, যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সাধনে সহয়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার এবং ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত কামারপুকুরে আবার আগমন করেন। (ক্রমশঃ)

প্রবাসী
বৈশাখ। } শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার সমস্যা—স্বাস্থ্যাভাব—প্রধানতঃ তিনটি দুষ্ট ব্যাধি আমাদের পল্লীগ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে।

(ক) কলেরা।

(খ) ম্যালেরিয়া।

(গ) কালা-আজার।

অথচ এই সমস্ত ব্যাধিগুলি সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে আমরা অনায়াসেই নিবারণ করিতে পারি। ইতালি, পানামা প্রভৃতি দেশ এক সময়ে ভীষণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছিল। সেখানকার লোকেরা সমবেত চেষ্টা করিয়া এই ব্যাধির করাল কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। তাহারা যাহা পারিয়াছে আমরা তাহা পারি না কেন? আমাদের অপারগতার প্রধান

কারণ—কঠোর দারিদ্র্য। কাজেই ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় আমরা কখনও দেশকে এই ব্যাধিত্রয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিব না। চাই সমবেত চেষ্টা, অপরিসীম ত্যাগ এবং স্বার্থহীন কর্ম্মীবৃন্দ।

(ক) কলেরা।

সুপেয় পানীয় জলের অভাবই ইহার কারণ। পূর্ব্বকালে পুষ্করিণী-খনন একটি মহৎ কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত। গ্রামের জমিদারবর্গ এবং অন্যান্য ধনী লোকেরা পুষ্করিণী খনন করাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। কাজেই পল্লীবাসীদের জলকষ্ট ছিল না। এখন যে কোন পল্লীগ্রামে যান দেখিবেন নূতন পুষ্করিণী খনন ত দূরের কথা পুরাতন পুষ্করিণীগুলি পঙ্ক এবং আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠমাসে এই সব পুষ্করিণীর জল সব শুকাইয়া যায়। এবং প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রাম-বাসীরাই 'হা জল হা জল' করিয়া অস্থির হইয়া পড়ে!! অসহায় তাহারা, তাহাদের কাতর ক্রন্দন কে শোনে? জমিদারবর্গ ও অন্যান্য ধনীলোকেরা প্রায়ই সহরে বাস করেন নিজেদের পল্লীগ্রামের কোন খবর রাখেন না। গবর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড দেউলিয়া। অনেক পল্লীগ্রামেই দেখা যায় যে হয়ত একটী পুষ্করিণী বা জলাশয় নিকটবর্ত্তী ১৫।১৬ খানি গ্রামের পানীয়াভাব পূর্ণ করিতেছে। কোন রকমে সেই জলাশয় কলেরা বীজাণু দূষিত হইলে ঐ ১৫।১৬ খানি গ্রামবাসীদের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া পড়ে!

আমাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ছোট ছোট বিজ্ঞানানুমোদিত ইন্দারা বা কূপ খনন করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ পুষ্করিণী খনন বড়ই ব্যয় বাহুল্য। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই কিছু কিছু চাঁদা দিয়া এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ বা ইন্দারা অনায়াসে খনন করাইতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কলেরা হইতে রক্ষা পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় Tube well। কারণ এই শ্রেণীর কূপগুলি কলেরা বীজাণু দূষিত হয় না। আজকাল শুনিতেছি এক প্রকার বাঁশের Tube well হইয়াছে। উহা অত্যন্ত সুলভ কাজেই নিঃস্ব গ্রামবাসীদের উপযুক্ত।

অজ্ঞতাও (Ignorance) এই ব্যাধির বিস্তারের প্রধান কারণ। কলেরা রোগীর ব্যবহৃত এবং তাহাদের বমন ও মল দুষিত কাপড় চোপড়

প্রায়ই পুষ্করিণী বা জলাশয়ে কাচিতে দেখা যায়! অথচ সেই জলাশয় বা পুষ্করিণী হয়ত সেই পাঁচ সাতখানি গ্রামবাসীদের পানীয় জলের একমাত্র আশা ভরসাস্থল। ফলে একদিনেই ৫।৭ খানি গ্রামের মধ্যে ঐ রোগ ছড়াইয়া পড়ে। গ্রামে কলেরা আরম্ভ হইলেই পাণীয় জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া—গরম নহে—পান করা উচিত। এবং একটী পুষ্করিণী বা জলাশয় কেবলমাত্র পানীয় জলের জন্য আলাহিদা করিয়া রাখা উচিত। সেই পুষ্করিণীতে কাপড় কাচা, স্নান করা বা বাসন মাজিতে দেওয়া উচিত নয়। উপরোক্ত এই সামান্য মাত্র সাবধানতার ফলে পল্লীবাসীরা অনায়াসেই এই ভয়াবহ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। কলেরা বমন, বা মল দূষিত কাপড় চোপড় পুড়াইয়া ফেলা উচিত। যাঁহারা কলেরা রোগীর সেবা করেন তাঁহাদের আহারের পূর্ব্বে হস্ত পদাদি উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত। বিশেষতঃ Pot. Parmanganate Lotion দিয়া।

(খ) ম্যালেরিয়া।—এক বাঙ্গলাতেই প্রতিবৎসর প্রায় দশলক্ষ লোক এই ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। তাহা ছাড়া এই ব্যাধি কত শত লোককে যে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রমিক বা কৃষিজীবীরা যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারিত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া আজ তাহারা তাহার অর্দ্ধেক কার্য্য করিতে পারে কি না সন্দেহ !! সুতরাং গৌণ ভাবে এই ব্যাধি জাতিকে দরিদ্র হইতে দারিদ্রতর করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় দেশ হইতে এই করাল ব্যাধিকে তাড়াইতে পারা যাইবে না। সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে Anti-Malarial Society স্থাপনার চেষ্টা করিতে হইবে। রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পথপ্রদর্শক। সংক্ষেপে ব্যাপারটী এই :—প্রত্যেক গ্রামেই ক্ষমতানুযায়ী কিছু কিছু চাঁদা দিয়া একটি উপযুক্ত ডাক্তার নিযুক্ত করিতে হইবে। সেই ডাক্তারটি প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে চাঁদাদাতৃগণকে বিনা পয়সায় দেখিবেন। চাঁদা দাতাগণ বিনা পয়সায় ডাক্তারের সাহায্য পাওয়ায় তাঁহাদের লোকসান কিছুই নাই। ডাক্তার মহাশয় প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন—যথা, খানা, ডোবা প্রভৃতিতে কেরোসিন দেওয়ান, পুষ্করিণী বা জলাশয়ের প্রান্তরবর্ত্তী জঙ্গল কাটান, সপ্তাহে দুই দিন করিয়া প্রত্যেক গ্রামবাসীকে ১০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাওয়ান ইত্যাদি। এই সমস্ত কার্য্য করিতে বিশেষ পয়সার আবশ্যক হয় না অথচ পয়সা হিসাবে ভবিষ্যতে অনেক সুফল হয়। ডাক্তারের মাহিনা দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাতে উপরোক্ত কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। কোন একটি বিশেষ পল্লীগ্রামে উপযুক্ত লোক সংখ্যা না থাকিলে দুই তিনটী গ্রাম একত্র হইয়া একটী Society স্থাপন করিতে পারেন। এখন দেশের যে অবস্থা আসিয়াছে তাহাতে নিজেদের পায়ের উপর নিজেদের দাঁড়াইতেই হইবে। ইংরাজীতে বলে God helps those who help themselves।

পল্লীগ্রামের প্রধান অভাব গঠনের উপযুক্ত লোক। ইংরাজীতে যাহাকে Organiser বলে। ভগবানের ইচ্ছায় দেশে কার্য্যের প্রেরণা আসিয়াছে। কর্ম্মিবৃন্দের—প্রত্যেক পল্লী গ্রামে অনেক যুবক নিষ্কর্ম্মা ভাবে জীবন যাপন করেন—তাঁহাদের এক করিয়া গন্তব্য পথে সুশৃঙ্খলিত ভাবে চালাইতে পারিলে লোকের অভাব মোটেই হইবে না। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, দুষ্ট ব্যাধির তাড়নে পল্লীবাসীর মধ্যে উৎসাহ, উদ্যম বা স্ফূর্ত্তি একেবারেই নাই। তাঁহারা প্রায় সকলেই Cynic হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই প্রথম প্রথম তাঁহাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে হইবে। চাই এমন নেতা যিনি এই সব জীবন্মৃতদের মধ্যে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে পারেন এবং তাঁহাদের বুঝাইয়া দিতে পারেন যে মরণ বাঁচনের ভার তাঁহাদের নিজেদের উপর। কাজেই নেতাগিরি করিতে হইলে তাঁহাদের এই সব পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করা ছাড়া আর কোনই উপায় নাই। পরিশেষে আমার সম, ব্যবসায়িগণের প্রতি, বিশেষতঃ যাহারা পল্লীগ্রামে ডাক্তারী করেন, পুনরায় নিবেদন এই যে তাঁহারা সমবেত চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে শীঘ্রই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। চাহিয়া দেখুন, বাঙালী জাতির নাম বুঝি ক্রমশঃই ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়। কিন্তু এখনও সময় আছে।

(গ) কালা-আজার—এই ব্যাধি সম্বন্ধে গত চৈত্র মাসের উদ্বোধনে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম, বি।

ভগিনী নিবেদিতা

স্বামিজী মানস সিন্ধু হইতে উঠিলে ভগিনী যখন তুমি,
শ্রদ্ধা-নম্র হৃদয়ে তোমার ফুটিয়া উঠিল ভারত ভুমি,
রহিতে তাহার সেবায় নিরত, করিলে তোমার জীবনের ব্রত,
তাহারি কল্যাণে নিঃশেষ করিয়া আপনারে তুমি করিলে দান।

২

কমলা-আলয় শূন্য করিয়া এলে কি গো সেবা মূর্ত্তিমতী!
জ্ঞানের প্রভায় উজলি ভুবন এলে কি গো আজি ভারতী সতী!
জননীর স্নেহ-ভরা হৃদি খানি, ঢালিয়া মোদের দিয়াছ গো আনি,
ধন্য মানিনু জীবন আমরা সে পীযূষ ধারা করিয়া পান।

৩

সহেছ ভগিনী আমাদের তরে কত না বেদনা কত না ক্লেশ,
সহেছ ভগিনী আমাদের তরে কত না বেদনা কত না ক্লেশ,
স্নিগ্ধ-হাস্যে বহেছ সকলি চিত্তে রাখনি ক্ষোভের লেশ;
সব উপেক্ষা সকল দৈন্য, সহেছ নীরবে মোদেরি জন্য,

৪

তেয়াগ-পূত এ মহিমা জ্যোতিঃ হতে কি পারে গো কখনো ম্লান
শ্রীগুরু চরণে সঁপিয়া পরাণ কেমনে কঠোর সাধনা পথে
হয়গো চলিতে সাধিতে আপন উচ্চ লক্ষ্য মহৎ ব্রতে,
শিখালে স্বার্থ-অন্ধ জগতে, ভাসায়ে আপনা কর্ম্ম স্রোতে,

৫

চাহ নি কখনো আরামের পানে, চাহনি কখনো বিভব মান।
আজি গো জননী কল্যাণরূপিনী, ঘুচাতে মোদের হীনতা যত,
এসোগো নামিয়া জীবনে মোদের দেবতার শুভবরের মত;

এসোগো স্বামিজী মানস-দুহিতা, এসো গো ভগিনী এসো নিবেদিতা
নিখিল ভুবন ধ্বনিয়া আজিগো উঠুক তোমার গরিমা-গান।
ভগিনী তোমার পুণ্য কিরণে আজিগো মোদের করায়ে স্নান,
অঙ্কিত করি পদরেখা তব, দিয়ো গো মোদের ভরিয়া প্রাণ।

—শ্রীকর্ণাটকুমার চৌধুরী।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব নামক পুস্তিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ যখন বেলুড় মঠে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা হইত তখন সেখানে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিয়া সত্য-জ্ঞান প্রেম ঘন মূর্ত্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী জলন্ত ভাষায় শ্রোতৃবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়া শাস্ত্র মীমাংসা সহজ ও সরল করিয়া দিতেন। ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসের কোনও বৈকালিক ধর্ম্মালোচনায় শ্রীভগবানের বর্ত্তমান ভাগবতী লীলারূপ ফল যাহা তাঁহার সুধামৃত দ্রব-সংযুত হইয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিগণের নিকট পতিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।" সেই দিনের বাক্যগুলি স্বামী বাসুদেবানন্দের ডাইরীতে রক্ষিত হয়। তিনি সেগুলি সজ্জিত করিয়া পর মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত করেন। ইহাই এক্ষণে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা। প্রাপ্তিস্থল উদ্বোধন কার্য্যালয়।

সংঘ-বার্ত্তা

১। বিগত ৩০শে চৈত্র শনিবার স্বামী নারায়ণানন্দ বৃন্দাবনধামে সর্পদংষ্ট হইয়া প্রভুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কঠোরী কর্ম্মী অতি বিরল।

২। স্বামী বোধানন্দ কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামী শঙ্করানন্দ সমভিব্যাহারে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। সেথান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি মহারাজের সহিত মান্দ্রাজ গিয়াছেন।

৩। মান্দ্রাজ গিয়া শ্রীশ্রীমহাপুরুষজি অসুস্থ হইয়া পড়েন। এক্ষণে ভাল আছেন, এবং নীলগিরিতে অবস্থান করিতেছেন।

৪। বিগত ৭ই বৈশাখ পাঞ্জাব জেলার অন্তঃপাতী ইছাপুরম রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের প্রথম বাৎসরিক উৎসবে স্বামী ওম্‌কারানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৫। বিগত ১৭ই বৈশাখ চেতলা ট্রেনিং এ্যাসোসিয়েসনে বালকদের এক সভার অধিবেশন হয়। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ বালকদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ ও স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে সদুপদেশ দান করেন।

৬। বিগত ২০শে বৈশাখ কলিকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাপ্তাহিক ধর্ম্মালোচনা সভায় থিয়সফিকাল হলে স্বামী বাসুদেবানন্দ "পতঞ্জলি ও অন্তরঙ্গ-সাধন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৭। ২১শে বৈশাখ দমদমার নিকটবর্ত্তী কান্দিহাটী গ্রামের বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্যে স্বামী বাসুদেবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কার্য্য শেষে শিক্ষক ও অভিভাবকদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বামী নির্ব্বাণানন্দ তাঁহার ধর্ম্ম সঙ্গীতের দ্বারা সকলের পরিতোষ সাধন করেন।

৮। ২৮শে বৈশাখ শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর নাট মন্দিরে বিবেকানন্দ সোসাইটীর অধিবেশনে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীসম্বন্ধে অনেক অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করান। পরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজ সর্ব্বশেষে স্বামিজী সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। স্বামী রামানন্দ ও বাসুদেবানন্দ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংগীত আলাপ করেন এবং বরাহনগরের অনাথ আশ্রমের বালকেরা রাম নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

1926

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-স্তোত্রম্ *

(বিদ্যার্থী বামদেব)

নিবিড়-তিমির-জালো ব্যাপ্ত-বিস্তীর্ণ-বক্ত্রো
নিখিল-বিপুল-বিশ্বং গ্রাসয়ন্ বর্ত্তমানঃ।
মধুর-মলয়-বাতো নাধুনা বাতি মন্দো
বিষম-ভয়দ-বেশং বিশ্বতো দিগ্ বিভর্ত্তি॥ ১॥
বিষয়-বিষ-নিষণ্ণা দ্বন্দ্ব-বন্ধাদ্ বিষণ্ণাঃ
সতত-বিবদমানা মোহ-গ্রাহ-প্রপন্না।
বিগত-সরল-বোধা ধর্ম্ম বিশ্বাস-হীনা
ভুবন-বিচরমানা দুঃখ-সিন্ধৌ বিমগ্নাঃ॥ ২॥
"ভুবন-ভরণ-বিষ্ণো বর্ষ কারুণ্য-রাশিম্"
ইতি নিরবধি নাদো নিঃসৃতো মর্ত্ত্য-লোকাদ্।
গগন-গহন-ভূধ্রা অভ্রমার্গং বিদার্য্য
সকরুণ-প্রতিশব্দং নাকলোকে নয়ন্তি॥ ৩॥
নিখিল-বিবুধ-বৃন্দা মর্ত্ত্য-দুঃখাদ্ বিষণ্ণাঃ
সদসি চ সমবেতা-স্তন্নিরোধৈক-কামা।
দিবি সুরুচির-বাটং সার্গলং বৈ বিমোচ্য
ব্যথিত-মনুজ-লোকে দিব্য-দৃষ্টিং ক্ষিপন্তি॥ ৪॥
রুচির-পরম-ধাম্নি স্বপ্রকাশে বিভাসা
রবি-শশধর-রশ্মি-র্যত্র নালং প্রবেষ্টুম্।

---

* শ্রীহট্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সভায় পঠিত।

প্রবর-সুর-গণানাং যত্র বৈ নাধিকারঃ
স্তিমিত-নয়ন-সপ্তর্ষয়স্ত ধ্যানমগ্নাঃ ॥ ৫ ॥
সমাধি-সুখ-বিলীনং তেষু চৈকং প্রবীণং
সুমধুর-কর-স্পর্শ-ব্যুত্থিতং ধ্যান-মার্গাৎ।
তপন-কিরণ-হাসঃ শুভ্রতেজঃ-প্রপুঞ্জো
দ্যুত-সুর-শিশু-বেশো গাঢ়মেবালিলিঙ্গ ॥ ৬ ॥
অবদদতি-বিনীতো বোধয়ংস্তং মহর্ষিং
মধুর-ললিত-বাক্যৈ মর্ত্ত্য-লোকে ত্বিদানীম্।
সকল ভুবন-ভারং হর্ত্তুমাবির্ভবামি
সমবতরণ-জন্যং সোঽপ্য তস্মাদিদেশ ॥ ৭ ॥
বিমল-মধুর-নন্দো গাঙ্গবারি-প্রবাহো
নিখিল-সুর-গণেভ্যঃ শান্তি-রাশিং প্রদায়।
খচর-গিরি-চরাণাং ক্ষালয়ন্ পাপ-পুঞ্জম্
অগমদবনি-লোকে সর্ব্ব-দৈন্যাপহারী ॥ ৮ ॥
সকল-বিবুধ-সঙ্ঘা স্ত্যক্ত-দিব্য-বিলাসা
অবনি-তলমুপেতাঃ স্বর্গরাজ্যং বিহায়।
বিবিধ-সুনব-কেলিং শোভনং বৈ বিচয্য
মনুজ-নয়ন-তৃপ্তিং শংসনং কর্ষয়ন্তি ॥ ৯ ॥
অতিমদ-বল-দৃপ্তান্ রাক্ষসান্ যো জঘান
নরপতি-বর-সেব্যাং রাজ্য-লক্ষ্মী মহাসীৎ।
বনজকুসুম-মালো গোপিকা-প্রাণনাথঃ
পতিত-করুণ-দৃষ্টিঃ সোঽধুনা রামকৃষ্ণঃ ॥ ১০ ॥
বিগত-বিষয়-সঙ্গঃ সাধক এহি ভোস্তম্
বিফল-সকল-যত্নো মাঽস্ত নৈরাশ্য-ভাবো।
জলধি-সলিল-মধ্যাৎ সর্ব্বজীবং দিধীর্ষুঃ
প্রণয়-গলিত-চিত্তো জ্ঞান-কর্ম্মৈক-কায়ঃ ॥ ১১ ॥
পরিহর ভয়-ভারং গচ্ছ বিদ্বন্ নিবৃত্তিং
কুরু চ নয়ন-পাতং মোহ-রাত্রিঃ প্রভাতা।

উদয়-শিখরি-শৃঙ্গে দৃশ্যতে দীপ্ত-ভানুঃ
কনক কিরণ-মালা দিগ্ বিভাগান্ বিভাতি ॥ ১২ ॥
বন্দে ভবেশং জগতো বরেণ্যং
সংসার-সিন্ধো স্তরণীং শরণ্যম্।
বন্দে পরং দুঃখ-বিনাশ-জন্যং
নিরস্যতাং নো ভব-জন্ম-দৈন্যম্ ॥ ১৩ ॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

সাধনা ও তাহার ক্রম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাহা তুমি কখনও জান নাই, জানিতে না, জানিবার অঙ্কুরের পর্য্যন্ত সম্ভাবনা জ্ঞান ছিল না, তাহা জানিয়াছ।—কি উপায়ে জানিয়াছ? জ্ঞানে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক কাহার না কাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছ। একটি সাদা কাল লাল নীল যাহা কিছু দৃষ্ট বা অনুশ্রবিক পদার্থ—অসম্ভাবনা হইতে সম্ভবে পরিণত হইয়াছে, অপ্রাপ্তব্য হইতে প্রাপ্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"সৎগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ
তব্ কয়লাকো ময়লা ছোড়ে যব্ আগ্‌করে পরবেশ"

আচার্য্যবান পুরুষ আচার্য্যের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞ হন, ব্রহ্মজ্ঞান চিত্তমল বিদূরিত করে, তদা সৎস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। চিত্তসত্তায় সৎস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হওয়ার নাম আত্মদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ।

সূর্য্যগ্রহণ কালে একটি ক্ষুদ্র বাসনে জল প্রয়োগ করিয়া সুবৃহৎ সূর্য্যমণ্ডলীকে বাসন অভ্যন্তরে আনয়ন করা হয়। স্বচ্ছ চিত্তে অর্থাৎ বিষয় বাসনা বা বিষয় অবলম্বন বিরহিত চিত্তে যাহা বিকার ও

বিনাশশীল সুতরাং অসৎ ক্ষণভঙ্গুর তাহা হইতে পৃথক হওয়ার নাম স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হওয়া। এবম্বিধচিত্তে সৎস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু বিম্বপাত মাত্রে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। যে ব্যক্তি কখনও রেলগাড়ী দেখে নাই সে হঠাৎ কোনও প্রান্তরে দ্রুতগামী রেলগাড়ী দেখিয়া চকিত হয় কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় কোন জ্ঞানই জন্মে না। ঐ বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন কোনও ব্যক্তির সহিত বিচার ও পুনঃপুনঃ দর্শন দ্বারা স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হয়। ক্রমে প্রয়াসী হইয়া অধিকতর জ্ঞানলাভ ও তাহাতে আরোহণ ও গতিবিধি দ্বারা সমূহ দর্শন ও স্পর্শ জ্ঞানের আস্বাদ সম্পাদনে স্বার্থকতা হইয়া থাকে।

জলপাত্রখানি যে স্থানে স্থাপন করিয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিতে ছিলাম, পৃথিবীর গতি চাঞ্চল্য হেতু বাসনটিকে স্থানান্তরিত না করিলে বিম্বপাত সম্ভাবনা থাকে না। তদ্রূপ প্রকৃতির প্রতিকূলে ও পুরুষের অনুকূলে, যাহা প্রাকৃতিক তাহাই নশ্বর যাহা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র তাহাই পুরুষ তাহা অবিনাশী; স্থূলভাবে একটি মিথ্যা অপরটি সত্য। কায়মনোবাক্যে মিথ্যা বর্জ্জন ও সত্য গ্রহণ দ্বারা ক্রমে সত্যের সহিত যে নৈকট্য সম্বন্ধ জন্মে তাহা হইতে সত্যের প্রতি প্রেম উৎপন্ন হয় ও সত্যস্বরূপের সহিত নিজ অভিমানী স্বরূপের যে মমত্ব সংস্থাপিত হয়, তাহা হইতে ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। তখন কাঞ্চন কাচমূল্যে বিক্রীত হইতে চাহে না। নিজেকে সত্য হইতে সম্ভূত অনুভব করিয়া পুত্র যেমন অপহৃত পিতৃরাজ্যের সন্ধান পাইয়া অধিকার লাভে কৃতসংকল্প হয়, জীবাত্মা তদ্রূপ পরমাত্মার ঐশী শক্তির দাবী করিতে আরম্ভ করে ও সাধনবলে সম, দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা দয়া প্রভৃতি ষড়্গুণসম্পন্ন হইয়া দেবত্ব লাভ করে।

যে অভাবের পীড়নে অস্থির হইয়া হিতাহিত বিচার বিবর্জ্জিত ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য দ্বারা অভিভূত হইয়া অপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সে পশু।

যিনি কায়মনোবাক্যে ব্যবহারিক জগতে ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নিজ দেহ মন সমর্পণ করিয়াছেন ও কাম ক্রোধ আদি

রিপুগণকে পরাভূত করিয়া কর্ত্তব্যের জন্য, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম্ম করেন তিনি মনুষ্য।

যিনি তদূর্দ্ধে সম, দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা দয়া গুণে অলঙ্কৃত ও ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্য লালায়িত নহেন অর্থাৎ তদ্বিষয়ক অভাবজ্ঞান বিরহিত, যেহেতু তাহাতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তিনিই দেবতা। তিনিই ব্রহ্মমার্গে উন্নীত হইবার যোগ্য পাত্র।

আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে ব্রহ্ম নিরূপণ সম্বন্ধে বলিব।

"রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোঃ দূরীকৃত যন্ময়া নিরাকৃত
ভগবতো যৎ ব্যাপিত্বঞ্চ তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিফলতা দোষ এয়ং মৎকৃতং।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যই ঈশ্বর ও ঈশ্বরই সত্য। যে অঙ্গুলির সাহায্যে শিশু পাটি পাটি করিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছিল, সে অঙ্গুলির কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। বড় একটা কিছু বলিয়া ব্রহ্ম পদার্থকে উড়াইয়া দিয়া একটা কিছু বীভৎস করিতে প্রয়াস পাওয়া মোটেই সঙ্গত নহে। ব্রহ্মপদার্থ নিতান্ত আপনার পদার্থ উহা আমাদিগের Substance বা সত্তা।

"রেণুর সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড গড়েছে, জীবের সমষ্টি জাতি,
তব সিদ্ধি লাভ জাতির জীবনে রশ্মি উঠিবে ভাতি।"

ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ড গড়িতে পারেন না, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তাঁরত দাঁড়াইবার স্থান থাকা চাই, যদি ভিতরে থাকিয়া গেলেন তবেত সসীম হইলেন ; ব্রহ্মে দোষ স্পর্শ করিল। তবে ব্রহ্ম নিরূপণের সম্ভাবনা কৈ ? "ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ"। এই জগৎ ব্রহ্মময়, বা ব্রহ্ম জগৎময় আছেন একই কথা। স্বয়ম্ভু-ব্রহ্ম জন্মিয়াছেন অব্যক্ত ব্যক্ত হইলেন, অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইলেন। ভেদবুদ্ধিতে যাহা বুদ্ধির অগম্য, Unknown and Unknownable অভেদ জ্ঞানে তাহা 'ইহা সেই।'

"সোঽহং বা সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ God is with me and I am

with God. কিম্বা যেখান হইতে আরম্ভ করিবে তাহাই ব্রহ্মময় অর্থাৎ তাহা সত্যের রূপান্তর বা রূপান্তরিত সত্যমাত্র। বেদান্ত বলেন যাহা নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ, যাহার বিকার ও বিনাশ সম্ভাবনা নাই তাহাই ধ্রুব, অন্যার্থে সত্য। প্রত্যেক পদার্থের আড়ালে যে সত্য নিহিত আছে তাহার অস্তিত্ব অর্থাৎ অবিনাশী ভাগ যাহা রেণু হইতে পরমাণু তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তর, যাহা আইসে নাই এবং যাইবার নহে, কাজেই নিত্য, তাহার বিকার সম্ভাবনা নাই কাজেই শুদ্ধ (অবিকৃত); তাহা কোনও গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ হইতে পারে না কাজেই মুক্ত; তাহা জড়ময় হইতে পারে না চৈতন্য ময়, কাজেই বুদ্ধ। জীবমাত্রেই এই সৎভাগের ও চৈতন্যভাগের বিকাশ আছে, আনন্দভাগ প্রচ্ছন্ন আছে দেবদেহে তাহার অঙ্কুর আছে, ব্রহ্মে পূর্ণতা আছে।

সত্য স্বরূপ তুমি, চৈতন্য স্বরূপ তুমি
আনন্দময় তুমি,
জীবদেহ তব লীলাভূমি।
যোগাসনে যোগী তুমি, জ্ঞানে বুদ্ধ নাম
বিবেকে বৈরাগী তুমি প্রেমেতে পাগল
হরি হরি বল।

যিনি প্রেমময়, চৈতন্যময় ও সত্যময়, যিনি রেণুতে পরমাণুতে পরতে পরতে রেখাতে বিন্দুতে মাখামাখি হইয়া বিরাজিত, যিনি আস্বাদে সুস্বাদে বিস্বাদে বিড়ম্বনায়, যিনি স্থিরে চকিতে শ্রান্তিতে শ্রমে, যিনি অনিলে অনলে গহ্বরে, যিনি উদয়ে অস্তে মধ্যাহ্নে নিশিতে, যিনি হাসিতে রুধিরে কঠিনে কোমলে, যিনি চলিতে বলিতে খেলিতে দলিতে—কি দিয়া ধরিব তায়, ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পারি ধরিতে সরিয়া যায়।—চিত্তের প্রতি প্রতিবিম্ব, ধরিব কি করিয়া? প্রাণ স্পর্শ করিলেই ত আপনাকে হারাইয়া ফেলি।

"যার প্রাণ তারই কাছে লোকে বলে নিলে নিলে
দেখা হলে সুধাইব সে নিলে কি আমায় দিলে।"
"বলি বলি বলা হল না"

প্রতিফলিত প্রেম-তরঙ্গ ও উচ্ছ্বাস যদি মানব হৃদয়ের পক্ষে এত আবেগ ময়, তবে প্রেমসাগরে ডুবিয়া আর উঠিবে কে ? সাগর যদি তাহাকে ফিরাইয়া দেয় ! সে যদি ডুবিয়া ভাসে, কাঁদিতে হাসে, তবে তাহার হাসি কান্নার ভিতর অপ্রাকৃত যাহা পরিলক্ষিত হয় তাহাই ব্রহ্ম ।

(ভক্তের নিকটই ভগবানের প্রকাশ)

যাহা অসীম বৃহৎ তাহাই ব্রহ্ম ; যাহা অদ্বিতীয়, তাহাই ব্রহ্ম ; তবে তাহার নিরুপণ সম্ভবপর কিরূপে তাহা মাপের ভিতর আমার গণ্ডির ভিতর আমার সীমার ভিতর আমার চিন্তার ভিতর কি করিয়া আসিবে ?

ভেদাভেদ থাক্‌তে নাকি,
যায় না বুঝা তোমার ফাঁকি
দেখতে যে আর নাই মা বাকি
তাইতে তারা তাকিয়ে থাকি ।
নাম রূপ রসগন্ধে মজে,
বেদের মেয়ে মা আছিস সেজে,
তোর বেদের বাজী আর ভোজের পুঁজি
সোজা সুজি বুঝিয়ে দে না ।

চিত্ত বিষয়াকার শূন্য হওয়ার নাম স্বচ্ছাকার বা নিরাকার নিরবলম্ব তুল্য হওয়া, তাহাতে সৎ সত্ত্বা, বা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । অর্থাৎ চিত্ত যদি কোনও প্রকার মিথ্যা সংস্পর্শে কলুষিত না হয় তবে সত্যে স্বাকারে বা স্বরূপ দর্শনে, বা স্বরূপে অবস্থিত হয় । আমি যাহা নহি আমি তাহা এরূপ বুদ্ধিকে অজ্ঞান বলে । আমি অবিকৃত ঠিক্ ঠিক্ যাহা তাহা উপলব্ধি করার নাম—অবিদ্যা অজ্ঞান নাশ ও জ্ঞান প্রকাশ ।

পাতঞ্জলি বলেন—

"যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধ ॥ ১ । ২
তদা দ্রষ্টু স্বরূপেঽবস্থানম্ । ১ । ৩

তাৎপর্য্য অর্থ এই যে, বস্তু বিশেষ হইতে বিযুক্ত হইয়া বিশেষ বস্তুতে

সংযুক্ত হওয়ার নাম যোগ। যুগপৎ মন দ্বারা দুইটি কর্ম্ম সম্পন্ন না হওয়ায় ইহাতে কোন বিরোধ ভাব নাই।

যাহা অসীম বৃহৎ তাহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে সন্নিবিষ্ট না থাকিলে সীমান্তর ঘটিয়া যায়, যাহা অদ্বিতীয় তাহা সর্ব্ব প্রকাশক না হইলে দ্বৈত আসিয়া যায়। অভিমানী "আমি" ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে গিয়া গোলে পড়িয়া যায়, তাহার সীমা বিচার পর্য্যন্ত।

বৈষয়িক জগতে আমাদিগের যেমন পৃথক পৃথক মর্য্যাদা আছে ও তদনুযায়ী শক্তি সামর্থ্য সঞ্চালন করিয়া থাকি অধ্যাত্ম জগতেও অধিকার বহির্ভূত অবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

মহাদেব শঙ্করাচার্য্য বিচার করিলেন, অজ্ঞান নষ্ট হইলে ব্রহ্ম বস্তু উপলব্ধি হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তু শুদ্ধ জ্ঞানারূঢ় থাকেন বা আছেন অন্যথায় তৎকল্পনায় বা রূপান্তরিত আছেন।

যেমন কোন একটি বিন্দু কোনও একটি বিন্দুর সহিত সমসূত্রে না থাকিলে একবিন্দু হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অন্য বিন্দুতে সম্যক দর্শন হয় না, অথবা কোন রঙ্গিন কাচের ভিতর দিয়া কোনও দ্রব্য দেখিলে রঙ্গিন দেখিতে হয় তদ্রূপ অভিমানী 'আমি' যাহার সংসার রেখা বর্ত্তমান অর্থাৎ যে নিজেকে নিঃসম্বল অনুভব করে নাই, যাহার ত্রিজগতে স্থান কাল ও অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ ভাব ঘটে নাই, যে স্পষ্টতঃ দেখিয়াছে যে তাহার ধন জন পুত্র কলত্র, বিদ্যা বুদ্ধি, নাম যশ, বিষয় আশয় দেনা পাওনা দূরে কর্ম্মসূত্রে ঝুলিতেছে—তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে আমি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মা প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন তাঁহার ব্রহ্ম নিরূপণে ব্যবধান নাই, ব্রহ্মে তাঁহার অবিচ্ছেদ ভাব আছে।

আমি চিনিনা জানিনা বুঝিনা
তোমারে, তবু হে তোমারে চাই।
একি মহা দায় বুঝি না তাই।
পিত পিত বলে ডাকিহে তোমারে
ব্যথা কি লাগে না তোমার অন্তরে

নির্ব্বিকার যদি শকতি তোমার
কেন বা ঘটিল বিকার আমার
কেন হাসি কাঁদি লইয়ে তোমারে
কেন চাহি তোমা পূজিতে তুষিতে।　　(ক্রমশঃ)

—শ্রীতারিণীশঙ্কর সিংহ।

জীবন-রহস্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সত্যসন্ধ ভীষ্মের পর সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের কথা মনে হয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুগণকর্ত্তৃক দ্যূতে আহুত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ক্রীড়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একে একে রাজ্য, বাহন, কবচ, আয়ুধ, ভ্রাতৃগণ আপনাকে—এবং পরিশেষে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণে হারিয়া গেলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনিয়া অনুচিত অপমান করিতে লাগিলেন; সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল; ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন, তথাপি ধর্ম্মরাজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, কারণ তিনি সত্যবদ্ধ। মহামতি বিদুর ঐ সঙ্কট সময়ে সভাসদ্গণকে যে মহৎ কথা শুনাইয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। বিদুর বলিয়াছিলেন—"বিচার-সমাজে উপস্থিত থাকিয়া যে ধর্ম্মদর্শী-সভ্য বিচার্য্য বিষয়ে কিছুই না কহেন, তিনি মিথ্যা কথনের অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হয়েন। আর যিনি মিথ্যা সিদ্ধান্ত কহেন, তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার ফল ভোগ করেন।" সত্যের কি উচ্চ আদর্শ! যাহা হউক, মহারাজ যুধিষ্ঠির হৃতরাজ্য এবং স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও, অদৃষ্টকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া পুনরায় দ্যূতে আহুত এবং পরাজিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বন

সমাকীর্ণ এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া অজীন উত্তরীয় গ্রহণপূর্ব্বক বনগমন করিলেন। অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া এই ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, তথাপি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কখন সত্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। এমন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহারথ যুধিষ্ঠির তাঁহাকেও সত্যের ক্ষণিক কুটিল অপলাপ হেতু নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। আমরা ঐ মহাভারতে পড়িয়াছি যে, দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিয়া মহারাজ বসুকেও রসাতলে গমন করিতে হইয়াছিল।

মহাত্মা যিশু খৃষ্ট সত্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন রুধিরস্রাব হেতু তাঁহার মানবধর্ম্মশল দেহ অবসন্ন হইতেছিল তখন তিনি ভগবানের নিকট তাহার ঘাতকদের পারত্রিক কল্যাণ কামনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "পিতঃ, ইহারা জানে না কি অন্যায় কার্য্য ইহারা করিয়াছে।" জগতের ইতিহাসে ইহা একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু পাঠক একবার শিবিরাজার পুণ্যোপাখ্যান স্মরণ করুন। এক শ্যেন কর্তৃক তাড়িত হইয়া এক কপোত শিবিরাজার শরণাপন্ন হইয়াছিল। শিবি রাজা তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদয় কাশী রাজ্য এবং জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। শ্যেন আসিয়া মহারাজ শিবিকে বলিল, কপোত তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য; অতএব প্রাপ্ত ভক্ষ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিলে মহারাজের অধর্ম্ম হইবে। মহারাজ শিবি শ্যেনকে বৃষ, বরাহ, মৃগ বা মহিষের মাংস পর্য্যাপ্তরূপে প্রদান করিতে চাহিলেও শ্যেন তাহাতে সম্মত হইল না। মহারাজের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শ্যেন পরিশেষে কপোত পরিমিত মহাত্মা শিবির গাত্র মাংস লইতে স্বীকৃত হইলে মহারাজা স্বহস্তে তাহাকে স্বীয় গাত্র মাংস কর্ত্তিত করিয়া দিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন তাঁহার সমস্ত দেহের মাংসেও কপোতের দেহ পরিমিত হইল না, তখন তিনি রুধিরাক্ত কলেবরে তুলাদণ্ডে আরোহণ করিলেন। সত্যরক্ষার্থ স্বেচ্ছাবলির ইহাপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত সত্যাভিমানী অন্য কোন সভ্যজাতির ইতিহাসে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

যে ভারতবর্ষে সত্যের এই মহৎ আদর্শ—সেই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিজেতার অনাচারে অত্যাচারে আমরা আজ অসত্যবাদী। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করি নাই বলিয়া এখন আমরা আত্ম মর্য্যাদা রক্ষণেও অসমর্থ হইয়াছি।

আমরা শাস্ত্র মানি না। শাস্ত্র না পড়িয়াই মানি না। শাস্ত্রে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহার সত্যাসত্য বিজ্ঞানসম্মত কি না সে বিচার না করিয়াই শাস্ত্র মানি না। কেন না শাস্ত্র না মানাই হইতেছে এখন পুরুষত্ব। আবার শাস্ত্র মানিতে গেলে তাহার যুক্তিতর্ক বিজ্ঞানের মাপকাটীতে মাপিয়া লইতে হয়, সেও বড় পরিশ্রমের কাজ। কাজেই না মানাটাই সহজ এবং আমরাও দ্বিধামাত্র না করিয়া শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখি। শাস্ত্র আমরা মানি অথবা না মানি, শাস্ত্রে কি লিখিত আছে তাহা জানিতে কোন দোষ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল গ্রন্থে কিছু না কিছু অলৌকিক কিংবা অপ্রাকৃতিক কথা সন্নিবিষ্ট আছে। কথিত আছে যে ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে প্রজাপতিগণের সৃষ্টি করেন; পরে স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, সত্য প্রথম; ধর্ম্ম সত্যের অনুগামী। বেদের ফল সত্য, কিন্তু সত্য বেদাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সত্যের ফল দমগুণ এবং দমগুণের ফল মোক্ষ।

আর্য্য-শাস্ত্রকারেরা সত্যের ত্রয়োদশ লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যথা—অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনুসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা। সত্য—তপ, যোগ যজ্ঞও পরব্রহ্মস্বরূপ; অর্থাৎ একমাত্র সত্যেই এই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। সত্য ধর্ম্মের আধার—অতএব সত্যের অপলাপ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। সত্য অব্যয়—অবিকৃত; কোন ধর্ম্মের বিরোধী নহে, কারণ সত্য বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। সত্য প্রভাবে অন্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। সত্য সম্বন্ধে হিন্দুর আদর্শ এমনি উচ্চ যে, ধীমান ভীষ্ম ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, মানদণ্ডের একদিকে

সহস্র অশ্বমেধ এবং অপর দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধর্ম্ম সত্যের অনুগামী। সত্যবলে ইহলোক ও পরলোক হইতে যেমন পরিত্রাণ লাভ হয়, যজ্ঞ, দান ও নিয়ম দ্বারা সেরূপ হয় না। সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যাও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নয়। সত্য ও ধর্ম্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিলে সত্যের গৌরবই রক্ষিত হইবে, যেহেতু সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্যা, অক্ষয় যজ্ঞ, ও অক্ষয় বেদস্বরূপ। বেদশাস্ত্রে সত্য জাগরূক হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা মহাভারতেই পড়িয়াছি যে, সত্যপ্রভাবে অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। তপস্যা ধর্ম্ম দমগুণ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র, স্বরস্বতী, স্বর্গ, বেদ, বেদাঙ্গ বিদ্যা, বিধি, ব্রতচর্য্যা ওঙ্কার এবং জীবগণের জন্ম, ও সন্তান সন্ততি সমুদায়ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্য প্রভাবে বায়ু গমনাগমন, সূর্য্য তাপ প্রদান, এবং অগ্নি দাহ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। এ সকল বৈজ্ঞানিক সত্য, সুতরাং সন্দেহ করিবার অবসর নাই। যাঁহারা কিছু দিনও নিয়মিত সত্যের সেবা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, সত্যবলে সমুদায় কার্য্যে উন্নতি সাধন হইয়া থাকে।

মিথ্যাপেক্ষা অপধর্ম্ম নাই; এই জন্য পণ্ডিতেরা মিথ্যাকে অন্ধকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিথ্যাবাদী হইলে তাহার ইহকাল ও পরকাল কোনটিই মঙ্গলজনক হয় না। শাস্ত্র বলেন, মিথ্যাবাদীর পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও থাকে না। জয়লাভাদির জন্য মন্ত্র প্রয়োগ; দক্ষিণা ব্যতীত যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং মন্ত্র ব্যতীত হোম করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই পাপ জন্মে। কিন্তু সত্যযুগে যাহা সম্ভব হইত কলিযুগে তাহা সম্ভব নহে; কারণ কলি মিথ্যার যুগ। কলি মৃত্যু-প্রধান—মিথ্যাই মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যু হইতে যেমন রক্ষা নাই তেমনি মিথ্যা হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। এই জন্য নীতিশাস্ত্র বিশারদেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, বিবাহে ও প্রাণ সংশয় কালে, কিংবা অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্ম্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত, অথবা গুরুর হিতসাধন ও ভয় নিবারণ হেতু মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা

অকর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে যে পাপ হইবে, ক্ষত্রিয়ের তদপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের অষ্টগুণ হইবে। ইহা কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রচিত। মিথ্যা সকল বর্ণের পক্ষেই মিথ্যা। মিথ্যা মৃত্যু—মিথ্যা অন্ধকার। এই মিথ্যারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে সত্যরূপ আলোক কাহারো নয়নে প্রতিভাত হয় না। মুনিসত্তম ভরদ্বাজ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে বলিয়াছিলেন—"সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, প্রকাশ অপ্রকাশ, সুখ ও দুঃখ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ; এবং যাহা প্রকাশ, তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম; যাহা অপ্রকাশ তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ।" অতএব সত্যে স্বর্গ লাভ হউক বা নাই হউক এবং মিথ্যায় নিরয়গামী হইতে হউক বা নাই হউক-যাহাতে দুঃখ অপনোদিত হইয়া সুখের সঞ্চার হয় তাহাই আমাদের অবশ্য প্রতিপাল্য। সুতরাং সত্যই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

সত্যের লক্ষণ এবং অনুষ্ঠানের বিষয় আমরা বিবৃত করিয়াছি; এখন কি প্রকারে সত্য লাভ করা যায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। সত্য লাভ করিবার সহজ অথবা শ্রেষ্ঠ উপায়, সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ করা। যেখানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেখানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পরধনাপহারি দস্যুকে পরধনের সন্ধান না দিয়া মৌনাবলম্বন, এবং মৌনাবলম্বন বিপজ্জনক হইলে এমন কি শপথপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলা যাইতে পারে—ইহা নীতিসঙ্গত; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেই আছে যে যিনি কিছুতেই সত্য হইতে বিচলিত হয়েন না, তিনি সত্যশূর। আর যিনি জনক জননীর হিতার্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং দেবদেব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সতত সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে দেহান্তে দেবগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে এবং এমনও ভরসা আমাদের শাস্ত্রে আছে যে সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে সকল বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

আধুনিক শিক্ষিত যুগের লোক আমরা এত বড় একটা কথা সহজে হজম করিতে পারি না; কিন্তু একটু চিন্তা করিলে এইটুকু বুঝিতে পারি যে, সত্য স্বর্গ এবং মিথ্যা নরক। যাহাতে অন্তরে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই স্বর্গ এবং যাহাতে মনে অশান্তি আধিপত্য লাভ করে তাহাই নরক। সত্য প্রভাবেই উগ্রস্বভাবসম্পন্ন লোকেরা নিয়ম সংস্থানপূর্ব্বক পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিহার করিয়া একতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাচালতা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন ভাল, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্য বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা ধর্ম্ম সংযুক্ত সত্য বাক্য প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ। আবার সেই ধর্ম্ম সংযুক্ত সত্যবাক্য যদি লোকের প্রিয় হয় তাহাপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই; কারণ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, সত্য বলিবে প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিও না। এই ব্যবস্থা নীতিমূলক সন্দেহ নাই—তবে কতদূর ধর্ম্মমূলক তাহা বিবেচ্য।

সত্য বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্য বাক্য ব্যতীত মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে, সত্য সর্ব্বপ্রকার মিথ্যার এবং অন্যায়ের প্রলোভন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। সত্য দুষ্প্রবৃত্তি দমন করে—দুর্নীতি নিবারণ করে। সত্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ষড় রিপু হইতে সত্যবাদীকে সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করেন। মনে কর, কাহারো কোন দ্রব্যে লোভ হইয়াছে—অথবা কেহ কোন অন্যায় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছে—তখন তাহার বিবেক নিশ্চিত এই প্রশ্ন তাহার মনে উত্থাপিত করিবে যে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তখন কি বলিবে? যে মুহূর্ত্তে এই প্রশ্ন মনে উদিত হইবে, তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে কল্পিত কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে হইবে। যদি কেহ কোন রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত হইবা মাত্র তাহাকে সত্যকথা বলিতে হইবে, এই ভয়ে তাহাকে কুণ্ঠিত হইতে হইবে এবং দ্বিতীয় বার সে, সে কার্য্য করিতে কখনই স্বীকৃত অথবা প্রবৃত্ত হইবে না। সত্য অন্যায় এবং অধর্ম্মের প্রকৃষ্ট বর্ম্ম। যে সদা সত্য কথা কহিবার সৎসাহস অবলম্বন করিতে পারিবে তাহাকে কখন বিপথগামী হইতে হইবে না। যদি কখন প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা

মোহাকৃষ্ট হইয়া কেহ কোন অন্যায় অধর্ম্মাচরণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার সে আর সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। জিজ্ঞাসিত হইলে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিতে পারিবে না এই জ্ঞান তাহাকে সর্ব্বদা বিপদের সান্নিধ্য হইতে দূরে লইয়া যাইবে।

স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, চরিত্র উন্নত রাখিতে হইলে, দেহ এবং মনকে পবিত্র রাখিতে হইলে, আত্মাকে নির্ম্মল রাখিতে হইলে, বিবেককে প্রবুদ্ধ রাখিতে হইলে সত্য বাক্য ব্যতীত মিথ্যা বাক্য প্রাণান্তেও ব্যবহার করিব না—এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। কেবল মাত্র পরের প্রাণ অথবা ধর্ম্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত নিজের বিপন্ন জীবনকে আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিব না—এই প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলে, কোন মানুষই কখন বিপথগামী হইতে পারিবে না। সত্যের এমন মহিমা যে, সত্যকে আশ্রয় করিলে মনে কোন দুর্ভাবনাই স্থান পাইতে পারে না। একদিনে সত্যবাদী হওয়া সম্ভব নহে; কেননা মিথ্যা বাক্য এবং মিথ্যা ব্যবহার আমাদের এমন মজ্জাগত দোষ হইয়াছে যে, স্থির ধীর ভাবে কঠোর সাধনা না করিলে আমরা কখনই সত্যকে সম্যক আশ্রয় করিতে পারিব না। প্রতিদিন প্রত্যূষে অথবা নিয়মিত সময়ে শয্যাত্যাগ করিবার কালে বিনীতভাবে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে,—হে, দয়াময়! অদ্যকার দিনে আমি যেন কোন প্রকারে সত্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার চরণ প্রসাদ হইতে বঞ্চিত না হই। আবার প্রত্যহ রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিবার সময় সমস্ত দিনের ঘটনাবলী স্মরণপূর্ব্বক কয়টি মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া পুনরায় জগৎপিতার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে এবং পর দিবসের সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত সৎসাহসের যাচ্ঞা করিতে হইবে। যে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি একমাস এইরূপ করিবেন, তাঁহাকে আর কখনও মিথ্যার কুহকে পড়িয়া সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে না। সত্য পথ লাভ করিবার, সত্যনীতি অবলম্বন করিবার, সচ্চরিত্র হইবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় সত্যবাক্য ব্যবহার করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। পুরাকালে

ব্রাহ্মণেরা পরিমিত সত্য বাক্য প্রয়োগ করিতেন মিথ্যা বলিতেন না। এইজন্য প্রসিদ্ধি আছে যে, বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিতেন তাহাই ফলিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণেরা সত্য ব্যতীত কখন মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা জানিতেন অনৃত হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়। যাহারা সেই অন্ধকার প্রভাবে ধর্ম্মকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা আধিব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া দুঃখে কাল যাপন করে।

যে বাক্যের দ্বারা জীবের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাই সত্য-বাক্য; সুতরাং সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আধুনিক নীতি অনুসারে যেখানে সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয়, সেখানে সত্যবাক্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা উচিত; কিন্তু আমার মতে ইহাতে ধর্ম্মের হানি না হউক, ধর্ম্মের গ্লানি হয়। ধর্ম্মাত্মারা বাক্য, দেহ ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতিকে ধর্ম্মের নিদান বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন, সত্য ও মিথ্যা এই দুইয়ের ইহজীবনে যিনি যাহা আচরণ করেন, পরজন্মে তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে রত হয়েন। একথা অস্বীকার করা যায় না; কারণ, যাহার যেরূপ ভাবনা এবং সাধনা, তাহার তদ্রূপ সিদ্ধিলাভ হইতে দেখা যায়। আমাদের এই ক্ষণবিধ্বংসী দেহ মধ্যে মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছে; সত্যব্রত ও সমদমাদি গুণ দ্বারা কেবল সত্যবলে মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃত লাভ করিতে হয়। সত্যপথ অবলম্বন করিলে ইহজন্মেই অমৃতলাভ করা যায়; আর মোহান্ধ হইলেই মৃত্যু ধ্রুব। এইজন্যই সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও হৈহয় বংশোদ্ভব সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে তিনি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইলে যেন সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে শাসন করেন। মহামতি ভীষ্ম মৃত্যুকালে, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"সত্য হইতে তোমাদিগের বুদ্ধি যেন কখন বিচলিত না হয়। সত্যের তুল্য পরমবল আর কিছুই নাই।"

সত্য স্বভাবতঃ নির্গুণ; যখন উহা সগুণ, তখন উহাকে ঈশ্বর

ধর্ম্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলিয় ভগবান ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইজন্য ব্রাহ্মণেরা নিত্য যোগ-পরায়ণ, ক্রোধশূন্য, সন্তাপ বিমুক্ত হইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যেখানে সত্য, সেইখানে লক্ষ্মী। যিনি সত্যবাদী, তিনি ব্রহ্মচারী সত্যবাদী হইলেই মনুষ্য শত সংসর জীবিত থাকিতে পারে। সত্য প্রভাবেই সূর্য্য তাপ বিতরণ করেন, সত্য প্রভাবেই অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, মেঘ বারি প্রদান করে, পৃথিবী শস্যশালিনী হয়, বৃক্ষলতা গুল্ম ফল ফুলে সুশোভিত হয়, দেবতা ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। দেবতা ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যে প্রীত হয়েন। সত্য পরম ধর্ম্ম, অতএব সত্য উল্লঙ্ঘন করা অতীব গর্হিত কর্ম্ম। আমাদের ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিগণ সকলেই সত্য নিরত, সত্য পরাক্রম ও সত্য শপথ ছিলেন। সত্যবাদী ব্যক্তিরা ইহলোকেই স্বর্গ সুখ ভোগ করে—কেন না, মনই সুখের আগার। সমুদায় বেদ অভ্যাস এবং সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ। সতত সত্যপরায়ণ হওয়াপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই; কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ কেন, সকলেরই সতত সত্যপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। সত্যপরায়ণ হইলে, সত্য পালন করিলে, সত্য রক্ষা করিলে, সদা সত্য কথা কহিলে, আমরা স্বর্গলাভ করিব—অর্থাৎ স্বাস্থ্য শান্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী হইব। অতএব মানব জীবনকে যথাযোগ্যরূপে উপভোগ করিবার পক্ষে প্রধান-তম উপকরণ হইতেছে সত্য। সত্য অপেক্ষা পবিত্র আর কিছু নাই। সত্য জীবনের প্রথম ও প্রধান সম্পদ—সত্যই জীবনের সার্থকতা।

সত্যং শিবম্ সুন্দরম্।

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

লাটুমহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

পূজ্যপাদ লাটুমহারাজের জন্ম ও বাল্য-জীবন-কথা আমরা কিছুই অবগত নহি। কেবল এইমাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, তাঁহার জন্মস্থান ছাপরা জিলার অন্তর্গত কোন এক গণ্ডগ্রামে এবং তিনি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া জনৈক নিকট আত্মীয় কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাল নাম ছিল—রাখতুরাম (চৌধুরী ?) ডাক নাম—লাটু।

শৈশবে বিদ্যার্জ্জন তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই, এমন কি অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নয়।

তাঁহার বাল্যকালের মাত্র একটি ঘটনা তিনি কোন সময় কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।—শৈশবে তিনি একবার ভীষণ বসন্ত-রোগাক্রান্ত হন। যখন সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছে, এমত অবস্থায় —কোথা হইতে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার সর্ব্ব-শরীরে হাত বুলাইয়া দেন, এবং সকলকে অভয় দান করিয়া চলিয়া যান। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেন, "সে কোন দেবী এসেছিল।"

যৌবনের প্রারম্ভে সাংসারিক অস্বচ্ছলতাবশতঃ তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনার্থে কলিকাতায় আসিতে হয়। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি কোথায় কি ভাবে ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই অবগত নহি, তবে ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট তাঁহার চাকুরী স্বীকার, শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিকাশ ও শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের অশেষ কৃপালাভ করিয়া পরিশেষে তাঁহার নিকট অবস্থানাদি সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন সূত্র হইতে যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই সকল উক্তির মধ্যে যে অনৈক্য দৃষ্ট হয়, ত্যজ্য-গ্রাহ্য বিচার করিয়া তাহার

সামঞ্জস্য বিধান করিবার শক্তি ও সাহস আমার নাই। আমি যেমন পাইয়াছি, তেমনি তুলিয়া দিতেছি।

স্বামী—শিবানন্দ মহারাজের পত্র

"—রামবাবুদের কলেজ স্কোয়ারে একটি মনিহার দোকান ছিল। লাটু সে দোকানে বিলসরকারি করিত এবং দোকান ঝাড়িয়া পরিষ্কার রাখিত। কিছুকাল পর দোকানটি উঠিয়া যায়; তারপর ৺রামবাবু লাটুকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যান। সেখানে বেহারার কাজ করিত। * * রামবাবু মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে মিষ্টান্নাদি বা অন্য কোন জিনিস লাটুর হাতে পাঠাইয়া দিতেন। কিছুদিন পর লাটুর উপর ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। একদিন রামবাবুকে ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমার এ লোকটি বেশ ভক্তিমান্।'

"৺রামবাবুর বাড়ীতে তখন প্রায় নিতাই সংকীর্ত্তনাদি হইত, লাটুও সংকীর্ত্তনে যোগদান করিত। কিছুদিন পরে লাটুর একটু একটু ভাব হইতে আরম্ভ হইল, ক্রমে নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি করিতে ভুল হইতে লাগিল। রামবাবুও মাঝে মাঝে ভৎ‌র্সনা করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইত না, ক্রমে লাটু খুব অন্তর্মুখী হইতে লাগিল। তারপর লাটু দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে বলিল, 'আমি আপনার কাছে থাকব।' ঠাকুর একদিন রামবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ছেলেটি এখানে থাকিতে চায়, তুমি বলত সে এখানে থাকে।' রামবাবু বলিলেন, 'আপনার যখন দয়া হয়েছে, তখন সেত মহাভাগ্যবান্। থাকুক্ না, আপনার কাছেই থাকুক্।'

"লাটু প্রথমে মধ্যে মধ্যে ৺রামবাবুর বাড়ীতেও যাইত। শেষে কলিকাতায় যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল—দক্ষিণেশ্বরে জপ-ধ্যান লইয়া প্রায় সমস্ত দিনরাত কাটাইত। ধ্যান করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে তাহার খুব মনস্থির হইয়া যাইত,—সমাধির ন্যায়। এমন কি আহারের সময়ও প্রায়ই আহার করিতে যাইত না,—ধ্যানে এত মগ্ন থাকিত। তাহাতে ঠাকুর অনেক সময় তাহাকে ধম্‌কাইতেন 'না,—খাবার সময় ঠিক্ খাবি, আমাকেই কে দেখে তার-ঠিক-নাই, আবার তোকে কে দেখ্‌বে?'

"দক্ষিণেশ্বরে তখন প্রত্যহই প্রাতঃকালে ঠাকুরের কাছে 'হরিনাম' কীর্ত্তন হইত। রাখাল মহারাজ, হরিশ, লাটু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ঠাকুরের কাছে কীর্ত্তন করিত। মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তনের সময়ে লাটুর ভাবও হইত। কখনও ক্রন্দন করিত, কখনও বা হাসিত। ঠাকুর বলিতেন, 'এর ভাব ঠিক্ ঠিক্।' * * *"

লাটু মহারাজ সম্বন্ধে রামলাল দাদার কথা :—

"লাটুমহারাজ এখন রামদাদার (ডাক্তার ৺রামচন্দ্র দত্ত) সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন। রামদাদা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, লাটুমহারাজও প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। ঠাকুর তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রামদাদাকে বলিলেন, 'বাঃ! রাম, এ ছেলেটি কোথায় পেলে? এর বেশ সাধু-লক্ষণ দেখ্‌ছি।' রামদাদা শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলেন, 'আমি কি ক'রে জানি, আপনিই সব জানেন।' তারপর রামদাদার সঙ্গে ঠাকুরের কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। লাটুমহারাজ দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বলিলেন, 'বস্ না-রে, বস্'। তারপর লাটুমহারাজের দিকে একদৃষ্টে বার বার চাহিতে লাগিলেন, আর খালি বলিতে লাগিলেন, 'বাঃ ছেলেটি বেশ, বেশ সুন্দর ছেলে।'

"কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। লাটুমহারাজ ঠাকুরের কথামত এক-পাশে বসিলেন। ঠাকুর রাধিকার কীর্ত্তন গাহিতেছিলেন :—

তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে
কথা কইতে পেলাম না,—আমার বঁধুর সনে
(কেন পেলাম না) (ওটার সঙ্গে দাদা-
বলাই ছিল) (অতএব কথা কইতে পেলাম না)
যখন গোঠে যায়, গোঠে যায় হারে রে রে রব ক'রে॥

—কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধির প্রায় তিন কোয়াটার পর কিছু বিরাম অবস্থায় রামদাদা ও লাটুমহারাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পদধূলি গ্রহণ করিয়া লাটুমহারাজ দণ্ডায়মান হইবামাত্র সেই অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় লাটুমহারাজের মস্তক ও বক্ষে হাত

বুলাইতে বুলাইতে ঠাকুরের চক্ষে দরদরিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; মস্তকের কেশ কদম্ব-কেশরের মত প্রফুল্লিত এবং শিহরিত হইয়া উঠিল। ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন। ঠাকুরের স্পর্শে লাটুমহারাজ গভীর ভাবস্থ হইলেন। তারপর ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, 'রাম দেখ্‌লে! এই ছেলেটির কথা যেমন বলেছিলাম, এখন মিলিয়ে নাও।' তার প্রায় ১ ঘণ্টা পর লাটুমহারাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া—প্রথম উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও পশ্চাৎ হাস্য করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এ আমার চক্ষে দেখা। তারপর, ঠাকুরের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে ঐরূপ ভাবস্থ হইতে তাঁহাকে বহুবার দেখা গিয়াছে।

"রামদাদা লাটুমহারাজের এই অবস্থা দৃষ্টে তাঁহাকে দিয়া কোন 'নীচ কর্ম্ম' করাইতে অতীব শঙ্কিত হইয়া ঠাকুরকে কহিলেন,—একে আমাদের বাড়ীতে সামান্য চাকর রূপে রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইহার এইরূপ অলৌকিক ভাবদর্শনে আমি মহা কুণ্ঠিত ও ভীত হইলাম। এখানে ইহার দ্বারা যে সমস্ত 'নীচ কর্ম্ম' করান হয়, তাহা করাইতে আর আমার সাহস হইতেছে না। ইহাতে আপনি কি বলেন? ঠাকুর কহিলেন, 'নীচ-কর্ম্ম' করাইও না। তবে বাৎসল্য-ভাবে (অর্থাৎ নিজ পুত্র বোধে) যতটুকু পার করিয়ে নিও, তা'তে কোন দোষ হবে না। এরপর ও যদি তোমার কাছে থাক্‌তে ভাল না বাসে আর, ওকে রাখ্‌তে তোমাদেরও যদি দ্বিধা হয় (ভয় হয়), তা' হ'লে এখানে দিও। কেন না, ও যে 'এখানের'।—'ও শাপ ভ্রষ্ট।'

"রামদাদা লাটুমহারাজকে দিয়ে কোন কোন সময় বরফ, ছাঁচি পান, মিঠে তামাক, পান-মসলা ইত্যাদি ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া দিতেন। রামদাদার স্ত্রী সব জিনিস ঠিক্‌-ঠাক্‌ করিয়া দিতেন। লাটুমহারাজ মাঝে মাঝে একবেলার মত জিনিস দিতে আসিয়া হয়তো দুই তিন দিন থাকিয়া যাইতেন। আবার হয়তো চলিয়াও যাইতেন—বালকবৎ ভাব।

"লাটুমহারাজ (ঠাকুরের নিকট অবস্থান কালে) দিনে বা রাত্রে একটা সামান্য কম্বল অথবা মাতুরের উপর চিৎ হইয়া মোটা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতেন—ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারাণ্ডায়। অনেকেই

বলিত—এ ভয়ানক ঘুমঘোরে। একথা আমি প্রায়ই শুনিতাম। একদিন কয়েকজন দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের সাম্‌নে সেই চাদর আমি তুলিয়া লইয়া দেখিলাম—দু'চক্ষে অশ্রুধারা পতিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া আমার হৃদয় চমকিয়া উঠিল।—'করিলাম কি! এ কাজ তো ভাল করিলাম না! সহসা ইহাঁর ধ্যান-ভঙ্গ করিলাম। আমার মহা অপরাধ হইল'—এইরূপ মনে করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ব্বক পূর্ব্বে চাদরখানি যে ভাবে ছিল, সেইভাবে রাখিয়া দিলাম। কিন্তু আমি যে চাদর তুলিলাম, তাহাতেও তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইতে দেখিলাম না। উনি সমভাবে রহিলেন। পশ্চাৎ আন্দাজ দুই ঘণ্টা বাদে উঠিলেন। আহার্য্য বস্ত্র দেওয়া হইল।

"ঠাকুর এই গানটি প্রায়ই গাহিতেন,—

মনুয়ারে, সীতারাম ভজন করলিয়ো,
ভুখে অন্ন, পোয়াসে পাণি, লেঙ্গে বস্ত্র দিয়ো॥

—এই গানটি লাটুমহারাজ পছন্দ করিতেন ও আপন মনে যখন তখন গাহিতেন। সময় সময় আমিও গাহিতাম। আর লাটুমহারাজকে ঠাকুর বলিতেন—'আর ক'র্‌বি কি! এতে তোর সব হ'য়ে যাবে।'"

শ্রীযুক্ত লাটু রামবাবুর নিকট বেহারা রূপে নিযুক্ত হইবার প্রায় এক বৎসরকাল পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভে কৃতার্থ হন—এইরূপ পূজ্যপাদ শিবানন্দ মহারাজ বলেন।

অন্তর্দ্দৃষ্টি সম্পন্ন ঠাকুর তাঁহার জনৈক ভক্ত ভৃত্যবেশে উপস্থিত হইলেও শ্রীযুক্ত লাটুকে নিজ অন্তরঙ্গ বলিয়া চিনিয়াছিলেন—ইহা রামলাল দাদার কথায় জানিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত লাটুও * * এই অপরিচিতের প্রতি অন্তরে অন্তরে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের নিকট আসিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন এবং রামবাবু কিছু পাঠাইলে, তিনি সানন্দে তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পৌছাইয়া দিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতেন। (ক্রমশঃ)

—স্বামী সিদ্ধানন্দ।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের কয়েকটি ঘটনাবলী

বরাহ নগরের মঠ স্থাপন ও তাহার কিছু পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবুর বুদ্ধদেব-চরিত অভিনীত হয়। তৎপ্রণীত বিখ্যাত গীতটি,—

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই, সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায় আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর অধীর যেমতি সমীর
অবিরামগতি নিয়ত ধাই।
জানি না কেবা এসেছি কোথায়, কেন বা এসেছি কোথা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে, চারিদিকে রোল উঠে নানা রোল।
কত আসে যায় হাসে কাঁদে গায় এই আছে আর তখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল, কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি, যাই যাই কোথা কূল কি নাই॥
করহ চেতন কে আছে চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন,
কে আছ চেতন ঘুমাও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমোনাশ হও হে প্রকাশ, তোমা বিনে আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই॥

এই গানটি নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ের অন্তর হইতে গাইতেন এবং সঙ্গীত কালে যেন এক বৈরাগ্যের হিল্লোল চারিদিকে প্রবাহিত হইত। শ্রোতৃ-বর্গের মন যেন রাগ স্পন্দনের সহিত কোথায় উঠিয়া যাইত। নরেন্দ্র-নাথ যখন এই গানটি গাহিতেন, তখন যেন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট কি একটা ভাব উঠিত, লোক যেন মাতোয়ারা হইয়া উঠিত। শিবানন্দ মহাপুরুষের কণ্ঠ তখন বড় মধুর, বয়স অল্প, তিনিও ঐ গানটি নরম সুরে অতি মধুর

ভাবে গাহিতেন। সাধারণ লোকে সুখ ও আমোদের জন্য গাহিয়া থাকে, কিন্তু সাধক নিজের জীবনটা ভগবান লাভের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার অন্তর হইতে জলস্তরূপে আর এক ভাব উদয় হয় এবং শ্রোতৃবর্গের গাত্রে যেন সেই ভাবগুলা প্রলেপ লাগাইয়া দেয়।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে ;
উঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্য শূন্যে মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার॥

এই গানটি স্বামিজী এই সময় রচনা করেন। গরমীকাল, প্রাতে গিরিশবাবুর বাটীতে স্বামিজী গিয়াছিলেন এবং উপরকার ছাতের গরাদের কাছে ব'সে গুণগুণ করে গানটি গাইতেছেন। অতুলবাবু, গিরিশবাবুর ভাই, জিজ্ঞাসা কল্লেন, "হাঁ হে এ গানটা নূতন দেখছি যে, কার বাঁধা? মেজদাদার (গিরিশবাবুর) বাঁধা নয়ত?" নরেন্দ্রনাথ কোন কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অতুলবাবু বলিলেন, "ওহে ভাল ক'রে একবার গাও না"। শুনে মোহিত হইয়া অতুলবাবু বলিলেন "এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড় লোক—এই একটা গানের জন্য সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে"! নরেন্দ্রনাথ মুচকে মুচকে হাসিতে লাগিলেন এবং কিছুই বলিলেন না। অতুলবাবুর গানটা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সকলকেই কাহার রচিত গান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে শরৎ মহারাজ ইহা নরেন্দ্রনাথের রচিত বলিয়া দিলেন। অতুলবাবু নরেন্দ্রনাথের তীব্র মেধা শক্তিতে আগেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু এই গানটিতে নরেন্দ্রনাথের যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আছে ও উপলব্ধি হইয়াছে, ইহা তাঁহার ধারণা হইল। এই সময়টাতে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অন্তেবাসী ও সতীর্থবাসিগণের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেমের

এমন একটা উন্নত উন্মত্তভাব চলিতেছিল ও একটা জ্বলন্ত শক্তি উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, কি জপ ধ্যান, কি সাধনভজন, কি শাস্ত্রাদি পাঠ, কি ভজন সঙ্গীত, কি হাস্য কৌতুক সবই যেন দেব ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। সব যেন এক তপস্যা। এক ঈশ্বর উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মাত্র। এইরূপ জ্বলন্ত ভগবান উপলব্ধির প্রয়াস জগতে খুব কম সময় দৃষ্ট হইয়াছিল।

গিরিশবাবুর বুদ্ধদেব চরিত রাত্রে অভিনীত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ মাথা নেড়া, শুধু পা; রাত্রি জাগরণ ও অনবরত জপ ধ্যান করায় শরীর কৃশ, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল। গিরিশবাবুর উপরকার ঘরটিতে বারাণ্ডার দিকের উপর দ্বারের মধ্যে যে স্তম্ভটি আছে তাহাতে ঠেঁস দিয়া পা ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। হাতে একটা কাগজ নিয়া কি দেখিতেছেন। অভিনয়ে যিনি বুদ্ধদেব সাজিয়া ছিলেন, সম্ভবত বেলাবাবু, তিনি গিরিশবাবু ও নরেন্দ্রনাথের মাঝখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এই সময় গিরিশবাবুর পূর্ব্বপরিচিত একজন মুনসেফ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মুনসবটি বলিলেন, "হাঁা হে গিরিশ, বুদ্ধ নাকি নাস্তিক ছিল, ভগবান্ মানিত না। আমি ইংরাজি পুস্তকে এই সব পড়েছি" এই বলে তিনি তাঁর ইংরাজি বিদ্যার পরিচয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু একটু ব্যঙ্গ করিবার এবং মুনসবটিকে বিশেষ আক্কেল দিবার ইচ্ছায় বলিলেন (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) "ঐ যে উনি বসিয়া আছেন ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না" এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিলেন। তিনি গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও যুবকটি কে?" গিরিশবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—"একটা ভিখারি দুটি ভাতের জন্য এখানে বসে আছে" বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মুনসবটি ভিখারির সঙ্গে কথা কহিব, এটা হীনতা, এই জন্য গম্ভীর মাতব্বরি চালে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে বুদ্ধ নাকি নাস্তিক ছেলো?" নরেন্দ্রনাথ সব কথাই শুনিতে ছিলেন, কাগজখানা শুধু মুখটি আড়াল দিবার জন্য দুহাতে ধরিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পা দুটি ছড়াইয়া বসিয়াছিলেন। মুনসেব আসিলে পাটা

গুটাইয়া লন নাই ইহাতে মুনসেব একটু মনে মনে চটিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ চট্ করে উত্তর দিলেন (অভিনেতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) "ঐ যে বুদ্ধদেব ব'সে রয়েছে ওকে জিজ্ঞাসা করুন না?" কথাটা একটু ব্যঙ্গ কৌতুকের চ্ছলে বলিলেন। অভিনেতা নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ সম্মান করিতেন ও চিনিতেন। অভিনেতা ত্রস্ত্য হইয়া নরেন্দ্র নাথের প্রতি কর যোড় করিয়া বলিলেন—"আমি কিছু জানি না আমি মুখ্যু মানুষ আমি থিয়েটারে সাজি ভাঁড়ামো করি এই পর্য্যন্ত"। গিরিশবাবু একটু একটু মুচকে হাসচেন ও তামসা দেখচেন। মুনসবটি চটিয়া বলিলেন—"কি হে বল না বুদ্ধের বিষয় কি জানো?" নরেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ বুদ্ধ নাস্তিক ছিল, এটা নাকি, 'হায়রে মজা শনিবার' কাগজ লিখেছে"। সে সময় মাতালদের ভিতর একটা বোল উঠেছিল "হায়রে মজা শনিবার, বড় মজার রবিবার"। নরেন্দ্রনাথ সেই জন্য ঠাট্টা করিয়া ঐ কথা বলিলেন। মুনসব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চটিয়া উঠিয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন "কিহে—কি করো? কাজ কর্ম্ম কর না কেন?" ইত্যাদী মাতব্বরি কথা বলিতে লাগিলেন। "কেবল গিরিশের অন্ন ধ্বংস কর্ত্তে এসেছ, দেখছো সকলে হাসছে"। নরেন্দ্রনাথ পট করে জবাব দিলেন, "আমার প্রতি কেউ হাসছে না, তোমার দুর্গতি দেখে হাসছে তোমার ন্যাকামি বোকামি দেখে সকলে হাসছে"। মুনসব একটা ভেতো ভিখারী ছোঁড়ার কাছে এরূপ অপদস্থ হইতেছেন ও সকলে হাসিতেছে ইহা তাঁহার নিকট যেন বজ্রাঘাত হইল। চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া নরেন্দ্রনাথের প্রতি দেখিতে লাগিলেন এবং কি উত্তর করিবে তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। মুনসবকে শিক্ষা দেওয়াই গিরিশবাবুর উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বেশ রীতিমত হইয়াছে দেখিয়া গিরিশ বাবুর ভারি আহ্লাদ। তখন তিনি মুনসবকে বলিলেন "ওহে থামো থামো, ওঁর সঙ্গে অমন করো না, এক সময় ওঁর বিষয় পরে বলবো"। মুনসবও রেগে তর তর ক'রে চলে গেলেন।

একদিন প্রাতে বরাহনগরের মঠের বড় ঘরটীতে সকলে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্রনাথ একটী বাটীতে রুক্ষ চা লইয়া খাইতেছেন।

শিবানন্দ স্বামী বাটীতে চা লইয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন "সব রকমের তর্পণ হইয়াছে, চা দিয়া তর্পণ করতে হবে।" কারণ তিনি পূর্ব্বে বুদ্ধগয়া গিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন যে দার্জ্জিলিংএ ভূটিয়ারা চা দিয়া দেবতার পূজা অর্চ্চনাদি করে। শিবানন্দ মহারাজ আগ্রহ ও কৌতুক উভয় মিশ্রিত ভাবে চার বাটীতে হাত দিয়া তর্পণের মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। "অনেন চায়য়া" ; জনৈক বলিলেন, "না, অনয়া চায়য়া।" শিবানন্দ স্বামী বলিলেন "ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ।" তারপর নরেন্দ্রনাথ কথা তুলিলেন, নানা বিষয়ে শাস্ত্রের কথা উঠিল। একজন বলিলেন, "যে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঈশ্বর ব্রহ্ম কিছু মানেন না, তিনি বুঝেন জগতের কল্যাণ, বিদ্যাচর্চ্চা, ইহাই প্রধান" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, আরে সে কখন হ'তে পারে। আগে ব্রহ্ম না জানলে, কেউ কি জগৎ বুঝতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তা'হলে যে ভুল পথ ধরা হয়। আগে জগৎ তারপর ব্রহ্ম—একি হয়? আর দেখ অত বড় লোক, ওকি কখন ভুল করে? ও নিশ্চয় আগে ব্রহ্মর জ্ঞান বা আভাস পেয়েছে, তারপর জগৎ ও ধর্ম্ম বুঝেছে।" সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আবার বলিলেন—"ইউরোপে এখন সমাজ, দর্শন, জীবের উৎপত্তি এ সব নানা বিষয়ের তর্ক উঠাতেছে। মহাভারতে এ সব বিষয় বহুকাল আগে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া গিয়াছে। ইউরোপ এখন সেগুলো করছে, হিন্দুরা আগে তাহা অনেক বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়া গিয়াছে। আমি সব বইগুলো পড়ে দেখলাম। একশ বৎসর পরে কি হইবে, তাহা যেন আমার চোখের উপর ভাসছে যেন স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছি।" কথাগুলি এমন গম্ভীর ও নির্ভীক ভাবে বলিতে লাগিলেন যে সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল এবং কথাগুলি অলীক বা অহঙ্কার প্রসূত নয়, কিন্তু যথার্থই যেন দেখিতে পাইতেছেন, ইহা স্পষ্টই যেন বোধ হইতে লাগিল।

বাইবেলের কথা উঠিল। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"সাধারণ লোক, ভক্ত শ্রেণীর পক্ষে বাইবেলের ধর্ম্মটা বেশ। অল্পতেই মোটামুটি ধর্ম্মটা ও ভক্তির পথ বুঝতে পারে কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে ইহা

তত ফলদায়ক নয়। অনেক সময় বিভীষিকা ও বন্ধনের ভাব আনয়ন করে। বেদান্তই উচ্চ শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে ভাল।

একদিন নরেন্দ্রনাথ বলরাম বাবুর বাটীতে বড় ঘরটিতে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানা প্রথম ভাগ নিবিষ্ট হইয়া দেখিতেছেন। তিনি প্রথমভাগের উপক্রমণিকাটা একমনে পড়িতেছেন ও চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। মুখটি অতি গম্ভীর। বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এখন আবার প্রথম ভাগ পড়ছ নাকি?" নরেন্দ্রনাথ বিস্ফারিত নেত্রে বাবুরাম মহারাজের দিকে দৃষ্টি করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আগে প্রথম ভাগ পড়েছিলুম, এখন বিদ্যাসাগরকে পড়ছি।" বাবুরাম মহারাজ অপ্রতিভ হইয়া একটু দাঁড়াইয়া সরিয়া গেলেন। এই গল্পটি বাবুরাম মহারাজ বলিতেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

দেশের দুঃখ

বহুদিনের মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া দেখিলাম ভারতের পূর্ব্বাকাশে যেন ত্যাগসূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় কিরণমালা ছাইয়া পড়িয়াছে। এতদিন—এতযুগ যুগান্তর চলিয়া গেল—ভাবিয়াছিলাম এ মহানিদ্রা হইতে আর আমাদের উত্থান নাই!—ভাবিয়াছিলাম দেশটা বোধ হয় দুঃখ জঞ্জাল ছাড়িয়া আর বুঝি সুখের মুখ দেখিতে পাইল না! অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইলে দরিদ্র যেমন খাদ্য বস্তু না পাইয়া যন্ত্রনার হাত হইতে এড়াইবার জন্য এক মাত্র নিদ্রার আশ্রয় লয়, আমিও সেইরূপ দেশের ভাবী উন্নতি ও সুখ না দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম এ জীবনের মত একটা ঘুম দিব, আর যেন নয়ন মেলিয়া দেশের দুর্দ্দশা, খাইতে না পাইয়া দেশবাসীদের যে আর্ত্তনাদ ভারতজননীর যে নয়নাশ্রু তাহা

দেখিতে না হয়। নিজে শৃঙ্খলাবদ্ধ—কারানিক্ষিপ্ত ; ক্ষুধায় কাতর অপর ভ্রাতার যে আমার চেয়েও কত কষ্ট, তাদের স্ত্রীপুত্র পর্য্যন্ত না খেয়ে ম্রিয়মান—শুকায়ে প্রাণ-ত্যাগ করিল—অনশনে অচিকিৎসায় মরিয়া গেল। তাদের যে কেউ দেখিবার নাই, আপনার বলিতে তাদের কেউ পৃথিবীতে নাই। সে দৃশ্য যে কি ভীষণ, কি মর্ম্মান্তিক তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই। ভারতের মহিলাগণ এবার পুরুষদের চেয়েও অনেক কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিল। স্বামী আজ দারিদ্র্যের তাড়নায় গৃহত্যাগী, সহায়হীনা সম্পদবিহীনা স্ত্রী তার কঙ্কালসার ছেলে মেয়ে নিয়ে দরিদ্র ভারতের দুয়ারে দুয়ারে লাথি ঝাঁটা খেয়ে প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিতা হ'য়ে শুষ্ক মুখে ফিরিতেছে। কতদিন যায় পেটে অন্ন নাই, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া মাথায় আলুলায়িত রুক্ষ কেশ লইয়া, সঙ্গে অসংখ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত সন্তান লইয়া ভারতজননীর দরিদ্রমূর্ত্তি প্রত্যেক দ্বারে উপস্থিত। যখন তাকে কোন প্রশ্ন করিলে অতি ক্ষীণ স্বরেও কোন উত্তর দিতে পারে না, হস্তোত্তোলন করিয়া ইঙ্গিত করিবার শক্তিও যখন তার থাকে না তখন দৃশ্য দেখিলে—শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার সেই ওষ্ঠাগতপ্রাণ ম্লান ছবি দর্শন করিলে কার প্রাণে শান্তির লেশ থাকিতে পারে? আমি বীরজননীর—বীরসন্তানের বুকে হাত দিয়া সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে জীবনদায়িনী মাকে লাঞ্ছনায় বিতাড়িত করিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিলাসিনী স্ত্রীর কুহকিনী মায়ায় কোন্ হতশ্রদ্ধ পাষণ্ড ঘরে খিল দিয়া শান্তিতে থাকিতে পারে? কিন্তু কলিতে সত্যের অপলাপে বিপরীতই দাঁড়াইয়াছে। কুসন্তান আজ মাকে লাথি মারিয়া সোহাগিনী প্রণয়িনীকে মাথায় লইয়া নাচিতেছে, আর বিষয়ানন্দে বিভোর হইয়া ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু ভোগের জিনিস সেই বিষয় কি আজ আমাদের নিকট আছে? রসনার তৃপ্তির জন্য খাদ্য আমরা পাই কোথায়? অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়াই না আমরা শারীরিক ব্যাধি ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতেছি? যাউক্ সে কথা, জাতির দিক্ দিয়া আমাদের অবস্থা বিচার করিলে কতদূর অধঃপতন দেখা যায় যে আর বুঝি এ বিশাল জাতিটা উঠিতে পারিল না। মাতৃজাতির দিক দিয়াও

আমাদের কত অবনতি কত অপমান ! এসব সহ্য করিয়াও ভারতের প্রাণ প্রদীপটি নিবু নিবু জ্বলিতেছে।

আজও ভারতে সেই চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান্, আজও ভারতের নদী, নালা শুকায় নাই কিন্তু ভারতের প্রাণটি হঠাৎ শুকাইয়া গেল ! মৃত্যু সন্নিকট হইল। যখন দেশের অবস্থাটি ভাবি—লোকের সংসারের অবস্থাগুলি চিন্তা করি তখন বুঝিতে পারি ভারত কি সর্ব্বনাশের পথে আসিয়াছে। কাঙাল ভারতবাসী আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে কাঙ্গালের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে তাহারা একদিন যদি অসুস্থ হইয়া পড়িয়া থাকে তবে তাদের সংসার একেবারে নিশ্চল। খাইবার নাই, শুইবার নাই, পরিবার নাই, খাটিবার শক্তি পর্য্যন্তও তাদের নাই। শুদ্ধ মৃত্যু ব্যতীত ভবলীলা সাঙ্গ করিবার দ্বিতীয় উপায় আর তাদের নাই।

দেশের মধ্যে এত ডাকাডাকি পড়িয়া গেল—জীবনরক্ষার চিন্তা জাগিল কিন্তু কই রক্ষার উপায় ত কেহই ধারণ করিল না ! কত সহজ, সরল উপদেশ পাইল কিন্তু কেহই উহা কার্য্যে পরিণত করিতে রাজি হইল না। চরকা কাটিবার ক্ষমতা টুকুও যে নাই। ভিটায় জমি আছে কিন্তু একটু আলস্য ছাড়িয়া কয়েকটা কাপাস গাছও লাগাইতে কারও মতি হয় না। আমি কত গ্রাম ঘুরিয়া দেখিলাম কত জায়গা পড়িয়া আছে যেন শ্মশান-ভূমি ! লোকজন যেন একেবারে ছারেখারে গিয়াছে। কর্ম্ম বলিয়া যেন একটা কিছুই পল্লীর জীবনে নাই। শক্তির লেশও মনুষ্যজীবনে আর নাই। পল্লীগ্রাম যেন প্রাণহীন—সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে।

দেশে দরিদ্রতার অনুপাতে হিংসা, দ্বেষটাও অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। স্বার্থপর নৃশংস লোক সকল পল্লীবাসীর মৃতদেহ কামড়াইয়া ছিঁড়িতেছে, স্বার্থগৃধিনীসমূহ হাড় মাংস পর্য্যন্ত চিবাইয়া খাইতেছে। পল্লীর সুবিশাল দেহে আর এখন প্রাণের স্পন্দন নাই। স্বজাতীয় শিক্ষার অভাবে বিজাতীয় শিক্ষার প্ররোচনায় পল্লীসমাজের জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে। পল্লীর, বিশেষতঃ দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের জীবন আর সতেজ হইতেছে না। প্রাচীন

শিক্ষাশ্রমের সম্পূর্ণটা না হইলেও আমাদের নিজ নিজ স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশ সাধনের জন্য প্রতি পল্লীগ্রামেতে শিক্ষাভিলাষী লোকসমাজে নৈতিক আদর্শ লইয়া শিক্ষার প্রণালী ঠিক করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতকে মুখ্য শিক্ষাসাধন নির্দ্দেশ করিয়া, তদনুযায়ী বালক চরিত্র গঠন করিতে হইবে। স্থানে স্থানে কেন্দ্র করিয়া আশ্রম করিতে হইবে। বেশী দিন পর্য্যন্ত নয় প্রত্যেক বালককে ২০।২৫ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মচর্য্যের মুখ্য নীতিগুলি শিক্ষা দিয়া ভাবী জীবনের জন্য কর্ম্মে সুদক্ষ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তবে আর তাদের জন্য অনুশোচনা করিতে হইবে না। এজন্য স্বার্থত্যাগী কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত কতকগুলি উদ্যোগী কর্ম্মীর অসাধারণ প্রাণ পণ পরিশ্রম অবাশ্যক। প্রতি আশ্রম-কেন্দ্র হইতে বৎসরের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে ও তজ্জন্য দায়িত্ববোধে প্রত্যেককে খাটিতে হইবে। তাহা হইলে পল্লীর প্রতিকুটিরে পুনরায় কর্ম্মের প্রেরণা আসিবে। অকর্ম্মণ্যতা পরিহার করিয়া নিজ মেরুদণ্ডে ভর করিয়া পল্লীবাসিগণ আবার দাড়াইতে পারিবে। এইরূপে যদি কর্ম্ম-শক্তির সঞ্চার করিতে পারাযায় তবে দেশের উত্থানের সম্ভাবনা। তাঁত প্রতিষ্ঠা, চরকার প্রচলন প্রভৃতিদ্বারা গ্রামগুলিকে আবার জমকাইয়া সতেজ করিতে হইবে। যার যার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সেই সেই সাধন করিয়া কেন্দ্রীভূত আশ্রমে মিলিত হইয়া যুক্তি পরামর্শ করিতে হইবে। হিন্দুর ব্রহ্মণ্যশক্তিকে জাগ্রত হইতে দিলে দেশ প্রাণও জাগিয়া উঠিবে। এবং এ কথাটি সকলেরই সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যাঁহারা কর্ম্মী হইবেন তাঁহারা উচ্চ উচ্চ আদর্শ লইয়া কর্ম্মজীবন যাপন করিবেন। স্বার্থের গলদ যদি না থাকে তবে কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চয় হইবে।

দেশের প্রাণ যে পল্লী, তাহার অশিক্ষা দেখিয়া অনেক সময় যুবক হৃদয়ে নিরাশার নিরুৎসাহ আসিয়া বলবীর্য্য নিস্তেজ করিয়া দেয়। আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাবের কথা বলিতেছি না, পূর্ব্বে আমাদের কৃষককুলও আপনা বুঝ বুঝিয়া ক্ষেতে খাটিয়া মরিত কিন্তু সাহেব মাড়োয়ারীদের চক্রান্তে সরল প্রাণ কৃষকগণ ধান দিয়া খাটিয়াও পেটের ভাত যোগাইতে পারিতেছে না। পাটচাষের মোহে অর্থ লালসা

অদ্যাপি পরিত্যাগ করিতে পারিল না। হাজার টাকার পাট বেচিয়াও ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারিল না। আমি গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরিয়া দেখিলাম কোন কৃষকেরই ঋণ শোধের উপায় নাই—ঋণ লইয়া তাহারা জন্মিয়াছে ঋণ ভার কাঁধে করিয়াই তাহারা মরিবে। বংশ পরম্পরা ক্রমে ঋণদায় হইতে উদ্ধার নাই। এজন্যই ত মহাজনগণের নিষ্পেষণে দেশ শুদ্ধ লোক দমিয়া গেল। ঋণ জালে বদ্ধ হইয়া সকলেই পঙ্গু হইয়া বসিল। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ দেখা যায় না কেবল ভারতেই এই নির্য্যাতন কৌশল। অন্যত্র কৃষক কুল প্রবঞ্চিত হয় না কৃষকের প্রাণ কেহই কাড়িয়া লয় না। কারণ তাহারা জানে কৃষক সম্প্রদায়ই দেশোন্নতির গোড়া। তাদের দুঃখ দারিদ্র্যেই দেশ প্রপীড়িত। বিশেষতঃ তাহাদের নিকটই আমাদের প্রাণ। বৃক্ষের গোড়ায় অবয়ব স্থানে যদি অত্যাচার হয় তবে সে বৃক্ষ মহা প্রকাণ্ড হইলেও তার পত্রাদি শাখা উপশাখার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে দেশের মলিন অবস্থা আমাদের মন নিরাশ করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে কত কাপাস গাছ থাকিত, তুলার জন্য আর পরপ্রত্যাশা করিতে হইত না; চরকা যদিও সকলে কাটিবার অবসর পায় না তথাপি কয়েকটা কাপাস গাছ বুনিলেও তাহার দ্বারা অশেষ উপকার হইবে। ভারতে এখনও স্থান-দুর্ভিক্ষ হয় নাই যে কোথায় কাপাস গাছ বুনিব! ইচ্ছা থাকিলে সকলেই অনেক কাজ করিতে পারিবেন। একবার ভাবিয়া দেখুন! দেশের নেতারা আমাদেরই জন্য—অতি সহজ কাজ প্রচলনের জন্য অদ্ভুত স্বার্থে জলাঞ্জলী দিয়াছেন—প্রাণ জাগাইতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমাদের যে আর ভাবিবার শক্তিও নাই—মানসিক চিন্তা শক্তিও যে খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। এজন্যই স্বামিজী বিবেকানন্দ বাছিয়া বাছিয়া যুবক দল চাহিয়াছেন যাদের দ্বারা নবীন উৎসাহে ভারতের রক্ষা হইবে। তা ছাড়া বিপুল উদ্যমের আয়োজন চেষ্টায় অন্য পাত্র মিলিবে না। রুগ্ন দেহ, দুর্ব্বল মনের দ্বারা জগতের কোন হিতসাধন হইতে পারে না। বঙ্গীয় যুবকের অসাধারণ কর্ম্মনিষ্ঠাই দেশের ভরসা।

'হে বঙ্গ যুবক ! কর অবধান,
ভবিষ্য ভরসা তুমি জগতের ;
এই মোহ সাজে কি তোমারে ?
কভু সুখ-প্রলোভনে মোহিত অন্তরে,
কভু বা কলহ বশে কাল গোঁয়াইছ বসে
এ ভাব কি সাজে হে তোমারে ?
ভারতের সব গেছে— গেছে তন্ত্র, বেদ,
গিয়াছে বাল্মিকী ব্যাস,— কিবা আছে শেষ ?
জাগাও হৃদয় তন্ত্র, জপ 'স্বার্থ ত্যাগ মন্ত্র'
হও 'ঋষি' দ্রষ্টা মন্ত্র ত্যাজি ভেদাভেদ।
ক্ষুদ্র দৃষ্টি ভুলে গিয়ে, মাত সে ভূমারে ল'য়ে
ইন্দ্রিয় অতীত যেবা, নাহি যাহে ক্লেদ।
ভারতের প্রাণ ধর্ম্মের কৌটায়,
ধর্ম্ম নাশে ভারতের প্রাণ যায়,
ধর্ম্ম-উদ্দীপনে পুনঃ সমুদয়।
(তাই বলি)—উড়াও ত্যাগের ধ্বজা জগতের পাবে পুজা
ত্যাগ সর্ব্বসদ্‌গুণ আলয়।
ত্যাগেরে ত্যাজিলে হায় ! ত্যক্ত সমুদয়।
কোটি কোটি ভগ্নী ভ্রাতা মরে অনাহারে
কে আছ হৃদয়বান্‌ হও হও আগুয়ান্‌
একটি বোনের কিংবা ভ্রাতার উদ্ধারে।
এক অঙ্গ পুষ্টি হয় আর অঙ্গ পায় ক্ষয়
পুষ্টি নয়, ভিষকেরা রোগ তাকে কয়।
ধনিক যুবক কেহ শিক্ষিত বলিষ্ঠ দেহ,
পাশে তার ক্ষীণ ভ্রাতা পাশে তার শীর্ণা মাতা ;
রোগে, শোকে, ক্ষুধাবশে মরে দলে দলে।
আছে কি ঈশ্বর কেহ দয়ার শরীর
যার রাজ্যে এই সব হয় অনাচার ?

স্বাধীনতা আশে কেহ ঝরায় রুধির
স্বার্থপর করে কেহ— বিজয় হুঙ্কার !
হে বঙ্গ যুবক !
তোমার হৃদয়ে তাঁর মহিমা প্রকাশ
স্বার্থ ত্যাগ দয়া রূপে যাহার আভাস ।
হৃদয় মহান্ কর বৈরাগ্যের বেশ ধর
এস দলে দলে শীঘ্র ব'বে সুবাতাস
সুচিবেক জননীর দীর্ঘ হা-হুতাশ ।
যাও ভুলে, দাও অন্ন
পিয়াসীরে দাও জল,
বিদ্যাহীনে দাও বিদ্যা, জ্ঞান হীনে জ্ঞান,
দেখাও চরিত্র বল জিনিবে পাশব বল,
ধর্ম্ম তেজে জিনিবে হে বিজয়ীর দলে
রহিবে অক্ষয় যশ তব ধরাতলে ।
ধর্ম্মের বিস্তার কর শুভাশীষ সনে
সকলে অভয় দাও হিংসারে বিদায় দাও
আর যাহা প্রয়োজন আসিবে আপনি
হাসিলে পুলকে পুনঃ হাসিবে জননী ।
তাই বলি হে বঙ্গ যুবক ! উঠ নব অনুরাগে,
দেশের ভরসা তুমি, দরিদ্র সম্বল
দেখাও দেখাও তব ত্যাগ মন্ত্র বল
যেন পুনঃ এ ভারত জাগে ।
জাগিলে ভারত জগৎ হাসিবে
ভারতের আলো গগন ছাইবে ॥

ত্যাগ মন্ত্রের উদ্বোধনে 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধিত' বলিয়া নবজাগরণে সন্ন্যাসীর মঙ্গল গীতি গাহিতে হইবে—

উঠাও সন্ন্যাসী উঠাও সে তান
হিমাদ্রি শিখরে উঠিল যে গান,

গভীর অরণ্যে পর্ব্বত প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে
যে সঙ্গীত ধ্বনি প্রশান্ত লহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি ;
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশ আশ,
যাইতে না পারে কভু যার পাশ
যথা সত্য জ্ঞান আনন্দ ত্রিবেণী
সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি ;
উঠাও সন্ন্যাসী উঠাও সে তান
গাও গাও গাও গাও সেই গান।
ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ! ! !

শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গোস্বামী

ধনি-দরিদ্র-সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সকলের কল্যাণেই একের কল্যাণ কিন্তু একের কল্যাণে সকলের কল্যাণ হয় না, অতএব সেই একেরও প্রকৃত কল্যাণ হয় না। ভূমার যাহাতে কল্যাণ হয় না, অল্পের তাহাতে কল্যাণ হওয়ার আশা করা বৃথা। "মুক্তাধারার" স্রোত রুদ্ধ করিয়া দিলে উত্তরকূটবাসীদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু শিবতরাইয়ের প্রজাদের আবার অসুবিধা করিয়া দেওয়া হয় ততোধিক। সুতরাং ভূমার মোটের উপর উহাতে কোনও, লাভই হয় না। তাই কি উত্তরকূটবাসী, কি শিবতরাইয়ের প্রজা, কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। ফলতঃ, কি করিলে ভূমার কল্যাণ হয়, তাহা বুঝা মনুষ্যের অসাধ্য। বিশেষতঃ, দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে যাহা কল্যাণ, দেশ-কাল-পাত্রভেদে তাহাই আবার অকল্যাণ হইয়া দাঁড়ায়।

তন্ত্রধর্ম্ম * স্ত্রী পুরুষের মাতৃত্বের ও পিতৃত্বের মহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। উহাতে, সমাজের কল্যাণ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পরিণামে যে অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহারই প্রতিকার করিবার জন্য বৈষ্ণবধর্ম্মকে আবার স্ত্রী পুরুষের রমণীত্ব ও পুরুষত্বের মহিমাই উজ্জ্বল ভাবে বর্ণনা করিতে হইয়াছিল। † শাঙ্কর ধর্ম্মে সন্ন্যাসীর

* আজ পর্য্যন্ত জগতে যত ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ সকলের দ্বারা লোকসমাজের যতই কল্যাণ হউক, অকল্যাণও বড় অল্প হয় নাই। এক ভারতবর্ষেই ধর্ম্মের নামে কত যে রক্তপাত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আচার্য্য শঙ্করের উক্তি তাই, "ন মে ধর্ম্মো ন চ পাপ পুণ্যে।" ফ্র্যান্সের বর্ত্তমান মহামানব রোঁমাঁ রোঁলার ও এই মত। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম তাই সার্ব্বজনীন—সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডিতে সংবদ্ধ নহে। ইহা শুধু realisation এরই বিষয়। যত লোক তত মত—এ ধর্ম্ম মূলতঃ তাই ব্যষ্টি প্রধান। মুসলমানের মসজিদ আছে, খৃষ্টানের গির্জ্জা আছে, হিন্দুর তাই তদনুরূপ কিছুই নাই। এই জন্যই, রোঁলা তাঁহার আদর্শের কতক সন্ধান পাইয়াছেন—এই হতভাগ্য ভারতবাসীরদের মধ্যেই।

† এক এক সময়ে সমাজে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। সুতরাং তখন স্ত্রী পুরুষের পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বকেই বড় করিয়া দেখা হয়, কেন না সমাজের প্রয়োজন তখন সন্তানের। স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্য ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হউক, সমাজের তাহাতে তখন আপত্তি হয় না, যেমন করিয়াই হউক সন্তান হইলেই সমাজ তখন সুখী হয়। এই জন্যই হররমা গণেশ জননীই হয় তখন সমাজের আদর্শ। তন্ত্রধর্ম্মের প্রচারের বিষয় ছিল ইহাই। ইহাতে আর কিছু না হউক, সন্তানের কিন্তু কল্যাণ হয়।

কালক্রমে, এইপ্রকার ব্যবস্থার ফলে দাম্পত্য বন্ধন যখন শিথিল হইয়া যায়, তাহারই ফলে নরনারীর মিলন যখন দুঃখেরই হেতু হইয়া দাঁড়ায়, স্ত্রী পুরুষের পুরুষত্ব ও রমণীত্বকেই তখন বড় করিয়া দেখা হয়। সন্তানের দিকে সমাজের আর তখন দৃষ্টি দিবার অবসর হয় না তাহার একমাত্র লক্ষ্য হয় তখন, যাহাতে স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্য ধর্ম্মের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। এইজন্যই "বৃন্দাবনের নিত্য যুগলকিশোর" হয় তখন সমাজের আদর্শ। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারের বিষয় ছিল ইহাই। এই ব্যবস্থার ফলে আর কিছু না হউক, দম্পত্তির কিন্তু সুখ হয়।

মাহাত্ম্য শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহারই ফলে সংসারীদের আত্ম-প্রত্যয় নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, সমাজে যখন বিবিধ বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হইয়াছিল তখন শ্রীচৈতন্যদেবকে আবার বৃন্দাবন লীলার রূপক ছলে সংসারীর শ্রেষ্ঠত্বই প্রচারিত করিতে হইয়াছিল। ইতালি দরিদ্রের উপকার করিতে গিয়াছিল, তাহারই ফলে আজ আবার উঠিতেছে মধ্যবিত্তের হাহাকার ধ্বনি। পূর্ব্বতন শ্রমজীবী আন্দোলনের স্থান তাই আজ নবজাগ্রত ফ্যাসিষ্টি আন্দোলনকর্তৃক অধিকৃত। সুতরাং ইতালি দরিদ্রের উপকার করিতে সমর্থ হয় নাই। পূর্ব্বে তাহার বিবাদ চলিয়াছিল ধনীর সঙ্গে, এক্ষণে চলিতেছে মধ্যবিত্তের সঙ্গে। অতএব, সকলেই যে তিমিরে, সেই তিমিরে। এই যে একদিকে গড়িতে গেলে অন্যদিকে ভাঙ্গিয়া যায়, একস্থানে সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইলে অন্য স্থানের মৃত্তিকা বিধ্বস্ত করিতে হয়, উপকার করিতে গেলেই অপকার আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে, ইহার প্রতীকার নাই। * ভ্রমের দ্বারা ভ্রম সংশোধনের এই যে চেষ্টা, ইহা কদাপি ফলবতী হয় না। ইহাতে ভ্রমের সংখ্যাই শুধু বাড়িয়া যায়। এক ছায়া যেমন চঞ্চল জল তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত হইয়া সহস্রছায়া উৎপন্ন করে, সেইরূপ এক মিথ্যা হইতে সহস্র মিথ্যার উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, এই উপায়ে, দরিদ্রের যথার্থ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে হয় শুধু—ধনী যে অত্যাচারী, প্রকারান্তরে এই কথাই দরিদ্রের মনে পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হয়। ফলে, ধনী দরিদ্রের বিরোধ দ্বিগুণ হইয়া যায়। অতএব, কেবল যে ধনী এবং দরিদ্রই ভ্রান্ত, তাহা নহে, হিতৈষীও ভ্রান্ত; বরং সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভ্রান্ত। † কাহারই ভূমা দৃষ্টি নাই, কেহই নিষ্কিঞ্চণ

---

* ভাঙ্গা গড়া লইয়াই সৃষ্টি, গচ্ছতীতিজগৎ, সৃষ্টি ও জগৎ তাই, শঙ্কর মতে, অনিত্য।

† কেন না, ধনী এবং দরিদ্র উভয়েই চাহে নিজের নিজের ভাল। কিন্তু হিতৈষী চাহে উহাদের উভয়েরই ভাল। সুতরাং তাহারই বাসনা অধিক। নৈষ্কিঞ্চণ্যই যদি মানবের আদর্শ হয়, তবে, বাসনা যাহার যত অধিক সেই তত অধিক ভ্রান্ত, জ্ঞানীদের ইহাই অভিপ্রায়।

নহে, সকলেই অপূর্ণ। "রাম মূর্খ, সীতা মূর্খ, ততোধিক মূর্খ পবন-নন্দন"—তাই কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যে অর্থভোগের জন্য ধনী ও দরিদ্র উভয়েই লালায়িত, তাহাদের সেই ভোগ সুখও লাভ হয় না। আবার, হিতৈষীর দরিদ্রের হিত-সাধন করিবার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাও সফল হয় না। ফলতঃ, ক্ষুদ্রকে আশ্রয় করিয়া, ক্ষুদ্র সার্থক হয় না, হইতে পারে ভূমাকে আশ্রয় করিয়া। হিতৈষী কিন্তু স্বয়ংই ক্ষুদ্র মানব, সুতরাং তাহার সাধ্য নাই, সে ভূমার, অতএব দরিদ্রেরও, উপকার করিতে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ, একটি ক্ষুদ্র কৃমিকীটেরও যথার্থ উপকার করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। অথবা, মানব স্বয়ংই ভূমা, সুতরাং তাহার অন্য কাহারও উপকার করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, সে যদি শুধু নিজেই কল্যাণ করে, তবে তাহাতে সকলেরই, (যেহেতু সে স্বয়ংই ভূমা) অতএব দরিদ্রেরও, কল্যাণ হয়। অতএব, কাহারও কল্যাণ করিতে যাওয়া নিরর্থক, দুই দিক দিয়াই,—একদিক দিয়া,—যেহেতু ক্ষুদ্র মানবের তাহা করিবার সামর্থ্য নাই, অন্য দিক দিয়া,—যেহেতু তাহা করিবার তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে যদি ভ্রান্তি বশতঃ একথা না বুঝিয়া ইতালির ন্যায় দরিদ্রেরই উপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলিতে হয়, "Oil your own machine!" দরিদ্রের যথার্থ ভাল যদি করিতে হয়, তবে, দরিদ্রের ভাল করিতে হইবে, এই কথাই ভুলিয়া যাইতে হইবে। "নিজে ভাল হও", ইহাই অন্যের ভাল করিবার প্রকৃত উপায়। আর, ইহাতেও যদি সে নিবৃত্ত না হয়, তবে "Oh God! Save us from our friends." *

* প্রতীচ্য জগতের প্রত্যেক নেতারই এই সকল কথা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মহামতি মিল্‌ও এই জন্যই বলেন, দার্শনিকেরাই জগতের পরিচালক হইবার যথার্থ যোগ্যপাত্র। প্রাচীন ভারতেও রাজাদের স্বর্ণসিংহাসন তাই ঋষিদের সামান্য কুশাসনের নিম্নে অবস্থিত ছিল। যাঁহারা প্রায়শঃ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহাদের কার্য্যের ভুল চুক বুঝিবার তাদৃশ সামর্থ্য থাকে না। উহা বুঝিবার জন্য তাই একদল

অতএব ধনি-দরিদ্র সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, যাহাতে ধন-বৈষম্য উপস্থিত হইতে না পারে, তাহারই দিকে লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। প্রতীচ্য জগৎ, এই জন্যই, Commonwealth প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। তাঁহাদের চেষ্টা তাই এমন সকল আইনের প্রবর্ত্তন করা, যাহাতে সমাজের সকলেই ধনের সমান ভাগী হইতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ধনবৈষম্য নিবারণের ইহা প্রশস্ত উপায় নহে। কেন না, সমাজের যাবতীয় ধনসম্পত্তি যদি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া দেওয়াও সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও, মানবের বুদ্ধির অনৈক্যবশতঃ সে প্রকার ব্যবস্থা বহুদিন অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং ধন-বৈষম্যের মূল কারণ, ধন নহে, মানবের মনোবৈষম্য। ধন বাহ্য বিষয় মাত্র। এই মনোবৈষম্য যদি ঘুচিয়া যায়, ধন-বৈষম্যও তাহা হইলে দূর হইয়া যায়। * * * ধনী দরিদ্র ও হিতৈষী, সকলেই বৈষম্য-ব্যাধিগ্রস্ত। সকলেরই একই ব্যাধি—মনোবৈষম্য। সকলেই ব্যাধিগ্রস্ত, সুতরাং কাহারও অন্যের চিকিৎসাভার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা নাই। সকলেরই কর্ত্তব্য তাই নিজ নিজ ব্যাধির চিকিৎসা করা এবং ইহাতেই জগতের যথার্থ উপকার করা হয়। কারণ, নিজ ব্যাধি নির্ম্মূল না করিলে, উহা সংক্রামিত হইয়া অন্য সকলেরও অনিষ্ট সাধন করে। অতএব, নিজ নিজ ব্যাধির চিকিৎসা করাই জগতের যথার্থ উপকার করা। আবার, সকলেরই যখন একই ব্যাধি—মনোবৈষম্য, তখন সকলেরই তাই একই ব্যবস্থা,—"নিষ্কিঞ্চন হও"—সকলেরই অভ্যন্তরীন চিকিৎসা। মানব স্বভাবতঃ পূর্ণ, নিষ্কিঞ্চন। স্বরাট্ সে। ভূমা সে। কিন্তু মোহবশতঃ সে আত্মস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া আপনাকে অভাবগ্রস্ত বলিয়া কল্পনা করে। এইরূপে তাহার প্রয়োজন বোধ উৎপন্ন হয় এবং তাহার ব্যাধির কারণও ইহাই। পক্ষান্তরে, এই প্রয়োজন বোধের আবার 'মা বাপ' নাই। কাহারও

চিন্তাশীল লোকোর প্রয়োজন। এই হেতু, প্রাচীন যুগে রাজারা কর্ম্ম করিতেন এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষিরা সাবধানে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করত উহার গতি কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতেন।

প্রয়োজন শাকান্নের—কাহারও আবার ভূরি ভোজন না হইলে তৃপ্তি হয় না। সুতরাং যে যত অল্পে তৃপ্ত হইতে পারে, সে তত সার্থক। সকলেরই কর্ত্তব্য তাই প্রয়োজন বোধের অতীত হওয়া—নিষ্কিঞ্চন হওয়া—ইহারই নাম নিজে ভাল হওয়া—যেমন ভাল হইলে পরেরও ভাল করা হয়। * এবং ইহাই ধনি-দরিদ্র সমস্যা নিবারণের যথার্থ উপায়। * * * মানব ধনের জন্য যতই লালায়িত হউক, ধনের বস্তুতঃ কিন্তু কোনও মূল্য নাই। লোষ্ট্র ও কাঞ্চন দুইই তুল্য। শুধু লোষ্ট্রের উপর প্রয়োজনের ছাপ আঁকিয়া লোষ্ট্রকেই কাঞ্চনে পরিণত করা হয়, এইমাত্র এবং এইমাত্রই ধনের যাহা কিছু সার্থকতা। ফলতঃ এই প্রকার প্রয়োজন বোধ হইতেই ধনী ও নির্ধন ইত্যাকার বৈষম্যের উৎপত্তি। যিনি নিষ্কিঞ্চন, তাঁহার নিকটে লোষ্ট্র ও কাঞ্চনের তুল্য মূল্য। অতএব, নিজের মধ্যে এই প্রকার প্রয়োজন বোধ যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য এবং ইহাতেই সমাজের যথার্থ উপকার হয়। * * * আকর্ষণী ও বিপ্রকর্ষণী শক্তির সাম্যভাবই স্থিতির ভাব—মানব দেবাসুরের মিলনভূমি। তাহার স্থিতি এই দুই শক্তির সাম্যভাবেরই ফল। যতক্ষণ এই দুই শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, ততক্ষণই সে বর্ত্তিয়া থাকে। কিন্তু ইহারই অন্যথায় তাহার ধ্বংস হয়—সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে সে বিক্ষুব্ধ হয়। সুতরাং মানবের মধ্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ত্যাগ ও ভোগ, দৈবী ও আসুরী অর্থাৎ আকর্ষণী ও বিপ্রকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান, উহার সমতা যদি রক্ষিত হয়, তাহা হইলে আর তাহার ধনেরও প্রয়োজন হয় না,

* জ্ঞানীরা নিষ্কিঞ্চন। তাঁহাদের তাই ভাল মন্দ বলিয়া কিছুই নাই। নিজের ভালই হউক, আর পরের ভালই হউক, তাঁহাদের তাই করণীয় কিছুই নাই। তাঁহাদের ভাল করা বা হওয়ার একমাত্র অর্থ ই নিষ্কিঞ্চন হওয়া এবং এই জন্যই তাঁহারা কর্ম্মত্যাগী। চরম অবস্থায় জ্ঞানীর "কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্"এই প্রকার দিব্যভাব লাভ হয়। জ্ঞানীরা কেন নৈষ্কিঞ্চন্যবাদী তাহা প্রবন্ধমধ্যে বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং ধনী, দরিদ্রেরও আর সৃষ্টি হয় না। কিন্তু প্রবৃত্তির আধিক্য বশতঃ যখন সে বিক্ষুব্ধ হয়, তখনই সে ধনসঞ্চয়ে মনোযোগী হয়। ধন তাহার ভোগের উপকরণ বলিয়াই উহার সঞ্চয়ে তাহার মতি হয়। সে বিক্ষুব্ধ হয়, তাহাতে বৈষম্য উপস্থিত হয়, এ কথার অর্থ এই যে, তাহার অল্লাধিক ধ্বংস হইয়া যায়। বস্তুতঃও, ধন অর্জ্জন ও তাহা রক্ষা করিবার জন্য তাহার শক্তি যে কতদূর ব্যয়িত হয়, একথা যদি সে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে আর তাহার ঐ প্রকার ধন-সঞ্চয়ে মতি হয় না। আবার, একস্থানের বায়ু বিক্ষুব্ধ হইলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলই যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ একজনের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হইলে উহারই ফলে সমগ্র সমাজেই বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বৈষম্য বশতঃ একজন ধন-সঞ্চয় করে, তাহারই অনুসরণে আবার সহস্র ধন লিপসুর উদয় হয়। অতএব, দরিদ্রের মধ্যেও যে ধন লিপ্সা সুপ্ত থাকে, উহারই ফলে সেই ঘুমন্ত বাঘও তখন জাগিয়া উঠে। এইরূপে, ব্যাপার ক্রমশঃই গুরু হইতে গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। কোন্ এক অশুভ মুহূর্ত্তে সামান্য এক ইউরোপীয় বণিক ভারতের এই প্রাচুর্য্যের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, আজিকার এই মহান্ অনর্থ তাহার সেই এক মুহূর্ত্তের সামান্য বিক্ষোভেরই ফল! সামান্য সর্ষপ প্রমাণ একটি বীজ হইতে এই বিশাল অশ্বত্থের উৎপত্তি। *

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে সম্রাজ্ঞী যখন ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মিল তখন, এই জন্যই, উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রাম না জন্মিবার পূর্ব্বেই দেবর্ষি নারদ যেমন বৈকুণ্ঠে রামলীলা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মিলও, সেইরূপ তাঁহার গভীর দূরদৃষ্টিবলে ইংলণ্ড ও ভারতের এই কুঠার রাজ্য নির্ম্মিত হইবার বহুপূর্ব্বেই, ইংলণ্ডের সেই বৈকুণ্ঠ রাজ্যে বসিয়াই, বর্ত্তমান যুগের এই ভাবী সমস্যার কথা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধন্য এই মহাপুরুষেরা যাঁহারা জগতের ভূত ভবিষ্যৎ নখদর্পণবৎ দেখিতে সমর্থ হন,—বাল্মীকির ন্যায় রাম না জন্মিতেই, তাই, রামায়ণ লিখিয়া রাখিয়া যান।

এই মহান্ অনর্থ দূর করিতে হইলে, ভারতীয় ও ইংরাজ উভয়েরই সাম্যভাব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ভারতবাসীর মতে আজ তাহার

এই জন্যই পূর্ণজ্ঞানী সাধুদের মতে নিজের সাম্যভাব রক্ষা করিয়া চলাই সমাজের যথার্থ উপকার করা। নিজের সাম্যভাব রক্ষা করিয়া চলার অর্থই নিজে বর্ত্তিয়া থাকা এবং তদ্দ্বারা অন্য সকলকেও বর্ত্তাইয়া (বাঁচাইয়া) রাখা। নিজে বিক্ষুব্ধ হইও না এবং তদ্দ্বারা অন্য সকলকেও বিক্ষুব্ধ করিও না। পূর্ণজ্ঞানীদের ইহাই আদর্শ। এই হেতুই ভারতীয় সাধুদের মতে নির্জ্জন কাননে কন্দরে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাস জীবন যাপন করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি সমাজে বাস করিয়া আপনার অপূর্ণতার দ্বারা অপর সকলকেও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বপ্রকারে নিষ্কিঞ্চন হও,—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র উপদেশ—নির্ব্বাণে গিয়া পৌঁছাও, সেখানে গেলে মানবের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়া যায়। নির্ব্বাণে মানবের মুক্তি হয়। সে নিজেই তখন জগৎ হইতে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, সুতরাং তাহার স্থান তখন অন্যে প্রাপ্ত হয়। মানবের ইহা অপেক্ষা অধিক উপকার করিবার সম্ভাবনা আর কিছুতেই নাই। সুতরাং দরিদ্রের যথার্থ উপকার যদি করিতে হয়, তবে "দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়" এই নীতির দ্বারা তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, হইতে পারে তাহা "মা কস্যস্বিৎ ধনং", এই নীতির দ্বারা—যে নীতি ধনী দরিদ্র সকলেরই সম্বন্ধে তুল্য সত্য। "দরিদ্রান ভর" এই নীতির অনুসরণ করাও যাহা ধন বৈষম্যের সমর্থন করাও তাহাই। অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, কুবেরের ঐশ্বর্য্য আনিয়া দাও, কিছুতেই মানবের তৃপ্তি হয় না। ইংরাজকবি এইজন্যই বলিয়াছেন :—

স্বরাজ্যের প্রয়োজন। ইংরাজের মতে উহা কিন্তু তাহার নিষ্প্রয়োজন। উভয়েরই স্বার্থ দৃষ্টি। তাই এই অনর্থের প্রাবল্য। অন্যথা ইংরাজ যদি এরূপভাবে চলেন, যাহাতে ভারতবাসীর মনে স্বরাজ্যের প্রয়োজন বোধ উৎপন্ন না হয়, পক্ষান্তরে, ভারতবাসীও যদি এমনভাবে চলেন, যাহাতে ইংরাজেরও স্বার্থের হানি না হয়, তাহা হইলে সকল গোলযোগই মিটিয়া যায়। সুতরাং প্রতীচ্য রাষ্ট্রবিদ্‌গণ যাহাকে স্বারাজ্য বলেন, সেই প্রকার স্বারাজ্য—কি ভারতীয়, কি ইংরেজ—কাহারই বাঞ্ছনীয় নহে। উভয়েরই বাঞ্ছনীয় প্রেমের রাজ্য—যে রাজ্যে ইংরাজ ও ভারতীয়ের তুল্য অধিকার যে রাজ্যে অধিকার অনধিকারের কথামাত্রও উত্থাপিত হইবার অবসর নাই।

I gave him a piece of bread, he come again.

I gave him a thought he never came again.

অতএব বস্তুগতপ্রাণ মানবকে কিছু দিতে হইলে, দিতে হয় ভাব। কেন না, ভাবের অনন্ত ভাণ্ডার, সে ভাণ্ডার কখনও ফুরায় না।

ফলতঃ ধনী-দরিদ্র সমস্যার মূলে রহিয়াছে তিনজন,—ধনী, দরিদ্র এবং হিতৈষী। সুতরাং তিনজনেরই কর্ত্তব্য, নিষ্কিঞ্চন হওয়া—ভূমার স্বরূপ উপলব্ধি করা। ইহাই ধনিদরিদ্র সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়।

—শ্রীসাহাজী

কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বৈশেষিক দর্শন

বৈশেষিক মতে পদার্থ ছয়টী—

(১) দ্রব্য (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায়। আর অভাব সপ্তম পদার্থ।

(১) দ্রব্য পদার্থ। গুণের আশ্রয় দ্রব্য, যাহাতে গুণ আছে, তাহা দ্রব্য। দ্রব্য নানাপ্রকার—(ক) ক্ষিতি; (খ) অপ্, (গ) তেজ, (ঘ) বায়ু, (ঙ) আকাশ, (চ) কাল (ছ) দিক্, (জ) আত্মা, (ঝ) মন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, পরমাণুরূপে নিত্য, আর অবয়ব অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয় বিষয়রূপে অনিত্য। আত্মা অমূর্ত্ত, আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়। মন অণু। মন সুখদুঃখের আশ্রয়। আত্মা দ্রব্য পদার্থ, কারণ আত্মার গুণ আছে। আত্মার গুণ জ্ঞান।

(২) গুণ পদার্থ। গুণ চব্বিশটী—(ক) রূপ যেমন শুক্ল, নীল, পীত, (খ) রস যেমন মধুর অম্ল তিক্ত, (গ) গন্ধ সুগন্ধ দুর্গন্ধ, (ঘ) স্পর্শ উষ্ণ, শীত, (ঙ) সংখ্যা এক হইতে পরার্দ্ধ, (চ) সংযোগ, (ছ) বিভাগ, (জ) পরত্ব-জ্যেষ্ঠ, (ঝ) অপরত্ব-কণিষ্ঠ, (ঞ) বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান, (ট) সুখ, (ঠ)

দুঃখ, (ড) ইচ্ছা, (ঢ) দ্বেষ, (ণ) যত্ন, (ত) গুরুত্ব পতনহেতু; (থ) দ্রবত্ব, যেমন জলের,, (দ) স্নেহ যেমন তৈলের, (ধ) সংস্কার স্মরণের কারণ, (ন) অদৃষ্ট—সুখ দুঃখের হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম, (প) শব্দ—ধ্বনি ও বর্ণ। (ব) পৃথকত্ব যেমন ঘট পট, (ভ) পরিমাণ যেমন অনু মহৎ হ্রস্ব দীর্ঘ।

(৩) কর্ম্ম পঞ্চবিধ (ক) উৎ (উর্দ্ধ) ক্ষেপণ, (খ) অব (অধঃ) ক্ষেপণ (গ) আকুঞ্চন, (যেমন মুষ্টি), (ঘ) প্রসারণ, (ঙ) গমন।

(৪) সামান্য অর্থাৎ জাতি। জাতি দ্বিবিধ পরা অপরা। অধিক-দেশ-বৃত্তিত্ব—পরা, অল্প-দেশ-বৃত্তিত্ব—অপরা।

(৫) বিশেষ অর্থাৎ ব্যক্তি। বৈশেষিক মতে এক পরমাণু হইতে অপর পরমাণুর পার্থক্য যাহা দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহার নাম বিশেষ, যেমন বায়ু পরমাণু ও পৃথ্বী পরমাণু অথবা মুদ্গ পরমাণু ও মাস পরমাণু।

(৬) সমবায় নিত্যসম্বন্ধ যেমন দ্রব্যের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ। দ্রব্য হলেই তাতে গুণ ও ক্রিয়া থাকিবেই।

(৭) অভাব। অভাধ দ্বিবিধ (ক) সংসর্গাভাব অর্থাৎ সম্বন্ধাভাব ত্রিবিধ (১) প্রাগভাব, মৃৎপিণ্ডে ঘটের অভাব, (২) ধ্বংসাভাব মুদ্গর দ্বারা ঘটের ধ্বংস, (৩) অত্যন্তাভাব, বায়ুতে রূপ নাই। (খ) অন্যোন্যা-ভাব ঘটে পটে ভেদ।

কণাদমতে এই পদার্থগুলির ঠিক ঠিক জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইবে।

ন্যায় দর্শন

গৌতমের মতে পদার্থ ষোলটী—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহ স্থান।

(১) প্রমাণ—ন্যায়মতে প্রমাণ চারিপ্রকার—

(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান ও (৪) শব্দ।

(১) প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রতি অক্ষ। 'প্রতি' অর্থাৎ রূপাদি বিষয়; অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। রূপাদিবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি। বৃত্তি অর্থাৎ সন্নিকর্ষ

বা সম্বন্ধ। রূপাদিবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষহেতু যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

ন্যায়সূত্রে আছে—

ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি-ব্যবসায়াত্মক-প্রত্যক্ষম্ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান, যেটি অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারি ও ব্যবসায়াত্মক, সেইটি প্রত্যক্ষ।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান

ইন্দ্রিয় ও অর্থ অর্থাৎ বিষয় উভয়ের সন্নিকর্ষ, উভয়ের সংযোগহেতু যে জ্ঞান হয়, এই জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার—(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত সমবায়, (৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেত-সমবায় ও (৬) বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব।

(১) সংযোগ—ঘট ও চক্ষুর সন্নিকর্ষ, ইহা দ্বারা ঘটদ্রব্যের জ্ঞান জন্মায়।

(২) সংযুক্ত সমবায়—ঘটের বর্ণ শুক্ল। শুক্লের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ।

(৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়—শুক্ল গুণের শুক্লত্ব আছে, সেই শুক্লত্ব জাতির সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হয়।

(৪) সমবায়—শব্দ আকাশের গুণ। অতএব শব্দ আকাশ সমবেত। কর্ণপ্রদেশাবচ্ছিন্ন আকাশ শ্রোত্র। শ্রোত্রের সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ।

(৫) সমবেত সমবায়—শব্দত্ব অর্থাৎ ককারত্ব গকারত্ব প্রভৃতি জাতির সহিত সন্নিকর্ষ।

(৬) বিশেষণ—বিশেষ্য ভাব—ইহা দ্বারা সমবায় ও অভাবের জ্ঞান হয়। সমবায় স্বাশ্রিতের সর্ব্বাবয়বভুক্ত। আকাশের সহিত শব্দের বা পুষ্পের সহিত গন্ধের সম্বন্ধকে সমবায় বলে। পুষ্প দৃষ্ট হইলে ও গন্ধ আঘ্রাত হইলে উহাদের সম্বন্ধ বিশেষণ হয়। সে জন্য পুষ্প ও গন্ধের সন্নিকর্ষের সঙ্গে উক্ত সম্বন্ধেরও সন্নিকর্ষ হয়। অভাব ও বিশেষণ

বিশেষ্যভাবে জ্ঞেয়। "ভূতলং ঘটাভাববৎ" ঘট শূন্য ভূতল অর্থাৎ ঘটের অভাব ভূতলের বিশেষণ হইয়া প্রতীত হয় স্বতন্ত্ররূপে প্রতীত হয় না।

"অব্যপদেশ্য"

পদার্থের একটি নাম আছে। নাম সঙ্কেত শব্দ। এই সঙ্কেত শব্দও কখন কখন পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা জ্ঞান জন্মে। নাম দ্বারাও জ্ঞান জন্মে। প্রশ্ন হয়, নাম দ্বারা জ্ঞান প্রত্যক্ষ কি শব্দ? প্রত্যক্ষ জ্ঞান 'অব্যপদেশ্য' অর্থাৎ নাম ব্যবহারের অযোগ্য। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা যখন জ্ঞান জন্মায় তখন শব্দ সম্বন্ধের লেশ থাকে না, পশ্চাতে নামসম্বন্ধ ঘটে। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বিনা যে জ্ঞান হয় উহা শব্দজ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। অতএব মাত্র ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা যে জ্ঞান হয়, উহাই প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা প্রথম যে জ্ঞান হয়, উহা কেবল বিশেষণের জ্ঞান, যেমন গোল, লম্বা চওড়া, মসৃণ, চিকণ প্রভৃতি জ্ঞানের নাম বিশেষণ। প্রথমে ঐ সকল বিশেষণের জ্ঞান হয়। ঐ সমুদায় গুলি মনসংযোগ বলে এক-বিশেষ্য হইয়া এক জ্ঞানে পরিণত হয়। সেই এক জ্ঞানের নাম বিশিষ্ট জ্ঞান। যাবৎ বিশিষ্ট জ্ঞান না জন্মায় তাবৎ উহা অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নাম ব্যবহারের অযোগ্য, যেমন শিশুর কি বোবার জ্ঞান। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজ জ্ঞান উৎপত্তি কালে অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নাম প্রয়োগের অযোগ্য। কেহ বলেন প্রত্যক্ষ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক। নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ অব্যপদেশ্য।

"অব্যভিচারী"

গ্রীষ্ম কালে মরীচি দেখিয়া নীর জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান যদি চ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজ কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমা নহে। একে আর এক জ্ঞান হইলে, উহা ব্যভিচারী। তাহা না হইলে অব্যভিচারী। মরুনীর ব্যভিচারী, সে জন্য উহা প্রত্যক্ষ প্রমা নহে। প্রত্যক্ষ প্রমা হইতে হইলে অব্যভিচারী হওয়া চাই। মরুনীর ভ্রান্তি মাত্র।

ব্যবসায়াত্মক

ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজ হইলেও স্থলবিশেষে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে না। সে জন্য বলা হয় উহা ধূম না ধূলি পটল? অসন্দিগ্ধ নিশ্চয় জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। অতএব ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজ ভ্রান্তিবর্জ্জিত ও সংশয় বর্জ্জিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।

প্রশ্ন হইতে পারে সংশয় মনজনিত, ইন্দ্রিয়জনিত নহে। কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ই সংশয়ের কারণ। ইন্দ্রিয় যদি ঠিক দেখে তাহা হইলে মনেও সেটা ঠিক হইবে। প্রত্যক্ষ হইলে প্রথমে ইন্দ্রিয়ের 'ব্যবসায়' নিশ্চয় হয়, পরে মনের ব্যবসায় হয়। সে জন্য মনের "অনুব্যবসায়" বলে। ইন্দ্রিয় যদি ঠিক না দেখে,সে বিষয়ে মনের অনুব্যবসায় হয় না। অনুব্যবসায় অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান, "আমি ইহা দেখিয়াছি" এইরূপ মানস জ্ঞান।

প্রশ্ন হইতে পারে সুখ দুঃখ মানস প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জনিত নহে। অতএব সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়। অতএব সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। মন ইন্দ্রিয় হইলে ও উহাতে শক্তি ভেদ আছে। মন ত্রিকালগ্রাহী, সমুদায় বিষয়ের জ্ঞাতা, চক্ষুরাদি মাত্র নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞাতা।

(২) অনুমান।

অনু পশ্চাৎ মান অর্থাৎ জ্ঞান। কোন এক স্থানে লিঙ্গ লিঙ্গীর সহিত দর্শন হইলে, স্থানান্তরে যদি লিঙ্গ দর্শন হয় তৎসহচর লিঙ্গীর জ্ঞান হয়। ইহাকে অনুমান বলা হয়। যাহার দ্বারা অনুমিতি জ্ঞান হয় তাহাকে লিঙ্গ বলে। ধূম দর্শন হইলে বহ্নি জ্ঞান হয়। ধূম লিঙ্গ। লিঙ্গের অপর নাম হেতু, ব্যাপ্য, সাধন। বহ্নি লিঙ্গী। লিঙ্গীর অপর নাম ব্যাপক সাধ্য। লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের নাম অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি। এই সম্বন্ধ পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। পরীক্ষার প্রণালী অন্বয় ও ব্যতিরেক। পাকশালায় সধূম বহ্নি দৃষ্ট হয়, আবার লৌহ পিণ্ডে নির্ধূম বহ্নি দেখা যায়। অতএব বহ্নির লিঙ্গ ধূম, কিন্তু ধূমের লিঙ্গ বহ্নি নহে। পক্ষ শব্দের অর্থ লিঙ্গী অনুমানের স্থান, যেমন বহ্নি অনুমানের স্থান পর্ব্বত।

অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, ও সামান্যতঃ দৃষ্ট।

(ক) পূর্ব্ববৎ অনুমান, অর্থাৎ কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান, যেমন মেঘ বিশেষ দেখিয়া ভাবী বৃষ্টির অনুমান করা হয়।

(খ) শেষবৎ অনুমান অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান। নদীর পূর্ণতা দেখিয়া দেশান্তরে বৃষ্টি হওয়ার জ্ঞান।

(গ) সামান্যতঃ দৃষ্ট—সামান্য অর্থাৎ জাতীয় ভাব। এক স্থানে দৃষ্ট বস্তু অন্য স্থানে দৃষ্ট হইলে, সেই বস্তু গতিশীল বুঝা যায়। যেমন মনুষ্য প্রভৃতি। গতি ব্যতীত একস্থানে দৃষ্ট বস্তু অন্য স্থানে দৃষ্ট হয় না। অতএব সূর্য্যের গতি আছে, এই অনুমান করা যায়। (?) ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান শেষবৎ অনুমানের ফল। সাবয়ব বস্তু জন্য-পদার্থ। পৃথিবী সাবয়ব স্থূল, অতএব পৃথিবী জন্য। জন্য মাত্রের জনক-বা কর্ত্তা আছে। অতএব পৃথিবীরও জনক বা কর্ত্তা আছে। জীব পৃথিবীর জনক হইতে পারে না—অলৌকিক আত্মা পৃথিবীর জনক। তিনিই ঈশ্বর নামে পরিভাষিত হন।

লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ, স্থলবিশেষে অপ্রত্যক্ষ হয়! রূপাদি গুণ নিরাশ্রিত হইতে পারে না, ঘটাদি দ্রব্যের আশ্রিত। সেইরূপ ইচ্ছাদি গুণও নিরাশ্রিত হইতে পারে না। অতএব ইচ্ছাদি গুণেরও আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টির পারিভাষিক নাম আত্মা।

অনুমান দ্বিবিধ:—স্বার্থ ও পরার্থ। স্বার্থ অনুমানে শাস্ত্রাপেক্ষা নাই। কারণ আমরা নিজেরাই সহস্র সহস্র অনুমান দৈনন্দিন ব্যবহার করি। পরার্থ অনুমান ন্যায়সাধ্য। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া আমি বলিলাম, ওখানে অগ্নি আছে; আর একজন বলিল, অগ্নি নাই। তাহাতে "অগ্নি আছে" বুঝাইতে হইলে বাক্যের প্রয়োজন। সে জন্য উহা ন্যায়সাধ্য। পঞ্চাবয়ব বাক্যের নাম ন্যায়।

১ম প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বতোপরি বহ্নি আছে।

২য় হেতু—কেন না, ধূম দেখা যাইতেছে।

৩য় উদাহরণ—ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে, যেমন পাকশালায়।

৪র্থ উপনয়—পর্ব্বতেও ধূম দেখা যাইতেছে।

৫ম নিগমন—অতএব ওখানেও বহ্নি আছে।

(৩) উপমান।

উপ—সাদৃশ্য, মান—জ্ঞান। সাদৃশ্যহেতু সাধ্য অর্থাৎ বিজ্ঞাপনীয়—সাধন অর্থাৎ বিজ্ঞাপনকে উপমান বলে। গবয় নামক আরণ্যক পশু আছে। গবয় এক ব্যক্তি অরণ্যে দেখিয়াছে, অপর ব্যক্তি দেখে নাই। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বুঝাইল, 'গবয়' গোসদৃশ। অপর ব্যক্তি অরণ্যে যাইয়া যদি গবয় দেখে, তার জ্ঞান হয়, এই পশুই গবয়। এই নাম জ্ঞান উপমানের ফল। বৈদ্যরা মুগানি মুগের মত, মাষাণি মাস কলাইয়ের মত, এইরূপ শ্রবণ করিয়া বনে মুগানি মাষাণি চিনিয়া লয়।

(৪) আপ্ত।

প্রকৃত জ্ঞানী অপরে জ্ঞান সঞ্চার জন্য যে বাক্য ব্যবহার করেন, উহা আপ্ত উপদেশ। যাহার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, প্রতারণার ইচ্ছা নাই, ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা নাই, এরূপ ব্যক্তির উপদেশই আপ্ত-উপদেশ। রজস্তমোগুণ শূন্য যোগী ও ঋষিরা অমোঘদর্শী, ত্রিকালদর্শী ও যথার্থদর্শী। তাঁহাদের বাক্যই আপ্ত-উপদেশ। কেহ কেহ বলেন, যোগী ও ঋষিদেরও স্থলবিশেষে ভ্রমপ্রমাদাদি হইতে পারে। অতএব বেদবাক্যই আপ্ত উপদেশ। আপ্ত দ্বিবিধ, দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। যাহার বিষয় ইহলোকের জন্য এবং প্রত্যক্ষ, তাহা দৃষ্টার্থ। যাহার বিষয় পরলোকের জন্য এবং অনুমেয়, তাহা অদৃষ্টার্থ। অদৃষ্টার্থ আপ্ত ও প্রমাণ।

(২) প্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়। ন্যায় মতে প্রমেয় দ্বাদশটী—

(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ, (১২) অপবর্গ।

(১) আত্মা।

কেহ কেহ বলেন, আত্মা 'অহং' আমি, এইরূপে উপলব্ধ হইতেছেন, অতএব আত্মা প্রত্যক্ষ। এই স্বতঃসিদ্ধ অব্যভিচরিত অনুভব আত্মার

অস্তিত্বে বিশ্বাস সামান্যতঃ জন্মায় বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মার বিশেষ ভাব অবগত হওয়া যায় না। কোন পদার্থে একবার সুখ বোধ করিলে সেই বস্তু পাইবার কামনা হয়, এই কামনার নাম ইচ্ছা। এই ইচ্ছা প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা বা স্মরণ হইতে হয়। যে আত্মা পূর্ব্বসুখের ভোক্তা, সেই আত্মাই সেই সুখের স্মর্ত্তা এবং সেই আত্মারই ইচ্ছা হয়। অতএব ইচ্ছাটি পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী একই আত্মার লিঙ্গ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন, বীজ যেরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়, সেইরূপ এক বুদ্ধি অন্য বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়, সেই বুদ্ধি অপর বুদ্ধি, আবার সেই বুদ্ধি অপর বুদ্ধি, এইরূপ অনাদি বুদ্ধিসন্তানের নাম আত্মা। সেই বুদ্ধি-ধারাই 'অহং' 'অহং' ইত্যাকারে ভাসমান হয়। নৈয়ায়িক বলেন, যদি লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিধারা আত্মা হইল, তাহা হইলে এরূপ আত্মার ইচ্ছা হইতে পারে না। এক আত্মার অনুভূত সুখ অপর আত্মার দ্বারা স্মৃত হইতে পারে না। অতএব তাহার ইচ্ছা হইতে পারে না।

সেইরূপ তাঁহার দ্বেষও হইতে পারে না। দ্বেষ পূর্ব্বদুঃখ-প্রতিসন্ধানমূলক। কারণ পূর্ব্বক্ষণে যে আত্মা, পরক্ষণে সে আত্মা নাই।

এরূপ আত্মার প্রযত্নও হইতে পারে না। যে বস্তু সুখের হেতু বলিয়া জানা যায়, সেই বস্তু পাইবার জন্য যত্ন করার নাম প্রযত্ন। প্রযত্ন ও পূর্ব্বাপরদর্শী একস্থায়ী প্রতিসন্ধাতার কার্য্য। ক্ষণস্থায়ীর পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান হইতে পারে না।

যে পূর্ব্বের সুখ দুঃখ স্মরণ করিতে পারে, সেই তাহার আহরণ বা বর্জ্জন করিতে পারে।

জ্ঞান এইরূপ এককর্তৃক নিয়মে আবদ্ধ। যে জিজ্ঞাসু হয়, সেই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের অনুসন্ধান করে এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করে। অতএব জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান ও জ্ঞানলাভ, এই তিনের কর্ত্তা একই।

অতএব (১) ইচ্ছা, (২) দ্বেষ, (৩) প্রযত্ন, (৪) সুখ, (৫) দুঃখ, (৬) জ্ঞান, এই ছয়টি আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক।

এই ছয়টি যখন দেখা যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এই ছয়টি নিরাশ্রিত হইতে পারে না, অতএব তাহাদের আশ্রয় আত্মা আছেন।

(২) শরীর।

চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থ এই তিনটির আশ্রয় শরীর। চেষ্টা অর্থাৎ ইচ্ছাজনিত স্পন্দন। কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে শরীরে স্পন্দন হয়। অতএব চেষ্টার আশ্রয় শরীর। ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য করিবার শক্তি শরীরাধীন। অতএব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় শরীর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধাদি পদার্থের নাম অর্থ। 'অর্থ' হইতে সুখ ও দুঃখ উপলব্ধি হয়; সেই উপলব্ধি সশরীর অবস্থায় হয়, অশরীর অবস্থায় হয় না। অতএব অর্থের আশ্রয়ও শরীর।

(৩) ইন্দ্রিয়।

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। ইহারা পৃথিব্যাদি ভূত হইতে উৎপন্ন। গন্ধ গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম ঘ্রাণ। কটু-তিক্ত কষায়াদি রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম রসনা। শ্বেত পীতাদি রূপগ্রাহক চক্ষু। কার্কশ্যাদি স্পর্শ জ্ঞানের কারণভূত ইন্দ্রিয় ত্বক্। ধ্বন্যাত্মক শব্দ গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র।

সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়গুলি এক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় গন্ধই গ্রহণ করে, অন্য কিছু গ্রহণ করে না। চক্ষু রূপ গ্রহণ করে, অন্য কিছু গ্রহণ করে না। অতএব ইন্দ্রিয়গণ এক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। অতএব তাহারা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন বলিতে হইবে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পাঁচটী ভূত। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ, আপ হইতে রসনা, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে ত্বক্, আকাশ হইতে শ্রোত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীবিহারীলাল সরকার।

ব্রতধারীর মহামিলন*

রাখালের বেনুরবে, নিকুঞ্জের পেলব কুসুমে,
যমুনার নীল জলে, কোকিলের সুস্বর পঞ্চমে।
কি আনন্দ, কি অমৃত, পরিপূর্ণ-পূর্ণতর হয়ে
গগনে উজলে আলো শত ধারে ব্রজপুরী ছেয়ে।
তোমার মিলন গাথা বাজে আজ মন্দিরে, মন্দিরে,
দুর-দূরান্তরে বাজে, বাজে যথা শ্যামা গান করে,
আর্ত্ত যথা অশ্রু মুখী, দীন যথা আছে ম্লান হয়ে,
ধরণী শয্যায় শুয়ে ক্ষুধাতুর থাকে সব সয়ে,
ভক্ত যথা হর্ষ ভরে শ্রীরাধার মুখ পদ্ম হেরি
উপজে বিমলানন্দ, তথায় সকল হিয়া ভরি
তোমার মিলন-গীতি বাজে সখা, রণিয়া, রণিয়া,
গোপন মরম মাঝে, আনে মুখ ব্যাথায় ছাপিয়া।
ধন্য, পুণ্য শুভদিন, প্রেমরূপী কৃষ্ণ-নারায়ণ
চুম্বনে অমৃত ঢেলে "নারায়ণে" করে আলিঙ্গন।
বহুদিন সেবিয়াছ দুই করে নর-নারায়ণে,
সুদিন দুর্দ্দিন মাঝে, মনে প্রাণে, শয়নে স্বপনে।
তাই আজ ভগবান পরিপূর্ণ সাধনার শেষে,
এসেছেন তব দ্বারে, বঁধু হয়ে মহা অরি বেশে—
বরিতে তোমারে সখা, আনন্দের অমৃত-নগরে,
প্রেম যথা রাজ্যেশ্বরী, মুক্তি যথা দাসী হয়ে ফেরে।
তোমার বিমল হাসি চুরি করে আজি শশী হাসে,
তোমার সরল প্রাণ ছড়ায়ে পড়েছে দিক্ বাসে।
একদিন ছিলে ক্ষুদ্র, আজি ভাই পূর্ণতম তুমি,
তোমারি পবিত্র রজঃ, ছেয়ে থাক্ পুণ্য ব্রজভূমি।

—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ।

---

* স্বামী নারায়ণানন্দের দেহ ত্যাগ উপলক্ষে।

মাধুকরী

২। সারদামণি দেবী—বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া, এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাট-বাজার বসিল এবং নববধূকে আনাইয়া সুখের মাত্রাপূর্ণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্দ্দেশে জয়রামবাটী গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। বিবাহের পর সারদামণি একবার মাত্র স্বামীকে দেখিয়াছিলেন। তখন তিনি সাত বৎসরের বালিকা মাত্র। সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার এইটুকু মনে ছিল যে, ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত রামকৃষ্ণ জয়রামবাটী আসিলে, বাড়ীর কোন নিভৃত অংশে লুকাইয়াও তিনি রক্ষা পান নাই ; হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্ম ফুল আনিয়া, বালিকা মাতুলানী লজ্জা ও ভয়ে সঙ্কুচিতা হইলেও, তাঁহার পূজা করিয়াছিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার তের বৎসর বয়সের সময়, তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ী কামারপুকুর লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি একমাস ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায়, তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে, আবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দেড় মাস ছিলেন। তখনও স্বামীর সহিত দেখা হয় নাই। তাহার তিন চার মাস পর যখন তিনি বাপের বাড়ীতে ছিলেন তখন খবর আসিল রামকৃষ্ণ আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তখন তাঁহার বয়স তের বৎসর ছয় সাত মাস।

রামকৃষ্ণ এই সময়ে একটী সুমহৎ কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নবান হইলেন। পত্নীর তাঁহার নিকট আসা না আসা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ উদাসীন থাকিলেও যখন সারদামণি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শিক্ষা-দীক্ষাদি দিয়া তাঁহার কল্যাণসাধনে তৎপর হইলেন। রামকৃষ্ণকে বিবাহিত জানিয়া "শ্রীমদাচার্য্য তোতা পুরী তাঁহাকে একসময় বলিয়াছিলেন, 'তাহাতে আসে যায় কি। স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ বৈরাগ্য বিবেক বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে

অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।”

তোতা পুরীর এই কথা রামকৃষ্ণের মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধন-লব্ধ নিজের বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল। কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি কোন কাজ উপেক্ষা করিতে বা আধসারা করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। এ বিষয়েও তাহাই হইল।

“ঐহিক পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয় অর্দ্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির সেবা ও গৃহকর্ম্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশকালপাত্র ভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন, তদ্বিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।”

চৌদ্দবৎসর বয়সের সময় যখন সারদামণি দেবীর স্বামীর নিকট হইতে শিক্ষালাভ আরম্ভ হয়, তখন তিনি স্বভাবতঃই নিতান্ত বালিকা-স্বভাব-সম্পন্না ছিলেন। কারণ “কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না।... ..পবিত্র নির্ম্মল গ্রাম্য-বায়ু সেবন এবং গ্রাম-মধ্যে যথাযথ স্বচ্ছন্দবিহরপূর্ব্বক স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে।”

পবিত্রা বালিকা রামকৃষ্ণের দিব্য সঙ্গ ও নিঃস্বার্থ আদর যত্ন লাভে ঐ কালে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিলেন। পরমহংস দেবের

স্ত্রীভক্তদিগের নিকট তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময়ে এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"হৃদয়-মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম— সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

কয়েক মাস পরে রামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, সারদামণি তখন অনন্ত আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন —এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

"উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব-সাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্তসমবেদনা-সম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক-উল্লাস-প্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর-যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। এইরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন।"

কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন স্বামীর পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা যত্নে সম্বরণপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন; ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেননা—সময় হইলেই নিজের নিকট ডাকিয়া লইবেন।

"ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশাপ্রতীক্ষার প্রবলপ্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর

কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিত না, দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে তাঁহাকে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম-সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর কোথায়?—গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, 'পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ায়'—ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—তবে কি পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই। লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্ব্বন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার ত আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন, পরে—যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।"

ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য দেবের জন্মতিথিতে সারদামণি দেবীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া এই বৎসর গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসা স্থির করেন। তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার পিতাকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি কন্যার এখন কলিকাতা যাইবার অভিলাষের কারণ বুঝিয়া, তাঁহাকে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। জয়-রামবাটী হইতে কলিকাতা রেলে আসা যাইত না, সুতরাং পাল্কীতে কিংবা পদব্রজে আসা ভিন্ন উপায় ছিলনা। ধনী লোকেরা ভিন্ন অন্য সকলকে হাঁটিয়া আসিতে হইত। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাঁটিয়াই কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমল-পূর্ণ দীর্ঘিকা নিচয়

দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ রাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে, তাঁহারা সকলে প্রথম দুই দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থল পৌঁছান পর্য্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না; পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথি মধ্যে এক স্থানে দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটিতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয় মনে করিলেন। কন্যারও তাহাতে মত হইল, কিছুদূর যাইতে না যাইতে একটা পাল্কীও পাওয়া গেল। সারদামণি দেবীর আবার জ্বর আসিল। কিন্তু আগেকার মত জোরে না আসায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন না, এবং ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেনও না। রাত্রি নয়টার সময় সকলে দক্ষিণেশ্বর পৌঁছিলেন।

(ক্রমশঃ)

বৈশাখ
" প্রবাসী " —শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থ পরিচয়

হিন্দু রমণী—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত—মূল্য একটাকা মাত্র। সময়ের সঙ্গে সমাজের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা পুরাতনকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারি নাই। একদিকে অতিমাত্র সংকীর্ণ ছুঁৎমার্গী প্রাচীন সমাজ অপরদিকে যুক্তিহীন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল 'আধানিক'—এই উভয় বিপদের মধ্য দিয়া লেখক সমাজ রথকে পরিচালিত করিয়া যথার্থ হিন্দু সভ্যতার আদর্শ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছেন। রমণী—মা—ছেলেকে গর্ভে ধারণ করে

মানুষ করে—অতএব রমণীর আদর্শ নিরূপিত না হইলে সমাজের জাতীয় ভিত্তিই অসম্পূর্ণে রহিয়া যায়। হিন্দুর জননী, ভগিনী ও দয়িতার আদর্শ কি, লেখক বর্ত্তমানের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সাহায্যে তাহাই নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই গ্রন্থে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সফলকামও হইয়াছেন। আমরা উদ্বোধনের সকল পাঠিকাকেই এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

দক্ষিণা—শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত কবিরত্ন। মূল্য দশ আনা। সাধনা রূপক ও ছন্দে বর্ণিত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "পুস্তকের মূল কোনও পারসীক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।" গল্পটি এই, 'সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত বিবশ ফকির নিজামী দেবমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। নিজামীর ইচ্ছা মন্দিরস্থিত দেবতা দর্শন করে। কিন্তু মন্দির মধ্যে গমনোদ্যত নিজামীকে "ধূপ" বাধা দিয়া বলিল—"দেব-দরশনে হেথা দিতে হয় কিছু, দেবতার আগে এই সনাতন প্রথা" কিন্তু রিক্ত নিজামী দক্ষিণা কোথায় পাইবে। সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি দক্ষিণা দিয়ে দরশন পেলে।" ধূপ উত্তর করিল, "অসহ্য দহন-যাতনা সহিয়া * * সরবস্ব মোর যাহা কিছু ছিল, আমি দেবতারে দিনু ডালি।" নিজামী ক্রমে তীর্থ সলিল, প্রদীপ, ফুল, চন্দন ও শঙ্খের নিকট গমন করিয়া তাহাদের আত্মবলীরূপ দক্ষিণার কথা অবগত হইয়া নিজেকে দেবদর্শনের অধিকারী করিবার জন্য গমন করিল। গ্রন্থকার সহজ সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। কোথায়ও ভাবের ও ভাষার আধুনিক অস্পষ্টতা নাই।

সাধন—প্রাণায়াম। রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ সাধন ভজন সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধ উদ্বোধনের পঞ্চম বর্ষে লিখেন। সাধন ও প্রাণায়াম সম্বন্ধে লোকে নানা অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে কিন্তু উহা কত স্বাভাবিক তাহাই দেখাইবার জন্য মহাপুরুষজী এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। বিশ বৎসর পরে উহার পুনরালোচনার প্রয়োজন বোধে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তিকা উদ্বোধন অফিসে পাওয়া যায়। মূল্য দুই আনা।

নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি—(১) Sight

Beyond—স্বামী বিবেকানন্দের কথা সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, (২) উপনিষৎ কণিকা—উপনিষদের বাক্য সংগ্রহ, কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত, (৩) Extracts from the Swamijis Sayings, বেলুড় মঠ হইতে প্রকাশিত এবং কঠোপনিষৎ—মূল সংস্কৃত—ইংরাজীতে শব্দের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, পুনা, অষ্টেকার কোম্পানী হইতে প্রকাশিত।

সংঘ বার্ত্তা

১। বিগত ৩০শে এপ্রিল স্বামী কমলেশ্বরানন্দ, বাসুদেবানন্দ, এবং মুক্তেশ্বরানন্দ চেতলা ট্রেণিং এ্যাসোসিয়েসনে "বালকদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২। বিগত ৩রা মে স্বামী বাসুদেবানন্দ বিবেকানন্দ সোসাইটীর তরপ হইতে কলিকাতা থিয়সফিক্যাল হলে "পতঞ্জলী ও অন্তরঙ্গ সাধন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৩। বিগত ৪ঠা মে স্বামী বাসুদেবানন্দ ও নির্ব্বানানন্দ দমদমার নিকটবর্ত্তী কান্দিহাটী গ্রামের বিদ্যালয়ের বাৎসারিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে গমন করিয়া "অভিভাবকদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৪। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ দেশনেতৃগণ কলিকাতার ১১, ইডেন হস্‌পিটাল রোডস্থ, শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে এক আবেদন পত্র সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য—(১) স্কুল এবং কলেজের ছাত্রেদের মধ্যে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান, (২) জনসাধারণে বিদ্যার প্রচার, (৩) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, এবং (৪) কুটির শিল্পের প্রচলন। যাঁহারা এই সৎকার্য্যে অর্থ সাহায্য করিবেন তাঁহারা উপরি লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৫। খাসীয়া পাহাড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম—মাত্র ৩ মাস আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের দুই জন কর্ম্মী খাসীয়া পাহাড়ে একটী কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা কেন এখানে আস্‌লাম এবিষয় বোধ হয় বেশী না বল্‌লেও চল্‌বে। আপাততঃ এইমাত্র বল্‌তে চাই যে, হিন্দুধর্ম্ম চিরকার প্রচারশীল। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও হিন্দু ভাব, ভাষা ও ধর্ম্মের প্রভাব খাসীয়া এবং জৈন্তিয়া পাহাড়েও পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের পর সেলার বাঙ্গালী শিক্ষক পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয় গৃহ নষ্ট হয়ে যায়, তদবধি কোনও বিশিষ্ট হিন্দু প্রচারক এখানে স্থায়ী ভাবে কাজ করবার জন্য আসেন নি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে দুই একজন প্রচারক এসেছিলেন তারাও গোড়ামীর একশেষ করে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অধিকাংশ লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি আকর্ষণ করতে পারেন নাই। তাদের কৃতকার্য্য না হবার আর এক প্রধান কারণ খ্রীষ্টিয় প্রচার সমিতি। উপরোক্ত উচ্চ বিদ্যালয় নষ্ট হওয়ার পর হতে সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা বিভাগ ‘ওয়েল্‌স্’ মিশনের হাতে চলে গেছে। সমস্ত খাসীয়া পাহাড়ে প্রায় ৫০০ স্কুল স্থাপিত হয়েছে, গ্রামে গ্রামে গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারক নিযুক্ত হয়েছে। এ কাজের জন্য ‘ওয়েল্‌স্’ মিশন এখানে প্রায় ১০০ বৎসর এসেছে। সমস্ত গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকায় এবং তদুপরি ছাত্রদের উৎসাহিত ও সাহায্য কর্‌বার বিশেষ বন্দোবস্তহেতু খাসীয়াদের প্রায় সকলেই মাতৃভাষায় লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে। প্রায় ২ লক্ষ লোকের ভিতর—যাদের আকৃতি, ভাব ও পোষাক পরিচ্ছদের সৌসাদৃশ্য বাঙ্গালীর সহিত সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান একমাত্র আমাদের শৈথিল্য, অনুদারতা ও ধর্ম্মান্ধতার জন্য ইতিমধ্যে তাদের প্রায় শতকরা ৪০।৫০ জন খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। অবশ্য বলা বাহুল্য তাদের ভাব, আচার, বেশভূষা সবই সাহেবদের অন্ধ অনুকরণে হচ্ছে। পূর্ব্বে খাসীয়া পাহাড়ে আস্‌লে হিন্দু স্বধর্ম্মাবলম্বীর ভিতর থাকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কর্‌ত। এখন বিলাতী সমাজের ভাব পেতে আমাদের আর বেশীদূর যেতে হবে না, ঘর ছেড়ে ১০ মাইল গেলেই হবে। এ

কি অদৃষ্টের পরিহাস নয়! এইরূপ করেই আমরা স্বগৃহে প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলে অবরুদ্ধ বাতাসে প্রাণ দিচ্ছি। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে তিনি ছাড়্‌বেন কেন। তুনিয়াতে হয় উন্নতি নয় অবনতি এর মাঝামাঝি কোনও অবস্থা নেই। 'সত্য লোকাচার বা সমাজের সঙ্গে আপোষ করে না, সমাজকেই সত্যের সঙ্গে আপোষ কর্‌তে হয়'। হিন্দু সমাজ স্বামিজীর কার্য্যের পর হ'তে বুঝ্‌তে পেরেছেন ধর্ম্মের জীবনী শক্তি কোথায়। প্রচার ও প্রচারক বিহীন ধর্ম্ম সম্প্রদায় নীচ দশা প্রাপ্ত হয়, বলা বাহুল্য। ধর্ম্মে ও দর্শনে যে জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাঁহারা 'বহুত্বে একত্ব' রূপ মহাসত্য লাভের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন তাঁদের বংশধরগণ ঘরের দাওয়ায় বসে রোদ পোহাচ্ছেন আর নীরবে অজস্র গালাগালি বেমালুম হজম কর্‌ছেন। এই জন্যই স্বামিজী আমাদের দেশের যুবকদের বিশেষ করে অন্যান্য দেশ দেখ্‌তে বল্‌তেন। অন্য দেশ দেখা দূরে থাকুক নিজের দেশ দেখাই হয় না, আমরা সে পথই মাড়াই না। অসম সাহসিক জীবন (adventerous life) সেন আমাদের চলে গেছে, কারণ প্রতিযোগিতায়, শক্তি সংঘর্ষে না দাঁড়ালে নিজশক্তিতে বিশ্বাস আসে না এবং শক্তির স্ফুরণ হয় না। হিন্দুদের সম্বন্ধে 'পৌত্তলিক', 'ছুঁৎমার্গী' প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণা যে এখনও আছে তার একমাত্র কারণ দেশে ও বিদেশে আমাদের সনাতন শাস্ত্রের প্রচার বহুলতার অভাব। আমেরিকাতে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যাবলী গতি ও প্রসার যিনি লক্ষ্য কর্‌ছেন তাঁরই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে। অবশ্য সামাজিক দোষ ত্রুটি আমি সমর্থন কর্‌ছি না কিন্তু এরূপ দোষ ত্রুটি কোন্ সমাজেই বা নাই।' হিন্দু সমাজ প্রবুদ্ধ হয়েছে, গৌরবময় অতীতের মহান্ কার্য্যকারিতার পর উহা সাময়িক বিশ্রাম নিয়েছিল মাত্র। হিন্দু সমাজের বিরাট অঙ্গে প্রাণ স্পন্দন হয়েছে। যে ত্যাগ ও সেবা ভারতের মূলভিত্তি সে তুটিকে আশ্রয় করে সব দিকে নব জীবনের চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্ম বিমুখতার অপবাদ দূর কর্‌তে আমরা বদ্ধপরিকর।

অতঃপর—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রচারের পর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকও

এসেছিলেন। বর্ত্তমানেও তাদের দুইজন খাসীয়া পাহাড়ে স্থায়ীভাবে বাস কর্‌ছেন; কিন্তু প্রচারক ভাবে নয়। প্রায় ৬টী ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাবের প্রধান দোষ ঐক্যের অভাবে সবমন্দিরই নির্জীবপ্রায়। দুইজন প্রচারকের মতভেদই এই ধ্বংসের কারণ। ৩০০।৪০০ শত খাসীয়া ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিল বর্ত্তমানে তাদের সংখ্যা অনেক কম। এবার খ্রীষ্টিয় মিশনরীদের কার্য্যাবলীর কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। 'ওয়েল্‌স্', মিশন, 'চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ডে' 'রোমান্ ক্যাথলিক' প্রভৃতি খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ গীর্জ্জা আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দলবৃদ্ধির চেষ্টা কর্‌ছেন। 'ওয়েল্‌স্' মিশনই সর্ব্ব প্রথম খাসীয়া ভাষার বর্ণমালা ইংরেজীর অনুকরণে (মাত্র ৪।৫টী অক্ষর বদলাইয়া) তৈয়ার করেছে এবং প্রাথমিক পুস্তক হতে আরম্ভ করে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক বই খাসীয়া-ভাষায় প্রচার করেছে। সেলার উচ্চ বিদ্যালয়টি থাকা পর্য্যন্তও বোধ হয় এ দেশের রাজকার্য্য এবং অপরাপর সকল লেখা-পড়ার কাজ অবাধে বাংলা ভাষায়ই হ'ত, পরে আসাম গভর্ণমেণ্ট আইন করে খাসীয়া ভাষার প্রচলন করেছেন। তারপর সুদীর্ঘ ২৫।৩০ বৎসর বাংলা ভাষার চর্চ্চার সুবিধা না থাকায় বর্ত্তমানে খাসীয়ারা বাংলা জানে না, এইরূপে দুই জাতির মধ্যে ভাষাগত একটা মস্ত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। যাক্ এদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় গুলিতে যে বই পড়ান হয় তার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। প্রথম ভাগখানি বাইবেল বল্লেই চলে, কি অদ্ভুত চালবাজি! ছোট ছোট ছেলেদের ভিতর কি রকম করে খ্রীষ্টানি ভাব ঢুকাবার চেষ্টা হচ্ছে দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হবেন। কম লোকেই ধৈর্য্য ধরে এদের বইখানি শেষ পর্য্যন্ত পড়্‌তে পারবে। "আমি পাপ" "তুমি পাপ" "সব পাপ" ইত্যাদি প্রথম পাঠে আরম্ভ করে যীশু পৃথিবীর একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা এই মন্ত্রে শেষ করা হয়েছে। অন্যান্য পাঠেও কেবল প্রার্থনা—যীশু পাপ হতে উদ্ধারক। এইরূপ করে সমস্ত জাতীর ভিতর দুর্ব্বলতা ঢুকান হচ্ছে। খাসীয়াজাতি সঙ্গীতপ্রিয় তাই যীশু ও বাইবেল্ সম্বন্ধে গান রচনা করে ইংরেজী

সুরে ছেলেদের শেখান হয়। এদের ভাষায় অন্য ভাবের রচিত গান নাই বল্‌লেই চলে। প্রত্যেক শিক্ষকই খাসী—খ্রীষ্টিয়ান এবং প্রত্যেকেই প্রচারকের কার্য্য করেন। চেরাপুঞ্জীতে "থিওলজিকাল্ কলেজ" করে মাষ্টারদের শিক্ষা দেওয়া হয়। "থিওলজিকেল্ এডুকেটর" নামক তাদের একখানি পাঠ্য বই কতক কতক আমি ইতিমধ্যে পড়েছি, তাতে সব ধর্ম্মের ভুল দেখিয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদন করবার চেষ্টা হয়েছে। তাতে অধিকাংশ যুক্তি অনার্য্য। এত করেও শিক্ষা বিষয়িক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি প্রভৃতির বিশেষ প্রলোভন দেখান সত্ত্বেও কিন্তু অর্দ্ধেকের অধিক লোক এখনও অখ্রীষ্টান। খাসীয়াদের শরীর বলিষ্ঠ, এরা কর্ম্মঠ, স্বাধীনতাপ্রিয়, যদিও বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষারগুণে অন্যরূপ হচ্ছে। কোন কোনও রাজ্য অর্দ্ধ স্বাধীন। রাজনৈতিক ক্ষমতা আসাম গবর্ণমেণ্টের হাতে। সমাজ সংস্কারেচ্ছু ব্যক্তিগণেরও এখানে অনেক শিখ্‌বার আছে। তাহারা বঙ্গ সমাজে যাহা প্রবর্ত্তন কর্‌তে চান তার অনেকটা এখানে কার্য্যে-পরিণত দেখ্‌তে পাবেন, যেমন স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, ছুৎমার্গ-ত্যাগ, গ্রাম্য-স্বায়ত্ব-শাসন ইত্যাদি। এদের স্ত্রীলোকেরাই বেশী কর্ম্মঠ, হাট, বাজার করা, কমলা বাগানে কার্য্য করা ইত্যাদি সব করছে, অথচ পবিত্র। পার্ব্বত্য জাতিসুলভ সরলতা এখনও বিদ্যমান, তবে বর্ত্তমানে বিলাসিতার মোহ আস্‌ছে। খাসীয়াদের অনেকেই রাম, চণ্ডী, শিব, প্রভৃতি হিন্দু দেবতার পূজা করে সুতরাং এরা হিন্দু-আহারাদি বিষয়ে দেশ, কাল, পাত্রানুযায়ী কিছু কিছু পার্থক্য থাক্‌লেও উক্ত মূলসূত্র ধরে অতি সহজেই এদের দ্বারা হিন্দু সমাজের বলপুষ্টি করা যেতে পারে। খ্রীষ্টিয়ানরা ১০০ শত বৎসরে যা কর্‌তে পারে নাই ১ ডজন চরিত্রবান্, ইংরেজীশিক্ষিত যুবক হলে আমরা ৫ বৎসরে আরও বেশী কর্‌বার আশা রাখি। হিন্দু যুবক এ কার্য্যে অগ্রসর হ'লে স্বধর্ম্মাবলম্বীদেরও স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ ও শক্তি বৃদ্ধি হবে। দুই জন মাত্র লোক দ্বারা এত বড় দুই পাহাড়ী দেশে কাজের প্রসার দেখান অসম্ভব। আমরা আপাততঃ ২টী স্কুল করেছি, সকালে ছেলেদের জন্য এবং রাত্রে যুবকদের জন্য,—যারা সারাদিন

কাজ করে। বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়; আমরা নিজেও খাসী ভাষা শিখ্ছি, এদের ভাষা শিখ্তে আরও ৩।৪ মাস লাগ্বে। স্কুল ব্যতীত দৈনিক আলোচনা ক্লাশ ও সাপ্তাহিক অধিবেশন চালানো হচ্ছে। অনেক জায়গা থেকে আমাদের ডাক্ছে—লোক দেবার জন্য, তারাই শিক্ষকের খাওয়া পরাও তদুপরি তাহাকে মাসিক অল্প সাহায্যের ব্যয়ও বহন কর্বে। এদের বাংলা ভাষা শিক্ষার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান শিক্ষায় অনেকেই সন্তুষ্ট নয়। নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আমাদের দুই স্কুলে—খাসী, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ছাত্র গড়ে ২৫।৩০ জন আস্ছে। সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় (যেখানে আমি প্রথম দিন ২।৩ জনকে দেখ্তে পেয়েছিলুম) এখন ৫০।৬০ জন স্ত্রী, পুরুষ উপস্থিত হয়। আমরা স্থানীয় সাহায্যের দ্বারাই কাজ চালাচ্ছি। অনেক ব্রাহ্ম বন্ধুদের নিকট হ'তে আর্থিক ও অন্যান্য নানারূপ সাহায্য পাচ্ছি। খ্রিষ্টিয়ানরাও আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহারই করে আস্ছেন।

ইতিমধ্যে আরও ৩ জন কর্ম্মী পেয়েছি, এদের দ্বারা আরও ৩টি কেন্দ্র শীঘ্রই খুলবার আশা করি।

ব্রঃ মহাচৈতন্য

৬। বাংলার বিদ্যামন্দিরের প্রধান পুরহিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ২৫শে মে এ মর জগৎ ত্যাগ করিয়া বাণাপাণির পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। বাঙ্গালিকে শিক্ষিত করিবার জন্য শ্রীভগবান তাঁহাকে ১৮৬৪ সালে, ২৯শে জুন এ ধরাধামে প্রেরন করেন। এ ক্ষতির পূরণ এক্ষণে অসম্ভব—কারণ সে আসনের অধিকারী বর্ত্তমানে ভারতে কেহ নাই।

1446.

[library stamp]

শ্রীশ্রীমায়ের কথা *

প্রথম দর্শন—১৩১৭

কলিকাতা পটলডাঙ্গার বাসায় শুক্রবার সকালে শ্রীমান—বলে গেল, "কাল শনিবার মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করতে যাব—আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন।" কাল তবে মায়ের দর্শন পাব! সারা রাত আমার ঘুমই এল না—কেন যে সারা রাত কেঁদে কাটালুম তাও জানি না। আজ ১৩১৭ সন, প্রায় চৌদ্দ-পনর বৎসর হয়ে গেল কলিকাতায় আছি, এত কাল পরে মায়ের দয়া হল কি? এত দিনে কি সুযোগ মিলিল? পরদিন বৈকালে গাড়ী করে সুমতিকে বেথুন স্কুল হ'তে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিতে চলিলাম। কি আকুল আগ্রহে গিয়েছিলাম তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা জানি না। গিয়ে দেখি মা বাগবাজারে তাঁর বাটীতে ঠাকুরঘরের দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছেন। এক পা চৌকাঠের উপর, অপর পা পা-পোষখানির ওধারে; মাথায় কাপড় নাই, বাঁ হাতখানি উঁচু করে দরজার উপর রেখেছেন, ডান

---

* দেব-মানব ঠাকুরের আদর্শ চরিত্র ও অলৌকিক জীবনকথার সহিত পাঠক পাঠিকা এখন অনেকটা পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বিষয় তাঁহারা স্বল্প মাত্রই জ্ঞাত আছেন। ঐ জন্য আমরা এখন হইতে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর পুণ্য জীবন কথার যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া প্রতি সংখ্যায় পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের সুপরিচিতা জনৈক ভক্ত-মহিলা ঐ বিষয়ে যে ডাইরী রাখিয়াছেন তাহাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

উঃ সঃ

হাতখানি নীচুতে, গায়েরও অর্দ্ধাংশে কাপড় নাই, এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। গিয়ে প্রণাম কর্ত্তেই পরিচয় নিলেন। সুমতি বলিল 'আমার দিদি'—সে পূর্ব্বে একদিন গিয়েছিল; তখন একবার আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, 'এই দেখ মা এদের নিয়ে কি বিপদে পড়েছি। ভাইএর বউ, ভাই ঝি, রাধু, সব জ্বরে পড়ে। কে দেখে, কে কাছে বসে ঠিক্ নাই। বস আমি কাপড় কেচে আসি।" আমরা বসিলাম। কাপড় কেচে এসে দুই হাত ভরে জিলেপি প্রসাদ এনে দিয়ে বল্লেন 'বৌমাকে (সুমতি) দেও, তুমিও নেও। সুমতিকে শীঘ্র স্কুলে ফির্তে হবে, তাই সে দিন একটু পরেই প্রণাম করে বিদায় নিলাম। বল্লেন—'আবার এস'। এই পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা, আশা মিট্‌ল না। অতৃপ্ত প্রাণে বাসায় ফির্‌লাম।

দ্বিতীয় দর্শন ১৩১৭, ৩০শে মাঘ

শ্রীশ্রীমা সে দিন বলরাম বাবুর বাটী গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বাগবাজারের বাটীতে গিয়ে একটু অপেক্ষা করতেই ফিরিলেন। প্রণাম করিয়া উঠ্‌তেই হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—'কার সঙ্গে এসেছ?' আমি বল্‌লাম 'আমার এক ভাগ্নের সঙ্গে।'

মা—'ভাল আছ? বৌমা ভাল আছে? এত দিন এস নি—ভাবছিলুম অসুখ করল নাকি?'

বিস্মিত হয়ে ভাবলুম, একদিন মাত্র পাঁচ মিনিটের দেখা তাতেই মা আমাদের কথা মনে করেছেন্! ভেবে আনন্দে চোখে জলও এল।

মা —(আমার পানে সস্নেহে চেয়ে) তুমি এসেছ, তাই ওখানে (বলরাম বাবুর বাড়ীতে) বসে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম!

মায়ের ভাইপোর (ক্ষুদের) জন্য সুমতি দুটি পশমের টুপি দিয়েছিল, মাকে উহা দিতে, এই সামান্য জিনিসের জন্য কতই খুসী হলেন! তক্তপোষের উপর বসে বললেন—'বস এখানে, আমার কাছে।' পাশেই বসলাম, মা আদর করে বললেন—'তোমাকে যেন মা আরও কত দেখেছি—যেন কত দিনের জানাশোনা!'

আমি বল্লুম কি জানি মা, এক দিন ত কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য এসেছিলুম ! মা হাসতে লাগ্লেন ও আমাদের দুই বোনের অনুরাগ ভক্তির অনেক প্রশংসা করলেন। আমরা কিন্তু ঐ সকল কথার কতদূর যোগ্য তাহা জানি না। ক্রমে ক্রমে অনেক স্ত্রীভক্ত আসতে লাগলেন। ভক্তি বিগলিত চিত্তে মায়ের হাসি মাখা স্নেহভরা মুখখানির পানে তাঁদের এক দৃষ্টে চেয়ে থাকাটা আমার একটু নূতন ধরণের বোধ হল। কারণ, ওরূপ দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। মুগ্ধ হয়ে তাই দেখ্ছি—এমন সময় বাসায় ফিরবার তাগিদ এল—গাড়ী এসেছে। মা তখন উঠে প্রসাদ নিয়ে 'খাও খাও' করে একেবারে মুখের কাছে ধর্লেন। অত লোকের মধ্যে একলা অমন করে খেতে আমার লজ্জা হচ্চে দেখে বল্লেন 'লজ্জা কি ? নেও।' তখন হাত পেতে নিলাম। 'তবে আসি মা' বলে প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় বললেন, 'এস মা, এস, আবার এস। একলা নেমে যেতে পার্বে ত ? আমি আস্ব ?' বলে, সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এলেন। তখন আমি বল্লুম 'আমি যেতে পার্ব মা। আপনি আর আস্বেন না। মা তাই শুনে বললেন—'আচ্ছা একদিন সকালে এস।' পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরলাম। ভাবলাম একি অদ্ভুত স্নেহ !

তৃতীয় দর্শন—বৈশাখ সংক্রান্তি ১৩১৮

আজ গিয়ে প্রণাম করিতেই—'এসেছ মা, আমি মনে করছি কি হল গো ! কেন আসে না। এতদিন আস নি কেন ?' আমি বল্লাম, 'এখানে ছিলাম না মা, বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম। ভ্রাতৃবধূ অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। মায়ের একলা অসুবিধা হবে তাই যেতে হয়েছিল। একটি ছেলে হয়েছে।'

মা—বৌমা (সুমতি) আসে না কেন ? পড়া-শুনার চাপে ? আমি—না, ভগ্নীপতি এখানে ছিলেন না। মা—'তা, ওত ইস্কুলে যাচ্ছে ; আচ্ছা, ওরা সংসার ধর্ম্ম করে ত ?' আমি বল্লুম 'কাকে বলে সংসার, কাকে বলে ধর্ম্ম তার কি জানি মা !—আপনিই জানেন।' মা একটু হাস্লেন।

মা—'কি গরম পড়েছে!' বাতাস খেতে পাখাখানা হাতে দিয়ে বললেন—'আহা! দুটো ভাত খেয়েই ছুটে আস্‌ছ—এখন আমার কাছে একটু শোও।'

মাকে নীচে মাদুর পেতে দিয়েছে। তাঁর বিছানায় শুতে সঙ্কুচিত হচ্ছি দেখে বল্‌লেন—'তাতে কি মা, শোও, আমি বল্‌ছি শোও।' অগত্যা শুইলাম। মার একটু তন্দ্রা আস্‌চে দেখে চুপ করে আছি। এমন সময়ে প্রথমে দুই একটি স্ত্রী-ভক্ত এবং শেষে দুজন সন্ন্যাসিনী এলেন, একজন প্রৌঢ়া অপরটি যুবতী। মা চোখ বুজেই বলছেন্ 'কে গো, গৌরদাসী এলে!' যুবতী বললেন—'আপনি কি করে জান্‌লেন মা'?

মা বল্‌লেন—"টের পেয়েছি!' কিছুক্ষণ পরে উঠে বস্‌লেন। যুবতী বল্‌লেন—'বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। প্রেমানন্দ স্বামিজী খুব খাইয়ে দিয়েছেন, তিনি থাক্‌লে ত না খেয়ে ফির্‌বার উপায় নেই'। যুবতী সিন্দুর পরেন নি দেখে মা তাঁকে একটু বক্‌লেন।

পরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার পরিচয় নিয়ে গৌরী মা একদিন তাঁহাদের আশ্রমে আমাকে যেতে বলে বল্লেন—'সেখানে প্রায় ৫০।৬০ জন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তুমি সেলাই জান?' আমি 'সামান্য কিছু জানি' বলাতে তিনি তাহার আশ্রমের মেয়েদের তাহাই শিখিয়ে আস্‌তে বল্‌লেন।

মায়ের আদেশ নিয়ে গৌরীমার আশ্রমে একদিন গেলাম। তিনি খুল স্নেহ যত্ন করলেন এবং প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা করে এসে মেয়েদের পড়িয়ে যেতে অনুরোধ কল্লেন। বল্লুম—'এই সামান্য শিক্ষা নিয়ে শিক্ষয়িত্রী হওয়া বিড়ম্বনা! ক, খ পড়াতে বলেন ত পারি।' গৌরী মা কিন্তু একেবারে নাছোড়! অগত্যা স্বীকৃত হয়ে আস্‌তে হল।

এক দিন স্কুলের ছুটি হলে গৌরীমার আশ্রম হতে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেলাম। গ্রীষ্ম কাল। সেদিন একটু পরিশ্রান্তও হয়ে ছিলাম। দেখি মা একঘর স্ত্রীভক্তের মধ্যে বসে আছেন! আমি গিয়ে প্রণাম কর্‌তেই মুখ পানে চেয়ে মশারীর উপর হতে তাড়াতাড়ি পাখাখানি

নিয়ে আমায় বাতাস করতে লাগলেন। ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—শীগগির গায়ের জামা খুলে ফেল, গায়ে হাওয়া লাগুক।' কি অপূর্ব্ব স্নেহভালবাসা! অত লোকের মধ্যে এত আদর যত্ন! আমার ভারী লজ্জা করতে লাগ্‌ল—সব্বাই চেয়ে দেখ্‌ছিল। মা নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছেন, দেখে জামা খুল্‌তেই হল। পরে আমি যত বলি পাখা আমাকে দিন্ আমি বাতাস খাচ্ছি—ততই স্নেহ ভরে বল্‌তে লাগলেন—"তা, হোক্ হোক্; একটু ঠাণ্ডা হয়ে নেও।" তারপর প্রসাদ ও এক গ্লাস জল এনে খাইয়ে তবে শান্ত হলেন। স্কুলের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, সুতরাং দু একটী কথা কয়েই সেদিন ফিরতে হল।

১৮ই শ্রাবণ ১৩১৮

আজ সকালে কিছু জিনিস পত্র নিয়ে দীক্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষায় গেলাম। কি কি দ্রব্যের দরকার হয় তা গৌরীমার নিকট জেনে এবং তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম। মায়ের বাটী গিয়া দেখি মা তদ্গত চিত্তে ঠাকুর পূজা করছেন; আমরা যাবার একটু পরে চেয়ে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। পূজা শেষ হলে গৌরী মা আমার দীক্ষার কথা বললেন। পূর্ব্বে মার সঙ্গে একদিন আমারও ঐ বিষয়ে কথা হয়েছিল। মর্ত্তমান কলা নিয়ে গেছি দেখে বল্‌লেন—'এই যে মর্ত্তমান্ কলা এনেছ। (এক জন সাধুর নাম করে) সে কলা খেতে চেয়েছিল, বেশ করেছ।

পরে বললেন—'ঐ আসনখানা নিয়ে আমার বাঁ দিকে এসে বস।' আমি বল্লুম—'গঙ্গা স্নান ত করা হয় নাই।'

মা—'তা হোক্। কাপড় চোপড় ত ছেড়ে এসেছ?' কাছে বসলাম। বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল, কেন কি জানি। মা তখন ঘর হতে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বল্লেন। তারপর জিজ্ঞাসা কল্লেন 'স্বপ্নে কি পেয়েছ বল।' আমি বল্লুম 'লিখে দেব, না মুখে বল্‌ব?

মা—'মুখেই বল' * * *

দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীমা স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্রের অর্থ বলে দিলেন। বল্লেন

'আগে ঐটি জপ করবে,' পরে তিনি আর একটি বলে দিয়ে বললেন 'শেষে এইটি জপ ও ধ্যান কর্‌বে।'

মন্ত্রটির অর্থ বলবার পূর্ব্বে মাকে কয়েক মিনিটের জন্য ধ্যানস্থ হতে দেখেছিলাম। মন্ত্র দিবার সময় আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল ও কেন বলতে পারি না কাঁদতে লাগ্‌লাম। মা কপালে বড় করে একটা রক্ত চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন। শেষে দক্ষিণা চাইলেন।

দীক্ষার সময় মাকে খুব গম্ভীর দেখলাম। পরে পূজার আসন হতে মা উঠে গেলেন। আমাকে বল্লেন—'তুমি খানিক ধ্যান জপ ও প্রার্থনা কর। আমি ঐরূপ করবার পরে উঠে মাকে প্রণাম কর্‌তেই মা আশীর্ব্বাদ করলেন—'ভক্তি লাভ হোক'। সেই কথা মনে করে এখন মাকে বলি দেখো মা, তোমার কথা মনে রেখো, ফাঁকি দিওনা যেন!

শ্রীশ্রীমা এই বার গঙ্গা স্নানে যাবেন—গোলাপ মা সঙ্গে। আমিও মায়ের কাপড় গামছা নিয়ে সঙ্গে গেল্‌ম। স্নানের জন্য মা গঙ্গায় নেমেছেন—এমন সময় অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হল। স্নান করে উঠে ঘাটের পাণ্ডা ব্রাহ্মণকে একটি কলা একটি আম ও একটি পয়সা দিয়ে বল্লেন—"ফল আমি দিলুম বটে, কিন্তু দানের ফল তোমার'। হায়! পাণ্ডা ঠাকুর, জান না কার হাতের দান আজ পেলে! আর কত বড় কথা শুন্‌লে! কোটি কামনায় জড়িত মানুষ আমরা ঐ দেববাণীর মর্ম্ম কি বুঝিব!

আমার কাছ হতে কাপড় খানি নিয়ে প'রে, ভিজে কাপড় খানি আমার হাতে দিয়ে মা বল্লেন—'চল।' গোলাপ মা আগে, মা মধ্যে, আমি পশ্চাতে চললাম। ছোট একটি ঘটিতে গঙ্গাজল নিয়ে মা রাস্তার ধারে প্রতি বটবৃক্ষে জল দিয়ে প্রণাম করে যেতে লাগলেন। মা তখন রাজার ঘাটে স্নান কর্ত্তেন। কারণ নূতন ঘাট (দুর্গাচরণ মুখার্জী ঘাট) তখনও হয় নি। গোলাপ মা ছোট একটি ঘড়ায় গঙ্গাজল নিয়ে এসেছিলেন বাড়ীতে ফিরে উহা ঠাকুর ঘরে রাখ্‌তে গেলেন। মা নীচের কল তলায় চৌব্বাচ্চার কাছে একটা ঘটীতে জল ছিল তাই

দিয়ে পা ধুয়ে আমাকে বললেন—'কাদা লেগেছে ধুয়ে এস।' আমি জল খুঁজছি, দেখে বল্লেন—'ঐ ঘটির জলেই ধোও না।' আমি বললাম "আপনি যে ও জল ছুঁয়েছেন।" মা—'আগে একটু মাথায় দিয়ে নাও, তা হলেই হবে।' আমার কিন্তু মন সরল না, বল্লুম 'তা কি হয়'! আমি আর একটা পাত্র এনে চৌবাচ্চা হতে জল নিয়ে পা ধুয়ে নিলুম। মা ততক্ষণ আমার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে উপরে গিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ দুখানি শাল পাতায় সাজিয়ে নিজে একখানি নিলেন ও আমাকে একখানি দিয়ে কাছে বসে খেতে বল্লেন। আমি প্রসাদ পাবার পূর্ব্বে মায়ের চরণামৃত পাবার আকাঙ্ক্ষা জানাইতে মা বল্লেন—'তবে জালা হতে একটু কলের জল নিয়ে এস' এবং আমি উহা আনিলে পাত্রটি আমাকে হাতে করে ধরে রাখ্‌তে বলে নিজ বাম ও দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জলে দিয়ে কি বলতে লাগলেন বুঝতে পারলুম না; শুধু ঠোঁট নড়্‌তে দেখলুম। শেষে বল্লেন 'নাও, এখন।' আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে উহা পান করলাম। তারপর খাবারের প্রত্যেক জিনিসটি নিজে একটু একটু খেয়ে আমাকে দিলেন।

ক্রমে অনেকগুলি স্ত্রীভক্তের আগমন হল। কাউকেই চিনি না। শুনলুম তাঁরা সকলেই এখানে প্রসাদ পাবেন। ঠাকুরের ভোগের পর আমরা সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম। মাও তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। তিনবার অন্ন মুখে দিয়ে মা আমাকে ডাকলেন এবং আমার হাতে প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করলুম। কি যে একটি সুগন্ধ পেলুম এখনও সেকথা ভাবলে অবাক্ হই। তার পর একে একে সকলের পাতেই মার প্রসাদ বিতরিত হল। গোলাপ মা সকলকে দিয়ে শেষে নিজে খেতে বস্‌লেন। মা এইবার খুব হাসি খুসি গল্প সল্প করতে করতে খেতে লাগলেন। তাই দেখে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। দীক্ষার সময় হতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে যেন আর এক মা মনে হচ্ছিল। সে কি গম্ভীর অন্তর্মুখী, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থা দেবী মূর্ত্তি! ভয়ে জড় সড় হয়ে ছিলাম। পরে কত লোককে দীক্ষা দিতে

দেখেছি, দুচার মিনিটেই হয়ে গেছে, কিন্তু আমাকে দীক্ষা দিবার সময়ে মার যে গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে ছিলাম সেরূপ গম্ভীর ভাব তাঁর আর কখন দেখিনি। কত জনকে হাস্‌তে হাস্‌তে, দাঁড়িয়ে বা ব'সে দীক্ষা দিয়েছেন। তারা খুসী হয়ে তখনই তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। কৌতুহলাক্রান্ত হ'য়ে কাউকে বা জিজ্ঞাসাই করে ফেলেছি "দীক্ষার সময় মায়ের কেমন রূপ দেখ্‌লেন?" একটি বিধবা স্ত্রীভক্ত আমার ঐ প্রশ্নে বলেছিলেন "এই এম্নিই। আমি পূর্ব্বে কুল-গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম—পরে মায়ের কথা শুনে এখানে দীক্ষা নিতে এসেছি। মা আমাকে পূর্ব্বে গুরু যেটি দিয়েছেন সেটি রোজ প্রথমে দশবার জপ করে নিতে বল্লেন—পরে নিজে যেটি দিয়েছেন—সেইটি দিয়ে ঠাকুরকে দেখিয়ে বল্লেন—উনিই গুরু, উনিই ইষ্ট, আর এই বলে প্রার্থনা কর্‌তে বল্লেন যে, 'ঠাকুর আমার পূর্ব্ব জন্মের ইহজন্মের কুকর্ম্মের ভার তুমি নাও' ইত্যাদি। আমার কি হয়েছে বলুন ত, যখনই জপ কর্ত্তে বসি, আধ ঘণ্টার বেশী জপ কর্ত্তে পারি নে, কে যেন ঠেলা দিয়ে তুলে দেয়। আপনাদের এমন হয়? ভাবি মার কাছে কত কথা বলি—কিছুই বল্‌তে পারি নে। আপনারা ত বেশ মায়ের সঙ্গে কথা বল্‌তে পারেন। মা কি আমাকে ফাঁকি দিলেন।" আমি কিন্তু অত কথা জান্‌তে চাইনি, স্ত্রীলোকটি প্রায় প্রৌঢ়াবস্থা—সরল ভাবে নিজেই বলে যাচ্ছেন। আমি বল্লুম—'যা আপনার ইচ্ছা হবে, মায়ের কাছে বলুন না, দুচার দিন বল্‌তে বল্‌তে সহজ হয়ে আস্‌বে। আমরাও প্রথম প্রথম অত কথা বল্‌তে পারি নি। এখনও এক এক সময় এমন গম্ভীরভাব ধারণ করেন, কাছেই এগুণো যায় না।' আহারের পর বিশ্রাম করে বৈকালে গৌরীমার সহিত তাঁর আশ্রমে এলাম।

* * * *

কলিকাতা মার বাটী—স্কুলের কাজের জন্য শীঘ্র আর মায়ের কাছে যেতে সময় পাইনি। অনেকদিন পরে আজ আবার মায়ের পদপ্রান্তে গিয়ে বসতেই মা কত আদর করতে লাগলেন! ভূদেব মহাভারত পড়্‌ছিল। ছেলে মানুষ, পড়্‌তে দেরী হচ্ছিল, মাকে এখন শীঘ্র উঠ্‌তে হবে, কারণ,

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। সেজন্য তিনি ভূদেবকে বল্‌লেন—'একে দে, এ জলের মত পড়ে দিবে এখন, এ অধ্যায় শেষ না করে ত উঠ্‌তে পার্‌ব না।" মায়ের আদেশে মহাভারত পড়তে বসলাম। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও মায়ের কাছে পড়িনি। কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। যা হোক কোন প্রকারে অধ্যায় শেষ হল। মহাভারতকে মা হাত জোড় করে প্রণাম করে উঠে পড়্‌লেন এবং আমরা সকলে ঠাকুর ঘরে আরতি দেখতে গেলাম। মা নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়ে জপে বসিলেন।

জপান্তে হরিবোল্ হরিবোল্ করে উঠে ঠাকুর প্রণাম করে সকলকে প্রসাদ দিলেন। কথায় কথায় কর্ম্মের কথা উঠিল। মা বলিলেন—"সর্ব্বদা কাজ করিতে হয়। কাজে দেহ মন ভাল থাকে। আমি যখন আগে জয়রাম বাটী ছিলুম, দিন রাত কাজ কর্‌তুম। কোথাও বা কারো বাড়ী যেতুম না। গেলেই লোকে বল্‌ত—'ও মা শ্যামার মেয়ের ক্ষ্যাপা জামাইএর সঙ্গে বে হয়েছে।' ঐ কথা শুনতে হবে বলে কোন খানে যেতুম না। একবারে সেখানে আমার কি অসুখই করেছিল—কিছুতে সারে না। শেষে মা সিংহবাহিনীর দুয়ারে হত্যা দিয়ে তবে সারে। বড় জাগ্রত দেবতা, সেখানকার মাটী কৌটায় করে রেখেছি। নিজে খাই এবং রাধুকে রোজ সেই মাটি একটু খেতে দেই।

মায়ের বাটীর সামনের মাঠে নানা দেশের কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ বাস করে। নানা প্রকার কাজ করে তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তার মধ্যে এক জনের উপপত্নী ছিল, উভয়ে একত্রেই বাস করিত। ঐ উপপত্নীর কঠিন পীড়া হয়েছিল। মা ঐকথার উল্লেখ করে বল্‌লেন—'কি সেবাটাই করেছে মা, এমন দেখিনি! একেই বলে সেবা, একেই বলে টান', বলে ঐরূপে তার সেবার কতই সুখ্যাতি কর্‌তে লাগ্‌লেন। উপপত্নীর সেবা! আমরা উহা দেখ্‌লে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌তুম সন্দেহ নাই। মন্দের মধ্য হতেও ভালটুকু যে নিতে হয়, তাকি আর আমরা জানি!

এই সময়ে সামনের মাঠের ঘর হতে একটি দরিদ্রা হিন্দুস্থানী নারী তার রুগ্ন শিশুটিকে কোলে করে মায়ের আশীর্ব্বাদ নিতে এল।

তার প্রতি মায়ের কি দয়া! আশীর্ব্বাদ কল্লেন—'ভাল হবে।' তারপর দুটো বড় বেদানা ও কতকগুলি আঙ্গুর ঠাকুরকে দেখিয়ে এনে তাকে দিতে বল্লেন। আমি মায়ের হাতে ঐগুলি এনে দিলে মা সেই নিঃস্ব রমণীটিকে দিয়ে বল্লেন—'তোমার রোগা ছেলেকে খেতে দিও।' আহা! সে কতই খুসী হয়ে যে গেল! বার বার মাকে প্রণাম করতে লাগল।

২৮শে মাঘ ১৩১৮—আজ মায়ের কাছে গিয়া প্রণাম করে বসতেই মা আক্ষেপ করে বল্লেন—"আহা, গিরীশ বাবু মারা গেছেন—আজ চারদিন, চতুর্থীর কাজ, আমায় নিতে এসেছিল। সে নেই—আর কি সেখানে যেতে ইচ্ছা করে, আহা, একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল! কি ভক্তি বিশ্বাসই ছিল। গিরীশ ঘোষের সে কথা শুনেছ? ঠাকুরকে পুত্রভাবে চেয়েছিল। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন 'হাঁ, বয়ে গেছে আমার তোর ছেলে হয়ে জন্মাতে!' তা, কে জানে মা, ঠাকুরের শরীর যাবার কিছুকাল পরে গিরীশের এমন একটি ছেলে হল, চার বছর বয়স হয়েও কারু সঙ্গে কথা বলে নাই! হাবভাবে সব জানাত। ওরা ত তাকে ঠাকুরের মত সেবা কর্ত। তার কাপড় জামা, খাবার জন্য রেকাব, বাটী, গেলাস, সমস্ত জিনিস পত্র নূতন করে দিলে—সে সব আর কাউকে ব্যবহার কর্তে দিত না। গিরিশ বলত 'ঠাকুরই এসেছেন!'—তা ভক্তের আব্দার, কে জানে মা! একদিন আমাকে দেখ্বার জন্য এমন অস্থির হল যে, আমি উপরে যেখানে ছিলুম—সকলকে টেনে টেনে সেই দিকে 'উ উ' ক'রে দেখিয়ে দিতে লাগ্ল। প্রথমে কেউ বোঝে নাই। শেষে বুঝ্তে পেরে আমার কাছে নিয়ে গেল, তখন ঐটুকু ছেলে, আমার পায়ের তলে পড়ে প্রণাম কর্লে! তার পর নীচে নেমে গিরীশকে ধরে টানাটানি—আমার কাছে নিয়ে আস্বে বলে! সে ত হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে 'ওরে, আমি মাকে দেখ্তে যাব কি—আমি যে মহাপাপী!' ছেলে কিন্তু কিছুতে ছাড়ে না। তখন ছেলে কোলে করে কাঁপ্তে কাঁপ্তে, দুচক্ষে জলধারা, এসে একেবারে আমার পায়ের তলে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ে

বল্লে—'মা এ হতেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন হলো আমার!'* ছেলেটি কিন্তু মা চার বছরেই মারা গেল।"

"ঐঘটনার আগে এক দিন গিরীশ ও তার পরিবার তাদের বাড়ীর ছাতে উঠেছিল। আমি তখন বলরাম বাবুর বাড়ীতে, বিকেল বেলা ছাতে গেছি। গিরীশের ছাত হতে তাকালে যে দেখা যায়, সেটা আমি লক্ষ্য করি নি। পরে তার পরিবারের কাছে শুনলুম, সে গিরীশকে বলেছিল "ঐ দেখ, মা ও বাড়ীর ছাতে বেড়াচ্চেন!" গিরীশ ঐ কথা শুনে অম্‌নি তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল "না না, আমার পাপনেত্র, এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখ্‌ব না"—বলে নীচে নেবে গিছিল।

সাধনা ও তাহার ক্রম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জগৎময় সর্ব্বত্র ব্রহ্ম—নিত্য পদার্থ; তবে আবার ব্রহ্ম নিরূপণ কি? অজ্ঞানই বা কোথা হইতে আসিল? অনন্ত অনন্তকে অনন্তানন্ত ভাবে অনন্তানন্তাস্বাদ করিতেছেন, অর্থাৎ যেখানে সর্ব্বথা পূর্ণ পরমানন্দের অভাব সেখানে তাহারই পূরণ চেষ্টা, অতএব অজ্ঞান কোথাও নাই সকলই জ্ঞানময়।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়াছেন অজ্ঞানকে ডাকিয়া আনিয়া বিচার ব্যবধান ঘটিয়াছে। ব্রহ্ম বিচার্য্য নহেন, অব্যয় নিত্য, অনুভূতি গোচর, উহা আস্বাদের সামগ্রী—আবার বিচার্য্যও বটেন যেখানে বিচারের অভাব আছে।

"কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে
দে মা আমায় পাগল করে"

---

* মা তখন বরানগর কুটীঘাটা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ভাড়াটে বাটীতে ছিলেন।

"অভিমানে ঘেরা রে তুই অভিমানে ঘেরা
অভিমান নিয়ে যে তোর ভবে ঘোরা ফেরা
কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত জগৎ
কর্ম্মময় মোর এ জীবন
কর্ম্মভোগ করে না আশ্রয় ।
বিধির বিধানে বাঁধা সব
সে বন্ধন নিজ গলে যে লয় তুলিয়া সেই সব
মুক্ত জীব শিব নাম ধরে
তবে বল তুমি সকাতরে
করুণা মাগিবে কার তরে ।
জটিল জঞ্জাল জ্ঞানে কুটিল করমরে
প্রণারাম প্রাণারাম রাম রাম রাম রে ।"

ভয়ে ভক্তিতে, বুঝিয়া না বুঝিয়া ঈশ্বর মানিয়া লওয়া ঈশ্বর নিরূপণ নহে, ঈশ্বর আঁধার ঘরের সাপ নহেন। যে অনুভূতির দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয়, চরাচর বিশ্বে সর্ব্বত্র যাঁহার বিভূতি বিরাজিত, যাঁহার জ্যোতিঃ কেবল জ্ঞান গম্য; ব্রহ্ম নিরূপণে সেই জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয়। এই জ্ঞান চক্ষু বা তৃতীয় নেত্র (Third Eye) প্রকৃতি ভেদ করিয়া অপ্রাকৃত পদার্থে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ও ক্রমে দৃষ্টি পরিমার্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। ব্রহ্ম জ্যোতিঃ অর্থাৎ (চিৎভাগ ও আনন্দভাগ)। জড় দ্বারা জড় সাধন, জ্ঞান দ্বারা চৈতন্য সাধন, ও পরবৈরাগ্য দ্বারা আনন্দ সাধন। যাহা অস্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রহিয়াছে বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাই সৎভাগ। যাহা জ্ঞান গম্য ও শুদ্ধজ্ঞানে প্রতিভাত বা স্পন্দিত হইতেছে, যাহা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের আশ্রয় তাহাই চৈতন্য। যাহা জ্ঞানাতীত ও বৈরাগ্য সূত্রে গ্রথিত তাহাই আনন্দ (ব্রহ্ম)।

"প্রজ্ঞামানন্দং ব্রহ্ম" ঋক্‌বেদের মহাবাক্য—

হলনা হলনা জ্ঞান উপার্জ্জন।
হলনা আমার বৈরাগ্য সাধন

বিধি বিড়ম্বনা পাপ আবরণ
নিত্য সহচর অভিমান ধন ।
ঢুর্ল্লভ জীবন মানব রতন
ঘুমায়ো না আর হয়ে অচেতন
উঠ উঠ ভাই ডাকিছে কাতরে
থেক না ডুবিয়া বিস্মৃতি সাগরে
মায়া মোহ সব মিছা আবরণ
কেন ভাব তাহা তোমার বন্ধন
নেচে নেচে গোরা ডাকে তোরা আয়—
গোরা রূপে মোরা মজিব সবায় ।
গোরা হারা হয়ে পথ হারা ভাই
পথে পথে পথে গোরা গুণ গাই
গৌর নিতাই গৌর নিতাই গৌর নিতাই
করে সাধন ।

জ্যোতিঃ-দর্শন

জড়ের সাহায্যে জড় সাধনায় জড় জগতে জীবের যে চরম গতি লাভ হয় তাহা বলা হইয়াছে । That is the highest development of duties in life through truth alone.

এই জড় সাধনের চরম উৎকর্ষতায় চেতনার উদ্রেক হয় বা জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয় । তখন চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ চৈতন্যাভিমুখী হয় ও জড়াতিরিক্ত চেতনার স্পন্দন অনুভূত হইতে থাকে । জীব তখন আত্মহারা হইয়া মধুচক্রে ফিরিবার অর্থাৎ মুমুক্ষুত্ব প্রাপ্ত হয়েন । চৈতন্য স্নেহ পদার্থ তাহা তরলতা ময়, করুণা দয়া ভক্তি স্নেহ প্রেম সেবা ইত্যাদি আশ্রয় দ্বারা আত্মাভিমান বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; আত্মাভিমান আমূল বিনষ্ট হইলে চিৎ জগতের আচরণ হৃদয়ঙ্গম হয়, হৃদয় ও মন বিকাশ প্রাপ্ত হইলে নবরাজ্যে অমর জগতে বিচরণশীল হওয়ায় অভ্যাস ও তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরে অমরত্ব হইতে অমর তত্ত্বে উপনীত হইলে আত্মাভিমান বিমুক্তে ও সচ্চিদাভিমান প্রযুক্তে আমি অমৃতের

সন্তান এই মহান বিশাল সাম্রাজ্যের একাধিপত্য নিজস্ব অনুভূত হওয়ায় প্রতি বস্তুর বস্তুত্বের সহিত নিজ বস্তুত্বের (চৈতন্যের) সম্মিলন দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির আড়ালে ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ, খোসার অভ্যন্তরে শাঁস বা সার প্রাপ্ত হই। ঐ শাঁস বা চৈতন্যের আস্বাদন দ্বারা অফুরন্ত অনন্ত ব্রহ্মজ্যোতিঃ অধিকার ভেদে যাহার যেমন আধার যিনি যে প্রকার উপাদানে গঠিত তিনি তাহার অনুকূল ব্রহ্মরস, পান করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে থাকেন। উচ্চাধিকারী ঐ সকল জ্যোতিঃ আয়ত্ব করিলে সমজীবে পরিবেশন করতঃ অপার আনন্দ সাগরে সন্তরণশীল হইয়া পারের ভেলা বা গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নিম্নাধিকারী চৈতন্য রসামৃত সমাহিত হইয়া অব্যক্ত আনন্দ দর্শন শ্রবণ আঘ্রাণ আস্বাদন আদিতে আপ্লুত ও বিপ্লুত হয়েন।

ব্রহ্মস্বরূপোলব্ধি

ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে সেই মূলীভূত অবিনাশী সত্তাই ব্রহ্ম। আর ব্রহ্ম হইতে বিকাশ প্রাপ্ত পঞ্চভূত ও যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্ম ভূতনাথ, ভূতভাবন, অভূত। সেই অভূত অন্তরঙ্গ প্রাণারাম প্রাণেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি বহুকালব্যাপি নিঃসঙ্গ প্রেম ও বৈরাগ্যসূত্রে গ্রথিত। সেই সচ্চিদানন্দ রস শেখরের সরস-সদ্ভাব লেখনী আয়ত্ত নহে। শব্দানুস্মরণ দ্বারা ধ্যানযোগে ব্রহ্ম সম্বন্ধ ঘটে, যেহেতু শব্দ ব্রহ্ম।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ লভে নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥
তজ্জপস্তদর্থভাবনম্॥ পাতঞ্জল দর্শন।

চৈতন্যের উদ্রেক

এবম্বিধ সম্বন্ধ চেতনাময়, চৈতন্য-সম্বদ্ধ জীব অচৈতন্য থাকিতে পারে না; সম্বন্ধ অচ্যুত থাকিলে চেতনার বিপর্য্যয় না ঘটিলে, চৈতন্য উদ্গত থাকেন তখন জীব জাগ্রত হয়েন স্বরূপে অর্থাৎ আনন্দময়তায় নিমগ্ন থাকেন ও প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন; প্রাকৃতিক বা ভৌতিক

সন্তাপ আর তাঁহাকে তপ্ত করিতে পারে না কারণ তখন স্বভাবে অবস্থান করেন—অভাবে নহে।

প্রকৃতির বন্ধন ছেদন

জীবের দ্বিবিধা সত্তা রহিয়াছে—একটি ব্যবহারিক সত্তা অপরটি তাত্ত্বিক সত্তা বা বাস্তব সত্তা। ঐ ব্যবহারিক সত্তার সহিত প্রকৃতি সম্বন্ধ; বাস্তব সত্তা প্রকৃতি বহির্ভূত। ব্যবহারিক সত্তাটি ব্যবহার সংযোগে প্রাকৃতিক সাধারণ অষ্টপাশ দ্বারা আবদ্ধ। জীব অনাদি অবিদ্যাবসে আপনাকে আপনি এই অষ্টপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়াছেন।

প্রকৃতির আহ্বানে পুরুষ অপৌরষেয় ইচ্ছা শক্তি দ্বারা বিড়ম্বনার সৃষ্টি ও নাশ করিয়া চলিয়াছেন। To creat obstacle and to remove it is the highest pleasure in the universal willfulness.

অষ্টপাশ

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, সংশয়, সন্দেহ, কুল, শীল ও মান।

"যদি দাগাবাজি ছাড়ি—
হরি পেলেও পেতে পারি।"

পূর্ণ সরলতা, সমভাব ও সমজ্ঞান পাশবদ্ধ জীবের আয়ত্ত নহে। প্রকৃতির বন্ধন ছেদন হইলে জীবের অবস্থাগত অধীনতা থাকে না, তখন জীব স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন। মূলে কর্ম্ম,—কর্ম্ম দ্বারাই বন্ধনের সৃষ্টি ও নাশ ঘটিয়া থাকে। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।

দুঃখের নাশ

এবম্বিধ অবস্থায় আত্মা (জীব) দুঃখ লেশশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, সেই হেতু দুঃখ নাশ বলা যায়। বিষয় বিবর্জ্জিত চিত্ত ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া জ্ঞানের সাহায্যে (জ্ঞান বা চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া) বিবেক বৈরাগ্য প্রসূত ধ্যানজ প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত থাকায় বিষয় সংস্পর্শ করিতে পারে না। বিষয় সংস্পর্শে না থাকিলে দুঃখের ও হেতুর অভাব থাকে কাজেই দুঃখ নাশ হওয়া সম্ভব হইল।

এতদবস্থায় অচ্যুত প্রজ্ঞাই সিদ্ধি নামে অবিহিত হয়েন। আকাঙ্ক্ষিত স্থান কাল ও পাত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থা প্রাপ্তির নামই সিদ্ধি।

মোটামুটি সকল শাস্ত্রেই ব্রহ্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

(সৎ+চিৎ+আনন্দ) কাজেই সিদ্ধিও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন।

জড় সিদ্ধি, চিৎসিদ্ধি ও আনন্দ সিদ্ধি।

১। অনিমা, লঘিমা, মহিমা, ব্যাপ্তি প্রাকাম্য বশিত্ব ঈশিত্ব ও যত্রকামবসাইত্ব। এই অষ্ট সিদ্ধি বা ইহার যে কোনও একটি সিদ্ধি যাহা দেহ মন ও বুদ্ধির সাহায্যে সম্পন্ন বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জড়সিদ্ধি বা ভূত সিদ্ধি।

২। চিত্ত যখন জড় সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয় তখন চৈতন্য সান্নিধ্য চিত্ত চৈতন্য স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানযোগে ঐশী শক্তি লাভ করেন অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ জ্ঞান শ্রী বৈরাগ্য লাভ দ্বারা চৈতন্যাঙ্গীভূত হইয়া চিৎসিদ্ধি লাভ করেন।

৩। নিঃসঙ্গ ব্রহ্মোপলব্ধি হইতে ও ব্রহ্মোপলব্ধিতে স্থিতি দ্বারা বিবেক বৈরাগ্যাতুর পরমানন্দে স্থিতিই আনন্দ সিদ্ধি।

(সমাপ্ত)

—শ্রীতারিণীশঙ্কর সিংহ।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী

এই সময় নরেন্দ্রনাথ বলরাম বাবুর বাটীতে প্রায় থাকিতেন। সকলেরই সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা হাসি-তামাসা করিতেন। কিন্তু এক এক সময় এমন গম্ভীর ও চিন্তান্বিত হইয়া উঠিত যে, তাহার মুখের তেজ চক্ষের দৃষ্টি, ও ভাবভঙ্গী সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই কার্য্য ব্যপদেশে গৃহটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। নরেন্দ্র তখন একটি ঘরে একাই বসিয়া থাকিতেন, নিজ মনে নিজেই কখনও পড়িতেছে, কখনও শূন্য

দৃষ্টিতে রহিয়াছেন, কখনও বা ডানহাতের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া কাহাকে যেন কিছু বলিতেছেন, কখনও বা নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া সতেজে কোন ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কখনও বা নিজের বিজয় হইল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বিধ্বস্ত হইল এইরূপ ভাবে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, কখনও বা বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেন অস্পষ্টস্বর কিছু বুঝা যাইত না। আমি যদিও ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহটি ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলাম, (কিন্তু পুনঃ পুনঃ দেখিতে এত ভাল লাগিত যে অলক্ষিতভাবে আড়নয়নে মাঝে মাঝে দেখিতাম) এবং চিন্তার বিঘ্ন না হয় এইজন্য খুব সাবধানে দূর হইতে দেখিতেছিলাম। এই সময় নরেনের মন বড় উদ্বিগ্ন ছিল। একটা মহাবিজয় করিবেন না হয় দেহ রাখিবেন—না কি যে তাঁর মনে চিন্তাতরঙ্গ উঠিতেছিল, তিনি নিজেই কেবল বুঝিতেন, আমরা তাঁর ভাবভঙ্গি দেখিয়া অল্পমাত্র অনুভব করিতে পারিতাম। এই গল্পটি তুলসীরাম বাবু অর্থাৎ বাবুরাম মহাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট শুনিয়াছিলাম। পূজ্যপাদ গিরিশ বাবু এই সময়ে একটি কথা উল্লেখ করিতেন "একদিন সকালে নরেন্দ্র আসিয়া বসিল, বিভোর, কি যেন একটা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, দেহের কোন হুঁস্ নাই, জগৎকে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না, তাহার চেহারা ও মুখের ভাব দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম, কোন কথা কহিতে পারিতেছিলাম না, নরেন আসিয়া রাস্তার দিকের দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিতে আরম্ভ করিল— 'দেখ জি, সি, আমার ভগবান লাভ করা হইল না। আমি সব ত্যাগ করেছি, আমি সব ভুলেছি, কিন্তু ঐ দক্ষিণেশ্বরের পাগ্‌লা বামুনটাকে ভুল্‌তে পারি না। ওই যত আমার কণ্টক হয়েছে, গিরিশবাবু ভক্তলোক, তাঁহার পক্ষে গুরু বিস্মৃত হওয়া অতি কষ্টকর কথা, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এমন উচ্চ অবস্থা থেকে কথা কহিতেছিলেন যে গিরিশবাবু বলিতেন "আমি তার কিছুই জবাব করিতে পারিলাম না এবং তাহার কত উচ্চ অবস্থা তা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না ; যা হোক আমি চুপ করে রহিলাম"।

মহাপুরুষদিগের প্রসঙ্গ অতি তুচ্ছ হলেও তাহার ভিতর এত মাধুর্য্য ও

মহত্ত্ব থাকে যে পরবর্ত্তী লোকেরা তাহা সাগ্রহে শ্রবণ করে। এইজন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা এইখানে সন্নিবেশিত হইল। নরেন্দ্রনাথ, কালী (বেদান্তী) ও হরি মহারাজ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা ও বিচার করিতেন। বড় ঘরটি যেন একটা তেজে সদাসর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত, জপ ধ্যান ও বিদ্যাচর্চ্চা অনবরতই চলিতেছিল, এই সময় নরেন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারত এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্যের বিষয় কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। শিবানন্দ স্বামী কঠোর জপ ধ্যান করিতেন, চক্ষু ঢুলু ঢুলু বিভোর, মাঝে মাঝে হাসিতেন। তিনি তখন বড় কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন, মাইকেলের কথাবার্ত্তা শুনিয়া একদিন তাঁহার মনে খেয়াল হইল "বাংলা ভাষার সংস্কার করিতে হইবে" তিনি আরম্ভ করিলেন, "দ্যাখ্, বাংলা ভাষায় একটি ক্রিয়াপদের সহিত দুই তিনটি শব্দ সংযোগ না করিলে ক্রিয়া হয় না। ওরূপ চলিবে না। অন্যশব্দ সংযোগ না করিয়া একটি-মাত্র ক্রিয়াপদেতেই ভাব প্রকাশ পাইবে। তিনি দাঁড়াইয়া কোমর কিঞ্চিৎ সাম্‌নের দিকে বক্র করিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী সাম্‌নে চালিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেন, ইংরাজীতে হয়, বাংলায় হবে না কেন? এক কথায় ক্রিয়াপদ করিতে হইবে। একজন কৌতুক করিয়া বলিল, "মহাপুরুষ, আলুর দম, কর্‌তে হবে। এটা এক কথায় কি করে হবে?" তিনি মৃদু মৃদু হাঁসিয়া বলিলেন, "কেন, বল্‌বে আলুটা—দমিয়ে দাও। দাঁড়াও, দাঁড়াও, লুচি ভাজ্‌বে কথাটা এক কথায় কর্‌তে হবে। আচ্ছা, লুচিটা লুচ্চাইয়া দাও।" এই বলে নিজে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন—"আরে, ছি-ছিঃ এযে বেথাপ্পা হয়ে গেল, এক আধটা চল্‌বে না।" আর সকলেই বিদ্রূপ করিয়া আরম্ভ করিল—"মহাপুরুষ তামাকটা তাম্‌কাইয়া দিবেন। সম্মুখে গুপ্ত বসিয়াছিল, "ওরে গুপ্ত, তামাকটা তাম্‌কাইয়া দে না" (অর্থাৎ তামাকটা সেজে খাওয়ানা একটু) এই সকলের হাস্য কৌতুক সুরু হইল।

একটি সামান্য কথা বা কার্য্য যদি প্রাণের ভিতর থেকে হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা চিরকাল স্মরণ থাকে এই নিমিত্ত একটি সামান্য

ঘটনা এখানে বিবৃত করিলাম, বরাহনগর মঠের প্রথম সময়েতে নরেন্দ্রনাথের এক সময়ে বড় পেটের অসুখ করে, কিছুই পেটে হজম হয় না, অনবরত পেট নামাইতেছে। শরৎ মহারাজের পিতার একটি ডাক্তার খানা ছিল। বৌবাজারের Imperial Druggists Hall উঁহারই পিতার ছিল। তখন নূতন ঔষধ বলিয়া শরৎ মহারাজ Fellow's syrup এক শিশি আনিয়া নরেন্দ্রনাথকে রামতনু বসুর বাটীতে দিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন বাটীতে ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয় তখন Government Stationery office এ সামান্য কেরাণী ছিলেন। অবস্থা টানাটানি কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আফিসের ফেরত সন্ধ্যার সময় একটি হাঁড়ি করিয়া নূতন বাজার হইতে মাগুর মাছ লইয়া গেলেন; জিনিসটা অতি সামান্য হইলেও এত প্রগাঢ় ভালবাসা হইতে সান্যাল মহাশয় দিয়া গিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান লেখকের অদ্যাপিও স্মরণ আছে।

একদিন বলরাম বাবু বোসপাড়ার বাড়ীতে সিঁড়িতেউঠিয়া ডানদিকের ছোট ঘরটিতে বসিয়া আছেন; মাঝে একটা টেবিল, পশ্চিমদিকে একখানা তক্তপোষ পাতা তাহাতে নরেন্দ্রনাথ একটি ছোট হুকাতে তামাক খাচ্ছেন যোগেন মহারাজ নিরঞ্জন মহারাজ সম্ভবতঃ কালী বেদান্তী এদিক ওদিকে রয়েছে। গর্ম্মি কাল বেলা ৯টা ৯॥টা হবে, বলরাম বাবু আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—"এই যে তোমরা স্বামী মহারাজ রয়েছ, তোমরা পরমহংস মহাশয়ের কাছে গেলে, আমিও গেলুম, তোমরা তখন অনায়াসে গৃহত্যাগ কর্‌লে, সন্ন্যাসী হলে, জপ ধ্যান নানা প্রকার কচ্ছ, আর অল্প দিনের ভিতর কত উন্নত হয়ে যাচ্ছ, আর আমি যা বদ্ধ জীব ছিলাম, তাহাই রহিয়াছি, আমার কিছুই হলো না।" এইরূপ অনেক খেদ করিতেছেন, ও নরেন্দ্রনাথের কাছে মনের কষ্ট জানাইতেছেন। নরেন্দ্রনাথ ছোট হুকোটি ডান হাতে লইয়া তামাক টানিতে টানিতে বাম পায়ের উপর ডান পা রাখিয়া ঝুকিয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বড় বড় চক্ষু গম্ভীরভাবে বলরাম বাবুরদিকে ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ছাখ বলরাম, তোমরা তিন পুরুষ ধরে যে সন্ন্যাসী বৈরাগী বৈষ্ণবসেবা করে আস্‌তেছ, সেই পুণ্যের ফল কি ক্ষয় হবার। এই পুণ্যের ফলে তুমি এত বড়

মহাপুরুষের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিবার অধিকার পাইলে, ইহাই তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুণ্যের ফলে হইয়াছে, ইহাই তোমার বংশের গৌরব থাকিবে। তোমার ত্যাগ বৈরাগ্যের কোন আবশ্যক নাই, কঠোর তপস্যারও কোন আবশ্যক নাই। এই পুণ্যের ফলেতে এতবড় মহাপুরুষের সেবা কচ্ছ, এতবড় মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছ। জানত তিনি তোমার বাড়ী এসে থাক্‌তে ভাল বাস্‌তেন এবং তোমার জিনিস আদর করিতেন। আর তুমি কি স্বর্গ মুক্তি চাও। ইহাই ত পর্য্যাপ্ত হয়েছে"। কথাগুলি গম্ভীর ও তেজে কহিতে লাগিলেন এবং নূতনদিক্‌ দিয়া শেষে দেখাইলেন যে, জপ ধ্যান তপস্যা করাও যা, আর বলরামবাবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে যে সেবা করেছিলেন তা দুইই এক। নূতনভাব দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও বলরামবাবুর লোকেরা গিয়া মহা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে আর আনন্দ ও হাসি ধরে না। তিনি নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা না হলে, হে নরেন, তোমায় চাই কেন"। সেইদিন উপস্থিত সকলের ভিতর মহা একটা আনন্দস্রোত উঠিল এবং কথাটা মুখে মুখে অনেক দূর চলিয়া গেল।

রাখাল মহারাজ এই সময় বলরাম বাবুর সহিত কোঠার ভদ্রক ও পুরী গমন করেন। এইটি হচ্ছে তাঁর প্রথম পুরী যাত্রা। ফিরিয়া আসিবার সময় আবলুস্‌ কাঠের একটা গাট্টাদার নলচে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক রকম কাজ করা ছিল। রাখাল মহারাজ এই নলটি লইয়া রামতনু বসুর গলির বাটিতে নরেন্দ্রনাথকে দিয়া তামাক খাওয়াইলেন। নরেন্দ্রনাথ পাইয়া খুব খুসী। তারপর বলরামবাবুর বাড়ীতে রাখাল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"কি রে তুই পুরী গেছিলি জগন্নাথ দেখ্‌লি?" রাখাল মহারাজের বয়স তখন অল্প, জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভাবাবেশ হওয়ায় তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ রাখাল মহারাজকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য উলটো দিকে কথা কহিতে লাগিলেন—"কিরে শ্যালা, জগন্নাথের বড় বড় থস্তালের মত চোক দেখে তুই নাকি ভয়ে কেঁদে

ফেলেছিলি? দেখ এ রকম চোখ না?" এই বলিয়া নিজে মুখভঙ্গি করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। "তুই ভয় তরাসে তাইতো কেঁদে ফেল্‌লি" ইত্যাদি বলিয়া আমোদ ও কৌতুক করিতে লাগিলেন। গুড়গুড়ির কথা উল্লেখ করিবার এই প্রয়োজন যে, রাখাল মহারাজের তখন তীব্র বৈরাগ্য, কোন জিনিস চাওয়া বা গ্রহণ করিতেন না। অধিকাংশ সময় মৌনাবলম্বন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া জপ করিতেন। বিশেষ আবশ্যক না হইলে বড় কথা কহিতেন না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি এত ভালবাসা ছিল যে তিনি নিজে কোন জিনিস গ্রহণ না করিলেও নরেন্দ্রনাথের জন্য আবলুসের কাঠের একটি গুড়গুড়ি তৈয়ারি করিয়া নিজে উপহার স্বরূপ আনিয়াছিলেন।

বাবুরাম মহারাজ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। তখন তাঁহার অর্থাৎ ১৮৮৬ বা ১৮৮৭ সালে বয়স অল্প, পাতলা দেখতে ফ্যাকাসে ফরসা। বড় ভাল মানুষ। তিনি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বাধাবাসি বাধাবাসি বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। আর একটু ভাবাবেশ হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন; এইজন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ভেপু বলিয়া ডাকিতেন অর্থাৎ সব সময় যেন বেজেই আছেন? বাবুরাম মহারাজ মাছ মাংস খাওয়ার বড় বিরোধী ছিলেন এবং যাঁহারা খাইতেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন। একদিন বাবুরাম মহারাজ বড় ঘরটিতে একপাশে শুয়ে আছেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন— "হ্যারে শ্যালা তুই মাছ খাসনি বলে বড় সাধু হয়েছিস্ আর ওরা মাছ খায় বলে ওদের ঘেন্না করিস্, দাঁড়া আজ তোর চোক গেলে দেবো"। ভয়েতে বাবুরাম মহারাজের ঘুম ভেঁঙে গেল, তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং পরনিন্দা করিয়াছেন, অপরাধ করিয়াছেন তাই সকলের কাছে মনে মনে ক্ষমা চাইলেন। সকলে তখন নিদ্রিত ছিলেন পাছে নিদ্রা ভঙ্গ হয় কাহাকেও জাগ্রত করিলেন না। অবশেষে পায়খানার দিকে যাইতে যে ছোট ঘরটি (সেখানে নর্দ্দমার দিকে কখনও বা মাছকোটা হইত) অন্ধকারে সেখানে হাত বুলাইয়া মাছের আঁস বা

তৎস্পৃষ্ট মৃত্তিকা বা যাহাই হউক তিনি তুলিয়া জিহ্বায় দিলেন আর স্থির করিলেন যে মাছ খাওয়ার বিরুদ্ধে আর কখন কিছু বলিব না। তার পর পুনরায় তিনি গিয়া শুইয়া রহিলেন এবং পর দিবস ও তাহার কয় দিবস পর পর্য্যন্ত তিনি এই ব্যাপারটি সকলকে বলিয়া নিজের মন বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

লাটু মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"এই সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী 'নহবতে' থাকিতেন।" * * * তিনিও বালক লাটুকে দেখিয়া সঙ্কুচিতা হইতেন না ; বরং তাহার দ্বারা জল আনা ময়দা ঠাসা, বাজার করা প্রভৃতি ছোট খাট কাজ গুলি করাইয়া লইতেন। শ্রীযুক্ত লাটুও সানন্দে উহা সম্পন্ন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

এইরূপে দিন যায়। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন রাম বাবুর নিকট শ্রীযুক্ত লাটুকে নিজের কাছে রাখিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে রামবাবু এবং লাটু উভয়েই সানন্দে স্বীকৃত হওয়ায় শ্রীযুক্ত লাটু সেই দিন হইতেই ঠাকুরের নিকট থাকিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে এইরূপে ইনিই সর্ব্বপ্রথম গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর সেবায় মনপ্রাণ অর্পন করেন।"

শ্রীযুক্ত লাটু শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিবার কিছু দিন পরেই তিনি তাঁহাকে মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও তৎ-প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ করেন এবং বহু যত্নে সাধন সম্বন্ধীয় শিক্ষাদি দিতে থাকেন। ফলে, শ্রীযুক্ত লাটু অল্পদিনেই সাধন রাজ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন,

এবং ক্রমশঃ তাঁহার মধ্যে উচ্চ-উচ্চ ভাবারাশির বিকাশ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তখন "দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই সংকীর্ত্তন হইত এবং শ্রীযুক্ত লাটু ও অন্যান্য ছেলেরা তাহাতে যোগ দিয়া—মহা-উল্লাসে নৃত্যাদি করিতেন। ছেলেদের অনুরাগ দেখিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। 'মা এদের একটু ভাবটাব হোক্'। আধার শুদ্ধ থাকিলে অল্প অভ্যাসেই ফল দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রার্থনার কিছুদিন পরেই শ্রীযুক্ত লাটুর ও অপর কাহারও কাহারও ভাব হইতে লাগিল।"

শ্রীশ্রীঠাকুর অধিক রাত্রিতে সকলকে জাগাইয়া ধ্যানাদি অভ্যাস করিবার জন্য কাহাকেও পঞ্চবটীতে, কাহাকেও বা কালী-মন্দিরে—এইরূপে নানাস্থানে পাঠাইয়া দিতেন। অতঃপর সকাল হইবার পূর্ব্বেই সকলে ফিরিয়া আসিয়া অল্প বিশ্রাম করিয়া লইতেন। ইহাতে কিন্তু শ্রীযুক্ত লাটুরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম হইত।

কেন না সারাদিন নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আবশ্যক মত নিদ্রালাভ তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। তাই অধিকাংশ দিনই তিনি সন্ধ্যাকালে ঘুমাইয়া পড়িতেন। "একদিন ইহা ঠাকুরের চক্ষে পড়ায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'সে কিরে, সন্ধ্যায় ঘুম কিরে? সন্ধ্যায় ঘুমুবি ত ধ্যান ধারনা ক'রবি কখন?' ব্যস, ইহাই যথেষ্ট। সেই দিন হইতে তিনি যে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই অভ্যাস রক্ষা করিয়াছিলেন। কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁহার দেহ-ত্যাগের পরে, তিনি আজীবন প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া ধ্যান ধারনায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন। * * এইরূপে সারারাত্রি ধ্যান-ধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়া যাইতেন।" ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র আলস্য বা কষ্ট বোধ হইত না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে যখন যাহা করিতে বলিতেন, তিনি তাহাতেই রাজী হইতেন, কখন কোনও দ্বিরুক্তি করিতেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীযুক্ত লাটু সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন; বাল্যে তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর সে কথা

ভাবিয়া যেন কতই চিন্তিত হইয়াছেন—এইরূপ ভাবে জনৈক ভক্তকে বলিলেন,—"দেখ, লেটো (লাটু) একেবারে আমার মত মুক্‌খু থাক্‌বে গা! তা' তুমি একটা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এনে দিও ত; ওকে পড়াব। একটু একটু পড়ুক্ কেমন?" তাঁহার আদেশ মত পুস্তক আনিত হইলে, শ্রীযুক্ত লাটু আহারাদির পর পুস্তক লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পড়িতে বসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া শ্রীযুক্ত লাটুকে তাঁহার অনুকরণ করিয়া বলিতে বলিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত লাটু 'ক' স্থলে—'কা', 'খ' স্থানে—'খা', এইরূপ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। যতই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে 'ক, খ' ইত্যাদি বলিতে বলেন, ততই তিনি 'কা, খা'——এইরূপ বলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং অন্যান্য সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত লাটুও সেই হাসিতে যোগ দিলেন, হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

এইরূপ কয়েক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে পড়াইবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার উচ্চারণের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না।—শ্রীযুক্ত লাটু সেই পূর্ব্ববৎ 'কা, খা' বলিতে লাগিলেন। শেষে তিনি 'যা তোর লেখাপড়া হবে না, বলিয়া তাঁহাকে পড়াইবার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত লাটুরও আর বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হইল না; কিন্তু তিনি যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট শিখিলেন, তাহার তুলনায় উহা অতি নিকৃষ্ট। তিনি নিরক্ষর হইয়াও শ্রীগুরুকৃপায় সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যালাভে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। লেখা-পড়া না জানিলেও শাস্ত্রাদি শ্রবণে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল,—তিনি অপরকে দিয়া শাস্ত্রাদি পাঠ করাইয়া শুনিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান-কালেই শ্রীযুক্ত লাটুর আধ্যাত্মিক উন্নতি যে বিশেষ ভাবেই হইয়াছিল,—তাহার প্রমাণ আমরা দুইটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা জানিতে পারি :—

শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক ভক্ত বলেন,—

এক দিন শ্রীযুক্ত লাটু প্রভৃতি বালক-ভক্তগণের বৈরাগ্যাদি সাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক কথা বলিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত লাটুর কথায়

বলেন একদিন গভীর রাত্রে লেটো * কি ক'র্‌ছে দেখবার জন্য পঞ্চবটীতে গেলাম। গিয়ে দেখি লোটো বেলতলায় ব'সে ধ্যান ক'রছে, তার দু'পাশে দু'টা বড় বড় কাল কুকুর কান খাড়া ক'রে বসে রয়েছে—লেটোকে পাহারা দিচ্ছে। ওরা ভৈরবের বাহন। তখন তখন আমিও যখন পঞ্চবটীতে ধ্যান ক'র্‌তে যেতাম, ঐ রকম দু'টা কাল কুকুর এসে দু'পাশে ব'সে থাক্‌ত—পাহারা দিত।"

আর এক দিন শ্রীযুক্ত লাটু বাগানে কলাপাতা কাটিতে গিয়া তদবস্থায় গভীর সমাধিমগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তদ্দর্শনে প্রক্রিয়া বিশেষে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন।

এইরূপে সে সময় তাঁহার প্রায়ই গভীর ভাব সমাধি প্রভৃতি হইত; শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেক সময় হাঁটু দিয়া ডলিয়া চৈতন্য বিধান করিতে হইত। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন—"এদের মধ্যে লাটুরই ঠিক্ ঠিক্ ভাব হয়।" আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'কি জান দেহ রক্ষার অসুবিধা হ'চ্ছে। ও এসে থাক্‌লে ভাল হয়। এদের স্বভাব সব এক রকম হ'য়ে যাচ্ছে। লেটো চ'ড়েই রয়েছে (সর্ব্বদা ভাবেতে রয়েছে)। ক্রমে লীন হবার যো।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট অবস্থান কালে একবার শ্রীযুক্ত লাটুর তীর্থাদি ভ্রমনেচ্ছা অত্যাধিক প্রবল হইয়াছিল। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'আমি ঠাকুরের পা টিপ্‌চি। মনে হ'চ্ছে—তীর্থ ভ্রমণে যাই। কারণ শুনেছিলাম—তীর্থে গেলে ধর্ম্ম হয়। ঠাকুর মনের কথা জান্‌তে পেরে ব'ল্লেন, 'এখান্ হ'তে যাস্‌নি; এখানেই সব আছে—কোথায় ঘুরাঘুরি ক'রবি? আর এখানে দু'টি খাওয়া মিল্‌ছে, এছেড়ে যাস্‌নি।' ঠাকুরের অহেতুক দয়া! আমি আর গেলাম না।—ইহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বিদ্যমান্ থাকিতে তিনি আর ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লাটু শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গমনের

* শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত লাটুকে লেটো বলিয়াডাকিতেন।

পর হইতে তাঁহার দেহাবসানকাল পর্য্যন্ত একনিষ্ঠচিত্তে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

'যখন ঠাকুর অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরে ও পরে কাশীপুর উদ্যানে ছিলেন, তখনও তিনি বরাবর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর যখন তাঁহার ত্যাগী যুবক শিষ্যগণ ভাবিতেছেন,—"কিছু দিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া গিয়া পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া আসিবেন—কি এখনই সংসার ত্যাগ করিয়া সাধন ভজনে রত থাকিয়া—শ্রীগুরু প্রদর্শিত পথে চলিবেন, ইহার পূর্ব্ব হইতেই "শ্রীযুক্ত লাটু, তারক ও বুড়োগোপাল—এ তিনজনের বাড়ী ঘরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মাথা গুজিবার স্থান ছিল না। সুতরাং ইহাদের থাকিবার জন্য বরাহ নগরে একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়। ইহাই হইল—বরাহনগর মঠের সূত্র পাত (?)। অতঃপর ক্রমশঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রমুখ ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী শিষ্য মণ্ডলী একে একে এখানে আসিয়া সমবেত হন এবং সকলে মিলিয়া ভগবান লাভের তীব্র ব্যাকুলতায় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দিবারাত্র ধ্যান জপ, কীর্ত্তনাদিতে ডুবিয়া থাকেন। এই খানেই স্বামিজী সকলকে লইয়া যথাবিধি বিরজা হোম করিয়া সকলকে সন্ন্যাস নাম প্রদান করেন। এই সময়েই শ্রীযুক্ত লাটুর অদ্ভুত ভাব, ধ্যান-ধারণায় অদ্ভুত অনুরাগ ও অন্যান্য অদ্ভুত আচরণ স্মরণ করিয়া স্বামিজী তাঁহাকে 'অদ্ভুতানন্দ' নামে অভিহিত করেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বৃন্দাবনে যান। সঙ্গে শ্রীযুক্ত লাটু, যোগানন্দ স্বামী এবং কয়েকজন স্ত্রীভক্ত গিয়াছিলেন। * * বৃন্দাবনে অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত লাটুর পূর্ব্ববৎ আহারাদির কিছুই ঠিক থাকিত না। তদুপরি প্রায়ই তাঁহার ভাগের রুটি বাঁনরদিগকে খাওয়াইয়া অসময়ে শ্রীশ্রীমা বা তাঁহার সঙ্গিনীদের নিকট খাইতে চাহিতেন। ইহাতে অনেকেই বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিত। কিন্তু—শ্রীশ্রীমা তাঁহার এই বালকবৎ আচরণে বিরক্ত না হইয়া সকলকে ভৎর্সনা করিতে নিষেধ করিতেন এবং

স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে তাঁহাকে নিজের কাছে বসাইয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতেন।

মা জানিতেন—তাঁহার আব্দারে ছেলে লাটু বড় অভিমানী। তাঁহাকে যে যাহাই বলুক-না-কেন, তাহার যত অভিমান—সরল বালকের মত তাঁহার উপরেই হইয়া থাকে। এজন্য তিনি সঙ্গিনীদিগকে শ্রীযুক্ত লাটুর খাবার আলাদা করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহার লাটু নিজ ইচ্ছামত আহারাদি করিতে পারে এবং তাঁহার বালকোচিত ব্যবহারাদিতে কোনও বিঘ্ন না হয়।

শ্রীশ্রীমার এবম্প্রকার অহেতুক দয়ার কথা স্মরণ করিয়া ভক্তিগদগদ চিত্তে শ্রীযুক্ত লাটু একদিন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যদিও এগুলি তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত ভাব—কখনও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু সেদিন আর—'ভাব' চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন :—

"আমি মার কথা যেখানে সেখানে বলি না, ঠাকুর স্বামিজীর কথা ব'লে থাকি। সকলে বুঝ্‌বে না, উল্টো বুঝ্‌বে, তাই * * । বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুয্যের বাড়ীতে—যখন মা থাক্‌তেন, সে সময় যোগীন মহারাজ একদিন ছিলেন না। সেই দিন আমায় বাজার কর্‌তে বলায় আমি ব'লেছিলাম—আমার দ্বারা ওসব হবে না; তোমাদের হাঙ্গামা পোয়াতে পার্‌বো না। যাই, যোগীনকে ডেকে দিইগে। মা ব'ল্লেন—'যেয়ে কাজ নেই থাক্।' এরকম কত উৎপাত ক'র্‌তুম, মা কিন্তু কখনও বিরক্ত হ'তেন না। মার—কি অতুল সহ্যগুণ, তার তুলনা নাই। লোকে এত বিরক্ত করে, কিন্তু মা কখনও বিরক্তি দেখান না। তুমি আমার কাছে এতদিন আছ, আমি এত লোক্‌কে চিঠি লিখি—তুমি ত জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার মাকে কেন লিখি না? কেন লিখি না জান?—মা আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব জানেন, তাঁকে চিঠি দেওয়ার কি দরকার—? যারা বুঝে না, তাদের চিঠি দিতে হয়। যদি বেইমানি করি, তবে ভুগ্‌তে হবে। * * বেইমান্ হস্‌নি, তোরা ক্ষুদ্র

জীব মার উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি কিছুই নেই। কেবল মুখে 'মা, মা' করিস্। অমন মাতৃভক্তি আমি চাই না। তোদের মত মাতৃ-ভক্তি আমার নেই। * মাকে আর কি ব'ল্‌বো ? মা সব জান্‌ছেন। আমার দক্ষিণেশ্বরের সেই মা।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্রীযুক্ত লাটু সম্ভবতঃ বরাহ নগর মঠেই অবস্থান করিতে থাকেন; এবং অন্যান্য গুরু-ভ্রাতাদিগের সহিত কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত হন। "অতঃপর বাগবাজারস্থ ৺কেদারনাথ দাস যিনি বর্ত্তমান উদ্বোধন বাড়ীর জমী দান করিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে তিনি অনেক দিন ছিলেন। সম্ভবতঃ ৩।৪ বৎসর। মধ্যে মধ্যে শালিখায় তাঁহার এক আত্মীয়ের ডাল-চাল-চিঁড়ে ইত্যাদির দোকানেও থাকিতেন। স্বামিজী মহারাজ (বিবেকানন্দ) যখন প্রথমবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়ে আসিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন, তখন তিনি লাটু মহারাজকে সঙ্গে লইয়া যান। রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি অনেক স্থান লাটু মহারাজ স্বামিজীর সঙ্গে ভ্রমণ করেন। ভ্রমণান্তে কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারস্থ ঠাকুরের প্রিয়-ভক্ত ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে বহুবৎসর ধরিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে লাটু মহারাজ ঠাকুরের ভক্ত 'বসুমতীর' ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছাপাখানার বাড়ীতেও অনেক সময় থাকিতেন।"

মঠ যখন আলমবাজারে ছিল, সে সময় তিনি (শ্রীযুক্ত লাটু) কখনও মঠে, কখনও বা কলিকাতায় ভক্তদের গৃহে অবস্থান করিতেন। ঐ সময়ের একটি ঘটনা স্বামী-শুদ্ধানন্দজীর নিকট-যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা যথাযথ এস্থানে বিবৃত করিলাম :—

সেই দিন সেই প্রথম আমরা আলামবাজার মঠে গেছি। দেখি—একজন টান্ হ'য়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছেন, আর তাঁকে দু'জন টানাটানি ক'চ্ছেন। আমরা সেই প্রথম গেছি, তাই ঐরূপ ব্যবহার দেখে কিছু আশ্চর্য্য হ'য়েছিলাম; কিন্তু তার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিনি। অনেক দিন পরে তাঁকে ঐরূপ শুয়ে থাক্‌বার কারণ, আর তাঁদের ঐরূপ

টানাটানি কর্‌বার উদ্দেশ্য কি ছিল, জিজ্ঞাসা করায় ব'লেছিলেন, মনে ক'রেছিলাম আর খাব না, অন্ন ত্যাগ ক'র্‌বো, তাই পড়েছিলাম।

৺কেদারনাথ ঘোষের বাড়ী ৺উপেনবাবুর 'বসুমতী' প্রেস এবং বলরাম-মন্দির ছিল—শ্রীযুক্ত লাটুর প্রধান আড্ডা। পরে কিছুদিন রাত্রে 'বসুমতী' প্রেসে এবং দিনে—গঙ্গার ধারে কাটায়েছিলেন। শুনা যায় খড়োনৌকার মাঝিদের সহিত তাঁহার বেশ জানা শুনা হইয়া গিয়াছিল। এবং তাহারা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তিও করিত। তিনি অনেক সময় খড়ের নৌকার উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন, মাঝিরা গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে বহুদূর যাইবার পর হয়তো তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তীরে নামাইয়া দিত। তিনি পুনরায় পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেন।

এই সময়েই এক রাত্রে কোন এক ষ্টেসনে গিয়ে তিনি একটি খালি মালগাড়ীর (goods-train) মধ্যে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। মালগাড়ীটি কখন যে একটি গুডস্‌ট্রেনের সহিত সংযোজিত হইয়া বহু দূর নীত হইয়াছে, তাহা তাঁহার বোধগম্যই হয় নাই। পরের কোনও ষ্টেসনে (station) কুলিরা সেই গাড়ীতে মাল বোঝাই করিতে গিয়ে দেখে—একটি কৌপীনধারী সাধু স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহারা অনেক ঠেলাঠেলি করিবার পর তাঁহার চৈতন্য হয় এবং তথা হইতে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

(ক্রমশঃ)

—স্বামী সিদ্ধানন্দ।

সুখের সন্ধান

(টলষ্টয়ের গল্পাবলম্বনে)

ক্ষুদ্র পল্লীর এক কোণে এলাহি বাস করিত। এলাহিকে বিবাহ করাইয়া এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার পিতা ইহসংসারের মায়া কাটাইয়া পরলোকে প্রস্থান করিল। দীনহীন এলাহির অবস্থা এখন আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাহার সম্পত্তির মধ্যে মাত্র কয়েকটি গো-মহিষ। যা হউক স্ত্রী-পুরুষ দুইজন সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া নিজের অবস্থান পরিবর্ত্তনের জন্য খুবই চেষ্টা করিতে লাগিল। অসহায়ের সহায় ভগবানের কৃপায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই এলাহি সুন্দর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইল। এখন তাহার সম্মান প্রতিপত্তির অবধি নাই। কত দাসদাসী নিত্য তাহার বাড়ীতে খাটিতেছে। কতলোক গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতেছে। অতিথি অভ্যাগত এলাহির গৃহে পরম সমাদর লাভ করিতেছে। এখন প্রতিবেশীদের মুখে এলাহির প্রশংসা ধরেনা। এরূপ সৌভাগ্যের মধ্যে এলাহি এক কুড়ি পনরটি বৎসর কাটাইয়াছিল।

এলাহির দুই পুত্র ও এক কন্যা; সকলেই বিবাহিত। দুঃখের দিনে পুত্রদ্বয়ও এলাহির সহিত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আজ সুদিনে তাহারা বড় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বড় ছেলে একদিন মারামারি করিতে করিতে প্রাণ হারাইল। ছোট ছেলে মাতাল—পিতার সম্পূর্ণ অবাধ্য। এলাহি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে কয়েকটি মাত্র গো-মহিষ দিয়া দূর করিয়া দিল।

এখন এলাহির যথার্থই দুর্দ্দিন উপস্থিত। মড়ক লাগায় তাহার গো-মহিষের অধিকাংশই প্রাণ-ত্যাগ করিল। এদিকে আবার অনাবৃষ্টি; তৃণ শস্য একেবারেই জন্মিল না। অনাহারে কত গো বৎস মৃত্যুমুখে পতিত হইল, বাকী যাহা রহিল, তাহাও দস্যু চোরেরা অপহরণ করিয়া লইয়া

গেল। এলাহি ক্রমে ভূসম্পত্তি সব কিছু বিক্রয় করিয়া পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িল। স্ত্রী পুরুষের এখন পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যতীত অপর কোন সম্বলই রহিল না। বিতাড়িত পুত্র কোন্ দেশে গিয়াছে, কেহ তাহার খোঁজ খবর রাখেনা। কন্যাটিও আর ইহ জগতে নাই। কাজেই জগতে এখন তাহার আশ্রয় লইবার স্থান পর্য্যন্ত রহিল না। ভগ্নহৃদয় জরা-জীর্ণ এলাহি অভাবের তীব্র তাড়নায় পত্নীকে লইয়া একদা ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। পথে তাহার পূর্ব্ব প্রতিবেশী মামুদের সহিত সাক্ষাৎ। এলাহির দুর্দ্দশায় মামুদের হৃদয় গলিয়া গেল। মামুদ সম্ভ্রান্ত বংশীয়, কিন্তু তাহার অবস্থাটা তত সচ্ছল নহে। যাহউক সে এলাহিকে কহিল—'ভাই এলাহি' তোমরা এখন আমারই দরিদ্র পরিবার ভুক্ত হইয়া পড়না কেন। গ্রীষ্মকালে আমারই ক্ষেত্রে তোমাকে সামান্য কাজ করিতে হইবে; শীতের সময় শুধু গরু চরাইলেই চলিবে। আর তোমার পত্নী যদি গো দোহন করিতে পারে তবেই যথেষ্ট। আমি তোমাদের খোরাক পোষাক যোগাইব। যদি বা আর অতিরিক্ত কিছু লাগে আমাকে জানাইলে তাহাও তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে ত্রুটি করিব না। এই বৃদ্ধ বয়সে তোমরা আর কোথায় যাইবে ভাই!

এলাহি সহৃদয় মামুদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে ইহাদের একটু কষ্ট বোধ হইত, মনেও সর্ব্বদা বিষাদভাব লাগিয়া থাকিত। কিন্তু শীঘ্রই কাজটা তাহাদের সহিয়া গেল। তখন শক্তি অনুযায়ী পরিশ্রম করিতে তাহারা ত্রুটি করিত না।

মামুদের গৃহে একদিন কয়জন বিশিষ্ট আত্মীয় উপস্থিত। এলাহির উপর মেষ বধ করিয়া রন্ধন করিবার ভার। মামুদ বন্ধুবর্গ নিয়া টেবিলে আহার করিতে বসিল। এলাহিই পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মামুদ একজন বন্ধুর নিকট গোপনে এলাহির ভাগ্য পরিবর্ত্তনের কাহিনী বর্ণনা করিল। লোকের অদৃষ্ট বস্তুতঃই চক্রের বিঘূর্ণনের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এলাহির জীবনের করুণ ইতিহাসটি অতিথির হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহার ইচ্ছা জন্মিল—এলাহির সঙ্গে একটু আলাপ করিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহার হৃদয়ের বেদনা ভার লাঘব করিয়া দেয়।

মামুদ এলাহিকে ডাকাইয়া একান্তে তাহার বন্ধুর নিকট নিয়া উপস্থিত করিল। তাহার পত্নীও তখন পর্দ্দার অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে।

অতিথি জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা এলাহি, তোমার পূর্ব্বের অবস্থার বিষয় স্মরণ হইলে তোমার মনে না জানি কত কষ্টই হইয়া থাকে!"

এলাহি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "না, আমার মনের কথা বলিলে তোমার হয়ত বিশ্বাস জন্মিবে না; আচ্ছা, আমার পত্নীকেই সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না! স্ত্রীলোকের হৃদয় সাধারণতঃই কোমল। করুণ কাহিনীটি তাহার মুখেই শোনাইবে ভাল।"

অতিথি তখন এলাহির পত্নীর নিকট প্রশ্নটির পুনরুত্থাপন করিল। পর্দ্দার পশ্চাৎ হইতেই সে বলিতে লাগিল—"পঞ্চাশটি বৎসর স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সুখের অন্বেষণে বৃথাই ঘুরিয়াছি। ধনদৌলতের অভাব ছিলনা, তথাপি একদিনও সুখের আস্বাদ পাইয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু নিঃস্ব অবস্থায় পরগৃহে ভৃত্যের কাজ করিয়াও আমরা পরম সুখে কালযাপন করিতেছি, আমাদের মনে এখন আর সংসারের কোন বাসনাই নাই।" মামুদও তার বন্ধু এই উত্তর শুনিয়া ত অবাক্! রমণীর অন্তরের আনন্দ মুখের হাসিতেই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে আবার বলিতে লাগিল—"অর্দ্ধ শতাব্দীর ধনৈশ্বর্য্য ভোগে যে সুখের আস্বাদ করিতে পারি নাই, দুই বৎসর দরিদ্রতার মধ্যে সাধারণ লোকের সহিত একত্র বাস করিয়া সেই দুর্লভ সুখ উপভোগ করিলাম; এর চেয়ে অধিক সুখ জগতে কোথাও আছে কি না জানি না।"

অতিথি জিজ্ঞাসা করিল—"এই দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তোমার সুখটা কোন জায়গায় রহিয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না।"

রমণী কহিল—"যখন আমরা ধনী ছিলাম, তখন নিজের বিষয় ভাবিবার আমাদের মোটেই অবসর ছিল না। আমরা পরস্পর বিশ্রম্ভালাপের, পরলোকের বিষয় ভাবনার, করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার সময় টুকুও করিতে পারিতাম না। কোন অতিথি আসিলে তাহাকে কি ভাবে আপ্যায়িত করিতে হইবে, কি ভাবে নিজের মান সম্ভ্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এই সকল চিন্তায়ই আমরা অস্থির থাকিতাম। রাত্রিতেও

আমাদের নিদ্রা হইত না। শয্যায় শয়ন করিয়াও ভাবিতাম—না জানি আমাদের গো-মহিষগুলি ব্যাঘ্র ভল্লুক আসিয়া লইয়া যায়, অথবা অসুরগণ অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। টাকা পয়সা চোরে লইয়া যাইবে—এই চিন্তা ও আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইত। রাত্রেও আমরা এসব দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিতাম। কি ভাবে সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতে হইবে—এই নিয়া প্রায়ই আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিত। তজ্জন্য সময় সময় উভয়ের ভিতর ঝগড়া বিবাদ পর্য্যন্ত হইত। নিত্য এভাবে অর্থই আমাদিগকে অশান্তির পথে লইয়া যাইত, পাপের মাত্রা আমাদের দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছিল, সুখ ভোগ ত দূরের কথা।" অতিথি সবিস্ময়ে কহিল—"আর এখন বুঝি তোমরা একেবারে সুখের নদীতে সাঁতার কাটিতেছ!"

রমণী উত্তর করিল—"বাস্তবিক, এখন আমাদের কোনই দুশ্চিন্তা নাই। ভগবানের নাম নিয়া আমরা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করি। কাহারো সহিত আমাদের কলহ বিবাদের বিন্দুমাত্র কারণ নাই। এক্ষণ আমাদের কার্য্যে মামুদ সন্তুষ্ট থাকিলেই সব হইল। আমরাও যথাশক্তি প্রভুর কার্য্য করিয়া যাইতেছি। অন্ন বস্ত্রের ভাবনা এখন আমাদের করিতে হয় না। অবসর সময়ে আমরা আত্মার উন্নতি সম্বন্ধে আলাপ করি, পরকালে আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকি। আর নিয়মিত ভগবানের উপাসনা করিয়া সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করিয়া থাকি, যাহা নাকি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একদিনও আমরা উপভোগ করিতে পারি নাই।"

অতিথি ত হাসিয়াই অস্থির। এলাহির চক্ষু কিন্তু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল—হাসিওনা ভাই সাহেব, এ উপহাসের কথা নয়। আমাদেরও অন্তরটা পূর্ব্বে ঠিক অনুরূপ ছিল। বিপুল বিত্ত হারাইয়া আমরাও কত অশ্রুপাত করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় এতদিনে নিজের ভুল বুঝিয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আজ এই সত্যের বার্ত্তা প্রচার করিয়া শুধু নিজে যে তৃপ্তিলাভ করিলাম, তাহা নহে, ইহার দ্বারা অপরেরও মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলাম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

অতিথি এবার বলিয়া উঠিল—'এমন হিতকথা সারগর্ভ উপদেশ ত ধর্ম্মপুস্তকেও পাই নাই ।"

সমাগত অতিথিদের আমোদ হিল্লোল হঠাৎ জমাট বাঁধিয়া গেল। সকলেই যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিল ।

—শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় ।

সংসার

একাদশ পরিচ্ছেদ

সংসারে কত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া কালের আরও দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। কিশোরী মোহন বাবুও এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে পতিত হইয়া অনেক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিতেছেন। প্রকৃতির আবর্ত্তে দিন দিন কত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসিতেছে, কত ধনী নির্ধন, কত পথের কাঙ্গাল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কত সুখের হাসি রোদন-রোগে বিলীন হইয়া যাইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে? আজ এই আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া শ্রীপাট নবদ্বীপে ব্রজমোহন গোস্বামীর আসন হরিপুরে আসিয়াছে। তাঁহার নিত্য পূজার বিগ্রহ শ্যামচাঁদ সেই সঙ্গে হরিপুরের ভূমি পবিত্র করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে,—কিশোরী মোহন বাবুও আজ গুরুদেবের অনুগ্রহে শ্যামচাঁদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ভক্তবৎসল বোধ হয় দয়া করিয়াই তাঁহার পার্থিববন্ধন শিথিল করিয়া ক্রমে তাঁহার শান্তি—আনন্দময় ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইতেছেন ।

প্রায় বৎসরাধিক কাল গত হইল অর্থাৎ শান্তির বিবাহ-বিভ্রাটের কয়েকমাস পরেই হৃদ্‌রোগে শান্তির মা'র মৃত্যু হয়; তাহার পর আরও

কিছুদিন পরেই আঘাতের বেদনা ভালরূপ বুঝিবার জন্য তাঁহার একটি কন্যা বিধবা হয়। তাহার মাত্র দুই তিন বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছিল, এবং সন্তানাদি হয় নাই। সুতরাং তাহার সমস্ত ভার এখন কিশোরী মোহন বাবুর ঘাড়েই পড়িয়াছে। শান্তিকে অনেক চিন্তার পর স্কুলে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মার মৃত্যুর পর সে পড়া ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। যদিও পড়া ছাড়িবার বাহিরের কারণ তাহাই হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে সেখানে সে নিজের জীবনকে অভিনব সমাজে ঠিক মিলাইতে পারে নাই। সেখানে সবই যেন তাহার নিকট অন্যরূপ বলিয়া মনে হইত, কাহারও সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিত না। সময় পাইলেই একলা বসিয়া চিন্তা করিত। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে অনেকেই তাহাকে ভালবাসিলেও তাহার অন্তরের ভাবনাটা ঠিক ধরিতে পারিতেন না, তাই অনেক সময় বিরক্ত হইতেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই সে স্কুলের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। এখন কিন্তু বাড়ীতে সে এক মুহূর্তের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। কারণ সংসারের সমস্ত ভারই তার উপর পড়িয়াছিল; ইহা ছাড়া দৈনিক পড়া শুনা ইত্যাদিও প্রায় সে নিয়মমতই করিত। এখন আর সে ছেলে মানুষী পড়া মোটেই পছন্দ করিত না। একটা শোকের আঘাত পাইয়া তাহার স্বভাব-সুলভ কোমল হৃদয় একেবারে নিতান্ত তরল হইয়া পড়িয়াছিল। মা'র ফটোখানা বুকের উপর রাখিয়া নির্জ্জনে অশ্রু-বিসর্জ্জন তাহার একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল। কিশোরীমোহন বাবু এটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই প্রায়ই তিনি তাহাকে কোন না কোন কাজে ব্যস্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেন। সেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অবস্থা-বিপর্য্যয় বুঝিয়া যথাসম্ভব নিজের অন্তরকে উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ প্রদান করিতে ছাড়িত না। এখন তাহার শিক্ষা একটু নূতন ভাবে ব্যাকুল-বেদনার ভিতর দিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। সে এখন নিজের হৃদয়ের কোন গভীর অন্তস্তলে,—যেখানে কেবলই হাহাকার ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইত না, সেখানে সেই হাহাকারময় বেদনাতুর হৃদয়কে অশ্রু-সিক্ত করিয়াই তৃপ্তি পাইত।

এখন সে বই পড়িত; কিন্তু এমন বই পড়িত—যাহাতে নিজের অবস্থার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া কাঁদিবার সুযোগ পাইত। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বেশ একটু দখল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কীর্ত্তন শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব-কবিদের হৃদয়-স্পর্শী পদের ব্যাখ্যার সহিত করুণ রাগিণীর গান শুনিতে শুনিতে গাহিতে গাহিতে সে আত্মহারা হইয়া যাইত; এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রাণের ভাষায় শ্যামচাঁদের কাছে হৃদয়ের কথা জানাইত। বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয়ও তাহার এই অসাধারণ হৃদয় ভাব দেখিয়া বড় আনন্দের সহিত তাহাকে ভাগবত প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যত্নপূর্ব্বক কীর্ত্তন শিক্ষা দিতেছিলেন। যদিও ইদানিং শান্তির হৃদয় একটু বেশীর ভাগ ভাব-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি কার্য্যে অলসতা আসিতে পারে নাই। এসব আলোচনা ছিল তাহার বিশ্রাম সময়ের বিষয়। এসব বিষয়ে সে দিন দিন উন্নতির পথেই যাইতেছিল, আর তাহার একমাত্র কারণ ছিল নিরলস কর্ম্ম-প্রচেষ্টা। সে সাধারণ ভাবে যে সকল কার্য্য করিত, তাহার দ্বারাই যেন সংসারীর যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অলক্ষ্যে তাহার ধর্ম্মভাবের পরিপোষক হইত। এখন বাড়ীর অতিথি অভ্যাগত মহোৎসব, দরিদ্রভোজন যাহাই হউক না কেন শান্তিই তাহার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিল। সে সব কাজেই নীরবে সুনিষ্পন্ন করিয়া ফেলিত, কিন্তু কাহাকেও বুঝিতে দিত না যে কি উদ্বেগের প্রেরণায় সে এ সকলে নিজকে নিয়োজিত করে।

কিশোরীমোহন বাবুর প্রায় সমস্ত সম্পত্তি এখন শ্যামচাঁদের সেবা এবং তাহার আনুসঙ্গিক মহোৎসব প্রভৃতি পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, একমাত্র পুত্র এ বিষয়ের উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করিলে তাহাকে নিয়মমত সমস্ত অনুষ্ঠান বজায় রাখিতে হইবে। কোনরূপ বিলাসিতা বা ইচ্ছানুযায়ী অমিতব্যয়িতায় এই পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত ধনের অপব্যবহার করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য নরেন্দ্রনাথ ইহাতে অনুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই বরং সে এইরূপ বন্দোবস্তের জন্য খুসীই হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয়ের

কৃপায় এখন হরিপুরে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর পদধুলিও কিশোরীমোহন বাবুর বহির্ব্বাটীতে পড়িত। তাহা ছাড়া কীর্ত্তন ও খোলবাজনা শিখিবার জন্য দুই চারিজন শিষ্যও প্রায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিত। মোটের উপর এখন হরিপুরে বসিয়াই কিশোরীমোহন বাবু অনেকটা তীর্থ স্থানের আনন্দ উপভোগ করিতেন। কেবল দুঃখের বিষয় তিনি জাতি ও সমাজচ্যুত। কিন্তু এ দুঃখকে তিনি একবারও মনে স্থান না দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বের কথাই প্রথমে চিন্তা করিতেন। জীবনে এমন কিছু অন্যায় করিয়াছেন কিনা যাহার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত আত্মগৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে বা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিকট, মানব-ধর্ম্মের নিকট প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় এই কথাই তাঁহার প্রধান বিষয় ছিল। তাই মাঝে মাঝে শ্যামচাঁদের কাছে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেন :—

"প্রভো ! তুমি কখন আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়ে তোমার চিরানন্দময় ধামের দিকে নিয়ে যাও তা হীন-বুদ্ধি আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা সুখ বলে দুঃখ চাই, অনন্ত করুণার আধার অন্তর্যামী তুমি দুঃখ ব'লে সুখকেই আমাদের নিকটে এনে দাও। যখন আমরা দুঃখের দাহে জ্ব'লে মরি তখনই তোমার পরশ-মণির স্পর্শে আমার সকল পথ উজ্জ্বল হ'য়ে যায়। তোমার লীলা তুমিই বুঝ, আমরা কেবল খেলার সাথী—কখন বা খেলার উপকরণ মাত্র হ'য়ে জীবনকে পবিত্র করি—জন্ম সার্থক করি। জানি না কতদিনে এই হীন কলঙ্কময় জীবনে সার্থকতা আসিবে।" কিশোরীমোহন বাবু এখন নিজের কথা, ছেলে মেয়েদের কথা বিশেষ চিন্তা করিতেন না, তার পরিবর্ত্তে তাঁহার সকল আমিত্ব ভগবানের বিরাট বিশ্বের মাঝে হারাইয়া দিবারই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হইতেছিল যে, সকল জীবের, বা সকল মানুষের পৃথক্ পৃথক স্বার্থ যখন আমার স্বার্থ, যখন অন্য সাধারণের সুখ-দুঃখই আমার নিজের সুখ-দুঃখের সঙ্গে বিলীন হইয়া যায় তখনই আমার জীবনের সার্থকতা আসে। তাহা ছাড়া প্রকৃত শান্তি নাই। যতক্ষণ সমাজের একটি লোকও যে পরিমাণে অসুখী ততক্ষণ সমাজের সেই পরিমাণ অপূর্ণতা থাকিবেই। যখন ব্যষ্টির প্রত্যেকেই পূর্ণ তখনই সমষ্টিও পূর্ণ। অতএব

নিজের মঙ্গল চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের মঙ্গল কামনা করিতে হইবে।

তিনি নিজের গ্রামটিকে একটী সুখ-সচ্ছন্দময় পল্লীতে পরিণত করিবার ইচ্ছায় সকল প্রকার বাধা বিপত্তি অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিতে-ছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি বেশ শান্তি পাইতেছিলেন না। "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" তিনি যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, এমন কি যাহারা তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন তাহাদিগকেও ছোট করিয়াছিলেন, তথাপি অপূর্ণ, অনেক অভাব। কারণ এখনও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখনও তিনি এমন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই যাহার জন্য সকলেই সুখী। তাই আরও এমন কোন নূতন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাহাতে এই কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অকপট সহানুভূতি দিবার সাথী পান। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহার নিজের কঠোর অভিমানও অনেক পরিমাণে দায়ী। কারণ যদি আমাকে অন্যের হিত সাধন করিতে হয় তবে কতকটা সেবাধর্ম্মের নীতি-অনুযায়ী বৃথা আত্ম-মর্য্যাদাকে একটু ক্ষুণ্ণ করিতে হইবেই। তাহা ছাড়া তাঁহার নিজের উদ্দেশ্যই যখন সেবা ধর্ম্মের প্রচার তখন নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে অন্যের দাস না ভাবিলে, অহঙ্কারের কলঙ্ক মিশ্রিত থাকিলে তাহা অপূর্ণ থাকিবে। অতএব এখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং অন্যান্য বিপক্ষ দলকে নিজের মতানুবর্ত্তী করা তাঁহার একটা প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ইহার জন্য তিনি সকল লাঞ্ছনা, সকল অবজ্ঞাকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহাদিগকে জয় করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আর এ জয় শুধু বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ না করিয়া আত্মিক বলের সাহায্যে লাভ করিতে হইবে তাহাও বুঝিলেন। যদিও সম্প্রতি অনেক সাধারণ শ্রেণীর লোক তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিতেছিল, তথাপি সকলকেই এক কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত শক্তি প্রয়োগের জন্য পাইব এই ইচ্ছাই তাঁহার ফলবতী হইল এবং এখন হইতে ইহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধার লক্ষণ দেখিলেন না। যাহা হউক তিনি পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না এবং কোন বিষয়ে শীঘ্র হতাশও হইতেন না।

বৈশাখ মাসে পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ যে রূপ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়, তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি চব্বিশ প্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। ইহার জন্য ভিন্ন গ্রামের অনেক সঙ্কীর্ত্তনের দলও নিমন্ত্রিত হইল, নাম কীর্ত্তন রস-কীর্ত্তন সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিলেন। প্রধানতঃ দরিদ্র নারায়ণের সেবা এবং সম্মিলনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সংকীর্ত্তনের শুভানুষ্ঠানের পূর্ব্বদিন তিনি ছোট বড় প্রত্যেকের বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ দিয়া আসিলেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ যেরূপ মত প্রকাশ করিলেন তাহাতে তাঁহাদের মত বেশ সুবিধা রকমের মনে হইল না। যাহা হউক পরের দিন যথারীতি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, কিশোরীমোহন বাবু পুনরায় প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়া বিনয়ের সহিত আপনার অনুরোধ জানাইয়া আসিলেন। এবারেও তাঁহাদের হৃদয় পূর্ব্বের ন্যায় অটল বলিয়াই মনে হইল; তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, —"দেখ কিশোরী! আমাদের সেখানে যেতে কোন আপত্তি নেই, তবে কি না—আমরা ধর্ম্মের দায়ে বাধ্য হ'য়ে তোমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর্‌ছি। অবশ্য বড়ই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করি বল? ব্রাহ্মণের ছেলে কেমন ক'রেই বা পিতৃ-পিতামহের বংশের অগৌরব ক'রে অনাচারগুল করি? তারপর তোমার বাড়ীতে যে প্রসাদের আয়োজন কচ্ছ সেটাত একেবারেই অসম্ভব। আমার মনে হয়, তোমার নিজের জাতিদেরও কেও যাবেনা, আর যাওয়া যুক্তিসঙ্গতও নয়। একেবারে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম করাও যা আর সনাতন ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করাও তা।"

কিশোরীমোহন বাবু বলিলেন,—"আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাহি না, তবে এইমাত্র বলছি যে, যদি পতিত জাতির বাড়ীতেই ভগবানের পূজার আয়োজন হয় সেখানে কি যেতে কোন বাধা আছে? শ্রীরামচন্দ্র কি চণ্ডালের সঙ্গে মিতালি করেন নি? বুদ্ধ কি চণ্ডালের মাংসান্ন ভোজন করেন নি? শ্রীচৈতন্য কি যবন হরিদাসকে কোল দেননি? আর কত বলব? এমন উদাহরণ কি খুঁজে পাওয়া যায় না? জগতের একজনকেও ঘৃণিত পতিত ভেবে কি মানুষ ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে পারে? হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দিতে

না পারলে কি সেই প্রেমময়ের সন্ধান পাওয়া যায়? আচ্ছা একবার আপনি অতি সাধারণ ভাবে আপনার মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন দেখি—আমি এমন কোন অন্যায় ক'রেছি কি না যার জন্য আপনাদের সঙ্গে আমার মিলন একেবারে অসম্ভব? সব জায়গায় শাস্ত্রের দোহাই, বিশেষতঃ অতীতের স্মৃতির দোহাই আজকাল দেওয়া চলে না, কারণ তখনকার জীবন-সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে এখনকার জীবন-সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। যাক সে কথা না হয় যেতে দিন। আমি না হয় আপনাদের বিশ্বাসের প্রতিকূল কোন কাজ ক'রেছি, তাই ব'লে আমার প্রত্যেক কাজেই আপনারা প্রতিকূল আচরণ করবেন—কোনরূপ বিচার-বিবেচনা করবেন না তারই বা মানে কি? ভেবে দেখুন দেখি এতে কি কেবল আমারই ক্ষতি? তা যদি হ'ত আমি আপনাদের দোরে এরূপ কাতরভাবে অনুগ্রহপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াতাম না। কারণ আমি আমার নিজের জন্য বিশেষ কিছু চিন্তা করি না। সাধারণ ভাবে খাওয়া-পরা দিন গুজরানের জন্য ভগবান আমায় যা দিয়েছেন তাতে দিন বেশ চলে যাবে। যদি বলেন তবে কেন এত ব্যস্ত? তার উত্তর এই যে, এ বিষয়ে আপনার এবং আমার উভয়েই সমান ক্ষতি তাহা ছাড়া একটা সমাজের ক্ষতি, একটা জাতির ক্ষতি। আমি বা আপনি অন্ততঃ এই গ্রামের যে হিতানুষ্ঠান করতে পারি ব'লে আশা করি,—শুধু আপনার এবং আমার মধ্যে অকারণ ব্যবধান ও বিদ্বেষ বহ্নিই কি সে হিতানুষ্ঠানের কল্পনার মূল পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে না? প্রতিশোধপরায়ণ হ'য়ে মানুষ না করতে পারে এমন কাজ নেই। আমার মনে হয় আমরা আজ সেই ভুল রাস্তা ধরেছি। পরস্পরকে আঘাত ক'রে আমাদের প্রত্যেকেই উপরে উঠতে চাই, তার ফলে সকলেই নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ব তাতে আর সন্দেহ কি? আমি যা করতে চাই তার মধ্যে হয়ত কিছু ভাল থাকতে পারে, কিন্তু আপনারা আমার উপর বিদ্বেষ পোষণ করেন ব'লে সে ভালকে স্বীকার করতে চান না। আবার আমার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যেতে পারে। মোটের উপর আমাদের দলাদলিই সকল

অনর্থের মূল। একবার সকলে মিলে সেই একমাত্র সত্যকে অবলম্বন ক'রে সমবেত চেষ্টা করুন দেখি কতটা কাজ করতে পারি দেখা যাক্। এখন আমাদের ওসব কথা মনে রাখ্‌লে চল্‌বে না। যদি ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখেন, আমরা সবাই হীন—সবাই দীন—পরমুখাপেক্ষী এখন কি আর দলাদলি চলে? সবাই আমরা একমার পেটের ভাই; তবে কেউ বা মূর্খ, কেও বা পণ্ডিত, কেও বা ধনী কেও বা গরীব। তাই বলে কি ধনী ভাই—পণ্ডিত ভাই আজ মূর্খ—গরীবকে পদাঘাত ক'রে দূরে তাড়িয়ে দিবে? না তার উন্নতি দেখ্‌লে হিংসায় জ্বলে মরবে? ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমরা তা পারি না। আমরা আর কিছু না পারি এই এক গ্রামে যাদের নিয়ে বাস করছি, যাদের পরিশ্রমের অন্নে আমার শরীর পোষণ হচ্ছে—যারা সুখে দুঃখে আমার সঙ্গী তাদের মঙ্গল কামনা করাও কি উচিত নয়? আমি যদি প্রকৃতই আমার নিজের মঙ্গল চাই তবে সকলের মঙ্গল কামনা করতেই হবে। নতুবা মনের এক কোণে একটুও ঘৃণা বিদ্বেষ পড়ে থাক্‌লে সকল মঙ্গল অমঙ্গলেরই নামান্তর হবে। তাই আজ আপনাদের সকলকে আমি হাতজোড় ক'রে বলছি, আজ একবার অতীতের সব তুচ্ছ কথা ভূলে যান, এবং নূতন জীবনের নূতন উদ্যম কাজে লাগিয়ে ভগবানের প্রকৃত আরাধনা আরম্ভ করি। আমি যত দোষ ক'রেছি তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। বরং আমায় আরও যদি কিছু সাজা দিতে হয় দেন তারপর গ্রামের দিকে দেশের শোচনীয় অবস্থার দিকে চেয়ে দেখুন।" বলিয়া কিশোরী-মোহন বাবু জোড় হাত করিয়া করুণ দৃষ্টিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দিকে চাহিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"তা যাক্ সে সব কথা তুমিও ভূলে যাও। এখন তুমি নিজের কুটুম্বদের সঙ্গে একটা রফা কর। ওটাতেই সব গণ্ডগোল হ'য়ে বসে আছে। তারপর বিয়ের ব্যাপারটাতে আবার তুমি এমন একটা ছেলে মানুষী ক'রে ফেল্‌লে যে তার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। মেয়েটাকে একেবারে ভাসিয়ে ফেল্‌লে।"

এ সব কথা কিশোরীমোহন বাবুর হৃদয়ে এমন একটা আঘাত দিল

যে তিনি ভিতরে বৃশ্চিক দংশন অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা সে যা হবার হয়েছে, আর ফিরবে না, এখন আপনারা অনুগ্রহ ক'রে কীর্ত্তন শুনতে যাবেন"। বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে একাকী ছিলেন না, কাছে দুই একজন অনুচর ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন,—"এখন পথে এসেছে। বাবা! বিনোদ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে চালাকি! সাত সাগরের জল খাইয়ে তবে ছাড়বে। আস্পর্দ্ধা বড় কম হয় নাই, কিন্তু জব্দও বেশ হয়েছে, কি বলেন ভট্‌চার্জ দাদা?" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনোযোগ ওদিকে ছিল না, তিনি কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। তাই অন্যমনস্ক ভাবেই বলিলেন—"তা আর কি হয়েছে—যাক্"।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅজিতনাথ সরকার।

কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪) অর্থ।

অর্থ অর্থাৎ বিষয়। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, আকাশের গুণ শব্দ। এই ভূতগুণগুলি ইন্দ্রিয়ের অর্থ অর্থাৎ বিষয়।

(৫) বুদ্ধি।

বিষয়গুলি আত্মার ভোক্তব্য। ভোগ্যবস্তুর আকারে বুদ্ধি আকারিত হয়। অতএব ভোগ ও বুদ্ধি এক কথা। বুদ্ধি অর্থাৎ উপলব্ধি বা জ্ঞান। সাংখ্যমতে বুদ্ধি জড়। জ্ঞান বুদ্ধির বিষয়েন্দ্রিয়ের—সন্নিকর্ষের

পরিণাম। তাহার অপর নাম বৃত্তি। সেই জ্ঞান চেতনপুরুষে অর্থাৎ আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্বের নাম উপলব্ধি বা বোধ। কিন্তু বুদ্ধির যদি জ্ঞান হয়, বুদ্ধি অচেতন হইবে কি করিয়া ? চেতনেরই জ্ঞান হয়, অতএব বুদ্ধি চেতন বলিতে হইবে। আবার বুদ্ধি চেতন হইলে এক শরীরে বুদ্ধি ও আত্মা উভয় চেতনের সমাবেশ হয়, উহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব আত্মা অচেতন বলিতে হইবে।

(৬) মন।

মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ। স্মৃতি, অনুমান, সংশয়, স্বপ্নদর্শন, কল্পনা, সুখদুঃখানুভব, ইচ্ছা প্রভৃতি মনের লক্ষণ। মনের আর একটি লক্ষণ আছে, এক সময়ে বহু জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া। গন্ধ ইহা, রস ইহা, স্পর্শ ইহা, এরূপ জ্ঞান পর পর হয়। যুগপৎ নানা জ্ঞান না হওয়া মনের একটা লক্ষণ। মনের সংযোগ বিনা কেবল ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জ্ঞান হয় না। কথায় বলে, অন্যমনস্কহেতু দেখিতে বা শুনিতে পায় নাই। কেবলমাত্র বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগহেতু জ্ঞান হইলে এক সময় বহু জ্ঞান হইত।

(৭) প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তি ত্রিবিধ :—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। দানাদি কায়িক, হিতোপদেশ বাচিক, দয়াদি মানসিক প্রবৃত্তি। ইহারা ধর্ম্ম বা পুণ্যের হেতু। হিংসাদি শারীরপ্রবৃত্তি, পরদ্রোহাদি মানসিকপ্রবৃত্তি। ইহারা অধর্ম্ম বা পাপের হেতু।

(৮) দোষ।

প্রবৃত্তির হেতু দোষ। দোষ ত্রিবিধ :—রাগ, দ্বেষ, মোহ। আসক্তি রাগ, অমর্ষ দ্বেষ, মিথ্যাজ্ঞান মোহ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ প্রভৃতি রাগের অন্তর্গত। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ, দ্বেষের অন্তর্গত। বিপর্য্যয় (মিথ্যাজ্ঞান), বিচিকিৎসা (সংশয়), মান ও প্রমাদ মোহের অন্তর্গত।

(৯) প্রেত্যভাব।

পুনঃ পুনঃ জন্ম ও পুনঃ পুনঃ মরণ, এই জন্ম-মরণ প্রবাহের নাম

প্রেত্যভাব। জন্ম-মরণ প্রবাহ কবে আরব্ধ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু উহার শেষ আছে, এই সমাপ্তি স্থান অপবর্গ।

(১০) ফল।

জীব দোষ প্রেরিত হইয়া যে সকল কাজ করে, উহা দ্বিবিধ, সুখ-বিপাক ও দুঃখবিপাক। বিপাক অর্থাৎ পরিণাম। দেহ ছাড়া সুখ দুঃখ ভোগ হয় না, অতএব দেহও ফল।

(১১) দুঃখ।

বাধনা, পীড়া, তাপের নাম দুঃখ। পীড়া এবং পীড়াপ্রদ পদার্থ দুঃখ। যে সর্ব্বদা দুঃখ দর্শন করে, সে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। যে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়, তার বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্য হইতে দুঃখের নিরোধ হয়। অপবর্গে আত্যন্তিক দুখের অবসান হয়।

(১২) অপবর্গ।

অপুনর্জ্জন্মাই অপবর্গ বা মোক্ষ। ইহারই নাম অভয়পদ ব্রহ্মপদ বা শান্তি। কেহ কেহ বলেন, নিত্যসুখই মোক্ষ। আত্মায় মনসংযোগ হইলে নিত্যসুখ হয়। কিন্তু অপবর্গের অপর নাম কৈবল্য অর্থাৎ কেবল হওয়া। মনঃসংযোগ থাকিলে কেবল হওয়া যায় না। কেহ বলেন, যোগ-সমাধিতে নিত্যসুখ হয়। যোগ-সমাধি-জাত ধর্ম্ম নশ্বর। যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা নশ্বর। অতএব যোগসমাধিতে নিত্যসুখের আশা নাই। দেহের অবসানে নিত্যসুখ পাইতে হইলে, নিত্যদেহের আবশ্যক। কিন্তু নিত্যদেহ প্রমাণবিরুদ্ধ। নিত্যসুখ উপার্জ্জন করিব, ইহা বন্ধন, মোক্ষ নহে। সব সুখই দুঃখ-সংস্পৃষ্ট, অতএব সুখের অনুসন্ধান মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য নহে। অতএব দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে চিন্তা করেন, এই জন্ম, ইহাতে কেবল দুঃখভোগ, আত্মার সর্ব্বদা নানা ক্লেশ, সে ব্যক্তি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়। নির্ব্বেদ হইতে তার বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্যের প্রভাবে অপবর্গ হয়। অপবর্গ অর্থাৎ জন্ম-মরণ-প্রবাহের সমুচ্ছেদ ও তাহাতে সর্ব্বদুঃখের বিরাম।

(৩) সংশয়—সন্দেহ বা অনবধারণ জ্ঞান।

(৪) প্রয়োজন—যে উদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন ; যেমন সুখ ও দুঃখাভাব।

(৫) দৃষ্টান্ত।

(৬) সিদ্ধান্ত—নিশ্চয়।

(৭) অবয়ব পাঁচটি—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।)

(৮) তর্ক—তত্ত্বজ্ঞানের জন্য একতর পক্ষের সম্ভাবনার নাম তর্ক।

(৯) নির্ণয়—পরপক্ষ দূষণ ও স্বপক্ষ স্থাপন দ্বারা অর্থের নিশ্চয়।

(১০) বাদ—পরপরাজয়ের জন্য নহে, কেবলমাত্র তত্ত্বনির্ণয় জন্য যে কথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে বাদ বলে।

(১১) জল্প—তত্ত্বনির্ণয় উদ্দেশ্য নহে, কেবল জয়েচ্ছু ব্যক্তির কথার নাম জল্প।

(১২) বিতণ্ডা—নিজের কোন পক্ষ নাই, কেবল পরপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশে যে কথা ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম বিতণ্ডা।

(১৩) হেত্বাভাস—হেতুর মত অথচ হেতু নয়, তার নাম হেত্বাভাস।

(১৪) ছল—বক্তার বাক্যের বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষোদ্ভাবন করার নাম ছল।

(১৫) জাতি—ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া সমানধর্ম্ম বা বিরুদ্ধধর্ম্ম বলে, দোষোদ্ভাবন করার নাম জাতি।

(১৬) নিগ্রহ—যাহার দ্বারা বিচারকারীর বিপরীত জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহার নাম নিগ্রহ স্থান।

গোতম মতে এই ষোলটী পদার্থের জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইবে।

—শ্রীবিহারীলাল সরকার।

সায়াহ্ন চিন্তা

এ দেহ সত্য নয়
মিথ্যা, মিথ্যা
বড় মিথ্যাময়।
এত আদরের দেহ
চিতার আগুনে ওগো,
হয়ে যাবে লয়॥
সত্যই কি ছাড়িব এ ধরা ?
কই কই প্রাণ কেন
নাহি দেয় সাড়া!
কহ কহ কাল
বাঁচিব কি চিরকাল
কিংবা হয়ে যাব এক
সিন্ধু মাঝে হারা!!

এ যদি ভীষণ সত্য
তবে,
বল, বল অন্তর্যামী!
কেন, কেন আসিয়াছি
ভবে,
লয়ে নশ্বরতা আমি ?
কোন্ প্রয়োজনে
বল কোন্ হেতু।
বাঁধিয়াছ এপারে ওপারে
এমন সুদৃঢ় করে
এক মরণের সেতু!!

কিংবা কেন বা আমারে
এমন নশ্বর করে
গড়িয়া পাঠালে এক
মাটীর পুতুল।
ওগো, তুমি ভীষণ খেয়ালি
এ তব কেমন হেঁয়ালি
কিংবা এ তব
চিরন্তন ভুল ?
এমন খেয়ালে ওগো,
কিবা কিবা প্রয়োজন ?
নাচায়ে পুতুল দলে
ডুবাইয়া দাও জলে
শুনাও খেলার ছলে
প্রলয় গর্জ্জন !!
ওরে, ওরে মূর্খ নর
এ কি তোর ঘর
এ যে শুধু মরণ আশ্রয় !
ওই যে হেরিছ দূরে
অন্ধকারে আছে ঘিরে
অজানা বিজন প্রদেশ,
সেথা তোর দেশ !
ওরে, মূর্খ নর
হেথা তুই পর
তোর ঘর
সেথায় নিশ্চয় !
এযে শুধু মরণ আশ্রয় !!

—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

মাধুকরী

সারদামণি দেবী—সারদামণিকে এইরূপ পীড়িত অবস্থায় আসিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন।

"ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজ বাবু (মথুর বাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?" ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন চারিদিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্যলাভ করিলেন।

ঐ তিন চারি দিন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দিনরাত নিজ গৃহে রাখিয়া ঔষধ পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবৎ ঘরের নিকট তাঁহার থাকবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সারদামণি এখন বুঝিলেন, রামকৃষ্ণ আগে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনি আছেন, তাঁহার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও করুণা পূর্ব্ববৎ আছে। তিনি প্রাণের উল্লাসে পরমহংসদেব ও তাঁহার জননীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন, এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েক দিন পরে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণ পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে মনোনিবেশ করিলেন। অবসর পাইলেই তিনি সারদামণিকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকিবে, তিনি তাহাকেই দর্শন দানে কৃতার্থ করিবেন। তুমি ডাক ত তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে।" কেবল উপদেশ দেওয়াতেই রামকৃষ্ণের শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবসিত হইত না। তিনি শিষ্যকে নিকটে নিকটে রাখিয়া, ভালবাসায় সর্ব্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া

তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিতেন ; পরে শিষ্য উহা কাজে কতদূর পালন করিতেছে, সর্ব্বদা সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রম বশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। সারদামণির সম্বন্ধেও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামান্য বিষয়েও রামকৃষ্ণের এরূপ নজর ছিল যে, তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠ্‌বে, আর নামবার সময় কোনও জিনিস নিতে ভুল হ'য়েছে কিনা, দেখে শুনে সকলের শেষে নাম্‌বে।"

কথিত আছে, সারদামণি একদিন এই সময় স্বামীর পদ-সম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সত্য দেখিতে পাই।' রামকৃষ্ণ সকল নারীর মধ্যে, —অতি হীন চরিত্রা রমণীর মধ্যেও বিশ্বের জননীকে দেখিতেন।

"উপনিষৎকার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী-সংবাদে শিক্ষা দিতেছেন— 'পতির ভিতর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয় ; স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই, পতির মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫ম ব্রাহ্মণ)।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ ও সারদামণি এক শয্যায় রাত্রি যাপন করিতেন। দেহ-বোধ-বিরহিত রামকৃষ্ণের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণ যাহা বলিতেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, সারদামণি দেবীও যদি সম্পূর্ণ কামনাশূন্য না হইতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণের 'দেহ-বুদ্ধি আসিত কিনা, কে বলিতে পারে?' পৃথিবীর নানা কার্য্যক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ লোকদের পত্নী দিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তাঁহারা উঁহাদের সহায় হইয়া, উঁহাদের জীবন-পথ সর্ব্ববিধ সাংসারিক বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত না রাখিলে, উঁহারা এত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন না। অনেক মহৎ লোকের পত্নী

কেবল যে পতিকে সংসারের খুটিনাটী ও নানা ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি দেন, তা'নয়,—অবসাদ, নৈরাশ্য ও বলহীনতার সময়, তাঁহার হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহেরও সঞ্চার করিয়া থাকেন। আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্ত্তির অন্তরালে সারদামণি দেবীর মূর্ত্তি এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে, রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও যখন রামকৃষ্ণের মনে একক্ষণের জন্যও দেহবুদ্ধির উদয় হইল না এবং যখন তিনি সারদামণি দেবীকে কখন জগন্মাতার অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রামকৃষ্ণ আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাবিয়া, ষোড়শী পূজার আয়োজন করিলেন এবং সারদামণি দেবীকে অভিষেকপূর্ব্বক পূজা করিলেন। পূজাকালের শেষদিকে সারদামণি বাহ্যজ্ঞানরহিতা ও সমাধিস্থা হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

ইহার পরও তিনি অহঙ্কৃত হন নাই, তাঁহার মাথা বিগ্‌ড়াইয়া যায় নাই।

ষোড়শীপূজার পর তিনি প্রায় পাঁচ মাস দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় রন্ধনাদি দ্বারা রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতেন এবং দিনের বেলা নহবৎ ঘরে থাকিয়া রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন। সকল প্রকারের খাদ্য ও রন্ধন রামকৃষ্ণের সহ্য হইত না বলিয়া, অনেক সময়েই তাঁহার জন্য আলাদা রান্না করিতে হইত। সেই সময় দিবারাত্র রামকৃষ্ণের 'ভাব-সমাধির বিরাম ছিল না' এবং কখন কখন 'মৃতের লক্ষণসকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত।' কখন রামকৃষ্ণের সমাধি হইবে, এই আশঙ্কায় সারদামণির রাত্রে নিদ্রা হইত না। এই কারণে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া, রামকৃষ্ণ নহবৎ-ঘরে নিজের মাতার নিকটে তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে এক বৎসর চারি মাস দক্ষিণে-

শ্বরে থাকিয়া, সারদামণিদেবী সম্ভবতঃ ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে কামারপুকুরে ফিরিয়া আসেন।

তখনকার কথা স্মরণ করিয়া সারদামণিদেবী উত্তরকালে স্ত্রী-ভক্ত-দিগকে বলিতেন—

"সে যে কি অপূর্ব্ব দিব্যভাবে থাক্‌তেন, তা ব'লে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হ'য়ে যাওয়া—এই রকম সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌ত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে। ভাব-সমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না;—একদিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে, ভয়ে কেঁদে-কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কাণে নাম শুনাতে শুনাতে, তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়। তারপর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে, তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন—এই রকম ভাব দেখলে, এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখলে, এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হ'ত না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁস হ'ত।

সারদামণি দেবী বলিতেন—এইরূপে প্রদীপে শল্‌তেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ী যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্ত্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্য্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহিলা দক্ষিণেশ্বরে রাম-কৃষ্ণের দর্শনে আসিয়া নহবৎখানায় সমস্ত দিন থাকিতেন। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর জন্য রন্ধন ব্যতীত ইঁহাদের জন্য রান্নাও সারদামণি করিতেন। কখন কখন বিধবাদের জন্য গোবর গঙ্গাজল দিয়া তিনবার উনুন পাড়িয়া আবার রান্না চড়াইতে হইত।

একবার পাণিহাটীর মহোৎসব দেখিতে যাইবার সময় রামকৃষ্ণ জনৈক স্ত্রীভক্তের দ্বারা সারদামণি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি

যাইবেন কিনা ;—'তোমরা ত যাইতেছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক।' সারদামণি দেবী ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন,—'অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি যাইব না।' তাঁহার এই না-যাওয়ার সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া পরে রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—'অত ভিড় —তাহার উপর ভাব সমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল,—ও (সারদামণি) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত 'হংস হংসী এসেছে।' তারপর পত্নীর বুদ্ধির ও নির্লোভিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন—

"মাড়োয়ারী ভক্ত (লছ্মীনারাণ) যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাহিল, তখন আমার মাথায় যেন করাত বসাইয়া দিল ; মাকে বলিলাম, —'মা ! এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে আসিলি !' সেই সময় ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকিয়া বলিলাম,—'ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলিয়া তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লওনা কেন, কি বল ?' শুনিয়াই ও বলিল,—'তা কেমন করিয়া হইবে ? টাকা লওয়া হইবে না—আমি লইলে, ঐ টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ আমি উহা রাখিলে, তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না ; সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে,—তোমার ত্যাগের জন্য ; অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।' ওর ঐ কথা শুনিয়া হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি।"

যাঁহাকে দরিদ্রতাবশতঃ বিপৎ-সঙ্কুল দুই তিন দিনের পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাইতে হইত, ইহা সেইরূপ অবস্থায় নারীর নিস্পৃহতার ও সুবিবেচনার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

সারদামণি দেবী পানিহাটীর মহোৎসব দেখিতে না যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "প্রাতে উনি আমাকে যেভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম, উনি মন খুলিয়া অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন—'হাঁ, যাবে বৈ কি'। ঐরূপ না করিয়া

উনি ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপরে ফেলিয়া বলিলেন, 'ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক,' তখন স্থির করিলাম যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

সারদামণি দেবী বাঙ্গালী হিন্দু-কুল-বধূ, সুতরাং সাতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে নহবৎখানায় তিনি দীর্ঘকাল স্বামীর ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অল্প লোকেই তাঁহাকে দেখিতে পাইত। রাত্রি তিনটার পর কেহ উঠিবার বহু পূর্ব্বে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি যে ঘরে ঢুকিতেন, সমস্ত দিবস আর বাহিরে আসিতেন না,—কেহ উঠিবার বহু পূর্ব্বে নীরবে নিঃশব্দে আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পূজা জপ ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবৎখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবার কালে তিনি এক দিবস এক প্রকাণ্ড কুম্ভীরের গাত্রে প্রায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। কুম্ভীর ডাঙ্গায় উঠিয়া সোপানের উপরে শয়ন করিয়াছিল; তাঁহার সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। তদবধি সঙ্গে আলো না লইয়া তিনি কখন ঘাটে নামিতেন না। এইরূপ স্বভাব ও অভ্যাস সত্ত্বেও স্বামীর কঠিন কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে অবস্থানের সময় "এক মহল বাটীতে, অপরিচিত পুরুষ সকলের মধ্যে, সকল প্রকার শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিয়া তিনি যে ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" "ডাক্তারের উপদেশ মত সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র সারদামণি দেবী আপনার থাকিবার সুবিধা-অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ ভার সানন্দে গ্রহণ করেন।—তিনি সেখানে থাকিয়া সর্ব্ব প্রধান সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।" তিনি তখনও রাত্রি ৩টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন, এবং রাত্রি ১১ টার পর মাত্র দুইটা পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন। হিন্দু-কুল বধূ হইলেও তিনি প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বসংস্কার ও অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ও সাহসের সহিত যথাযথ আচরণে কতদূর সমর্থ ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি ঘটনার বিবরণ দিতেছি।

স্বল্পব্যয়সাধ্য যানের অভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে সেকালে সারদামণি দেবী অনেক সময়ে জয়রাম-বাটী ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বর হাঁটিয়া আসিতেন। আসিতে হইলে পথিকগণকে ৪।৫ ক্রোশ ব্যাপী তেলোভেলো ও কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তরদ্বয়ে তখন নরহন্তা ডাকাইতদের ঘাটি ছিল। প্রান্তরের মধ্যভাগে এখনও এক ভীষণ কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'তেলোভেলোর ডাকাতে-কালীর পূজা করিয়া ডাকাতেরা নরহত্যা ও দস্যুতায় প্রবৃত্ত হইত। এই কারণে লোকে দলবদ্ধ না হইয়া এই দুইটা প্রান্তর অতিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

একবার রামকৃষ্ণের এক ভাইপো ও ভাইঝি এবং অপর কয়েকটি স্ত্রীলোক ও পুরুষের সহিত সারদামণি দেবী পদব্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরামবাগে পৌঁছিয়া তেলোভেলো ও কৈকলার প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও রাত্রি-যাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকিলেও সারদামণি দেবী আপত্তি না করিয়া তাঁহাদের সহিত অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা বার বার আগাইয়া গিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তিনি নিকটে আসিলে আবার চলিতে লাগিলেন। শেষবার তাঁহারা বলিলেন, এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকাইতের হাতে পড়িতে হইবে। এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া তিনি তখন তাঁহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছে বিশ্রাম করগে, আমি যত শীঘ্র পারি, তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।' তাহাতে সঙ্গীরা বেলা বেশী নাই দেখিয়া জোরে হাঁটিতে লাগিল ও শীঘ্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। সারদামণি দেবীও, ক্লান্তি সত্ত্বেও যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রান্তরমধ্যে পৌঁছিবার কিছু পরেই

সন্ধ্যা হইল। বিষম চিন্তিতা হইয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, দীর্ঘাকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ লাঠি কাঁধে লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। তাহার পিছনেও তাহার সঙ্গীর মত কে যেন একজন আসিতেছে মনে হইল। পলায়ন বা চীৎকার বৃথা বুঝিয়া তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা তাঁহার কাছে আসিয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে গা এসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ? সারদামণি বলিলেন, 'বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমিও বোধ হয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে করে' যদি তাদের নিকট পৌছিয়ে দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন। আমি তাঁরই নিকট যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্য্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও, তাহ'লে তিনি তোমায় খুব আদর যত্ন কর্‌বেন। এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে পিছনের দ্বিতীয় লোকটীও তথায় আসিয়া পৌছিল, এবং সারদামণি দেবী দেখিলেন, সে স্ত্রীলোক, পুরুষটির পত্নী। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্তা হইয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলাম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়্‌লে, নইলে কি কর্‌তাম বল্‌তে পারি নে।'

প্রবাসী— (ক্রমশঃ)

বৈশাখ —শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গলার সমস্যা—শিক্ষার অভাব—প্রশ্ন হইতেছে যে শিক্ষা মানে কি? এবং কিরূপ শিক্ষা পাইলে গ্রামবাসীদের উন্নতি হইতে পারে?

শিক্ষা মানে বি-এ, এম্‌-এ, পাশ করা নয়। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে তাহার চরিত্রের উন্নতির সহায়ক এবং তাহার মধ্যে যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকে তাহাদের পূর্ণতা ও বিকাশপ্রাপ্তির সাহায্য করে। একজন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় তথাকথিত চাষী বি-এ, পাশ করা কামকাঞ্চন তাড়িত

ভদ্র অপেক্ষা বেশী শিক্ষিত—যদিও সে চাষী, কথায় কথায় ইংরাজী ভাষা বলিতে পারে না। ধর্ম্মহীন শিক্ষা চিরকালই কুশিক্ষা, কারণ ধর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম কখনও সম্ভব হয় না। ধর্ম্মহীন ব্যক্তিরা যতই কেন আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হউন না কেন, কার্য্যকালে কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা দেখাইয়া থাকেন। আধুনিক ইউনিভার্সিটি প্রদত্ত শিক্ষা তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে, যে এই দেশের পক্ষে বিশেষতঃ পল্লী-গ্রামবাসীদের পক্ষে অনুপযুক্ত। তাহার প্রধান কারণ এই যে তাহা ছেলেদের নৈতিক চরিত্রের কোনও সাহায্য করে না। এবং তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও উপায় করিয়া দিতে পারে না। এই শিক্ষা পাইয়া দেশে কতকগুলি নাস্তিক ও ভিক্ষুক দলের সৃষ্টি হইতেছে। পল্লীবাসী শ্রমিকদের উচ্চশিক্ষা বা ইউ-নিভার্সিটি শিক্ষার কিছুই দরকার নাই। সেন্সাস হিসাবে, যাহাকে literate বলে সেইরূপ কিছু লিখিতে বা পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট। তাহা-দের প্রথম শিক্ষাই দিতে হইবে যাহাতে তাহাদের নৈতিক জীবনের উন্নতি হয় এবং বিলাসিতা তাহারা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে পারে। এই নৈতিক চরিত্রই আমাদের সম্মানের কষ্টি পাথর হওয়া উচিত। এমন সময় গিয়াছে যখন পল্লীবাসীরা যৎসামান্য কাপড় চোপড়েই সন্তুষ্ট থাকিত এবং উত্তরীয় সম্বল ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত তাঁহাদের পূত চরিত্রের জন্য। আর এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং তথাকথিত হোমরা চোমরাদের অন্ধ অনুকরণ ফলে জুতা জামা প্রভৃতি পরিয়া ইহারা-তৃপ্ত হয় না। ইহাদের শিখাইতে হইবে ভোগে কখনও তৃপ্তি হয় না। বরং লালসা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া যায়। এই জন্যই ভারতের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা ত্যাগ। এই শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াই আজ আমাদের এত দুর্দ্দশা ও অধঃপতন।

প্রত্যেক পল্লীগ্রামের প্রধান অভাব বিদ্যালাভ। ইহার প্রধান কারণ এই যে গ্রামের ধনী লোক ও জমীদারেরা প্রায়ই সহরে বাস করেন, প্রত্যেক পল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছোট ছোট বিদ্যালয় স্থাপন করা বিশেষ দরকার। আর এইসব বিদ্যালয়ে সাজসরঞ্জাম কিছুই দরকার হয় না। কাজেই এইসব স্কুলের খরচের বিশেষ দরকার হইবে না, উদা-

হরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বসিবার জন্য চাটাই ও মাদুর হইলেই যথেষ্ট, চাই কেবল কতকগুলি স্বার্থহীন পরিশ্রমী যুবকের দল। গ্রীষ্মাবকাশে ও পূজার ছুটিতে স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা নিজ নিজ গ্রামে গিয়া ইচ্ছা করিলে এই প্রকার বিদ্যালয় স্থাপনের সাহায্য করিতে পারেন। বিশেষতঃ নৈশ-বিদ্যালয়। এই সব স্কুলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই জন্য শিক্ষার ব্যাবস্থা করা উচিত এবং স্থানীয় ডাক্তারবৃন্দের সাহায্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সহজ ও সরল ভাষায় উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। স্কুলের আদর্শ হইবে—

"ত্যাগে সুখ—ভোগে কভু নয়"।

শিখাইতে হইবে মানুষ মানুষমাত্রকেই ভালবাসিতে বাধ্য তা সে চামারই হউক, বা মালোই হউক। নরই নারায়ণ এবং মানুষকে সেবা করিলে নারায়ণকে সেবা করা হয়—এই সেবাধর্ম্মই কলির প্রধান ধর্ম্ম। সমাজকে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বার্থের বশে আজ পদদলিত করিতে পার, ইহার ফলে তোমাকেও পঙ্গু হইতে হইবে।

পূর্ব্বের ন্যায় বারওয়ারীতে গ্রামে গ্রামে যাত্রা কথকথা প্রভৃতির পুনঃবিস্তার করিতে হইবে কারণ এই যাত্রা ও কথকথার সাহায্যে পূর্ব্বে পল্লীবাসীরা অনেক সদুপদেশ পাইত। এবং তাহাদের নৈতিক শিক্ষা লাভের এইগুলি প্রশস্ত উপায় ছিল। তবে এই সব বারওয়ারী এবং যাত্রা প্রভৃতির আমূল সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ দেখা যায় অনেকস্থলে এ সব বারওয়ারীতে পূর্ব্বের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া আয়ের দোহাই দিয়া জুয়াখেলা বারাঙ্গণা প্রভৃতির প্রশ্রয় দিতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসীদের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সব অর্থগৃধ্নু লোকদের সমাজ হইতে বিশেষ শাসন দরকার।

ডাঃ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্-বি।

কর্ম্ম

সংসারে কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। আমাদিগকে কর্ম্মের উপায় এবং উদ্দেশ্য উভয়ের প্রতি সমান ভাবে মনযোগ দান করিতে হইবে। আমরা যেরূপ কর্ম্ম করিব তদুপযুক্ত কর্ম্ম ফল আসিতে বাধ্য। তবে আমরা যেন কোন কর্ম্মেই আসক্ত না হই, যেন নিজেকে বন্ধনে না ফেলি। যেরূপ কর্ম্মই করি না কেন আবশ্যক মত তাহা ত্যাগ করিবার ক্ষমতা যেন আমাদের হস্তগত থাকে। আমরা যে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারি না, তাহার কারণ কেবল দুর্ব্বলতা। তমঃগুণময়ী মায়ার করাল গ্রাসে পড়িয়া এখন আমরা জড়বৎ হইয়াছি, সেইজন্য এখন আমাদের প্রাণে স্পন্দন নাই, হৃদয়ে বিকাশ নাই, ইচ্ছা-শক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারে নাই বলিলেও হয়। আমাদের সুখানুভূতি নাই, আবার বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, যেন আমরা জড় অপেক্ষা জড়, দুর্ব্বল অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়াছি। এখন আমাদের রজঃগুণ দ্বারা সেই প্রবল তমঃগুণকে দূর করিতে হইবে। অভ্যাস দ্বারা নিঃস্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ও গীতার এই মহৎ বাক্য—

শ্রেয়োহি * * *

* * * কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥

১২ অঃ ১২ শ্লোক গীতা।

—উপলব্ধি করিতে হইবে। যতদিন আমাদের ভোগে বিতৃষ্ণা ও দেহকে মহাবন্ধন বলিয়া মনে না হইবে ততদিন আমরা নিঃস্কাম কর্ম্মী হইতে পারিব না। যতদিন আমরা কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইব ততদিন আমাদের ঠিক ঠিক কর্ম্মী হওয়া অসম্ভব। কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল অবশ্য আসিবে, কিন্তু আমাদিগকে ফলেরদিকে লক্ষ না করিয়া শুধু ঠিক ঠিক কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। যেমন কোন পাত্র জলে পরিপূর্ণ

করিবার পূর্ব্বে তাহার মধ্যস্থিত বাতাস সম্পূর্ণরূপে বহির্গত না হইলে, তাহা পরিপূর্ণ হওয়া অসম্ভব; তদ্রূপ আমাদের হৃদয় কামনা শূন্য না করিলে আমাদের মধ্যেও নিঃস্কাম কর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি আসা অসম্ভব। ঐ শোন! স্বামিজী বজ্র নির্ঘোষে বলিতেছেন ;—

"কর্ম্মফলে আমাদের নাহি অধিকার।
কাজ কর করে মর এই হয় সার॥"

তাঁহার প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে যেরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, আমাদিগকেও সেইরূপ কর্ম্মবীর হইতে হইবে। অপরের সেবার জন্য, হিতের জন্য, শান্তির জন্য আমাদের এই হাড় মাসের খাঁচাটাকে বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ঠিক ঠিক নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। কেবল আমাদিগকে এইটুকু চিন্তা করিলেই যথেষ্ট হইবে যে যখন এ খাঁচাটাকে চিরকাল রাখিতে আমরা অসমর্থ, এমন কি রাখিবার চেষ্টা করিলেও জোর করিয়া কাল কাড়িয়া লইবে, কিছুতেই পরিত্রাণ নাই, তখন একটা ভাল উদ্দেশ্যে খাঁচাটাকে উৎসর্গ করা উচিৎ নয় কি? যখন আমরা এই ভাবটি মনমধ্যে অঙ্কিত করিয়া, নিঃস্বার্থের অগাধ সলিলে আত্মবিসর্জ্জন দিব, তখন দেখিতে পাইব,—কই! আমরাত একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিই নাই, কিম্বা বিসর্জ্জন দিয়াছি বলিয়া হারাইয়া ফেলি নাই, পরন্তু আমাদের আত্মার প্রসারই হইয়াছে, আমাদের সসীম আত্মা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বিশ্বাত্মার আত্ম-স্বরূপের মধ্যে বিলীন হইতে চলিয়াছে।

—শ্রীবিমলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিবেদিতা

'তুষার সাগরে কমল ফুটেছে'
একি অপরূপ কথা ;
মরু-উদ্যান-শোভিনী গোলাপ
নহে—নহে বনলতা ।
হিম সায়রের প্রাণের প্রতিমা,
নাহারে নীরুজা লতা !
সুরভি সুরমা ঝরিতেছে মরি সুবরণ শতদলে !
পূরবের নব অরুণিমা কিবা অমল আননে ঝলে ॥
লালসার বুকে একি এ দহন—ধূর্জ্জটি ললাটিকা ?
সজল শীতল জলদের মাঝে, অনল বিজলী লেখা !
কে তুমি ভামিনী, দীপ্তা দামিনী !
হে বিভূতি বিভূষণা !
লাবণ্য লতিকা, জ্যোতি প্রদীপিকা, পূর্ণ ইন্দু নিভাননা !
প্রতীচির হিম কুহেলি গগনে, প্রাচীর আশার উষা,
কম কাঞ্চন বিজলী উজল নব গৈরিক ভূষা ।
ত্যজি ইহসুখ, বিষয় বিমুখ,
যৌবনে কে এ যোগিনী ?
হে জ্ঞান গরিমাময়ি নিরুপমা, হোমশিখা স্বরূপিনী !
কোথায় ভারত—কোথা বৃটেনিয়া রাজ্ঞী সে গরবিনী ॥
চির বরণীয়া নারীকুলে তাঁর নন্দিনী আদরিণী,
চির প্রতিভার বিভায় দীপ্তা মহা মনীষায় ভরা
হৃদে তব কার পাতিলে আসন দেখে বিস্মিত ধরা—
ভিখারীর দেশে ভিখারিণী বেশে নিবেদিতা কেগো তুমি ?
গুরু আরাধনা মগন জীবনে উজলিলে তপোভূমি !

যাপিয়া গিয়াছ নীরব সাধনে যে জীবন অনাদরে,
বিজয়িনী আজি হে অপরাজিতা তাহাদেরি অন্তরে !
আজি ভারতের কণ্ঠমালায় তুমি যে মধ্য মণি ।
আজি ভারতীর বীণায় ধ্বনিছে তব কণ্ঠের ধ্বনি !
ঘোরা তামসীর সীমন্ত শোভা নবীনা ইন্দু লেখা,
স্ফুরে পথ হারা পান্থের চোখে সিতালোক বর্ত্তিকা,
কোন্ সাগরের নিবিড় নীলিমা,
কোন্ অতলের নিধি !
কোন্ ধেয়ানীর মানসী প্রতিমা,
দূর অতীতের সতীর সাধনা
জীবনে তোমার জাগে,
যোগী শঙ্কর প্রদানিতে বর,
তাই কি শরীর মাগে ।
অয়ি দেবি, তব পাবন চরিত
সাধনা সে নিরমল,
ভারত মানস সরসে
যেন সে প্রফুল্ল শতদল ।
ঝরে গেছে দল, কালের কবল হরেনি মাধুরী তার,
চির অক্ষয় পরিমল ময়, রূপ রস সম্ভার ।
ফুটেছিল যথা, রয়েছে তেমতি ছড়ায়ে সুরভি ধারা,
রবে সৌরভে চির গৌরবে যাবত তপন তারা ।—

—শ্রীমতী নিহারিকা দেবী ।

গ্রন্থ পরিচয়

নবীনা জননী—(উপন্যাস) শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত, মূল্য এক টাকা, প্রাপ্তিস্থল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ লেখক গঙ্গাজলঘাটী জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যখন বাহির হয় তখন মাত্র প্রাচীনের সহিত নবীনের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। 'তখন গোপনে পুত্র পীড়িতকে অর্থদান করিলে, পিতা পুত্রকে তাড়াইয়া দিতেন।' পাশ্চাত্য মিল হবস্ তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদ এবং শিশুদের মধ্যে দেশাত্ম বুদ্ধি স্ফুটনোন্মুখ। বালক বালিকারা বলপূর্ব্বক পরতন্ত্র হইয়া বিবাহের প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছে। সেই হেতু এই পুস্তকের মধ্যে Realismএর একটু আধটু গন্ধ থাকিলেও Idealism এর মধ্য দিয়া গ্রন্থকার হিন্দুর আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন। ঘটনা বৈচিত্র্য বেশ পর পর সাজান হইয়াছে কিন্তু দুই একস্থলে অসম্ভাবিত রূপে সম্বন্ধ যোজিত হইয়াছে। ভাষার গতি পুরাতন ঢঙের হইলেও তরুণের মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেসিত হইয়াছে। যাঁহারা পল্লীগ্রামের চিত্র অবগত নহেন তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে বাঙালার যথার্থ সমাজের কতকটা সত্য অবগত হইবেন। কিন্তু এই গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ draw-back হিন্দুর একটি মহৎ আদর্শকে মর্য্যাদা না করা—প্রেমাস্পদের বিরহে গৈরিক ধারণ ও তাহাকে লাভ করিয়া পুনরায় উহার বর্জ্জন। মোটের উপর পুস্তকখানি পড়িয়া কোনও পাঠক পাঠিকাই মন হইতে উহা একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না। আনন্দ ও অশ্রুর মসীতে নবীনের অভিভাষণ লিখিত হইয়াছে বলিয়া উহা ভবিষ্যতের জন্য আমাদিগকে চিন্তাশীলই করিয়া তুলে।

ম্যালেরিয়া—শ্রীউমাপদ চক্রবর্ত্তী বি, এ প্রণীত—মূল্য লেখা নাই। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, প্রসার, ফল ও প্রতিষেধ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাঠক পাঠিকা এই পুস্তক হইতে অবগত হইবেন।

অপরাপর এই ধর্ম্ম পুস্তকাগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্বৈত চৈতন্য ব্রহ্মচারী লিখিত 'শুভ-মুহূর্ত্ত,' স্বামী নিষ্কলচৈতন্য ভারতী লিখিত 'শান্তি-সঙ্গীত' এবং অচলানন্দ স্বামী লিখিত 'অচল-উক্তি'।

সংঘ-বার্ত্তা

১। বিগত ২৯শে বৈশাখ স্বর্গীয় নফর কুণ্ডু মহাশয়ের স্মৃতি সভায় স্বামী বাসুদেবানন্দ, মুক্তেশ্বরানন্দ এবং কমলেশ্বরানন্দ গমন করেন। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, পরে স্বামী বাসুদেবানন্দ ও কমলেশ্বরানন্দ "ত্যাগ-ধর্ম্ম ও নফর কুণ্ডু" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২। বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ নারায়ণগঞ্জ, মূলচর ও কলমায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হয়। পূজ্যপাদাচার্য্য সুবোধানন্দ স্বামী এবং স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ ও গোপালানন্দ নারায়ণগঞ্জে গমন করেন। স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ পূজা পাঠ করেন। প্রায় ২০০০ ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ পান। বৈকালে সভা হয়। ঐ সভায় কতকগুলি বালক আবৃত্তি করে এবং আশ্রমের বাৎসারিক রিপোর্ট জনসাধারণের নিকট পাঠ করা হয়। স্থানীয় ব্রহ্মচারী অমলচৈতন্য বক্তৃতা করেন। ৫ই ওখানকার অবৈতনিক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্যে স্বামিপাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সংবুদ্ধানন্দ, অমলচৈতন্য ও জ্যোতির্ম্ময়ানন্দও কিছু কিছু উপদেশ করেন। অপর দিকে স্বামী সহজানন্দ ও রাঘবেশ্বরানন্দ মূলচর এবং অক্ষরানন্দজী ও রামেশ্বরানন্দজী কলমায় উৎসব কার্য্য সম্পাদন করেন। ১১ই জ্যৈষ্ঠ বড্ডনগরে উৎসব হয়। সেখানেও স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ, গোপালানন্দ ও সংবুদ্ধানন্দ গমন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করেন।

৩। বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ স্বামী বাসুদেবানন্দ, কমলেশ্বরানন্দ ও মুক্তেশ্বরানন্দ মণিকাগঞ্জের অন্তঃপাতী বেলিয়াটি গ্রামে যাত্রা করেন। তাঁহাদের ঐ গ্রামে অবস্থান কালে ৮ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ সকালে ধ্রুপদ ও অপরাপর ভজন কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় আরতির পর গীতা, ভাগবত ও উপনিষদ্ পাঠ ও নানাপ্রকার সৎ প্রসঙ্গ হইত। ৯ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং স্বামী কমলেশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোমাদি সম্পাদন করেন। ঐ দিবস মন্দির প্রাঙ্গণে গীতা, ভাগবত, উপনিষদ, চণ্ডী এবং অনেক শিখ

কর্ত্তৃক গ্রন্থ-সাহেব অধীত হয় এবং শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে ইন্দারা উৎসর্গ করেন। সন্ধ্যাকালে গ্রামস্থ প্রায় সহস্রাধিক লোকে মিলিয়া নগরকীর্ত্তন বাহির করেন। ১০ই জ্যৈষ্ঠ স্বামী বাসুদেবানন্দ স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বি[illegible]ণ কার্য্য সমাধা করেন। তিনি ও স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ছাত্র, অভিভা[illegible]ক ও সমগ্র গ্রামবাসীদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ছা[illegible]রা স্বামী বাসুদেবানন্দকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করে। ১১ই জ্যৈষ্ঠ প্রায় সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণ ভোজন ও বৈকালে আশ্রমের বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সাব-ডিবিসানাল-অফিসার শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র চন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ চামারদের কাঁচা দুগ্ধ ও সিদ্ধ চাউল সমাজে চল করিয়া লইবার জন্য বহু গণমান্য ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত এক পাটি পাঠ করেন। পরে সেবাশ্রমের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ, অবৈতনিক বিদ্যালয়ের বালকগণ কর্ত্তৃক আবৃত্তি, বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ, স্বামী বাসুদেবানন্দ, কমলেশ্বরানন্দ ও অপরাপর স্থানীয় [illegible]দ্র মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সেবা-ধর্ম্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধীয় বক্তৃতা এবং সভাপতির মন্তব্যের পর সভা ভঙ্গ হয়। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হিন্দু মহাসভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া স্বামী বাসুদেবানন্দ ও মুক্তেশ্বরানন্দ ধুল্লা গ্রামে গমন করেন। দশ বার খানি গ্রামের ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণদের লইয়া এক সভার অধিবেশন হয়। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতায় শাস্ত্র ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অস্পৃশ্যতার নিরর্থকতা দেখান। পরে পণ্ডিত প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গোস্বামী মহাশয় ঐ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শেষে ব্রাহ্মণেরা গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি করিয়া নব শাখদের জল-চল করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মাণিকগঞ্জের জন সাধারণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ "হিন্দুধর্ম্ম ও বেদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং পরদিন প্রাতে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ উপনিষদ্ হইতে পাঠ করেন এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আহ্বান

অম্বরে আজি গম্ভীর রবে কাহার শিঙ্গা বাজে।
চমকি চমকি বিজলী আলোক চমকে প্রাণের মাঝে॥
আকাশের বুক চিরিয়া ফাড়িয়া
আসিয়াছে ডাক পৃথিবী নাড়িয়া
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই মহামরণের কাজে॥
হাসিছে নাচিছে শুম্ভ দলনী হুঙ্কার ঘোর ছাড়ি।
ঝক্ ঝক্ করি উঠিছে খড়্গ উজলি স্বর্গপুরী॥
গিয়াছে নিভিয়া চন্দ্র তারকা
কড়্ কড়্ কড়্ পড়িছে করকা
শোঁ শোঁ শোঁ বহিছে ঝটিকা,—মরণ-শানাই বাজে।
চল্‌রে, চল্‌রে, চল্‌রে ওভাই, মহামরণের কাজে॥
ছড়ায়ে গিয়েছে মন কুন্তল অন্ত বিহীন গগন-গায়।
দিগম্বরীর দাপটে অবনী এইবার বুঝি ধ্বসিয়া যায়॥
পলকে পলকে শিহরি শিহরি
বিশ্ব কাঁপিছে থর থর থরি
চূর্ণিত করি, ঘূর্ণিত করি ঝঞ্চা বহিছে সাঁঝে॥
চল্‌রে, চল্‌রে, চলরে ওভাই, মহামরণের কাজে॥
ঢুলিছে চামর, বাজিছে ঝাঁঝর ঝম্ ঝম্ মহারবে।
হাঁকিছে ডাকিছে বজ্রনিনাদে মৃত্যু মহোৎসবে॥
ভৈরব রবে গর্জ্জে সিন্ধু
নাচিয়া উঠিছে রক্ত বিন্দু
ঝঞ্চা বায়ুর ঝাম্‌টা হাঁকিছে, ঘোম্‌টা কি আর সাজে।
চল্‌রে, চল্‌রে চলরে ওভাই মহামরণের কাজে॥

—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১লা আষাঢ়, ১৩১৯—বেলা প্রায় চারটা। শ্রীশ্রীমা অনেকগুলি স্ত্রীভক্ত সঙ্গে বসে আছেন। আমার পরিচিতার মধ্যে তাহার ভিতরে আছেন মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী, ডাক্তার দুর্গাপদ বাবুর স্ত্রী, গৌরী-মা ও তাঁহার পালিতা কন্যা যাঁহাকে আমি দুর্গাদিদি বলে ডাকি এবং বরেনবাবুর পিসি। আর যারা আছেন, তাঁদের চিনি না। মা হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা কচ্চেন। আমাকে দেখে বললেন, 'এই যে, এস মা, বস'। আমি গৌরী-মাকে দিয়ে নীচে আফিস ঘর হতে 'নিবেদিতা,' ও 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই দুখানি আনালুম। আমার ইচ্ছা, মা 'নিবেদিতা' বই খানির কিছু শুনেন। মাও বই দেখে বল্‌ছেন 'ওখানি কি বই গা' ? আমি বল্‌লুম 'নিবেদিতা'। মা—'পড় ত মা একটু শুনি—সেদিন আমাকেও একখানি ঐ বই দিয়ে গিয়েছে, এখনও শুনা হয় নি।' যদিও অত লোকের মধ্যে পড়তে লজ্জা করতে লাগল, তথাপি নিবেদিতার সম্বন্ধে সরলাবালা কেমন সুন্দর লিখেছেন তা মাকে শুনাবার আগ্রহে ও মায়ের আদেশে পড়তে আরম্ভ করলুম। শ্রীশ্রীমা ও সমবেত স্ত্রীভক্তেরা সাগ্রহে শুনতে লাগলেন। নিবেদিতার ভক্তির কথা পড়তে সকলেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। দেখলুম শ্রীশ্রীমায়ের চোখ দিয়াও অশ্রু গড়িয়ে পড়চে। মা ঐ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—"আহা, নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল ! আমার জন্য যে কি কর্‌বে ভেবে পেত না ! রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। প্রণাম করে নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পায় ধূলো নিত। দেখতুম যেন পায়ে হাত দিতেও সঙ্কুচিত হচ্চে !" কথাগুলি বলেই মা নিবেদিতার

কথা ভেবে, স্থির হয়ে রইলেন। তখন উপস্থিত সকলেও নিবেদিতার কথা যাহা জানতেন বলতে লাগলেন। দুর্গাদিদি বললেন 'ভারতের দুর্ভাগ্য যে তিনি এত অল্পদিনে চলে গেলেন।' অপর একজন বললেন—'তিনি যেন ভারতেরই ছিলেন। নিজেও তাই বল্‌তেন। সরস্বতী পূজার দিন খালি পায়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে বেড়াতেন।' পুস্তক পড়া শেষ হল। শ্রীশ্রীমা তখনও মাঝে মাঝে নিবেদিতার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেষে বললেন "যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী, (অন্তরাত্মা) জান মা?"

এইবার মা কাপড় কেচে এসে ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দিতে বসলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন সময়ে স্বহস্তে অনেকগুলি ফুলের মালা গেঁথে বৈকালে পরিয়ে দিবেন বলে ঠাকুরের সামনে রেখেছিলেন। ব্রহ্মচারী রাসবিহারী ঐ গুলির নিকটেই ভোগের জন্য রসগোল্লা এনে রেখে গেছেন। উহার রস গড়িয়ে ফুলের মালাতে লেগে ডেয়ো পিঁপড়ে ধরেছে। মা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ছেন 'এইবার ঠাকুরকে পিঁপ্‌ড়েয় কামড়াবে গো'—'ও রাসবিহারী এ কি করেছ?'—বলে, সযত্নে পিপড়ে ছাড়িয়ে ঠাকুরকে পরিয়ে দিলেন। মা ঐরূপে সকলের সামনে নিজের স্বামীকে মালা পরিয়ে সাজিয়ে দিচ্চেন দেখে রাধুর মা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। শ্রীশ্রীমা উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দিতে গৌরী-মাকে বললেন ও সকলে প্রসাদ পেলেন।

একজন স্ত্রীভক্ত বললেন—'আমার পাঁচটি মেয়ে, মা, বিবাহ দিতে পারি নাই, বড়ই ভাবনায় আছি।

শ্রীশ্রীমা—'বিবাহ দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখ্‌বে, বেশ থাক্‌বে।'

ঐ কথা শুনে আর একজন স্ত্রীভক্ত বললেন—'মায়ের উপর যদি তোমার ভক্তি বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঐ কোরো, ভাল হবে। মা যখন বল্‌ছেন, তখন আর ভাবনা কি?' বলা বাহুল্য মেয়ের মায়ের এ সব কথা মনে ধরল না। অপর একজন বললেন—'এখন ছেলে পাওয়া কঠিন, অনেক ছেলে আবার বে কর্‌তেই চায় না।'

শ্রীশ্রীমা—'ছেলেদের এখন জ্ঞান হচ্ছে,—সংসার যে অনিত্য তা তারা বুঝ্‌তে পার্‌ছে। সংসারে যত লিপ্ত না হওয়া যায় ততই ভাল।'

সকলে চলে যেতে মাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"মা, স্ত্রীলোকদের অশুচি অবস্থায় ঠাকুরকে পূজা করা চলে কি না।" শ্রীশ্রীমা বল্‌লেন—'হাঁ মা, চলে—যদি ঠাকুরের উপর তেমন টান থাকে। এ কথা আমিও ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম *। তা তুমি পূজা কোরো, কিন্তু মনে কোন দ্বিধা এলে কোরো না।' সকলকেই যে, মা, ঐরূপ করতে বল্‌তেন, তা নয়। কারণ, দিন কয়েক পরে ঠিক এই একই অবস্থার আর একটি স্ত্রীভক্তকে বলেছিলেন, এই অবস্থায় কি ঠাকুর দেবতার কাজ করতে হয়? তা করো না। ঐরূপে মা লোকের মানসিক অবস্থা দেখে কাকে কখন কি বলতেন তা অনেক সময় বুঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

আর একদিন গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীমা দ্বিপ্রহরের আহারান্তে বিশ্রাম কর্‌ছেন। আদেশ মত তাঁর কাছে শুয়ে বাতাস করছি এমন সময়ে তিনি সহসা আপন মনেই বল্‌ছেন—'তাই ত মা, তোমরা সব এসেছ, তিনি (ঠাকুর) এখন কোথায়?' শুনে বললুম 'এ জন্মেত তাঁর দর্শন পেলুমই না। কোন জন্মে পাব কি না তা তিনিই জানেন! আপনার যে দর্শন পেয়ে গেছি—এই আমাদের পরম সৌভাগ্য!' শ্রীশ্রীমা বললেন—"তা বটে"। ভাবতে লাগলুম, কি ভাগ্য যে এ কথাটি স্বীকার কর্‌লেন! সব সময়েইত দেখি নিজের কথা চেপে যান!

মায়ের কাছে কত লোকের কত রকমের গোপনীয় কথা যে থাক্‌তে পারে—হাবা আমি তা তখন বুঝ্‌তে পার্‌তুম না। জানবই বা কেমন করে—মার কাছে তখন অল্পদিন মাত্র যাচ্ছি বৈত নয়। সেজন্য মার বাড়ীতে পৌঁছে তাঁর ঘরে তাঁকে দেখ্‌তে না পেলে আস্‌বার অপেক্ষা না করে খুঁজে খুঁজে যেখানে তিনি আছেন সেইখানেই গিয়ে দেখা করতুম। একদিন বিকাল বেলা বেশ সুশ্রী দুটি বৌ মাকে তাঁর

---

* ঠাকুর বলেছিলেন "যদি পূজা না করার জন্য তোমার মনে খুব কষ্ট হয় তাহলে কর্‌বে, তাতে দোষ নেই। নতুবা করো না।"

ঘরের উত্তরের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে গোপনে কি বল্‌ছেন—এমন সময়ে আমি মাকে দেখতে একেবারে সেইখানে গিয়ে হাজির। শুনতে পেলুম মা তাঁদের বলচেন—"ঠাকুরের কাছে মনের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করবে। প্রাণের ব্যথা কেঁদে বল্‌বে—দেখ্‌বে তিনি একেবারে কোলে বসিয়ে দিবেন!" বুঝতে বাকী রইল না, বৌ দুটি মার কাছে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন! আমাকে দেখে তাঁরা লজ্জিত হলেন, আমিও ততোধিক! আমার কিন্তু খুব শিক্ষা হয়ে গেল। মনে মনে স্থির করলুম আর কখনও সাড়া না দিয়ে মাকে এমন করে দেখ্‌তে যাব না। কয়েকমাস পরে মার বাড়ীতে বৌ দুটীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল এবং বুঝেছিলাম তাঁরা উভয়েই সন্তান সম্ভবা হয়েছেন!

গৌরী-মা এসেছেন। তাঁকে একটু ঠাকুরের কথা বল্‌তে অনুরোধ করায় তিনি বললেন 'আমি ঠাকুরের কাছে অনেক আগে গিয়েছিলুম। তারপরে আর সকলে আস্‌তে লাগলেন। এই নরেন, কালী এদের ছোট দেখেছি।' বেলা বেশী নাই দেখে আর অধিক কথা হইল না। মাকে প্রণাম করে গৌরী-মা বিদায় নিলেন।

আমাকেও যেতে হবে। মাকে প্রণাম করে বিদায় চাইতে মা বারান্দায় ডেকে নিয়ে প্রসাদ দিলেন। বল্‌তে লাগলেন—'তবে এস মা। আমার সব ছেলে মেয়ে গুলি আসে, আবার একে একে চলে যায়। একদিন সকালে সাতটায় এসো। এখানে প্রসাদ পাবে।'

রাধাষ্টমী, আশ্বিন ১৩১৯—গৌরী-মার আশ্রমের স্কুলের কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় মায়ের নিকট আর ইচ্ছানুসারে আজকাল যাওয়া হয়ে উঠে না। রাধাষ্টমীর দিন অবসর পেয়ে গিয়ে দেখি, মা গঙ্গাস্নান যাবেন বলে পাশের ঘরে তেল মাখছেন। লোকে বলে তেল মাখলে প্রণাম করতে নাই এবং মানব দেহ ধারণ করলে জগজ্জননীও মানব রীতির বশীভূত হয়ে চলেন, তাই প্রণাম করলুম না। আমাকে দেখেই মা বল্‌লেন "এস মা, এস, সকালে এসেছ—বেশ করেছ। আজ রাধাষ্টমী, দিনও ভাল, বস, আমি স্নান করে আসি।" আমি তাঁর সঙ্গে গঙ্গায় যাব বলায় মা বললেন—'তবে এস,' কিন্তু অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল বলে গোলাপ-মা আমাকে কিছুতেই যেতে

দিলেন না। মা'ও তখন গোলাপ-মার মতে মত দিয়ে বললেন "তবে থাক মা, আমি এখনি আস্‌ছি।" কাজেই রহিলাম। ঐরূপ প্রায়ই দেখতে পেতুম—সরলা বধূটির মত মা কাহারও কথার উপর জোর করে কিছু বলতেন না। যা হোক্, রাস্তায় মা বেরুতেই জল ধরে গেল। মা তাই বাটীতে ফিরে এসেই আমাকে বললেন—"বেরুতেই জল ধরে গেল দেখে আমি ভাবলুম, আহা তুমি আস্‌তে চেয়েছিলে, এলে বেশ হত, গঙ্গা দর্শন করে যেতে।" সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি গঙ্গা দর্শনের জন্য যত না হোক্ মার সঙ্গে যাবার আকাঙ্ক্ষাতেই যেতে চেয়েছিলাম। কারণ সংসারে নানা বাধা বিঘ্নের জন্য মার কাছেত আসাই হয় না, সেজন্য ভাগ্যক্রমে যে দিন আসা ঘটে, সে দিন আর ইচ্ছা হয় না যে এক মুহূর্ত্তও মাকে চোখের আড়াল করি। গোলাপ-মা মায়ের কথা শুনে বল্‌লেন 'নাই বা গেছে, তোমার পা ছুঁলেই সব হবে।" আমিও তাই বলতেই মা বললেন—"আহা, সেকি কথা ? গঙ্গা !" ঐরূপে ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায় মা কখন নিজের মহত্ত্বের কথা প্রকাশ করতেন না—অপর সকলের ন্যায় তিনিও একজন সামান্য মানুষ এইরূপই বলতেন ও দেখাতেন। তবে ইহাও দেখেছি অন্য কেহ কাছে না থাকলে কখন কখন কার কার প্রতি কৃপায় তাঁর অসীম মহিমান্বিতা জগন্মাতার ভাব প্রকাশ পাইত। ঘরে এসেই তক্তপোষখানির উপর বসে আমাকে বললেন "বেশ, গঙ্গা স্নান করেও এসেছি"—বুঝলুম আমি যে তাঁর পাদপদ্ম পূজা করব মানসে এসেছি তা টের পেয়েছেন। মনে মনে বললুম—নিত্য শুদ্ধা তুমি, মা, তোমার আবার গঙ্গাস্নান! তাড়াতাড়ি ফুল চন্দনাদি নিয়ে পদতলে বস্‌তেই বললেন "তুলসী পাতা থাকে যদি ত পায়ে দিও না।" পূজা শেষ হলে প্রণাম করে উঠ্‌লুম। মা এইবার জল খেতে বস্‌লেন। সেই অপূর্ব্ব স্নেহে কাছে নিয়ে বসা এবং প্রত্যেক জিনিসটির অর্দ্ধেক খেয়ে প্রসাদ দেওয়া !—আমিও মহানন্দে প্রসাদ পেলুম। শালপাতাখানিতে করে প্রসাদ খেতে সাধু নাগ মহাশয়ের কথা মনে হলো। শ্রীশ্রীমাকে বললুম 'মা শালপাতায় প্রসাদ পেলেই নাগ মহাশয়ের কথা মনে পড়ে'। মা বললেন

"আহা তার কি ভক্তিই ছিল! এই ত দেখছ শুক্‌নো কট্‌কটে শালপাতা একি কেউ খেতে পারে? ভক্তির আতিশয্যে, প্রসাদ ঠেকেছে বলে পাতাখানা পর্য্যন্ত খেয়ে ফেল্লে! আহা কি প্রেম চক্ষুই ছিল তার। রক্তাভ চোখ, সর্ব্বদাই জল পড়্ছে! কঠোর তপস্যায় শরীরখানি শীর্ণ, আহা আমার কাছে যখন আস্‌ত ভাবের আবেগে সিঁড়ি দিয়ে আর উঠ্‌তে পার্‌ত না, এম্‌নি (নিজে দেখিয়ে) থর থর করে কাঁপত,—এখানে পা দিতে ওখানে পড়ত! তেমন ভক্তি আর কারও দেখলুম না।" আমি বললুম বইএ পড়েছি, তিনি যখন ডাক্তারী ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে দিনরাত ঠাকুরের ধ্যানে তন্ময় থাক্‌তেন, তখন তাঁর পিতা একদিন বলেছিলেন,—'এখন আর কি কর্‌বি, নেংটা হয়ে ফির্‌বি আর ব্যাঙ্‌ ধরে খাবি!' উঠানে একটা মরা ব্যাঙ পড়ে আছে দেখে নাগ মহাশয় কাপড়খানি ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সেই ব্যাঙটা ধরে খেয়ে পিতাকে বলেছিলেন—আপনার দুই আদেশই পালন কর্‌লাম্ আপনি আমার খাওয়া পরার চিন্তা ছেড়ে ইষ্টনাম করুন। মা—আহা, কি গুরুভক্তি! কি শুচি অশুচিতে সমজ্ঞান! আমি আবার বললুম "অর্দ্ধোদয় যোগের সময় কলিকাতা ছেড়ে নাগ মহাশয় বাড়ী গিয়াছিলেন, তাতে তাঁর পিতা ভৎর্সনা করে বলেছিলেন—'গঙ্গা স্নান না করে, গঙ্গার দেশ থেকে বাড়ী এলি!' কিন্তু যোগের সময় সকলে দেখে উঠান ভেদ করে জল উঠে সারা উঠান একেবারে ভেসে যাচ্চে! আর নাগ মহাশয় 'এস মা গঙ্গে! এস মা গঙ্গে' বলে অঞ্জলি পূর্ণ করে সেই জল মাথায় দিচ্চেন! তাই দেখে পাড়ার সকলে সেই জলে স্নান কর্‌তে লাগ্‌ল।" মা—'হাঁ, তার ভক্তির জোরে অমন সব অদ্ভুতও সম্ভবে! আমি একখানা কাপড় দিয়েছিলুম, তা মাথায় জড়িয়ে রাখতো। তার স্ত্রীও খুব ভাল এবং ভক্তিমতী। এই সেবার আমের সময় এখানে এসেছিল। এখনো বেঁচে আছে।' এই সময় অন্য কয়েকজন স্ত্রীভক্ত আসায় কথাটা চাপা পড়ে গেল। মা উঠে তাদের প্রণাম নিয়ে আমাকে পাণ সাজতে যেতে বললেন। খানিক পরে আমি দুটো পাণ এনে মাকে দিলুম। মা পাণ দুটি হাতে নিয়ে একটি খেয়ে একটি আমাকে খেতে দিলেন। আমি

আবার বাকী পাণগুলি সাজ্‌তে চলে এলুম। মাও স্বল্পক্ষণ পরে দুইজন স্ত্রী-ভক্তের সহিত সেই ঘরে এসে বস্‌লেন। স্ত্রী-ভক্ত দুটিও সাহায্য করায় খুব শীঘ্রই পাণ সাজা হয়ে গেল। মা ঠাকুরের পাণগুলি আলাদা করে আগে তুলে নিলেন ও "আমার মা লক্ষ্মীরা কত শীগ্‌গির সেজে ফেললে" বলে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন।

এইবার মা তেতালায় গোলাপ-মার ঘরে গেলেন। খানিক পরে আমি সেখানে গিয়ে দেখি, মা ঐ ঘরের দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে আছেন—কেমন করে ভিতরে যাই! আমাকে দেখে মা বল্‌ছেন "এস, এস, তাতে দোষ নেই।" মার সর্ব্বদাই এইরূপ ভাব! পরে মা মাথা তুললেন। আমি ঘরে গিয়া কাছে বসে তাঁকে বাতাস করতে লাগলুম। মা শুয়ে শুয়ে গৌরী-মার স্কুলের নানা কথা, আর গাড়ী ভাড়া এ সব কথা পাড়্‌লেন। আমি যথাযথ উত্তর দিতে লাগলুম। এই সময়ে সেই স্ত্রীভক্ত দুটি সেখানে এলেন। তাঁদের একজন মায়ের চুল শুকিয়ে দিতে দিতে দুই একটি পাকা চুল বেছে আঁচলে বেঁধে রাখতে লাগলেন, বললেন—কবচ করবেন। মা, লজ্জিত হয়ে বললেন "ও কেন, ও কেন, কত মুড়ো মুড়ো কাঁচা চুল যে ফেলে দিচ্ছি।" মা এইবার উঠে ছাতে একটু রোদে গেলেন। আমরাও সঙ্গে গেলুম ও একপাশে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দর্শন করতে লাগলুম। এমন সময়ে ঘর হতে গোলাপ-মা বলে উঠলেন, "মা ত সকলকে নিয়ে ছাতে গেলেন, এখন কে খাবে, কে না খাবে, তা আমি কি করে জানি।" ঐ কথা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে গিয়ে তাঁকে বললুম "বিধবাটি কেবল খাবেন।" রৌদ্রে অনেকগুলি কাপড় ছিল, মা আমাকে সেগুলি তুলে ঘরে রাখতে বললেন। আমি তুলছি এমন সময়ে মা নীচে ঠাকুরের ভোগ দিতে নামলেন। আমরাও সকলে নীচে ঠাকুর ঘরে এলুম। ভোগ দেওয়া হলে মা আমাকে মেয়েদের খাবার যায়গা করতে বললেন। পরে সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম। মা দুই এক গ্রাস খাবার পরে আমাদের সকলকে প্রসাদ দিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে আরও দুটি স্ত্রী-ভক্ত এসেছিলেন তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধা সধবা,

ঠাকুরের সময়ের এবং অপরটী তাঁর পুত্রবধূ। বৃদ্ধাটী খেতে খেতে বললেন "আহা, ঠাকুর আমাদের যে সব কথা বলে গেছেন তা কি আমরা পাল্‌তে পেরেছি, তাহলে এত ভোগ ভুগ্‌বে কে মা! সংসার সংসার করেই মরছি—ও কাজ হল না, সে কাজ হল না এই কেবল কর্‌ছি।" মা তাঁর ঐ কথায় বললেন "কাজ করা চাই বৈ কি; কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে কর্ম্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।"

আহারান্তে, মা এখন একটু বিশ্রাম করবেন—খাটের উপর শয়ন কর্‌লেন। সকলেই এখন তাঁর একটু সেবা করতে ব্যগ্র। মা কিন্তু সকলকেই বিশ্রাম কর্‌তে বল্‌লেন। খানিক পরে বাড়ীতে কাজ আছে বলে অপর স্ত্রীলোকেরা সব চলে গেলেন। আমি এবং ঠাকুরের সময়কার একটি বিধবা স্ত্রীলোক রইলুম। আমি এখন মার সেবার ভার একাই পেলুম। বিধবাটি মায়ের কাছে বসে তাঁর সংসারের দুঃখের অনেক কথা বলতে লাগলেন— "মা আপনার কাছে সকল অপরাধের ক্ষমা পাই, কিন্তু ওদের কাছে ক্ষমা নাই," ইত্যাদি। আমি কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম 'আপনি ঠাকুরকে দেখেছেন? "ও মা দেখেছি বৈ কি! তিনি যে আমাদের বাড়ীতে আস্‌তেন। মা তখন বৌটির মতন থাকৃতেন।"

আমি বললুম "দুটো ঠাকুরের কথা বলুন না শুনি।" তিনি বললেন, "আমি না মা, মাকে বল্‌তে বলো।" কিন্তু মা তখন একটু চোখ বুজে আছেন দেখে আমি ওকথা বল্‌তে পার্‌লুম না। খানিক পরে মা নিজেই বল্‌ছেন—"যে ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌বে সেই তাঁর দেখা পাবে। এই সে দিন * একটি ছেলে মারা গেল। আহা সে কত ভাল ছিল! ঠাকুর তাদের বাড়ী যেতেন। একদিন পরের গচ্ছিত ২০০৲ টাকা ট্রামে তার পকেট থেকে মারা যায়, বাড়ী এসে দেখে। ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে কাঁদছে 'হায় ঠাকুর, কি করলে!' তার অবস্থাও

* দশ এগার দিন পূর্ব্বে (৩১শে ভাদ্র) ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত তেজ চন্দ্র মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর কথাই বলছেন।

তেমন ছিল না যে নিজে ঐ টাকা শোধ করবে। আহা, কাঁদতে কাঁদতে দেখে, ঠাকুর তার সামনে এসে বলছেন 'কাঁদছিস্ কেন ? ঐ গঙ্গার ধারে ইট চাপা আছে ত্যাখ্'। সে তাড়াতাড়ি উঠে ইট খানা তুলে দেখে সত্যই এক তাড়া নোট! শরতের কাছে এসে সব বললে। শরত শুনে বললে 'তোরাত এখনো দেখা পাস, আমরা কিন্তু আর পাইনে'। ওরা পাবে কি ? ওরাত দেখে শুনে এখন গ্যাট (শান্ত) হয়ে বসেছে। যারা ঠাকুরকে দেখেনি, এখন তাদেরই ব্যাকুলতা বেশী।

"ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে, রাখাল টাখাল এরা সব তখন ছোট। একদিন রাখালের বড় ক্ষিধে পেয়েছে, ঠাকুরকে বল্লে। ঠাকুর ঐ কথা শুনে গঙ্গার ধারে গিয়ে 'ও গৌরদাসী, আয় না, আমার রাখালের যে বড় ক্ষিধে পেয়েছে' বলে চাৎকার করে ডাকতে লাগলেন। তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া যেত না। খানিক পরে গঙ্গায় একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা ঘাটে লাগতেই তার মধ্য হতে বলরাম বাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি নাম্লো এক গামলা রসগোল্লা নিয়ে। ঠাকুরত আনন্দে রাখালকে ডাকতে লাগলেন 'ওরে আয় না রে, রসগোল্লা এসেছে, খাবি আয়। ক্ষিধে পেয়েছে, বল্লি যে।' রাখাল তখন রাগ করে বলতে লাগল 'আপনি অমন করে সকলের সাম্নে ক্ষিধে পেয়েছে বল্ছেন কেন ?' তিনি বল্লেন 'তাতে কিরে, ক্ষিধে পেয়েছে, খাবি, তা বল্তে দোষ কি ?" তাঁর ঐ রকমই স্বভাব ছিল কি না !"

এমন সময় ভূদেব স্কুল হতে জ্বর নিয়ে এল। মা তার জন্য বিছানা করে দিতে বললেন। বিছানা করে দিলুম। মাকে আজ একবার বলরাম বাবুর বাটী যেতে হবে রামবাবুর মাকে দেখতে—কারণ তিনি রক্তা-মাশয়ে খুব পীড়িত। তাই তাড়াতাড়ি উঠে বৈকালের কাজ কর্ম্ম সেরে নিতে লাগলেন, বল্লেন—"একবার যেতেই হবে, মাকুর স্কুলের (নিবেদিতা স্কুলের) গাড়ী এলে দাঁড়াতে বোলো।" ঠাকুরকে বৈকালী ভোগ দিয়ে উঠে আমাকে কিছু প্রসাদ নিব কি না জিজ্ঞাসা করায় বললুম "এখন থাক্।" মা বললেন "তবে পরে খেয়ো, নলিনী খেতে দিস্।" মাকুর গাড়ী আস্তেই বললেন—'আমি শীঘ্র ঘুরে আস্ছি, তুমি

বসে থেকো, আমি না এলে যেও না।' মা ও গোলাপ মা বলরাম বাবুর বাড়ী গিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এলেন। এদিকে খবর এসেছিল আমাকে নিয়ে যেতে লোক এসেছে। আমি কিন্তু মার ফিরবার অপেক্ষায় ছিলুম। মা এসেই বললেন "এই যে আছ মা, আমি এই তোমার জন্য তাড়াতাড়ি আসচি। জল খেয়েছ?" "না, মা।" "সে কি নলিনী, খেতে দিস নি? বলে গেলুম।" নলিনী (লজ্জিতভাবে) "মনে ছিল না, এই দিচ্ছি" মা—"না থাক, এখন আর তোকে দিতে হবে না, আমিই দিচ্ছি। (আমার প্রতি) তুমি চেয়ে খাওনি কেন মা? এযে নিজের বাড়ী।" আমি বললুম—"তেমন খিধে পেলে চেয়ে খেতুম বৈ কি মা।" মা তাড়াতাড়ি নিজেই কিছু প্রসাদী মিষ্টি এনে দিলেন। আমিও আনন্দের সহিত খেলুম। "পান্ দি" বলে সাজাপান আনতে গেলেন। নলিনী দিদি বললেন—ডিবেতে আর পান সাজা নাই, দেবে কি? কিন্তু পুনরায় খুঁজে মা সেই ডিবেতে দুটি সাজা পান পেয়ে আমার হাতে দিলেন। আমি প্রণাম করে বিদায় চাইতে "এস মা, আবার এস, দুর্গা, দুর্গা," বলে উঠে বললেন "আমি সঙ্গে যাব কি? একলা নেমে যেতে পারবে? রাত হয়েছে।" আমি বল্লুম "খুব পারব মা, আপনাকে আস্‌তে হবে না।" মা তবুবল্ 'দুর্গা দুর্গা' তে বল্‌তে সহাস্য মুখে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এসে দাঁড়ালেন। বললুম "আর দাঁড়াতে হবে না মা, আমি বেশ যেতে পারব।"

আর একদিন, সে দিন অক্ষয় তৃতীয়া—পূর্ব্বোক্ত সধবা বৃদ্ধাটী ও তাঁহার বধূ স্নান করে এসে, পৈতে আর দুই একটি কি ফল মায়ের হাতে দিতে গেলে মা বললেন "আমাকে কেন? ভূদেবকে দাও"। তার খানিক পরে কথায় কথায় আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—"আজকের দিনে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমাদের মুক্তিলাভ হোক! জন্ম মৃত্যু বড় যন্ত্রণা, তা যেন তোমাদের আর ভুগতে না হয়।"

চণ্ডী

এ যাবৎ অনেক মনীষী সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আজ আমরা দেখিব চণ্ডীর একটি স্তব হইতে সে সম্বন্ধে কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই কি না।

মহিষাসুর বধের পর স্বর্গ ভ্রষ্ট—পরাজিত দেবগণ দেবীকে যে স্তোত্র দ্বারা তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন—এটি সেই স্তোত্র।

ইহার প্রথম অংশে ৯ হইতে ২০ শ্লোক পর্য্যন্ত আদ্যাপ্রকৃতি-রূপা মহাশক্তির সাধারণ বর্ণনামাত্র দেখিতে পাই যাহাতে তাঁহাকে সৃষ্ট জগতের সর্ব্বকারণ-কারণ-রূপিনীরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি 'অতি সৌম্যাতিরৌদ্রা' তিনি ধাত্রী, তিনি লক্ষ্মী এবং তিনি অলক্ষ্মী-স্বরূপিণী। জগতে যাহা কিছু আছে সবই তিনি। যে ভাবেতে তাঁহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছিলেন—

"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী,
সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া

* * * * * * *

মৃত্যু তুমি রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি
বিতরিছ জনে জনে॥"

একদিকে তিনি যেরূপ ভীষণা, অপর দিকে তিনি আবার 'জ্যোৎস্না রূপিনী', 'ইন্দু-রূপিনী' সুখস্বরূপা।

তাঁহাকে জগৎ 'প্রতিষ্ঠা-রূপিনী' বলা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শ্লোক হইতে এই 'জগৎ-প্রতিষ্ঠা' ধ্যান-সম্পন্ন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের নিকট কি ভাবেতে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এ শ্লোক হইতে আমরা শুধু এইটুকুই বুঝিতে পারি এই জগৎ-প্রপঞ্চ বিষ্ণুমায়া হইতে কল্পিত বা উদ্ভূত। এ মায়া শব্দের অর্থ অনেকের নিকট অনেকভাবে প্রতিভাত হয়। স্বামিজীর বক্তৃতায় মায়ার যে ব্যাখ্যা আছে পাঠককে আমরা তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থের জন্য পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সাধকেরা বলেন এ জগৎ মহামায়ার খেলা মাত্র। কিন্তু খেলাতেও আমরা একটা নিয়ম মানিয়া চলি। তাই মহামায়ার এই বিরাট সৃষ্টিরূপ খেলার মধ্যে একটা নিয়মের অভিব্যক্তি সকলের চখেই পড়ে। সূর্য্য উদয় হন, অস্ত যান, কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্ল পক্ষ, পর্য্যায়ক্রমে ঋতুর পরিবর্ত্তন। ভ্রামামাণ গ্রহ নক্ষত্রের অবাধ অবিরাম গতি নিজ কক্ষ নিবদ্ধ। যে ঋতুর যে ফুলটি, যে ফলটি, যে শস্য তাহা সে সময়েই দেখা যায়। মানব জীবনে, জড়পিণ্ডপ্রায় নবজাত শিশুর ভিতরে ক্রমশঃ জ্ঞানের বিকাশ। বাল্য, কৈশোর, যৌবন ইত্যাদি অবস্থায় বুদ্ধি ও বৃত্তিগুলির ক্রমঃ বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি। এই সকলের মধ্যেই আমরা একটা নিয়মের প্রভাব অনুভব করি। তাই বলি এ মায়াকল্পিত জগৎ জগদম্বার খেলা হইলেও ইহা নিয়মাধীন। যে নিয়ম মানিয়া চলিবে সে সুফল পাইবে—ব্যক্তিগত জীবনেই হউক, সামাজিক শৃঙ্খলাতেই হউক, কর্ম্মজীবনেই হউক বা ধর্ম্মজীবনেই হউক। তাই সমাজ-শৃঙ্খলার পদ্ধতিকে ইঙ্গিত করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

আমাদিগের যোগদৃষ্টি নাই তাই আমাদের জড়ে চৈতন্যের অনুভূতিও নাই, কিন্তু জীবে এই চেতনার অভিব্যক্তি তাহার জীবত্বের প্রথম বিকাশ—সে জীব নীচই হউক উচ্চই হউক।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এই চেতনার প্রথম উৎকর্ষ জীবজগতে দেখিতে পাই বুদ্ধিতে। বুদ্ধির ক্রমবিকাশই জীবের ক্রমোন্নতি। বুদ্ধিই জীবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সাধারণ জীব অন্তর নিহিত চৈতন্যের দর্শন পায় না, আভাস পায় মাত্র। তাই তাহাকে উন্নতির পথে যাইতে হইলে এ বুদ্ধিকেই সম্বল করিতে হইবে—সে উন্নতি যে পথেই হউক।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥"

কিন্তু কথা হইতেছে, এই বুদ্ধির পুষ্টি সংমার্জ্জন ও সংরক্ষণের জন্য প্রধান ও প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু কি? বিনিদ্র তন্দ্রালু লোকের মস্তিষ্কে চিন্তার ধারা উচ্ছৃঙ্খল। তাই অবসাদ শ্রান্তি অপনোদনের জন্য নিদ্রাই কি উৎকৃষ্ট ও প্রধান সামগ্রী নহে? আহার কর বা না কর কিন্তু নিদ্রা—যত দিন না "যোগে যাগে" জেগে থাকতে শিখ্‌বে তত দিন নিয়মিতভাবে চাই-ই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এ খেলা নিয়মের খেলা। দেখিয়াছ বুদ্ধিই তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই সেই বুদ্ধির সাহায্যে ব্যক্তিগত জীবনে তোমার পক্ষে কতটুকু নিদ্রা আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

"ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন।"

(৬ষ্ঠ অঃ ১৬)

ব্যক্তিগতভাবে নিদ্রার এই উপকারিতা উপলব্ধি হইলেও সামাজিক জীবনে সাধারণ্যের বুদ্ধি স্ফুরণের জন্য শ্রমজীবীদিগের বিশ্রামের সময় নিয়ন্ত্রিত করা সমাজতত্ত্ববিদের লক্ষ্য বস্তু। শ্রমিককে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দ্বারা পেষিত করিয়া নরাকৃতি পশুতে পরিণত করা একান্ত অবিধেয়। অপর পক্ষে তাহার শ্রমের সময় লাঘব এবং তাহার অভাবের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দানও তাহাকে তাহার অনায়াসে লব্ধ অর্থ শ্রান্তির পর শান্তিতে না লইয়া যাইয়া উচ্ছৃঙ্খল প্রেরণায় সয়তানের অনুচরে পরিণত করে। পরিমিত শ্রান্তি চাই। শ্রান্তি দূরের জন্য নিদ্রা চাই। নিদ্রা-স্নিগ্ধ মনে বুদ্ধির স্ফুরণের জন্য তদুপযুক্ত ও যথোপযোগী বিশ্রাম-সময় ক্ষেপণের আয়োজন চাই। এই আয়োজন করিবে কে? ইহা কিরূপে হইবে? শ্রমজীবী দরিদ্র, ব্যয়সাধ্য উপকরণে তাহার সামর্থ্য নাই। তাই সেকালের শ্রমিক উদ্ভাবন করিয়াছেন ঐ সহজ পন্থা

যাহাতে এককালে মনের, বুদ্ধির ও চরিত্রের সমবেত ক্রমোন্নতি সহজেই সংসাধিত হইত।

পল্লীর অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্পন্ন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি একখানি রামায়ণ বা মহাভারত রাখিতেন, সকলের অবসর সময় ব্যয়িত হইত তাহার পঠন পাঠন ও শ্রবণ মননে। পরিবারের বিশ্রাম সময় ব্যয়িত হইত ব্রত নিয়মে ও পাল পার্ব্বণে।

কিন্তু আজ লালসা-দগ্ধ অর্থপিপাসু বিদেশী বণিক তাহার নির্ম্মম প্রাণহীন জড়যন্ত্র স্থাপিত করিয়া প্রাণদায়িনী শস্য শ্যামলা পল্লী জননীর জীবন্ত ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া আনিতেছে তাহার নির্ভীক, নির্দ্দোষ, সরল শিশু—করিতেছে তাহাকে ভীরু কুটিল, উচ্ছৃঙ্খল, শান্তিবিহীন উন্মত্তজীব। শস্যশ্যামলা শান্তিদায়িনী জননীর শস্পাঞ্চলেআবৃত সযত্নে রক্ষিত দেবশিশু আজ লুব্ধ কুহকে বীরাচারী অসুরে পরিণত হইয়াছে।

পরের শ্লোকে দেখিতেছি—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এই ক্ষুধা কেবল কি জীবজগতেই লক্ষিত হয়? ইহা সর্ব্বব্যাপিনী। জীব যেমন ক্ষুধার সময় আহার্য্য গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করে তদ্রূপ বৃক্ষাদি লতা গুল্ম পৃথিবী হইতে রসের সহিত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নিজদেহে সংগ্রহ করিয়া তাহার বিশ্লেষণ ও পরিবর্ত্তনে নিজ কলেবর সংবর্দ্ধিত করে। আবার তাহার কক্ষ নিহিত সঞ্চিত খাদ্য ভাণ্ডার ভবিষ্যৎ জীবদেহের পুষ্টিসাধন করে। মৃত জীবদেহের দ্রব্যসম্ভার তাহার ধ্বংসে মৃদ্রসের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভাবী উদ্ভিজ্জের আহারীয়রূপে সঞ্চিত থাকে। তাই বলা হইয়াছে এই ক্ষুধা সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বগ্রাসিনী। পরিদৃশ্যমান পরিবর্ত্তন-শীল জগতে পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় পরমাণুনিচয়ের অবিরামস্রোত ঐ পরমাণুকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভাবে, ব্যক্ত করিতেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রসাত্মক) জগত, ও তাহার

পরিবর্ত্তন, উপাদানভূত পরমাণুর বিভিন্ন বিশ্লেষণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সমদ্ভূত। এই সংগ্রহের মূলে আমরা দেখিতে পাই—বিশ্বব্যাপিনী এক বিরাট ক্ষুধা। যেন জগদ্ব্যাপিনী জগজ্জননী মা বলিতেছেন "মৈ ভুখাহুঁ।"

এই জগৎজোড়া "মৈ ভুখাহুঁ"র ডাকে আমরা অনুভব করি জগদ্ব্যাপিনী মার ছায়া—তাই চণ্ডীকার লিখিলেন :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এই করাল ক্ষুধার শেষ নাই, তৃপ্তি নাই; তবে আছে তাহার অভিব্যক্তি যেমন ছায়ারূপে তেমনি শক্তিরূপে। সেই জন্যই পরের শ্লোকে চণ্ডীকার গাহিলেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

শক্তি একদেশিনী নহে—সর্ব্বব্যাপিকা। যেহেতু সেই আদ্যাশক্তি-লীলার বিকাশেই এই শক্তির উদ্ভব। জগতে এমন কিছু নাই যাহাতে কোন না কোন প্রকার শক্তির বিকাশ দৃষ্ট বা অনুভূত হয় না। ক্ষুধার তৃপ্তিতে পুষ্টি, পুষ্টিতে শক্তির সঞ্চার ও শক্তির অভিব্যক্তি—সে প্রাণী জগতেই হউক, উদ্ভিদ জগতেই হউক বা জড় জগতেই হউক। বন-ঔষধির বিষের শক্তিতে মানুষ বাঁচে মরে। জড় কামানের ভিতর জড় বারুদ-নিহিত শক্তিতে গোলা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া জনপদ ধ্বংস করে। জড় জগতের শক্তি কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষ আজ জড় শক্তিকে তাহার দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছে। এই মানুষই আবার স্বীয় সাধন সম্ভূত শক্তিবলে দেবতার দেবত্বকে তুচ্ছ করিয়া ব্রহ্মত্ব পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে। কিন্তু সব শক্তির মূলে নিহিত সেই আদ্যা-শক্তির বিভিন্ন ভাবে বিকাশ ও খেলা। তিনি সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্ব-স্বরূপিনী ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি তাহার ভিন্ন ভিন্ন ভাব। এই শক্তি বা ভাবপ্রকাশ পাইতেছে তৃষ্ণায়—তাই পরের শ্লোকে দেখিতে পাই—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

মানুষ তৃষ্ণা বা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। বাসনা হইতে সৃষ্টির উদ্ভব, বাসনাতেই সৃষ্টি চলিতেছে। যত দিন মানব মনে কোন না কোনও প্রকার বাসনা থাকিবে ততদিন তাহাকে এই মর্ত্ত জগতে গতায়াত করিতে হইবেই। বাসনার অন্ত নাই, শেষ নাই, সে দুষ্পূরণীয়। ভাগ্যবলে যে মহাপুরুষের তপস্যালব্ধ সুকৃতির জন্য ও ঈশ্বরানুকম্পায় এই বাসনার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে তিনি মুক্ত হইয়া যান। তৃষ্ণার্ত্ত সূর্য্যকিরণ সাগরের জল শোষণ করিয়া আকাশ মার্গে ঊর্দ্ধে মেঘান্তরালে লইয়া যাইতেছে; তৃষ্ণার্ত্ত মেদিনীর তপ্ত শ্বাস শূন্য মার্গে উষ্ণ হইতে ঊর্দ্ধ দেশে প্রবাহিত হইয়া মেঘান্তরালস্থিত নীহার কণিকাকে সেই তৃষ্ণার বার্ত্তা প্রদান করিতেছে। করুণাহিমে মেঘ গলিয়া বৃষ্টিরূপে ভূতলের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যেন স্বর্গের মন্দাকিনীরূপে প্রবাহিত হইয়া ভূতলে আসিতেছে। এই চাওয়া ও দেওয়া অভিজ্ঞের নিকটে জড় ও চেতন জগতে তুল্যরূপে বিদ্যমান। এ শুধু চাওয়া নহে, পাওয়াও বটে। তাই পরবর্ত্তী শ্লোকে গীত হইল—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

তবে মনে রাখিতে হইবে চাহিলেই পাওয়া যায় না। পাইবার উপযুক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাই, সংযত চেষ্টা চাই, নিয়মিত পদ্ধতিতে সে চেষ্টাস্রোত প্রবাহিত হওয়া চাই। সে কথা সরল গ্রাম্য ভাষায় শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "মুখে মাখন মাখন বলিলে মাখন পাওয়া যায় না। দুধ জ্বাল দিয়ে দই পাতে হয়। ঠাণ্ডার সময় ঘোল মউনি দিয়ে মন্থন করতে হয়—তবে মাখন পাওয়া যায়।" এই কথার বিশ্লেষণে দেখিতে পাই—চেষ্টা চাই, উপাদান চাই, উপযুক্ত সময় চাই, বিধিবদ্ধ নিয়ম চাই, পরিশ্রম চাই। এই সকলের সমবায় সংযোগে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা যায়।

সমাজে বিভিন্ন রুচির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের উন্নতি ও শৃঙ্খলার সহিত রুচি পার্থক্য সমস্ত কর্ম্ম বিভাগের সৃষ্টি হয়। এই কর্ম্ম বিভাগ হইতেই জাতির সমুদ্ভব। সেই জন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকে দেবীর উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এ জাতি বর্ণগত নহে; বৃত্তিগত—গুণগত! শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজে গুণগত জাতি বিভাগে এক সম্প্রদায়ের কায অন্য সম্প্রদায়ে করিতে দেখা যায় কি? তাহার যে লোক লজ্জা আছে। তাই বলিতেছেন পরবর্ত্তী শ্লোকে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এ লজ্জা সংস্কারগত—গুণগত। সমাজের শৃঙ্খলা সহায়ক ও পুষ্টির পরিপোষক। ইহা হৃতশ্রী গুণহীন আভিজাত্যের বৃথা ডম্ফ নহে। এ লজ্জা সরল স্বাভাবিক। মদগর্ব্ব সম্ভূত নহে। এইরূপ গুণগত জাতি বিভাগ ও শোভন লজ্জাশীলতা যে সমাজে পরিস্ফুট, সেই সমাজে শান্তি স্বতঃই অধিষ্ঠিতা হন। তাই কবি গাহিয়া উঠিলেন :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এইরূপ শান্তিপূর্ণ সমাজে ও শান্তিময় পরিবারে—যেখানে প্রতিযোগিতার হলাহল পানে মানুষকে হিংস্র পশুতে পরিণত করে না, যে যাহার কর্ম্মে শান্তিতে নিরত থাকে এবং পরের বৃত্তি অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে,—সেখানে বৃত্তি অনুযায়ী পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই দেখিতেছি—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এ শ্রদ্ধা সমাজের উচ্চাধিকার প্রাপ্ত লোকের প্রতি নিম্নশ্রেণীর ভীতিপূর্ণ সম্মান নহে। এ শ্রদ্ধা সর্ব্বভূতে সম্প্রসারিত। হইতে পার

কুলগত বংশমর্য্যাদায় তুমি উচ্চবর্ণ কিন্তু তুমি যাহাকে নীচ জাতি আখ্যা দিয়া থাক তাহার কর্ম্ম করিতে শুধু তুমি অনিচ্ছুক নহ, তুমি অপারগ। পরিপুষ্ট, শৃঙ্খলা নিবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের কর্ম্ম বিভাগে যে ধারা দৃষ্ট হয় তাহাতে কোনও এক শ্রেণীর কর্ম্ম বন্ধ হইলে সমাজ শৃঙ্খলা বিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হয়। ইহার উদাহরণ সর্ব্বত্রই জাজ্বল্যমান। কিন্তু যে সমাজে সকলের ভিতর সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকে সেই সমাজের নয়ন মনোরম কান্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই জন্যই চণ্ডীকারের স্তোত্রে দেখিতেছি—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এ কান্তি শুধু সমষ্টিভাবে সমাজে নিবদ্ধ নহে, ব্যষ্টিভাবে সকল লোকের ভিতর অভিব্যক্ত।

উপনিষদের 'সত্যকাম' উপাখ্যানে দেখিতে পাই তাঁহার যে ব্রহ্মজ্ঞান-লব্ধ কান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার মূলে নিহিত রহিয়াছে এ শ্রদ্ধা। যদি দিব্যকান্তি লাভ করিতে চাও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। যদি সমাজকে, দেশকে উন্নত ও কান্তিপূর্ণ করিতে চাও—তাহা হইলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। তাহাতে দশের ও দেশের উন্নতি, সম্পদ ও শ্রী লাভ হইবে। সেইজন্যই বলিলেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এ লক্ষ্মী বলমত্ত, মদান্ধ, ভূজয়ী বীরের বিজয়লক্ষ্মী নহে, কারণ বিজেতা বিজিতকে শ্রদ্ধা করে না। এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে ধরিত্রীর বক্ষ কান্তিহীন দেখিতে পাই। বিজেতা বীর আনন্দে উৎফুল্ল হইলেও তাহার মুখে কমনীয় কান্তি দীপ্তি পায় না। সে কান্তি ফুটিয়া উঠে কেবল সদ্বৃত্তিতে। তাই কবি গাহিলেন :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এ বৃত্তি মনের সেই উচ্চবৃত্তি যাহাতে দেখিতে পাই শান্তিপূর্ণ শ্রী ও কান্তিসম্পন্ন সমাজে ও শ্রদ্ধা মণ্ডিত হৃদয়ে এবং সে বৃত্তি ফুটাইয়া তুলে স্মৃতি। তাই চণ্ডীকার পর শ্লোকে লিখিলেন :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এ স্মৃতি বাল্যের স্মৃতি নহে, যৌবনের স্মৃতি নহে, অতীতের স্মৃতি নহে। এ স্মৃতি মোক্ষমার্গী আত্মজ্ঞ পুরুষের আত্মস্মৃতি। যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে তিনি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন। যে ভক্ত পরা-ভক্তি লাভ করিয়াছে তিনিই সর্ব্ব জীবে তাঁহারই ধর্ম্মের প্রকাশ দেখিতে পান। কাযেই সর্ব্বভূতে দয়া এই সকল ব্যক্তির স্বাভাবিক ও সহজ। সেই জন্যই পরের শ্লোকে কবি বলিলেন :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে যদি এই দয়ার সহজ সরল সম্প্রসার দেখিতে পাই তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গীন্ তুষ্টি সকলের অন্তর ভক্তিরসে আপ্লুত করিবে। সেই জন্যই কবি গাহিলেন :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

অন্তরে জগন্মাতার অনুভূতি ও আবির্ভাব তাঁহাদেরই হয় যাঁহাদের অন্তর শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শান্তিপূর্ণ সদ্বৃত্তির আধার, যাঁহার গৃহে লক্ষ্মী সদা বিরাজমানা এবং যিনি সর্ব্বজীবে দয়ান্বিত। সেই জন্যই পরের শ্লোকে দেখিতে পাই—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

কিন্তু এ যদি আপত্তি হয়, যে সমাজের সকল লোক এত সদ্গুণ-সম্পন্ন হয় তাহা হইলে সে সমাজ কি চলিতে পারে? চলিবে না কেন? কেমন করিয়া চলিবে সেই কথাইত এই স্তবের শেষ শ্লোকে দেখিতেছি :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥"

একটা চলিত কথা আছে "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ।" ভ্রম জীবের থাকিবেই । জীব যত উচ্চই হউক না কেন ! এমন কি দেবতাদেরও ভ্রমের দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে বিরল নহে । শুধু দেবতা কেন স্বয়ং শ্রীভগবান যখন দেহ ধারণ করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য অবতাররূপে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাদের মধ্যেও সাময়িক ভ্রান্তির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রীভগবান মায়াতীত হইলেও দেহ ধারণ সময়ে সেই যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার রাজত্বে বিচরণ করেন । এবং সময় সময় আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার ক্ষমতাধীন হইয়া পড়েন । তখন অসহায় জীবের আর কা কথা !

—ডাঃ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ, এম-বি ।

কামাখ্যা কূট

হে বন্য দুর্দ্দান্ত শিশু বিশ্ব সৃজনের !
হে কালো কালিমা মাখা গিরিশতদল !
ধন্য তুমি হে সখা আমার ! মানবের
মারী-সুপ্ত দগ্ধ পানিদ্বয় অহরহঃ পীড়ায় বিকল
এখনে করেনি ক্ষত তব ভীম বক্ষ পর্ণপুটে ;
লেলিহান্ জিহ্বা মেলি' বার বার আসিয়াছে ছুটে
আর গেছে ফিরে আপনার নীড়ভাঙ্গা নীড়ে
তুমি আছ চিরস্থির ওগো গো দুরন্ত
দুর্ব্বার প্রোজ্জ্বল গীতে আপনারে আবরি গভীরে ।
প্রসুপ্ত প্রদোষ সম চারিদিকে এক
ঘিরিয়া রেখেছ হত অন্ধ আঁধারিকা—
কত শত বৃক্ষরাজি কেহ ক্ষুদ্র কেহ সুউন্নত
মায়া গর্ব্বে রচিয়াছে কায়া নীহারিকা—

তারি মাঝে ওগো মোর প্রাণের সুহৃদ
ছাড়ি' ফাঁড়ি' শ্রেয়, প্রেয়, নৈতিক, গর্হিত—
আনন্দের নিমীলিত নীরব গহ্বরে
অতিসুপ্ত সমস্তের যেন দীর্ঘশ্বাস—
ধ্বনি তব মোর প্রাণে শিহরি' ঠিকরে!
অদূরে অসংখ্য লোল তরল কুয়াসা
হরেক পরতে তব ঢাকিয়াছে প্রাণ
ইন্দ্রিয়ের নিরুদ্ধ অতলে হে যোগী,—ভরসা
তব আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ সঙ্গীতে, বহমান
স্রোত মাঝে ছুটে চলে মানবের নয়ন আড়ালে!
আমারো অন্তর মাঝে বুঝি তালে তালে
তেমনি গভীর গীত বাজে সুনীরবে,—
বাহিরের গূঢ় শত গাঢ় রহস্যিকা—
অন্ধ দুষ্ট কুহেলির মাঝে—শুধু বুঝি গরজে গরবে!
রক্ত আভা মৃত্তিকারে দুহাতে জড়ায়ে
অলক্ষিত হে আমার অন্তর পুরুষ
ধীরে শুধু কাঁদে! ওই! বিলায়ে ছড়ায়ে
গিরি গন্ধ পর্ব্বতের মিশ্র সহরস
পবন পাসরি' হাসে পাতার কাঁপনে
বেগহীন পূর্ণতার সরসীতে যেন পদ্মদলে!
হায় একি মৃত্যুফাঁদ অমৃত জীবন
সুষুপ্তির পিঞ্জরেতে তবু তবু ধায়
হায় একি! বহেবীজ মাঝে প্রাণারাম লীলানিকেতন!
ওগো কবি, ওগো ধ্যানী ওগো বীর সাধু—!
আমারেও ঐমত করগো করগো!
(অঙ্গেতব) চির স্তব্ধ পিণ্ড শিলাকৃতি লক্ষ লক্ষ যেন স্তব্ধ যাদু
হেরি' প্রাণ নেচে উঠে স্পর্শদাও স্পর্শদাও ওগো!
খনন করিব তব অযুত বন্ধন
অক্লেশ আঁধার মাখা গুহা গুঞ্জরণ—
বজ্রস্থির প্রাণারাম তব জগতের নিরুদ্ধ মলয়ে—
আঘাতে আঘাত করি ভাঙ মৌন সাধা—
এস আজ দুই প্রাণে প্রাণ খুলি হোক্ শুধু কাঁদা—
—শ্রীসুধীরচন্দ্র চাকী।

লাটু্ মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'বসুমতী' প্রেসের কম্‌পজিটারাদির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। তিনি তাহাদের সহিত খুব খোলাখুলি ভাবে ব্যবহার করিতেন। ফলে তাহারা তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে নিজ নিজ জীবনের সমস্ত ঘটনা—প্রবৃত্তি-আদির কথা বলিত এবং তাঁহার সরল উপদেশ শ্রবণে মহাপরিতৃপ্ত হইত।

পূজ্যপাদ শিবানন্দজী বলেন—শ্রীযুক্ত লাটু আলমবাজার মঠ এবং পরে বেলুড় মঠে বিশেষ থাকেন নাই—মধ্যে মধ্যে আসিতেন মাত্র।

স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলেন,—"যতদূর মনে পড়ে, তিনি আলম-বাজার মঠে এবং স্বামিজীর আগমনের পর বেলুড় মঠ স্থাপন হ'লে—তথায় ছিলেন। তবে, মাঝে মাঝে এদিক্ ওদিক চ'লেও যেতেন; ঘুরে ফিরে আবার আস্‌তেন।"

আমাদের মনে হয়, এ সময় তিনি একবার পুরী যান। পুরীর প্রসঙ্গে একবার তিনি বলিয়াছিলেন, আমি জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, বেশী ঘুর্‌তে টুর্‌তে পার্‌বো না, আর, যা খাই যেন হজম হয়ে যায়। জগন্নাথদেব তাই ক'রে দিলেন। * * কল্‌কাতায় উপেন মুখুয্যের ('বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা) কাছ থেকে পয়সা নিয়ে পুরি আর আলুর তরকারি কিনে খেতাম। তাঁর দয়ায় বেশ হজম হ'য়ে যেত —কোনও বখেড়া ছিল না।"

৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া পুরি তরকারি কিনিয়া খাইয়া দিন যাপন করিবার পূর্ব্বে তিনি ৺কেদার দাস, ৺গিরিশ ঘোষ, ৺হরিমোহন মিত্র প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ ভক্তদের বাটীতে আহার করিতেন। কারণ, তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি—"আরে, গঙ্গার ধারে বসে আছি। মন বেশ বসে গেছে—

কোথাও যেতে ইচ্ছা ক'রছে না। কিন্তু গৃহস্থ বাড়ীতে খাওয়া—ইচ্ছার বিরুদ্ধে খেতে হতো। তাই তাদের বাড়ী খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। তখন ঐরকম পয়সা নিয়ে কিনে খেতাম, বেশ স্বাধীন, যখন ইচ্ছা হ'য় কিনে খেলাম * *।"—এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "তারপর, যখন অম্নি পুরি খেয়ে থাকি, একদিন শা—বাবু আমায় বিশেষ ক'রে ব'ল্লেন—তাঁদের বাড়ীতে থাকতে। আমিও শা—বাবুদের বাড়ীতে গেলাম। তখন তাঁকে বল্লাম—আমার কিন্তু খাওয়ার কিছুই ঠিক্ নেই। তাতে তিনি বল্লেন, 'মহারাজ, আমাদের এত বড় সংসার, এত খরচ হ'চ্ছে—একপো চালের অন্ন আর একপো আটার রুটি না হয় ফেলা যাবে। খাবার আপনার ঘরে দুপুরে আর রাত্রে রেখে যাবে, আপনার যখন ইচ্ছা তখন খাবেন'।" অতএব এই সময় হইতে ৺কাশীধাম আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থান ৺বলরাম বাবুর বাটীতেই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলেন—কেদার দাসের বাড়ী ছাড়বার পর কখন উপেন মুখুয্যের কখনও বা হরমোহন মিত্রের ওখানে থাক্তেন।

শেষে ৺কাশীতে স্থায়িভাবে অবস্থিতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৺বলরাম বাবুর বাটীতে ছিলেন।

লাটু মহারাজ সম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দের কথা :—

লাটু মহারাজ কল্‌কাতায় থাক্‌তে আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যেতেন। আমরা জিগেস্ ক'র্‌তাম—আপনি এখন কি করেন? ব'ল্‌তেন—এই দিনের বেলায় তোদের এখানে 'ক্যাচ্ ক্যাচ্' কর্‌তে আসি, আর রাত্রে 'গাঙ্গার' ধারে পড়ে থাকি।"

৺বলরাম বাবুর বাটীতে লাটু মহারাজ প্রথমে উপর তলায় থাক্‌তেন। পরে নীচে—বাড়ীতে ঢুক্‌তে ডান্‌দিকের কোণেরঘরে অনেকদিন ছিলেন। আমরা তখন উপরে থাক্‌তাম। দিনে 'উদ্বোধনে' কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তাম। সেই সময়ের একটি ঘটনা এরূপ মনে পড়ে :—তখন তিনি খুব সিগারেট খেতেন। রাত্রে আমার ঘুম্‌টুম্ না হ'লে প্রায়ই তাঁর কাছ হ'তে সিগারেট চেয়ে খেতাম। সেইভাবে একদিন অনেক রাত্রে সিগারেট খাবার ইচ্ছা হওয়ায় তাঁর ঘরে গেছি, (সে সময় তিনি একলা থাক্‌তেন),

দেখি—দরজা খোলা, ঘর অন্ধকার ; আমি ত ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে মেজেতে বস্‌লাম—সে সময় তিনি বিড়্ বিড়্ ক'রে কি ব'ল্‌ছিলেন। মাত্র এই কথাটি শুন্‌তে পেয়েছিলাম—মনে হ'ল খুব অভিমানভরে জগজ্জননীকে উদ্দেশ্য ক'রে—বল্‌ছেন, "মা হয়েছে...... মা হ'য়েছে !!"

তিনি খুব আমুদে ছিলেন। তাঁকে নিয়ে আমরা অনেক সময় আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌তাম্। সময় সময় এমন চেঁচামেচি হ'ত যেন ডাকাত পড়েছে।

একদিন স্বামিজী বলরাম-মন্দিরের হল-ঘরে ব'সে আছেন, লাটু মহারাজ দরজার পাশ হ'তে যেন বিষণ্ণ হ'য়ে বল্লেন, তুমি ত আমেরিকা হ'তে এলে, আমি কিন্তু সে-ই আছি—।'

ঐ সময় লাটু মহারাজের কাছে অনেক ভক্তরা আস্‌তো। রান্নাদি হ'তো এবং অনেক রাত পর্য্যন্ত ভাগবতাদি পাঠ হ'তো—আমরা দেখেছি।

লাটু মহারাজ নিজে পড়্‌তে না জান্‌লেও তাঁর শাস্ত্রাদি শোন্‌বার খুব আগ্রহ ছিল ; তিনি অপরকে দিয়ে পাঠ করাতেন। একদিনের কথা আমার মনে পড়ে—মঠে তখন একঘরে দুজনে শুই। অনেক রাত্রে উঠে ব'ল্লেন, এই সুধীর, সুধীর, গীতা পাঠ কর ! আমি তাঁকে পাঠ ক'রে শুনালাম।

আমি তাঁকে একবার কঠোপনিষদটি সমস্ত মূল আর তার ব্যাখ্যা ক'রে শুনিয়েছিলাম। যখন এই শ্লোকটি পাঠ কর্‌লাম :—

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি।"

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অন্তর্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্ষু ব্যাক্তি মুঞ্জাতৃণ হইতে যেরূপ ইষীকা (মুঞ্জার শিষ) বাহির করে, সেইরূপ ধৈর্য্যসহকারে অন্তরাত্মা পুরুষকে স্বীয় দেহ হইতে পৃথক করিবেন ; এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। —তখন তিনি 'প্রবৃহৎ মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং ধৈর্য্যেন'—অর্থাৎ মুঞ্জাতৃণ হ'তে

যেমন তার শিষটা (ইষীকা) ধৈর্য্যের সহিত বাহির করে, তেম্নি ধৈর্য্যের সহিত অন্তরাত্মা পুরুষকে নিজ দেহ হ'তে পৃথক ক'র্‌বে'—এই কথাটি শুনে খুব সুখী হ'য়ে বলেছিলেন, 'এই ঠিক্ বলেছে।' তাঁর ঐ অবস্থা লাভ হ'য়েছিল বলেই, তিনি ঐ দুর্ব্বোধ্য কথাটি শুনবামাত্র বুঝ্‌তে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয়।

যে সময় আমরা বলরাম-মন্দিরে থাকি, তখন আর্য্য মিশনে রোজ গীতাপাঠ আর তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদি হ'তো, আমি শুনতে যেতাম। তখন পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করছিলেন। একদিন লাটু মহারাজ আমার সঙ্গে তাহা শুনতে যান। সে ব্যাখ্যা শুনে বলেছেন, 'সাঙ্কেতিক ব্যাখ্যা ক'ল্লে। যদি ঠিক ঠিক করা যায়, তা হ'লে ভাল (হবে)।' তাঁকে দেখ্‌লে অনেকটা পাগলের মত বোধ হ'তো —এলথেলো বেশ, কোনও গোছ নেই—উদাস ভাব। এই দেখে, সেদিন (সেই সমাজের) কোন দর্শক তাঁকে লক্ষ্য ক'রে 'cracked' বলে। তিনি তবু বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। সারা রাস্তা কেবল 'আমায় cracked ব'ল্লে, আমায় cracked ব'ল্লে', এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এসেছিলেন।

বেলুড়মঠে থাকতে তিনি মাঝে মাঝে ব'ল্‌তেন, 'আমি প্রত্যক্ (প্রত্যক্ষ) দেবতা সূরযনারায়ণকে মানি। অন্য কোন দেবতাকে মানি না।'

কলিকাতায় ৺বলরাম বাবুর বাটীতে স্থায়ী-ভাবে থাকিবার পূর্ব্বে মাঝে কিছুদিন চানা-ভাজা অথবা ভিজা-ছোলা খাইয়া কাটাইয়াছিলেন। সে সময় তিনি গঙ্গার ধারে পড়িয়া থাকিতেন। আমাদের মনে হয়— গৃহস্থ বাটীতে আহার করা ত্যাগ করিবার পর এবং 'বসুমতী'র ৺উপেন বাবুর নিকট হইতে পয়সা লইয়া পুরি-তরকারি কিনিয়া খাইবার পূর্ব্বে কিছুদিন ঐরূপভাবে দিনযাপন করিয়াছিলেন। জনৈক বলেন, 'সে সময় প্রায়ই (শ্রীযুক্ত লাটু) ব'লতেন, 'হম্‌কো দো-পয়সা চানা-ভুজামে হো যাতা হ্যায়, হম্মে ওর ক্যা পরওয়া হ্যয়' (অর্থাৎ, আমার দু'পয়সা চানা-ভাজায় খাওয়া হ'য়ে যায়, আমার আর ভাবনা কি ?)। এই প্রকার তিতিক্ষাপূর্ণ বৈরাগ্যব্যঞ্জক কথা শুনিয়া

লোকে স্বতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

কোন ভক্ত বলেন, "সে সময় তিনি গামছার খোঁটে ছোলা বেঁধে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে বসে থাকতেন। ছোলা ফুল্লে খাবেন—এই ভাব। একদিন গামছায় বাঁধা ছোলা একটা ইট চাপা দিয়ে গঙ্গায় ভিজিয়ে রেখেছেন তখন ভাঁটা ছিল। ইতিমধ্যে জোয়ার এসে গেছে। তাঁর অতটা খেয়াল ছিল না। নিজের ভাবে ব'সে ছিলেন। যখন খেয়াল হ'ল, দেখ্‌লেন—জোয়ার এসে গেছে; ছোলা সমেত গামছা আছে কি গেছে তার ঠিক নাই। কি করেন, সেইখানেই বসে রইলেন। জোয়ার নেমে গেলে দেখেন যে—যেখানকার জিনিস সেইখানেই রয়েছে। তখন তুলে নিয়ে খেতে লাগ্‌লেন।"

বলরাম-মন্দিরে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত লাটু একদিন ভাবস্থ হইয়া জনৈক ভক্তকে বলিতে লাগিলেন, "তোমার বাপ্ আছে, মা আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে, আমার কিন্তু কেউ নেই। আমি অনাথ—আমার গুরু বৈ আর কেউ নেই। তাই গুরুস্থানের পঞ্চক্রোশের মধ্যে পড়ে আছি।" —বলরাম-মন্দিরে ভক্ত সঙ্গে এইরূপে কাল কাটাইয়াছেন। অনেকে তাঁর পূতঃসঙ্গ লাভে ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে। অনেকেরই বিপথ-গামী মন সুপথে ফিরিয়াছে জীবনের চরম আদর্শ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার তাৎকালীন্ জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। আর কখন হইবারও আশা নাই। অথবা, আমরা এখন—স্বামিজীর বিলাত হইতে প্রথমবার প্রত্যাগমনের পর তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত লাটুর রাজপুতানা, কাশ্মীর, আলমোড়া প্রভৃতি ভ্রমণকালের কথা কিছু বলিয়া—তাঁহার বেলুড় মঠ ও কলিকাতার জীবনের দু একটি কথা বলিব এবং পরিশেষে '৺কাশীধামে শেষ কয়দিনের' কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব :—

স্বামিজী কাশ্মীরে (শ্রীনগরে) 'হাউস্-বোট্' ভাড়া করিয়াছিলেন। 'হাউস্-বোটে'র কাশ্মীরী মাঝি তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সেই বোটেরই একপাশে থাকে—তাহাদের ঘর-সংসার—সব ঐ বোটেই। অবশ্য

বড় বড় 'বোটের' মাঝিরা অন্য একটি ছোট নৌকায় স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া থাকে। এখন শ্রীযুক্ত লাটু নৌকায় উঠিয়াই দেখিলেন—স্ত্রী-লোক। আর কোথায় আছেন, তৎক্ষণাৎ 'বোট্' হইতে লাফাইয়া তীরের উপর পড়িলেন। স্বামিজী তাঁহার 'ভাব' বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত লাটু 'আমি মেয়েছেলের সঙ্গে থাক্‌ব না' পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষে স্বামিজী যখন বলিলেন, 'আমি আছি, তোর ভয় কিরে! আমি থাক্‌তে তোর কিছুই হবে না।' তখন তিনি রাজী হন এবং বোটে উঠেন।

রাজপুতনায় খেতড়ী মহারাজের সহিত শ্রীযুক্ত লাটু এমনি বুদ্ধিমত্তার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন যে, তিনি যে একেবারে নিরক্ষর এ কথা মহারাজ বুঝিতে পারেন নাই। বরং তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইয়া স্বামিজীর নিকট তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত লাটু এই কথা স্মরণ করিয়া বলিতেন, 'স্বামিজী আমায় আগে থাক্‌তেই শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছিল।'

আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি রাজ অতিথি হইয়া একদিনও রাজ অন্ন গ্রহণ করেন নাই। বলিতেন—'রাজ অন্ন সাধুর খেতে নেই, তাই আমি খেতড়ী-রাজার ওখানে থাক্‌তে একদিনও তাঁর অন্ন খাই নাই। চুপি চুপি বাইরে গিয়ে খাবার কিনে অথবা ভিক্ষা ক'রে খেয়ে আস্‌তাম। রাজা জিজ্ঞেস্ ক'ল্লে বল্‌তাম—আমি খেয়েছি। একদিন রাজার দারোয়ানের কাছ হ'তে জোর ক'রে বেগুন-পোড়া আর-রুটি চেয়ে খেয়েছিলাম। সে কিছুতেই দিতে চায় না—ভয় পাছে রাজা জান্‌তে পেরে কিছু বলেন! আমি কিন্তু জোর ক'রে নিয়ে খেয়েছিলাম।"

—তাঁহার নিজস্ব এরূপ অনেক ভাব ছিল, যাহার সহিত অনেকেরই মিল হইত না। এ জন্যই তিনি 'সঙ্ঘের' মধ্যে থাকিতে পারেন নাই। এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাবেই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

—স্বামী সিদ্ধানন্দ।

সংসার

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কিশোরীমোহনবাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসার পর দেখিলেন—কীর্ত্তন আরম্ভের সব প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রামের ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ অনেকেই সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছে। আসেন নাই কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাঁহার অনুচরবর্গ। ক্রমে গৌর-চন্দ্রিকা শেষ করিয়া স্বয়ং গোস্বামী মহাশয় 'কলহান্তরিতা' গান ধরিলেন। তাঁহার ভাবোচ্ছাস-পূর্ণ উচ্চ সুমধুর কণ্ঠস্বরে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল—আসর নিস্তব্ধ হইল। এখন তিনি গানের সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্য্যও বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, শ্রোতাগণ আরও মুগ্ধ হইল।

গাহিলেন,—"আঁধল প্রেম পহিলে নাহি হেরলুঁ। সো বহু বল্লভ কান"। অর্থাৎ "শ্রীমতী রাধিকা যখন কৃষ্ণের অদর্শনে কাতরা হ'লেন,—জীবন আর থাকে না; সেই সময় তাঁর প্রিয় সখীদের অনেক চেষ্টায় কৃষ্ণ-দর্শন হ'ল। কিন্তু রাধিকার তখন আর সেভাব থাক্‌ল না। যে হৃদয়-বল্লভকে পাবার জন্য মন এতদিন নিতান্ত ব্যাকুল—উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, আজ সেই সাধনার ধনকে সম্মুখে পেয়েও তিনি গ্রহণ কর্‌তে পারলেন্ না; হৃদয় অভিমানে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। এখানে যদি বলা যায় অভিমান কিসের? যাকে পাবার জন্য এত চেষ্টা করেছি, এত ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদেছি, সে যে সম্মুখে তবে বক্ষের ধন বক্ষে রাখি না কেন? এখন আবার অভিমান কিসের? ঐ অভিমানই ত আমাদের সব অন্তরায়। ভক্তকে ভগবানের কাছে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়; সর্ব্বস্ব-ত্যাগ কর্‌তে হয় তবে সেই প্রিয়তমকে পাওয়া যায়। খাঁটি প্রেম এমনি জিনিস—সে পেতে কিছু চায় না, সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা হওয়াই প্রেমের ধর্ম্ম। যেখানে আত্ম-সুখ-বাসনা থাকে,

যেখানে ভেদাভেদ থাকে, যেখানে প্রতিদান পাবার আশা থাকে। সেই-খানেই অশান্তি—নিরানন্দ—আবার পরীক্ষা উপস্থিত হয়; ইহা সেই ভক্তবৎসলেরই অভিপ্রেত। কারণ তিনি ঘষে মেজে একেবারে নির্ম্মল—উজ্জ্বল ক'রে তবে আপনার কাছে টেনে নেন। ধন্য হরি তোমার লীলা! একবার হরি হরি বল!" অমনি নীরব-নিশ্চল আসর হইতে শত শত কণ্ঠে হরি-ধ্বনি উঠিয়া—একবার নিমেষের জন্য চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ হইল।

গোস্বামী মহাশয় পদে আখর দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ—এখন আমরা অবশ্যই বলব শ্রীমতী রাধিকার প্রেম-সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে পেয়েও বুঝ্‌তে পারলেন না, আর সেই প্রেমের ঠাকুরটিও বুঝ্‌তে দিলেন না—তিনি আবার অন্তর্দ্ধান হ'লেন। তারপর মানময়ীর অভিমান নষ্ট হওয়ার পর চেয়ে দেখেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর নিকটে নাই। আবার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'ল। এখন কৃতকর্ম্মের অনুতাপানলে নিজেই জ্বলতে লাগ্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে অভিমানও পুড়ে ছাই হ'তে লাগ্‌ল। তাই সখীদের সম্বোধন ক'রে বল্‌ছেন,—'হে সখী প্রেম সাধনা যে এত কঠিন তা আমি জানতাম না। প্রেমের যে নয়ন নাই, প্রেম যে ভাল মন্দ বিচার কর্‌তে জানে না তা আমি আগে জান্‌তাম না। তবে কি এখন বুঝেছি? হাঁ তা বুঝেছি বৈকি! এখন আমি বেশ বুঝ্‌লাম প্রেম নয়ন-হীন, সে দেখে শুনে যাচাই ক'রে নিতে জানে না, সে একবার যেথায় মজে ভাল হোক্ মন্দ হোক্ সেইখানেই যেতে চায়। কিন্তু যাই হোক্ আজ আমি বুঝ্‌লাম যে কৃষ্ণ শুধু আমার নয়। আমার অভিমান ছিল না, তখন আমার হৃদয়-বল্লভকে কাছে পেয়েছিলাম, আবার অভিমানও এসেছে কৃষ্ণকেও হারিয়েছি তাই আমার এত যন্ত্রণা—এত জ্বালা! এ সব আমারই কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তা আমি বেশ বুঝেছি; আর আমার আমার ব'লে এত দিন যে গর্ব্ব ক'রে এসেছিলাম তা চূর্ণ হ'য়েছে। আমি কৃষ্ণকে কেবল আমার ব'লেই ভাবতাম; সেইজন্যই ত অভিমান? সেইজন্যই ত মনে করতাম আমার হৃদয়ের ধন আমার

কাছেই থাকে না কেন ? অন্যের তাতে কি অধিকার আছে ? তাই অনেক যন্ত্রণায় কৃষ্ণ নিকটে আসাতেও আমি তাঁকে গ্রহণ করতে পারলাম না ; আমার জিনিসে আমার ছাড়া আর কার দাবী থাকতে পারে ? এই ভেবে অভিমানভরে তাঁর সঙ্গে কথাও বল্‌লাম না। কিন্তু তার ফলও বেশ পেয়েছি। আর আমার অভিমান নাই, এই দেখ্ কৃষ্ণের সঙ্গে মান-অভিমান সব গিয়েছে এখন কেবল জীবন যেতেই বাকী। এখন 'আমার' ব'লে আর অভিমান নাই ; কারণ সে 'বহুবল্লভ' একথা আমি বেশ বুঝেছি'।" এই সময় আসরে ঈষৎ চঞ্চল ভাব প্রকাশ পাওয়ায় গোস্বামী মহাশয় আবার আখর দিয়ে গান ধরিলেন,—"তাঁরে যে ভজে সে তারই হয় বল্লভ একা আমার যে নয় গো। সে যে সাধনের ধন, দীন-শরণ একা আমার যে নয় গো।" তাঁহার চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে কাঁদিল। শান্তি মেয়েদের আসরে বসিয়াছিল এবং অনেক্ষণ হইতেই তার চোখ্ ফাটিয়া জল আসিতেছিল ; এখন সে আর সহ্য করিতে পারিল না, উঠিয়া গিয়া পূজার দালানে মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল। এ দিকে আকুল কণ্ঠে হরিধ্বনি হওয়ার পর আবার গান চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনেকেই তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই, গোস্বামী মহাশয় ইঙ্গিতে বসিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

ক্রমে শ্রীরাধিকার অনুতাপযুক্ত আক্ষেপোক্তি শেষ করিয়া গোস্বামী মহাশয় মিলনের গান ধরিলেন। সকলেরই নয়নে আবার পুলকাশ্রু দেখা দিল। "বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে", ভণিতা দিয়া গান শেষ করিলেন ; শেষে কিছুক্ষণ প্রার্থনা গান হওয়ার পর তাঁহার অনুমতি লইয়া নূতন দল আসরে প্রবেশ করিল। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং গ্রামের আরও অনেক ভদ্রলোক ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুই দশ জন লোক্‌কে লইয়া একটু দূরে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পিছনে পিছনে গেলেন কারণ এমন সুন্দর গান আর কখনও তাঁহারা শুনেন

নাই। অনেক বড় বড় কীর্ত্তন-গায়ক হরিপুরে আসিয়াছিলেন সত্য —কিন্তু তাঁহাদের কাহারও হয়ত ভাল গলা ছিল না, আবার গলা ছিলত এমন ভাবোচ্ছ্বাস ছিল না; ইঁহার গান সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। নানা-রূপ ভাবে শ্রোতাগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

গোস্বামী মহাশয় সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমাদেরও দরকার ঐরূপ আত্মহারা হ'য়ে ভালবাসার সাধনা। শ্রীরাধার ভাব বড় উচ্চ—সেটা মহাভাব। কিন্তু তিনি ঠিক মানুষের ভালবাসার মতই ভগবানকে ভালবেসে ছিলেন। কিন্তু সে ভালবাসা খাঁটি হওয়া চাই। মাতার পুত্রে, সতী স্ত্রীর স্বামীতে যে প্রাণঢালা ভালবাসা সেইটাই প্রকৃত পক্ষে প্রতিদানের আশা না রেখে ভালবাসা। আজকাল আমাদের দাম্পত্য জীবনেই বা সে ভালবাসা কই? কেবল কলহ আর কলহ। স্ত্রীর আর জিনিস-পত্র গয়না-কাপড়ের-বিলাস-বাসনার আশা মিটে না; কিন্তু দরিদ্র স্বামী আর কত যোগাবে? শেষে টানাটানি, ক্রমে রাগা-রাগি শেষে বিষ দৃষ্টিতে তার যবনিকা পতন। তাই আমাদের নানা কারণে আর সুখ-শান্তি নাই বাবা! তার উপর আবার দেখ পুরুষগুলর ভিতর আবার দলাদলি---মারামারি কাটা-কাটি। কেও কারও সুখ বা উন্নতি সহ্য করতে পারে না, সবাই চায় আমি বড় থাকি আর সবাই ছোটই থাক্। আমি বড়—আমি বড় বল্‌লেই কি আর কেও বড় হ'তে পারে গো! যে প্রকৃত বড় সে আত্মগোপন করলেও প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। আগুন কখন চাপা থাকে না। এই শোচনীয় দশার দিনে আমাদের অন্যায় অভিমান পরিত্যাগ করতে হবে, তবে মিলনের দিকে আগিয়ে যেতে পারব। আর মিলন হ'লেই প্রকৃত সুখ কি তা বুঝতে পারব। মান থাক্‌তে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে পান নি। তাই তাঁকে দগ্ধ হ'য়ে বড় জ্বালায় বল্‌তে হ'য়ে ছিল,—'অমিয়া সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল'। আমাদেরও কি আজ সেই অবস্থা নয়? আজ আমরা যেখানে যাই সেইখানেই গরল। আমরা আজ সুখের জন্য কি না করছি? যা করবার নয় তাই করছি; কিন্তু তা হ'লে কি হবে? সুখের সাধনা

সে আমার ত্রিসীমানায় নেই। তাই শ্রীমতীর সেই অবস্থা—'সাগর বাঁধিলাম, নগর বসালাম মাণিক পাবার আশে। অমনি সাগর শুকাল মাণিক লুকাল অভাগীর করম দোষে'। আমাদেরও সব কর্ম্মের দোষ, অন্যের কিছু দোষ নেই। এই জগৎটা একটা দর্পণ; যেদিকে চাইবে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে, মনের মধ্যে নিজেরই কার্য্যের প্রতিক্রিয়া ফিরে আসবে। এই যে আজকাল মা জননীদের সঙ্গে পুরুষদের দ্বন্দ্ব—মা জননীরা বলেন, পুরুষরা আমাদের স্বাধীনতা দিবে না কেন? আমার ত শুনে হাসি পায় আবার দুঃখও হয়। হায়! আজ সে দাম্পত্য প্রেম কোথায়? আমার মনে হয় ভালবাসা একেবারেই হৃদয়ে নেই, নতুবা দ্বন্দ্ব কেন? পুরুষ যদি নারীকে ভালবাসতে পারত—বা নারী পুরুষকে ভালবাসতে পারত তবে কি একজন আর একজনের অধীনতা অস্বীকার করত—না সে অধীনতা ব'লে বুঝতে পারত? আসল কথা তা নয় উভয়েই উভয়ের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করছে তাই এ অধীনতা এত কষ্টদায়ক। নারীর অভিযোগ,—পুরুষ তাকে বলপূর্ব্বক দাসীত্ব করাতে চায়। কেন সে এ অপমান সহ্য করবে? এই অভিযোগের মূলে কেবলই অবিশ্বাস রয়েছে। যদি আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রেম থাকত তা হ'লে এ দাসত্বের কথা কি আর উঠত? আমাদের সমাজের অবস্থাও ঐরূপ,—পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস ত করিই না, পরন্তু আমরা নীচ ব'লে কতকগুলো মানুষকে চেপে রাখি। কেন তারা সহ্য করবে? একদিন ছিল, যখন গুণ কর্ম্মানুযায়ী চতুর্ব্বর্ণ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ছিল, ভালবাসা ছিল। এখনও ছোটরা সেইরূপই বড়দের সেবা করে, কিন্তু বড়রা ছোটদের ঘৃণা করে—লাঞ্ছনা করে,—আবার কাজও আদায় করতে চায়, দাসত্ব করাতে চায়। কেন তারা সহ্য করবে? তাই আজ জগতের মধ্যে এই সাড়া পড়েছে। এ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। প্রকৃতির এ পরিবর্ত্তনের স্রোতে সকল প্রকার বাধা তৃণের মত উড়ে যাবে; সুতরাং আগে থেকে সাবধান হওয়াই কি আমাদের উচিত নয়? আজ যদি আমাদের মান বাঁচাতে হয় তবে অন্য শক্তি ছেড়ে

প্রেমের আশ্রয় নিতে হবে। ভালবাসায় বশ না হয়—দাসত্ব স্বীকার না করে এমন ইতর জীবও বোধ হয় সংসারে খুব অল্পই আছে। একবার এই প্রেমরূপ পরশমণি হৃদয় স্পর্শ করলে সব বিপরীত হ'য়ে যায়। সেখানে কুরূপ সুরূপ ধারণ করে, নিগুর্ণও গুণবান হয়।

"আজ কতকগুলি জাতিবিশেষের লোককে পতিত বলে ফেলে রাখ্‌লে চল্‌বে না, সকলকেই কোল দিতে হবে। আবার প্রেমে গদগদ হ'য়ে বল্‌তে হবে,—'মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিব না'। তবে দেখ দেখি ভাই কে পতিত আর কে অস্পৃশ্য-শূদ্র এ ভেদাভেদ কোথায় থাকে? তাই না সাধক রামপ্রসাদ গেয়ে ছিলেন,—'ঘুচিবে সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ, তখন শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা'। ভাই! যেখানে যত ভেদাভেদ সেখানে ততই অশান্তি; এতে মোটেই সুখ নেই। তবে কেন বৃথা দ্বন্দ্ব ক'রে অমূল্য জীবন নষ্ট করি? ভেদের সুখ ত অনেক দেখ্‌লাম, এখন একবার মিলনের সুখে মেতে দেখ দেখি ভাই, কত আনন্দ পাও?" বলিয়া গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত প্রত্যেকের সহিত আনন্দে কোলাকুলি করিয়া বিদায় দিলেন। তাহার পর একটু নির্জ্জন স্থানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লইয়া গিয়া হাতে ধরিয়া অনেক অনুরোধ করিলেন,—যাহাতে এ বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া যায়। তিনিও একরূপ স্বীকার করিলেন, কিন্তু অন্তর খোলসা করিতে পারিলেন না। গোস্বামী মহাশয় সে কথা বুঝিতে পারিয়াই সেদিনকার মত বিদায় দিলেন।

তারপর আরও দুই একদিন পরে কীর্ত্তন শেষ হইল। তিন দিন এক লগ্নে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও রস-কীর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ন-বিতরণ প্রভৃতি মহোৎসব বেশ ধূমধামের সহিত চলিয়াছিল। শেষের দিন ধূলট-মহোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য সকল জাতীয় লোকদেরই আদর অভ্যর্থনার সহিত নিমন্ত্রণ করা হইল। যাইবার সময় অন্যান্য জাতিদের মধ্যে প্রসাদের নামে প্রায় সকলেই আসিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থের প্রায় অধিকাংশই আসিলেন না। গোস্বামী

মহাশয় এবং কিশোরীমোহন বাবু প্রত্যেকেরই বাড়ীতে যাইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অটল—অচল! নিরুপায় হইয়া সে প্রসাদ আচণ্ডালে বিতরণ করা হইল এবং উৎসবেরও শেষ হইল। গোস্বামী মহাশয় বুঝিলেন এখনও সময় হয় নাই। "আচ্ছা দেখা যাক শ্যামচাঁদের কি ইচ্ছা। এ মিলন কি সম্ভব হবে না? তা যদি না হয় তবে জীবনের সব সাধনাই বৃথা করেছি। প্রভু! তোমারই ইচ্ছা—যা করাও তাই করব।" বলিয়া তিনি ঈষৎ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিশোরীমোহন বাবুরও ধৈর্য্যচুতি হইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সকলের অলক্ষ্যে শান্তি পূজার দালানে গিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া তাহার মন যখন অনেকটা হাল্কা বোধ হইতে লাগিল, তখন বাড়ীর ভিতরে গেল। তারপর একলা কিছুক্ষণ উঠানে পায়চারী করিয়া আবার নাট-মন্দিরের দিকে ফিরিয়া আসিল। তখন কীর্ত্তন শেষ করিয়া গোস্বামী মহাশয় ধরা গলায় প্রার্থনা-গান করিতেছেন। শান্তি একটু দূরে দাঁড়াইয়াই শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ শুনিয়া কীর্ত্তন শেষ হইলে আবার ভিতরে আসিয়া আবার পায়চারী করিতে লাগিল। আজ যেন তার হৃদয়ে কি একটা প্রবল তুফান বহিয়া যাইতেছে, সে কূল কিনারা পাইতেছে না। একবার আকাশের দিকে চাহিল,—সম্মুখে একটা তারা উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছিল, দেখিয়া মনে হইল ওটা বুঝি আপনার পূর্ণতার গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতেছে। ভাল লাগিল না, আজ তাহাকে নিতান্তই নিরাশ্রয় একলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আবার বাড়ীর মধ্যে গিয়া তাহার শুইবার ঘরে বিছানার উপর হারমোনিয়মটা লইয়া একটা গান ধরিল, —"বঁধু কি আর বলিব আমি। যেন শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হয়ো তুমি"। আখর দিল—"যেন হারাই নাহে, আমার আশা না মিটিতে হৃদয় না জুড়াতে যেন হারাই না হে। আমার পলক

না পড়িতে, হিয়ায় না রাখিতে, যেন হারাই না হে"। আর গাহিতে পারিল না, স্বর বন্ধ হইয়া আসিল; পদের আত্মহারা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেও আত্মহারা হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে হারমোনিয়মের শব্দ শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় দর্শন দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই পূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাসময় সঙ্গীত তিনি শুনিবেন। কিন্তু তাহা হইল না, শান্তি তখন গান বন্ধ করিয়াছে।

গোস্বামী মহাশয় সেখানে যাইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। তারপর বলিল,—"কাল থেকে আমায় কলহান্তরিতার গান গুলো শিখিয়ে দেন, আমার বড় ভাল লাগ্‌ছিল।" গোস্বামী মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন,—"শুধু ভালই লাগ্‌ছিল মা? আমার ত মনে হয় আমার গানের সার্থকতা শুধু তোর হৃদয়েই পেয়েছি। ঐ যে তোর চেহারা বদ্‌লিয়ে গিয়েছে? তা হ'লে দেখ্‌ছি সত্যিই তুই প্রেমের দেবতাকে বেঁধে আন্‌বি। দেখিস্ যেন অভিমান ক'রে আবার তাড়িয়ে দিস্ না, নইলে অমনি কাঁদ্‌তে হবে।" শান্তির মুখ কাণ সব আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। গোস্বামী মহাশয় তাহাকে শুইতে বলিয়া নিজের বাসায় গেলেন।

শান্তি কিন্তু শুইল না, সে একটা ট্রাঙ্ক খুলিল। সেটা খুলিতেই প্রথমে দেখিল আর একটা ছোট রকমের ফটো চিত্র অতি যত্নে সাজান রহিয়াছে। সেটা লইয়া একবার মাথায় একবার বুকের উপর রাখিয়া আবার বাক্সে রাখিল; সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। তারপর আরও কতকগুলি বই খাতা পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কয়েকখানা দেখিল তাহারই নোট বুক্। আগে সে নোট লিখিত, বিনয় সংশোধন করিয়া দিত। অতি যত্নে সে গুলি এক পাশে সরাইয়া রাখিল। তারপর একখানি নূতন বই খুলিতেই তাহার ভিতর একখানি চিঠি পাইল। চিঠিখানি তাহার দাদার বন্ধু ইন্দুভূষণের লেখা। ইন্দুভূষণ হরিপুর হইতে যাওয়ার পর এই চিঠি খানি শান্তিকে লিখিয়াছিল, বই খানিও সে পাঠাইয়াছিল। সম্প্রতি আবার ইন্দুভূষণের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা বার্ত্তা হইতেছিল।

এই বিষয়টা মনে করিতেই তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল, এবং কি মনে করিয়া চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর ষ্ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ঘুম আসিল না, কিন্তু মুখ গুঁজিয়া শুইয়া থাকিল।

* * * * * * * * * *

কিশোরীমোহন বাবুর বাড়ীর উৎসবের পর মাস খানেক না যাইতেই গ্রামে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। একজন ডোম কোথায় চড়ক পূজার মেলা দেখিতে গিয়া কলেরা লইয়া আসিল। কিন্তু ইহা শুধু তাহাকে লইয়াই ক্ষান্ত হইল না, গ্রামে মহামারীর স্মৃষ্টি করিল। একে দারুণ গ্রীষ্ম, তাহার উপর জলাভাব নানা কারণে ব্যায়রাম খুব বেশী হইয়া উঠিল; তবে একটু আশার কথা এই যে মৃত্যু সংখ্যা খুব কম। আজ পর্য্যন্ত প্রায় কোন রোগীরই কোনরূপ অযত্ন হয় নাই; কিশোরীমোহন বাবু নিজে—গোস্বামী মহাশয় এবং তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকদিগকে লইয়া যে একটি সেবক-সমিতির গঠন করিয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্যে যথাসাধ্য সেবা যত্ন হইতে লাগিল। কিশোরীমোহন বাবু হোমিওপ্যাথিক মতে বেশ ভাল চিকিৎসা করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও আর একজন ডাক্তারের সাহায্য লইয়া যথা-সাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।

একদিন গভীর রাত্রিতে রোগীর বিছানা পরিত্যাগ করিয়া কিশোরী মোহন বাবু এবং গোস্বামী মহাশয় অবসন্নভাবে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হবার পর কিশোরীমোহন বাবু বলিলেন,—"গুরুদেব! কি ক'রে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব? অবশ্য আপনি আমার নিকটে,—শুধু নিকটে নয়, আপনি সকল বিষয়েই আমার সহায় হ'য়ে যে শক্তি যোগাচ্ছেন তাতে আমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি হৃদয়ে এক অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া বেশ বুঝ্‌তে পারছি, এসবই আপনার কৃপা। কিন্তু তাহ'লেও সময় সময় নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ছি এইটাই ভয়ের কারণ।" গোস্বামী মহাশয় আশ্বাসের স্বরে বলিলেন, —"কিছু ভয় নেই বাবা! শ্যামচাঁদ সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, আমরা

কেবল নিমিত্তের ভাগী। তাঁর শক্তির কাছে জগতে অসম্ভব কিছু নাই। যিনি সেই কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপন সূচনায় বলেছিলেন 'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' তাঁর বাণী অবিশ্বাস করবার কোন কারণ দেখি না, সব বন্দোবস্তই তিনি করবেন। আমরা কেবল তাঁরই আদেশ পালন ক'রে যাব। কাজেই আমাদের অধিকার, যথা সাধ্য কাজ ক'রে যাও—প্রাণের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর; ফলাফল যা হয় হোক্! সেই অভয় বাণীতে বিশ্বাস হারিয়ো না বাপ! আজ বিশ্বাস হারিয়েই আমাদের এত দুর্দ্দশা!" বলিতে বলিতে গোস্বামী মহাশয়ের উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল। এবং একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"পতিত পাবন! এখনও কি তোমার আসবার সময় হয়নি প্রভু! আর কত দেখবে? তুমি যে করুণাময়, তবে সেখানে কি পতিতদের বেদনা আঘাত করেনি?" বলিয়া দুই হাত কপালে দিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। এমন সময় বাহিরে কাহার অস্থির পায়ের শব্দ শুনিয়া দুই জনেই উৎকণ্ঠিত ভাবে বাহিরের দিকে চাহিলেন। আগন্তুক বাড়ীর ভিতরে আসিবার পূর্ব্বেই ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"কিশোরী! বাড়ীতে আছ ভাই?" স্বর নিতান্ত পরিচিত—বিনোদ বিহারী ভট্টচার্য্য ডাকিতেছেন। তাঁহারা দুইজন নূতন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া প্রস্তুত হইয়াই বাহির হইলেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবার অবসর দিলেন না, একেবারে ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"ভাই! বড় বিপদ শীগ্‌গীর এস আমাদের বিমলার কলেরা।" বিমলা ভট্টচার্য্য মহাশয়ের আবাল্য বিধবা কন্যা। সকলেই ছুটিয়া গিয়া দেখেন,—রোগিনীর অবস্থা বাস্তবিকই ভীষণ। সন্ধ্যার সময়েই ভেদ বমি আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সামান্য পেটের অসুখ বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছিল। তাহার পর সামান্য টোট্‌কার সাহায্যে নিবারণ করিবারও চেষ্টা করা হইয়াছিল। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া একাকী কিশোরীমোহন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এরূপ কার্য্য তাঁহার জীবনে এই প্রথম। গ্রামে কোন সংক্রামক ব্যাধি হইলে তিনি দিনের বেলাইতেই বাড়ীর বাহির হইতেন না। কিন্তু বিপদ

এমনই জিনিস যে রাত্রি দুই প্রহরের সময় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি একাকীই গ্রামের আর এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরকম সময় বাড়ীর মধ্যেই কতদিন কান্নার দূরাগত শব্দে তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে, আজ যাইবার সময় কয়েকটা উন্মত্ত শৃগাল কুকুরের সঙ্গে সাক্ষাতেও তাঁহার চমক ভাঙ্গে নাই।

যাহা হউক চেষ্টা অনেক হইল। কিশোরীমোহন দেখিলেন ইহা খাঁটি এশিয়াটিক কলেরা। ফল কিছুই হইল না,—অভাগিনী অনেক যন্ত্রণার পর ভোরের সময় জগতের ভার লাঘব করিয়া মুক্তিলাভ করিল। এদিকে রোদন-রোল উঠিল, কিন্তু সংকারের কি হয়? খুঁজিয়া দেখা গেল, ব্রাহ্মণদের অনেকেই প্রাণরক্ষার জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই আসিতে স্বীকার করিলেন না; বাজে ওজর আপত্তি দেখাইলেন। কেহ বলিলেন—"আমার বাড়ীতে অন্তঃসত্ত্বা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।" গোস্বামী মহাশয় এবং কিশোরী মোহন বাবু ব্যাপার সব বুঝিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সংপ্রতি নিজেদের স্বরূপ বেশ ভাল করিয়াই অনুভব করিলেন। কিন্তু এখন উপায় কি হয় ইহাই বিবেচ্য। এদিকে সময়ও আর বেশী নাই, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শব বাহির করিতে হইবে। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—"কিছু ভয় নেই! এই কঙ্কাল এখনও অনেক শক্তি ধরি। ব্রাহ্মণের মধ্যে আরও একজন উপস্থিত ছিলেন,—তিনি তারণ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনিও আবার সমাজচ্যুত। গোস্বামী মহাশয় ঈষৎ চিন্তা করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলেন,—"ভাই বিনোদ! আমরা দুইজনে যদি তোমার মেয়ের সংকার করি কিছু আপত্তি আছে কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখ লজ্জায় অনুতাপে ক্ষোভে একেবারে মলিন হইয়া গেল; তিনি কথা বলিতে পারিলেন না, গোস্বামী মহাশয়ের পায়ে হাত দিবার জন্য বসিয়া পড়িলেন। গোস্বামী মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"ভাই! মাপ কর আমি বড় কষ্ট দিলাম। কিন্তু তোমার ভয় নেই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে।"

যথা সময়ে শব সংকার করা হইল। বাহক কেবল দুই জন,—সঙ্গে

কিশোরীমোহন বাবু এবং কয়েক জন ব্রাহ্মণেতর সেবক গেলেন। বলা বাহুল্য সেবক-সমিতির সকলেই ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোক। কিন্তু বিপদ এই খানেই শেষ হইল না, বেলা প্রায় দশটা না হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছোট ছেলে ননীগোপালের ভেদ বমি আরম্ভ হইল। এদিকে গৃহিণী শয্যাগত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেও প্রায় অর্দ্ধোন্মাদ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন। কিশোরীমোহন বাবু দেখিলেন অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। এ সময় ইঁহারা যদি ছেলের কাছে থাকেন তবে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। তিনি গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহাদের কাছে অন্য ঘরে থাকিতে বলিয়া, নিজে আর একজন ডাক্তারের সাহায্যে অন্য একটি নির্জ্জন ঘরে ছেলের চিকিৎসায় লাগিলেন। মধ্যে অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিল, কিন্তু হাল ছাড়িলেন না; ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারপর প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভেদ বমি সাধারণ ভাবে বন্ধ হইল, অবস্থা একটু ভাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি বড়ই উৎসাহের দ্বিগুণ শক্তিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি প্রায় বারটার সময় দেখা গেল রোগীর ভয়ের অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে। এখন চেতনও হইয়াছিল মানুষ চিনিতেছিল; কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল। সেই সময় একবার মা বাবাকে ডাকিয়া দেখান হইল; তাঁহারা প্রায় উন্মত্তের ন্যায় ছেলেকে ধরিতে গেলেন; কিন্তু এরূপ অবস্থায় বিঘ্ন হওয়ারই সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া গোস্বামী মহাশয় নিরস্ত করিলেন। তাঁহাদিগকে আবার অন্য ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

প্রাতঃকালে দেখা গেল ছেলের আর প্রাণের ভয় নাই। সকলেই একটু শান্ত হইলেন, কিশোরীমোহন বাবুর প্রাণ উৎসাহে ভরিয়া উঠিল;—এদিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সপরিবারে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে কিশোরীমোহন বাবুকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন,—"উপযুক্ত গুরু শিষ্য প্রত্যক্ষ ক'রে আজ জীবন সার্থক হ'ল। ভাই কিশোরী আমায় ক্ষমা করিস ভাই!" বলিয়া কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিশোরীমোহন বাবুও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,—"দাদা! আপনি আমায় ক্ষমা করুন! আমার মত পাপী বোধ হয় আর কেও নাই।"

দেখিতে দেখিতে গ্রামের অবস্থা একটু ভাল হইয়া আসিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রটিও বেশ সবল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই পরিবারের মধ্যে যে অভেদ্য যবনিকা ছিল, ভগবানের কৃপায় তাহা চিরতরে কোথায় মিলাইয়া গেল। বিধবা মেয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিশোরীমোহন বাবুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন দল ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। যদিও কাহারও কাহারও এক আধটু অমত ছিল তাহাদেরও এই সম্মিলিত পবিত্র জ্বলন্ত শক্তির নিকট মাথা উঁচু করিতে সাহস হইল না। যিনি গড়িয়াছিলেন তাঁহারই যত্নে আজ শয়তানের কারসাজী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হাওয়ায় উড়িয়া গেল। বিনোদবিহারী ন্যায়রত্ন নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কিশোরীমোহন বাবুকে সমাজের শীর্ষস্থান দিলেন দেখিয়া সকলেই তাঁহার মতে মত দিল। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের মধ্যে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। এখন আর গুপ্ত ষড়যন্ত্র নাই—দলাদলির পরামর্শ নাই—পতিত করিবার উদ্যোগ নাই, তাহার পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব মিলনের আনন্দ-ধারা গ্রামের উপর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য মাখাইতে আরম্ভ করিল। দীন-দুঃখীর প্রাণ আশায় ভরিয়া উঠিল, 'কোন্ পক্ষে যোগ দিতে হইবে' এই দুশ্চিন্তার হাত এড়াইয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আপনাদের কার্য্যে মনোযোগ দিল।

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামে একটী সমিতি গঠিত হইল, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন। সেবক-সঙ্ঘ আগেই হইয়াছিল এখন তাহার সংস্কার সাধিত হইল, ব্রাহ্মণ—কায়স্থ সকলেই আনন্দের সহিত যোগ দিলেন। তাহাদের অঙ্গীকার থাকিল যে, আচণ্ডালের সেবা করিতে হইবে তাহাতে কোনরূপ ভেদাভেদ থাকিবে না। তাহাদের আর একটি কাজ হইল গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে,—অন্ততঃ যাহাদের খাইবার সঙ্গতি আছে, তাহাদিগকে বলিয়া প্রতিদিন রান্নার চাউল হইতে 'মুষ্টি' তুলিতে হইবে। এইরূপে হিসাব করিয়া দেখা গেল, ইহার মাসিক আয় খুব কম পক্ষে পঞ্চাশ

টাকা। এই সব টাকার উপযুক্ত ব্যবহার করিবার ভার কমিটির উপর থাকিল, তবে কথা থাকিল যে মাসে একবার করিয়া গ্রামের সাধারণকে একত্র বসাইয়া তাহার হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিতে হইবে। তারপর ইহা ছাড়া বিবাহ ইত্যাদির সময় সাধারণের হিতার্থে অবস্থানুযায়ী একটা ট্যাক্স বরের পিতাকে দিতে হইবে তাহারও কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যদি সঙ্গত মনে হয় তবেই এ ব্যবস্থা হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। আর নূতন ফসলের সময় অতি সামান্য কিছু করিয়া শস্য সকলকেই এই ভাণ্ডারে দিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত হইল ; এবং ইহা হইতে যে আয় হইবে তাহা কেবল মাত্র গ্রামের স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা—কোন দুস্থ পরিবারকে হঠাৎ কোন কারণে সাহায্য করা হইবে। এখন হইতেই গ্রামের অসমর্থ দুর্ব্বল অসহায় ভিক্ষুকদের দৈনিক খোরাকী দেওয়া আরম্ভ হইল। সকলেই মহা উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া গেল :—গ্রামের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যেন প্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁহার আতুর সন্তানদের প্রতি হাসিয়া চাহিলেন। এমন সময় আর একটা সুখবর পাওয়া গেল,—নরেন লিখিয়াছে—"বিনয়বাবুর সন্ধান পেয়েছি, তিনি এখন পশ্চিম অঞ্চলে, আমি আন্‌তে চল্‌লাম" ।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅজিতনাথ সরকার।

প্রবাসীর পত্রাংশ

(১)

গত ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে খুব Snow storm হইয়া গিয়াছে ; রাস্তায় তখন চলাফেরা করা খুবই কষ্টকর হইয়াছিল, এবং হঠাৎ খুব বেশী শীত পড়িয়া সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত জমিয়া German ও England এর Mail এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ ছিল, আজকার Temp—2° C.। এই দেশের সবাই বলে যে শীঘ্র এরূপ প্রচণ্ড শীত পড়ে নাই। এবং

এত দিন ধরিয়া স্থায়ীও হয় নাই। April মাসের প্রথম সপ্তাহে বরফ গলিবে। আজকাল মাঝে মাঝে একদিন গলিবার মত হয় আবার পরদিন নূতন বরফ পড়িতে থাকে। এই ভাবে চলিতেছে।

কাজ কর্ম্ম মন্দ চলিতেছে না, হয়ত ৭।৮ দিনে মধ্যে একখানা paper লেখা শেষ হবে। ইতিমধ্যে একদিন North light দেখিয়াছিলাম।

(২)

প্রথমেই একটা সুখবর দেই, বরফ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই ভাবে গলিলে এই মাসের শেষ সপ্তাহে গলা শেষ হবে, এবং রাস্তাও অত্যন্ত বিশ্রী হইয়াছে, জল, কাদা, ময়লা,—একটা অদ্ভুত Compound। Motor চলিলে আমাদের দেশের রাস্তার মতই দুপাশে এই compound ছড়াইয়া চলে; এবং পথিক যাহারা তাহারা দুঃখে Motor চালক ও আরোহীকে গালি দিতে আরম্ভ করে। তবে পোষাকের এমনি মহিমা যে শুকাইলে Brush করিলে দাগ থাকে না। Temp. + 2° C আজ। দিন বেশ লম্বা, রাত্রি ৭॥•টার সময় বাহিরে বই পড়া যায়, সকাল কটায় হয় জানি না তবে আমার ঘরে ৪॥•টার সময় ঘড়ি দেখা যায়, কাচের জানালা ও কাপড়ের মোটা পর্দ্দা—তাহার ভিতর দিয়াই এত আলো। July মাসে শুনি ১০॥•টা বা ১১টা পর্য্যন্ত দিন থাকিবে ও সূর্য্যোদয় রাত্রি ২টা বা ২॥•টায়। এ জন্য খাবার সময় বদলান হয় না, এবং ঠিক সন্ধ্যার সময় সবাই যার যার বিছানায় ঘুমাইতে আরম্ভ করে।

এবার আর বিশেষ কোন নূতন খবর নাই; মাত্র একটাই একটু মজার। এতদিন ভদ্রলোকদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতাম, এবার একজন সমবয়সীর বাড়ী, তিনি বিবাহিত, এবং আমরা বাকী ৭ জনা সবাই প্রায় সমবয়সী। কাজেই ফূর্ত্তিটা খুবই হল। খাওয়া আরম্ভ হল রাত্রি ৮টার সময় এবং শেষ হল ভোর ২টায়। সমবয়সীরা নিমন্ত্রণ করিলে নাকি এরূপই হয়। ইঁহারা সেদিন প্রচুর মদ খাইয়াছিলেন, আমাকেও দুধ লইয়া মদের তাল যোগান দিতে হইয়াছিল, তাই প্রায় ৭।৮ গ্লাস কাঁচা দুধ সেই রাত্রে পেটে গিয়াছিল। মদ খাওয়া! গান আর যত

ফাজলামি ও গল্প। রাস্তায় আসিয়া ২টার সময় বন্ধুরা মাতালের মত টলেন নাই বটে তবে বেশী জ্ঞান ছিল না। * *

* * একজন বলিলেন যে তিনি ডিগবাজী দিয়া খুব তাড়াতাড়ি যাইতে পারেন, অমনি আমার হাতে তাঁহার টুপীটি দিয়া, অন্ততঃ গোটা দশেক ডিগবাজী রাস্তার উপর দিয়া উঠিলেন। তখন বরফ ছিল গায়ে বা পোষাকে কাদা লাগে নাই, ঝাড়িলেই বরফ চলিয়া গেল। আর একজন বলিলেন যে তিনি Wet shoe (অর্থাৎ বরফের জন্য বুটের উপর আর একজোড়া রবারের জুতা ব্যবহার করেন, না হলে বুট ভিজিয়া যায়, এবং তাহা ঘরে ঢুকিয়াই ছাড়িয়া রাখেন) ঠিক vertical উপরে ছুঁড়িতে পারেন, যেমনি বলা অমনি সেই কাজ, সেই জুতা জোড়াটা খুবই চলিল, সবাই vertical ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং পথে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া এমন গান বা হল্লা হইতেছিল যে পুলিশ থাকিলে নিশ্চয়ই warning দিত। আমি জিজ্ঞাসা, করিলাম আপনারা কি মাতাল হইয়াছেন অমনি, "মাতাল হব কেন, এই মদ কি সহ্য করিতে পারি না" ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া বিকট হাসি—মাতালের লক্ষণ বেশ প্রকাশ পাইল। কিছুক্ষণ পরে কাজের কথা হল, আমি আশ্চর্য্য হলাম যে সে বিষয়ে বন্ধুরা ঠিকই আছেন, তখন বেফাস কথা কেহ বলিলেন না। খাবার সময় আস্ত একটি মুরগী, Tableএ উপস্থিত। তাহার মাথা, পালক ও ঠ্যাং নাই। পেট কাটা। আমার Anatomyর জ্ঞান সামান্য তাই আর সুবিধা করিতে পারিলাম না। কথা ছিল সে দিন কে কত মদ খাইয়া হজম করিতে পারেন, কিন্তু প্রথম প্রথম হিসাব থাকিলেও পরে আর হিসাব রাখা সম্ভবপর হয় নাই।

(৩)

এ বৎসর আমার এই Christmas সাহেবদের সঙ্গে মন্দ কাটিল না। 24th Dec. ইহাদের খুব আনন্দের দিন, সে দিন সন্ধ্যার সময় Prof. আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, যাইয়াই দেখি অদ্ভুত ব্যাপার! Pine

গাছের ডাল কাটিয়া খাবার ঘরে বসাইয়াছে, তাহাতে Flag, মোমবাতি, ফুল, ফল, chocolate দিয়া সাজান হইয়াছে, দেখিতে বেশ, বলেন যে আজ Children's Eve. এই গাছ হতে ছেলেরা ফল ও মিষ্টান্ন লইবে ও গান করিবে। খাওয়া হল, একটু বিশেষ রকমের ও খাবার সময় সবাই থালা ও রুটী লইয়া রান্না ঘরে যাইয়া একটা জলে রুটী ভিজাইয়া আনিলেন। কেন জানি না। উহারা বলেন যে Custom! খাবার ঘণ্টা খানেক পরে, কয়েকটি ছেলে সং সাজিয়া একটি Bag লইয়া বাড়ী আসিল ও ছেলেদের ডাকিয়া তাহা হইতে বাঁশী প্রভৃতি দিয়া গেল, এই সং সাজা এক অদ্ভুত ধরণের, মাথায় Turkish cap Fez, মুখে পাকা দাড়ী ও গোঁপ। তারপর সবাই একটা Tableএর ধারে বসিয়া এবং গৃহকর্ত্তা ও কর্ত্রী একটি Basket আনিয়া তাহার মধ্য হইতে এক একটি packet বাহির করিতে লাগিলেন। ইহাদের এই সময় সবাই বন্ধু বান্ধবেরা present দেয় এবং সেই present নাম ধরিয়া দিতে লাগিলেন; আমিও বাদ যাই নাই, এবং packetএর উপরে নাম ও এক একটি ছড়া লেখা আছে, কত রকমের ছড়া, আমার packetএর ছড়া এই—

"I hope you will not feel alone
With this friend without flesh and bone."

ইহার পর coffee ও মদ খাওয়া খুব চলে। সবার সামনেই এই packet খুলিতে হয় এবং কি আছে তাহা দেখাতে হয়; এই একটা নূতন জিনিস দেখিলাম। Christmas treeর নীচেই কিন্তু এই সব হয়। এবং এই Christmas tree সর্ব্বত্র, Hotel, Coffee House সর্ব্বত্রই এই একই ধরণে গাছ সাজান।

এখানে Holland হইতে Dr J. R. Katz আসিয়াছেন, আমারই মত শিক্ষানবীশ তবে তাঁহার বয়স বোধ হয় ৪০ বৎসর হবে। তাঁহার স্ত্রী Boston বাসিনী, তিনি এখানে আসিয়াই আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, এবং দেখিয়াই Introduced হবার পূর্ব্বেই বলিলেন—হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, এক জনা লোক পাইয়াছি, যাহার সঙ্গে মন খুলিয়া ইংরাজী কথা বলা যাবে। ইনি German ও Dutch ভাষা জানেন তবে

ইংরাজী ভাষার মত নহে। ইঁহারা খুবই ধনী, আর আমার নিমন্ত্রণ ইঁহাদের Hotelএ লাগিয়াই আছে, অর্থ ইংরাজীতে গল্প করা—তবে মদ মাংস খাই না, তাই ফলের খুবই আয়োজন করেন। ইঁহাদের অনুরোধ 25th Dec. ইঁহাদের সঙ্গে Village churchএ যাইতে হইবে, যাবার সময় সকাল ৬টা (তখনও রাত্রি অনেক কারণ সূর্য্যোদয় ৯টায়)। আমিত কাঁপিতে কাঁপিতে ৬টার পূর্ব্বেই ইঁহাদের Hotelএ উপস্থিত, তখন ইঁহারাও সাজিয়া আছেন, সেই Hotel এর মেয়েরা সব সাজিয়া এক এক dishএ coffee লইয়া ও মাথায় বাতি সাজাইয়া গান করিতে করিতে এক একজনকে এই সব দিয়া গেল, বেশ গরম পাওয়া গেল, তারপর ইঁহাদের সঙ্গে গাড়ী করিয়া ৪ মাইল দূরে একটি 15th Centuryর church আছে, সেখানে গেলাম। আমরা ৪ জনা, Dr. Katz তাঁহার স্ত্রী ও স্ত্রীর সঙ্গিনী এবং আমি। Temp. বাহিরে তখন —21°c, ইঁহারা কম্বল প্রভৃতি এরূপ ঢাকিয়া বসিলেন যে আমার ত হাসি চাপিয়া রাখা মুস্কিল, আমার ত অত সব নাই, ও জানিও না যে ও সব দরকার তাই তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই আমার জন্য এক set সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহাই লইলাম। সেই ৪ মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া আর ভুলিব না, Temp—21°c, কন্ কনে বাতাস রাস্তা মাঠ সব সাদা বরফে ঢাকা আকাশে চাঁদ, শীত ছাড়া আর সবই মন্দ নহে। তবে গাড়ীর চাকার বদলে একটি plain কাঠ, কারণ উহাই বেশ সর্ সর্ করিয়া যায়, বরফের সময় গাড়ীর চাকার বদলে এই সবই ব্যবহার করে। Church এ আমরা যখন গেলাম তখন ৭টা বাজে নাই, ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত, prayer প্রভৃতি বেশ চলিল, তবে ২।৪টি নাম ও কথা ছাড়া আমরা আর কিছুই বুঝিলাম না, আসিবার সময় সূর্য্য উঠিতেছে, আকাশ লাল বেশ দৃশ্য—সাদা ও লাল, অন্য দিকে তখনও চাঁদ দেখা যাইতেছিল, অন্ধকার থাকিতে Churchএ যাইতে হয়, এবং দিনের আলোতে বাহির হইতে হয়—এই Darkness to Light, ইহাই Christএর জন্মের Symbol স্বরূপ এই Custom। Churchটি খুব পুরাতন তবে বেশ সাজান, অনেক Statue Mary ও Bady Christ on Cross ইহার নীচেই

পাদরী সাহেব প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনাও তালে তালে, এই কপালে হাত দেওয়া এই মাথা নীচু করা, এই দাঁড়ান, এই Amen করা—বেশ মজা, যেন মুসলমানদের নমাজ পড়া! বাসায় ফিরিবার সময় শীতে সবাই কাবু হইয়াছিলেন তবে মুখ ফুটিয়া কেহ বলিবেন না। আমিও ভাবি যে থাকি চুপ করিয়া, দেখি ইঁহারা কত সহ্য করেন। তবে সবাই আমার শীত করে কি না, আমার অভ্যাস নাই এই সব সহানুভূতির কথা শুনাইতে শুনাইতে ব্যস্ত করিতেছিলেন, আমিও Thanks, I am all right বলিতেছিলাম তবে কান, গাল, নাক ও পা যে কি হইতেছিল তাহা আর কি বলিব। বাসার ধারে আসিয়া Dr Katz বলিলেন যে তাঁহার পায় অত্যন্ত শীত লাগিতেছে প্রায় অসাড় হবার মত। Mrs. Katz তখন সেই কথাই বলিলেন, তাঁহার সঙ্গিনী বলিলেন যে তাঁহার কান ও নাক আছে কিনা এরূপই সন্দেহ হইতেছে, তবে তাঁহার পাও জ্বালা করিতেছে। আমাকে তখন সবাই জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেমন feel কর, কথার স্বর সবারই বিকৃত, আমিও বাগে পাইয়া বলিলাম, কেন আমি Indian, আমার ত শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, এখন তোমরা ওরূপ কর কেন, তোমরা ত শীতের দেশের মানুষ। তবে আমার পা অনেক পূর্ব্বেই অসাড় হইয়াছে, কান, নাক ও গালও তদ্রূপ, তবে ইঁহাদের নিকট বলা হবে না। বাসার ধারে আসিয়া ইঁহারা Hotel maidকে ডাকিয়া খানিকটা মদ খাইয়া টলিতে টলিতে ঘরে গেলেন, আমি মদ খাইলাম না, কম্বলের নীচেই পায়ে পায়ে খুব ঘসিয়া ঘরে গেলাম। সেখানে সবাই আগুনের ধারে বসিয়া আপনার কষ্টের কথা (শীতের জন্য) বলিতে লাগিলেন, আমিও গরম হইয়া ইঁহাদের ঠাট্টা করিতে ছাড়িলাম না, আমার যে কেমন হইয়াছিল তাহা আর বলিলাম না, ইহারা বলেন যে তুমি মদ খাও না মাংসও খাও না, শীতে থাক কি করিয়া—আমার এক কথা Indiaর Heat আমার শরীরে আছে, এই দু বৎসর সেই Heatএই আমাকে রক্ষা করিবে—তখন বাহিরের Temp—17°C,—সেদিনের টেক্কায় খুব জিতিয়াছি তবে ওরূপ আর করিতে যাব না।

এক দিন রাত্রি ১০টার সময় সবাই পাশের গ্রামে বেড়াইতে

গিয়াছিলাম Temp—20°C ছিল তবে Protection ভাল ছিল আর খুব জোরে জোরে হাঁটিতেছিলাম তাই পায়ে এরূপ কষ্ট আর হয় নাই। সব বরফে ঢাকা। আকাশে চাঁদ, নদীও জমিয়া সাদা হইয়াছে, বেশ দেখা যায়, আমার Camera নাই, থাকিলে কয়েকখানা ছবি তুলিতাম। রাত্রিতে বেশ কষ্ট হইয়াছিল, বাসায় ফিরিলাম রাত ১২টায়, আসিয়া আগুনে বেশ গরম হইয়া শুইতে গেলাম তখন যেন বুক একটু ভার বোধ হইতেছিল, পর দিন সকালে উঠিয়া আগুনে বেশ সেঁকিয়া বাহির হইলাম, আর কোন উপসর্গ হয় নাই, তবে নৈশ ভ্রমণের দলের মধ্যে অনেকেরই ঠাণ্ডায় সর্দি হইয়াছিল। Dr. Katz বলেন যে আমি নিশ্চয়ই কোন যোগ করি নচেৎ এরূপ ভাবে রক্ষা পাইলাম কিসে। তবে আমিও সম্মানের সহিত ইঁহাদের সঙ্গে পাল্লায় জিতিয়াছি। আর ওরূপ করিতে যাব না, কি জানি যদি কিছু হয়। তবে 'আমরা গরমদেশের লোক, শীতে কাবু করে' এরূপ কথা ইঁহারা বলিলেই সেদিনকার ঘটনা বলিয়া ইঁহাদের ঠাট্টা করিতে ছাড়ি না।

একজনা ডাক্তার আমাকে পরামর্শ দিতেছেন 'হয় মাংস খাও না হয় মদ খাও না হলে তুমি নিশ্চিতই মারা যাবে'। আমি পাখীর মাংস খাইতে পারি তবে এখানে ওটা দুর্ঘট ও খুব দামী তাই সুবিধা হয় না—এরূপ বলিয়াছি এবং মদ ও মাংস বিনা এখানকার শীত কাটাইতে পারা যায় ইহা দেখাইয়া যাব। ইহারা ত আমার শীত সহ্য করার কথা বেশ আলোচনা করে এবং কি করিয়া পারি ইহাই বারে বারে জিজ্ঞাসা করে। নূতন কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইলেই তিনি শীত সহ্য কি করিয়া করি ইহাই প্রশ্ন করেন।

26th Dec. Temp—7°C, আজকাল—3° —5°C. পর্য্যন্ত চলিতেছে, এখনও minusএর ভিতর। এই শীত ও বরফ আমিত ভাই জীবনে ভুলিব না, তবে আমি বেলা না হলে বিছানা হতে উঠি না।

সেদিন আমরা কলেজে ৪ জন কাজ করিতেছিলাম তখন রাত ৮টা (সন্ধ্যা হয় ৩ টায়), Prof. বাড়ী হতে phone করিয়া বলিলেন যে

তোমরা বাড়ী যাও, Temp. খুব তাড়াতাড়ি নামিতেছে হয়ত রাত্রিতে ঝড় হইতে পারে। সন্ধ্যায় ছিল—5°C এবং ৮টার সময়—17°C আমরা ঘরে আগুনের কাছে ছিলাম+17°C। তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিলাম তবে + 17°C হইতে—17°C এর তফাৎ বেশ বুঝিলাম। রাত্রিতে সত্য সত্যই ঝড় হইয়াছিল, অর্থাৎ আমাদের দেশে জোরে বাতাস হলে যেমন বালি বা ধূলা উড়িতে থাকে বরফও তদ্রূপ হয়, তখন পথ ঘাট কিছুই চোখে দেখা যায় না, সে সময় বাহিরে থাকিলে কষ্টের একশেষ। সকালে উঠিয়া দেখি যে আমাদের বারান্দার দরজা খোলা ছিল, তাই সমস্ত বারান্দা বরফে ঢাকা প্রায় ২ ইঞ্চি হবে! এই সব আমি উপভোগ করি মন্দ নহে তবে আর একটি বাঙ্গালী থাকিলে জমিত ভাল।

রাস্তায় বরফ পড়িলেই Municipalityর লোক আসিয়া footpath হতে সেগুলি সরাইয়া দেয় এবং Tram লাইনের বরফও এক প্রকার গাড়ীতে ঠেলিয়া দেয়, আর এক দল সেই সব বরফ গাড়া বোঝাই করিয়া সহরের বাহিরে ফেলিয়া আসে। একদিন বরফ পড়িলে সেগুলি সহরের বাহিরে ফেলিতে ৫।৬ দিন লাগে এবং ইহার ভিতর আবার পড়িলে বেচারারা আর বিরাম পায় না। ইহাদের পোষাক অদ্ভুত। দূর হতে মানুষ কি অন্য কিছু বোঝা যায় না। বুটের উপর আর একটা চামড়া তার উপর আবার খড়ের জুতার মত পরে ও পায়ে খড়ের পটি বাঁধে। গায়ে overcoat তারপর আর একটা চামড়ার overcoat হাতে Glovesএর উপর চামড়ার gloves মাথায়ও তদ্রূপ, শুধু নাক চোখ ও মুখ ছাড়া সবই ঢাকা, ইচ্ছা আছে, ইহাদের একটা ফটো নিব। যাহার গোঁপ আছে তাহার গোঁপের উপর বেশ বরফ জমিয়া যায়। কি করিবে! ১ ঘণ্টা কাজ করিয়া পরে ঘরে যায় ও একটু মদ ও কফি খাইয়া পুনরায় আসে। গরীবের কষ্ট কত। এইরূপ footpath পরিষ্কার করিয়া পরে পাথরের নুড়ি বা কুঁচি ছড়াইতে থাকে নচেৎ পা slip করিবে, ও সবাই ঢিপ ঢাপ পড়িবে কারণ তখন ইহা অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়, আমিত একদিন একেবারে চিৎ। রাস্তায় বাহির হলেই সব ঢিপ ঢাপ! দেখায় বেশ।

একটু অবস্থাপন্ন লোকেরা Furএর coat এবং overcoat ব্যবহার

করে। গরীব যারা তাহারা কোন রকমে কতকগুলি জড়ায়! এই শীত জিনিসটা নূতন ধরণের বেশ লাগে. তবে আমাকেও খুব coffee খাইতে হয়। এইত অবস্থা! আমিত কোন পাখী দেখি না, এমন কি শীতের পূর্ব্বে কাক দেখিয়াছিলাম তাহারাও দেশ ছাড়িয়া পালাইয়াছে, কোথায় আমাদের দেশের রং বেরংএর পাখী। ইহারা বলে গরমের সময় পাখী দেখিবে তবে হাঁস দেখি। কুকুর ও বিড়ালও বেশ। আমাদের কলেজের পিছনে মস্ত মাঠ, সব সাদা ছোট ছোট গাছগুলিও বরফে ঢাকা একটু একটু দেখা যায়. বেশ দেখায়—আমিত—সময় পাইলে এগুলি দেখি। এই ত গেল শীতের কথা।

ইহাদের আমাদের দেশ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নাই। সেই এক ঘেয়ে গৎ বাল্য বিবাহ, Caste system, Too much of religion। তাই ভারতের অধঃপতন। অর্থাৎ আমরা Western Civilisation, লই না, তাই উন্নতি লাভ করিতে পারি না, যত রকম কুসংস্কার সবই আমাদের আছে। কারণ ইহাদের কয়েক জন missionary মাদ্রাজে আছে তাহারা তাহাদের দেশে ওরূপ ভাবে বই লিখিয়াছে তাই ইহারাও তাই জানে। কেবল ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি সুস্থির মনে ধীরে কিছু করিবে না। ইহাদের পোষাক আদব কায়দা প্রভৃতিতে ইহারা এত ব্যস্ত যে সময় ইহারা পায় না। ধর না, ইহাদের ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া পোষাক পরা প্রভৃতিতে ১ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে। জিনিষ পত্র ঝাড়া, তাহার যত্ন করা, ঘর সাজান, ও তাহার তদারক করা—এই সব কাজেই ব্যস্ত। এমনি করিয়া ঘর সাজাবে বা ওমনি করিবে, এই ভাবে আর তাই করে; আর কেমন দেখায় এই দেখে আবার change করে। এই ত কাজ—plain ভাবে ইহারা কিছু রাখিবে না।

ধর্ম্ম জিনিষটি ইহাদের (অন্ততঃ আমি যাদের সঙ্গে মিশি) পোষাকী অর্থাৎ একটু বেড়াইয়া আসি, মন্দ কি, একটু change ত হবে, ইহা Practical বা ইহাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এরূপ চিন্তা ইহাদের মাথায় নাই, তাই বলে যে Indianরা সন্ধ্যার পর যে ধর্ম্ম কথা শুনিতে ভালবাসে বা এত সময় meditationএ কাটায়—এটা waste, অর্থাৎ

অন্য কায করিলে দু পয়সা হত। আমিও অবশ্য পাল্টা জবাব দিতে ভুলি না, কারণ, ইহারা Dinner Tableএ, nothing about everything গল্প করে ঘণ্টা খানেক, Coffee Houseএ প্রায় ২ ঘণ্টা কাটায় এটা কি waste নয়, আমরা waste (!) করি ভগবানের চিন্তায় আর ইহারা করে Temporary Stimulantএর জন্য। ইহাদের এক কথা, এরূপ Stimulant না হলে কাজ করা যায় না, জীবনে সুখই ত এই, তাই ছেলে ও মেয়েরা সন্ধ্যার পর যেরূপ ভাবে যেরূপ স্থানে বেড়ায় ভারতের চোখে সেটা অতি বিসদৃশ—এটা ছেলে ও মেয়েদের Stimulant! কি কাণ্ড!! দোষ শুধু ফরাসীর! "ময়লা খায় সব মাছে; দোষ শুধু সিঙি মাছের" আমরা এরূপ কোন Stimulant ব্যবহার করি না, মদ খাই না, আনন্দ পাই কিসে সেই ইহাদের মাথায় ঢোকে না। বলিলে বলে তা কি করিয়া হয়, যাহা দেখা যায় না, তাহার বিষয় চিন্তা করিলেই আনন্দ পাওয়া যায়? আমিও বলি তোমরা যখন বাহিরে যাও, তখন সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর বিষয় ভাবিয়া Stimulant পাও কি করিয়া? সে ত কাছে নাই। অবশ্য logicএর দোষ আছে তবে শেষে বলে যে আমরা উহা বুঝি না।

ঠাকুর ও স্বামিজীর ভাব এ দেশে মোটেই নাই, তবে সম্প্রতি ২।১ জন ইহাদের চিন্তাশীল লোক এই civilisationএর বিরুদ্ধে খুবই বলিতেছেন ও লিখিতেছেন, তাহাদের আদর নাই,—বলে যে তাহারা পাগল! কিসে অর্থ হবে কিসে কত প্রকার ভোগ করিবে ইহাই ছাত্রদের একমাত্র চিন্তা ও চেষ্টা, অন্য কোন ভাল মৎলব বড় একটা নাই আর থাকিলেও সেটা খুবই ভাসা ভাসা রকমের—সৌখীন।

আমারত যত দিন যাইতেছে ততই ইহাদের হাবভাব ও আদব কায়দার উপর বিরক্তি আসিতেছে, কেমন ভাসা ভাসা, আর এত formalities আমার ভাল লাগে না, যেন ইহার সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই। অথচ করা চাই, অন্য দেশ কেমন জানি না তবে ইহাদের এইরূপই দেখি।

—অধ্যাপক ডাঃ বিধুভূষণ রায় এম্ এস-সি, ডি এস-সি।

Fysiska Institutionen Upsala Universitet Upasala, Sweden, 16-3-24

মাধুকরী

ধর্ম্ম ও পলিটিক্স—স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "God and truth are the only politics in the world everything else is trash."—কিন্তু এই ভগবান ও সত্য নিরূপণ করিতেই জীবনের আয়ু ফুরাইয়া যায়। সংসারে থাকিয়া আমরা কাদাই মাখি, মাছ আর ধরা হয় না।

ভগবান ও সত্য সম্বন্ধে অবিসম্বাদী ধারণা কোন যুগে সম্ভব হয় নাই, আজও হইবে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না, প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ সত্য ও ভগবানের অনুসরণ করে, একজনের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম, তাই অন্যের নিকট পর ধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

যেখানে সমধর্ম্ম, সেখানে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হউক, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে ইহা এক ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারে নাই। মোসলেমের জয়ধ্বজা একদিন জগতে সর্ব্বত্র উড়িয়া ছিল, খ্রীষ্টের বক্ষ-রক্তে অদ্ধ ধরণী প্লাবিত হইয়াছিল, বুদ্ধের কণ্ঠধ্বনি আসিয়ায় প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল, প্লাবনের জলরাশি শুষ্ক ভূমির উপর রেখাপাত করিয়া যেমন অপসারিত হয়, সত্য ও ভাগবত নিরূপণের নির্দ্দিষ্ট রেখা তদ্রূপ স্মৃতি হইয়াই থাকে, সবখানিকে ভরাইয়া সমতা বিধান করে না।

কিন্তু ধর্ম্ম প্রচারের নেশা মানুষকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, একজনের যাহা ধর্ম্ম, তাহা অন্য জনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে প্রাণবলি দিতেও কুণ্ঠা হয় না, দলে দলে ইহার জন্য রক্ত ঢালিয়া দেওয়ার ইতিহাস জগতে বিরল নহে।

ভগবান ও সত্যের অনুশীলনের সঙ্গে ইহা কি খাঁটি politics নহে? মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচারের পশ্চাতে জগতে স্থায়ী সুদৃঢ় একটি শক্তি প্রতিষ্ঠান সংগোপিত ছিল, মোসলেমের গৌরব যুগের ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্ত, আজও মুসলমান জাতি যে অপরাজেয় হইয়া জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তি প্রকাশ করিতে চাহে, তাহা এই politics চর্চ্চার পরিণতি।

খ্রীষ্টের আত্মদান, ভবিষ্যতে একটা জাতির উচ্ছেদ সাধন করিয়া অন্য জাতির অভ্যুত্থান সম্ভব করিয়াছিল, ইহা politics ভিন্ন আর কি বলিব। ভারতে এমন politics চর্চ্চার যুগ স্বামিজীর জীবন হইতে সুরু হইয়াছে; রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম চর্চ্চার মূলে, এমন politics ছিল, জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ আজ পর্য্যন্ত ইহাই হইয়া আসিতেছে; কিন্তু মেরুদণ্ডহীন ভারতের আধার ধর্ম্মের খরস্রোতে ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভগবান ও সত্যের চাপ সহিয়া খাড়া থাকে না—কাজেই ধর্ম্ম সাধনায় ভারত দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছে এই কথাই চারিদিক হইতে শুনা যায়।

এই যে এক একটি ধর্ম্মমতকে আশ্রয় করিয়া শত সহস্র লক্ষ লোক কেন্দ্রীকৃত হয়, ইহার মূলগত উদ্দেশ্য কি, ভগবানের সাধনা বন জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় তো সম্পন্ন হইতে পারে। লোকালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচার দল বাঁধারই নীতি, এবং তেমন শক্ত নির্ভীক প্রাণশক্তি থাকিলে সংহতিবদ্ধ এক একটি দল, জাতির এই দুর্দ্দিনে অসাধারণরূপে আত্মপ্রকাশ করিত, পঞ্চনদে এমন একটি ধর্ম্মের আশ্রয়ে লক্ষ লক্ষ লোক মিলিয়া একদিন প্রবল রাষ্ট্র গড়িয়াছিল, এই উৎপীড়নের যুগে তাহারা আজও নিশ্চিহ্ন হয় নাই, চল্লিশ লক্ষ লোকের মুখে এখনও গর্জ্জিয়া উঠিতেছে সে অমর মন্ত্র--"সৎ শ্রী অকাল"

বাংলায় সত্য ও ভগবানকে আশ্রয় করিয়া একটা দলের মত দল মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আঘাতের পর আঘাত সহিয়া তাহারা বাংলাদেশে তিন শত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহাদের নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন না, স্বার্থে ও মত বিরোধে সে উদীয়মান শক্তি অর্দ্ধ পথেই অবনত হইল; তারপর যাহা হইয়াছে, তাহা আঘাতে যত না হউক, আপোষে বীর্য্যহীন, আঘাতে অমৃত ঝরে—আপোষেই তো শক্তিক্ষয় হয়।

তবে কি মনে করিতে হইবে, ভগবান ও সত্যের নাম লইয়া, ভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই মানুষ ধর্ম্ম প্রচার করে? না, মানুষের মনগড়া

ঈশ্বরতত্ত্ব বা সত্য কে শুনে, কে তাহা অনুসরণ করে? ভগবান চাহেন বলিয়াই সাধকের কণ্ঠে শিবের বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠে, জগতে তাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সার সত্য, যাহা তিনি চাহেন। আর যাহা তিনি চাহেন না তাহাই অধর্ম্ম বলিয়া মানুষ ত্যাগ করে।

কিন্তু ভগবানের চাওয়াও মানুষের কষ্টি পাথরে যাচাই হইয়া থাকে, তাই ভগবানের দান বহিয়া যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় ঝাঁপ দিতে হয়, কত প্রাণবলি দিয়া যে ভগবানের চাওয়াকে ফুটাইতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দেশে এমন আত্মদানের উৎসব কোথাও অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না, ভগবানের চাওয়ার সুর ফুটাইতে কারু কণ্ঠ কেহ চাপিয়া ধরিতেছে কি না, আপনাকে হারাইয়া ফুরাইয়া কাঙ্গাল বেশে কেহ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কি না?

যদি এমন কোথাও দেখিতে পাও, জানিও ভগবানের আসন সেইখানেই সুপ্রতিষ্ঠিত, সত্যের নিশান সেইখানেই উড়িবে, ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণের উদ্যোগ পর্ব্ব সেইখান হইতেই আরম্ভ হইবে।

দেশ জাতি যাহাদের ভগবান, মুক্তি যাহাদের সত্য তাহারা আজ কোথায়—ভগবান ও সত্য ভিন্ন poiltics নাই শুনিয়া এই সহজকে ছাড়িয়া যাহারা বিপরীত পথে যাত্রা করে, তাহাদের বিদায় দাও, বাংলার তরুণ! তোমরা উদ্বুদ্ধ হও, দেশের মুক্তি কামনা সত্যচ্যুতি নয়, এই ত্রিশকোটী নরনারীর বিগ্রহ মূর্ত্তি—শ্রীভগবানের লীলা প্রকাশ, দেশ ও জাতির সেবায় যাহারা উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তাহারা ভগবানের উপাসক, তাহারাই যথার্থ সত্যাগ্রহী।

চৈত্র ১৩৩০ —প্রবর্ত্তক

জীবনে কাজ—(The Nation পত্রিকায় প্রকাশিত Anatole France এর The Dreamer এর মর্ম্মানুবাদ)

পলিটিসিয়ানের (রাজনীতিক) নিকটে একজন স্বপনবিলাসীর মূল্য যে এক কাণাকড়িও নয়, বরং তাহার অস্তিত্বটাই যে একান্ত নিষ্প্র-য়োজন, তাহা আমার বেশ ভাল রকমেই জানা আছে। বিপুল জনতার

একমাত্র উপাস্য দেবতা কে? এই পলিসিবাজ পলিটিসিয়ানই ত! তিনি একই কালে যেমন তাহাদের প্রভু, তেমনি তাহাদের দাস। অনুগ্রহ-পদ-মর্য্যাদার বুভুক্ষু কাঙ্গাল যাহারা, তাহাদের তিনি দলকে দল অবিরাম অক্লান্ত ভাবে আপনার পিছু পিছু টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতার অন্ত নাই, প্রতিষ্ঠার সীমা নাই, খ্যাতির শেষ নাই। দেশবাসীর ভবিষ্যৎ তাঁহার হাতের মুঠায়। তাহাদের ভালর পথে, উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন; তাহাদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া সেই পথে তাহাদের ঠেলিয়া দেওয়া, সেও তাঁহার অভিরুচি। দেশের যত কিছু বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন সবার মূলে তিনি। কেনই বা তাহা না হইবে? তিনি যে কত বড় শক্তিমান, এইখানেই যে তাহার সত্য পরিচয়। যে সব বিধি-নিষেধ দেশবাসীকে অহোরাত্র মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়, যাহার এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার আর অন্ত থাকে না, কোথায় কতখানি পা বাড়াইতে হইবে, আর কোথায় হইবে না এই সব নির্দ্দেশ করিবার ভার যাঁহার উপর, তাঁহার আসন যে দেবরাজের আসন হইতে একটুও নীচে নয়, একথা কি অস্বীকার করা যায়?

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসে। বিধি-বিধান নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। বিজ্ঞ, কর্ত্তা ব্যক্তিরা যাহা নূতন বিধি বলিয়া প্রচার করেন, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে তাহা ইতিমধ্যেই সমাজের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনুষ্ঠেয় আচরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিধি-বিধান কেবল কাগজে-কলমে সেই আচার-পদ্ধতিকে চালাইয়া লয় মাত্র। ইহার বেশী আর কিছু সে করিতে পারে না। যেখানে সে আকস্মিক নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করে, সেইখানেই তাহা ঐ সব পুঁথি পত্রের স্তূপের মধ্যে অকেজো হইয়া অচল হইয়া পড়িয়া থাকে। তাই বিধি-বিধানেরও উপরে রহিয়াছে সর্ব্বসাধারণে গৃহীত আচার-পদ্ধতি।

এই আচার-পদ্ধতি যদিচ সমাজের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সামগ্রী, তবুও ইহার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে, ঐ যত খেয়ালী, ছন্নছাড়া,

কল্পনাপ্রিয়, স্বপ্নচারীর দল। উহাদের কাজই যে এই, আত্মভোলা হইয়া দেশের জন্য, সমাজের জন্য, বিশ্বের জন্য চিন্তা করা। শারীরিক পেশীচালনায়, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় অথবা গৃহ-প্রাসাদ নির্ম্মাণে যেমন প্রণালী-গত শিক্ষার প্রয়োজন তেমনি সুসম্বদ্ধ চিন্তার দ্বারা মহৎও বিরাট কিছু গড়িয়া তোলার জন্যও এমনি শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। এই জীবনের হাটে চিন্তার পসরা মাথায় করিয়া যাঁহারা ফেরি করিয়া বেড়ান, অন্য সাধারণ লোকের তুলনায় তাঁহাদের গুণপনা বেশী কিনা জানি না, তবে পণ্য বিকাইবার শক্তি যদি তাঁহারা সত্য সত্যই অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উপরে তাঁহাদের অকুণ্ঠ দাবী আছে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

কত বিচিত্র ভাবেই না তাঁহারা এই জীবনকে সকলের জন্য প্রিয় ও মহৎ করিয়া তুলিতেছেন! ঐ যে শান্ত প্রাঙ্গণের পাশেই, আপনার ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারে ক্ষীণদেহ বৈজ্ঞানিক চোখে চশমা পরিয়া বসিয়া আছেন, উনি ঐখান হইতেই এই পৃথিবী-মায়ের অঙ্গে নূতন বসন পরাইয়া দিতেছেন। বর্ত্তমানে নূতন নূতন কলকব্জার, বিশেষ করিয়া ষ্টীম এঞ্জিনের আবিষ্কারে, আমাদের চোখের উপর দিয়াই কি অদ্ভুত বিপ্লব-তরঙ্গ খেলিয়া গেল, তাহা কি আমরা দেখিতে পাইতেছি না? ইহার প্রতিধ্বনি যে মিলাইয়াও মিলায় না, দিকে দিকে যে ইহার শব্দ শুনিতে পাইতেছি। দূর যে নিকট হইল! এত বড় ইয়ুরোপ যেন যাদু মন্ত্রে এতটুকু হইয়া প্রথম সাম্রাজ্য যুগের ফরাসী দেশের আয়তনের সামিল হইল! একশত বৎসর পূর্ব্বে Little Europe এর পরিধি যাহা ছিল আজ সমগ্র পৃথিবীর আয়তন যেন তাহার অপেক্ষা খুব বেশী বড় রহিল না! আজিকার এই সভ্য পৃথিবীর ইতিহাসে কতই না বিচিত্র আসন্ন পরিবর্ত্তনের আভাস দিয়া গেল!

তারপর আজকালকার সাময়িক অসাময়িক মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক পত্রাদির ও বড় ছোট মাঝারি পুস্তকাদির কথাই ধরা যাক। ইহাদের প্রচার ও আদর পূর্ব্বাপেক্ষা কি অজস্র পরিমাণেই না বাড়িয়া

গিয়াছে! কত বেপরোয়া ভাব, কত দুঃসাহসিক চিন্তা দিন দিন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে! গৃহে সমাজে ও রাষ্ট্রে যে সব অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন আসন্নপ্রায়, তাহারই পথ সরল ও সহজ করিয়া তুলিতেছে! বর্ত্তমান যুগে যাহারা ভাবুক, যাহারা চিন্তাশীল তাহারা কেবল নিত্য নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা মানুষের জীবনকে উন্নত করিতে চাহে না, তাহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে চাহে অফুরন্ত ভাবের উৎসার, অত্যুজ্জ্বল আদর্শের প্রসার, এমন সব তর্ক আলোচনা, বিজ্ঞ সাংসারিক লোকের কাছে যাহা একেবারেই অনর্থক ও অসার।

শুধু ভাবুক-বৈজ্ঞানিক কেন, যাঁহারা লেখক, যাঁহারা শিল্পী তাঁহারাই বা ইঁহাদের অপেক্ষা কম কিসে? বস্তুতঃ তাঁহারাই ত উপরে থাকিয়া জাতির অন্তরগত আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্তি দিয়া, উজ্জ্বল করিয়া জাতিকে সামনের দিকে লইয়া যান! যেখানে কবির বীণা বাজে না, সেখানে মিলনের রাগিণী শোনা যাইবে কেমন করিয়া? দেশের চিন্তা-নায়ক যাঁহারা, তাঁহারা যদি নিজেদের জীবনে একটা সত্য আদর্শের প্রেরণা অনুভব না করেন, এবং সেই মহান্ আদর্শের আলো যদি দেশের সকল দিক উজ্জ্বল করিয়া সকলের মুখে চোখে প্রাণে ছড়াইয়া না পড়ে, তবে যুদ্ধকালে অন্ধ পশু শক্তির নির্লজ্জ দাপট দিয়া অথবা যুদ্ধান্তে সন্ধির অছিলায় পরাধীনতার কঠিন শিকল পায়ে পায়ে জড়াইয়া যে সব প্রদেশকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক ভাবে এক করিয়া রাখা হইয়াছে, কেমন করিয়া তাহাদের সকল ভেদ পার্থক্য অতিক্রম করিয়া, জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত সকল অনৈক্যকে ছাপাইয়া পরম ঐক্যের শান্ত মধুর ধ্বনি দিকে দিকে অনুরণিত হইবে? ক্ষুদ্ধনিপীড়িত জনগণের আশাকে ভাষা দেয় কে? ভাব-ভাবনাকে রূপ দেয় কে? তাহাদের দুঃখ-অবসাদ, সুখ-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বসিয়া, তাহাদের মর্ম্মস্থলে থাকিয়া তাহাদের মুখ-পাত্র হয় কে? সে ত ঐ ভাবুক, ঐ প্রেমিক! ইহাদের সুর যদি সহজ হয়, কণ্ঠ যদি নির্ভীক হয়, ভাষা যদি সুস্পষ্ট হয়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের কর্ত্তাদের যদি আশে পাশের জনসমূহের উপর ছলে বলে নিজেদের তৈরী আইন-কানুনের বোঝা

চাপাইয়া দিবার মত দুর্ব্বুদ্ধি হয়, তবে ঐ বাণী প্রতিধ্বনির মত সর্ব্বত্র কবিদিগের নিকট পহুঁছিয়া যায়, আর তাঁহারাই তখন উহাকে আপনার করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া সকলের নিকট প্রচার করিতে থাকেন। কত কবি, কত কল্পনাপ্রিয় দরদী বন্ধু কত রূপদক্ষ এই সঙ্গীতের জলসায় প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, হাতে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া! ... ... তবুও হায়, যুগে যুগে সকল দেশে এই মিলনোৎসবের উদ্যোক্তার সংখ্যা কত মুষ্টিমেয়! * * *

কিন্তু আবার দেশকে, জাতিকে যাঁহারা নূতন করিয়া গড়িয়া যান, তাঁহারা ইঁহারাই। তাঁহাদের প্রতিভার দুন্দুভি যখন বাজে, তখন শত সহস্র লক্ষ কোটী লোক তাহাতে সাড়া দেয়, একেবারে দূর পথের যাত্রী সাজিয়া পথের উপরে আসিয়া দাঁড়ায়! আর তখন সেই নব জাতির চেতনায় রাষ্ট্রের এক সত্য—সংজ্ঞা অপরূপ দীপ্তি লইয়া ভাস্বর হইয়া উঠে। ঠিক এমনি করিয়াই আমাদের প্রাণে জননী জন্মভূমির ভাবময়ী অপরূপ রসমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে; এই দেবী-মন্দিরের আলো-বাতাস স্বাধীনতা ও আন্তরিকতায় ভরপুর, ইহার সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র যাহা, অন্যায় যাহা সাধারণ সাময়িক যাহা, কদর্য্য যাহা, তাহাকে লইয়া একটা বিদ্রূপ, একটা মর্ম্মন্তুদ হাসি; মানুষের বিচার বুদ্ধি এই মন্দিরে মর্য্যাদা পায়; এখানকার কেহই একেলা থাকিতে চাহে না, সবাই সাবায়ের সঙ্গে মিশিতে চাহে; সংসারে যে দীন, সমাজে যে হীন, জীবনের পথে চলিতে গিয়া মোহের ভুলে যাহার পা পিছলাইয়াছে, তাহাকে পরম অনুকম্পাভরে বুকে টানিয়া লইবার মত দরদী লোকের অভাব এই-খানে নাই; এই মন্দিরের সবাই সত্য, সত্যই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই'।

বন্ধুগণ, আমাদের সকলকে, আজ সর্ব্বপ্রকার ভয়কে পরিহার করিয়া, মায়ের এই সুন্দর মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে, আজ আর হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবার দিন নয়। আজ আর এই মন্দিরকে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির আয়তনে আবদ্ধ রাখিয়া গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। সকল দিক দিয়া ইহাকে প্রশস্ত কর—সারা পৃথিবীকে আমন্ত্রণ করিবার

সৌভাগ্য-অধিকার যেন ইহা অর্জ্জন করিয়া লইতে পারে। যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা প্রেমিক, তাঁহাদের সকলেরই আজ এই কাজ। কে কোথায় আছ শক্তিমান, কে কোথায় আছ দুর্ব্বল, কে কোথায় আছ বড়, কে কোথায় আছ ছোট, সকলেই আজ কাজে লাগিয়া যাও। মায়ের দেউলে প্রাচীর উঠিবে, সারি সারি উচ্চ স্তম্ভ বসিবে, মায়ের পূজা লইয়া যে ভক্ত মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে সে গদ-গদ হইয়া বলিবে, কি মহান, কি বিরাট—কত সুন্দর! বিশ্বাস রাখিও ভাই, এই প্রাণ-মন-পাগল-করা কল্পনা আজ একান্তই তোমাদের, ইহার অপরিমেয় আনন্দ তোমাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সেবক যে তাহাকেও পাইয়া বসিবে, সেও হাসি-মুখে পরম উৎসাহে বালি চুণের বোঝা মাথায় বহিয়া বাঁশের ভারা বাহিয়া উপরে ঐ কর্ম্ম নিরত শিল্পীর নিকট পহুঁছিয়া দিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবে।

বন্ধুগণ, আজ আমি আমার জীবনের কাজ খুঁজিয়া পাইয়াছি এই আমার সাধের স্বপ্নপুরী তৈয়ারীর জন্য চুণের সহিত বালি, বালির সহিত জল মিশানোই আজ আমার একমাত্র কাজ। ইহাই আমার প্রেরয়িতার বিধান। ইহাকে আমি মাথায় করিয়া লই। ইহা ছাড়া আর কিছু চাহিবার আমার নাই।

সংহতি —শ্রীমুরলীধর বসু এম, এ।

বৈশাখ, ১৩৩১

সারদামণি দেবী—প্রবাসী, বৈশাখ—সারদামণির এইরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগ্‌দি পাইক ও তাহার স্ত্রীর প্রাণ একেবারে গলিয়া গেল। তাহারা সামাজিক আচার ও জাতির পার্থক্য ভুলিয়া সত্যসত্যই তাঁহাকে আপনাদের কন্যার ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে খুব সান্ত্বনা দিতে লাগিল, এবং তিনি ক্লান্ত বলিয়া আর তাঁহাকে অগ্রসর হইতে না দিয়া নিকটস্থ গ্রামের এক দোকানে লইয়া গিয়া রাখিল। রমণী নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয়া তাঁহার জন্য বিছানা করিয়া দিল ও পুরুষটি দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিল।

এইরূপে পিতামাতার ন্যায় আদর ও স্নেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা রাত কাটাইল এবং ভোরে উঠিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তারকেশ্বর পৌঁছিল। সেখানে এক দোকানে তাঁহাকে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে বলিল। বাগ্‌দিনী তাহার স্বামীকে বলিল, 'আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায়নি; বাবা তারকনাথের পূজা শীঘ্র সেরে বাজার হ'তে মাছ তর্‌কারী নিয়ে এস; আজ তাকে ভাল ক'রে খাওয়াতে হবে।'

বাগ্‌দি পুরুষটি ঐ সব করিবার জন্য চলিয়া গেলে সারদামণি দেবীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার রাত্রে আশ্রয়দাতা বাগ্‌দি পিতামাতার সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এঁরা এসে আমাকে রক্ষা না কর্‌লে কাল রাত্রে যে কি কর্‌তুম, বল্‌তে পারি না।"

তাহার পর সকলে আবার পথচলা আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে সারদামণি দেবী ঐ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলাম যে বিদায় গ্রহণকালে ব্যাকুল হইয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধপূর্ব্বক ঐকথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতিকষ্টে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল এবং রমণী পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কড়াই-শুটি তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি, তখন এইগুলি দিয়ে খাস্।' পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিয়াছিল।

"নানাবিধ দ্রব্য লইয়া আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার ন্যায় ব্যবহারে ও আদর-আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত-বাবা পূর্ব্বে কখন কখন ডাকাতি যে করিয়াছিল, একথা কিন্তু আমার মনে হয়।"

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন। তখন সারদামণি দেবীর বয়স ৩৩ বৎসর। আমি শুনিয়াছিলাম, স্বামীর তিরোভাবে সারদামণি দেবী বিধবার বেশ ধারণ করেন নাই। ইহা সত্য কি না জানিবার জন্য পরমহংস দেবের ও সারদামণি দেবীর একজন ভক্তকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিয়াছেন :—

"শ্রীশ্রীমৎপরমহংস দেবের দেহরক্ষার সময় মা হাতের বালা খুলিতে গেলে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব, জীবিত অবস্থায় রোগহীন শরীরে যেমন দেখিতে ছিলেন, সেই মূর্ত্তিতে আসিয়া মার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন— আমি কি মরিয়াছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত হইতে খুলিতেছ? এই কথার পর আর মা কখন শুধু হাতে থাকেন নাই—পরিধানে লাল নরুণ-পেড়ে কাপড় এবং হাতে বালা ছিল।"

আত্মার অমরত্বে এইরূপ বিশ্বাস সকলের থাকিলে সংসারের অনেক দুঃখ পাপ তাপ ও দুর্গতি দূর হয়।

স্বামীর তিরোভাবের পর সারদামণি দেবী ৩৪ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার পরবর্ত্তী ভাদ্র মাসের "উদ্বোধন" পত্রে তাঁহার ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা সংযম, সকলের প্রতি সমান ভালবাসা, সেবাপরায়ণতা, দিবারাত্র অক্লান্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান ও নিজ শরীরের সুখ দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, তাঁহার সরলতা, নিরভিমানতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, ক্ষমা সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বামীর ও তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন এবং এখনও মা বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করেন, এই মাতৃসম্বোধন সার্থক হউক।

[সারদামণি দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনা আমার পক্ষে নানা

কারণে সহজ হয় নাই। তাঁহাকে প্রণাম করিবার ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার কখনও না হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ কোন জ্ঞান নাই। পুস্তক ও পত্রিকা হইতে আমাকে তাঁহার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাই নাই। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" আমার প্রধান অবলম্বন। ছোট অক্ষরে যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য অনেক স্থলেও ঐ পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে। "উদ্বোধন" হইতেও অল্প সাহায্য পাইয়াছি। ইহার দুটি প্রবন্ধে ভক্তিউচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার নানা গুণের বন্দনা আছে। যে সকল কথায় কাজে ঘটনায় আখ্যায়িকায় ঐসকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা কিছু কিছু লিখিত হইলে ভাল হয়। যাহাতে মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কোনও কথা কাজ ঘটনা আখ্যায়িকা তুচ্ছ নহে। কাহারও জীবন্ত ছবি মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে এগুলি আবশ্যক। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" ব্যতীত সারদামণি দেবীর যে সকল ফটোগ্রাফ হইতে ছবি প্রস্তুত করিয়াছি, সেইগুলির এবং কয়েকটি সংবাদের জন্যও আমি ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। তাঁহাকে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।]

সমাপ্ত

গ্রন্থ পরিচয়

কবীরের জীবনী ও বাণী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য দেড় টাকা। সিদ্ধ সাধক রামানন্দশিষ্য কবীর সম্বন্ধে বাঙ্গালার জনসাধারণ সুপরিচিত নহেন। ব্রাহ্মসমাজ বা আর্য্যসমাজের পূর্ব্বেও যে ভারতে Protestant Movement হইয়া গিয়াছে—যাঁহারা কবীর পড়িবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এবং যাঁহারা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কিরূপে প্রীতির বন্ধন সম্ভব, খুঁজিয়া না পান তাঁহারা কবীরের বাক্যাবলী পাঠ করিলে, উভয় ধর্ম্মীর ঐক্য

সাধনের প্রেম-রজ্জুর সন্ধান পাইবেন সন্দেহ নাই। তিনি দেশাচার, লোকাচার, কুলাচার প্রভৃতি কুসংস্কার অপসারিত করিয়া কিরূপে তাঁহার ধর্ম্ম অদ্বৈত-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—দেখিলে অবাক হইতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ইহা পাঠ করা উচিৎ। কিছুদিন পূর্ব্বে শান্তি-নিকেতন হইতে এই মহাত্মার বাণী শ্রীক্ষিতীন্দ্রমোহন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনী আলোচিত হয় নাই। এবং বিগত বর্ষে 'উদ্বোধন' পত্রে জনৈকা ভদ্র মহিলা তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে লিখেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বাণী পরিপূর্ণ রূপে আলোচিত না হওয়ায় তাহাও অসম্পূর্ণ। কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে উভয়েরই সামঞ্জস্য বিহিত হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—মূল, অক্ষরার্থ এবং পয়ার ছন্দে ভাষ্যাদির তাৎপর্য্য ও দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্বলিত—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সুধী জনের নিকট অমৃতোপম, কিন্তু "জননীকুলকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতে" গিয়া লেখক গীতা ও জননীকুলের মধ্যে এক ভীতির পর্ব্বত-ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন। জননী কেন—জনকদের নিকটও এই ব্যাপ্তি পঞ্চক, তর্কামৃত, অদ্বৈতসিদ্ধি, খণ্ডনাখণ্ড খাদ্য, সিদ্ধান্ত লেশ প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যাহা পয়ারে লিখিত হইয়াছে—Hebrew ভাষার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু যাঁহারা এই দুর্ভেদ্য সংস্কৃত পরিভাষা অবগত আছেন তাঁহাদের নিকট ইহা অতি সুখ পাঠ্য।

সংঘ-বার্ত্তা

১। দক্ষিণাত্যের বন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কার্য্য—কাবেরী ও ভবানী নদীর জল প্লাবনে দেশের ও দশের যে কষ্ট ও দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা আজ ভারতবাসিমাত্রই অবগত আছেন। এই নদী দুইটির উভয় কূলে যে সমস্ত গ্রাম ছিল তাহা প্রায় সকলই বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে ও লক্ষ লক্ষ নর নারী গৃহহীন, অন্ন বস্ত্রহীন হইয়া মৃত্যু মুখে পড়িতেছে। মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে এই সমস্ত

বন্যাক্লিষ্ট নর নারায়ণগণের সেবার জন্য আপাততঃ চারিটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোয়াম্বাটুর জিলায় তিনটি ও টানজোর জিলায় একটি। সেবকগণ ভবানী নামক কেন্দ্র হইতে চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামসমূহ তদন্ত করিয়া আসিয়া আমাদিগকে জানাইতেছেন যে তেইশ খানা গ্রামে প্রায় ১৬৬৭ খানা গৃহ নষ্ট হইয়াছে এবং এই সীমার মধ্যেই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১১০৫৮৬ টাকার অধিক হইবে।

ইহা কেবল এক কেন্দ্রের বিবরণ। অন্যান্য কেন্দ্র সমূহের বিবরণ আরোও ভীষণ। অনেক স্থলে বহুগ্রাম বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের চিহ্নও পাওয়া যাইতেছে না।

টানজোর জিলায় দশ দিনের মধ্যেই সেবকগণ ১৫টী গ্রামের ৪৫০ পরিবারের ১৭৫০ জনকে চাউল, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। কোয়াম্বাটুর জিলাস্থ ভবানী কেন্দ্রেও সহস্রাধিক লোককে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। লোকের দুর্দ্দশা ও কষ্টের পরিমাণ এত বেশী যে আরোও অধিক পরিমাণে ও বিস্তৃতভাবে সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন। দেশের বিপন্ন নরনারীর এই অভাবনীয় দুঃসময়ে সাহায্য করিয়া সহৃদয় দেশবাসী স্বদেশ প্রীতি প্রদর্শনে ও স্বধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। গত উত্তর বঙ্গের বন্যায় ভারতের সমস্ত দেশ হইতেই প্রায় সাহায্য আসিয়াছিল আশা করি দাক্ষিণাত্যবাসীদের এই দৈবদুর্ঘটনার সময় ও বঙ্গদেশ হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাইবে। উপযুক্ত সাহায্য পাইলেই আমরা কার্য্যের পরিধি বাড়াইয়া নূতন কেন্দ্র খুলিতে পারিব। আশা করি, এই দুঃস্থ নর নারায়ণগণের সেবায় সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও সাহায্য গৃহীত হইবে,—

(১) প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ, জিলা হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

২। বেলুড় মঠে ৺দুর্গোৎসব হইবে। ভক্তগণ যোগদান করিয়া আনন্দ করিবেন।

PUBLIC LIBRARY
পুস্তকালয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রথযাত্রা ৩০শে আষাঢ়, ১৩১৯—আজ প্রাতে সাতটায় গৌরমার আশ্রমে যাই,—তিনি প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল ওখান হতে সকাল সকাল শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাব। কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠ্‌ল না। ঠাকুরের ভোগ ও ভক্তসেবা সাঙ্গ হতে প্রায় দুটো বেজে গেল। চারটার সময় গৌরীমাকে নিয়ে মায়ের কাছে গেলুম, তখন মা বৈকালের ভোগ দিতে বসেছিলেন। ভোগ দিয়ে উঠলে প্রথমে গৌরীমা, পরে আমি মাকে প্রণাম করলুম। গৌরী মা তাঁকে একটু নিভৃতে নিয়া গেলেন এবং কি কথাবার্ত্তার পরে আমাকে ডাকলেন। মার জন্য একখানি গরদ নিয়েছিলাম। উহা পদপ্রান্তে রেখে প্রণাম করে বললুম "মা এখানি পর্‌বেন"। মা হেসে বললেন "হ্যাঁ পর্‌ব বৈ কি"। গৌরীমা আমাকে স্নেহভরে প্রশংসা করতে লাগলেন। মাও তাহাতে যোগ দিলেন। ঠাকুর ঘরে মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্যা এবং অন্যান্য স্ত্রী-ভক্ত ও অনেকগুলি আছেন। সকলকে চিনি না। মাষ্টার মহাশয়ের মেয়ে ও স্ত্রীর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করার পরে পুরুষ ভক্তেরা মাকে প্রণাম কর্‌তে আসছেন শুনে আমরা সকলে বারান্দায় গেলুম। একটি ভক্ত কতকগুলি প্রস্ফুটিত গোলাপ ও জবা, একছড়া সুন্দর জুঁই ফুলের গড়ে, এবং ফল ও মিষ্টি এনেছিলেন। মায়ের পদপ্রান্তে ঐ সব রেখে চরণ পূজা করতে লাগলেন।

সে এক সুন্দর দৃশ্য! মা সহাস্য মুখে স্থির হয়ে বসে—গলায় ভক্ত প্রদত্ত মালা, শ্রীচরণে জবা ও গোলাপ। পূজা শেষে ভক্তটি ফল মিষ্টি প্রত্যেক জিনিস হতে কিছু কিছু নিয়ে মাকে প্রসাদ করে দিতে প্রার্থনা করলেন। গৌরী-মা তাই শুনে হাসতে হাসতে বল্‌লেন—"শক্ত ভক্তের পাল্লায় পড়েছ মা, এখন খাও।" মা'ও তাহাতে হাস্‌তে হাস্‌তে "অতনা অতনা—অত খেতে পারব না" বলে একটু একটু খেয়ে ভক্তের হাতে দিতে লাগলেন। ভক্তটি প্রত্যেক দ্রব্য মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে প্রণাম করে বিদায় লইলেন। মা তখন নিজের গলার ফুলের মালাটি গৌরী-মার গলায় পরিয়ে দিলেন। পদে নিবেদিত ফুলগুলি ভক্তেরাই নিয়ে গিয়েছিলেন।

ভূদেব রথ তৈরী করেছে। ঠাকুর রথে উঠবেন, সেই আয়োজন হচ্ছিল। গৌরী-মার আশ্রমে বিশেষ কাজ ছিল, তাই তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়া চলে গেলেন। আমি সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে গিয়ে পুনরায় মায়ের কাছে ফিরে গেলুম।

কথায় কথায় গৌরীমার কথা উঠল। মা বললেন "আশ্রমের মেয়েদের ও বড় সেবা করে—অসুখবিসুখ হলে নিজের হাতে তাদের গুমুত পরিষ্কার করে। সংসারে ওর ওসব ত আর বড় একটা করা হয়নি, ঠাকুর যে সবই করিয়ে নেবেন—এই শেষ জন্ম কি না!"

এইবার পাশের ঘরে ঠাকুর রথে উঠলেন। মা তক্তপোষে বসে অনিমেষ নয়নে তাঁকে দেখতে দেখতে কত যে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। পরে ভূদেব ও ভক্তেরা মিলে রথশুদ্ধ ঠাকুরকে ধরে তুলে নীচে নিয়ে গেলেন এবং রাস্তায়, গঙ্গার ধারে রথ টেনে সন্ধ্যার পর আবার ঘরে আনলেন। এই বার স্ত্রী-ভক্তেরা উপরের ঘরের ভিতর রথ টানলেন। তারপর মা, রাধু, নলিনীদিদি ও আমি টানলুম। যে কেহ আসতে লাগল তাকেই মা আনন্দ করে রথের কথা বলতে লাগলেন। ভক্ত মহিলারা প্রসাদ নিয়ে একে একে চলে গেলেন। পরে রাত্রের ভোগ আরতি হতে মা নিজেই একখানি থালায় করে প্রসাদ এনে আমাকে দিলেন। সেদিন বাসায় ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে এগারটা হয়ে গিয়েছিল।

যখন সামনের রাস্তায় রথ টানা হচ্ছিল, মা বলে ছিলেন "সকলেত জগন্নাথ যেতে পারে না। যারা এখানে (ঠাকুরকে রথে) দর্শন করলে, তাদেরও মুক্তি হবে।"

আশ্বিন ১৩১৯—পূজার ছুটীতে একদিন সকালেই মার কাছে গেলুম। দেখলুম মা খুব ব্যস্ত। আমাকে বসতে বলে রাঁচী হতে কে ভক্ত এসেছেন তাঁকে ডাকতে বললেন। ভক্তটি অনেক ফল ফুল, কাপড় ও একছড়া কাপড়ের গোলাপের মালা—দেখতে ঠিক সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত—নিয়ে উপরে এলেন। মালাটি মাকে গলায় পরতে অনুরোধ করায় মা উহা পরলেন। এমন সময়ে গোলাপ-মা এসে মালার লোহার তার মায়ের গলায় লাগবে বলে ভক্তটিকে বকলেন। ভক্তটিকে অপ্রতিভ হতে দেখে করুণাময়ী মা বললেন 'না, না, লাগছে না, কাপড়ের উপর পরেছি।' ভক্তটি প্রণামাদি করে নীচে গেলেন।

পরে মা ও আমি জল খাবার (প্রসাদ) খেতে বসলুম। আমি কিছু ফল ও খাবার নিয়ে গিয়েছিলুম। মাকে দিবার জন্য উহা তাঁর কাছে আনতেই বললেন 'ঠাকুরকে নিবেদন করে নিয়ে এস'। নিয়ে আসতে উহা হতে একটি আঙ্গুর মুখে দিয়ে বললেন 'আহা, বেশ মিষ্টিত'। একখানি কাপড় কয়েকদিন পূর্ব্বে দিয়াছিলাম। সেই কাপড়খানিই পরে ছিলেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন 'এই দেখ গো তোমার কাপড় পরে পরে কালো করেছি'। অবাক হয়ে ভাবলুম এই 'অযোগ্য সন্তানের উপর তোমার এতই কৃপা ও স্নেহ।' মা নিজের পাত হতে প্রসাদ তুলে তুলে আমাকে দিতে লাগলেন। আমি হাত পেতে নিচ্ছি এমন সময় হঠাৎ একবার তাঁর হাতে আমার হাতে ঠেকে গেল। বললুম 'মা হাত ধুয়ে ফেলুন'। মা হাতে একটু জল দিয়ে বললেন 'এই হয়েছে'। এই সময়ে নলিনীদিদি এসে বসলেন। ইতিপূর্ব্বে কি কারণে যেন তিনি রাগ করেছিলেন। মা তাকে তিরস্কার করে বললেন 'মেয়ে মানুষের অত রাগ কি ভাল, সহ্য চাই * * * '।

একটু পরে রাধু এসে হাঁটুর কাপড় তুলে বসেছে। আবার মা তাকে ভৎর্সনা করতে লাগলেন—'ও কি গো, মেয়ে লোকের হাঁটুর

কাপড় উঠবে কেন?' বলে কি একটি শ্লোক বললেন, মানে, হাটুর কাপড় উঠলেই মেয়ে লোক উলঙ্গের সামিল।

চন্দ্রবাবুর ভগ্নী এসেছেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'মার গোঁসাই (স্বামী) আছেন? এ সব বুঝি ছেলে মেয়ে বউ!' আমি—'কেন ঠাকুরের কথা শোনেন নাই, তাঁর শিক্ষাই ছিল কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ'। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন 'আমি মনে করেছি এরা সব ছেলে, বউ হবে'।

দুর্গা পূজা আস্‌ছে। মা তাই জামাইদের * কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখতে ছিলেন এবং আমাকে পৃথক করে বেঁধে রাখতে বললেন। আর একখানি কাপড় আমার হাতে দিয়ে বললেন 'এখানা কুঁচিয়ে রাখত মা, গণেন পূজার সময় পরে মঠে যাবে'।

মধ্যাহ্নের ভোগ ও প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল। আহারান্তে মা বিশ্রাম করছেন। আমি নিকটে বসে বাতাস কচ্ছিলাম। মা তাতে বললেন 'ঐখান হতে একটা বালিস নিয়ে আমার এইখানে শোও, আর বাতাস লাগবে না'। মায়ের বালিসে কি করে শোব মনে করে রাধুর ঘর হতে একটা বালিস নিয়ে আসতেই মা হেসে বললেন 'ওটা পাগলের (রাধুর মার) বালিস গো! তুমি এই বালিসটাই আন না, তাতে দোষ নেই'। রাধুকে ডেকে বললেন 'রাধুও আয়, তোর দিদির পাশে শো'।

মার সঙ্গে চন্দ্রবাবুর ভগ্নীর কথা হতে লাগল। মা বললেন "তা, তুমি বললেই পারতে 'হাঁ এই ত তাঁর স্বামী ঘরে বসে আছেন, আর তোমরা সব ছেলে মেয়ে'।" আমি—'সেত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে কত ছেলে মেয়ে আছে মা!' মা হাসতে লাগলেন। কথায় কথায় আবার বললেন 'কত লোকে কত ভাবে আসে মা! কেউ হয়ত একটা শশা এনে ঠাকুরকে দিয়ে কত কামনা করে—বলে 'ঠাকুর তোমাকে এই দিলুম, তুমি এই কোরো—এই এমনি কত কামনা!'

মা একটু পাশ ফিরে শুলেন। আমারও একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। জেগে দেখি মা পাখা নাড়ছেন। একটু পরেই মা উঠলেন। দেখলুম

* মার তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রী—তাঁহাদের স্বামীর জন্য

পাশের ঘরে কয়েকটি স্ত্রীলোক বসে আছেন। তন্মধ্যে দুজন গৈরিক-ধারিণী। তাঁরা মাকে প্রণাম করলেন। ঐ সঙ্গে একটি ছোট ছেলেও এসেছিল, সে প্রণাম করতেই মা প্রতি-নমস্কার করলেন। তাঁরা মিষ্টি এনেছিলেন, মা আমাকে তুলে রাখতে বললেন এবং হাত মুখ ধুতে গেলেন। পরিচয়ে জানলুম তাঁরা কালীঘাটের শিবনারায়ণ পরমহংসের শিষ্যা, সম্প্রতি তাঁদের গুরুর ওখানে অহোরাত্র ব্যাপী এক যজ্ঞ হচ্ছে—ইত্যাদি। একটু পরেই শ্রীশ্রীমা এসে বসলেন। গৈরিক-ধারিণীদের মধ্যে একজন মাকে বললেন 'আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই'।

মা—বল।

গৈরিক-ধারিণী। মূর্ত্তি পূজায় কিছু সত্য আছে কি না? আমাদের গুরু বলেন—'মূর্ত্তি পূজা কিছু নয়, সূর্য্যের ও অগ্নির উপাসনা কর।"

মা—'তোমার গুরু যখন বলেছেন, তখন ওকথা আমায় জিজ্ঞাসা না করাই ঠিক্। গুরু বাক্যে বিশ্বাস রাখতে হয়।' তিনি বললেন, 'তা হবে না, আপনার মত বল্‌তেই হবে। মা নিজ মত বল্‌তে পুনরায় অসম্মতি প্রকাশ কর্‌লেন। কিন্তু গৈরিক-ধারিণী একেবারে নাছোড়। তখন মা বললেন 'তিনি (তোমার গুরু) যদি সর্ব্বজ্ঞ হতেন—এই দেখ তোমার জিদের ফল, কথায় কথা বেরুল,—তা হলে ঐ কথা বল্‌তেন না। সেই আদিকাল হতে কত লোকে মূর্ত্তি উপাসনা করে মুক্তি পেয়ে আস্‌ছে, সেটা কি কিছু নয়? আমাদের ঠাকুরের ওরূপ সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না। ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সে জন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে ব'সে হরেক রকমের বোল বল্‌চে। শুন্‌তে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল গুলিকেই আমরা পাখীর বোল বলি—একটাই পাখীরবোল্ আর অন্যগুলা পাখীরবোল্ নয় এইরূপ বলি না।" তাঁরা কিছুক্ষণ তর্ক করে শেষে নিরস্ত হলেন। তার পর তাঁরা শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা

কর্‌লেন—'আপনার বাড়ী কোথায়?' মা—'কামারপুকুর, হুগ্‌লি জিলায়।' 'এখানকার ঠিকানা কি বলুন, আমরা মাঝে মাঝে আস্‌ব।' মা ঠিকানাটা লিখে দিতে বল্‌লেন। তাঁরা যে মিষ্টি এনেছিলেন ইতি পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীমা তাহা হইতে ছেলেটিকে দিতে বলেছিলেন এবং আমি তখনই দিয়াছিলাম। একটু পরে তাঁরা বিদায় লইলেন। তাঁরা গেলে শ্রীশ্রীমা বলছেন 'মেয়েলোকের আবার তর্ক! জ্ঞানী পুরুষরাই তর্ক করে তাঁকে বড় পেলে! ব্রহ্ম কি তর্কের বস্তু? একটু পরেই আমার গাড়ী এল। মা বললেন—'এই গো পটলডাঙ্গার গাড়ী এসেছে বল্‌ছে, এখনি এল?' ঐ কথা বলেই তিনি তাড়াতাড়ি ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দিলেন এবং কিছু প্রসাদ, প্রসাদী জলের গ্লাসটি এবং দুটি পান নিয়ে বারান্দায় আড়ালে গিয়ে ডাকলেন—'এস'। তাঁহার স্নেহ যত্নে আমার চোখে জল এল। ভাবতে লাগলুম আবার কত দিনে মার সঙ্গে দেখা হবে! কারণ, পূজার পরেই মা কাশী যাবেন। মা সস্নেহে বল্‌লেন্—'আবার আস্‌বে।' এমন সময় বাহির হতে চন্দ্রবাবু এসে একটু বিরক্তির সহিত বললেন "বাহিরে গাড়ী দাঁড়িয়ে, গাড়োয়ান দিক্‌ কর্‌ছে, আমি এই সকলকে বলে রাখ্‌লাম গাড়ী আস্‌লে কেহ যেন তিলার্দ্ধ দেরী না করেন।" শ্রীশ্রীমা তাই শুনে বললেন "আহা, তার কি, এই ত যাচ্ছে,—এস মা।" আমি অশ্রুসিক্ত চোখে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে নেমে গেলুম। প্রাণের আবেগে সেদিন বাড়ীতে কারও সহিত ভাল করে কথা বল্‌তে পার্‌লুম না। সারা রাতও ঐ ভাবে কেটে গেল।

১৮ই মাঘ ১৩১৯—মা কাশী হইতে ফিরেছেন। সকাল বেলা গিয়ে দেখি মা পূজা কচ্চেন এবং পূজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পূজা শেষ হলে উঠে বললেন 'এই যে মা এসেছ, আমি ভাবচি, দেখা হল না বুঝি, আবার শীঘ্রই দেশে চলে যাব।' খাবার তৈয়ার করে নিয়ে গিয়েছি দেখে বললেন 'ঠাকুরের আজ মিষ্টি কম দেখে ভাবছিলুম। তা ঠাকুর তাঁর ভোগের জিনিস সব নিজেই জোগাড় করে নিলেন—তা আবার কেমন ঘরের-তৈরী সব খাবার! ঠাকুরকে ঐ সব নিবেদন করা হলে ভক্তদের জন্য এক একখানি শালপাতায় ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে দিতে লাগলেন।

ভূদেব বললে "এত দেবো কাকে ?" মা হেসে বল্লেন—'দেখ ছেলের বুদ্ধি ! নীচে যে সব ভক্তরা আছে তাদের দিবি। দিয়ে আয়গে যা।' একটু পরে রাঁচী হতে একটি ভক্ত এসে মাকে প্রণাম করে ফুলের মালা দিলেন এবং বললেন "সুরেন আপনাকে এই টাকাটি দিয়েছে।" বলে টাকাটি মার পদতলে রাখ্‌লেন।

বেলা হয়েছে। রাধু স্কুলে যাবে বলে খেয়ে দেয়ে কাপড় পরে প্রস্তুত হতেই গোলাপ-মা এসে বললেন "গাড়ী ফিরিয়ে দাও—বড় হয়েছে মেয়ে, এখন আবার স্কুলে যাওয়া কি ?" রাধু কাঁদতে লাগ্‌ল। মা বললেন "কি আর বড় হয়েছে, যাক না। লেখাপড়া, শিল্প এ সব শিখতে পারলে কত উপকার হবে। যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে—এ সব জানলে নিজের এবং অন্যেরও কত উপকার করতে পারবে, কি বল মা ?" পরে রাধু স্কুলে গেল।

অন্নপূর্ণার মা একটি মেয়ে নিয়ে এসেছেন দীক্ষার জন্য ; বল্লেন "মা ও আমাকে খেয়ে ফেল্লে তোমার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য। কি করি নিয়ে এলুম"। মা—"আজ কি করে হবে ? জল খেয়েছি।" অন্নপূর্ণার মা—"ও ত খায়নি। তা মা তোমার খাওয়ায় ত আর দোষ নেই"। মা—একেবারে কি ঠিক হয়েই এসেছে ? অন্নপূর্ণার মা—"হাঁ মা একেবারে স্থির করেই এসেছে।" মা সম্মত হইলেন। দীক্ষার পরে শ্রীশ্রীমাকে মেয়েটির কথা বলতে লাগলেন "ও কি মা তেমন মেয়ে! ঠাকুরের বই প'ড়ে চুল কেটে পুরুষ সেজে তপস্যা করতে তীর্থে বেরিয়ে গিছল—একেবারে বৈদ্যনাথে গিয়ে হাজির ! সেখানে এক বনের মধ্যে গিয়ে বসেছিল। ওর মায়ের গুরু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ওকে দেখতে পেয়ে পরিচয় নিয়ে নিজের কাছে রেখে ওর বাপের কাছে সংবাদ পাঠাতে ওর বাপ গিয়ে নিয়ে এল।" মা চুপ করে কথাগুলি শুনে বললেন "আহা, কি অনুরাগ !" আর সকলে বল্‌তে লাগ্‌লেন "ও মা সে কি গো, অমন রূপের ডালি মেয়ে (মেয়েটি খুবই সুশ্রী) কেমন করে রাস্তায় বেরিয়েছিল, হোক্ গে বাপু ভক্তি অনুরাগ !" নলিনী—"বাপ্‌রে, আমাদের দেশ হলে আর রক্ষে থাকৃত না,"—অবশ্য এই সব কথা মেয়েটির ও অন্নপূর্ণার মার অসাক্ষাতেই বলা হচ্ছিল।

দুপুরে আহারান্তে সকলে শয়ন করলেন। নূতন মেয়েটিকেও মা একটু শুতে বললেন। সে বললে—"না মা, আমি দিনের বেলায় শুই না"। আমি তাকে বললুম—"মা বল্‌ছেন, কথা শুনতে হয়"। "তবে শুই"—বলে সে একটু শুয়ে আবার তখনই উঠে বারন্দায় গেল। মা বললেন "মেয়েটি একটু চঞ্চল, সেই জন্যেই বেরিয়ে গিয়েছিল।" মা মেয়েটির ঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মেয়েটির স্বামী কি করে? কেন মেয়েটিকে কাছে নিয়ে রাখে না?" ঝি বল্লে—"তিনি অল্প মাইনে পান্‌, আর, ঘরে কেউ নাই, ওঁকে নিয়ে গিয়ে একলাও রাখ্‌তে পারেন না। তাই শনিবার, শনিবার শ্বশুরবাড়ী আসেন।" অন্নপূর্ণার মা—ও স্বামীকে বলে "তুমি আমার কিসের স্বামী, জগৎ স্বামীই আমার স্বামী।" মা কোন উত্তর দিলেন না।

ঠাকুরঘরের উত্তরের বারন্দায় মেয়েরা সব গল্প করছিল। বড় গোল হচ্ছিল। মা বল্লেন—"বলে এস ত মা, আস্তে কথা বল্‌তে; এক্ষণি শরতের ঘুম ভেঙ্গে যাবে" (তিনি নীচে বৈঠক্‌খানা ঘরে শুয়ে ছিলেন)। ঘরটি এখন নির্জ্জন দেখে মাকে সাধন ভজন ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলুম। মা বললেন—"ঠাকুর ও আমাকে অভেদভাবে দেখ্‌বে, আর যখন যে ভাবে দর্শন পাবে, সেই ভাবেই ধ্যান স্তুতি করবে—ধ্যান হয়ে গেলেই পূজা শেষ হল। এইখানে আরম্ভ, ও এইখানেই শেষ করবে।" বলে দেখিয়ে দিলেন।

মা—"মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয় মা, ভক্তিই সব। ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইষ্ট, সব পাবে। উনিই সব।" তারপর কথা-প্রসঙ্গে গৌরী-মা ও দুর্গাদেবীর কথা উঠল। মা উভয়ের অনেক সুখ্যাতি করলেন। আর বললেন "দেখ মা, চড় খেয়ে রাম নাম অনেকেই বলে, কিন্তু শৈশব হতে ফুলের মত মনটি যে ঠাকুরের পায়ে দিতে পারে, সেইই ধন্য! মেয়েটি যেন অনাঘ্রাত ফুল। গৌরদাসী মেয়েটিকে কেমন তৈরী করেছে। ভায়েরা বিয়ে দেবার বহু চেষ্টা করেছিল। গৌরদাসী ওকে লুকিয়ে হেথা সেথা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। শেষে পুরী গিয়ে ৺জগন্নাথের সহিত মালা বদল করে সন্ন্যাসিনী করে দিলে। সতী লক্ষ্মী মেয়ে, কেমন লেখাপড়াও শিখেছে!

কি একটা সংস্কৃত পরীক্ষাও দিবে শুনছি।" গৌরী-মার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন। তাতে জান্‌লুম তাঁর জীবনের উপর দিয়া কম দুঃখ-ঝঞ্ঝা বয়ে যায় নাই!

একটু পরে চার পাঁচটি স্ত্রীলোক এলেন। তাঁরা ডাব ও কিছু অন্য ফল মায়ের চরণপ্রান্তে রাখলেন। একটি স্ত্রীলোক প্রণাম করতে নিকটে আসবার উপক্রম কর্‌লে মা বল্‌লেন—"ওখান হতেই কর।" তাঁরা প্রত্যেকে মার সম্মুখে দু চারটি পয়সা রেখে প্রণাম করতে লাগলেন। মা পয়সা দিতে বার বার নিষেধ করিলেন। তাঁরা কিছু উপদেশ চাইলেন। মা একটু হেসে বললেন—"আমি আর কি উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চল্‌তে পার ত, সব হয়ে যাবে।" শ্রীশ্রীমা খুঁটি-নাটি অনেক কথা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বিদায় হলে মা আমাকে বললেন—"উপদেশ নেয় তেমন আধার কই? আধার চাই মা, নইলে হয় না।" কথায় কথায় ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় প্রভৃতির কথা উঠ্‌লো; দুই একটি কথা হতেই অন্নপূর্ণার-মা ঘরে ঢুক্‌তে সে সব কথা চাপা পড়ে গেল। তিনি বললেন—"মা, আমি স্বপ্ন দেখেছি, তুমি যেন আমাকে বল্‌ছ 'আমার প্রসাদ খা, তবে তোর অসুখ সার্‌বে।' আমি বল্‌চি—"ঠাকুর নিষেধ করেছেন যে, আমাকে কারও উচ্ছিষ্ট খেতে। তা মা আমাকে এখনতোমার প্রসাদ একটু দাও।" মা সম্মত না হওয়ায় তিনি খুব জিদ কর্‌তে লাগলেন। মা বললেন, 'ঠাকুর যা নিষেধ করেছেন তাই কর্‌তে চাও?' অন্নপূর্ণার মা—'মা তাঁতে ও তোমাতে যত দিন তফাৎ বোধ ছিল ততদিন ওকথা ছিল, এখন দাও'। মা শেষে তাঁকে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা বিদায় নিলেন। গৌরী-মার ওখান হয়ে যেতে হবে বলে আমিও একটু পরে বিদায় নিলুম।

পরদিন গিয়েছি। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর, মা একটু বিশ্রাম করছিলেন—এমন সময় কয়েকজন স্ত্রীলোক দর্শন কর্‌তে এলেন। মা শুয়ে শুয়েই তাদের কুশল-প্রশ্ন করতে লাগলেন। তাঁরা দুই একটি

কথার পর বলতে আরম্ভ করলেন—"আমার একটি ভাল ছাগল আছে, দু সের দুধ দেয়। তিনটি পাখী আছে। এই সবই এখন অবলম্বন। আর বয়স ত কম হয়ে গেল না মা।" আমার তখন ঠাকুরের কথা মনে পড়্‌ল—"বেড়াল পুষিয়ে মহামায়া সংসার করান! শ্রীশ্রীমা, "হাঁ হাঁ" করে যেতে লাগলেন। আহা। মা আমাদের জন্য তোমাকে কতই না সইতে হয়। এই বিশ্রামটুকুর সময়েও যত রাজ্যের বাজে কথা!

তার পর দীর্ঘকাল কেটে গেল। মা পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন। আশ্বিন মাসে পূজার পূর্ব্বে কলিকাতা ফিরেছেন। একদিন বৈকালে গিয়ে দেখি একটি স্ত্রীলোক পদতলে পড়ে কাঁদ্‌ছেন—দীক্ষার জন্য। শ্রীশ্রীমা চৌকীর উপর বসে আছেন। মা সম্পূর্ণ অসম্মত—"আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বারণ করেছি, কেন এলে, আমার শরীর ভাল নয়, এখন হবে না।" সে যতই বল্‌ছে মা আরও বিরক্তি প্রকাশ কচ্ছেন—'তোমাদের আর কি? তোমরা ত মন্ত্রটি নিয়ে গেলে, তার পর?" সে তবুও নাছোড়! উপস্থিত সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। শেষে মা বললেন—'পরে এসো।' তখন স্ত্রীলোকটি বল্লে—"তবে আপনার কোন ভক্ত ছেলেকে বলে দিন্।" মা—"তারা যদি না শুনে?" মেয়েটি—"সে কি, আপনার কথা শুন্‌বে না?" মা—"এ ক্ষেত্রে নাও শুনতে পারে।" তারপর কিছুতেই না ছাড়াতে বল্লেন—"আচ্ছা, খোকাকে * বলে দেবো, সে দেবে।" তবুও মেয়ে লোকটি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"আপনি দিলেই ভাল হয়, আপনি ইচ্ছা কর্‌লেই পারেন" এই বলে দশ টাকার একখানি নোট বের করে বললেন "এই নিন্ টাকা, যা লাগে আনিয়ে নেবেন।" ঐরূপে টাকা দিবার প্রস্তাবে আমাদের লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌লো, রাগও হলো। মা এইবার তাঁকে ধম্‌কে বললেন "কি, আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ নাকি? আমি টাকায় ভুলি না, যাও, টাকা নিয়ে যাও" বলে উঠে গেলেন।

পরে স্ত্রীলোকটির অনেক অনুনয়-বিনয়ে ঠিক হল মহাষ্টমীর দিন দীক্ষা হবে। সে ত বিদায় হলো। মা এইবার পাশের ঘরে এসে

* স্বামী সুবোধানন্দ—ডাকনাম 'খোকা' মহারাজ।

বসে আমাকে ডাকলেন 'এস মা, এই ঘরে এস। এতক্ষণ তোমাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারি নাই, কেমন আছ?'

বেলা শেষ হয়ে এসেছে—পূজার সময় বলে অনেক স্ত্রীলোক কাপড়, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। মা হাসিমুখে তাঁদের কথার উত্তর দিচ্ছেন। খুব গ্রীষ্ম, আমি মাকে হাওয়া করতে লাগলুম। একটি মহিলা এসে সাগ্রহে আমার হাত থেকে পাখাখানা চেয়ে নিয়ে মাকে হাওয়া করতে লাগলেন—মায়ের একটু সামান্য সেবার কাজ করতে পেলেও সকলের কি আনন্দ! আহা, কি অপূর্ব্ব স্নেহ-করুণায়ই শ্রীশ্রীমা আমাদিগকে চিরাবদ্ধ করে গেছেন! আর তাঁর অবস্থানে বাগবাজারের মাতৃ-মন্দির সংসার তাপদগ্ধ মানুষের কি মধুর শান্তি নিলয়ই হয়ে ছিল তা বলা বা বুঝান অসম্ভব।

* * * *

প্রায় আড়াই মাস পরে আবার একদিন গিয়েছি। সিঁড়ি উঠতেই কল ঘরে মার সঙ্গে দেখা হ'ল। কাপড় কাচতে গিয়েছিলেন। আধ-ভিজে কাপড়েই এসে জিজ্ঞাসা করে গেলেন 'এত দিন দেরীতে কেন এলে?' কাপড় কেচে এসে তক্তাপোষের উপর বসতে কুশল-প্রশ্নাদির পর কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম 'সেই যে স্ত্রীলোকটি মন্ত্র নিতে চেয়ে ছিল তার কি হল মা?' মা—সে সেদিন নিতে পারলে না। বলে-ছিলুম 'আমার অসুখ সারুক, তার পরে নেবে'—তাই হোলো! অসুখ হওয়ায় সেদিন সে আসতে পারে নাই। তার অনেক পরে একদিন, এসে নিয়ে গিয়েছে।' 'তাইত মা আপনার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে পড়ে তাই হয়। আমরা আপনার ইচ্ছা না মেনে নিজেরা কষ্ট পাই, আপনিও নিজের অসুস্থ শরীরে অনেক সময় দয়া করে দীক্ষা দিয়ে আমাদের ভোগ নিজ শরীরে নিয়ে আরও বেশী কষ্ট পান।'

মা বললেন 'হাঁ মা, ঠাকুর ঐ কথা বলতেন! নইলে এ সব শরীরে কি রোগ হয়? এর মধ্যে আবার কলেরার মত হয়ে ছিল।'

আমার ভ্রাতৃবধূ সঙ্গে গিয়েছিল। মা তাকে দেখে বললেন 'বেশ শান্ত বৌটি। এক বেনুন—নূনে পোড়া হলে মুস্কিল হত।'—অর্থাৎ

আমার ভ্রাতৃবধূ একটি, সে যদি ভাল না হত ত তাকে নিয়ে সংসারে থাকা কষ্টকর হত।

* * * *

একদিন রাত্রে গিয়েছি। মা শুয়ে আছেন। কালোবৌ (মা ঐ নামেই তাঁকে ডাকতেন) কাছে বসে আছেন। মা উঠে বসলেন—প্রণাম করব সেইজন্য। প্রণাম করতেই কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে আবার শয়ন করে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বল্লেন। পরে কথা-প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন 'শোন মা বিধাতা যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন তখন এক প্রকার সত্ত্বগুণী করেই করলেন—ফলে, তারা জ্ঞান নিয়ে জন্মাল, সংসারটা যে অনিত্য তা বুঝতে আর তাদের দেরী হল না। সুতরাং তখনি তারা সব ভগবানের নাম নিয়ে তপস্যা করতে বেরিয়ে পোড়লো ও তাঁর মুক্তিপদে লয় হয়ে গেল। বিধাতা দেখলেন তবে ত হল না। এদের দিয়ে ত সংসারের লীলা-খেলা কিছু করা চললো না। তখন সত্ত্বের সহিত রজঃ, তমঃ অধিক করে মিশিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। এবার লীলা খেলা চলল ভাল।" এই পর্য্যন্ত বলে সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে সুন্দর একটি ছড়া বললেন। তারপর বললেন—'তখন মা, যাত্রা-কথকতায় এই সব ছিল। আমরা কত শুনেছি, এখন আর তেমনটি শোনা যায় না।' ইতিমধ্যে কালো বৌ অন্য ঘরে উঠে গিয়ে নলিনী দিদি ও মাকুর কাছে কি একখানা বই চেঁচিয়ে পড়ছিল। মা তাই শুনে বললেন 'দেখেছ মা, অত চেঁচিয়ে পড়ছে—নীচে সব কত লোক রয়েছে তা হুঁস্ নাই!

রাধারাণীর মা এসে বললেন 'লক্ষ্মীমণিরা নবদ্বীপে যাবে—তা তুমি আমায় তাদের সঙ্গে যেতে দিলে না!' ঐ কথা বলেই তিনি অভিমান করে চলে গেলেন। মা বললেন 'ওকে যেতে দিব কি মা, সে (লক্ষ্মী) হল ভক্ত, ভক্তদের সঙ্গে মিশে কত নাচবে গাইবে—হয়ত জাতের বিচার না করে তাদের সঙ্গে খাবে, * ওত সে সব

---

* শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন 'ভক্তেরা এক আলাদা জাত', ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের মত' ইত্যাদি।

ভাব বুঝবে না, দেশে এসে লক্ষ্মীর নিন্দে কর্‌বে। তুমি দেখেছ লক্ষ্মীকে ?” আমি বললুম ‘না, মা’। মা—‘দক্ষিণেশ্বরেই ত আছে, দেখো। দক্ষিণেশ্বরে গেছ ত?’ আমি—হ্যাঁ, মা, অনেকবার গেছি —তা তিনি যে সেখানে আছেন তা জানতুম না।’ মা—‘দক্ষিণেশ্বরে আমি যে নবতে * থাকতুম দেখেছ’ ? আমি—‘বাইরে থেকে দেখেছি’। মা—‘ভিতরে গিয়ে দেখো। ঐ ঘরটুকুর মধ্যেই সব সংসার ছিল,—মায় ঠাকুরের জন্য হাঁড়িতে করে মাছ জিয়ান পর্য্যন্ত! প্রথমে যখন কলকাতায় আসি, আগে জলের কলটল ত কিছু দেখিনি, একদিন কল ঘরে † গেছি—দেখি কল সোঁ সোঁ করে সাপের মত গর্জ্জাচ্ছে! আমিত মা ভয়ে এক ছুটে মেয়েদের কাছে গিয়ে বল্‌ছি—“ওগো কলের মধ্যে একটা সাপ এসেছে, দেখবে এস। সোঁ সোঁ কচ্ছে!” তাঁরা হেসে বল্‌লেন—‘ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেয়ো না। জল আস্‌বার আগে অম্‌নি শব্দ হয়।’ আমিত শুনে তখন হেসে কুটি পাটি। বলেই খুব হাস্‌তে লাগ্‌লেন। সে কি সরল মধুর হাসি! আমিও আর হাসি চেপে রাখতে পারলুম না, ভাবলুম,—এমনি সরলাই আমাদের মা বটেন!

মা—বেলুড়ে ঠাকুরের উৎসব দেখেছ? ‘না, মা; কখনো বেলুড়ে যাই নি। শুনেছি সাধু-ভক্তরা সেখানে মেয়েদের গিয়ে গোল করা পছন্দই করেন না। সেই ভয়ে আরো যাই নি।’ শ্রীশ্রীমা—‘যেয়ো না একবার, ঠাকুরের উৎসব দেখতে যেয়ো।’

আর একদিন শ্রীশ্রীমা রাস্তার ধারে বারন্দায় এসে আমাকে আসনখানি পেতে হরিনামের ঝুলিটি এনে দিতে বললেন, এবং উহা এনে দিলে বসে জপ্‌ করতে লাগলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এমন সময়ে সাম্‌নের মাঠে যেখানে কুলি মজুর গোছের কতকগুলি লোক স্ত্রী পুত্র নিয়ে বস্‌বাস করত, সেখানে একজন পুরুষ সম্ভবতঃ তার স্ত্রীকে বেদম মার সুরু করে দিলে—

* মা উত্তর দিকের নহবতের নীচের কুঠরীতে থাকতেন।

† কলিকাতা কাঁসারী পাড়ায় গিরীশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী। তথায় শ্রীশ্রীমার সহোদর প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাসায়।

কিল, চড়, পরে এমন এক লাথি মার্‌লে যে, স্ত্রীলোকটির কোলে ছেলে ছিল—ছেলে শুদ্ধ গড়িয়ে এসে উঠানে পড়ে গেল! আহা, তার উপর এসে, আবার কয়েক ঘা লাথি!—মায়ের জপ করা বন্ধ হয়ে গেল। এ কি আর তিনি সহ্য কত্তে পারেন? অমন যে অপূর্ব্ব লজ্জাশীলা—গলার স্বরটি পর্য্যন্ত কেহ কখনও নীচে থেকে শুন্‌তে পেত না—একেবারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র ভৎর্সনার স্বরে বল্লেন—'বলি, ও মিনসে, বৌটাকে একেবারে মেরে ফেল্‌বি নাকি, আঃ, মলো যাঃ!' লোকটা একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই, অত যে ক্রোধোন্মত্ত হয়েছিল, যেন সাপের মাথায় ধূলো পড়া দেওয়ার মত অম্‌নি মাথা নীচু করে বউটাকে তখনি ছেড়ে দিলে! মায়ের সহানুভূতি পেয়ে বউটির তখন কি কান্না। শুন্‌লুম, তার অপরাধ, সে সময় মত ভাত রান্না করে রাখেনি। খানিক পরে পুরুষটার রাগ পড়ল, এবং অভিমান ও সাধাসাধির পালা সুরু হল দেখে আমরাও ঘরে চলে এলুম।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভিক্ষুকের স্বর রাস্তায় শোনা গেল—'রাধা-গোবিন্দ, ও মা নন্দরাণী অন্ধজনে দয়া কর মা' ইত্যাদি। মা শুনতে পেয়ে বল্‌লেন 'প্রায় প্রতি রাত্রেই রাস্তা দিয়ে ঐ ভিখারীটি যায়। "অন্ধ জনে দয়া কর মা" আগে এই ওর বুলি ছিল। তা, গোলাপ ওকে সেদিন বলেছিল ভাল :—"ওরে, সঙ্গে সঙ্গে একবার রাধাকৃষ্ণের নামটিও কর্। গৃহস্থেরও কাণে যাক্—তোরও নাম করা হোক্। তা নয়, অন্ধ, অন্ধ করেই গেলি।" সেই হতে ও এখানে এলেই এখন 'রাধা-গোবিন্দ' বলে দাঁড়ায়। গোলাপ ওকে একখানি কাপড় দিয়েছে—পয়সাও পায়।'

একদিন সন্ধ্যাবেলা গেছি—শুনি মা বল্‌ছেন—'নূতন ভক্তদের ঠাকুর সেবা করতে দিতে হয়, কারণ তাদের নবানুরাগ—সেবা হয় ভাল। আর, ওরা সব সেবা কর্‌তে কর্‌তে এলিয়ে পড়েছে। সেবা কি কর্‌লেই হয়, মা! সেবাপরাধ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। তবে কি জান? মানুষ অজ্ঞ জেনে তিনি ক্ষমা করেন।' জনৈকা সেবিকা কাছে ছিলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বল্লেন কিনা বুঝ্‌তে পারলুম না—কেন না বল্লেন,

চন্দনে যেন থিচ্ না থাকে, ফুল বিল্বপত্র যেন পোকা কাটা না হয়। পূজা বা পূজার কাজের সময় যেন নিজের কোন অঙ্গে, চুলে বা কাপড়ে হাত না লাগে। একান্ত যত্নের সঙ্গে ঐ সব করা চাই। আর, ভোগ-রাগ সব ঠিক্ সময়ে দিতে হয়।"

রাত্র প্রায় ৮॥ টা। আজ গিয়ে দেখি মা তখন ঠাকুরঘরের উত্তরে রাস্তার দিকের বারান্দায় অন্ধকারে বসে জপ কচ্ছেন। পাশের ঘরে আমরা বসবার খানিক পরে মা উঠে এলেন এবং হাসিমুখে বল্লেন—"এসেছ মা এস!" "হ্যাঁ মা, আজ আমরা দুই বোনে এসেছি, আরতি কি হয়ে গেছে? "না এখনও হয় নি। তোমরা আরতি দেখ, আমি আস্ছি।"

আরতি আরম্ভ হল। অনেকগুলি মহিলা ঠাকুরঘরে জপ করিতে বসিলেন। আরতি সাঙ্গ হলে আমরা প্রণাম করে মায়ের উদ্দেশে পাশের ঘরে গেলুম। ওখানে গেলে এক মুহূর্ত্তও মাকে চোখ ছাড়া করতে ইচ্ছা হয় না। খানিক পরে মা কাছে এসে বসলেন। একটি বৃদ্ধা অপর এক জনের কাছে ভক্তি রসাত্মক একটি গান শিখিতেছিলেন। মা তাই শুনে বল্লেন—"হাঁ, ও যা শিখাবে—দু ছত্র বলে আবার দুছত্র বাদ দিয়ে বল্‌বে! আহা, গান গাইতেন তিনি (ঠাকুর), যেন মধু ভরা, গানের উপর যেন ভাস্‌তেন। সে গানে কাণ ভরে আছে। এখন যে গান শুনি সে শুনতে হয় তাই শুনি। আর নরেনের কি পঞ্চমেই সুর ছিল! আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুস্থড়ীর বাড়ীতে। বলেছিল "মা যদি মানুষ হয়ে ফির্‌তে পারি, তবেই আবার আস্‌ব—নতুবা এই-ই।" আমি বললুম—'সে কি!' তখন বললে—'না, না, আপনার আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই আস্‌ব।' আর গিরিশবাবু—এই সে দিনও গান শুনিয়ে গেলেন। সুন্দর গাইতেন।"

রাধু এই সময়ে মাকে তার কাছে গিয়া শুতে বলায় মা বল্লেন—"তুমি যাওনা, শোওগে। আহা এরা কতদূর থেকে এসেছে, আমি এদের কাছে একটু বসি।' রাধু তবুও ছাড়ে না দেখে আমি বললুম 'আচ্ছা মা চলুন ও ঘরেই (ঠাকুর ঘরে) চলুন, শোবেন। মা বললেন 'তবে তোমরাও

এস।' আমরাও গেলুম। মা শুয়ে শুয়ে কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন ও আমি বাতাস করতে লাগলুম। খানিক পরে মা বল্‌লেন—'এখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে আর না।' আমি তখন পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। একজন বৃদ্ধা অপর একজনকে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন। গোলাপ-মা বল্লেন—'ও সব বীজ মন্ত্র অমন করে বলতে নাই।' তবু তিনি বলতে লাগলেন। মা ঐ সব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সহাস্যে আমাকে বললেন "ঠাকুর নিজ হাতে আমাকে কুলকুণ্ডলিনী, ষটচক্র এঁকে দিয়েছিলেন"। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম "সে খানি কই মা?" মা—'আহা, মা তখন কি এত জানি? সে খানি কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর পেলুম না।"

রাত প্রায় এগারটা হয়েছিল। আমরা প্রণাম করে বিদায় নিতে আশীর্ব্বাদ করে "দুর্গা দুর্গা" বল্‌তে বল্‌তে উঠে বসলেন। যাবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একান্তে বললেন—"দেখ মা স্বামী স্ত্রী এক মত হলে তবে ধর্ম্মলাভ হয়।"

লাটু মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামিজী যখন পরিব্রাজক অবস্থায় নানাস্থান ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি আলমোড়া পাহাড়ে একবার অন্নাভাবে কাতর হইয়া মৃতপ্রায় হন। তখন জনৈক মুসলমান্ ফকির তাঁহাকে কাঁকুড় খাওয়াইয়া সুস্থ করেন। ঘটনাচক্রে প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর যখন তিনি আলমোড়া ভ্রমণে যান সেই ফকিরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। (শ্রীযুক্ত লাটু সঙ্গে ছিলেন)। স্বামিজী সেই পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে ২৲ টাকা দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত লাটু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"আলমোড়া পাহাড়ে স্বামিজীকে

এক মুসলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন দেখা। স্বামিজী দৌড়ে গিয়ে তার হাতে ২৲ টাকা দিলে। আমি বল্লাম, ঐ লোক্‌কে কেন টাকা দিচ্ছ? স্বামিজী ব'ল্লে, 'ও আমায় অসময়ে ফল খাইয়েছিল। ২৲ টাকা কি বল্‌ছিস্ ওরে লেটো, অসময়ের উপকারের মূল্য নেই।' * * মানুষ উপকার পেয়ে উপকার ভুলে যায়, তাইত এত দুর্দ্দশা। যে উপকার পেয়ে মনে রাখে—সেই মানুষ।"

শ্রীযুক্ত লাটু যে নিজ জীবনের কথা খুব কমই বলিতেন—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কথা-প্রসঙ্গে কোন কোন ঘটনা বলিয়া ফেলিতেন মাত্র। জিজ্ঞাসা করিলে কোন কিছু জানিবার উপায় ছিল না।' কারণ, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। এনিমিত্ত তাঁহার সুসম্পূর্ণ জীবনী লেখা সম্ভবপর নহে।

লাটু মহারাজ সম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দজী আরো বলেন।—'তখন মঠে অভেদানন্দ স্বামিজী কৃত শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রটি পাঠ হ'তো। একদিন লাটু মহারাজ মঠে আছেন—সন্ধ্যা-আরতি পাঠ হ'চ্ছে। (তিনি সম্ভবতঃ সে সময় নীচে ছিলেন)—সেই আরতির মধ্যে "ঈশাবতারং পরমেশমীড্যম্ তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ" এই প্রণাম মন্ত্রটি আছে। তিনি 'ঈশা-বতারং' এই শব্দটি শুনে মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে শ্রীশরৎ মহারাজকে ব'ল্লেন, 'এ শরৎ, তোমরা এর মধ্যে ঠাকুরকে ভুলে গেলে দেখ্‌ছি? ঈশাকে পূজা ক'রছ! তোমরা সব কি হ'লে?' ইত্যাদি। সে সময় তাঁকে ঐ শ্লোকের অর্থ বুঝাতে চেষ্টা ক'ল্লেও বুঝ্‌তে চান্‌নি। তিনি ভেবেছিলেন যে যীশুখ্রীষ্টের স্তব পাঠ হ'চ্ছিল।"

অবশ্য পরে তাঁহার মধ্যে আর ঐরূপ কোন সঙ্কীর্ণ ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি ঐবিষয়ে খুব উদার হইয়াছিলেন। মাত্র এইটুকু তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শুনাযাইত যে,—'ঠাকুর, স্বামিজীই হ'চ্ছে-এ যুগের আদর্শ। তাঁদের যে না মান্‌বে, সে ভুগ্‌বে।' আর বলিতেন, 'ঠাকুর-স্বামিজীর উপদেশ মেনে যে চল্‌বে তার কল্যাণ হবেই। এ যুগের ধর্ম্ম ঠাকুর ব'লে গেছেন, আর স্বামিজী প্রচার ক'রেছে। ওঁরাই এ যুগের আদর্শ।"

একবার বেলুড়মঠ ও স্বামিজী সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। তিনি প্রসঙ্গ-ক্রমে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"মুক্তি ত তাঁর হাতে। বাসনা—যেন জন্মে জন্মে বিবেকানন্দের মত গুরুভাই পাই। আগে বুঝ্‌তে পারিনি, আমাকে এত ক'রেছে—তবু তাকে সময় সময় গালি দিয়েছি, কিন্তু কিছু মনে করেনি। এখন সে সব মনে হ'লে কি দুঃখ হয় তা আর কা'কে বল্‌বো? * * আমি তাকে পূজো করি বৈকি? * * তাঁর নিচেই বিবেকানন্দের ভালবাসা।

দেখ, আমার শরীর বেশছিল।—বেশ স্ফূর্ত্তি ছিল, কারো তোয়াক্কা রাখ্‌তাম না। দিনের বেলায় গঙ্গার ধারে পড়ে থাকৃতুম্, আর রাত্রে 'বসুমতী' প্রেসে। বিবেকানন্দ ভাই চ'লে গেলে, হঠাৎ শরীর ভেঙ্গেগেল; আর কোন কারণ নেই। এ কথা এতদিন বলিনি। আজ তোমাদের ব'ল্‌ছি। তাই মনে হয়—এশরীর আর সার্‌বে না।

আজ কাল ত খুব নাম পড়েগেছে। বিবেকানন্দ ভাই থাক্‌লে কত স্ফূর্ত্তি হ'তো। আমি ব'লেছিলাম—মঠ-ফঠ ক'রে কি হবে? বিবেকানন্দ তাই ব'লেছিল,—'মঠ তোর আমার জন্য নয়, এই সব ছেলেদের জন্য। যদি পবিত্রভাবে জীবন কাটাইতে পারে, তবুও কল্যাণ। মঠে ডাল ভাতের কোন অভাব হবে না—তাঁর কৃপায়।' এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, সে যা ব'লেছে তা সব ঠিক্।

আমেরিকা হ'তে আসার পর আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, 'তুই যেতিস্ কোথা? তুই ত বিগ্‌ড়ে থাক্‌তিস্!' আমি বল্লুম, বসুমতীর উপেন মুখুয্যে আমাকে খেতে দেয়। স্বামিজী উপেনবাবুকে খুব আশীর্ব্বাদ কল্লে।

'মঠে একবার হুকুম হ'লো—ভোর চারটায় উঠে সবাইকে ধ্যান ক'র্‌তে হবে। ঘণ্টা নেড়ে সকলের ঘুম ভাঙ্গান হ'তো। আমি একদিন সকালে উঠে গামছা কাপড় কাঁধে ফেলে চলে যাচ্ছি দেখে স্বামিজী ব'ল্লে—কোথায় যাচ্ছিস্? আমি বল্লুম,—তুমি বিলেত থেকে এসেছ, কত নূতন নূতন আইন চালাবে, আমি ওসব মান্‌তে পারবো না। মন কি ঘড়ি ধরা যে, ঘণ্টা বাজল আর মন বসে গেল! আমার এমন হয় নি।

তোমার যদি হ'য়ে থাকে ভালই। তাঁর কৃপায় কল্‌কাতায় আমার দুটো অন্নের সংস্থাপন হবে। তখন স্বামিজী আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে বল্লে,—'তোকে যেতে হবে না। তোদের জন্য ওসব নিয়ম নয়। এরা সব নূতন, এদের যাতে একটা ভাবস্থায়ী হয়, তারই জন্য।' তখন বল্লুম—তাই বল!

শ্রীযুক্ত লাটু সন ১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে (ইং ১৯১২ অক্টোবর) ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার পূর্ব্বেই কলিকাতা ও বলরাম মন্দির হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া—৺কাশীধামে চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান মানসে যাত্রা করেন। পথে বৈদ্যনাথে দু'একদিনের জন্য নামিয়া ছিলেন। ৺কাশীতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমেই উঠেন। সঙ্গে ৪।৫ জন গৃহী-ভক্ত ছিলেন। ভক্ত ও সাধু সঙ্গে নানা সদালাপে দিন কাটাইতেন। চন্দ্রমহারাজ—বলেন, 'আশ্রমে অবস্থান কালে রাত্রে প্রায়ই আমায় গীতাপাঠ করতে বল্‌তেন। আমি পড়ে শুনাতাম, তিনি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তেন। কখন কখন বিড়্ বিড়্ ক'রে বকতেন। মনে হ'তো—ঠাকুরের সঙ্গে কথা ব'ল্‌ছেন।'

কিছুদিন পরে কনখল হইতে মহারাজ, হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ও মহাপুরুষজী আসায় আশ্রমে স্থানাভাব হয়। মৃঃ—নামক শ্রীযুক্ত লাটুর জনৈক ভক্ত সে সময় গোধূলিয়ায় বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত লাটু আশ্রম হইতে তাঁহার ভক্তগণ সহ কুণ্ডু মহাশয়ের বাসায় গিয়া উঠেন। তিনি তাঁহার নীচের ঘরগুলি শ্রীযুক্ত লাটুকে ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই বাসায় তিনি অল্পদিন মাত্র অবস্থান করিয়া ৺বংশীদত্তের বাটী—সোনারপুরায় উঠিয়া যান্।

গোধূলিয়ায় অবস্থান কালে তিনি ৺লক্ষ্মী-পূজা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিবৎসর ৺কালীপূজার দিন ৺লক্ষ্মীপূজা—তাঁহাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী করাইতেন। তাঁহার এটি নিজস্ব ভাব ছিল।

এই বাসায় একটি ঘটনা হয়—একদিন দ্বি-প্রহরে আহারে বসিয়াছেন, বলিয়া উঠিলেন—

"কিসের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে? দেখ ত, বাহিরে কেউ আছে কি না?"

অনৈক ভক্ত বাহিরে গিয়া দেখেন—একটি স্ত্রীলোক দরজার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি সে সংবাদ দিলে—শ্রীযুক্ত লাটু কেবল 'হুঁ' বলিয়া ঘাড় নাড়িলেন। আহার সমাপনান্তে উঠিবামাত্রই বমন হইয়া সমস্ত অন্ন উঠিয়া গেল।

৺বংশীদত্তের বাটিতে প্রায় একবৎসর কাল ছিলেন। তৎপরে ৬৮নং পাঁড়েহাউলিতে বাসা ভাড়া করিয়া বৎসরাধিক কাল নিবাস করেন।

৺পূজার সময় এবং বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতা হইতে অনেক ভক্ত শ্রীযুক্ত লাটুর সঙ্গলাভ মানসে আসিতেন। পূজা, পাঠ, ধর্ম্মচর্চ্চা দেবদর্শনাদি নিত্য নব আনন্দের ধারা চলিত। ৺পূজার সময় তিনদিন—৺বিশ্বনাথ, ৺অন্নপূর্ণা, মহাবীর, ৺গণেশ, ৺দুর্গা, ৺সঙ্কটাদেবী ও ৺বারেশ্বর মহাদেবকে ফল মিষ্টান্নাদি দিয়া যথাবিধি পূজা দিতেন।

পাঁড়ে হাউলির বাড়ীওয়ালা ভাড়া লইয়া গোলমাল করায়। তিনি ৯৬নং হাড়ারবাগে বাসা ভাড়া ল'ন। এই খানেই তিনি জীবনের শেষ কয়টাদিন শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম চিন্তায় অতিবাহিত করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তিনি অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ থাকিতেন। ইচ্ছা হইল ত একটু আধ্টু কথা বলিলেন, নতুবা আপনি মনে মনে 'বিড়্ বিড়্, করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববৎ এখানেও স্নানাহারাদির কিছুই ঠিক্ ছিল না—ইচ্ছামত আহারাদি করিতেন। কোনও নিয়মের অধীনে থাকিতে পারিতেন না—কষ্ট হইত। তাই ঐরূপ কোন 'বাঁধা বাঁধি' (নিয়ম) তাঁহার সম্বন্ধে করিতে যাইলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। বলিতেন,—'আমি কি তোদের হাতের খেলনার পুতুলের মত [illegible], আর তোরা যেমন নাচাবি, তেম্নি নাচ্বো ?—তা আমি পার্বো না। আমি কারো তোয়াক্কা রাখি না ; আমার যখন খুসী হবে, তখন যাব ইত্যাদি।

"লাটু মহারাজের একটি বিশেষত্ব ছিল—সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মেলা-মেশার ভাব। তাঁহার কিছু মাত্র 'অভিমান' ছিল না। বালক, বৃদ্ধ, যুবা—সকলেই তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিত ও তাঁহার নিকট হইতে ছোলাভাজা, হালুয়া প্রভৃতি প্রসাদ পাইবার জন্য ভিড় করিত। * * * এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সারারাত্রি ধ্যান-ধারণা করিতেন,

অথচ আহার-বিহারে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না—সর্ব্বদাই যেন একটা ভাবে থাকিতেন। ভগবৎ-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট বড় একটা শুনা যাইত না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ভক্তবৃন্দ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কথামৃত পান করিত। অবশেষে তিনি সকলকে প্রসাদ দিয়া বিদায় দিতেন।"

দেহ-ত্যাগের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত লাটুর অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি-শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। মনে কেহ অসচ্চিন্তা করিলে অথবা কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট আসিলেই—তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া তাহার উদ্দেশে ভৎর্সনা করিতেন। এমন কি বাসা-বাটীর মধ্যে যে কোন-স্থানে কাহারো কোন অসচ্চিন্তা পর্য্যন্ত মনে উদয় হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং কখন আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া কখনও বা চিৎকার করিয়া ভৎর্সনা করিয়া উঠিতেন—'নিজেরাও কিছু ক'র্‌বে না, আমাকেও কিছু ক'রতে দেবে না!'

ঐ সময় তিনি নিয়ত একটা ভাবের ঘোরে থাকিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায়, অসচ্চরিত্র লোকের স্পর্শ সহ্য করিতে অথবা কামনাপূর্ণ দানাদি গ্রহণ করিতে পারিতেন না—অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করিতেন।

জনৈক ভক্ত বলেন, 'একদিন বাড়ীতে বিশ্বনাথের সত্যাসত্যত্ব সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া লাটু মহারাজের কাছে গিয়াছি—'উহা ত পাথর, উহাকে পূজা করায় লাভ কি' ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়—লাটু মহারাজের নিকট গিয়া দেখি তিনি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া আপনি মনে বলিতেছেন, 'যে পাথর ভাবে, তার কাছে পাথর। তিনি আছেন বৈকি! বাবা বিশ্বনাথ—সাক্ষাৎ র'য়েছেন। আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি তিনি র'য়েছেন—পূজা নিচ্ছেন! তাঁকে মান তোমারই কল্যাণ, না মান ত তাঁর কি?—তোমাকেই ভুগ্‌তে হবে' ইত্যাদি। আমি ত শুনিয়া অবাক্! আমি বাড়ীতে কি বলিয়াছি তাহা ইনি কি করিয়া জানিলেন? আমার, খুব ভয়ও হইল—কি জানি আমাকে সম্মুখে পাইয়া যদি ভৎর্সনা করেন অথবা অন্য কোন শাস্তি দেন! কে জানে সাধুর খেয়াল? এই সময় তিনি আমায় ডাকিলেন। ডাক্ শুনিয়া

তাঁহার নিকট ভীত ও সঙ্কুচিত হৃদয়ে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম কিন্তু তিনি 'ওবিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না—অন্যান্য সদালোচনা হইল।'

ইনিই আরো বলেন,—কিছুদিন আমি লাটু মহারাজের কাছে শয়ন করিতাম। সেটা গ্রীষ্মকাল—ঘরের মধ্যে শুইবার জো নাই—অত্যন্ত গরম; ছাদের উপরেই উভয়ে শয়ন করিতাম। তিনি আমায় ধ্যান করিতে বলিতেন—আমি ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতাম। চঞ্চল মন—ধ্যানে বসিয়া হয়তো কত কি বাজে বিষয় ভাবিতেছি তার ঠিক-ঠিকানা নাই, আসল বিষয় গুলাইয়া গিয়াছে। তিনি কিন্তু আমার মনের অবস্থা ঠিক্ ধরিতে পারিতেন, হয় তো ধম্‌কাইয়া বলিয়া উঠিলেন—'নিজেও কিছু কর্‌বে না, অপরকেও কিছু ক'র্‌তে দেবে না।' লজ্জিত হইয়া আবার মনটা ঠিক্ করিয়া বসিয়াছি, অসংযত মন—আবার বাজে বিষয় ভাবিতেছি—তিনি হয় তো বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'তোর জন্য কেউ কিছু ক'র্‌তে পাবে না নাকি? আরে, এ তো বড় বখেড়া লাগালে দেখ্‌ছি!' ইত্যাদি। এরূপ সারারাত্রি আমায় একপ্রকার নিদ্রা যাইতেই দিতেন না—'উঠ্, ধ্যান কর' বলিয়া বসাইয়া দিতেন। কিছু দিন এরূপ অনিদ্রা হওয়ায় বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহার নিকট শয়ন করা বন্ধ করিলাম।

তখন তাঁহার অহেতুক দয়া বুঝিতে পারি নাই—হেলায় তাহা হারাইয়াছি। এখন বড় অনুতাপ হয়। * * তিনি যে সব সময় বসিয়া থাকিতেন—এমন নহে। কখনও আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া খাটিয়ায় শুইয়া থাকিতেন। কখনও বা পায়চারি করিতে করিতে বিড়্ বিড়্ করিতেন, কিম্বা শান্ত—স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কিছুই তাঁর ঠিক্‌ছিল না—আপন খেয়াল মত চলিতেন। কিন্তু তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেখি নাই।"

আর একজন বলেন, 'কাশীতে শিবরাত্রের দিন লাটু মহারাজের কাছে র'য়েছি, চার-প্রহরে চারবার পূজা হবে, গান বাজনা হবে আর খাওয়া দাওয়া হবে। আমি শুণছি—আমরা ক'জন আছি। মনের ভাব—সেই

অনুপাতে লুচি করা হবে। লাটু মহারাজ বুঝ্‌তে পেরে ব'ল্লেন, 'কোথায় মহাদেবকে পূজা দিবি না নিজেদের জন্য শুনছিস্! তুই ত বড় লোভী দেখ্‌ছি!' এই কথা শুনে আমি বল্লাম,—কেন মশায়, ঠাকুর যখন খেতেন আর আপনি কাছে বসে থাক্‌তেন, তখন আপনার মুখে কি জল আস্‌তো না? গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—'না, আমার তা আস্‌তো না।' আমার সেই কথাশুনে চৈতন্যদেবের কথা মনে পড়ে গেল। শুনেছিলাম—যখন কেশব ভারতীর কাছে তিনি সন্ন্যাস নিতে গিছ্‌লেন, কেশব ভারতী ব'লেছিলেন—'জীতেন্দ্রিয় না হ'লে সন্ন্যাসে অধিকার হয় না' এবং গৌরাঙ্গদেব জীতেন্দ্রিয় কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে—জিহ্বার উপর চিনি দিয়ে দেখেছিলেন—জল আসে কি না! কিন্তু চিনি ভিজে নাই, ফুঁ দিতেই উড়ে গেল। অবশ্য এঁকে ওরূপ কোন পরীক্ষা কর্‌বার প্রবৃত্তি হয় নাই, বা সে কথা তুলিতে অবসর পাই নাই। কারণ তিনি ঐ কথা এমন ভাবে ব'ল্লেন যে, মনে একটুও অবিশ্বাস হ'ল না। অন্য কেহ যদি ওকথা ব'ল্‌তো, তা কখনই বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌তুম না।"

'পবিত্র হও, পবিত্র হও, পবিত্র হও;—পবিত্র না হ'লে ভগবান্‌কে বুঝা যায় না।'—একথা প্রায়ই বলিতেন। 'সৎ না হ'লে সৎ-স্বরূপকে জানা যায় না'—তাঁহার নিকট যে কেহ আসিত তাহাকেই পুনঃ পুনঃ ইহা বলিয়া সৎ হইতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার সেই পবিত্র জীবন দেখিয়া এবং তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণে বহু পথ-ভ্রান্ত 'পথ' খুঁজিয়া পাইয়াছে, সৎ হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণ কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

—স্বামী সিদ্ধানন্দ।

সংসার

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কিশোরীমোহন বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিনয় প্রথমতঃ কলিকাতায় আসিয়া একটি আশ্রয় যোগাড় করিয়া লইয়া বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। একটি স্কুলে কার্য্য করিয়া সে পঁচিশ টাকা এবং গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিয়া আরও প্রায় পনর টাকা রোজগার আরম্ভ করিল। এইরূপে একটি গরীব কেরাণীর মেসে বাসা লইয়া আবার সে ভাগ্য পরীক্ষার কঠোর ব্রতে ব্রতী হইল। দুরদৃষ্টের তীব্র উপহাস দারিদ্রের শোচনীয় দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনার ভীষণ নিদ্দয়তার সঙ্গে সে প্রায় আজন্ম যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে; সুতরাং নূতন এ কষ্ট তাহার কাছে অতি সামান্যই মনে হইল। যেস্থানে সে থাকিত তাহাকে মানুষের পক্ষে পায়রার খাঁচা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক অধিকাংশ সময় সে বাহিরেই থাকিত, এমন কি সময় ও সুবিধা পাইলে স্থানান্তরেও দুই একদিন কাটাইয়া দিত। এইরূপে কঠিন পরিশ্রম সহকারে সে নিজের সফলতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

* * * * * *

সকল দিন মানুষের সমানে যায় না। কঠোর দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতেও একদিন মানুষের সুখের দিন আসে। যাহার পরিধেয় বস্ত্র নাই, অন্নের সংস্থান নাই, মাথা গুঁজিতে পাতার কুঁড়ে নাই, সে যদি হঠাৎ কিছু অর্থের অধিকারী হয়; তবেই আমরা বলিয়া থাকি যে, অনেক দুঃখের পর সুখের দিন আসিয়াছে। আমরা মোটামুটি জ্ঞানে—বাহ্য দৃষ্টিতে এইরূপেই মানুষের সুখ-দুঃখের হিসাব-নিকাশ করিয়া থাকি; কিন্তু এছাড়া মানুষের অন্তর্জগতের যে একটি সুখ-দুঃখ আছে, তার খবর স্থূল ইন্দ্রিয় রাখিতে পারে না। নতুবা আমরা অনেক সময় যাহাকে দুঃখ বলি সেটা হয়ত সুখেরই রূপান্তর। অনেক সময়—

যখন দরবিগলিত অশ্রুধারায় আমার বুক ভাসিয়া যায়, তখন মনে হয় এই বুঝি স্বর্গীয় অমৃতের সিঞ্চন। তাই সুখ-দুঃখ দুইটি অবস্থাই মানুষকে হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু বুঝিব কিরূপে? যে কখন বেদনা জানে না সে আমার অন্তরের ব্যথা বুঝিবে কিরূপে? যে কখন অভাবের তাড়নায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে নাই, সে আমার ক্ষুধার জ্বালা বুঝিবে কিরূপে? নাই বা বুঝিলাম, আমি মানুষ; আমি চিন্তা করিতে জানি, আমার মন আছে। এই অহঙ্কার লইয়াই আমি অনেক সময় অতীন্দ্রিয় জগতের সমালোচনায় বসিয়া যাই। আর সেই ক্ষুদ্র মাপ-কাঠি লইয়াই অন্তহীন জগতের, কিম্বা তাহা হইতেও অনন্ত,—মানুষের হৃদয় রাজ্যের গভীরতম সাগর বারির ন্যায় তরঙ্গায়িত সুখ-দুঃখের পরিমাণ খতাইয়া দেখিতে যাই। অথচ যখন নিজের বিষয়েই চিন্তা করিতে বসি, তখন আর কূল কিনারা খুঁজিয়া পাই না; এইত আমার শক্তি।

বিনয় আজ এম, এ, পাশ করিয়া পশ্চিম অঞ্চলের একটি কলেজের অধ্যাপক। এই সবে মাত্র চাকুরীতে ঢুকিয়াছে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রমহলে বেশ পসার জমাইতে পারিয়াছে। এখন সে মোটামুটি মাসিক দুইশত টাকারও বেশী উপার্জ্জন করে। সংসারের লোকজনের মধ্যে সে একা আর দুইটি দরিদ্র ছাত্র। যাহাহউক এখন তাহাকে আর অভাবের চিন্তা করিতে হয় না, বরং সব টাকাটা কিরূপে মিতব্যয়িতার হিসাবে সদ্ব্যবহার করা যায় তাহারই হিসাব করিতে হয়। যাঁহারা বিনয়ের পূর্ব্ব অবস্থার কথা জানেন, তাঁহারা মনে করেন,—'এঁর ভাগ্য বেশ ভাল, কেও বলেন,—"নিজের অধ্যবসায়ের জোরেই তিনি দুঃখের সাগর সাঁতরিয়ে পার হয়েছেন"। বিনয় এসব কথা শুনিয়াও শুনে না, কিম্বা কোন বাদ-প্রতিবাদও করে না, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা আগ্রহের ভাব দেখা যায় না। সে যেন নিজেই অনেক সময় বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না যে, কোন্ অজ্ঞাত কারণের জন্য একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার হৃদয়কে প্রপীড়িত করিতেছে। তাই সে বাহিরে স্ফূর্ত্তির ভাব দেখাইতে গেলেও তাহার মধ্যে বিষাদের

ছায়া পড়িয়া যায়। একদিন তাহার একজন বন্ধু বলিলেন, "দেখুন বিনয়বাবু! আপনাকে দিয়ে সেক্সপিয়রের সেই এণ্টনিওর ভূমিকাটা করালে বেশ হয়। মুখে হাসি নেই, মনে স্ফূর্ত্তি নেই, কি যেন চিন্তা সাগরে ডুবে আছেন! আমরাও আপনার কোন চিন্তার কারণই খুঁজে পাই না। আপনাকে দেখ্‌লেই আমার সেই কথাগুলি মনে পড়ে। আমার ইচ্ছে করে যে, বলি,—"You look not well. Signior Antonio, you have too much respect upon the world, They lose it that do buy it with much care ;"

বিনয়—আমিও তার উত্তরে বল্‌তাম বা এখনও বল্‌ছি "I hold the world but as the world, Gratians ; A stage where every man must play a part, and mine a sad one." এটাকে একটা খেলা-ঘর ছাড়া আর কি বল্‌তে পারেন? তাই হাসি-কান্না সকল রকম অভিনয়ই করতে হয়। তবে তফাৎ এই যে, সখের অভিনয়ে আপনি যা করেন, সেটা কেবল কৃত্রিম—আর সংসার-অভিনয়ে যা করছেন, সেটা করতে আপনি বাধ্য। আপনি না করতে চাইলেও এক অদৃশ্য মহাশক্তি জোর ক'রে আপনাকে করাবে।

বন্ধু—"সে কিরম কথা? আমি যা করতে চাই না, তা আমাকে কেউ করাতে পারে না। তাহলে' পুরুষকার বলে' জিনিসটার নাম থাক্‌ত না। আচ্ছা—ওসব কথা যাক্। দেখুন বিনয়বাবু! আপনি একটা বিয়ে ক'রে ফেলুন। তাহলে ওসব ভাব-ভক্তি সব ঐ স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না প্লাবিত নীল আকাশখানির কোন্ এক সুদূর প্রান্তরে বিলীন হয়ে' যাবে। আমার মনে হয়, তখন আপনি একজন বড়দরের কবি হ'য়ে উঠ্‌বেন।"

বিনয়—"আমারও মনে হয় আপনি বোধ হয়—আর বোধ হয় কেন—সত্য সত্যই একজন নামজাদা কবি হ'য়ে পড়েছেন। যেহেতু আপনি বিবাহিত।"

বন্ধু—"হাঁ আমি বিবাহিত সত্য, কিন্তু বিবাহিত-জীবনের পূর্ব্বে কখন বৈরাগ্যগ্রস্ত ছিলাম বলে' মনে হয় না। আর ভাবের উৎসও

জমিয়ে রাখিনি। যখন যা এসেছে, হাসির ফোয়ারার সঙ্গে, বাক্যের তোড়ের সঙ্গে সব নিঃশেষ ক'রে বের ক'রে দিয়েছি। কাজে কাজেই 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' কোন পরিবর্ত্তন নেই। আর আপনারা কি জানেন, হৃদয়ের একটা দিক্ একেবারে রুদ্ধ ক'রে রেখেছেন। এই রুদ্ধ স্রোতাবেগ,—যা সুষুপ্ত অবস্থায় হৃদয়-কন্দরের স্তরে স্তরে পড়ে রয়েছে, সেটা যখন ঐ বিবাহরূপ মৃত সঞ্জীবনীর স্পর্শ পাবে, তখন আর যায় কোথায়! একেবারে শতধা বিভক্ত হয়ে' ছুটতে থাকবে। এবং সেই আবেগপূর্ণ উন্মত্ত ধারায় সিক্ত হয়ে' মরুভূমি ও নন্দন কাননে পরিণত হবে। তাতে কত সৌন্দর্য্যময়ী কবিতার আবির্ভাব হবে। বলা বাহুল্য আমরা আপনার বন্ধু হিসাবে সে সৌন্দর্য্য উপভোগে বঞ্চিত হব না।"

বিনয়—"বেশ হয়েছে বিমলবাবু! আপনার যে কবিত্বশক্তি আছে, তা বুঝা গেল। দেখা যাবে, সাহিত্য-পরিষদ থেকে যদি একটা ভাল দেখে' উপাধি আপনাকে দেওয়া যেতে পারে।" বলিয়া বিনয় কার্য্যান্তরে মনোযোগ দিবার ইচ্ছা করিলেও বিমলবাবুর হাত হইতে রক্ষা পান নাই। কারণ তিনি এ কথাটাকে একটু জমকাল রকমের করিবার মানসে বলিলেন, "কেন আপনি রহস্যচ্ছলে একথাটা ধরলেন কেন? আমাদের গার্হস্থ্য আশ্রমটা কি খেলো জিনিস নাকি? মনু ত এর আসন একটুও নীচে দেননি! বরং অনেক স্থলেই এর অবশ্য পালনীয় যুক্তি ও আবশ্যকতা দেখিয়ে গিয়েছেন, তা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন?"

বিনয়—"না তা করি না। বরং আমিও সেটার forএ যুক্তি দেখাতে পারি। কিন্তু যুক্তি-তর্কের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা এক কথা,—আর সে শ্রেষ্ঠতার মর্য্যাদা ব্যবহারিক জীবনে রক্ষা করা আর এক কথা। আমাদের তা আছে কি? আমাদের দাম্পত্য-জীবনের কয়টা জায়গায় আপনি মাধুর্য্য বলে একটা জিনিস ঠিক ভাবে দেখাতে পারেন? বিভিন্ন প্রকৃতি ও শক্তির সংঘর্ষণে অধিকাংশ জায়গায় কেবল বিষই দেখা যায়। তার কারণ কি?—আমার মনে হয়, আমাদের এই

নিত্য নূতন, যোগ্য-অযোগ্য বিলাশ-বাসনা চরিতার্থ করবার অতৃপ্ত কামনা-বহ্নিই সকল মাধুর্য্য, সকল সৌন্দর্য্য, সকল গৌরব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিচ্ছে। আমরা গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ ক'রেই মনুর একটা বিধি পালন ক'রে থাকি, সেটা কমের দিকে আসে না। কিন্তু তার পূর্ব্বে মনু যে পুরুষোচিত শক্তি-সঞ্চয় করবার কথা বলেছেন সেটা আমরা কয়জনে করি? অর্থাৎ তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটার মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমরা স্পর্শ করি না। সে স্থানটা বোধ হয় ব্যোম-যানের সাহায্যে খুব শীগ্গীর পার হয়ে চিরাকাঙ্ক্ষিত পিপাসার রাজ্যে প্রবেশ ক'রে ভোগ-পিপাসায় কাতর হ'য়ে ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ ছুটতে থাকি। এইত আপনার সব কবিত্বের পরিণাম? না—এর বেশী আর কিছু দেখাতে পারেন? অবশ্য মাসিক পত্রিকার গল্পে-উপন্যাসে বা ভাষায় কল্পনায় দেখ্‌তে চাই না। চাই বাস্তব জীবনে। যান বাঙ্গলার বাড়ী বাড়ী খুঁজে আসুন, অমৃতময় নন্দন কানন না শ্মশানের ভস্মস্তূপ-কোনটা বেশী দেখ্‌তে পান, আপনি বুঝ্‌তে পারবেন। কোন কোন জায়গায় হয়ত আপাত-মধুর-চাকচিক্যময় কিছু দেখ্‌তে পারেন, কিন্তু তার ভিতরে ঐ একই বিষের জ্বালা। বরং ততোধিক। এ জীবন বাস্তবিকই হেয় নয়, বিমলবাবু! কিন্তু আমূল সংস্কার একান্ত আবশ্যক।"

বিমলবাবু এতক্ষণ বিনয়ের অন্তরের যুক্তিগুলির কঠোর সারবত্তা স্থিরভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার আর রহস্যের ভাব থাকিল না। তিনিও গম্ভীর ভাবেই বলিলেন,—"বেশত! আপনি একটা আদর্শ জীবন দেখিয়ে দিন। তাতে উপকার বই অপকার হবে না। আপনারও মঙ্গল, আরও পাঁচজনের মঙ্গল হওয়াও অসম্ভব নয়।"

বিনয়।—"এত বড় কঠোর আশীর্ব্বাদ ভগবান যেন আমার উপর বর্ষণ না করেন। তা হলে তাঁর স্নেহাশীষের প্রতিদান স্বরূপ দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালাময়ী অনুশোচনার তপ্ত শ্বাস তাঁকে ফিরে নিতে হবে। তাই আগে থেকেই প্রার্থনা করছি, 'দয়াময়! ঐ ভীষণ পরীক্ষার হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।"

বিমল—"কেন এতটা ভয় পাবার কারণ কি! ওটাও যে আমাদের

একটি ধর্ম্মপথেরই সোপান, তাকি আপনি অস্বীকার করতে পারেন ! এর শাস্ত্রীয় প্রমাণও যথেষ্টই রয়েছে ! তবে আপনার বৈরাগ্যের মাত্রাটা একটু ছাপিয়ে উঠেছে বলেই প্রতিকূল তর্ক নিয়ে আসছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে কি—।”

বিনয় বাধা দিয়া বলিল,—“হাঁ, শুধু বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যে কেন ? আরও অনেক স্থানেই এর দৃষ্টান্ত অনেকই পাওয়া যায়। আমাদের ঈশ্বর—উপাসনাকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক ‘ঈশ-ভাব,—এই ভাবে তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যের রাজাধিরাজ। এইভাবে তিনি এই অনন্ত অসীম চিন্তাতীত বিশ্বের একাধারে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা। এই ভাবকে অবলম্বন ক’রে উপাসনা করুন,—দেখবেন তিনি সর্ব্বশক্তিমান। জল স্থল আকাশ সাগর লতা গুল্ম হীন দিগন্ত বিস্তৃত উত্তপ্ত মরুভূমি কোথায় তিনি নাই ? তাঁর সীমাহীন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার আপনার চারি-দিকে ছড়ানো রয়েছে, এবং তার প্রত্যেকটির মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন। এই ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তিই একদিন অর্জ্জুন সম্মুখে প্রত্যক্ষ ক’রে বলেছিলেন,—

“নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেক বর্ণং, ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশাল নেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা, ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥”

‘হে নারায়ণ ! তোমার নভস্পর্শী দীপ্ত অনেক বর্ণ, বিশাল ব্যাবৃত মুখ ও দীপ্ত নয়ন দেখে আমার অন্তরাত্মা যেন শান্তি পাচ্ছে না।’ যদিও এখানে অর্জ্জুন মায়ার কুহক জাল ভেদ ক’রে বুঝতে পারলেন যে, ইনিই জগৎ নিবাস, সর্ব্ব দেবের আদিকর্ত্তা। সৎ অসৎ, ইন্দ্রিয় গোচর বা অতীন্দ্রিয় জগৎ সবই ইনি। ইনিই একমাত্র অক্ষয় ব্রহ্ম। মোটের উপর বলিতে গেলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয় আর কিছু ছিল না। সব সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক’রেছিলেন। কিন্তু এতেও তিনি সন্তুষ্ট হ’তে পারলেন কই ? হৃদয় যেন আরও কিছু পাবার জন্য ব্যাকুল হ’ল। নয়ন এর চেয়েও সুন্দর কিছু দেখ্‌বার জন্য করুণ দৃষ্টিতে সেই বিশ্বরূপের দিকে চেয়ে থাকল। অর্জ্জুন আবার বল্‌লেন,—“অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা, ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনোমে।” অতএব হে জগন্নিবাস ! আমার সকল অপরাধ

ক্ষমা কর, এবং প্রসন্ন হ'য়ে আমায় সেই, চিরেপ্সিত নয়নাভিরাম চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখা দাও। আমার বড় ইচ্ছা তুমি আবার, কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং চতুর্ভুজেন রূপেন ভব। যদিও ভগবানের সকলরূপের সার এই বিশ্বরূপ তথাপি তিনি ঠিক্ বুঝতে পারেননি, কারণ যার যেমন শক্তি সে সেই রূপ বস্তু উপলব্ধি করতে পারে। মূর্খ পণ্ডিতকে, অজ্ঞানী জ্ঞানীকে, পাপী ধাৰ্ম্মিককে বা মানুষ দেবতাকে বুঝতে পারে না, যতক্ষণ না দেবতা মানুষী অবয়বের সহিত মানুষী ভাবে স্বপ্রকাশ হন। এর দ্বারাই আমাদের অবতারবাদ এবং ভগবানের নানারূপ লীলা-খেলার কথা এসে পড়ে। কিন্তু আপনার কথার উত্তর দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। অতএব সেই কথাই বলা যাক্।

এখন তাঁর ঈশভাবের ন্যায় আর একটি ভাবের উপাসনা আমরা করে থাকি। সেইটির নামই মধুর ভাব। এই ভাব সবসময়ই মাধুর্য্যময় এই ভাবে ভগবান প্রেমময়, আমরা সেই প্রেম-মধুর ভ্রমর। তিনি দীন-বন্ধু দয়াময়, আমরা দীন হীন ভিখারী ক্ষুদ্র মানুষ। তিনি বৃন্দাবনের রাখালরাজা, আমরা তাঁর সহচর শ্রীদাম সুদাম। তিনি প্রেমের রাজা গোপীর হরি বা শ্রীমতী রাধিকার জীবন-বল্লভ, আর আমরা অর্থাৎ প্রেম-পিপাসী মানুষ সেই প্রেমোন্মাদিনী রাধা এবং তাঁর সহচরী। এই কি আপনার বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা নয়? অবশ্য গীতায় আপনি এভাবের পরিপুষ্টি খুব কম দেখতে পাবেন। এর জন্য বিশেষ ক'রে আমরা বৈষ্ণব-শাস্ত্রের নিকটই ঋণী।

তার পর এই মাধুর্য্য ভাব উপলব্ধি করতে হ'লে আমাদিকে ভক্তি-পথের যাত্রী হ'তে হবে। আপনি যে, বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা বল্‌লেন, সেটা তাঁদের ভক্তির পূর্ণ পরিণতি বা পরমাভক্তি। এতে কোন কামনা নেই, কোন আবিলতা নেই—একেবারে তুলনা রহিত সুনির্ম্মল —'যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল'। বৈষ্ণব আচার্য্যের ভাষাতেই শুনুন এর স্বরূপ কি।

"প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

বৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড আর।
শর্করাসিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥"

এই হ'ল বৈষ্ণব সাহিত্যের রূপকছলে প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা এভাব গ্রহণ করিতে পারি না।

বিমল এতক্ষণ বিনয়ের এই ধীর ভাবে আলোচিত যুক্তিগুলি শুনিয়া আসিতেছিলেন। এবং বাস্তবিকই বিনয়ের সঙ্গে তাঁহার সকল মত না মিলিলেও মনে মনে তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। এতক্ষণে বিনয়ের ব্যাখ্যায় একটু বিরাম দেখিয়া বলিলেন,—"কেন ওর মধ্যে থেকে আবার আধ্যাত্মিক ভাব টেনে আনতে যাব কেন? আর রূপক অর্থই বা ধরব কেন? আপনি যখন আগেই বলেছেন যে, ভগবান মানুষের মধ্যে এসে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন সেটা সম্পূর্ণ তাদের মত ক'রেই; এই না? তাই যদি হয়, তবে এভাবত বড় সুন্দর! তবে মানুষ তার খাঁটি পার্থিব ভালবাসা থেকে উচ্চাবস্থা পাবেনা কেন? বৃন্দাবন লীলায় ত আমরা এ ভাবের ক্রমবিকাশ বেশ সুন্দর দেখ্‌তে পাই। শ্রীরাধিকা বা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণের দ্বারাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিল। শেষে তা থেকে মান অভিমান অবস্থার পর আপনহারা ভাব এলো। তারা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসেছিল, এবং তার প্রতিদান স্বরূপ তাঁর কাছ থেকেও কিছু আশা করেছিল। এমন কি কোন কোন সময় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর প্রতি অভিমান ভরে কত কথাই বল্‌তে শুনি।

এ সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে একেবারে আত্মহারা ভাব ছিল না। তাই শ্রীরাধিকার মুখে শুনি।

"কি কহসি মোহে নিদান্ত কহইতে দহই পরাণ॥
তেজলুঁ গুরুকুল সঙ্গ পূরল দুকূল কলঙ্ক॥"

এখনও কলঙ্কের ভয় বর্ত্তমান রয়েছে, যা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা আবার এই রাধিকাকেই বিরহাগ্নি জর্জ্জরিতা হয়েও যখন বলতে শুনি,

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি॥"

তখন বাস্তবিকই আর ধৈর্য্য রাখ্‌তে পারা যায় না। প্রাণ আকুল ক্রন্দনে ভ'রে উঠে। তখন আর এক পরিত্যক্তা অভাগিনীর জন্ম জন্মান্তরেও সেই পতিকামনার কথা মনে পড়ে। এখন আমার বক্তব্য,—যদি মানুষের জীবনে ঠিক তার স্বাভাবিক ব্যবহারের মধ্যেই এরূপ পবিত্রতম অবস্থা দেখাযায়, তবে কেন আমি তার একটা কষ্ট কল্পনা করতে যাব?"

বিনয়।—"না কষ্ট-কল্পনা করতে বলছি না ত! আমিও বলছি যে, এই স্বাভাবিক অবস্থা থেকেই আমাদের সেই পবিত্রতম অবস্থা লাভ ক'রতে হবে। তবে শ্রীরাধিকার যে উন্মাদ অবস্থাকে আপনি সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা বলতে চান, সেটা তার চেয়ে অনেক উচ্চ। আমি রাধিকার প্রেম-সাধনার প্রথম অবস্থার একটি হৃদয়োচ্ছ্বাস দ্বারা দেখাতে চাই—সাধারণ মানুষের কামনাকুল পঙ্কিল উন্মাদনা হ'তে সে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেবল নাম শুনেই তিনি বল্‌ছেন,—'না জানি কতেকমধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে।' শুধু কৃষ্ণ নামের প্রতিই যার আবেগ এত তীব্র, তাঁহার হৃদয় যে সেই —হৃদয় বল্লভকে জন্ম জন্মান্তরের আশা নিয়ে খুঁজেছে এটা যেন স্বাভাবিক। অর্থাৎ সাধনার অনেক নিম্নস্তর অতিক্রম ক'রে এবার যেন তিনি সিদ্ধি-লাভের জন্যই প্রস্তুত হ'য়ে এসেছেন। হৃদয় প্রেমেররাজাকে সেখানে বেঁধে রাখ্‌বার জন্য যোগ্যতা লাভ করেছে, এখন একবার দেখা পেলেই হয়। তা'লে 'আমার এ সব দুঃখ গেল হে দূরে, আমি হারান রতন পাইলাম কোলে' বলিয়া কত জনমের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না পবিত্রতম মিলনের আনন্দে ভাসাইয়া দিতে চান। এইত ভক্তের সহিত ভগবানের সাযুজ্য অবস্থা।

তারপর ভগবানের এই মধুর উপাসনা শুধু একদিকেই নিবদ্ধ নয়। অবশ্য এর সব দিকই এক ভক্তি-পথ নামে অভিহিত হ'তে পারে; কিন্তু শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত প্রভৃতি কয়টি শাখা আছে। ব্রজগোপীদের প্রেম-সাধনা এই কান্ত-প্রেমের অন্তর্গত। এ প্রেম

উপাসককে পাগল ক'রে তুলে। সে আত্মহারা না হ'য়ে আর পারে না। একটু চিন্তাশীল হ'য়ে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে হ'লেই ব'লতে হবে যে, সেই জগৎজীবন হরিকে স্বামী ভাবে পাবার সাধনাই বৈষ্ণব-ভক্ত চূড়ামণিগণ রূপকভাষায় বৃন্দাবন-লীলার অবতারণা করেছেন। আবার পতি পত্নী-ভাব অপেক্ষা আর একটা অবস্থা আছে সেটার ব্যাকুলতা একেবারে তীব্রতম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন,—'তাঁকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়। তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কাণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই চক্ষে তাঁর বাণী শুনা যায়। * * * এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমন হয়'। আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধিকার ঠিক এই অবস্থা। এ ভাবকে মহাভাব বল্‌তে পারেন। ইহাই আত্মদর্শন, বা আত্মা পরমাত্মার চিরমিলন। কিন্তু 'হৃদয়ে ঈশ্বরানুভব না হ'লে এ ভাব হয় না'। তাই স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা নিষেধ করেছিলেন। কারণ আমাদের 'মন প্রাণ কামিনী-কাঞ্চনের আবর্ত্তে দূর পাক খাচ্ছে, এ অবস্থায় আমরা তার মধ্য থেকে একটা পঙ্কিল ভাবই টেনে বের করব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, হাট ঘাট মাঠ রেল-ষ্টিমার সকল স্থানেই আজ কাল এই প্রেমের সাকার মূর্ত্তির আবির্ভাব হচ্ছে। আর আমরা গল্প উপন্যাস ইত্যাদির ভিতর দিয়ে তার পরিপুষ্টি সাধন কচ্ছি। শুধু তাই নয়, আবার অতীতের দোহাই দিতে ছাড়ি না।

এ সকল যুক্তি বিমলবাবুর বেশ মনঃপূত হইল না। তিনি একটু হতাশ ভাবেই বলিলেন, "কেমন ক'রেই বা অবিশ্বাস করি যে, আপনার বৈরাগ্যের আবেগ সবটাতেই একটা আধ্যাত্মিক ভাব টেনে আনতে চায়? হ'তে পারে,—যাঁরা ভক্ত তাঁরা সহজেই এ ভাব উপলব্ধি করবেন। সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারবে কেন? তারপর হাট-ঘাট-মাঠ, সকল স্থানেই যদি এইরূপ পবিত্র প্রেমের স্বরূপ দেখা যায়, তা হ'লেই বা ক্ষতি কি? সে ত মানুষের উন্নত অবস্থারই লক্ষণ!"

বিনয় এই কথা শুনিয়া একটু হাসিল। তারপর বেশ ধীর ভাবে

বলিল, "হাঁ অবশ্যই উন্নতাবস্থার লক্ষণ। কিন্তু আসলে যে তা নয় ভাই! আমরা জ্বলন্ত কামনার একটা কুরূপ মূর্ত্তিকেই প্রেমের অস্থায়ী সজ্জায় সাজান অবস্থায় দে'খে ভ্রমে পড়ি। নতুবা সেটা অত সস্তা নয়। * *" বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল এক নূতন আগন্তুকের আগমনে। সে আগন্তুক নরেন। বিনয় সহসা এরূপ অবস্থায় নরেনকে দেখিয়া প্রথমতঃ চমকাইয়া উঠিল, তারপর যেন ভয় মিশ্রিত স্বরে বলিল,—"খবর কি বলুন দেখি নরেন বাবু?" নরেন বলিল, —"আচ্ছা আপনার ভাবগুলির flow বন্ধ হোক, আপনি একটু সামলিয়ে নেন, তারপর সব বল্‌ছি। দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ নেই" বলিয়া সে বিনয়ের বিছানাটায় হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল।

* * *

হরিপুর আবার আজ কিসের আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। নব-মাধুরীময় উৎসব-মুখরিত হইয়া তার ক্ষুদ্র পুষ্প-বীথিকা, শাখা-বহুল বিহঙ্গ-সুখ-নিকেতন আম্র-পনস-বেল-তিন্তিড়ি-অশ্বত্থের কুঞ্জ-ভবনে মিলন-গীতির সাহানা রাগিনী বাজিয়া উঠিয়াছে। জড়—স্থবিরবালক বৃদ্ধ সেই আনন্দে গা ভাসাইয়া কর্ম্মে মাতিয়াছে। এখন দলে দলে লোক পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথী হইয়া নিজেকে সুখী মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ সমস্ত গ্রামখানি যেন এক পরিবার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাই কিশোরীমোহন বাবুর বাড়ীর উৎসব আজ সকলেরই উৎসব বলিয়া মনে হইতেছে। আজ আবার নূতন উৎসব, শান্তির-বিবাহ!

এবার বিবাহে আর কিশোরীমোহন বাবুর বিশেষ দায়িত্ব ছিল না, কারণ গোস্বামীপ্রভু এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই বিবাহে কর্ত্তৃত্বের ভার হাতে লইয়াছিলেন। যে কন্যার বিবাহের একবার লগ্ন-ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার আর নূতন বিবাহ হইতে পারে কি না এ প্রশ্ন কেহই তুলিলেন না। যদিও সেবার অন্যান্য অনুষ্ঠান সবই হইয়াছিল, কেবল দানের কাজই বাকী ছিল। তথাপি ওরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ দেওয়া কিশোরী-মোহন বাবুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, তাই সে সব কথা মনেও স্থান

দিলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"সেটা মস্ত একটা কুলগ্ন ছিল, গিয়েছে বেশ ভালই হয়েছে। সে জন্য চিন্তা করবার কোন কারণ নেই। যদি মানব-শাস্ত্র-বিধি না দেয় তাহ'লেও আজ আমরা দুই জন বিধি দিচ্ছি চিন্তার কোনও কারণ নেই।" বলা বাহুল্য কিশোরীমোহন বাবু সেরূপ কোন বিধি-ব্যবস্থার অপেক্ষা করিতেছিলেন না। তবে একটা কথা তাঁহার হৃদয়ে বড় আঘাত দিতেছিল, সেটা শান্তির মায়ের কথা। কি অব্যক্ত বেদনা লইয়া সে গিয়াছে সে কথা আজ তাঁহার বুকে যেন আগুণের অক্ষরে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন না সে থাক্‌লে সুখী হইতে পারিত কি না; কিন্তু এতটা দুঃখ থাকিত না সেটা অবশ্যই সত্য। একবার তিনি তাঁহার পরলোকস্থিত আত্মার উদ্দেশে হৃদয়ের কথা জানাইলেন, মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আবার সাম্‌লাইয়া লইয়া কার্য্যে মন দিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের সব প্রস্তুত হইতে লাগিল, দিনও নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল। নরেন বিনয়ের কাছে যাইয়া পত্র লিখিয়াছে যে, আমি শীঘ্রই তাহাকে লইয়া যাইতেছি আপনারা প্রস্তুত হউন। শান্তি সব খবর পরোক্ষভাবে শুনিল, কিন্তু তাহার মনের ভাব যাহাতে অন্য কেহ বুঝিতে না পারে সে জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে লাগিল। কিশোরীমোহনবাবুর মনে এবার কোন প্রকার সন্দেহের ছায়া ছিল না তাই তিনি এ সম্বন্ধে কোন উচ্চ-বাক্য করিলেন না। কিন্তু গুরুদেব সে প্রদেশের খবর লইয়া কিশোরীবাবুকে বলিয়া আরও নিশ্চিন্ত করিলেন।

শান্তি এখন সকলেরই কাছে নিজেকে এরূপ ভাবে গোপন করিতে চায়, যেন সে একটা অন্যায় করিয়াছে। অথচ সে নিজেই ঠিক বুঝিতে পারে না কেন এ সঙ্কোচ-ভাব? এইরূপ ভাবে নানারূপ কাল্পনিক অসার চিন্তা-সমুদ্রে পাড়ি দিয়া এই কয়দিনের মধ্যে নিজেকে অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর করিয়া তুলিল। একদিন ভাবিল,—এ কল্পনা যদি শূন্যে মিলাইয়া যায়? তার উত্তর নিজেই দিল। "ক্ষতি কি? আমি ত যেমন আছি—তেমনিই থাকব, তাতে জগতের কি আসে যায়? আবার

কখন বা ভাবিল—এ কি বিড়ম্বনা ? আমার যে সুখ ছিল তার চেয়ে এ বেশী ? যাক্ মাথা মুণ্ডু আর ভাব্‌তে পারি না"। বলিয়া বৃথা চেষ্টা করিয়া একটার পর একটা কাজ আরম্ভ আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিত্যাগ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

এদিকে বিনয়ের বৈরাগ্যের টান হইতে তাহাকে-ফিরাইয়া আনিতে নরেন ও বিমল বাবুর কয়দিন অতিবাহিত হইল তাহার ঠিক হিসাব না থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট দিনের অনেক আগেই তাহারা হরিপুরে পৌছিল। বিমল বাবুও সঙ্গে আসিয়া একটু আমোদ উপভোগের লোভ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। বাড়ীতে আসিবা মাত্র কিশোরীমোহনবাবু তাহাদিগকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী গিয়া প্রণাম করিয়া আসিতে বলিলেন। বিনয় যদিও নরেনের কাছে সব কথাই শুনিয়াছিল, তথাপি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াই সেখানে গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন একটা ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতেছিলেন। নরেন ও বিনয়কে দেখিয়াই সহাস্য বদনে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে আসিলেন,—ইহারও তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই বলিলেন,—"বাবা ! আজ এই নরাধম না থাক্‌লে কি আর বিনয় মাষ্টারকে বিদেয় দিয়ে অধ্যাপক বিনয়ভূষণকে ফিরিয়ে পেত কেউ। অমঙ্গলের ভিতর দিয়েই মানুষ যেমন মঙ্গলকে পায় আমি সেই রকমের একটা কুগ্রহ। যাই হোক কুগ্রহের রূপ আজ বদ্‌লিয়ে গিয়েছে বাবা ! আর ভয় নেই। কিশোরী সত্য সত্যই আমাকে হত্যা ক'রে সেই উপাদানে নূতন গ'ড়ে নিয়েছে,—এত শক্তি তার আছে আমি অস্বীকার করতে পারব না। যাও একবার গ্রামের চারিদিকে ঘুরে এস।" বলিয়া তিনি আবার ফর্দ্দটায় মনোযোগ দিলেন। তাহারা দুই জনে গ্রামের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল।

কথা-প্রসঙ্গে বিনয় বলিল,—"আমার ইচ্ছা ছিল যে, পূর্ব্ব কথার কোন আভাষই যাতে না উঠে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব ; কিন্তু দেখ্‌লাম যে স্মৃতি এখনও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পোড়াচ্ছে। যাই হোক্ খাঁটি সোনা পুড়ে উজ্জ্বলই হয়, সুতরাং সুখের বিষয়ই বটে"। নরেন

বলিল,—"আজকাল তিনি খুব প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করেছেন। এখন আচণ্ডাল সব বাড়ীতেই তাঁর পদধূলি পড়ে"। এইরূপ নানা কথা-বার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়াই গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিল। রাস্তায় যাহার সহিত দেখা হইল, সেই বিনয়কে অভ্যর্থনা করিল। বিনয় দেখিল এই খাঁটি মানুষটির সংস্পর্শে আসিয়া তার যে জিনিস লাভ হয়েছে তার মূল্য দেওয়া যায় না। আর দেখিল গ্রামের অপূর্ব্ব শ্রী। আকাশ বাতাস বৃক্ষ-লতায় পর্য্যন্ত উৎসাহের হাসি মাথান রহিয়াছে। গ্রামে অনেক কিছু নূতন হইয়াছে। আপাততঃ ছইস্থানে দুইটি প্রকাণ্ড ইঁদারা আরম্ভ হইয়াছে, কত লোক-জন খাটিতেছে, শুধু তাহাই নয় কত প্রকার কুটীর-শিল্পের পুনর্জীবন দান করিয়া গরীবের অন্ন সংস্থানের যোগাড় পর্য্যন্ত হইয়াছে।

গ্রামে যে কয়ঘর জোলা-তাঁতি ছিল তাহাদের এখন আর অবসর নাই, রাত্রিতেও কাজ করিতে হইতেছে; অথচ শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই নূতন বলে বলীয়ান। প্রত্যেক বাড়ীর পিছনেই বাস্তু সংলগ্ন পতিত জমিতে, যেখানে বর্ষাকালে কেহ কেহ শাক সব্জী লাগাইত বা ঘাস জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া থাকিত সেখানে জটা কাপাসের গাছ লাগাইবার যোগাড় হইতেছে, ছুতারেরা আবার সেই পল্লী-জননীর চিরন্তন যন্ত্র-পাতি নির্ম্মাণে অবিরত পরিশ্রম করিতেছে। তবে স্কুলটির উন্নতি সাধন বিশেষ কিছু হয় নাই, কেবল সূচনা হইতেছে। ইতিমধ্যে সেবক-সমিতির সভ্যেরা দুই অধ্যাপককে ধরিয়া তাহাদের আড্ডায় লইয়া গেল, এবং তাহাদের করণীয় প্রত্যেকটি কার্য্যের পুঙ্খাণুপুঙ্খ বিবরণ বলিয়া একটি খাতা আনিয়া সম্মুখে ধরিল। বলা বাহুল্য বিনয়ের তখন আর আনন্দের পরিসীমা ছিল না; কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ এ আনন্দের মধ্যে তার অংশ কোথায়? যাহা হউক তাড়াতাড়ি একটা কি লিখিয়া ফেলিল। সভ্যদের সকলেই উৎসুক হইয়া কলমের দিকে চাহিয়াছিল,—তা সত্বেও বেশ স্পষ্ট ভাবে সবাই অঙ্কটির স্বরূপ বুঝিতে পারিল না; তবে তার মধ্যে অন্ততঃ দুইটী শূন্য ছিল এটা সকলেই বুঝিল।

* * * * * *

আজ বিবাহের আসরে আর লোক ধরে না। কিশোরীমোহন বাবু ছোট বড় সকলেরই জন্য আসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ—কায়স্থ—নব শাখা সকলেরই প্রায় স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিল। বরপক্ষের পুরোহিত বসিয়াছেন স্বয়ং ব্রজমোহন গোস্বামী আর কন্যাপক্ষে বিনোদবিহারী ন্যায়রত্ন। বিবাহ-সভায় পণ্ডিতদের তর্ক নাকি একটা কৌলিক প্রথা; সেইজন্য কন্যাপক্ষের পুরোহিত মহাশয় দাঁড়াইয়া জোড় হাতে পাত্রপক্ষের পুরোহিত ও অভিভাবককে বলিলেন,—"যদি অনুমতি হয়ত কন্যা পাত্রস্থ করি; কারণ শুভ লগ্ন উপস্থিত। গোস্বামী অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"কড়ায় গণ্ডায় দেনা পাওনা বুঝে নেব—তারপর বিবাহের কথা। এ কি অন্যায়? আমার জ্যান্ত কুলীনের ছেলে এ কি একেবারে সস্তায় ছেড়ে দেব নাকি?" বলে মস্ত একটা হাসির রোল উঠিল।

ইত্যবসরে সালঙ্কারা কন্যা সভাস্থ হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুভদৃষ্টি করছিলেন। অমনি হারমোনিয়ম সহযোগে অপরিচিত কণ্ঠ গাহিয়া উঠিল,—"বহুদিন পরে বঁধুয়া আসিলে দেখা না হইতে পরাণ গেল। * * এখন কোকিলা আসিয়া করুক গান আর ভ্রমরা ধরুক তাহারই তান; আজি মলয় পবন বহুক মন্দ—গগনে উদয় হউক চন্দ্র। আজি কোটি চন্দ্রের উদয় হয় হে"। সকলেরই প্রাণ পুলকে আকুল হইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয়ের ভাবময় হৃদয় চঞ্চল হইয়া চক্ষু সজল হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাবিধি মন্ত্র পড়াইলেন, আজ তাঁর সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ মিশান ছিল বলিয়া আজিকার সামগান যেন সকলেরই কাণে মধু বর্ষণ করিয়া দিল। অতঃপর দান গ্রহণান্তর বর-কন্যা উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরিচিত নূতন কণ্ঠ বলিয়া উঠিল,—"বৌদিদি আমাদের বৈরাগী ঠাকুরটীকে একটু ভাল ক'রে বেঁধে রাখ্‌বেন, কারণ তাঁর পালিয়ে যাওয়া রোগটি এখনও সারেনি—তার সাক্ষী আমি। বিনয় বুঝিল—এ বিমল বাবু। লজ্জায় তার মুখ লাল হইয়া উঠিল। অপরিচিত কণ্ঠ অমনি গান ধরিল,—

জগতে জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে,—
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়ার মাঝে।
রয়েছ তুমি একথা কবে হৃদয় মাঝে সহজ হবে,—
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে।

সমাপ্ত

—শ্রীঅজিতনাথ সরকার

সংগীত

পণ্ডিত অহোবল তাঁহার সঙ্গীত পারিজাত নামক গ্রন্থারম্ভে ছন্দোময় গরুত্মন্তমারূঢ় পারিজাত-হরির স্মরণ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে সঙ্গীতের স্থান নির্দ্দেশের জন্য নারদের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

অতঃপর ভাগবতের—

গায়ন্ সুভদ্রানি রথাঙ্গ পানে
জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থিকানি
গায়ন্ বিলজ্জোবিচরেদসঙ্গ॥　১১।৩।৩৯

এই সকল শ্লোকের উদ্ধারের কারণ অস্মদীয় প্রাচীন সমাজের একটি প্রথা ছিল যাহা কিছু আমাদের কৃত তাহা সজ্জন গৃহীত হওয়া চাই। ইহার বিরুদ্ধে অতি আধুনিকেরা বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমানে কত নূতনের আবিষ্কার চলিতেছে এবং প্রত্যেক তথ্যটি যদি প্রাচীনপন্থীদের সম্মত হইল কি না দেখিতে যাই তাহা হইলে মানবজ্ঞানের ক্রমোবিকাশ ও

প্রাণস্পন্দনকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরকালের জন্য একেবারে অজ্ঞানগর্ভে সমাহিত করিয়াই ফেলিতে হয়। পক্ষান্তরে চিন্তাশীলেরা বলেন, সভ্যতার গাঙ্গোত্রি হইতে আমরা অনেকদূর সমুদ্রেরদিকে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের আদিমকালের দিকে উজাইয়া যাইবার উপায় নাই সত্য কিন্তু জ্ঞান-গঙ্গা যদি তাহার উৎপত্তি হইতে সঙ্গমের মধ্যে বহুধা খণ্ডিত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে কি আর অফুরন্ত স্রোতস্বিনী বলিতে পারিব ? তখন তাহাকে বলিতে হইবে কূপ, তড়াগ, বিল, খাল, ডোবা, পানাপুকুর। সত্য বটে, সকল দেশ অপেক্ষা স্বদেশের প্রতিই মানবের মমত্বাধিক্য হয় সেইরূপ স্বসময়ের প্রতিও তাহার একটু প্রীতির আধিক্য জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জাতীয় সভ্যতার অখণ্ডধারাকে বজায় রাখিতে হইলে প্রাচীন আপ্ত বা আর্ষকে নবীনের মানিয়া চলিতেই হইবে,—তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইতেই হইবে।

* * * * *

দেশ যখন অধঃপতিত হয় তখন সব দিকেই তাহার ব্যভিচার ঘটে। বাঙ্গলার নবজাগরণের পূর্ব্বে সহজ সরল বলপ্রদ বৈদান্তিক ধর্ম্মকে যেমন এককালে আমরা দুরূহ কঠিন বলিয়া একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দেশাচার, কুলাচার ও স্ত্রীআচারকে কতকগুলি অতিমাত্র ভাব-প্রবণ ব্যবহারের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধর্ম্ম বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম অথবা বিদেশীর রজোগুণের প্রভাবে মুহ্যমান হইয়া বিজাতীয় অশুদ্ধ, পঙ্কিল পল্বল হইতে ভাবধারা সংগ্রহ করিয়া দেশীয় ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—সংগীত সম্বন্ধেও আমাদের ঠিক সেই চেষ্টারই স্ফুরণ হইয়াছিল। তাই স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একেত এই dyspeptic রোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন ? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে—গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাবি, দেখ্‌বি, খোল্ করতালই বাজ্‌ছে ! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না ?—তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না ? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ

ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়ে মানুষী বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে, দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে?—কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্র তালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর' 'মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত করতে হবে। যে সব musicএ মানুষের soft feelings উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছু দিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে, ধ্রুপদ গান শুন্তে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ সঞ্চার করাতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে।"

* * * * *

ব্যাকরণের সিংহদ্বার অতিক্রমের ভয়ে যেমন আমরা সংস্কৃত পড়া ছাড়িয়া দিয়াছি তেমনি শ্রুতি, স্বরসমাবেশ, তাল-মান লয়ের ভয়ে আমরা "সঙ্গীতের মুক্তি কামনা" করিতেছি আর দেশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মনের তারল্যকে সুরে প্রতিফলিত করিবার জন্য মোক্ষমার্গীয় ধ্রুপদকে ত্যাগ করিয়া খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীর অবতারণা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি এবং আধুনিক বিদেশী-স্বদেশী স্বরের জগা খিঁচুড়ি থেয়েটারী সঙ্গীতকেই একমাত্র উপাদেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে উদ্যত তথা বিদেশীয় বাদ্য যন্ত্রের অপচার হারমোনিয়ম, অস্মদ্দেশীয় বীণ প্রভৃতির স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। হারমোনিয়াম, পিয়ানো বা অরগ্যান যতই সম্পূর্ণ হোক কিন্তু সারস্বত, ষড়ঙ্গ, রুদ্র, নারদ কার্ত্তিকেয় বীণের তুলনায় ফোটো ও অঙ্কিত চিত্রে যে প্রভেদ তাহাই চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। সংগীতের মধ্যে যে বাদ্য যন্ত্রের অবতারণা করিতে হইতেছে তাহার কারণ আমাদের

গীতবাদ্য নৃত্যত্রয়ং নাট্যং তৌর্য্যত্রিকঞ্চ তৎ

শাস্ত্রমতে—সঙ্গীতং প্রেক্ষণার্থেঽস্মিন শাস্ত্রোক্তে নাট্য-ধর্ম্মিকা॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ॥

নাট্য-ধর্ম্মে তিনটি অঙ্গ—গীত, বাদ্য এবং নৃত্য। মতান্তরে—

গীতবাদিত্রনৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।
গানস্যাত্র প্রধানত্বাৎ তৎ সঙ্গীতমিতীরিতম্॥
সঙ্গীত পারিজাতঃ॥ ২০॥

গীত বাদিত্র নৃত্য এই তিনকে সঙ্গীত বলে, কিন্তু গানের প্রধানত্ব হেতু তাহাকেই সঙ্গীত শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা হইয়া থাকে।

* * * *

সংগীত সময়ে এক স্বর হইতে স্বরান্তরে গমন কালে (যথা নি হইতে সা বা সা হইতে রে পর্দ্দায় উঠিবার সময়) উভয়ের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম স্বরাংশ সকল শ্রুত হয় ইহারাই সংগীত শাস্ত্রে শ্রুতি বলিয়া পরিচিত। যে গীত বা বাদিত্রে শ্রুতি সমধিক প্রকট সেই সংগীত বা যন্ত্র তত সুমধুর এবং পূর্ণ। হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রে ইহার প্রকাশ আদৌ নাই, কাজে কাজেই উহারা সংগীতশাস্ত্রের আদৌ উপকরণ নহে, পরন্তু উহা কর্ণকে ধীরে ধীরে শ্রুতিস্বর গ্রহণে একেবারে অপটু করিয়া তুলে। এ শ্রুতি সমষ্টি সংগীত দামোদর মতে—

	শ্রুতি সংখ্যা
ষড়জে (সা)	নন্দী, বিশালা, সুমুখী, বিচিত্রা
ঋষভে (রে)	চিত্রা, ঘণা, চালনিকা
গান্ধারে (গা)	মালা, সরসা
মধ্যমে (মা)	মাতঙ্গী, মাধবী, মৈত্রী, শিবা
পঞ্চমে (পা)	কলা, কলরবা, বালা, শার্ঙ্গরবী
ধৈবতে (ধা)	জায়া, অমৃতা, রসা
নিষদে (নি)	মাত্রা, মধুকরী,

এই মত ভরতের, কারণ উক্ত গ্রন্থকার এই ২২টি শ্রুতিকে "মতো মুনীন্দ্রেন ভরতেন" বলিতেছেন।

কিন্তু সঙ্গীত রত্নাকর যে নারদীয় মত উল্লেখ করিতেছেন তাহা অন্যরূপ। যথা—

তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দা ছন্দোবত্যস্তু ষড়জগাঃ।
দয়াবতী রঞ্জনী চ রতিকা ঋষভে স্থিতাঃ॥

রৌদ্রী ক্রোধা চ গান্ধারে বজ্রিকাথ প্রসারিণী ।
প্রীতিশ্চ মার্জ্জনীত্যেতাঃ শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ ॥
ক্ষিতিরক্তা চ সন্দীপিন্যালাপী চৈব পঞ্চমে ।
মন্দন্তী রোহিণী রম্যেত্যেতা ধৈবত সংশ্রয়াঃ ॥
উগ্রা চ ক্ষোভিনীতি দ্বে নিষাদে বসতঃ শ্রুতি ॥

এবং ইহা সংগীত পারিজাতেরও মত (৪৩-৪৬)

*　　*　　*　　*　　*

সপ্তস্বরকে ষড়জাদি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে কেন ? বক্ষ, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, নাসিকা ও দন্ত সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ষড়জ (সা)। ঋষভের ন্যায় শব্দ বলিয়া ঋষভ (রে)। নাভি, কণ্ঠ ও মস্তকে সমাহত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের সুখোৎপাদক বলিয়া গান্ধার (গা)। নাভি হইতে আরম্ভ হইয়া হৃদয় বা মধ্যস্থলে সমাহত হয় বলিয়া মধ্যম। নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, শির সংযোগে সমুদ্ভূত বলিয়া পঞ্চম (পা)। নাভি, হৃদি, কণ্ঠ, তালু এবং শিরে ধৃত হয় বলিয়া ধৈবৎ (ধা)। নাভি হইতে উঠিয়া কণ্ঠ, তালু, শিরোসংযোগে নিষন্ন (স্থিত) হয় বলিয়া নিষাদ (নি) নামে খ্যাত। (সংগীত-সার)।

ভরত মতে প্রাণীজগতের শব্দাবলীতে এই বিশেষ স্বর সকল শ্রুত হয়। যথা—

ষড়জ রৌতি ময়ূরো হি গাবোনর্দ্দন্তি চর্ষভম্ ।
অজাবিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চো নদতি মধ্যমম্ ॥
পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলো রৌতি পঞ্চমম্ ।
অশ্বশ্চ ধৈবতং রৌতি নিষাদং রৌতি কুঞ্জরঃ ॥

(সঙ্গীত-দর্পণম্)

কিন্তু কাহারও কাহারও মতে—

ঋষভং চাতকো বাক্তি ধৈবতঞ্চাপি দর্দ্দুরঃ ।

*　　*　　*　　*　　*

ইহা ছাড়া ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রত্যেক স্বরের এক একটি দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে। যথা,—

বহ্নি ব্রহ্ম স্বরস্বত্যঃ সর্ব্ব শ্রীশগণেশ্বরাং।
সহস্রাংশুরিতি প্রোক্তাঃ ক্রমাৎ ষড়জাদি দেবতাঃ ॥
(সংগীত দর্পণম্)

এবং প্রত্যেক স্বরের দ্রষ্টা ঋষিও আছেন। যথা—

অগ্নি ব্রহ্মা মৃগাঙ্কশ্চ লক্ষ্মীশো নারদো মুনিঃ।
তুম্বুরু ধনদশ্চেতি তে সপ্ত স্বরদর্শিনঃ ॥ (সংগীত পারিজাত)

রত্নাবলীমতে ঋগ্বেদ হইতে ষড়য ঋষভ, যজুর্ব্বেদ হইতে মধ্যম ও ধৈবত, সামবেদ হইতে গান্ধার ও পঞ্চম আর অথর্ব্ব বেদ হইতে নিষাদের জন্ম। এইরূপ ইহাদের কুল, জাতি, বর্ণ ও রসেরও বিভাগ আছে। এই সকল যদি আমরা কলিত করি তাহা হইলে এইরূপ হয়—

স্বর	সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	বিকৃত
উৎপত্তি	ময়ূর	বৃষ	ছাগ	সারস	কোকিল	অশ্ব	হস্তী	
† দেবতা	অগ্নি	ব্রহ্মা	সরস্বতী	শিব	বিষ্ণু	গণেশ	সূর্য্য	
† ঋষি	ঐ	ঐ	চন্দ্র	বিষ্ণু	নারদ	তুম্বুরু	কুবের	
* বেদ	ঋক	ঋক্	সাম	যজুঃ	সাম	যজুঃ	অথর্ব্ব	
‡ কুল	দেব	মুনি	দেব	দেব	পিতৃ	মুনি	অসুর	
* জাতি	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	শূদ্র
* বর্ণ	কমল	পিঞ্জর (নীল)	হাটক (ধূসর)	কুন্দ	শ্যাম	পীত	বাব্বুর (বিচিত্র)	
* ছন্দঃ	অনুষ্টুপ	গায়ত্রী	ত্রিষ্টুপ	বৃহতী	পংক্তি	উষ্ণিক	জগতী	
* রস	বীর অদ্ভুত রৌদ্র	বীর অদ্ভুত রৌদ্র	করুণ	হাস্য আদি	হাস্য আদি	ভয়ানক বিভৎস	করুণ	

† সংগীত-দর্পণম্
* সংগীত-পারিজাতঃ (৮৪—৯৩)
‡ রত্নাবলী

অথ গ্রামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বর সন্দোহরূপিনঃ
ষড়জ, মধ্যম, গান্ধার সঞ্জাভিস্তে সমন্বিতা ॥

(সঙ্গীত-দর্পণ)

ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রে গ্রাম তিনটি ষড়জ, মধ্যম এবং গান্ধার। যে কোনও স্বরকে ষড়জ করিয়া যে স্বর সকল পাওয়া যায় তাহাকে ষড়জ গ্রাম বলা যায়। যদি সেই গ্রামের মধ্যমকে সা ধরা যায় এবং যে স্বর পাওয়া যায় তাহাকে মধ্যম গ্রাম বলে এবং ষড়জ গ্রামের গান্ধারকে সা ধরা যায় এবং যে সকল স্বর পর পর অবলম্বন করিতে হয় তাহাকে গান্ধার গ্রাম বলে।

সা গ্রাম হইতে সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটি স্বর (Dominant Seventh) পাওয়া যায়। মা গ্রামে কেবল মাত্র একটি নূতন স্বর আমরা প্রাপ্ত হই উহা নিষাদ কোমল (নি)। উহার বাদ বাকি ছয়টি স্বর আমরা সা গ্রামেই প্রাপ্ত হই। গা গ্রাম হইতে আমরা আরও চারিটি নূতন স্বর প্রাপ্ত হই কড়ি মধ্যম (হ্মা), গান্ধার কোমল (জ্ঞা), ঋষভ কোমল (ঋ) এবং ধৈবত কোমল (দা)। ইহার বাকি দুইটি স্বর ষড়জ গ্রামেই পাওয়া যায়। তাহা হইলে শুদ্ধ ৭ + কোমল ৪ + কড়ি ১ = ১২টি স্বর সর্ব্ব সমেত আমরা প্রাপ্ত হই। যতই খাদে গাও আর যতই চড়ায় গাও এই দ্বাদশ স্বরকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই।

* * * *

আরোহশ্চাবরোহশ্চ স্বরাণাং জায়তে সদা
তাং মূর্চ্ছনা তদা লোকে আহুর্গ্রামাশ্রয়ং বুধাঃ ॥

(সংগীত পারিজাত ১০৩)

গ্রামত্রয়কে অবলম্বন করিয়া স্বরাবলীর ক্রমে ক্রমে আরোহণ ও অবরোহণকে মূর্চ্ছনা (Slid) বলে।

চতুর্বিধঃ স্বরোবাদী সংবাদী চ বিবাগ্যপি
অনুবাদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুল স্বর ॥

(সংগীত রত্নাকর)

কোন রাগ-রাগিণীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত স্বর বাদী, তাহা

অপেক্ষা কম সংবাদী, তাহা অপেক্ষা কম অনুবাদী এবং যাহা একেবারেই লাগে না তাহা বিবাদী। বাদী রাজা, সংবাদী মন্ত্রী, বিবাদী বৈরী, অনুবাদী ভৃত্য।

(সংগীত দর্পণম্)

গ্রহ স্বরাঃ সা ইত্যুক্তা যো গীতাদৌ সমর্পিতা.
ন্যাস স্বরাস্থ সা প্রোক্তা যো গীতাদি সমাপ্তিকা।
যো ব্যক্তি ব্যঞ্জকো গানে, যস্য সর্ব্বেঽনুগামিনা
যস্য সর্ব্বত্র প্রাবল্যং বাদী অংশোপি নৃপোত্তমা॥

(সংগীত নারায়ণ)

যে স্বরে সংগীত আরম্ভ হয় তাহাকে গ্রহ (Beginning) বলে। যে স্বরে শেষ হয় তাহাকে ন্যাস (Final Cadence or Half Cadence) বলে। অপর স্বর যাহার অনুগামী, যাহা রাগের বঞ্জ্যক এবং প্রাণ তাহাকে বাদী বা অংশ (Primal) বলে।

* * * *

সংগীতদর্পণের মতে নটরাজ শিবের পঞ্চ বক্ত্র হইতে পাঁচটি এবং পার্ব্বতীর মুখ কমল হইতে একটি, সর্ব্ব সমেত ছয়টি প্রধান রাগ নির্গত হয়। সদ্যোবক্ত্র হইতে শ্রীরাগ, বামদেব হইতে বসন্ত, অঘোর হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম এবং ঈশানাখ্য বদন হইতে মেঘ রাগের উৎপত্তি হয় এবং দেবীর মুখ কমল হইতে নটনারায়ণ জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মা এই ছয়রাগ শিবের নিকট শিক্ষা করেন এবং তিনি প্রত্যেক রাগের ছয়টি করিয়া ছত্রিশটি পত্নী বা রাগিনী কল্পনা করেন। পরে অপরাপর সংগীতশাস্ত্র আলোচনা করিয়া বুঝা যায় যে নারদ, রম্ভা, তুম্বুরু, হা হা হু-হু, কম্বলাশ্বতর, রাবণ, হনুমান, শার্দ্দুল, কোহল, ভরত, বাণ-পুত্রী উষা, ফাল্গুন প্রভৃতি সংগীতবিদেরা নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

* * * *

এক্ষণে চারিটি মত খুব প্রবল। সংগীত সম্বন্ধে শব্দঃকল্পদ্রুম বলিতেছেন যে 'নৃত্যগীতবাদ্যস্য শাস্ত্রম্। তত্তু সোমেশ্বর-ভরত-হনুমৎ-কল্লিনাথ মত ভেদাৎ চতুর্ব্বিধান। তস্য অধ্যায়াঃ সপ্ত—স্বরাধ্যায়ঃ, রাগাধ্যায়ঃ,

তালাধ্যায়ঃ, নৃত্যাধ্যায়ঃ, ভাবাধ্যায়ঃ, কোকাধ্যায়ঃ, হস্ত্যাধ্যায়শ্চ। ভরত ও হনুমন্মতে রাগ ছয়টি (ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘ) এবং প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া রাগিনী। কিন্তু কল্লিনাথ ও সোমেশ্বর মতে রাগ ছয়টি (শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ ও নটনারায়ণ) এবং প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া রাগিণী। ক্রমে শেষাচার্য্যগণ প্রতি রাগের ছয়টি করিয়া পুত্র, ছয়টি করিয়া পুত্র বধূ এবং প্রত্যেক রাগিণীর ছয়টি করিয়া সখীর কল্পনা করিয়াছেন।

রাগ		৬
রাগিনী		৬×৬=৩৬
পুত্র (উপরাগ)		৬×৬=৩৬
পুত্র বধূ (উপরাগিণী)		৬×৬=৩৬
সখী	"	৬×৬=৩৬

সর্ব্বসমেত ১৫০ রাগ-রাগিণী

মিশ্রণ রহিত রাগকে শুদ্ধ বলে। দুইটি রাগ মিশ্রণে যাহার উৎপত্তি তাহাকে ছায়ালগ বা সালঙ্ক বলে। দুইয়ের অধিক রাগ মিশ্রণে যাহার উৎপত্তি তাহাকে সঙ্কীর্ণ বলে। এই রাগরাগিণী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—

ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তা স্বরৈঃ ষড়্ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগজাতিস্ত্রিধা মতঃ॥

(সং, রত্নকর)

পাঁচটি স্বর সাহায্যে যাহা গেয় তাহাকে ঔড়ব (Pentatonic Scale), ছয়টি স্বর সাহায্যে যাহা গীত হয় তাহাকে ষাড়ব (Hexatonic Scale), সাতটি স্বর যাহাতে লাগে তাহাকে সম্পূর্ণ (Diatonic Scale) বলে।

* * * *

সংগীত-দর্পণ মতে রাগিণী-সহিত ভৈরব গ্রীষ্মে, মেঘ বর্ষায়, পঞ্চম শরতে, নটনারায়ণ হেমন্তে, শ্রীরাগ শীতে, বসন্ত বসন্তে গেয়। উক্ত শাস্ত্র মতে রাগ রাগিণী নিম্ন লিখিত মতে সাজান যাইতে পারে—

ভৈরব	মেঘ	পঞ্চম	নটনারায়ণ	শ্রী	বসন্ত

ভৈরবী	সৌরটী	পঠমঞ্জরী	কল্যাণী	গৌরী	তোড়িকা
গুর্জ্জরী	মল্লারী	বিভাষা	কামোদী	মালশ্রী	দেশী
রামকেলী	সাবেরী	ভূপালী	আভিরী	ত্রিবেণী	দেবগিরী
গুণ-কেলী	কৌশিকী	কর্ণাটী	নাটিকা	কেদারী	বৈরাটী
বাঙ্গালী	গান্ধারী	বড়হংসিকা	সারঙ্গী	মধু-মাধবী	ললিতা
সৈন্ধবী	হর-শৃঙ্গারা	মালবী	হাম্বিরা	পাহাড়িকা	হিন্দোলা

রাগরাগিণীর বিভাগ সম্বন্ধে কোনও সংগীতাচার্য্যের সহিত কাহারও মিলে না। একজনের নিকট যাহা রাগ অপরের নিকট তাহা রাগিণী। এবং হনুমন্ ও ভরত মতে ছয় রাগের পাঁচটি করিয়া রাগিণী। সেই জন্য আমরা বর্ত্তমানে প্রচলিত সংগীত-দর্পণের মতে রাগ-রাগিণী বিভাগ করিয়াছি। ইহা ছাড়া চারিজন আচার্য্য হইতে যে সকল প্রচলিত উপরাগ (রাগ পুত্র) ও উপরাগিণী (রাগপুত্রী ও সখী) সংগ্রহ করা যায় তাহাও আমরা দিতেছি—তিলক, পুরীয়, সুহ, বেলাবলী, দেবশাখ, মালকোষ, শ্যাম, সোহিনী, ধানশ্রী, মালশ্রী, আশাবরী, কৌমারী, শঙ্করাভরণ, মুলতানী, সাহানা, পরজ, ককুভ, পূর্ব্বী, বেহাগরা, কাফী। ইহা ছাড়া মুসলমানেরাও অনেক রাগ-রাগিণীর বিস্তার করিয়াছেন।

* * * *

ছয়টি রাগ ও তাহাদের ছয়টি প্রধান রাগিণীর রূপবর্ণনা করিয়া আমরা বর্ত্তমানে এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

১। গঙ্গাধরঃ শশিকলা তিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসঃ।
ভাস্বত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব রাগ রাজঃ॥ (হনুমৎ)

গঙ্গাধর, শশিকলা তিলক, ত্রিনেত্র, সর্প এবং গজচর্ম্মে বিভূষিত তনু উজ্জ্বল ত্রিশূল ও নৃমুণ্ডধারী, শুভ্রাম্বর রাগরাজ ভৈরব জয় যুক্ত হউন।

স্ফটিক রচিত পীঠে রম্য কৈলাস শৃঙ্গে
বিকচ কমল পত্রৈরর্চ্চয়ন্তী মহেশম্।

করধৃত ঘনবাদ্যা পীতবর্ণায়তাক্ষী
সুকবিভিরিয়মুক্তা ভৈরবী ভৈরব-স্ত্রী ॥ (হনুমৎ)

রম্যকৈলাস পর্ব্বতে স্ফটিক পীঠে পীতবর্ণ আয়তাক্ষী করধৃত-ঘণ্টা বাদনরতা বিকচ কমল পত্রের দ্বারা মহেশের পূজাপরায়ণা দেবীকে সুকবিগণ ভৈরব রাগের ভৈরবী স্ত্রী বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

২। নীলোৎপলাভবপুরিন্দু সমান বক্ত্রঃ
পীতাম্বরস্তৃষিত চাতক যাচ্যমানঃ।
পীযূষ মন্দহসিতোঘন মধ্যবর্ত্তী
বীরেষু রাজতি যুবা কিল মেঘরাগঃ ॥ (হনুমৎ)

নীলোৎপলাভ-বপু ইন্দু-বক্ত্র পীতাম্বর তৃষিত-চাতককুল কর্ত্তৃক যাচিত অমৃত মধুর হাস্য যুক্ত মেঘমধ্যবর্ত্তী যুবা মেঘরাগ বীরগণের মধ্যে বিরাজ করেন।

পীনোন্নত স্তন সুশোভন হারবল্লী
কর্ণোৎপল ভ্রমর নাদ বিলগ্ন চিত্তা।
যাতি প্রিয়ান্তিকমতিশ্লথবাহুবল্লী
সৌরাষ্ট্রিকা মদন-মূর্ত্তি সুচারু গৌরা ॥ (মতঙ্গ)

হার সুশোভিতা পীনোন্নত স্তনী কর্ণোৎপলস্থ ভ্রমর-গুঞ্জন শ্রবণ-নিয়তা, সুচারু গৌরাঙ্গী, শিথিল বাহুবল্লী মদনমূর্ত্তি সৌরাষ্ট্রিকা প্রিয় সমীপে গমন করিতেছেন।

৩। রক্তাম্বরো রক্ত বিশাল নেত্রঃ
শৃঙ্গারযুক্তস্তরুণো মনস্বী।
সদা বিভাত্যেষহি পঞ্চমোঽয়ম্
যোষিৎ প্রিয়ঃ কোকিল মঞ্জুভাষী ॥ (মতঙ্গ)

রক্তাম্বর, দীর্ঘ রক্তনেত্র বেশভূষাযুক্ত তরুণ মনস্বী, যোষিৎ প্রিয় কোকিল মঞ্জুভাষী এই পঞ্চম সর্ব্বদা শোভা পাইতেছেন।

নেত্রাম্বু ধারাঙ্কিত চারু দেহা
বিয়োগ দুঃখানত চন্দ্রবক্ত্রা।

চিরং প্রিয় ধ্যানরতা সুদীনা

মুহুঃ শ্বসন্তী পঠমঞ্জরীয়ম্ ॥ (মতঙ্গ)

চারুদেহ নেত্রজলে সিক্ত, চন্দ্রবদন বিরহ দুঃখে আনত সুদীনা নিরন্তর প্রিয়ধ্যান নিরতা, পঠমঞ্জরী মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

৪। তুরঙ্গমস্কন্ধনিবদ্ধ বাহুঃ

স্বর্ণপ্রভঃ শোণিত শোন গাত্রঃ।

সংগ্রাম ভূমৌ বিচরণ্ প্রতাপী

নট্টোঽয়মুক্তঃ কিল রঙ্গ মূর্ত্তি ॥ (মতঙ্গ)

তুরঙ্গ স্কন্ধে নিবদ্ধ বাহু, স্বর্ণপ্রভ রক্তাক্ত গাত্র, প্রতাপী, রঙ্গমূর্ত্তি যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণশীল নট বলিয়া কথিত হন।

কান্তানুরক্তা মৃদু ভাব যুক্তা

ব্যাঘূর্ণিতাক্ষী মৃদুগৌর দেহা।

নটাখ্য রাগস্য বিলাসিনী সা

কল্যাণিকেয়ং কথিতা কবীন্দ্রৈঃ ॥ (হনুমৎ)

কান্তানুরক্তা, মৃদুস্বভাবা, চঞ্চলাক্ষী, স্নিগ্ধ গৌরদেহা কল্যাণীকে কবীন্দ্রগণ নটাখ্য রাগের বিলাসিনী বলিয়া থাকেন।

৫। লীলা বিহারেণ বনান্তরালে

চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।

বিলাস বেশো ধৃত দিব্য মূর্ত্তিঃ

শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ ॥ (মতঙ্গ)

বনান্তরালে বধূসহায় কুসুমচয়নকারী স্বচ্ছন্দবিহারী, বিলাসবেশধৃক্ শ্রীরাগের দিব্যমূর্ত্তি কবীন্দ্রেরা বলিয়া থাকেন।

গজেন্দ্র মুক্তাকৃত চারুহারা

ময়ূর পিচ্ছাঙ্কিত শুদ্ধবেশা।

মাল্যানুলেপাঙ্কিত চারুগাত্রী

পূর্ণেন্দুবক্ত্রা সুভগা চ গৌরী ॥ (মতঙ্গ)

সুচারুগাত্রী পূর্ণেন্দুবদনা মাল্য ও অনুলেপাঙ্কিত ময়ূরপিচ্ছের ন্যায় শুদ্ধবেশা গজমুক্তার গ্রথিতহারা সুন্দরী গৌরী রাগিণী ॥

৬। চূতাঙ্কুরেনৈব কৃতাবতংসো
বিঘূর্ণমানারুণ পদ্মনেত্রঃ।
পীতাম্বরঃ কাঞ্চন চারুদেহো
বসন্ত রাগো যুবতী প্রিয়শ্চ ॥ (মতঙ্গ)

বসন্ত রাগ আম্রমুকুলের কর্ণভূষাযুক্ত চঞ্চল অরুণ নয়ন, পীতাম্বরধারী কাঞ্চনের ন্যায় চারুদেহ এবং যুবতীগণের প্রিয়।

তুষার কুন্দোজ্জ্বল দেহযষ্টিঃ
কাশ্মীর কর্পূর বিলিপ্ত দেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তরে
বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয়ম্ ॥ (মতঙ্গ)

তুষার কুন্দোপুষ্পোজ্জ্বল দেহযষ্টি, কাশ্মীর কর্পূর বিলিপ্ত দেহা তোড়িকা বন হইতে বনান্তরে বীণাহস্তে হরিণের মন বিনোদন করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

—স্বামী বাসুদেবানন্দ।

মাধুকরী

অস্পৃশ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন—পঞ্চদশী—"ছুৎমার্গ" পরিহারের জন্য ৺কাশীধামে হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে ৺কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র মহাশয় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ঐ সভার আহ্বানকারীদের চেষ্টা বিফল করায় ৺কাশীর ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একটি বৃহৎ সভা হইয়াছিল। এই সভাতে ৺কাশীর প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর

প্রভৃতি মহাশয়গণ সভার উদ্দেশ্যাদি ব্যক্ত করিবার পরে উক্ত সভার পক্ষ হইতে এক তোড়া টাকা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মিশ্রজীর সমীপে সমর্পণ করিলে তিনি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া সভায় সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। তৎপরে রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর মহাশয় উঠিয়া তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে উক্ত মিশ্রজীকে জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহার এই নির্ভীকতা ও সৎসাহসের এবং ধর্ম্মানুরাগের জন্য যদ্যপি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী হইতে অপসৃত হইতে হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ বিদ্যালয় হইতে যে ১৫০৲ দেড়শত টাকা মাসিক বেতন এক্ষণে পাইতেছেন, রাজা বাহাদুর আজীবনকাল তাঁহাকে ঐ পরিমাণে টাকা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতে প্রস্তুত রহিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাভ শাস্ত্রী মহাশয় রাজা বাহাদুরের এই উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, রাজা জমীদারগণের নিকট হইতে এরূপ পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের হৃদয়ের বল দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং তাঁহারা সাহসের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা পালন করিতে পারিবেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জয়দেব মিশ্রজীকে ধন্যবাদ প্রদান এবং জয়ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়।

সংবাদপত্রে উপরোদ্ধৃত সংবাদটি পাঠ করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র মহাশয়কে নিম্নলিখিত পঞ্চদশটি প্রশ্ন করিয়া একটি পত্র লিখিবার প্রয়োজন অনুভব করি। পত্রখানি সংস্কৃত ভাষায়। উহার বাঙ্গালা প্রতিলিপি মিশ্রজীর পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর মহাশয়কে প্রেরিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের বিচারশক্তির অনুশীলনকল্পে বাঙ্গালা চিঠিখানি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

ওঁ

৩নং সানি পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৩১।

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, ব্রাহ্মণ-জায়া ও ব্রাহ্মণ-মাতা এবং সামান্যতঃ

অধীত-ব্রহ্মবিদ্যা। আমার এবং চারিবর্ণযুত হিন্দুজাতির অজ্ঞান বিদূরণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসু হইয়া আপনার নিকট পঞ্চদশটি প্রশ্ন উপস্থিত করিতেছি। উত্তরদানে কৃতার্থ করিবেন :—

১। বেদ এবং বেদোক্ত বাণী সত্য বা মিথ্যা ?

২। বেদের দশম মণ্ডলস্থ পুরুষসূক্তে যে উক্ত হইয়াছে আমরা চারিবর্ণের মনুষ্যজাতি পরম পুরুষের শরীর হইতে উদ্ভূত হইয়াছি তাহা ঠিক কি না ?

৩। বেদোক্ত চারিবর্ণের স্রষ্টা ছাড়া অপর কোন স্রষ্টা আছেন কি, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্পৃশ্যদের বা পঞ্চম বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা।

৪। বেদবর্ণিত স্রষ্টাপুরুষ বেদমন্ত্রে কোথাও চারিবর্ণের পরস্পরের সহিত অস্পৃশ্যতা বা হেয়তার আদেশ করিয়াছেন কি ?

৫। লৌকিক বুদ্ধিই কি ইহার সমর্থন করে ?

৬। মস্তিষ্ক কি হস্তপদ বা বক্ষকে কাটিয়া ফেলিয়া জীবিত সুস্থ বা অবিকৃত থাকিতে পারে ?

৭। আপনারা ব্রাহ্মণেরা ন্যাসকালে এবং অন্য প্রয়োজনেও আত্মশরীরে আপাদমস্তক সমস্ত অঙ্গগুলি স্পর্শ করেন না কি ?

৮। আপনার মস্তিষ্ক আপনার জন্য চিন্তা করে, আপনার হাত আপনাকে রক্ষা করে, আপনার হৃদয় আপনার জীবনী-রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চালন করে এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল আপনার সর্ব্ববিষয়ের হিতকল্পে চলে। আপনার শরীর হইতে ইহার কোন একটিকেও ত্যাজ্য করিতে বা ক্ষীণবল করিয়া রাখিতে আপনার প্রাণপুরুষ চায় কি ? যে মানুষ তাহা করে সে কি বুদ্ধিমান আখ্যাযোগ্য ?

৯। যেমন ব্যক্তিগত জীবদেহে তেমনি হিন্দুজাতি-দেহেও কোন একটি অঙ্গের পক্ষাঘাতে বাকী অঙ্গেরও স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। জাতির পদস্বরূপ বহুশূদ্রবর্ণকে অস্পৃশ্যতা দ্বারা অবাধগতি রহিত করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কলির ব্রাহ্মণও নিস্তেজ ও জড়বৎ হইয়া গিয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষগম্য কি না ?

১০। শুধু জাতিতে নহে, গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবে যিনি ব্রাহ্মণ,

প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তাঁহার পক্ষে শূদ্র অস্পৃশ্য নহে, কারণ যিনি সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মদৃষ্ট—

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।

আর যাঁহার ব্রাহ্মণ্য জাতিগত মাত্র—যথা আজকালকার লক্ষ লক্ষ তৎপদবাচ্যের, যার স্বভাব-গুণ-কর্ম্ম ও বিশ্বের তাবৎ লোক-সাধারণের স্বভাব গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, তাঁর পক্ষে শূদ্র কিরূপে হেয় হইতে পারে?

১১। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—অভিমান, বৈশ্য শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ের স্ব স্ব ব্যষ্টি অভিমানের সহিত একীভূত হইয়া এক সাধারণ শরীরের সমষ্টি অভিমানের সঙ্গেই পুষ্টিলাভ করিতে পারে, কিংবা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন বা শরীরের কোনও অঙ্গ বিশেষকে দাবাইয়া?

১২। শূদ্ররূপী পদাঙ্গের চলায় ব্রাহ্মণেরা তাহাদের পশ্চাতে অনিচ্ছায় পরিচালিত হইবেন—ইহা বুদ্ধি-সঙ্গত হইবে—না অগ্রবর্ত্তী নেতা হইয়া স্বয়ং তাহাদের চালান বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ হইবে?

১৩। ব্রাহ্মণের রক্ষা কিসে? আত্মেতর বর্ণগণের সহিত সদ্ভাবে ও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহারে—না তাঁহাদের আত্ম-সম্মানবোধ নৃশংসরূপে আঘাত পরম্পরায় তাহাদের বিদ্রোহিতায়?—মাথাটা উঁচু রাখিয়া চলায়, না মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে চালিত হওয়ায় তাঁহাদের আত্মরক্ষার পরিচয় পাওয়া হইবে।

১৪। জাতির মূলাধারস্বরূপ শূদ্রের ভিতর জাতীয় কুণ্ডলিনীশক্তি নিহিত রহিয়াছে। আজ সেখানে শক্তি জাগ্রত হইয়া জাতির মস্তিষ্কস্থিত ব্রাহ্মণরূপী শিবের সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা সে স্বীকার করিবেন কি না? কিংবা তাহাকে রোধ করিয়া মস্তিষ্কের বিকার বা জীবন সংশয় করিবেন?

১৫। হিন্দুজাতীয় শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণবর্ণ কোনকালে যে কোন কারণে হউক কোন কোন শূদ্রকে অস্পৃশ্য করিয়াছিলেন। এখন এই অস্পৃশ্যতা দৃঢ়সংস্কারে পরিণত হইয়া তাঁহাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে।

শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতিজয়ী হইয়া উক্ত সংস্কারের সংস্কার করা আমাদের কর্ত্তব্য কি না? ইতি

—আত্মশক্তি। বিনীত—শ্রীসরলা দেবী।

প্রবাসীর পত্রাংশ

আমি ইতিমধ্যে Nobel prize distribution দেখিতে Stockholm গিয়াছিলাম, সে এক বিরাট ব্যাপার। ১০ই ডিসেম্বর Nobelএর মৃত্যু দিন, সেই দিনই এই prize দেওয়া হয়। দেওয়ার ধরণ ও প্রণালী বিশেষ রকমের।

এই prize দেওযার কর্ত্তা Swedish Academy for Scienee and Arts ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০ শত হইবে, যে সব বিষয়ে prize দেওয়া হয়, সে সব বিষরের জন্য ইঁহাদের মধ্য হইতে ৫ জনা করিয়া একটি *Sub-Yommitee* নিযুক্ত করা হয়। Physicsএর পুরস্কার দেওয়া সম্বন্ধে লিখি তাহা হইলেই অন্য সব বুঝিতে পারিবেন। Physics *Yommitee*র পাঁচ জনা সভ্য,—Norway, Sweden, Finland, Netherlands ও Danmark। এই সব জায়গার সব Physicsএর Prof. এর নিকট উপযুক্ত ব্যক্তির নাম চাহিয়া পাঠান হয় তাহা ছাড়া পৃথিবীর সব Universityর নাম একটি তালিকায় লেখা আছে, ইহাদের মধ্যে ১০টী Universityর Profএর নিকটও নাম চাহিয়া পাঠান হয়। এ বৎসর প্রথম ১০টি University হল—আগামী বৎসর পরের ১০টি Universityর নিকট পত্র যাবে। এই ভাবে পৃথিবীর সব Universityই নাম propose করিবার অধিকারী হবে। ক্রমে সব আসিলে সেই ৫ জন *Sub-Yommitee* ইহাদের মধ্যে একজন মনোনীত করেন ও Academy for Science and Arts তাহাই গ্রহণ করেন।

যদি এই ৫ জন, ৩ জন ও ২ জন করিয়া ২টি নাম মনোনীত করেন তবে Academy for Science, হয় সেই দুজনকে এক সঙ্গে prize দেন অথবা কাহাকেও দেন না। অন্যান্য বিষয়েও ঠিক এই ভাবে হয়, তবে Prize for Peace দেন Swidish Parliament.

১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫টার সময় prize দেওয়া হয়। এই সভায় যাইতে হলে Academy for Scienceএর একজন সভ্যকে ধরিয়া তাহাকে দিয়া টিকিট আনিতে হয়, অবশ্য এই টিকিট বিনামূল্যেই দেওয়া হয়। তারপর পোষাকের peculiarity আছে। সেদিন পুরুষেরা সব Solemn dress পরিবে ও মেয়েরা Evening dress পরিবে। এই Solemn dress all black colour hard Breast shirt, single hard V shaped সাদা Butterfly tie, waistcoat ও coatও অদ্ভুত রকমের। এই পোষাক ইহারা বড় বড় dinnerএ, মৃত সৎকারে বড় বড় বিবাহে বা এইরূপ solemn occasion এ ব্যবহার করে। Profএর দুটি এরূপ পোষাক ছিল আমিও একটি লইয়া গেলাম। মেয়েদের Evening dressও যে এত বিভিন্ন প্রকারের তাহা সেই দিনই দেখিলাম।

প্রথম lineএ বসিবার জায়গা King and the Royal familyর জন্য Reserved : আমাদের দেশের Governor গেলে তাহার কত পূর্ব্ব হইতেই পুলিশ রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করে, কত mounted police মোড়ে মোড়ে পাহারা দেয়, এবং যেখানে আসিবেন সেখানকার অবস্থা দেখিবার জন্য C. I. D. র লোক আসিয়া দেখিয়া যায়, কিন্তু এদের রাজার জন্য ওরূপ কোন ব্যবস্থা নাই, দিব্যি Royal carএ তিনি আসিলেন, ২টি ছেলে ও দুটি মেয়ে লইয়া কোনও Body Gauard ত দেখিলাম না, আসিয়াই তাহার Seatএ তিনি বসিলেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য Academyর President দরজায় ছিলেন, আর কেহ নহে। আসিলেই Band বাজিল ও প্রায় ১০ মিনিট ধরিয়া কি একটা গান বাজাইল, সবাই সেই সময় দাঁড়াইয়া। এবার Prize দেওয়া হল Music Hallএ। সে Hallটা আমাদের University Instituteএর মত হবে, তাহার

platformটা সবই white marbleএ ও সামনে একটা বেদীর মত, সেটাও marbleএর তাহার পেছনে A. Nobelএর Bust। ঘরটি সাজান মন্দ হয় নাই। তবে আমাদের দেশে ফুল ও পাতালতায় যেরূপ সুন্দর করে—তাহার তুলনায় কিছুই নহে। তারপর এক একজনা member এক একটি prize winnerকে সঙ্গে লইয়া রাজার কাছে Introduced করিয়া দিলেন, এবং সে সময় Swedish ভাষায় এক একটি বক্তৃতা করিয়া ইহাদের গুণাবলী কীর্ত্তন করিলেন, রাজাও পরে Hand shake করিয়া Nobel যে উদ্দেশ্যে এই টাকা দান করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয়—এই বলিয়া prize দিলেন ; একটা বইএর মত, তাহার ভিতরে cheque। গ্রহণকারীও তাহা গ্রহণ করিয়া নিজদের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন এবং ফিরিবার সময় রাজার দিকে পেছন না ফিরিয়া, পিছনে হাঁটিয়া ফিরিলেন এবং সে সময় মাথা নোয়াইতে নোয়াইতে আসিলেন, অনেকটা মোগল দরবারের কুর্ণিশের মত তবে হাত মাথায় ঠেকায় না এই যা প্রভেদ। এক এক জনকে prize দেওয়া হয় আর Band বাজিয়া উঠে ও সে বাদ্য প্রায় ১০ মিনিট কাল ধরিয়া চলে। যদি কেহ আসিতে না পারে তবে সেই দেশের রাজপ্রতিনিধিকে তাহাকে দিবার জন্য সেই prize দেওয়া হয়। শেষ হলে রাজা ও রাজপরিবার প্রথমই ঘরের বাহির হন, তারপর সবাই নিজ নিজ পথ দেখে। তবে রাজা Prize-winner এবং member of the Academy for Science ইহাদের সবাইকে একটা বিরাট ভোজ দেন, নাচ গান অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলে।

যে ভদ্রলোক সব প্রথমে রাজার নিকট হতে এই prize পান, তাঁহার নাম Rontgent, তিনি এ বৎসর মারা গিয়াছেন তাই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশও হল। ইনি জাতিতে জার্ম্মাণ ও ইনি X-Ray আবিষ্কার করেন। এই Academyর সভ্যেরা সবাই দীর্ঘায়ু তাঁহাদের Average age—৭০ বৎসর। আমি যে Prof.র নিকট কাজ করি তিনিও ইহার সভ্য ও Physics *Sub-Yommitee*র সভ্য, বয়স ৪০ বৎসর, ইনি সর্ব্বকণিষ্ঠ তাই সবাই ইঁহাকে বলেন Baby of the

Academy। যে সব ভদ্রলোক এই prize পাইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে আইরিশ কবি W. B. Yeatsরই চেহারা বেশ সৌম্য।

আজ কাল এখানে স্কিজ্ খেলা চলিতেছে। প্রায় ৪ ইঞ্চি চওড়া ও ৫ ফিট লম্বা এক একটা কাঠে, দুটি পা বেশ ভাল করিয়া বাঁধে ও দুটি বাঁশ নেয়, তাহাও প্রায় ৫ ফিট লম্বা হবে। এ দুটি হাতে ধরে এবং তাহার গোড়ায় যাত্রাদলের শ্রীকৃষ্ণের চক্রের মত দুটি চাকা, ইহার এক একটিতে বাঁধে। তারপর এই দুটি লাঠি দ্বারা খোঁচাইয়া সর সর্ করিয়া চলিয়া যায়, ইহা যায় এত জোরে যে দৌড়াইয়া পারা যায় না। কি পুরুষ, কি মেয়ে, সবাই এই লইয়া রাস্তায়, মাঠে ছুটিতেছে। সেদিন দেখি Prof. তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহাদের ২টি ছেলেকে লইয়া—ছুটিতেছেন। ইহাতে ভারী আনন্দ। আমাকেত সবাই ধরিয়াছেন, চল দৌড়াইবে ; আমার ভয় করে, আছাড় খাইলে হাত পা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা, আরও এই বরফের মধ্যে গেলে মুখে এমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বা "ঝাঁঝ" লাগে যে, বেশীক্ষণ থাকিতে আমার ভয় হয়, আর ইহাদের মত আমার এত protection নাই, তাই আমি আর ওদিক যাই না, তবে দেখি খুব। ছেলেরা ও মেয়েরা আছাড়ও কম খায় না, ঢুপ-ঢাপ পড়িতেছে। দিনে চলে এই স্কিজ্, আর সন্ধ্যার পরে Coffee Houseএ তালে তালে মাথা নাড়া, মদ খাওয়া ও বাদ্যের সঙ্গে নাচা—রাত্রি ১১টার সময় Coffee House বন্ধ হলে সবাই বাড়ী ফেরে। ইহাই নাকি Swedish life—ভারী আনন্দের বিষয় !!

আমার অসুবিধার প্রধান কারণ যে, ইহাদের সঙ্গে ভাবের মিল হয় না, Angle of vision সম্পূর্ণ আলাদা। এরূপ সভ্যতা আমার পছন্দও হয় না এবং সহ্যও হয় না। যখন আসিয়াছি তাড়াতাড়ি কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিব। এখানকার শীতটা বেশ সহ্য হইয়া গেল, কোনও অসুখ-বিসুখ হয় নাই—এমন কি সামান্য সর্দ্দি কাশিও হয় নাই, অথচ বরফের মধ্যে চলাফেরা খুব করিয়াছি ; শীত যাবার এখনও অনেক দেরী তবে বেশী শীত চলিয়া গিয়াছে, ক্রমশঃই এখন গরম হবে।

—অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিধূভূষণ রায়, এম্ এস-সি, ডি এস-সি।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীঅরবিন্দের গীতা—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ লিখিত Essays on the Gita পুস্তকের অনুবাদ—শ্রীঅনিলবরণ রায় কৃত—মূল্য পাঁচ সিকা। ঋষিকল্প অরবিন্দের গীতা সম্বন্ধে মতামত এই পুস্তকে বিবৃত আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা তাঁহার ভাষা হইতে দিতেছি—'গীতার ন্যায় মহৎ গ্রন্থ খণ্ডভাবে লইলে বুঝা যায় না—গীতায় কেমন করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার শিক্ষার ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহা সমগ্রভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র গীতাকে কর্ত্তব্যপালনের শাস্ত্র (Gospel of Duty) বলিয়া প্রথম এই নূতন ব্যাখ্যা করেন। বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা গীতাকে কর্ত্তব্যপালনের শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন গীতার সেই আধুনিক ব্যাখ্যা-কারেরা গীতার প্রথম তিন চারিটি অধ্যায়ের উপরই সব ঝোঁকটুকু দিয়াছেন। আবার এই সকল অধ্যায়ে যেখানে ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া কর্ত্তব্য পালনের কথা আছে সেই স্থানটিকেই গীতা শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়াছেন। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—"তোমার কর্ম্মেই অধিকার কর্ম্ম ফলে যেন কদাচ অধিকার না হয়"—এই কথাটিই আজকাল গীতার মহাবাক্য বলিয়া সুপ্রচলিত। শুধু বিশ্বরূপ দর্শন ছাড়া গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্ত দার্শনিক তত্ত্ব-পূর্ণ বাকী অধ্যায়গুলির বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তাই তাঁহারা উপলব্ধি করেন না। তবে এরূপ ব্যাখ্যা খুবই স্বাভাবিক। কারণ আধুনিক যুগে মানুষ দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার লইয়া মস্তিষ্কের অপ-ব্যবহার করিতে চায় না। তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেই ব্যগ্র এবং অর্জ্জুনের মতই এমন একটা কাজ-চলা নিয়ম বা ধর্ম্ম চায় যাহাতে তাহাদের কাজ করিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা এরূপ ভাবে করিলে উল্টা বুঝা হইবে।

'গীতা যে সমতার শিক্ষা দেয় তাহা নিঃস্বার্থপরতা নহে। গীতা-

শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিবার পর, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মহা আদেশ দিলেন—"উঠ, শত্রুগণকে বিনাশ কর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর।" এই আদেশ খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার বা নির্ব্বিকার বৈরাগ্যের প্রশংসা নাই। ইহা অভ্যন্তরীণ সাম্য ও উদারতার অবস্থা, ইহাই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ভিত্তি। "যে কর্ম্ম করিতে হইবে"—এইরূপ স্বাধীনতা ও সমতার সহিতই করিতে হইবে। কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম "যে কর্ম্ম করিতে হইবে" এই বাক্যের দ্বারা গীতায় শুধু সামাজিক বা নৈতিক কর্ম্ম বুঝায় না—গীতাতে ইহা অতিবিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার মধ্যে সর্ব্বকর্ম্মাণি—"মানুষ যাহা কিছু করে" সবই পড়িবে। কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে—তাহা ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা নির্দ্ধারণ করা চলিবে না। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—"কর্ম্মেই তোমার অধিকার ফলে যেন কদাচ তোমার অধিকার না হয়"—ইহাত গীতার মহাবাক্য নহে। যাহারা যোগমার্গ আরোহণ করিতে উদ্যত সেই সকল শিষ্যের ইহা কেবল প্রথমাবস্থার উপযোগী শিক্ষা। পরবর্ত্তী অবস্থায় এই শিক্ষা একরকম পরিত্যাগই করিতে হয়। কারণ পরে গীতা খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন যে "মানুষ কর্ম্ম করে না, প্রকৃতিই কর্ম্ম করে"। ত্রিগুণময়ী মহাশক্তিই মানুষের ভিতর দিয়া কর্ম্ম করে—মানুষকে শিখিতেই হইবে যে সে কর্ম্ম করে না। অতএব, "কর্ম্মে অধিকার" একথাটা শুধু ততক্ষণই থাকিতে পারে, যতক্ষণ অজ্ঞানের বশে আমরা আমাদিগকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করি। যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তা নই—তখনই ফলের অধিকারের মত আমাদের কর্ম্মেরও অধিকার ঘুচিয়া যাইবে। কর্ম্মীর অহঙ্কার—ফলে দাবী বা কর্ম্মে অধিকার সমস্ত দূর হইয়া যাইবে।'

প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তকাদ্বইখানি আমরা পাইয়াছি—"স্নেহের স্মৃতি" ও "মায়ের আহ্বান" শ্রীমোহিনীমোহন বসু প্রণীত।

সংঘ-বার্ত্তা

১। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আলেপ্পিতে সেবাকার্য্য—গত জুলাই মাসে ত্রিবাঙ্কুরের উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে জলপ্লাবন হওয়ায় অনেক গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আলেপ্পির পূর্ব্বদিকে বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় গ্রামবাসীরা প্রাণের ভয়ে পশ্চিম উপকূলে আশ্রয় লইয়াছে এবং এমন কি আলেপ্পি সহরের অর্দ্ধভাগ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। যে সমস্ত গ্রামবাসী আলেপ্পি সহরে আশ্রয় লয় তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪০০০ হইবে। এবং সহরের লোকেরা তাহাদিগকে বাসস্থান ও খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেছে। পরে চারি স্থানে সেবাকেন্দ্র খুলা হয়। সেত্রামে (Satram) এ যে সেবাকার্য্য হয় তাহাতে প্রায় ২৫০০ লোকে সাহায্য পায় তন্মধ্যে ২০০০ দীন দরিদ্র ছিল। অন্যান্য কেন্দ্রেও দরিদ্র-নারায়ণগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হইতেছে। প্রথমে সহরের উকিল ও স্কুলের শিক্ষকেরা Satram কেন্দ্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন পরিশেষে রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী তথায় তাঁহাদের সহিত এই জন হিতকর কার্য্যে যোগ দেওয়ায় তাঁহারা মিশনের সেবক-দ্বয়ের হস্তে সমস্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত করেন। তাঁহারাও অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপন্ন নরনারীগণের সেবা করিতেছেন। বন্যাতে লোকের এত অধিক ক্ষতি হইয়াছে যে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য। অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে এই বন্যার পরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মানুষ ও বিস্তর গরু বাছুর মারা গিয়াছে।

২। সাহায্য প্রার্থনা—বাঁকুড়ায় গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি সেবাশ্রম ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সেবা প্রতিষ্ঠানটি নানারূপ অভাব অভিযোগের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া, সমাজের সম্মুখে "ত্যাগ ও সেবার" আদর্শ ধরিয়া মিশনেরই কর্ম্মিগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিবিধ উপায়ে 'বহুজন হিতায় বহুজন

সুখায়' রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আজ দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া গণবিগ্রহের সেবা করিয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ দৈবদুর্ব্বিপাকে গত ১৯২২ সালের জুলাই মাসে গন্ধেশ্বরীর ভীষণ বন্যায় উক্ত সেবা প্রতিষ্ঠানের কতক অংশ ভগ্ন হওয়ায় একেবারে মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হইয়া পড়ে এবং অর্থাভাব প্রযুক্ত আবশ্যকীয় মেরামতাদি না হওয়ায় এতদিন সেবাকার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া আছে। বাঁকুড়ার মত গরীব দেশে এরূপ প্রতিষ্ঠান কত আবশ্যক তাহা চিন্তাশীল দেশবাসী বা দেশসেবী মাত্রেই বুঝিতেছেন।

অতএব আমরা সহৃদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন দেশবাসীর নিকট দুস্থ দরিদ্র নারায়ণগণের নামে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা ভগ্ন গৃহাদি নির্ম্মাণরূপ মহৎ ও শুভ উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন ও শ্রীভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক ধন্য ও কৃতার্থ হউন। সাহায্য সামান্য হইলেও নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতার জনৈক মাড়োয়ারী বণিক বাঁকুড়ার বড় বাজারস্থ শ্রীযুক্ত জয়দয়াল গোয়েঙ্কর এবং শ্রীযুক্ত হরিকিষণ রাঠী মহোদয় দ্বয়ের মারফৎ আমাদের গৃহ-নির্ম্মাণ ফণ্ডে ৪০০৲ শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদের ও বাঁকুড়াবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :—(স্বাঃ) স্বামী মহেশ্বরানন্দ। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বাঁকুড়া।

৩। মহামানব স্বামী-বিবেকানন্দের অমর সেবাভাব লোক সমাজে প্রচারের জন্য কানপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভক্তমণ্ডলী এক দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত করিয়াছেন। ২২শে জুন তারিখে সদাশয় ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া এই মহা আয়োজনের সূচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী নেপালেশ্বর ও তাঁহার সেবক-সঙ্ঘ এই শুভ প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। ডাক্তার শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুস্তফী এইচ এম্ বি ও শ্রীঅনিলবরণমুখোপাধ্যায় এইচ্-এম্ বি এই চিকিৎ-

সালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া জনসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই অনুষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন জনসাধারণের অযাচিত সহানুভূতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও সন্ন্যাসী মণ্ডলের আশীর্ব্বাদ সাপেক্ষ।

৪। সম্প্রতি বাগদাদ হইতে একপত্র পাইয়াছি। সেখানে আমাদের বন্ধুদিগের মধ্যে ২।১টি যাঁহারা আছেন তাঁহাদের একান্ত উৎসাহ ও চেষ্টায় এবারও শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব ক্রিয়া বিশেষ ভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা অতি আনন্দের কথা, কারণ এবার লোক অভাবে উৎসব হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছায় তাহাও হইল। এই তিন বৎসর পর পর শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করা হইল। ইহার ফল অতি উত্তম হইয়াছে। ঐ দেশীয় জনমণ্ডলী এই উৎসব মিলন দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের মাধুর্য্য ও সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বহুজাতি ও বহুধর্ম্মাবলম্বীর একত্র মিলনে যে কি আনন্দ সে স্বাদ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। কোনও ধর্ম্মে যে বিদ্রোহ নাই ঠাকুরের ও স্বামিজীর জীবন আলোচনায় তাহা সর্ব্ব সমক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৫। বিগত ২০শে জুন (১৯২৪) শুক্রবার বাগবাজার পল্লীর ২৬নং রাম-কান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ অনাথ-পার্ব্বতী স্মৃতিসমিতির বালকগণ কর্তৃক আলফ্রেড্ রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালরায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী নামক গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননীর পুণ্যজন্মস্থানে যে শ্রীমন্দির কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারই নিত্য সেবানির্ব্বাহের সাহায্যার্থ বালকগণের এই সশ্রদ্ধ উদ্যম। অভিনয় সাতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছিল। বালকদিগের ভক্তির অঞ্জলি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যে গ্রহণ করিয়া তাহা-দিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন—তাহা তাহাদিগের উদ্যমের সফলতা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের সাহায্যকল্পে তাহারা পাঁচশত পঞ্চান্ন টাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারীকে প্রেরণ করিয়াছে এবং অভিনয়ের ফলস্বরূপ আরও কিছু টাকা শীঘ্র পাঠাইতে পারিবে এইরূপ আশা করিতেছে।

৬। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউসন্—পরমহংসদেবের জন্মস্থান

কামারপুকুর গ্রামে স্থানীয় জনসাধারণের সৎশিক্ষা কল্পে গত ১৯২১ সাল হইতে একটি আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টিকে কালোপযোগী করিবার জন্য ইউনিভারসিটি বরাবর মঞ্জুরী করান আবশ্যক এবং এতদুদ্দেশ্যে এককালীন অন্ততঃপক্ষে ৩০০০৲ টাকার প্রয়োজন। উপরন্তু বিদ্যালয়টির উপস্থিত খরচ চালাইবার জন্য মাসিক ৬০৲ টাকা সাহায্যের আবশ্যক। স্থানীয় লোকের অস্বচ্ছলতানিবন্ধন তাহাদের দ্বারা ঐ অর্থ সরবরাহের সম্ভাবনা নাই। এখন দানশীল ও সহৃদয় মহাত্মাগণের কৃপা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

দেয় সাহায্য বিবেকানন্দ সোসাইটির সেক্রেটারী অথবা কামারপুকুর রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউসনের সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইলে অনুগৃহীত করা হইবে। নিম্নে ঠিকানা দেওয়া গেল—

শ্রীপ্রমথনাথ রায়, এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী, কামারপুকুর রামকৃষ্ণ ইন্‌ষ্টিটিউসন্, পোঃ আঃ কামারপুকুর, জেলা হুগলী।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সেক্রেটারী, বিবেকানন্দ সোসাইটী, ৭৮।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৩১৮—পটলডাঙ্গার বাসা হতে বৈকালে গিয়েছি। মায়ের ঘরে গিয়ে বসতেই গোলাপ মা এসে আমাকে বললেন "একটি সন্ন্যাসিনী গুরুর দেনা শোধ করতে সাহায্য প্রার্থী হয়ে কাশী হতে এসেছেন। তোমাকে কিছু দিতে হবে"। আমি সানন্দে স্বীকৃত হলুম। মা হেসে বললেন "আমাকেও ধরে ছিল। আমি কি কারো কাছে টাকা চাইতে পারি মা! বললুম 'থাকো, হয়ে যাবে'।" গোলাপ-মা বললেন "হাঁ, মা আমার পেয়ে ফিল্লে (উপায়) করে দিয়েছেন"। মা আস্তে চুপি চুপি আমাকে বলছেন "গোলাপ তিন খানা গিনি দিয়েছে"।

খনিক পরে সেই সন্ন্যাসিনী এলেন। তিনি বলরাম বাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখানে ভক্তেরা তাঁকে যার যা সাধ্য কিছু কিছু দিয়েছেন। শুনলুম সন্ন্যাসিনী হবার পূর্ব্বে তাঁর বৃহৎ সংসার ও সাতছেলে ছিল, তারাই এখন কৃতী হয়ে উঠে সকল বিষয়ের ভার নিতে তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছেন।

সন্ন্যাসিনী—"গুরুনিন্দা করতে নেই বলে, প্রণাম করে বলছেন বড় মোকদ্দমাপ্রিয় ছিলেন * * * *। এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আর পারেন না। ওদিকে পাওনাদার ডিক্রী পেয়ে ধরতে চায়। কি করি, তাই, তাঁরজন্য ভিক্ষায় বেরিয়েছি।

এইস্থানে শ্রীশ্রীমা একটি শ্লোক বললেন, শ্লোকটি মনে পড়ছে না।

তবে ভাবটী এই যে, "উচিৎ কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না।"

মা আরও বললেন, "তবে গুরুভক্তি থাকা চাই। গুরু যেমনই হোক্, তাঁর প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি। ঠাকুরের শিষ্য ভক্তদের কি ভক্তি দেখ দেখি! এই গুরুভক্তির জন্য ওরা গুরুবংশের সকলকে শ্রদ্ধা ভক্তি তো করেই গুরুর দেশের বিড়ালটাকে পর্য্যন্ত মান্য করে!"

সন্ন্যাসিনী রাত তিনটা হতে বেলা আটটা পর্য্যন্ত জপ ধ্যান করেন। সেই জন্য একখানি ধোওয়া কাপড় চাইলেন, মা ভূদেবের একখানি কাপড় দিতে বললেন। সন্ন্যাসিনী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কি রাতে থাকবে? থাকত, তোমায় কিছু শিক্ষা দিতে পারি।" মনে মনে ভাবলুম "আমাদের মার কাছে আবার আপনি কি শিখাবেন"—কিন্তু প্রকাশ্যে বললুম "না আমার থাকা হবে না"।

আমার গাড়ী এসেছে। সন্ধ্যারতি হতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় হইলাম।

কার্ত্তিক, ১৩১৯—আমাদের বালিগঞ্জের বাসায় ফুলের অভাব ছিল না। মা ফুল পেলে খুব খুসী হন বলে অনেক ফুল জোগাড় করে নিয়ে একদিন ভোরে মায়ের কাছে গেলুম। দেখি মা সবে পূজার আসনে বস্‌ছেন। আমি ফুলগুলি সাজিয়ে দিতে ভারী খুসী হয়ে পূজায় বস্‌লেন। শিউলি ফুল দেখে বললেন—"এ ফুল এনে বেশ করেছ। কার্ত্তিক মাসে শিউলি ফুল দিয়ে পূজো কর্ত্তে হয়। এবার আজ পর্য্যন্ত ঐ ফুল ঠাকুরকে দেওয়া হয়নি।"

আমি আজ মায়ের শ্রীচরণ পূজার ফুল আলাদা করে রাখিনি। সেজন্য ভাব্‌লুম আজ আর বোধ হয় মাকে পূজা করা হবে না। কিন্তু ফলে দেখলুম আমার ঐরূপ ভাববার আগেই মা সকল কথা ভেবে রেখেছেন! কারণ, সমস্ত ফুলগুলিতে চন্দন মাখিয়ে মন্ত্রদ্বারা পুষ্প শুদ্ধি করে নিয়ে পূজো করতে বস্‌বার সময় দেখলুম, তিনি থালার পাশে কিছু ফুল আলাদা করে রেখে দিলেন। পরে পূজো শেষ হলে উঠে বল্‌লেন—'আয়গো মা, ঐ থালায় তোমার জন্য ফুল রেখেছি—

নিয়ে এসো ! এই সময় একটি ভক্ত অনেকগুলি ফল নিয়ে মাকে দর্শন করতে উপস্থিত হলেন। ভক্তটিকে দেখে মা খুব আনন্দিত হলেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। কোন পুরুষ ভক্তকে ঐরূপে আদর করতে আমি এ পর্য্যন্ত মাকে দেখিনি। তার পর আমাকে বল্‌লেন 'মা, তোমার ঐ ফুল হতে চারটি ওকে দাও ত আমি দিতে গেলে ভক্তটি অঞ্জলি পেতে ফুল নিলেন। দেখলুম ভক্তির প্রাবাহে তখন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে ! তিনি সানন্দে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন এবং প্রসাদ নিয়ে বাহিরে গেলেন। শুনলুম তিনি রাঁচী হতে এসেছেন। তক্তাপোষ খানিতে বসে মা এইবার সস্নেহে আমাকে ডেকে বললেন 'এইবার আয় গো' ! আমি শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে উঠ্‌তেই চুমো খেয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। এইবার আমরা পান সাজতে গেলুম। পান সেজে এসে মাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি মা ছাতে চুল শুকাচ্ছেন ; আমাকে দেখে বললেন 'এস, মাথার কাপড় ফেলে দাও—চুল শুকিয়ে নাও, অমন করে ভিজে চুলে থেকো না, মাথায় জল বসে চোখ খারাপ হয়।' এর মধ্যে আর একটি স্ত্রী-ভক্তও তথায় উপস্থিত হলেন। ছাতে অনেকগুলি কাপড় শুকাচ্ছিল, মা আমাকে সেইগুলি তুলে কুঁচিয়ে রাখতে বললেন। আমি কাপড় গুলি তুলছি, এমন সময়ে গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমাকে ডেকে নীচে নেমে আসতে বললেন ; কারণ ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে। মা নীচে নেমে গেলেন। আমিও খানিক পরে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখি মা সলজ্জ বধুটির মত ঠাকুরকে বল্‌ছেন "এস, খেতে এস।" আবার গোপাল বিগ্রহের কাছে বল্‌ছেন—'এস গোপাল, খেতে এস' আমি তখন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে—'হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হেসে বল্‌লেন— "সকলকে খেতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।" ঐ কথা বলে মা ভোগের ঘরের দিকে চল্‌লেন। তাঁর তখনকার ভাব দেখে মনে হল যেন সব ঠাকুররা তাঁর পিছনে চলেছেন। দেখে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ভোগের ঘর (সর্ব্ব দক্ষিণের ঘর) হতে ফিরে এসে মা পাশের ঘরে সকলকে সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে বসলেন। আহারান্তে পাশের ঘরে

বিছানা করে দিলুম—মা শয়ন করলেন। কাছে বসতেই মা বললেন 'শোও, এই খেয়ে উঠেছ।" শুয়েছি—মায়েরও একটু তন্দ্রার মত এসেছে এমন সময় বলরাম বাবুর বাড়ীর চাকর "ঠাকুর মা ঠাকুর মা" করে ডেকে ঠাকুর ঘরে কতকগুলি আতা রেখে গেল। একটি চুপড়িতে আতা ছিল, লোকটি নীচে সাধুদের কাছে গিয়ে চুপ্‌ড়িটি কি করবে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন—'ও আর কি হবে, রাস্তায় ফেলেদে।" সে ফেলে দিয়ে চলে যেতেই মা উঠিলেন এবং ঠাকুরঘরের রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়ে আমাকে ডেকে বলছেন দেখেছ কেমন সুন্দর চুপ্‌ড়িটি ওরা তখন ফেলে দিতে বললে! ওদের কি? সাধু মানুষ, ও সব কি আর মায়া আছে। আমাদের কিন্তু সামান্য জিনিষটিও অপচয় করা সয়না। ওটি থাকলেও তরকারীর খোশাটাও রাখা চলত। এই ব'লে চুপড়িটি আনিয়ে ধুইয়ে রেখে দিলেন। মার এই কথায় ও কাজে আমার বেশ একটু শিক্ষা হয়ে গেল। কিন্তু, 'স্বভাব যায় না মলেও!'

কিছুক্ষণ পরে নীচে একজন ভিক্ষুক এসে 'ভিক্ষে দাও' বলে চীৎকার করছিল। সাধুরা বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়া দিয়ে উঠেছেন "যাঃ, এখন দিক্ করিসনে"। মা তাই শুনতে পেয়ে বললেন—"দেখেছ? দিলে ভিকিরীকে তাড়িয়ে! এই যে নিজেদের কাজ ছেড়ে একটু উঠে এসে ভিক্ষা দিতে হবে, এই টুকুও আর পারলে না, আলস্য হল। ভিকিরীকে একমুঠো ভিক্ষে দিতে পারলেনা! যার যা প্রাপ্য, তাহাতে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিৎ, এই যে তরকারীর খোসা টা—এও গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়"।

.. বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার রওনা হবার সময় হয়ে এসেছে। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে কিছু প্রসাদ নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলুম।

মাঘ, ১৩২০—একদিন সকালে গিয়েছি। বাগান থেকে অনেক গুলি ফুল তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। মায়ের নিকট উহা দিতে মা মহা আনন্দিত হয়ে ঠাকুরকে সাজাতে লাগলেন। নীলরংএর এক রকমের ফুল ছিল। সেইগুলি হাতে করে বললেন "আহা, দেখেছ কি রং। দক্ষিণেশ্বরে আশা বলে একটি মেয়ে একদিন বাগানে কাল কাল পাতা একটি

গাছ থেকে সুন্দর একটি লাল ফুল তুলে হাতে নিয়ে খালি বলতে লাগল 'এঁ্যা, এমন লাল ফুল, তার এমন কাল পাতা! ঠাকুর তোমার একি সৃষ্টি!'—এই বলে, আর হাউ হাউ করে কাঁদে।"

ঠাকুর তাই দেখে তাকে বলছেন "তোর হলো কি গো, এত কাঁদছিস কেন?" সে আর কিছু বলতে পারে না, খালি কাঁদে, তখন ঠাকুর তাকে অনেক কথা বলে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেন।"

"আহা এই ফুলগুলির কেমন নীল রং দেখ। ফুল না হলে কি ঠাকুর মানায়"—এই বলে অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল নিয়ে ঠাকুরকে দিতে লাগলেন। প্রথম বার দিবার সময় কয়েকটি ফুল সহসা তাঁর নিজের পায়ে পড়ে গেল দেখে বললেন "ওমা আগেই আমার পায়ে পড়ে গেল!" আমি বললুম "তা, বেশ হয়েছে"। মনে ভাবলুম, 'তোমার কাছে ঠাকুর বড় হলেও আমাদের কাছে তোমরা দুই-ই এক!'

একটি বিধবা মহিলা এসেছেন। মাকে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলুম। মা বললেন মাস খানেক হল, দীক্ষা নিয়েছে। পূর্ব্বে অন্য গুরুর নিকট দীক্ষিত হয়েছিল। তা মা, মনের ভ্রান্তি, আবার এখানে নিলে। গুরু সবই এক একথা বুঝলে না।

দুপুরে প্রসাদ পাবার পর বিশ্রাম করতে গিয়ে কামারপুকুরের কথা উঠ্‌ল। "ঠাকুর যখন পেটের অসুখ করে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন, আমি তখন ছেলে মানুষ বউটি ছিলুম গো। * * ঠাকুর একটু রাত থাকতেই উঠে আমাকে বলতেন "কাল এই এই সব রান্না করো গো"। আমরা তাই রান্না করতুম। একদিন পাঁচ ফোড়ন ছিল না, দিদি (লক্ষ্মীর মা) বললে 'তা অমনিই হোক্, নেই তার কি হবে।" ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে ডেকে বলছেন—"সেকি গো, পাঁচফোড়ন নেই, তা একপয়সার আনিয়ে নাও না; যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নুন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো, পায়েসের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?" দিদি তখন লজ্জা পেয়ে আনতে দিলে। সেই বামন ঠাক্‌রুণ ও (যোগেশ্বরী) তখন ওখানে ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে মা বল্‌তেন।

আমিও তাঁকে শাশুড়ীর মত দেখতুম ও ভয় করতুম। তিনি বড় ঝাল খেতেন। নিজে রান্না করতেন—ঝালে পোড়া। আমাকে খেতে দিতেন, চোথ মুছতুম আর খেতুম। জিজ্ঞাসা করতেন "কেমন হয়েছে?" ভয়ে ভয়ে বলতুম—"বেশ হয়েছে।" রামলালের মা বলত—"হ্যাঁ, যে ঝাল হয়েছে।" আমি দেখতুম তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন; বলতেন "বৌমা ত বলেছে ভাল হয়েছে। তোমার বাপু কিছুতে ভাল হয় না। তোমাকে আর বেন্নুন্ দেবো না।" বলে মা খুব হাসতে লাগলেন। আবার ফুলের কথা উঠল। মা বললেন "দক্ষিণেশ্বরে থাকতে একদিন আমি রঙ্গন ফুল আর যুঁই ফুল দিয়ে সাত গড়ে মালা নয় লহর গেঁথেছি। বিকেল বেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়ি গুলি সব ফুটে উঠল। মাকে পরাতে পাঠিয়ে দিলুম। গয়না খুলে মাকে ফুলের মালা পরাণো হয়েছে। এমন সময়ে ঠাকুর মাকে দেখতে গিয়েছেন—দেখে একেবারে ভাবে বিভোর। বার বার বলতে লাগলেন, 'আহা কাল রংয়ে কি সুন্দরই মানিয়েছে।' জিজ্ঞাসা করলেন 'কে এমন মালা গেঁথেছে।' আমি গেঁথে পাঠিয়েছি একজন বলাতে তিনি বললেন 'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো, মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক্।' বৃন্দে ঝি গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এল। মন্দিরের কাছে আসতেই দেখি, বলরাম বাবু, সুরেন বাবু—এঁরা সব মায়ের মন্দিরের দিকে আসছেন আমি তখন কোথায় লুকুই। বৃন্দের আঁচলটি টেনে ঢাকা দিয়ে তার আড়ালে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলুম। ওমা, ঠাকুর তা জানতে পেরে বলছেন—"ওগো, ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছোনী উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়েই এস না। তাঁর ঐ কথা শুনে বলরাম বাবুরা সরে দাঁড়ালেন। গিয়ে দেখি মায়ের সামনে ঠাকুর ভাবে প্রেমে গান ধরে দিয়েছেন"। কয়েকজন স্ত্রী-ভক্ত আসতে উপস্থিত প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। আমারও যাবার সময় হয়ে এল। মা বললেন আমাকে একটি জিনিষ দেবেন—কাপড় কেচে এসে। আবার মুক্তির কথা উঠল। বললেন—"ও কি জান মা,

যেন ছেলের হাতের সন্দেশ—কেউ কত সাধাসাধি করছে, 'একটু দে না একটু দে না', তা কিছুতে দেবে না, অথচ যাকে খুসী হল টপ্ করে তাকে দিয়ে ফেল্লে। একজন সারা জীবন মাথা খুঁড়ে কিছু করতে পারলে না, আর একজন ঘরে বসে পেয়ে গেল। যেমনি কৃপা হল, অমনি তাকে দিয়ে দিলে। কৃপা বড় কথা"—এই বলে কাপড় কাচতে গেলেন। বৈকালীন ভোগের পর, বেলপাতায় মুড়ে আমাকে যা দেবেন বলেছিলেন দিয়ে বললেন 'মাদুলি করে পোরো।' এইটির কথা কাউকে ব'ল না। তা হলে সবাই আমাকে ছিঁড়ে খাবে"। শ্রীশ্রীমাকে বালিগঞ্জে শ্রীমানের বাসায় যাবার কথা বল্লুম। মা বল্লেন যাবেন। মা আমাকে বল্লেন "আমাকে একখানা শীতল পাটী দিও মা, আমি শোব"। আমি—সেত আমার সৌভাগ্য। অবশ্য আন্‌বো। আমি প্রণাম করে বিদায় হলুম। মা বললেন 'আবার এস।'

জ্যৈষ্ঠ, ১ম সপ্তাহ ১৩২১—আজ মা বালিগঞ্জের বাসায় আসিবেন। পূর্ব্ব দিন হতে সব বন্দোবস্ত হচ্ছে। মার জন্য পৃথক আসন, নূতন শ্বেত পাথরের বাসন ইত্যাদি কেনা হয়েছে। মা আসবেন! আনন্দে সারা রাত ঘুমই হল না। কথা ছিল, মা অপরাহ্নে আসবেন। পাছে কোন কারণে তাঁর অন্য মত হয় তজ্জন্য প্রাতেই শ্রীমান—বাগবাজারে মার বাড়ীতে গাড়ী নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। আর আমরা সংসারের কাজ সব সকাল সকাল চুকিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলুম। মায়ের আসন পেতে চারিদিকে ফুল সাজিয়ে রাখলুম। সমস্ত ঘর দোরে গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলুম, ফুলের মালা গেঁথে রাখলুম ও বড় দুটি ফুলের তোড়া করে মায়ের আসনের দু'পাশে দিলুম। বেলা পড়তেই পথ চেয়ে আছি, কখন মা আসেন। এইবার এতক্ষণে সেই শুভ মুহূর্ত্ত! গাড়ীর শব্দ হতেই সকলে নীচে নেমে এলুম। গাড়ী থাম্‌তেই দেখলুম মা হাসি মুখে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে চেয়ে আছেন। গাড়ী হতে নাম্‌তেই সকলে তাঁর পদধূলি নেবার জন্য ব্যস্ত হলেন।

মায়ের সঙ্গে গোলাপ-মা, ছোট মামী, নলিনীদিদি, রাধু এবং চার পাঁচ জন সাধু ব্রহ্মচারী এসেছেন। অনন্তর মাকে উপরে নিয়ে আসনে বসিয়ে প্রণাম করলুম। মা বললেন 'খেয়েছ ত? আমি কত তাড়াতাড়ি করেছি, কিন্তু কিছুতেই আর এর চেয়ে সকালে হয়ে উঠল না। এতক্ষণে তবে আসা হল'—বলে চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। আমি আর বসতে পারলাম না—খাবারের আয়োজন করতে ও নিমকি ভাজতে হবে। আর সব খাবার ইতিপূর্ব্বে ঠিক করা ছিল।

উপরে গ্রামোফনে গান হচ্ছে। কাজ করতে করতে একটু ফাঁক পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি মা কলের গান শুনে ভারী খুসী, আর, 'কি আশ্চর্য্য কল করেছে' বলে বালিকার মত আনন্দ করচেন। খুব গ্রীষ্ম—মা বারান্দায় শীতল পাটীতে শুয়ে আছেন ও তাঁর আশে পাশে সবাই বসে আছেন। একটি পাথরের বাটীতে বরফ জল দেওয়া হয়েছে—মাঝে মাঝে খাচ্ছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন 'ওগো, একটু বরফ জল খেয়ে যাও'। মায়ের প্রসাদী জলটুকু খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নীচে রান্নাঘরে আবার ছুটে এলুম। আজ এত তাড়াতাড়ি করেও যেন কাজ আর সেরে উঠতে পাচ্ছিনে।

সন্ধ্যার পর পাশের ঘরে ভোগ সাজান হলো। মা এসে গোলাপ-মাকে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে দিতে বলতে তিনি বললেন—'তুমিই দাও, তুমি উপস্থিত থাকতে আমি কেন?' তখন শ্রীশ্রীমা নিজেই ভোগ নিবেদন করতে বসলেন। এবং 'আহা কি সুন্দর সাজিয়েছে!' বলে তারিপ করতে লাগলেন। এইরূপে সবেতেই বালিকার মত আনন্দ প্রকাশ করে আমাদের অপরিসীম আনন্দ দিতে লাগিলেন। ভোগ দেওয়া হলে মা ও অন্য সকলে প্রসাদ গ্রহণ করতে বসলেন। সকলের আগে মায়ের খাওয়া হয়ে গেল। বারান্দায় একখানি বেতের ইজি চেয়ারে বসে আমায় ডেকে বলছেন 'ওগো, আমায় পান দিয়ে যাও'। আমি তখনও গোলাপ-মায়েদের পরিবেশন করছিলুম। তাড়াতাড়ি গিয়ে পান দিয়ে এলুম। মাকে পান চেয়ে খেতে হল বলে একটু লজ্জিত হলুম। সুমতিকে বললুম 'পান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিস নি,

দেখছিস্ আমি এদিকে রয়েছি?' একটু পরে মা একবার নীচে কল তলায় গেলেন। আমি আলো নিয়ে সঙ্গে গেলুম। বাগানের এই দিকটি বেশ নির্জ্জন, পথে দু পাশে ক্রোটন গাছের সার। মা সস্নেহে বলছেন 'আচ্ছা, একটুও বস্‌তে পেলে না কাজের জন্যে। যেয়ো ওখানে, তোমার মাকে নিয়ে যেয়ো'। মা বেড়াতে এসেছিলেন। ভাগ্য-ক্রমে ঘরে বসেই শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেয়ে গেলেন।

তার পর বিদায়ের ক্ষণ এল। মোটর গাড়ীতে যেতে মায়ের মত নাই। কারণ একবার মাহেশে রথ দেখতে যেতে তাঁর মোটরের তলায় নাকি একটা কুকুর চাপা পড়ে কিন্তু অত দূরে বাগবাজারে মোটরে না গেলে রাত হবে, কষ্টও হবে বলায় ভক্তদের মতেই শেষে রাজী হলেন। বারবার ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রস্তুত হলেন এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ করে গাড়ীতে উঠলেন।

১৩২৪—আজ সন্ধ্যায় গেছি। কাছে হবে বলে এখন বাগবাজারের বাসায় আছি এবং রোজই প্রায় শেষ বেলায় মার কাছে যাই। নিরিবিলি দেখে আজ তাঁকে একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলুম:—'মা, একদিন স্বপ্নে ঠাকুরকে দেখি। আপনি তখন জয়রামবাটীতে। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলুম "মা কোথায়?" বললেন "ঐ গলি ধরে যাও, খড়ের ঘর, সামনের দাওয়ায় বসে আছে।" মা শয়ন করে ছিলেন—উৎসাহে একেবারে উঠে বসে বললেন 'ঠিক মা, ঠিকইত দেখেছ!'

আমি 'সত্য না কি মা! আমার কিন্তু এতদিন ধারণা ছিল, আপনার পিত্রালয় ইটের কোঠাবাড়ী। তা মাটীর দাওয়া, খড়ের চালা দেখে ভাবলুম মনের ভ্রান্তি।'

'ভগবানের জন্য তপস্যা করা প্রয়োজন' এই কথা প্রসঙ্গে মা এখন বললেন আহা গোলাপ যোগীন ওরা কত ধ্যানজপ করেছে। যোগীন কতবার চাতুর্ম্মাস্য করেছে—একবার শুধু কাঁচা দুধ ও ফল খেয়ে ছিল। এখনও কত জপধ্যান করে। গোলাপের মনে বিকার নেই, দিলে হয়ত খানিকটা দোকানের রাধাঁ আলুর দমই খেয়ে।

আজ মায়ের বাড়ীতে কালীকীর্ত্তন হবে। মঠের সন্ন্যাসী

মহারাজেরাই কীর্ত্তন করবেন। রাত প্রায় সাড়ে আটটায় কীর্ত্তন আরম্ভ হল। মেয়েরা গান শুনবার জন্য অনেকেই বারান্দায় গেলেন। আমি মায়ের পায়ে তেল মালিস করে দিচ্ছিলাম। ওখান হতেও বেশ শুনা যাচ্ছিল। এই সব গান আরও কতবার শুনেছি, কিন্তু ভক্তদের মুখে গানের শক্তি যেন আলাদা—কতই ভাবপূর্ণ বোধ হল। চোখে জল আসতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর যে সব গান করতেন, মাঝে মাঝে যখন সেই গান দু একটি হইতেছে, মা সোৎসাহে বলতে লাগলেন 'এই গো। এইটি ঠাকুর গাইতেন'। তারপর যখন 'মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে' এই গানটি আরম্ভ হল তখন মা আর শয়ন করে থাক্‌তে পারলেন না—চোখে দুই এক ফোঁটা অশ্রু, উঠে বললেন 'চল মা, বারান্দায় গিয়ে শুনি।' কীর্ত্তন শেষ হলে মাকে প্রণাম করে বাসায় ফিরলুম।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫—বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটি হতে এসেছেন। ম্যালেরিয়াজ্বরে ভুগে দেহ জীর্ণ শীর্ণ। একটু সুস্থ হলেই দেখা করা উচিত মনে করে এবং তাঁর অসুস্থ শরীর বলে এখনও কাউকে বড় একটা দর্শন করতে দেওয়া হচ্ছে না শুনে এতদিন দেখতে যাইনি। পরে, 'মেয়েদের আসতে বাধা নাই' আজ এই মর্ম্মে চিঠী পেয়ে গিয়ে দেখি, মা পাশের ঘরটিতে শুয়ে আছেন। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ। আমাকে দেখেই বললেন 'এস মা, এত দিনে এলে গো"। "হ্যাঁ মা, কবেইত আসতুম কিন্তু শুনে ছিলুম আপনার অসুখের জন্য আপনার ভক্ত-ছেলেরা এখনও সকলের অবাধ আসাটা পছন্দ কচ্ছেন না, তাই এতদিন আসিনি। আপনার জন্য আমাদের প্রাণ ছট্ ফট্ করে, আর আপনি বাপের বাড়ী গিয়ে এতদিন আমাদের বেশ ভুলে ছিলেন। তা আপনার ত সর্ব্বত্রই ছেলে মেয়ে রয়েছে, অভাবত নেই"। মা হেসে বললেন "না মা, না, তোমাদের কারও কথা আমি ভুলিনি, সকলের কথাই মনে করেছি"। "আপনার অসুখ শুনে আমরাত ভয়েই মরি না জানি কেমন আছেন"। "আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি মা, দেখ না পায়ে হাতে কি ছাল চামড়াটা উঠে যাচ্ছে"। পায়ে হাত দিয়ে দেখি সত্যই ঐরূপ হয়েছে।

একখানি কাপড় নিয়ে গিয়েছিলুম, দিতেই বলছেন "বেশ কাপড়খানি এনেছ মা, এবার কাপড় কমও আছে, পুজোর সময় ত এখানে ছিলুম না। বউমা সেদিন এসেছিল। তারা সব ভাল আছে? শ্রীমানশো—র কথা জিজ্ঞাসা করে বললেন "তার এখন কি করে চলছে? কাজ কর্ম্ম চাকরী বাকরী কিছুরই ত এখন সুবিধা নাই। কি পোড়া যুদ্ধই লেগেছে! কতদিনে যে থামবে, লোকে খেয়ে পরে বাঁচবে। তা এ যুদ্ধটা গোড়ায় লাগল কেন বলত মা?" আমি কাগজ পত্রে যা পড়েছিলুম কিছু কিছু বলতে লাগলুম।

অধিক কথা কইলে পাছে তাঁর অসুখ বাড়ে এই ভেবে আজ অল্পক্ষণ থেকেই বিদায় গ্রহণ করলুম।

৬ই শ্রাবণ, ১৩২৫—রাত সাড়ে সাতটা, মায়ের শ্রীচরণ দর্শনে গিয়েছি। প্রণাম করতেই বললেন "এস মা, বস। ভারী গরম, বসে একটু ঠাণ্ডা হও, তারা গিয়ে পৌঁছেচে—সুমতিরা?" "হ্যাঁ মা, তারা গেলে পরেই আমি এসেছি"।

মা—একখানা পাখা রাধুকে দিয়ে এস, আর এই মরিচাদি তেলটা নাও। পিঠে মালিস করে দাও। দেখেচ না হাতে, পেটে, পিঠে আর যায়গা নেই—আমবাতে ঘামাচিতে ভরে গেছে"। আমি মালিস করতে বসতেই আরতির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। মা উঠে বসে করযোড়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। অন্য সকলে আরতি দেখতে ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন।

মা—দেখমা, সকলেই বলে 'এ দুঃখ, ও দুঃখ—ভগবানকে এত ডাকলুম তবু দুঃখ গেল না'। কিন্তু দুঃখইত ভগবানের দয়ার দান"। সেদিন আমার মনটা বড় দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল, তাই কি মা টের পেয়ে ঐ কথাগুলি বললেন। মা বলতে লাগলেন "সংসারের দুঃখ কে না পেয়েছে বল? বৃন্দে বলেছিল কৃষ্ণকে 'কে বলে তোমাকে দয়াময়? রাম অবতারে সীতাকে কাঁদিয়েছ, কৃষ্ণ অবতারে রাধাকে কাঁদাচ্ছ। আর, কংস-কারাগারে দুঃখ-কষ্টে দিনরাত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছে তোমার পিতা মাতা। তবে যে তোমাকে ডাকি তা এই জন্য যে তোমার নামে শমন ভয় থাকে না।

শচীন ও দেবব্রত মহারাজের কথা উঠল। মা বললেন "শচীন বড় ভাগ্যবান ছিল। দেবব্রত যে রাত্রে দেহ রাখলে সেই রাতে বৃষ্টি ঝড় লোক জন এ মঠে তেমন কেহ ছিল না। আর শচীন প্রাতে গেল—মঠ লোকে ভরপুর" *। দেবব্রত মহারাজের কথায় বললেন "দেবব্রত যোগীপুরুষ ছিল"।

একটি স্ত্রীলোকের কথা উঠ্ল। মা বললেন "ঐরূপ চেহারার লোকের ভক্তি বড় একটা হয় না—ঠাকুর বলতেন শুনেছি"। আমি বললুম "হাঁ মা, আবার কাণ তুলসে, ভিতর বুদে ইত্যাদি আছে ঠাকুরের বইয়ে পড়েছি"। মা—"ওঃ, সেই কথা বলছ! সে নারাণদের বাড়ী গিয়ে ও কথা হয়েছিল। একজন একটি স্ত্রীলোককে রেখে ছিল। সে স্ত্রীলোকটি এসে ঠাকুরের নিকট আক্ষেপ করে বলেছিল "ওইত আমাকে নষ্ট করেছে। তার পর আমার যত গহনা, টাকা ছিল সেই সবও নিয়েছে" ঠাকুর ত সকলের অন্তরের সব কথাই জানতে পারতেন, তবু জিজ্ঞাসা করতেন। স্ত্রীলোকটির কথা শুনে বললেন 'তাই নাকি? মুখে কিন্তু ওত খুব ভক্তির কথা সব বলে!' ঐ কথা ব'লে তিনি ঐ শ্লোকটি বল্লেন। যাহক্ মাগী ত তাঁর কাছে পাপের কথা সব ব্যক্ত করে খালাস পেয়ে গেল"।

নলিনী—তাকি হয় মা? পাপের কথা একবার মুখে বললে, আর সব ধুয়ে গেল—তাই যায় কি?" মা—"তা যাবেনা? তিনি যে মহাপুরুষ, তাঁর কাছে বললে যাবে না? আর এক কথা শোন, পাপ পুণ্য প্রসঙ্গ যেখানে হয় সেখানে যত লোক থাকে, তাদের সকলকেই সেই ভাল মন্দের একটু না একটু অংশী হতে হয়"।

নলিনী—"তা কেন হবে?"

মা আমাদের বললেন "শোন মা কেমন করে হয়। মনে করে, এক

---

* দেবব্রত মহারাজ যখন দেহত্যাগ করেন তখন শ্রীশ্রীমায়ের (দেশে) কোয়ালপাড়ায় খুব সাংঘাতিক অসুখ। তজ্জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সব তথায় গিয়েছিলেন। শচীন মহারাজ যখন দেহ রাখেন তখন সকলেই এখানে, শ্রীশ্রীমাও ছিলেন।

জন তোমাদের কাছে তার পাপ পুণ্যের কথা বলে গেল। মনে কখনও সেই লোকের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ ভাল মন্দ কাজ গুলিরও চিন্তা এসে পড়বে। এইরূপে সেই সব ভাল বা মন্দ দুইই তোমাদের মনের উপর একটু কাজ করে যাবে। কি বল মা, তাই না ?"

আবার লোকের দুঃখ কষ্ট ও অশান্তির কথা উঠায় মা বলতে লাগলেন "দেখ, লোকে আমার কাছে আসে, বলে জীবনে বড় অশান্তি, ইষ্ট পেলুম না, কিসে—শান্তি হবে মা ?—কত কি বলে! আমি তখন তাদের দিকে চাই, আর আমার দিকে চাই, ভাবি এরা এমন সব কথা কেন বলে! আমার কি তা হলে সবই অলৌকিক। আমি অশান্তি বলেত কখনো কিছু দেখলুম না! আর, ইষ্ট দর্শন, সে তো হাতের মুঠোর ভিতর—একবার বসলেই দেখতে পাই"।

মার 'ডাকাত বাবার' কথাটি বইয়ে পড়েছিলুম। তাঁর নিজ মুখ হতে সেইটি শোনবার ইচ্ছা হওয়ায় মাকে এখন জিজ্ঞাসা করলুম "মা, বইয়ে পড়েছি একবার আপনি দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি সঙ্গে ছিলেন। আপনি নাকি তাঁদের সমান দ্রুত চলতে না পেরে ও সন্ধ্যা হয়ে আসচে দেখে তাঁদের এগিয়ে যেতে বলে নিজে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলেন, এমন সময়ে আপনার সেই বাগ্‌দি মা বাপের সঙ্গে দেখা হয় ? মা—'আমি একেবারে একলা ছিলুম, তা ঠিক্ নয়। আমার সঙ্গে আরও দুজন বুদ্ধ গোছের স্ত্রীলোক ছিলেন—আমরা তিন জনেই পিছিয়ে পড়েছিলুম। তারপর সেই রূপার বালা পরা, ঝাঁকড়া চুল, কালো রং, লম্বা লাঠী হাতে পুরুষটিকে দেখে বড্ড ভয় পেয়েছিলুম। তখন ওপথে ডাকাতি হত। লোকটি, আমরা যে ভয় পেয়েছি, তা বুঝ্‌তে পেরে জিজ্ঞাসা করলে—"কে গা, তোমরা কোথায় যাবে ?" বললুম "পূবে"। "সে এ পথ নয়, ঐ পথে যেতে হবে।" "আমি তবুও এগুই নে" দেখে সে তখন বললে "ভয় নেই, আমার সঙ্গে মেয়ে লোক আছে, সে পেছিয়ে পড়েছে।" তখন "বাপ্" ডেকে তার আশ্রয়ে যাই। তখন কি এমনি ছিলুম মা ? কত শক্তি ছিল,

তিন দিনের পথ হেঁটে এসেছি। বৃন্দাবন পরিক্রমা করেছি, কোন কষ্ট হয় নি।”

“দক্ষিণেশ্বরে নবত দেখেছ ? সেইখানে থাকতুম। প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যাস হয়ে গিছল। দরজার সাম্‌নে গেলেই মাথা নুয়ে আস্‌ত। কলিকাতা হতে সব মোটা সোটা মেয়ে লোকরা দেখতে যেত, আর দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ত “আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো,—যেন বনবাস গো !” নলিনী ও মাকুকে লক্ষ্য করে—“তোরা হলে কি একদিনও সেখানে থাকতে পারতিস ?” তাঁরা বললেন “না পিসিমা, তোমার সবই আলাদা।” আমি বললুম গুরুদাস বর্ম্মণের বইয়ে পড়েছি শেষে নাকি আপনাকে একখানি আট-চালা ঘর করে দিয়েছিল ও ঠাকুর একদিন সেই ঘরে গিয়ে খুব বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় নিজের ঘরে আসতে পারেন নি ? মা—কৈ মা, কোথায় আট্‌চালা ?—অমনি চালা ঘর। শরতের বইএ সব ঠিক্ ঠিক্ লিখছে। মাষ্টারের বইও বেশ—যেন ঠাকুরের কথাগুলি বসিয়ে দিয়েছে। কি মিষ্টি কথা ! শুনেছি ঐ রকম বই আরও চার পাঁচ খণ্ড হতে পারে এমন আছে। তা এখন বুড়ো হয়েছে, আর পার্‌বে কি ? বই বিক্রী করে অনেক টাকাও পেয়েছে—শুনেছি সে টাকা সব জমা রেখেছে। আমাকে জয়রামবাটীতে বাড়ী টাড়ী কর্‌তে প্রায় এক হাজার টাকা দিয়েছে (বাড়ীর জন্য ৪০০৲ ও খরচের, জন্য ৫০০৲) আর মাসে মাসে আমাকে দশ টাকা দেয়। এখানে থাকলে কখনো কখনো বেশী—বিশ, পঁচিশ টাকাও দেয়। আগে যখন স্কুলে চাকরী কর্‌ত—তখন মাসে দু টাকা করে দিত। আমি —“গিরীশ বাবু নাকি মঠে অনেক টাকা দিয়েছেন।” মা—“সে আর বেশী কি দিয়েছে ? বরাবর দিয়ে ছিল বটে সুরেশ মিত্তির। তবে হ্যাঁ, কতক্ কতক্ দিয়েছে বৈ কি ! আর আমাকে দেড় বছর রেখেছিল, বেলুড়ে নীলাম্বরের বাড়ীতে। তবে দু হাজার পাঁচ হাজার মঠে যে দিয়েছে তা নয়। দেবেই বা কোথেকে ? তেমন টাকাই বা কোথা

ছিল? আগে ত পাষণ্ড ছিল, অসৎ সঙ্গে থিয়েটার করে বেড়াত। তবে বড় বিশ্বাসী ছিল, তাই ঠাকুরের অত কৃপা পেয়েছিল। এবারে ঠাকুর ওর উদ্ধার করে গেলেন। এক এক অবতারে এক এক পাষণ্ড উদ্ধার করেছেন; যেমন গৌর অবতারে জগাই মাধাই— এই আর কি! তবে ঠাকুর এক সময়ে এও বলেছিলেন যে "গিরীশ শিবের অংশ।"

মা—"টাকাতে কি আছে মা? ঠাকুর ত টাকা ছুঁতেই পারতেন না। হাত বেঁকে যেতো। তিনি বলতেন জগতটাই যে মিথ্যা। ওরে রামলাল, যদি জানতুম জগতটা সত্যি তবে তোদের কামারপুকুর টাই সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি ও সব কিছু না—ভগবানই সত্যি।

মাকু আক্ষেপ কচ্ছে এক জায়গায় থির হয়ে বসতে পার্‌লুম না! "মা বললেন থির কিগো? যেখানে থাকবে সেইখানেই থির। স্বামীর কাছে গিয়ে স্থির হবি ভাব্‌চিস, সে কি করে হবে? তার অল্প মাইনে চলবে কি করে? তুইত (এখানে যেন) বাপের বাড়ীতেই রয়েছিস। বাপের বাড়ী লোকে থাকে না? এই ছাখনা এ রয়েছে নিজের সংসার ছেড়ে তোরা এতটুকু ত্যাগ্ কর্‌তে পারিস্‌নি? দেখ্ না একে, কি শান্ত মূর্ত্তি, আর আমি আছি বলে আছে, আর তোরা থাকতে পারিস্ নে?"

আমি—থাক মা, ঠাকুরের কথা আর একটু বলুন। মা—"বইএ যে লেখে, সব ঠিক হয় না। আমাকে যে ঠাকুর ষোড়শী পূজা করেছিলেন সে কথা রামের বইএ যা লিখেছে তা ঠিক হয়নি।" ঘটনাটি বলে শেষে বললেন 'বাড়ীতে তো নয়ই—দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যেখানে গোল বারান্দার কাছে গঙ্গা জলের জালাটি রয়েছে ঐ খানে, হৃদয় আয়োজন করে দিয়েছিল।

এই সময়ে যোগেন-মা এসে জান্‌লার পাশে দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে কি কথা বলতে যেতেই মা তাঁকে বললেন 'এদিকে এসনা, তোমাদের যে দেখতেই পাইনে। যোগেন-মা হাসতে হাসতে মার কাছে এলেন। আসবার সময় আমার গায়ে তার পা ঠেকে গেল। তিনি হাত জোড়

করে প্রণাম করছেন দেখে আমি শশঃব্যস্তে উঠে প্রণাম করে বল্‌ছি 'একি যোগেন-মা যে আপনার চরণ ধূলিরও যোগ্যা নয় তার গায়ে পা ঠেকেছে বলে প্রণাম!" যোগেন মা—"সে কি মা, ছোট সাপও সাপ, বড় সাপও সাপ, তোমরা সব ভক্ত যে"। মায়ের পানে চেয়ে দেখি মুখে সেই করুণামাখা হাসি। রাত্রি অনেক হয়েছে দেখে কিছুক্ষণ পরে প্রণাম করে বিদায় লইলাম।

১২ই শ্রাবণ ১৩২৫—সন্ধ্যার পরে গিয়েছি। এখনও আরতি আরম্ভ হয় নাই। মা রাস্তার ধারের বারান্দায় একটি আসন পেতে বসে জপ করছেন। ভারী গরম, কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই মা বাতাস কর্‌বার জন্য পাখাখানি হাতে দিলেন। বাতাস কর্‌ছি, এমন সময় একটি বর্ষীয়সী বিধবা এসে মাকে প্রণাম করতেই মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'কার সঙ্গে এলে?' 'দরোয়ানের সঙ্গে এসেছি'। বলে তিনি আমার কাছে পাখাখানি চাইলেন—মাকে বাতাস কর্‌বেন। আমি তখনি দিলুম। মা বললেন 'থাক্ থাক্ ওই দিক্।' তিনি বললেন "কেন মা, আমার হাত দিয়ে একটু হবে না? ওরা ত দিচ্চেই"। মা যেন একটু বিরক্ত হলেন। তিনি দু এক মিনিট বাতাস করেই বললেন 'তবে আসি মা, মহারাজের কাছে একবার যেতে হবে।' মায়ের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেই মা মহা বিরক্ত হয়ে বললেন 'আঃ, পায়ে কেন? একেত দেহ খারাপ— ঐ করে করে ত এই সব (অসুখ) হল।' তিনি চলে যাবার পরে জল দিয়ে পা ধুয়ে ফেললেন। বিধবা স্ত্রীলোকটি গোলাপ-মাকে একটু দেখে এসে (তার খুব অসুখ) পুনরায় মায়ের কাছে বিদায় নিতে এলেন। মা বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এস গে"। এর পূর্ব্বে মাকে কারও সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্‌তে আমি চক্ষে দেখিনি।

পরে মা আমাকে বললেন 'আমার আসনখানা তুলে ঘরে নিয়ে যাও ও বিছানাটা নীচে পেতে দাও।' মা এসে শয়ন করলেন এবং হাঁটুতে ঘি মালিস করে দিতে বললেন। কিছু পরে বললেন 'এখন পিঠে মরিচাদি তেল মালিস করে দাও।

ললিত বাবুর কথা উঠল। আমি বল্লুম 'মা তিনি ত শুনেছি আপনার

কৃপাতেই বেঁচে গেছেন। মা—'তার অনেক বাসনা ছিল। তার যা অবস্থা হয়েছিল মা, বাল্‌তি বাল্‌তি জল বেরুত পেট হতে। একেবারে শেষ অবস্থাতেই দাঁড়িয়েছিল। তখন বড় কাতর হয়ে বল্লে—'মা কামারপুকুরে, জয়রাম বাটীতে মন্দির কর্‌ব, হাঁসপাতাল দেবো, আমার বড় আশা ছিল, কিছুই কর্‌তে দিলিনি।' 'আহা' ঠাকুর বাঁচিয়েছেন। ওখানে সব কর্‌বার ইচ্ছা, ওর মত আর কোন ভক্তের নেই। বেঁচেছে, এখন কাজ করুক। আমাকে একটি পুকুর কিনে দিয়েছে।"

১৩ই শ্রাবণ ১৩২৫—আজ বৈকালে প্রেমানন্দ স্বামিজী দেহত্যাগ করিলেন। রাত্রে মায়ের নিকট গেলাম। মা বললেন "এসেছ মা, বস। আজ বাবুরাম আমার চলে গেল। সকাল হতে চক্ষের জল পড়ছে" বলে কাঁদতে লাগলেন। "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিষ ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরাম রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত!"

"বাবুরামের মা ছিল আঁটকুড়ো ঘরের মেয়ে, বাপের বিষয় পেয়ে ছিল। সে জন্য একটু অহঙ্কার ছিল। নিজেই বল্‌ত 'হাতে বাউটী, কোমরে সোণার চন্দ্রহার পরে মনে করতুম ধরা যেন সরা'। চারিটি সন্তান রেখে সে গেছে। একটি কেবল তার পূর্ব্বে মারা গিয়েছিল।"

খানিক পরে দেখি মাঝের ঘরের দক্ষিণের দেয়ালে ঠাকুরের যে বড় ছবি ছিল তার পায়ে মাথা রেখে করুণ স্বরে বলছেন "ঠাকুর নিলে!"—সে কি মর্ম্মভেদী সুর! আমাদেরও বড় কান্না পেতে লাগল।

এ দিকে গোলাপ মার খুব অসুখ—মরণাপন্ন রক্তামাশয় চল্‌ছে।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫—রাত সাড়ে সাতটা। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরে বসে আছেন। গিয়ে প্রণাম করে উঠতেই বললেন "বারান্দায় আমার আসনখানি পেতে দাও ত মা, আর তক্তা পোষের পাশে মেজের পাতা ঐ বিছানাটা গুটিয়ে রাখ, আরতির সময় ওরা ওখানে বসে কাঁজ (গং) বাজাবে"। বিলাস মহারাজ আরতির আয়োজন করতে ছিলেন। বারান্দায় আসন পেতে দিতে, বললেন "কমণ্ডলুতে গঙ্গা জল আছে, নিয়ে এস"। গঙ্গাজলে হাত মুখ ধুয়ে জপে বসলেন এবং পাখাখানি আমার

হাতে দিয়ে বাতাস করতে বললেন। একটু পরেই আরতি আরম্ভ হল। শ্রীশ্রীমা 'গুরুদেব, গুরুদেব' বলে জোড় হাতে প্রণাম করলেন এবং জপ শেষ করে আরতি দেখতে লাগলেন। আরতি হয়ে গেলে বিলাস মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে উঠে বললেন "মা আজ ভারী গরম।" মা ব্যস্ত হয়ে বললেন "একটু বাতাস করবে ?" তিনি বললেন "কে করবে মা ?" "কেন, এই মা করবে, করতো মা"। আমি তাঁর দিকে দু একবার বাতাস করতেই তিনি বললেন "না মা, উনি আপনাকে বাতাস করচেন আপনাকেই করুন" বলে বাহিরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মা প্রেমানন্দ স্বামিজীর কথা তুলে বললেন "দেখ মা, বাবুরামের দেহেতে আর কিছু ছিল না, কেবল কাঠামখানি ছিল"। এমন সময়ে চন্দ্র বাবু উপরে এসে ঐ কথায় যোগ দিলেন ও বাবুরাম মহারাজের দেহ সংকারের জন্য কয়েকজন ভক্ত যে চন্দন কাঠ, ঘি, ধূপ, গুগ্‌গুল, ফুল ইত্যাদি অনেক টাকার জিনিষ দিয়েছেন তাই বলতে লাগলেন। মা বললেন "আহা, ওরাই টাকার সার্থক করে নিলে। ঠাকুরের ভক্তের জন্য দেওয়া। ভগবান ওদের দিয়েছেন, আরও দিবেন"। চন্দ্র বাবু প্রণাম করে উঠে গেলেন। মা বলতে লাগলেন, "শোন মা, যত বড় মহাপুরুষই হোক্, দেহ ধারণ করে এলে দেহের ভোগটি সবই নিতে হয়। তবে তফাৎ এই, সাধারণ লোক যায় কাঁদতে কাঁদতে, আর ওঁরা যান হেসে হেসে—মৃত্যুটা যেন খেলা !"

"আহা, বাবুরাম আমার বালক কালে এসেছে। ঠাকুর কত রঙ্গের কথা বলতেন, আর নরেন, বাবুরাম এরা আমার হেসে কুটি পাটি হত। একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধ শুদ্ধ একটা বাটী নিয়ে সিঁড়ি উঠ্‌তে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ ত গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন বাবুরাম এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলছেন "তাই ত, বাবুরাম, এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে ? কে আমায় খাওয়াবে ?" তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরী করে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম। আমি নত্ পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে

হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠারে বলছেন "ও বাবুরাম, ঐ ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস্!" ঠাকুরের কথা শুনে নরেন বাবুরাম ত হেসে খুন! এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন। তার পর তিন দিন পরে ফোলাটা একটু কমলে ওরা আমাকে ধীরে ধীরে নিয়ে যেত—আমি খাইয়ে আসতুম। ও কয়দিন গোলাপ না কে মণ্ড তৈরী করে দিয়েছিল, নরেন খাইয়ে দিত।"

"বাবুরাম তার মাকে বলত 'তুমি আমাকে কি ভালবাস? ঠাকুর আমাদের যেমন ভালবাসেন, তুমি তেমন ভালবাসতে জান না।' সে বলত 'আমি মা, আমি ভালবাসি না, বলিস্ কিরে?'—এমনি তাঁর ভালবাসা ছিল। বাবুরাম চার বছরের সময়েই বলত 'আমি বে' করব না—বে' দিলে মরে যাব'। ঠাকুর যখন বলেছিলেন—'আমি পরে সূক্ষ্ম শরীরে লক্ষ মুখে খাব, বাবুরাম কথায় বলেছিল তোমার লক্ষ টক্ষ আমি চাইনে, আমি চাই তুমি এই মুখটিতে খাবে, আর আমি এই মুখটিই দেখব।"

'অনেক গুলো ছেলে পিলে হয় যার, ঠাকুর তাকে গ্রহণ করতেন না। একটা দেহ হতে পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে। ওরা কি মানুষ! সংযম নেই, কিছু নেই—যেন পশু।'

গোলাপমার অসুখ আজ একটু কম। কি ঔষধ দিয়ে ডুস দেওয়া হয়েছে—সরলা এসে বললেন। ডাক্তার বিপিন বাবু বলেছেন 'তিন মাস লাগবে সারতে। মা বললেন রক্তামাশয় কি সোজা ব্যারাম তা লাগবে বৈ কি। ঠাকুরের অমনি আমের ধাত্ ছিল। দক্ষিণেশ্বরে এই সময় (বর্ষাকাল) প্রায় আমশায় হত। নবতের দিকে লম্বা বারান্দার ধারে একটা কাটের বাক্স ফুটো করে নীচে সরা পেতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শোচে যেতেন। আমি সকালেরটা ফেলে আস্তুম। বিকালেরটা ওরা ফেলতো। সেই সময়ে একটি মেয়ে আসে বললে কাশীতে থাকে। সে প্রদীপের শীষে আঙ্গুল তাতিয়ে প্রত্যহ ঠিক একুশবার করে তাত দিতে মলদ্বারের ফুলো টনটনানি কমে গেল। আমি তখন ভাবতুম একে আমাশয়, তাতে গরম সেক বেড়েই বা যায়। কিন্তু বাড়ল না, সেরে

গেল। সেই মেয়েটিই আমাকে সে বাড়ী * থেকে নহবতে নিয়ে এসেছিল বললে 'মা, তাঁর এখন অসুখ, আর তুমি এখানে থাক্‌বে?' আমি বললুম 'কি করব, ভাগ্নে-বউটি একা থাক্‌বে, ভাগ্নে হৃদয় সেখানে ঠাকুরের কাছে। মেয়েটি বললে 'তা হোক্, ওরা লোকটোক রেখে দেবে। এখন তোমার কি তাঁকে ছেড়ে দূরে থাকা চলে? আমি তার কথা শুনে তার সঙ্গে চলে এলুম। কয়েক দিন পরে তিনি একটু সারলে সে মেয়েটি চলে গেল। কোথায় গেল আর কোন খোঁজ পেলুম না। তার পর আর দেখা হয়নি। সে আমার বড় উপকার করেছে। কাশী গিয়েও তার খোঁজ করেছিলুম, পাইনি। তাঁর (ঠাকুরের) প্রয়োজনে সব কোথা হতে আসত, আবার কোথা চলে যেত।

আমিও এক বছর আমাশয়ে ভুগেছি মা। সেকি শরীর হয়ে গেল! দেশে আমাদের কলু পুকুরের ধারে শৌচে যেতুম। বার বার যেতে কষ্ট হত বলে সেখানটিতেই শুয়ে পড়ে থাকতুম। একদিন পুকুর জলে শরীর পানে চেয়ে দেখি শুধু হাড় সার হয়েছে। দেহেতে আর কিছু নাই! তখন ভাবলুম—'আরে ছিঃ! এই দেহ তবে আর কেন? এই খানেই দেহটি থাক্ দেহ ছাড়ি।" পরে, নিবি (কি নাম বল্লেন ঠিক মনে নাই) এসে বললে "ওমা তুমি এখানে পড়ে কেন? চল, চল, ঘরে চল" বলে ঘরে নিয়ে এল। এখন আর পুকুর ধারে সে সব জায়গা নেই। ভাগ করে সব ঘিরে ঘুরে নিয়েছে।" রাত্র সাড়ে দশটা হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আমি বিদায় হলুম।

* দক্ষিণেশ্বরে গ্রামের ভিতরে, এখন যেখানে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদার বাড়ী হয়েছে তার পাশেই তখন শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের জন্য কুড়েঘর হয়ে ছিল। হৃদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারও তথায় থাকতেন।

প্রকৃত স্বাধীনতা

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির তথা প্রত্যেক ব্যক্তির একটা নূতন কিছু লাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, সেই আকাঙ্ক্ষাই বিভিন্নস্থানে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া পৃথিবী ব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। সেই অভীপ্সিত জিনিষটি কি এবং তাহা কিরূপে পাওয়া যায় ইহাই আমাদের বুঝিবার বিষয়।

আমরা কালপ্রভাবে মোহনিদ্রাভিভূত হইয়া বিলাস-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলাম; ক্রমশঃ নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ভাসিতে ভাসিতে কোন একটা অজানা রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। সহসা মহীয়সী শক্তিপ্রভাবে আমাদের দীর্ঘনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিদ্রার ঘোর কাটিতেছে না। যদি এখন ঘুমের ঘোর কাটিয়া থাকে আমরা কোন্ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি এইটি আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। যেখানে নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য ছলে, বলে, কৌশলে পিতা পুত্রকে, গুরু শিষ্যকে, পুরোহিত যজমানকে, শিক্ষক ছাত্রকে, রাজা প্রজাকে সৎ শিক্ষা ও সৎ যুক্তি দিবার অছিলায় কার্য্যতঃ দুর্নীতিপরায়ণ করিয়া তুলে এবং তৎ প্রতিদান স্বরূপ পুত্র, শিষ্য, যজমান, ছাত্র, প্রজাদি কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে, যে স্থানে পতি সতী স্ত্রীকে, স্ত্রী পতিকে দূরে খেদাইয়া দেয় এবং পুত্র অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করা দূরে থাকুক, উপার্জ্জনক্ষম হইলে পিতা মাতার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করে না; পিতা পুত্রকে সাধু বা সৎ হইতে দেখিলে সর্ব্বনাশ হইল মনে করে—যে সংসারে মুখে মধুর বাক্য ও মনে গরল রাশি রাখিয়া কার্য্য করিলে মাননীয়, গননীয় হয় এবং যথায় সত্য পথে চলিলে বিষম বিপাকে পড়িতে হয়—যে সংসারে ধর্ম্ম ও শিক্ষার দোহাই দিয়া স্বার্থ সাধনের

জন্য জাল জুয়াচুরি করিয়া দুর্ব্বল দরিদ্রগণের, এমন কি নিজের ভাইয়ের গলায় ছুরি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না—এইরূপ ভীষণ সংসারে আমরা পতিত হইয়াছি। এই সংসার কি মানবের সংসার! সত্য, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, সরলতা, উদারতা ও অহিংসা প্রভৃতি মানবোচিত সদ্‌গুণরাজির লেশ মাত্র দেখিতে পাইতেছ কি? এখানে ঠিক ঠিক ভালবাসা ব'লে জিনিষটা আছে কি? নিজের উপর এবং পরকালে বিশ্বাসের অভাবে আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা আদৌ করি না। বিবেকবুদ্ধির অভাব বশতঃ মন চঞ্চলীকৃত, ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিলুপ্ত প্রায় হওয়ায় অনুভবাত্মিকা স্নায়ু সকল অসাড় হইয়া গিয়াছে—সুতরাং লাঞ্ছনা, অপমান ও দুঃসহ কষ্ট জড়পিণ্ডবৎ সহ্য করিতেছি। যে কোন অসদুপায় অবলম্বনে নানারূপ লাঞ্ছনা পাইয়াও ক্ষণিক সুখ ভোগের চেষ্টা করি; প্যাচে পড়িলে পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া কলঙ্কিত জীবনের দিনকটা কাটাইয়া দিই। কোন দিন এই দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ অনুসন্ধানে প্রতীকার চেষ্টার আবশ্যক বোধ করি না, তাহারই ফলস্বরূপ এই অশান্তিপূর্ণ ভীষণ সংসারের সৃষ্টি। এই ভীষণ আসুরিক সংসারের অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়াই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের এই দারুণ দুর্গতি দর্শনে সহসা দীনজনের দুঃখহারী একটি দেবমানব আবির্ভূত হইয়া ব্যাকুলতার সহিত করুণস্বরে "তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে" ব'লে ডাকিলেন। সে সুমধুর ধ্বনি মোহাচ্ছন্ন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না, যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা দেখিতেছ কি? তৎপরে আবার ঈশানের বিষাণ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত" রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বাজিয়া উঠিল, সেই ঘন ঘোর রোল কি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে? যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা জাগিয়াছেন, পথ পাইয়াছেন, অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিবার জন্য ছুটিতেছেন, দেখিতে পাইতেছ কি? সেই অভীরভী হুঙ্কারেও আমাদের সম্পূর্ণ চেতনা সঞ্চার না হওয়ায় পুনরায় বরাভয়দায়িনী জগজ্জননী তাঁহার ভক্ত সন্তানগণকে এক দিকে বর ও অভয় প্রদান করিয়া অন্য দিকে দনুজদলনী বিরাটরূপে আবির্ভূতা

হইলেন। যখন কোটী কোটী বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনিতে গগনমণ্ডল আলোড়িত এবং উলঙ্গিনী নৃমুণ্ডমালিনী এলোকেশীর প্রচণ্ড তাণ্ডবে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল তখন ক্রমে ক্রমে আমাদের সকলেরই দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গের সূচনা হইল। মোহনিদ্রাভঙ্গে বলছি কি? চাই স্বাধীনতা, চাই স্বরাজ। ইহাই আমাদের অভীপ্সিত জিনিস বটে; তবে জিনিযটা কিরূপ, কোথায় আছে, কে দিবে বা কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগকে ঘুমের ঘোর কাটাইয়া একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। ঘৃত জিনিষটা কিরূপ তাহা যেমন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেইরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা জিনিষটা কি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইহা উপলব্ধির বিষয়; তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, যিনি কামকাঞ্চনৈক দৃষ্টিপূর্ণ সংসারের যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া দুনিয়ার বেচা-কেনা ও কোলাহলপূর্ণ সংসারের বাহিরে গিয়া নির্ম্মলানন্দ ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সুখ উপভোগ করিতেছেন, তিনিই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। তিনি কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না। সংসারের কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নাই, এজন্য কোন বস্তুর অভাবে দুঃখ বা প্রাপ্তিতে সুখ বোধ করেন না। অপার্থিব কোন বস্তু পাইয়া সর্ব্বদাই আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, যাঁহারা সমগ্র জগৎ এবং পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন, যাঁহাদের ইচ্ছাশক্তিতে সমগ্র জগৎ পরিচালিত হইয়া থাকে এবং আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন জগৎ গঠিত হয়, যাঁহাদের চরণস্পর্শে সংসার-তাপিত জীব বিষম জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পায় এবং যাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষেই মানব প্রকৃত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবার শক্তি পায়, সেই সর্ব্ব-বন্ধন-বিমুক্ত স্বাধীন মহাত্মাগণের মহিমা পরিচয় দিবার সাধ্য কার আছে? ইঁহারাই প্রকৃত স্বাধীনতা এবং স্বরাজ লাভ করিয়াছেন—ইঁহারাই পূর্ণ আদর্শ—ইঁহাদের ভাব লাভই আমাদের চরম লক্ষ্য। ভারত চিরকালই হৃদয়ের রক্তদানে ইঁহাদের শ্রীচরণপূজা করতঃ স্বাধীনতা-জনিত নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। শান্তিদায়ক এই প্রকৃত স্বাধীনতা পৃথিবীতে ছিল কি, যে আমরা

চাহিলেই পাইব! উহা এই পৃথিবী হইতে সরিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর কোন দেশে বা কোন জাতিতে ছিল না এবং কোন ব্যক্তিতে ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্বাধীনতার আবরণে স্বেচ্ছাচারিতাই এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছিল, সেই জন্যই পৃথিবীস্থ জীবের এই দুর্দ্দশা। এই দুর্দ্দশা দর্শনে স্বাধীন জগতের একটি স্বাধীন মানব যিনি আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া করুণস্বরে আমাদিগকে ডাকিয়াছেন। এবং স্বাধীনতালাভের পথ দেখাইয়া স্বাধীন যুগের অবতারণা করিয়াছেন—ইনিই শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ। ইঁহারই কৃপায় প্রকৃত স্বাধীনতা-মাখা নির্ম্মল শান্তিদায়ক বায়ু ভারতের সর্ব্বপ্রথম প্রবাহিত হয়। সুপ্তপ্রায় আমরা, অনুভবাত্মিকা শক্তির অভাবে বুঝিতে পারি নাই। যুগ প্রয়োজন হেতু ইনিই আবার সাক্ষাৎ শঙ্কররূপী বিবেকানন্দ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভোগ-বিলাসের কেন্দ্র পাশ্চাত্যকে প্রকৃত স্বাধীনতার কেন্দ্রাভিমুখিন এবং ভোগবিলাসের কেন্দ্রাভিমুখী ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা এবং সর্ব্বপ্রকার অভাব নিবারণকল্পে স্বাধীন শান্তিময় রাজ্যাভিমুখী করিয়াছেন। ইঁহাদেরই কৃপায় মুষ্টিমেয় ভারতবাসী এবং অপর কোন কোন দেশের কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়া সর্ব্ব বন্ধন বিমুক্ত হইয়াছেন। সতত ক্রিয়াশীল রজোগুণ প্রধান অঞ্চলে এই প্রকৃত স্বাধীনতা সাধনোদ্ভূত তুমুল আন্দোলনই কর্ণগোচর হইয়া আমাদের মধ্যে অনেকেরই বহুদিনের অভ্যস্ত নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়া দিয়াছে ও দিতেছে।

(২)

এখন আমরা যে সংসারে বাস করিতেছি সেই সংসারের সহিত নিজের অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিলাম এবং স্বাধীনতা জিনিসটা কি তাহারও আভাস কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিলাম, তথাপি যদি আমরা স্বার্থপূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতাবলম্বনে নানাপাশেবদ্ধ সংসারের ক্রীতদাসকে সভ্য ও স্বাধীন মনে করিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হই তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখ ও বিষম লজ্জাজনক বিষয় কি আছে? চক্ষুরুন্মীলন করিলে স্পষ্ট দেখিতে

পাইব যে, এক দিকে ভোগের চরম ফল—অশান্তির দাবানল দাউ দাউ শব্দে জ্বলিয়া উঠিয়া সেই অগ্নিশিখা ত্যাগাদর্শস্থলকেও ঝল্‌সাইয়া দিতেছে, অন্য দিকে ত্যাগের চরম ফল শান্তির সুশীতল সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া ভোগাসক্ত রাজ্যের অনল-দগ্ধ, তাপিত জনগণকে সুশীতল করিতেছে। যদি প্রকৃত স্বাধীনতা-জনিত অনাবিল সুখ-শান্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে ত্যাগীশ্বর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথাবলম্বনে অর্থাৎ ইঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য-কলাপ দর্শনে ও উপদেশাদি সহায়ে সাধন করিয়া অগ্রে ধর্ম্ম-জীবন গঠন করতঃ অভীপ্সিত শ্রেষ্ঠবস্তু লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহা লাভ করিলে সমস্ত কামনাই পূর্ণ হইবে। তখন—কেবল তখনই স্বাধীনতা বস্তু ও স্বাধীন আনন্দ কাহাকে বলে তাহা উপলব্ধি করিব। যদি আমরা তাহাতে বলি সে অনেক দূরের কথা, উপস্থিত পরাধীন রাজ্যে বাস করিয়া দেশের লোকগুলা আহারের অভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে সব সাবাড় হইয়া গেল, তখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা ও অগ্রে সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটাই ভোগ করা যাউক, তার পর অন্য কথা যদি তাহার কিছু উপায় থাকে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কথাটা শুনিবামাত্র সমীচীন বলিয়া বোধ হইলেও একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে ইহা বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ মাত্র ; বিকারগ্রস্ত রোগী সামান্য খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তি না থাকাতেই "এক হাঁড়ি ভাত খাব ও এক জালা জল খাব" ব'লে চীৎকার করে, আমাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা প্রায় সেইরূপ। কেন না ইতিপূর্ব্বে আমাদের সমাজ ছিল, আমরা সমাজ পরিচালনের জন্য শিক্ষা দীক্ষার বিধি-ব্যবস্থা নিজেরাই করিতাম। আমাদের রাজ্য ছিল, আমরা রাজ্য শাসনের নিয়মাদি প্রনয়ণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে জানিতাম। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, সুপ্রচুর ছিল, আমরা পেট পুরিয়া খাইতে ও পরিতে পাইতাম, অতিথি আসিলে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে তাহাদের সেবা করিয়া ধন্য হইতাম এবং উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি কত দেশ বিদেশে পাঠাইতাম। সেই আমরা আজ কিনা নিজের দেশে বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন, চরিত্রহীন বিদেশী কাঙ্গালের

মত বড়াইতেছি। আমাদের উপস্থিত এরূপ দুরবস্থার মূল কারণ কি অগ্রে ইহাই বুঝিবার বিষয়।

আমরা যখন ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত হইয়া জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে ভালবাসা সূত্রে বদ্ধ ছিলাম, তখন এ সংসার শান্তিময় সুখের স্থান ছিল। কালচক্রে আমরা অতৃপ্ত ভোগ-বিলাসোন্মুখিন হওয়ায় আপন 'আপন প্রয়োজন সিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হৃদয় হইতে সরলতা, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, পবিত্রতাদি সদ্বৃত্তিসকল অন্তর্হিত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ সনাতন ধর্ম্ম সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পরস্পর ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। এখন যে ভালবাসা-টুকু আছে সেটুকু কেবল অবিশ্বাস ও স্বার্থপূর্ণ। এই স্বার্থপরতার ভাব হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুকাইত রাখিয়া আমরা নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাণ করিয়া থাকি, কিন্তু যখনই উহার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া পড়ে তখনই আমাদের ভালবাসার বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়া পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হই; এই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাই ক্রমশঃ সংক্রামিত হইয়া আমা-দের জাতীয় জীবনকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কেবল ইহাতেই শান্তিময় সংসারে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই অশান্তির অনলেই আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা এমনকি স্বাধীন-ভাবে অন্ন, বস্ত্র প্রাপ্তির উপায় পর্য্যন্ত আহুতি দিয়াছি এবং একবারে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিহীন হইয়া জড়বৎ জীবন যাপন করিতেছি এবং সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। এই স্থূল শরীরটাও নানা রোগের আকর হইয়া পড়িয়াছে। যখন হাঁটিবার শক্তি নাই, এক ক্রোশ যাইতে হইলে যান-বাহনের আবশ্যক হয় তখন বিপদগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার অথবা কোন জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রাণে বাঁচিবার ক্ষমতা কই? আবার স্নায়ুগুলিও একবারে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে, এজন্য ইন্দ্রিয়গণ এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে ময়লামিশ্রিত পচা জল কি ভেজাল জিনিষকে স্বাদযুক্ত আর নির্ম্মল বিশুদ্ধ জল এবং খাঁটি জিনিষকে ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে; ইহাতে সুখাদ্য ও কুখাদ্য কিরূপে বিচার করিতে পারি? যখন চৌদ্দ, পনর

বৎসরের বালকের আর চশমা নহিলে চলে না তখন সুদৃশ্যের ও কুদৃশ্যের তারতম্য করিবার শক্তি কোথায় ? "মা," "রাম," "ধর্ম্ম," "সাধু", "শাস্ত্র", "ভাগবত", এই শব্দ শুনিলে যদি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিরক্ত হই এবং কতকগুলি নিষ্ফল পুস্তক পাঠে মস্তিষ্ক বোঝাই বা কুরুচিপূর্ণ নাটক, নভেল পড়িয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ি তখন আর আমাদের সুনীতি-পরায়ণ হইবার আশা কোথায় ? কোন কথা ভাল মন্দ বুঝিবার বিচার-শক্তি আমরা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। শক্তি থাকিলে কি হা অন্ন ! হা অন্ন !! করিয়া দাসখৎ লিখিতে হয় ? না দুর্ব্বলকে পেষণ করিয়া বাহাদুরী দেখাইতাম ? ক্ষুধার্ত্ত সিংহ কখনই মূষিক ধরিয়া খায় না। অন্যায়ের প্রতীকার বা কোন সৎকার্য্য করিতে আদিষ্ট হইলে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস প্রযুক্ত একেবারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া বলি, "কেহ যে আমার কথা শুনে না—একলা কি করি বলুন ?" এই বলিয়া কর্ত্তব্য শেষ করি।

এইরূপ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিহীনতার অবস্থায় যদি দৈব কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, কি প্রভূত ধন, রত্ন বা শস্যসম্ভার প্রাপ্ত হই তাহা হইলে দুর্ব্বলতা প্রসূত দ্বেষ-হিংসাবিষে জর্জ্জরিত ও অহঙ্কারে উত্তেজিত হইয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া নিজেরাই মরিব। যাহা পাইলাম তাহা ভোগ করা ত দূরের কথা, তাহা রক্ষা করিবার শক্তি আছে কি ? সুতরাং তাহা অপরের হস্তে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইব। কেন না আমরাই ত মানসিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া প্রাণসম সহোদরের মাথা ফাটাইয়া মোকর্দ্দমা দ্বারা প্রাণপণে উপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় করিয়া উভয়েই সর্ব্বস্বান্ত হই। আমরাই ত সকলে মিলিয়া "এই কার্য্যটি করিব স্বীকার করিয়া কার্য্যক্ষেত্র দর্শনে পশ্চাৎপদ হইয়া প্রাণাধিক সত্য লঙ্ঘন করি এবং তজ্জন্য পরস্পর অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হই। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমরা সত্যচ্যুত হইয়াই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং তজ্জন্যই আমরা আমাদের নিজস্ব-বস্তু তথা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি ক্রমশঃ হারাইয়া আজ পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি। তখন তাহার আর পুনরভিনয়ের আবশ্যকতা কি ? ইউরোপের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ধর্ম্মভিত্তির উপর স্থাপিত হইলে

কি সমগ্র ইউরোপের অবস্থা এরূপ সঙ্কটাপন্ন হইত? ধর্ম্ম ব্যতীত মানবের শান্তির আশা সুদূরপরাহত।

ধর্ম্মই মানব জাতির সর্ব্ব প্রকার উন্নতির ভিত্তি। সেই ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর স্থাপিত রীতি নীতি দ্বারাই মানব জাতির শান্তি নিকেতন নির্ম্মিত হয়। এই সনাতন ধর্ম্মই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। যখন মানব জাতি কাল প্রভাবে নানা জাতিতে পরিণত হয় তখন এই সনাতন ধর্ম্মই রূপান্তরিত ভাবে অবলম্বন স্বরূপ থাকিয়া বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করে, সুতরাং প্রত্যেক জাতিরই একটা জাতীয়ত্ব আছে যাহাকে অবলম্বন করিয়া জাতিটা বাঁচিয়া থাকে। যেরূপ মানবের মেরুদণ্ড সুদৃঢ় হইলে তাহার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় হইয়া থাকে, সেইরূপ যে জাতির জাতীয়ত্ব যে পরিমানে স্থায়ী, উন্নত, দৃঢ় ও সুগঠিত সেই জাতির রাজনীতি অথবা যে কোন নীতি সেই পরিমানে স্থায়ী, উন্নত, দৃঢ় ও সুগঠিত হইয়া জাতিটাকে বাঁচাইয়া রাখে এবং সেই জাতির জাতীয়ত্ব প্রত্যেক ব্যক্তিতে ফুটিয়া উঠে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যুগ-প্রয়োজন হেতু যথাসময়ে এক এক জাতি উত্থিত হইয়া আপন জাতীয়ত্বের প্রভাব জগতে বিস্তার করিয়া জাতি-মাহাত্ম্য দেখাইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই মানব বাঁচিবার পথ ও মরণের পথ দেখিতে পাইয়া থাকে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানব এক সূত্রে বদ্ধ হইবার জন্য বহুকালান্তে পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মানব জাতির মহাসম্মিলন সাধন করিয়া থাকে। ইহাই হইল প্রকৃতি দেবীর লীলাভিনয়। সনাতন ধর্ম্মের আদি উৎপত্তিস্থল ও ভাণ্ডার ভারত—ঋষিকুল উহার রক্ষক। ভারতীয় ঋষিকুল ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের হস্তে জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষার ভার ছিল। তাঁহারা যোগ ও তপস্যার বলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে কখন কি হইবে জানিয়া জনসাধারণের মঙ্গলকর যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন তাঁহাদের নিদেশে সেই বিধি-ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষত্রিয়গণ (রাজন্যবর্গ) জনসাধারণের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া রাজ্যরক্ষা, রাজ্যপালন রাজ্য শাসন করিতেন। বৈশ্যগণ (কৃষি, শিল্পি ও ব্যবসায়িগণ) জনসাধারণের সেবার জন্য প্রচুর শস্যোৎপাদন, প্রয়োজনীয়

ব্যবহারিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত এবং প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেন। শূদ্রগণ (শ্রমজীবিগণ) জনসাধারণের পরিচর্য্যাত্মক অবশিষ্ট অন্যান্য কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতেন। সদানন্দ, স্বাধীন চেতা, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ জনসাধারণের নেতা হইয়া সমগ্র সমাজ পরিচালন করিতেন। শুধু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নয় শূদ্রগণও যাহাতে ক্রমশঃ আত্মোন্নতি সাধন করিয়া ঋষিত্ব লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হন তাহারও বিধি-ব্যবস্থা দিয়া অধিকারী ভেদে কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেন। তাঁহাদের নির্দেশানুসারে সমাজের প্রত্যেকেই ধর্ম্মপথাবলম্বনে স্ব স্ব কর্ম্মের দ্বারা জনসাধারণের সেবা করিয়া পরমার্থ লাভ করিতেন। পরমার্থলাভে স্বাধীনতা ও পরমানন্দ উপভোগ করা সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল এবং কেবল তাহারই ব্যবস্থা করা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের একমাত্র কার্য্য ছিল। কালচক্রে যখনই ঋষিকুল উক্ত জগদ্ধিতায় কার্য্য হইতে বিরত হন এবং আপনাদিগকে একটি গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া ধর্ম্মতত্ত্বাদি গোপন করিতে আরম্ভ করেন তখনই,—কেবল তখনই উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইয়া অবনতির মূল আরম্ভ হয়। শুধু ভারতের কেন সমস্ত জগতেরই অবনতির যুগ আরম্ভ হয়। যখনই ঋষিকুল ধর্ম্মপ্রচার বন্ধ করিয়া স্বার্থান্বেষী হইয়া ভোগ-বিলাসের পথে পদার্পণ করেন তখনই সমাজ আপন আপন স্বার্থানুসন্ধিৎসু হইয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ভোগবিলাসের পথে ধাবিত হইয়া থাকে। ক্রমে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বশতঃ অতৃপ্ত ভোগ লালসা পূর্ণ করা মানব সমাজের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। তখন মানবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিলাস সাগরে ডুবিয়া গিয়া উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পায় না।

যিনি জগৎ পরিচালিত করিয়া এই লীলা বিলাস করিতেছেন এরূপ সময়ে ভাবঘনমূর্ত্তিতে তিনি আবির্ভূত হইয়া জীবের উদ্ধার ও শান্তির জন্য ধর্ম্মভাব দিয়া যান এবং তাহা জগতে প্রদানের নিমিত্ত কতকগুলি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সৃষ্টি করিয়া অন্তর্দ্ধান হন। সেই ঋষিকুলই যথাকালে, যথাস্থানে সনাতন ধর্ম্মভাব প্রদান করিয়া পূর্ব্বের মত পরমার্থ লাভের পথে তথা শান্তির পথে জগতের গতি নিয়মিত করেন। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই কেবল সকল জাতিকে উদার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সার তত্ত্ব

উপলব্ধি করাইয়া থাকে এবং কেবল ভারতই নানাধর্ম্ম তথা নানা জাতিকে আদরের সহিত বক্ষে ধারণ করিয়া থাকে। এই জন্য মানব জাতির মহাসম্মিলন ক্ষেত্র এই ভারতভূমি।

একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই ভারতবাসীর অতিপ্রিয় একচেটিয়া সম্পত্তি। অতএব ভারতবাসীর প্রত্যেককেই সনাতন ধর্ম্মভাব জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিব। পশ্চাতে কাহারও দিকে তাকাইবার আবশ্যক হইবে না। যে কোন দেশের যে কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্মভাব নিজের জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ভারতীয় ঋষিকুলের প্রদর্শিত যুগোপযোগী মতাবলম্বনে সাধন করিতে হইবে। অতএব যে মহাশক্তির কৃপায় আমাদের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে সেই মহাশক্তির আধার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরণে আশ্রয় লইয়া ইঁহাদেরই প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে শক্তিলাভ করতঃ অগ্রে মানুষ হই এস! সেই সঙ্গে আমরা অমানুষিক অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থকলুষিত দেশাচার ও লোকাচার প্রভৃতির প্রতীকার করিতে পারিব এবং আমাদের যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই অনায়াসে আয়ত্তে আনিতে পারিব।

—স্বামী কেশবানন্দ।

লাটু মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলবাবু বলিতেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের Miracle যদি দেখিতে চাও, তবে লাটু মহারাজকে দেখ। এর চেয়ে বড় Miracle আমি আর কিছু দেখি না।' পূজ্যপাদ স্বামিজী ও বলিতেন, "লাটু যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া অল্প দিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে, আর আমরা যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতি করিয়াছি, এতদুভয়ের তুলনা

করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চবংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া ছিলাম। লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা ধ্যান-ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম, লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না। তাহাকে একটি মাত্র ভাব অবলম্বনেই আজীবন চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা সহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক্ রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ও শ্রীশ্রীঠাকুরের তাহার প্রতি অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।"

দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "শরীর ধারণ ক'ল্লেই ভয়ানক কষ্ট—একথা কেউ বুঝে না। সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কিসে যে সুখ হয়—তার সন্ধান রাখে না। গর্ভাবস্থায় দুঃখ, জন্মাতে দুঃখ, বাঁচ্‌তে দুঃখ, মরতেও দুঃখ,—এখানে সুখ কোথা? সব কেবলই সুখের জন্য মত্ত! একমাত্র ভগবান লাভেই সুখ;—তাঁকে যারা দেখেছে, তারাই সুখী, তাদেরই শরীর ধারণ সফল। এত দুঃখ তাঁদের কাছেই সুখ ব'লে মনে হয়। তা না হ'লে শরীর ধারণ বিড়ম্বনা—খালি দুঃখ ভোগের জন্য।"

শেষে তাঁর নিজ শরীরের উপর একটুক্‌ও যত্ন ছিল না। এমন কি, সে বিষয়ে কেহ কিছু বলিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন।

৺কাশী ছাড়িয়া তিনি কোথাও যাইতে চাহিতেন না। তাঁহার অসুখ শুনিয়া তাঁহার জনৈক গুরু ভ্রাতা আলমোড়া হইতে তাঁহাকে পত্র লেখেন যে, * * "কৈলাস শেখরে হরপার্ব্বতী বাস করছেন। তুমি একবার এখানে এস * * *।" তদুত্তরে তিনি লেখেন,—'জীবের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা এখানে (৺কাশীতে) বিরাজ ক'রছেন, সুতরাং তাঁদের ছেড়ে আমি যেতে পার্‌বো না।"

এইরূপে কঠোর তপশ্চরণ, নাম মাত্র আহার ও অনিদ্রায় তাঁহার বৃদ্ধ শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অবশেষে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গত ২।৩ বৎসর হইতে তিনি অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলেন।

কিন্তু তিনি শরীরের দিকে আদৌ নজর দিতেন না। * * * দেহত্যাগের প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পায়ে একটা ফোস্কা হইয়া ঘা হয়। তিনি উহার বিশেষ কোন যত্ন লইতেন না। উহা ক্রমে বিষাক্ত হইয়া 'গ্যাংগ্রিণে' (দুষ্টক্ষতে) পরিণত হয়। উপর্য্যুপরি চারিদিন প্রত্যহ ২।৩টা করিয়া তাঁহার শরীরে অস্ত্র করা হইয়াছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার একটুকু বিকার নাই—যেন অপর কাহারও শরীরের উপর অস্ত্র-চালনা করা হইতেছে! এরূপ দেহজ্ঞান রাহিত্য মানুষে সম্ভবে না! তাঁহার মন জীবজগৎ, এমন কি, নিজের অতি প্রিয় দেহ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে বহু ঊর্দ্ধে সেই পরমানন্দময় সত্য শিব সুন্দরের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিত—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

শ্রীযুক্ত লাটু মহারাজের শেষ জীবন কাহিনী সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমরা পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ স্বামিজীর ২৫।৪।২০ তারিখের পত্রটি এ স্থলে পুনরুদ্ধৃত করিলাম :—

"প্রিয়বর—

"* * * লাটু মহারাজের অন্তিম সংবাদ আপনি তার যোগে অবগত হইয়া থাকিবেন। এমন অদ্ভুত মহা-প্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্ব্বদাই অন্তমুর্খ থাকিতেন দেখিয়াছি। অসুখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন। ভ্রূমধ্য-বদ্ধ দৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত। সদা সচেতন অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন না। এক দিন ড্রেসিং হইতেছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি অসুখ? ডাক্তাররা কি বলিতেছে? আমি বলিলাম, অসুখ তেমন কিছু নহে, খালি দুর্ব্বলতা। না খেয়ে শরীরপাত করিয়াছ, এখন আর নড়িবার ক্ষমতা নাই; একটু খেয়ে জোর করিলেই সব সারিয়া যাইবে। তাহাতে বলিলেন, 'শরীর গেলেই ত ভাল'। আমি বলিলাম, 'তোমার ও কথা বলিতে নাই, ঠাকুর যেমন করিবেন, সেই রূপ হইবে'।" তাহাতে বলিলেন, তা ত জানি, তবে আমাদের কষ্ট। ইহার পর আর তেমন কথাবার্ত্তা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রায় প—কে ডাকিতেন। প—র হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে প—বলিত, তবে

আমিও কিছু খাইব না। অমনি লাটুমহারাজ খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না। প—বলিল, খাইলেন না, তবে আমিও আর খাইব না। লাটুমহারাজ এবার বলিলেন, "মৎখা"—একেবারে মায়ানির্ম্মুক্ত উক্তি!

"পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি, খুব জ্বর। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা করিলেন—শব্দ পাইলেন না। টেম্পারেচার ১০২.৬। বেশ সজ্ঞান—তবে কোনও বাহ্য চেষ্টা নাই। প্রাতে একবার দাস্ত হইয়াছিল। বেশ ভাল স্বাভাবিক মল নির্গত হইয়াছিল। তবে অন্য দিন উঠিয়া বসিতেন, সেদিন আর উঠিতে পারেন নাই। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও দু'চার ফোঁটা বেদানার রস ও দু'চার ফোঁটা জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াইতে পারা যায় নাই। দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন। মাথায় বরফ ও অডিকলন দেওয়া হইতে লাগিল। বেলা দশটার পর আমি বিদায় লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম। সেই সময় ডাক্তার শ্রীপৎ সহায়েরও আসিবার কথা স্থির ছিল। বাটী আসিয়া স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম—লাটু-মহারাজ ১২টা ১০ মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তখনই আপনাকে ও শ—কে তার করিতে বলিয়া আমি তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য ৯৬নং হাড়ারবাগ বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, ডান্‌দিক্ চাপিয়া পাশ—বালিসে হাত রাখিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছেন। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, জ্বরের সময় যেমন গরম ছিল, সেইরূপ গরমই রহিয়াছে। কাহার সাধ্য বোঝে যে, চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন—কেবল, অধিক প্রশান্ত-ভাব মাত্র। মঠের সকলেই উপস্থিত, খুব নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল প্রগাঢ় ভগবদ্ভজন হইয়াছিল। বেলা সাড়ে চারটার পর তাঁহাকে বসাইয়া যথা রীতি পূজাদি করিয়া আরাত্রিকান্তে নীচে নামাইয়া আনা হইল।

"যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয়, তখনকার মুখের ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া জানান যায় না। এমন শান্ত সকরুণ মহা আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্ব্বে কখনও লাটুমহারাজের আর দর্শন করি নাই। ইতিপূর্ব্বে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র থাকিত, এখন একেবারে বিস্ফারিত ও উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি ভালবাসা—কি প্রসন্নতা—কি সাম্য ও মৈত্রীভাব দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে, সকলকেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত ও চমৎকার প্রাণস্পর্শী! অদ্ভুতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার শরীর, শয্যা যখন নূতন বসন ও মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিয়া সকলের সম্মুখে নীত হইল, তখন সাধারণে সে শোভা দেখিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এমন যমজয়ী যাত্রা অপূর্ব্ব ও অনন্য সাধারণই বটে! প্রভুর অনন্তমহিমার সুস্পষ্ট বিকাশ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রতিবেশী ও সকলে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে দর্শন প্রণামাদি মনের সাধে করিয়া লইলে প্রভুর সন্ন্যাসী ভক্তগণ তাঁহাকে বহন করিয়া কেদারঘাটে লইয়া যান ও তথা হইতে নৌকাযোগে ৺গঙ্গাবক্ষে স্থাপন করিয়া মণিকর্ণিকায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পূর্ব্বকৃত্যপূজাদি পরিসমাপ্ত করিয়া যথাবিধানে জল সমাধি প্রদান করিয়া শুভ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ণ সমাধান হয়। যাহারা এই চরমকালে লাটুমহারাজের এই পরমানন্দমূর্ত্তি দেখিয়াছে, তাহাদের সকলের মনেই এক মহা-আধ্যাত্মিক সত্যের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ধন্য গুরুমহারাজ, ধন্য তাঁহার লাটুমহারাজ! * * * *"

—স্বামী সিদ্ধানন্দ

সমাপ্ত।

পথনির্দ্দেশ

নানা ভাষাভাষী, নানা বেশধারী, নানা আচার সম্পন্ন—বিভিন্ন কেন বলি, বিরুদ্ধ—ধর্ম্মাবলম্বী এই যে বর্ত্তমান ভারতের ত্রিশ কোটি অধিবাসী; ইহাদের অভ্যুত্থানের আশা একেবারেই কি নাই? এই যে গভীর সমস্যা—এই যে সমগ্র জাতির বিরাট দৈন্য—এই অপবাদ এই দুঃসহ লজ্জা দূর করিয়া কি আর কখনও ভারত জগত সমক্ষে তাহার মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইবে না? এ আশা কি আমাদের চিরকালের মত কালের ভবিষ্যৎ অঙ্কে লুপ্ত হইয়া থাকিবে?

পুরুষকারে শ্রদ্ধাহীন ইদানীং অদৃষ্টবাদী ভারত, ভারতীয় নরনারী বলিবে বিধির বিধান। তাঁহার বিধান—অদৃষ্ট, আমাদের সাধ্য আমাদের আয়ত্বের বাহিরে—তাঁহার ইচ্ছায় আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা আবার তিনি যদি কখনও মুখ তুলিয়া চান, তাহা হইলে হয়ত আবার আমাদের অবস্থা উন্নত হইবে। একদিন ভারতের এমন অবস্থা ছিল যখন ভারতের বিকাশ ছিল সর্ব্বতোমুখী—বেদ, উপনিষদ, কলাবিদ্যা, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ভারতে শিক্ষা দেওয়া হইত—শিক্ষার্থী আসিত, তুষার-শুভ্র গগনচুম্বী হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া, তরঙ্গসমাকুল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া; তখন ভারতের পণ্য দ্রব্য উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরুকান্তার অতিক্রম করিয়া ভারতীয় নাবিক চালিত পোতে সমুদ্র পার হইয়া, দূর দূর দেশে যাইত, আর ভারতের জাতীয় কোষ, বৈদেশিক মুদ্রায় পূর্ণ হইত। আজ ভারতের বেদ উপনিষদ জার্ম্মাণী হইতে প্রচারিত হইয়াছে। ভারতীয় সামগানের সুর চীন জাপানে গীত হইতেছে। চিত্রকলা শিখিতে প্রতীচ্যে গুরুকরণ করিতে হইতেছে, ভারতীয় সঙ্গীত লুপ্তপ্রায়—আর কৃষি ও ব্যবসায়ের অবস্থার কথা ভাবিলে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অশ্রুত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। অর্দ্ধ জগতকে যে ভারত অন্ন পরিবেশন করিতে সমর্থ, তাহার সন্তানগণ, আজ অর্দ্ধাশনে অনশনে মৃতপ্রায়।

এই যে এত বড় অধঃপতন—সমগ্র জাতির অঙ্গে পক্ষাঘাতের মত ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে—ক্রমে ক্রমে তাহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে—এই ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবার কি কোন উপায় নাই? মোহাচ্ছন্ন মানব যেমন তাহার অন্ধকারময় জড়তা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া সেই গ্লানিকর অবস্থায় পড়িয়া থাকে ও বলে বেশ আছি তেমনি শতাব্দীর পর শতাব্দীর দাসত্বের মোহে লুপ্ত চেতন, হতবিভব সমগ্র জাতি—বেশ আছি বলিয়া ক্রমশঃ তল অতলের রাজ্য ছাড়াইয়া রসাতলে প্রবেশ করিতেছে।

জাতির যখন অধঃপতনের সূত্রপাত হইল, তখন প্রথমেই ভাঙ্গিয়া পড়িল জাতিসৌধের গৌরবময় শীর্ষ ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ভারতের প্রাণের কারবার করিতেন। আজিও প্রত্যেক হিন্দুর নমস্য ভারতীয় ব্রাহ্মণ সেই প্রাণের কারবারের মূক অভিনয় করেন।

শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্মণেরা নিজের উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সকলেরই উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্মণ জানিতেন যে—ধর্ম্মপ্রাণ জাতি যতদিন ধর্ম্মেনিষ্ঠা রাখিবে, ততদিন তাহাদের উন্নতি চির বৰ্দ্ধমান। আধুনিক, সুবিধাবাদী—দাসসুলভ সকল বৃত্তির আধার স্বরূপ, পতনের নিম্ন সোপানে দণ্ডায়মান, হিন্দুজাতির গুরুর ভণ্ডামীর আচরণ তখনকার দিনে ছিল না, ছিল আত্মজ্ঞানে গরীয়ান, ত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জ্বলন্ত আচরণ—সে তপস্যা দেখিয়া মর্ত্ত্যধামে নরপতিগণ তাঁহাদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন—দেবতারাও ভক্তিনম্র হৃদয়ে ব্রাহ্মণগণের পদাঘাতকে স্বীয় অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইতেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের আচরণের অনুসরণ করিয়া ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য জাতি নিজ নিজ মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহাদের আদর্শ ছিলেন দধিচী, বশিষ্ঠ প্রভৃতি। মহামুনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দধিচীর আশ্রমে দৈত্যত্রাস ত্রস্ত সুরকুল উপস্থিত—প্রার্থনা তাঁহার তপস্যা তেজঃ পূর্ণ দেহ—ধীর, অকুণ্ঠিতচিত্তে পরসেবার জন্য তিনি নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। বশিষ্ঠের কার্য্য যেন আরও মহীয়ান, আরও উজ্জ্বল, অত্যুত্তম। চির শত্রুতাতে বদ্ধপরিকর রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহার শত পুত্রের প্রাণ

সংহার করিয়া, শেষে বশিষ্ঠের মুণ্ডপাতের জন্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, কিন্তু সমগ্র ভারতে হোতার সন্ধান না পাইয়া স্বয়ং বশিষ্ঠকেই সেই পদে বরণ করিলে সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির কুলতিলক তাঁহার আচরণে বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিলেন। বিশ্ববাসী ত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিয়া চমৎকৃত হইল—নিজ মুণ্ড আহুতি দিবার জন্য অমোঘ মন্ত্রোচ্চারণোদ্যত মহর্ষি ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের পদতলে পড়িয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন 'তিষ্ঠ'। যতদিন জাতির মস্তক—ব্রাহ্মণ তাঁহার গরিমাময় আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—যতদিন তিনি লোকসেবার জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না, ততদিন তিনি ছিলেন সর্ব্বোচ্চ, ততদিন তিনি মর্ত্ত্যধামে হিন্দুদিগের নিকট নারায়ণের মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া পূজা পাইতেন। কালক্রমে ধ্বংসের বীজ তাঁহাদের মধ্যে নানা মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিল—প্রথম অবনতি সাধিত হইল প্রভুত্বের অহংকারে সমগ্র জাতির পূজা পাইয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত, তপস্যা, সংযম, ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠার আর প্রয়োজন নাই—প্রভুত্ব চালাইবার জন্য উদ্যত হইয়া বিধি নিষেধের কঠিন শাসনদণ্ডে নিজদের ছাড়া আর সকলকে বাঁধিতে উদ্যত হইলে উন্নত ক্ষাত্রশক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—তাঁহাদিগকে গুরুর আসন হইতে নামিয়া আসিয়া বৃত্তিভুক্ পৌরহিত্য স্বীকার করিতে হইল। অতীতের মহিমায় গর্ব্বিত, তপস্যাচ্যুত ব্রাহ্মণের নিষ্ফল গর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই রহিল না। আজও মোহাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ মিথ্যা দম্ভের আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে অবনতির কূপে নামিয়া যাইতেছেন। কে জানে, কবে আবার লুপ্ত গৌরবের জন্য যত্ন পরিকর কটিবদ্ধ ব্রাহ্মণ ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠার বার্ত্তা সমগ্র জগতকে শুনাইবেন এবং নিজেও তদানুযায়ী আচরণ করিবেন?

ক্ষাত্রশক্তি এতদিন গুরু ব্রাহ্মণের পদতলে বসিয়া শস্ত্রবিদ্যা ও দৈহিক বলচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে শিক্ষা করিতেছিলেন। একদিকে তাঁহারা যেমন বাহুবলে দেশের পর দেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া অধীন প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন—অন্যদিকে তেমনি অদম্য উৎসাহে ধর্ম্ম রাজ্যের গভীর

তত্ত্ব ও সত্যগুলি লাভের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিতে লাগিলেন। সেই প্রাচীন পুরাণোক্ত ক্ষত্রিয় কুলতিলকগণের ইতিহাস আজ যদিও উপাখ্যান—পুরাণ বলিয়া ইদানীং পাশ্চাত্য আলোক মোহিত জনগণের নিকট আদৃত হয় না, তথাপি যদি কেহ যত্ন সহকারে উহা পাঠ করেন, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন—উহাতেও সত্য আছে—ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচুর ইঙ্গিত আছে। শকাব্দা বা সংবতের যথাযথ বিবরণ না থাকিলেও উহাতে আছে ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠার কাহিনী—বিরাট আদর্শ চরিত্র যাহা কেবল মাত্র ভারতেই সম্ভব—ঐশী শক্তি সম্পন্ন দেব মানবের চরিত্র, যাঁহারা জড়বাদের রাজ্য ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় জগতের ধ্বংসের দিন পর্যান্ত সমভাবে দেদীপ্যমান ও ভাস্বর থাকিবেন। আছে—পিতৃসত্যপালনের জন্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের অদ্ভুত ত্যাগের কাহিনী—অর্জ্জুনের বনবাস ও দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার কথা; বনবাস কালে মহিষী দ্রৌপদীর স্বামীর সহিত রাজধর্ম্মের গভীর আলোচনার বিষয়—সত্যরক্ষার জন্য প্রার্থী বিশ্বামিত্রকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া পরিশেষে ঘৃণ্য চণ্ডালের নিকট মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আত্মবিক্রয়ের অপূর্ব্ব কথা—বুভুক্ষু শ্যেনকে আহার্য্য দান ও সঙ্গে সঙ্গে আশ্রিত কপোতের প্রাণরক্ষার জন্য মহারাজ উশীনরের স্বীয় দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিবার প্রাণস্পর্শী ঘটনা—আরও কত আছে কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই সকল ঘটনা আজকাল রূপ কথার উপাখ্যানে বর্ণিত ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পের সহিত সমান পর্য্যায়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের জাতীয় বীণার সুরের তারে ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠার গম্ভীর ধ্বনি উদাত্তস্বরে যতদিন বাজিয়াছিল, ততদিন ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ উন্নতির সোপানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু আদর্শ চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী পতন আসিয়া তাঁহাদেরও গ্রাস করিল। সত্যের অবমাননা—ভোগের বিলাস, মিথ্যা দম্ভের প্রশ্রয় তাঁহাদের চিরকালের জন্য শক্তিহীন করিয়া ফেলিল। ভারতের ক্ষাত্র-শক্তির মহাগরিমাময় উত্থান ও ততোধিক শোচনীয় পতনের অমর ইতিহাস মহাভারত চিরকাল জগত সমক্ষে সাক্ষ্য দিবে, কি করিয়া এই পতন সাধিত হইল।

তাহার পর কিছুকালের জন্য যেন ভারতের প্রাণের স্পন্দন রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে আত্ম-কলহের কথা ব্যতীত অন্য কিছুই শুনা যায় না। জাতীয় জীবনের এই দুঃখময় দিনের অবসান করিতে—হিমালয়ের পাদদেশে—শাক্যবংশে শ্রীভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া মোহাচ্ছন্ন জাতিকে—পুনরায় ত্যাগের অনন্ত মহিমা শুনাইলেন। দিক্‌ভ্রান্ত জাতি অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া নববলে বলীয়ান হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্যমে ভারতের বাণী—দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করিল। বৌদ্ধ শ্রমণগণ অসাধ্য সাধন করিতে লাগিলেন আজিও তাঁহাদের অতুলনীয় কীর্ত্তির ইতিহাস—জাতির মনে দৃঢ় অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যেমন ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠার স্থানে—বিলাস ও সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিল—অমনি এই ভারত হইতে তাঁহাদের সরিয়া যাইতে হইল। যে সকল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ত্যাগের ইতিহাসের কথা ভুলিয়া গেলেন—মহারাজ অশোক ও হর্ষবর্দ্ধনের উত্তরাধিকারিগণ, হীন, কুৎসিৎ বামাচারী হইয়া—ভারতের জাতীয় তরণীকে অবনতির কূলে দ্রুত পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন।

এদিকে আবার—ভারতের ধন-সম্পদে লুব্ধ—বিভিন্ন বৈদেশিক যাযাবর জাতির বারবার আক্রমণে—ভারতের নরনারী ত্রস্ত—ক্রমশঃ ঐ সকল পরাক্রান্ত আত্মবিশ্বাসী জাতিরা—এদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া এবং সর্ব্বোপরি এ দেশের লোকদের মধ্যে স্বদেশ প্রীতির, স্বজাতি প্রীতির অভাব, আত্মশক্তিতে—শ্রদ্ধাহীন সতত বিবদমান ভাব লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের শৌর্য্য প্রকাশ করিল—সমগ্র ভারত তাহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়িতে বাধ্য হইল। দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল গলে পরিয়া—ত্যাগ ছাড়িয়া ভোগের আদর্শে মুগ্ধ—ক্ষমা ছাড়িয়া হিংসার বশবর্ত্তী, পরগুণানুকীর্ত্তন বিমুখ—পরিছিদ্র অন্বেষণে পটু—সত্যভ্রষ্ট বর্ত্তমান ভারতীয়দের দেখিলে কি কখনও মনে হয়—এ জাতি একদিন জগতে বরেণ্য ছিল?—সংগীত, কলাবিদ্যা—জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদ, বিজ্ঞানের রহস্য-বত্তা জাতির উত্তরাধিকারিগণ—সর্ব্বোপরি মোক্ষধর্ম্মের একমাত্র

রহস্যবিৎগণের বংশধরগণ—এখনও সময় আছে—এখনও তোমাদের মাথায় শ্রীভগবানের শুভাশীর্ব্বাদের কণা লাগিয়া আছে—মিথ্যা মোহের আশ্রয় ছাড়িয়া—সকলে মিলিয়া ত্যাগ ও সেবার পন্থা অনুসরণ কর। সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া আবার তোমরা—জগতে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইয়া—সকলের আচার্য্য হইয়া জগতকে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্য দান করিতে পারিবে—যে সম্পদ লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদেশের মনুষ্যগণ না জানিয়া—কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ছুটিতেছে—একমাত্র তোমরাই সে সম্পদের অধিকারী। ভৃত্যের স্থান ছাড়িয়া, প্রভুর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হও, শিষ্যের স্থান ছাড়িয়া গুরুর আসন গ্রহণ কর—সাধারণের স্থান ছাড়িয়া অসাধারণ হও, পশুমানবত্ব ছাড়িয়া দেবমানবত্ব লাভ কর—নিজে অনুভব কর ও সকলকে সেই অনুভূতির কথা শুনাও—ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশু, মরণ ধর্ম্ম ছাড়িয়া—অমরত্ব লাভ কর।

—স্বামী বিজয়ানন্দ

প্রবাসীর পত্রাংশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩১শে ডিসেম্বর প্রফেসরের বাড়ীতে বড় একটা ভোজ ছিল, খাবার পর গল্প তারপর রাত্রি প্রায় ১২টার সময় Christmass Tree. চারিদিকে হাতে হাত দিয়া সবাই নাচে, প্রায় ১৫ মিনিট ঠিক ১২টার সময় সবাই এক এক গ্লাস শ্যাম্পেন পান। পান করিবার পূর্ব্বে এই নব বর্ষে আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ুক, আমরা যেন ক্রমোন্নতি লাভ করি এই রকম একটা প্রার্থনা তারপর পান। তারপর গান ও বাজনা। আমরা যখন বাসায় ফিরি তখন রাত্রি ২টা এবং Temp.—15°C।

এ দেশের মেয়ে মানুষ অদ্ভুত, জানি না ইহারা এই সভ্যতার ফল কি না। ছেলেদের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়ে, Research করে, এক

Boarding এ থাকে, এক জায়গায় খায়, স্কীজ্ খেলে, ছেলেদের সঙ্গে skatingএ পাল্লাদেয়, walkingএ ও ছেলেদের সমকক্ষ, এবং খাবার পর চরুট খাইয়াও ছেলেদের হারায়। ছেলেরা তাই Cigar খায়, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ Cigarও খাইতেছে।

Europe এ সর্ব্বত্র সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত। গান, বাজনা ও Theatre wirelessএ Broad-casting হয়, ইংরাজীতে ইহার Receiverকে বলে Antena. আমাদের কলেজে এইরূপ একটি receiver আছে, এবং সৌখিন পুরুষেরা সবাই ঘরে ঘরে এইরূপ Antena রাখে, খরচ প্রথমে ২০০ শত টাকা, পরে মাসিক ১০।১২৲ টাকা দরকার। তাই আমাদের কলেজে ৬টা বাজিতে না বাজিতেই ছাত্র ও ছাত্রীরা আসিয়া ভিড় করে গান শুনিবার জন্য। তখন আর কাজ কর্ম্ম চলে না। এই London, এই Aberdeen এই Newcastle, এই Paris, এই Berlin, এই Manchester হইতে গান ও বাজনা, Aberdeenএর গান ও বাজনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমিত অবাক, ঘরের মধ্যে বসিয়া আগুনের সামনে সব রকম গান, Lecture বাজনা সবই শুনি। Scienceএ কি করিয়াছে?

খাওয়াটা একপ্রকার চলে, তবে সেই ডিম, সেই ডিম মাঝে মাঝে হাঁস ও মুরগীর মাংস পাই, না হলে ডিম। দুধটা খুব খাই এখানে এটা বেশ সস্তা, দৈনিক প্রায় ১ সের খাই। তবে কাঁচা দুধ খাইতে হয়।

বরফের মধ্যে যেরূপ গাড়ী ইহারা ব্যবহার করে তাহার একটি চিত্র দিলাম, আমরাও এইরূপ গাড়ীতে মাশাল লইয়া 25th Dec Churchএ গিয়াছিলাম।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই বরফ গলা শেষ হইয়াছে, এবং 1st May হইতে ইহাদের Official spring আরম্ভ। সে দিন ছাত্র মহলে খুব ধুম ধাম। বৈকালে দল বাঁধিয়া রাস্তায় বাহির হয়, মাথায় white cap (student's cap) পরে Castleএর নিকট আসিয়া বসন্তকে উপলক্ষ করিয়া গান করে। ইহাই বাহিরের প্রধান উৎসব।

সন্ধ্যা ৯টার সময় সবাই নিজ নিজ Club Houseএ যায়। পরে সারারাত্রি উৎসব করে। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ মদ, দ্বিতীয় অঙ্গ নাচ ও গান। হতভাগারা সে রাত্রিতে এত মদ খায় যে পরদিন সকাল ৬টার সময় কোন মতে ৪ হাত পায় বাড়ী ফেরে। এই ব্যাপারে ছাত্রদের অপেক্ষা ছাত্রীরাই বেশ পটু। মদের জন্য ছাত্রেরা watch বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার করে, পরে আস্তে আস্তে শোধ দেয়, মেয়েরাও wrist watch বা ভাল gown বাঁধা রাখে। অভিভাবকেরা কিছুই বলেন না, কেহ বলিলে উত্তর করেন 'আঃ এ বয়সে ওরূপ সবাই করে, একটুও আনন্দ করিবে না, বৎসরে একদিন বইত নয়। তবে মদ কম খাওয়া উচিৎ কেন না ইহার দাম ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে'। বলাবাহুল্য আমি এই নরকে যোগ দেই নাই, রাস্তায় ও আমাদের Boardingএ ইহাদের preparation অবস্থায় যাহা দেখিয়াছি, তাই যথেষ্ট। এতগুলি মাতালের সমাবেশ একসঙ্গে বোধ হয় জীবনে আর দেখা হবে না। আমার ধারণা ছিল যে ভদ্রঘরের মেয়েরা মাতাল হয় না, কিন্তু সে দিন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছি। ১৮ই মে Spring Confirmation Day। ১লা মে শুধু রাত্রিবেলাই ইহারা Club Houseএ হল্লা করিয়াছে, ১৮ই মে সে হল্লা সারা দিন রাস্তায় হইয়াছে এবং সারা রাত্রি নাচিয়াছে। দেখিলাম যে মেয়েদের স্বভাবসুলভ লজ্জাটা যেন এ দেশে নাই বলিলেই চলে। ওদলে আমাকে নেবার জন্য ইহারা বেশ চেষ্টাই করিয়াছিল, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই, মদ না খাইলে এই উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভবপর নহে। এবং আমি মদ সম্বন্ধে বিশেষ গোঁড়া, তাই ইহারা দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেল। এই May মাসে অনেকগুলি উৎসব হইয়াছে। আজ Students Ceremony, কাল Workmen's Ceremony, পরশু Citizen Ceremony। দল বাঁধিয়া গান করা আর রাস্তায় March করা হইত, বাহির হতে দেখি। এই May মাসে যত মদ বিক্রী হয়, বাকী ১১ মাসে প্রায় সেই পরিমাণ মদ বিক্রী হয়।

ইতিমধ্যে Nobel Lecture শুনিতে দুই দিন Stockholmএ

গিয়াছিলাম, যদিও বক্তৃতা ইংরাজীতে হল তবুও সেরূপ ভাল লাগিল না, তিনি বলেন ধীরে ধীরে এবং ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ইহার বড়ই কম। আজকাল এখানে রাত্রি হয় না বলিলেই হয়। সূর্য্যাস্ত ৮॥•টায় ও সূর্য্যোদয় ২॥• বা ৩ টায়। বাকী সময়টা গোধূলী; সব চেয়ে অন্ধকার হয় ১১॥•টা ১২ টায়। সে সময়েও Tower clock পড়া যায়। এবং আকাশ শাদা হইয়াই থাকে। আমাদের দেশে যেমন বলে যে পূর্ব্ব দিক ফর্সা হইয়াছে, এখানে ১১॥০টা, ১২টায় সেইরূপই আকাশের অবস্থা। এ সময় রাস্তায় খোয়া ও নুড়ি বেশ দেখা যায়। আমাদের বাড়ীর উঠানে আলো নাই অথচ এই সব চোখে বেশ দেখা যায়। কিছু দিন পর আরও ২০০ মাইল উত্তরে ২৪ ঘণ্টাই সূর্য্য দেখা যাবে। ইচ্ছা আছে যে July মাসে একবার ওদিক যাইয়া দেখিয়া আসিব।

আজকাল সব গাছেই নূতন পাতা গজাইতেছে এবং ঘাসের রংও সবুজ হইয়াছে, ঘাসের মধ্যে ইহাদের Spring flower বেশ সুন্দরই দেখায়। এ ফুলটি আমাদের সূর্য্যমুখী ফুলের মত তবে খুব ছোট, গাছও যেমন ৪।৫ ইঞ্চি, ফুলও তেমন বড় জোর ২ ইঞ্চি। কিন্তু দৃশ্যটা বড়ই চমৎকার। শীত খুব কমিয়াছে, আজকাল +15°C, অর্থাৎ আমাদের দেশের শীতের চেয়েও বেশী শীত। তাই ইহাদের Summer! পোষাক পরিবর্ত্তন কেহই করে নাই। তবে ছাত্রেরা Student cap মাথায় দেয়, ভদ্রলোকেরা Fur Hat ছাড়িয়া সাধারণ টুপি পরে। Overcoat সবাই মোটা ছাড়িয়া পাতলা ব্যবহার করে ও রাস্তায় কেহ কেহ gloves ভিন্নই চলে। আমি একদিন Boot ছাড়িয়া Shoe পরিয়াছিলাম, পায় যেন শীত শীত বোধ হল। তাই আজকাল Boot লইয়াই আছি।

প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দরই হইয়াছে, আমাদের পক্ষে এরূপ দৃশ্য কিছু নূতন নহে, তবে বরফটাই নূতন ছিল; Spring, Summer ইত্যাদি বলিয়া সবাই দেখা হলে একবার আমাকে বলেন, আমি হাসিয়া বলি Not yet! শুনিলাম কলিকাতায় এবার খুব গরম, অথচ এখানে আজকাল Moderate Temp.। আরও বেশী Temp হলে পাতলা Underwear ব্যবহার করিব। তাহাই ইহাদের গরমের পক্ষে যথেষ্ট।

কাজকর্ম্ম মন্দ হইতেছে না, তবে আমার আর সাহেবী পোষাইতেছে না ; কি করি, যখন আসিয়াছি তখন দেখিয়া যাই, এই ভাবে মনকে প্রবোধ দেই। আরও ১ বৎসর কাটাইতে হইবে ভাবিলেও মন কেমন হয়।

আপনারা আমার এই পত্র যখন পাবেন তখন হয় ত আমি Abisko সহরে Midnight Sun দেখিতেছি। হয় ত ১৫ দিনের মধ্যে North Sweden ও Norway দেখিতে বাহির হব। কত খরচ পড়িবে জানি না। এটার একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া টাকার জন্য Londonএ পত্র দেব, টাকা আসিলে পরে যাব।

আজকাল ইহাদের Spring ! যদিও আজকার Temp+ 5°C, মাঝে +10°Cএর উপর ১০।১৫ দিন ছিল, আবার আজ কয়েক দিন নামিয়াছে, ইহারা বলে দেখিবে কেমন গরম হয় +20°Cএ, অর্থাৎ আমাদেরদেশের শীতকালের অবস্থা ! পোষাকের কোনই পরিবর্ত্তন এখনও করিনাই, হয়ত করিবও না।

কাজকর্ম্ম একরূপ চলিতেছে, এখানে Sep. পর্য্যন্ত আছি পরে Denmark যাব।

অধ্যাপক ডাঃ—

মা

সুষুপ্তির কোলে তন্দ্রালস কায়,
বিছায়ে জগৎ—অঘোরে ঘুমায়।
পুঞ্জিত তিমির ঘন তরু ছায়,
বিজন কানন ভূমি।
শুধু নিরলস লহরী চপল
ভাগীরথী বুকে খেলিতেছে জল
ওঠে অবিরল, ধ্বনি কলকল
তট রেখা চুমি চুমি।

শ্যামাঙ্গী রজনী আজি গরবিণী,
হাসিছে খদ্যোৎ নক্ষত্র মালিনী।
সিত শশীকরে সুরূপ শালিনী,
রজত গৌর কায়া।
ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ সুনীল উজ্জল,
চারুচন্দ্র করে, করে ঝলমল।
ফলিত আলোক প্লাবিয়া ভূতল,
রচিছে স্বপন মায়া।
অনিমিখ আঁখি নিশিফোটা ফুল,
পরিপূর্ণ মধু সৌরভে অতুল।
চাহে বাঞ্ছিত চরণের মূল,
পরশি পড়িতে ঝরি।
প্রীতি নিবেদিত শিশিরাশ্রু নীর,
মূক আহ্বান্ প্রণয়বতীর।
বহি ধীর পদে, চলেছে সমীর,
পল্লবে মরমরি।
বিশ্ব চরাচর নিস্পন্দ নীরব,
ঘুমায়ে পড়েছে নিখিল মানব।
পশু পাখী আদি ঘুমায়েছে সব,
নিঝুম চারিধার।
ভাবুকের আঁখি দেখিতেছে চেয়ে,
বসিয়া রয়েছে একাকিনী মেয়ে।
নারী অল্পবয়া, মুরতি অভয়া,
ধরি রূপ প্রতিমার।
জাহ্নবী পুলিনে রাখি পাদুখানি,
যেন গো সজীব উপবন রাণী।
কি ভাবে মগনা, রয়েছ না জানি,
কত কি যে জাগে মনে।

কোমল মুরতি বঙ্গ গৃহ বধূ,
মুখে মাখা মৃদু সরমের মধু।
অসীম মমতা করুণার শুধু,
বাঁধে যায় ত্রিভুবনে।
হেথা হেন কালে কে তুমি জননী?
বসিয়া রয়েছ কেন একাকিনী?
বেশে কুলবধূ, ভাবে উদাসিনী
চিনিব কেমন করি!
অদূরে যে ঐ কুটির ক্ষুদ্র
ওরই মাঝে সদা রহে কি রুদ্ধ
তোমার অপার ভাব সমুদ্র অন্তঃ সলিলে ভরি!
কুলবধূচিত বিনীত আচারে,
মুগ্ধ রেখেছ যেথা সবাকারে।
শুচি সুশীলতা স্নেহ সদাচারে,
ব্যাপিয়া নিশীথ দিন।
কেমনে জানিবে, তুমি যে সবার,
হৃদয়ের দেবী চির সাধনার।
সীমাহীন স্নেহে জননী তোমার জগত রয়েছে লীন।
তুমি আপনারে চাহ মা, গোপনে,
লুকায়ে রাখিতে, লাজ আবরণে
বিজিত বাসনা অজিত জীবনে চরিত চির অনিন্দ্য!
প্রকৃতির পূজা গ্রহণের ছলে
এসেছ কি আজি কিশোরী কমলে!
ফুটাতে ভকতি সরসীর জলে
পদ্ম ছবি অরবিন্দ?
নব যৌবন অঙ্গে সঞ্চার
ললিত পুষ্পিত লাবণ্য সম্ভার
আছ পাসরিয়া, আমরি অপার মহা ভাব নিমগনা।

আপনা হারাণ কি রূপ মা তোর,
কবি অন্তর করগো বিভোর,
চ্ছুরিত ইন্দুকিরণে উজোর ঠিকরিছে জ্যোতিঃকণা।
শিরোগুণ্ঠন গিয়াছে খসিয়া
মুখ মধুরিমা উঠে উছরিয়া
লুব্ধ চাঁদিমা আছে মুরছিয়া করিতে আসিয়া চুরি।
রাশি রাশি আলো পড়েছে বিধুর
উজলি তোমার সঁাথির সিঁন্দুর,
কেন মা, মুখখানি করুণা বিধুর, আঁখি আসে জলে পুরি।
উছলি উৎস উঠে করুণার
কে বুঝি মা নাম নিয়াছে তোমার,
ভাবিছ কি তাই, কিমতে তাহার ঘুচাবে অশ্রুজল।
কে জানে কি ভাবে তুমি অশ্রুমতী
ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরে, কত মা শকতি,
অসীম ও ভাব নিরাশনে, সতী, সসীম বিচার বল।
জ্যোছনা অম্বরা যামিনী নিথর,
তৃণাসন তটে জাহ্নবী প্রসর,
বিস্তৃর্ণ উদ্যান অতি মনোহর কুসুম সুরভিময়।
সমুন্নত চূড় তুলিয়া গগনে
ওই শ্রীমন্দির রাজিছে অঙ্গণে
তারি প্রান্ত শোভি দেব নিকেতনে শুনেছি কে নাকি রয়
আড়ম্বর হীন স্বল্প পরিসর
অসজ্জিত ক্ষুদ্র একখানি ঘর
কে সে দিব্যোন্মাদ প্রেমিক প্রবর তারি মাঝে করে বাস
যে অদ্ভুত ক্ষ্যাপা থাকে ওই খানে
তুমি বিনা তারে কেহ নাহি জানে,
থাকো নাকি মাগো সারা দিনমানে
সঙ্গিনী তারি পাশ ?

সদা ভাবে ভোলা কিশোর তরুণ
সুরূপে জিনিয়া প্রভাত অরুণ
ধারণা অতীত ধরে কত গুণ কে করিবে তার সীমা,
কিবা সে মুরতি নীরবে ছিনিয়া
বিনামূলে মন নেয় গো কিনিয়া
কিসের এ টান্ ভুবন জিনিয়া বুঝিয়াছ তুমি কি মা
প্রত্যক্ষে রহিয়া রহে অগোচর
গৃহী কি সন্ন্যাসী রসিক প্রবর যেগো
উদাসীর সাজে রাজ রাজেশ্বর তারে যে গো চেনা ভার,
অনন্ত সুরূপে চির মনোহর
গুণাতীত হয়ে গুণের সাগর
করুণার খনি প্রেমের আকর অচিন্ত্য সবাকার
যে পরশমণি প্রেম রসায়ন
বসুধার ভার করিতে মোচন
উদিয়াছে বুঝি যুগ প্রয়োজন দীপ্ত গুণের রবি
জীব দুঃখে চির ব্যথিত হৃদয়
অসীম অপার স্নেহের নিলয়
চির বাঞ্ছিত লীলা-রসময় ব্যক্ত প্রেমের ছবি !
সে মূর্ত্ত ব্রহ্মের তুমি মাগো মায়া
সে দিব্য দেহের জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া
বিজিত বাসনা ত্যাগ পূত কায়া তদ্ভাব ভাবিতা সতী
আজন্ম বিশুদ্ধ মাতৃ মহিমার
পরিস্ফুট ছবি চির সাধনার
পূত আদর্শ স্বরূপ তোমার

কে বুঝিবে ভগবতি !

তুমি সধর্ম্মিনী সেই দেবতার
সংসারের সুখে চির নির্ব্বিকার
তবু এ বেদনা নহে উপেক্ষার সে যে সোহাগের খনি

অহেতুকী প্রেমে পূর্ণ সে হৃদয়
কখনো কি কারো ব্যথা উপজয় !
করুণ কোমল চির সহৃদয় রসরাজ চূড়ামণি !
পুষ্প কীটে রাখে আবরিয়া
মুখে মধু, মনে গরল ভরিয়া
প্রেমার্থী মানব, যেতেছে ভাসিয়া
প্রখর কামের স্রোতে।
মোহান্ধ সে কাম, প্রেম জ্যোতির্ম্ময়,
কামনা কখনো ভালবাসা নয়
"দিবা ও রজনী একত্রে উদয় কখনো কি পারে হতে ?"
বুঝি কাল ধর্ম্ম প্রভু প্রকাশিলা,
ধরি লোকচক্ষে অলৌকিক লীলা
মহাদর্শ ত্যাগ স্থির গতিশীলা অনন্ত কালের বুকে
বিশ্বের শুভার্থে, প্রিয় প্রয়োজনে
তুমিও হে দেবি, সকল জীবনে
সঁপিলে আপন সুখ তনু মনে হাসি অমলিন মুখে
প্রেমাস্পদ পদে চির আত্মদান
সর্ব্ব তেয়াগিনী যোগিনী সমান
আরব্ধ সে যত পূর্ণাহুতি দান সমস্ত তোমারি পায়
এ দিব্য প্রেমের কে করিবে সীমা
নর অগোচর অমর মহিমা
কি আছে ভারতে, যাহা দিব ওমা এর সহ তুলনা !
লোক বেদাতীত চরিত তোমার
তুলনা তা সহ, দিব মা কাহার
সুরাসুর আদি অগম্য সবার মানবে বুঝিবে কি, তা ?
দেখেছে দ্বাপর 'দ্রৌপদী দীপিত,
দেখিয়াছে ত্রেতা 'সীতা' আলোকিত !
সত্যে 'সতী' নাম সংসারে কীর্ত্তিত জগতে অপরাজিতা !

সতীত্ব আদর্শে চির স্মরণীয়া
নমেছি তাঁদিগে। পাইনি খুঁজিয়া
তোমারে কোথায় অয়ি গোপনীয়া লাজপট আবরিতা
নিত্য পূতা চারু অভিরামা
সংসার অতুলা, প্রেমে অনুপমা
চির নিষ্ঠাবতী সতী জিতকামা, শুচির প্রতিমাখানি
নিখিল কল্যাণ সাধন নিরত
সর্ব্ব ভূত হিতে দয়াবতী স্বতঃ
স্নেহামৃত ধার সিঞ্চি অবিরত ভুবনে,—ভুবনরাণী!
দেখিবে না কভু ভেবে কি সংসার
ত্যজিয়া আপন নায্য অধিকার
তুমি কত খানি দিয়াছ তাহার
শুভ তরে, চুপে চুপে।
স্বার্থ লেশ শূন্য, মোহ মৃত্যুঞ্জয়ী—
—মহা প্রেমে তুমি চির জ্যোতির্ম্ময়ী
জগত কল্যাণে অবতীর্ণা অয়ি,
কল্যাণী 'জননী' রূপে।

—শ্রীনিহারিকা দেবী।

মাধুকরী

ঠাকুর রামকৃষ্ণ—"১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ হয়, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে দক্ষিণেশ্বরের মহিমা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা ছাড়া কেশবচন্দ্রের জীবন সাধনার সহিত ঠাকুরের অন্তর্মুখী সাধনার একটা যোগ ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।........১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর যখন ব্রাহ্মণীর নিকট শক্তি সাধনায় জীবনের সব খানি ঢালিয়া দিয়াছেন, কেশবকে

তখন হইতেই আমরা ব্রাহ্মসমাজের কাজে উদ্বুদ্ধ হইতে দেখি, ঠাকুরের সাধনা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বক আকর্ষণে লোহার মত এই দুই অপূর্ব্ব জীবনের মিলন, বাংলার অধ্যাত্ম ইতিহাসে এক অলৌকিক রহস্য।........

"অতীতের অধ্যাত্ম কীর্ত্তির পুনরুদ্ধারে রাজার জীবনপাত হইয়াছিল। মহর্ষি প্রমুখ বহু মহৎ প্রাণ ব্রাহ্মের অক্লান্ত পরিশ্রমে সত্যের অনুভূতি-মাত্র জাতীয় জীবনে স্পর্শ দিয়াছিল। ভগবতানুভূতির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ইহ জীবনে তাহার অমৃত আস্বাদ কেশবের জীবনে সুরু হইয়াছিল। ঠাকুরের সাধনায় তাহা মূর্ত্ত হইয়া জাতিকে ধন্য করিয়াছে। শতাব্দীর সাধনা দক্ষিণেশ্বরে পরিপূর্ণতার আনন্দে সমৃদ্ধ হইয়াছিল—সাধনার পূর্ণাহুতি এইখানেই সার্থক হইয়াছে—দক্ষিণেশ্বরে তাই জাতির সিদ্ধ তীর্থ।

"* * * সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি যখন ধন্বন্তরির মত সুধাভাণ্ড হস্তে সিদ্ধি বিলাইতে ভক্তদের আকুল কণ্ঠে ডাক দিয়া তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন তিনি নিজেই বেলঘরিয়ার বাগানে গিয়া, কেশব যেখানে ঈশ্বর ভক্তের ঝাঁক্ লইয়া আনন্দ মগ্ন ছিলেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে মার্জ্জিত বুদ্ধি, উচ্চ শিক্ষিত নব্যবঙ্গ নিরক্ষর ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। "কেশবের লেজ খসিয়াছে" এই কথা শুনিয়া সকলে বিরক্ত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঠাকুরের পরিচয়, কলিকাতা বিদ্বৎ সমাজে ছড়াইয়া পড়ে নাই। কেশব চন্দ্রই ইহার অগ্রদূত। নরেন্দ্র কেশবের মুখ হইতে ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কাহিনী শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া জীবন বিকাইয়া ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও কেশবের সঙ্কেত ধরিয়া নবযুগের কেন্দ্র-চক্রে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

"* * * * তরুণ বাংলা কেশবের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু প্রাণ ঢালা সাধনার পথ খুঁজিয়া পাইতে ছিল না। কল্পতরু ঠাকুর প্রশস্ত রাজপথ দেখাইয়া দিলেন। কত হাজার হাজার মানুষ সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সে পথে চলিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে।

"* * * * ঠাকুর ভগবানকে জীবনময় করিলেন সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি পঞ্চরসের উপাসনাকে নব প্রাণ দিয়া সাধকের প্রাণে নূতন হিল্লোল তুলিলেন। ঈশ্বর দর্শনের পর, জীবাধার শাস্ত্রানুযায়ী সাধনে ও সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় সিদ্ধ করিতে, তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ নিয়মিতভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। * * * তিনি ছয়মাস অদ্বৈতভাবে পূর্ণরূপে অবস্থিত থাকিয়াও, বহুজন হিতের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য, জাতির সুমহৎ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য জীবনের রাজ্যেই ফিরিয়াছিলেন। গিরিশের কর্ণে বকল্‌মার সিদ্ধ মন্ত্র দিয়া, জাতিকে আত্ম সমর্পণ মন্ত্রে দীক্ষা দিবার অমোঘ বিধান তিনিই প্রবর্ত্তন করিলেন। আজিও যে তাঁহার অমিয় কণ্ঠের ঋক্ আমাদের কর্ণে অনাহত বাজে "এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান; এই নে তোর ধর্ম্ম এই নে তোর অধর্ম্ম; এই নে তোর ভাল, এই নে মন্দ; এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য; এই নে তোর যশ, এই নে তোর অযশ—আমায় শ্রীচরণে শ্রদ্ধা ভক্তি দে, দেখা দে—

"* * * ঠাকুর একনিষ্ঠ পূজায় আত্মদান করিয়া, পাষাণের মধ্যে যে দিন চৈতন্যময়ী মহাশক্তির দর্শন পাইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার সাধনার আরম্ভ—তাঁহার কথা "ঘর দ্বার মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল কোথাও যেন আর কিছুই নাই। আর দেখিতেছি কি? এক অসীম, অনন্ত, চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র! * * * তিনি দেখিলেন ত্রিকোণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মযোনি, শ্রবণ করিলেন অনাহত বিচিত্র ধ্বনি—গঙ্গাগর্ভ হইতে অপরূপ রূপ সম্পন্না যুবতী রূপে মহামায়া চক্ষের সমক্ষেই দেখাইলেন, —সন্তান প্রসব করিয়া, আবার তাহা লেলিহান রসনা বিস্তারে গ্রাস করিলেন—ঠাকুর উন্মাদ হইয়া উঠিলেন, সে রোগ ভবরোগ নয়, চিকিৎসায় আরাম হইবে কেন? পরিশেষে ব্রাহ্মণী বেশে সাধন শক্তি, যথা নিয়মে ঠাকুরকে সাধনার ক্রম পার করিয়া দিলেন; সে মহাবেদ বর্ণনার ভাষা নাই।

"* * * ঠাকুর ত বাকী রাখিলেন না কিছু! চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধনা শেষ করিলেন, আম মাংসের আস্বাদ লইয়া ঘৃণার বন্ধন ঘুচাইলেন, ষোড়শী উলঙ্গ যুবতীকে কোলে লইয়া কাম জয় করিলেন, বলিব কত?

* * * বেদান্তের সিদ্ধ মূর্ত্তি তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—ভবিষ্যৎ জাতির যে অধ্যাত্ম ভিত্তি তাহা ঠাকুরের করুণায় সিদ্ধ হইল।

"* * * ভারতের কঠিন সমস্যা, হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম বিরোধ, কেন জানি না ঠাকুর সুফী গোবিন্দের নিকট মোস্লেম্ মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া আল্লার পবিত্র নামের মর্য্যাদা রাখিলেন, তিন দিন তিনি যথা নিয়মে নমাজ পড়িয়াছিলেন, মুসলমানের খাদ্য ভোজন করিয়াছিলেন। আজ ভারতে ধর্ম্ম বিরোধ কেন ?

"শিক্ষিত সমাজে গুরুবাদের উপর একটা অকারণ অশ্রদ্ধার ভাব দেখা যায় ; অবশ্য গুরুকরণ যাহার তাহার ভাগে৷ ঘটে না, সংস্কার ক্ষয়ের মত ইহা লৌকিক আচার নহে। উচ্চ অধ্যাত্ম ভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে, ইহার অনিবার্য্য প্রয়োজন আছে। * * * যে মনের ক্ষেত্রে পৌঁছিলে জাতি দিবা হইবে তাহার সঙ্কেত দিতে গিয়া বলিয়াছেন "গুরু ভাবটি শ্রীশ্রীজগন্মাতার শক্তি বিশেষ ও সেই শক্তি সকল মানব মাত্রেই সুপ্ত বা ব্যক্ত ভাবে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই, গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক শেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যে তখন ঐ শক্তি তাঁহার নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মের জটিল নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকে।

* * * * *

"ঠাকুরের সন্ন্যাস, সেও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণের মহাশিক্ষা। জাতির কণ্ঠে এই ঋক্ উচ্চারিত হউক—"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি, দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতি-পূর্ব্বক ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা"

—প্রবর্ত্তক

২। বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্য —পৃথিবীর ভিতরটা কি ভয়ানক গরম। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমে এবং গরমজলের ফোয়ারায় পৃথিবীর ভিতরের যে তাপটার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাহার আসল তাপের তুলনায় অতি নগণ্য! বৈজ্ঞানিক বলেন এককালে পৃথিবী তরল অবস্থায়

সূর্য্যের মতই একটি জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড ছিল। তখন তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ছিল না। আগুনে, বাষ্পে, কর্দ্দমে ও জলে তাল পাকাইয়া তাহা এক কিম্ভূতকিমাকার অবস্থায় বিরাজ করিত। সৃষ্টির প্রথম উদ্বোধনে সেই অবয়বহীন ধরিত্রীর বহির্দ্দেশ ক্রমশঃ শীতলতা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু পৃথিবীর ভিতরটা এখনও তাহার আদিম অবস্থার মত প্রচণ্ড উত্তাপে তরল বা গলিত অবস্থাতেই আছে। শুধু তাহার উপরটাতে একটা পুরু শক্ত মাটীর চাপের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র; এ শক্ত মাটীর চাপকে ইংরাজীতে 'ক্রাষ্ট' (Crust) বলা হইয়া থাকে। ইহারই উপর অসহায় মানব বড় বড় ঘরবাড়ী তুলিয়া বসবাস করিতেছে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই মাটীর চাপটুকু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এবং আগ্নেয়গিরির গহ্বর দিয়া যখন ভিতরের সেই গলিত কর্দ্দম, ভস্ম ও গরমজলের ফোয়ারা বাহির হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়, পৃথিবীতে মানুষ কত অসহায়! পৃথিবীর এই উত্তাপকে তুলনা দিয়া বুঝাইবার মত উত্তপ্ত কোন জিনিষ ত্রিজগতের কুত্রাপি নাই। লোহার একটা নিরেট ভাঁটাকে ঐ উত্তাপে রাখিলে তাহা গলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইত। কিন্তু বিজ্ঞানের একটা মোটা কথা এই যে, প্রবল চাপের মধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে তাহা বাষ্প না হইয়া তরল আকার ধারণ করে। তাপ ও চাপের এই নিয়মটি বিজ্ঞানশাস্ত্রের খুব আবশ্যকীয় কথা; পৃথিবীর ভিতরে যে সকল জিনিষ রহিয়াছে, তাহাদের উপরের মাটির চাপটা বড় কম নহে। এই প্রবল চাপে পৃথিবীর ভিতরকার সমস্ত জিনিসই বাষ্প না হইয়া তরলাকার ধারণ করিয়া থাকে। যে পৃথিবীর ভিতরটি আজও এত তরল এবং গরম, তাহারই উপরে আমরা বাস করিতেছি, ইহা আশ্চর্য্য নহে কি?

পৃথিবীর এই আভ্যন্তরীণ প্রবল উত্তাপকে মাপিবার জন্য ভূতত্ত্ববিদেরা অনেকদিন ধরিয়াই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টার ফলে, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেরই মাটীর নীচেকার উত্তাপের মাত্রা মাপিয়া তালিকা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই তালিকা দৃষ্টে পৃথিবীর যে কোন স্থানের দুইমাইল গভীর মাটীর তলাকার উত্তাপের মাত্রা

বলিয়া দিতে পারা যায়। উত্তাপের এই তালিকা রচনায় বড় বড় খনি ও কয়লার খাদগুলি বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। তা ছাড়া, মাটীর নীচে ড্রিল্‌নামক একপ্রকার খননযন্ত্র চালাইয়া ভূতত্ত্ববিদেরা খুব গভীর কূপ খনন করিয়া থাকেন। তারপর নবাবিষ্কৃত অদ্ভুত অদ্ভুত তাপমানযন্ত্র বা থার্ম্মোমিটারকে ধীরে ধীরে এই সকল গভীর কূপে নামাইয়া তাঁহারা উত্তাপের মাত্রা পরিমাপ করিয়াছেন। খনন কালে কোন কূপে হয়ত ফুটন্ত জল বাহির হইয়া পড়িল, সেখানে যে তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, গলিত ধাতু ও কর্দ্দমে পূর্ণ কূপে সে তাপমানযন্ত্রে কাজ চলে না। তজ্জন্য অপর এক শ্রেণীর তাপমানযন্ত্র আছে। এইরূপে স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ থার্ম্মোমিটারের ব্যবহার প্রচলিত আছে। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত দুই মাইলের বেশী গভীর ড্রিলের কূপ দেখা যায় না। মার্কিনের এক গ্যাস্ কোম্পানীই ড্রিল দিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এই গভীর কূপটি খনন করিয়াছেন। তা' ছাড়া ব্রেজিলের "রে গোল্ড মাইন" নামক এক সোণার খনির গভীরতা পৃথিবীর অপরাপর খাদ বা খনির গভীরতাকে হারাইয়া দিয়াছে। ইহাও পূর্ব্বোক্ত ড্রিলের কূপের গভীরতার সমান।

"যে সব জায়গায় গরমজলের ফোয়ারা, আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের ধ্বংসাবশেষ আছে, মাটীর তলাকার উত্তাপের মাত্রা অপরাপর জায়গার তুলনায় ঐ সকল জায়গাতেই খুব বেশী। এই সকল জায়গার উত্তাপের মাত্রা সাধারণতঃ গভীরতার দশফিট হিসাবে এক এক ডিগ্রি করিয়া চলে, কিন্তু পৃথিবীর অপরাপর জায়গায় গড়পড়তায় প্রতি পঞ্চাশফিটে এক ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়াই হইতেছে সাধারণ নিয়ম। সুতারাং ব্রেজিলের এই দুই মাইল গভীর সোণার খনির উত্তাপ এত বেশী যে, কিছুদিন আগে সেখানে কুলীরা কাজ করিতে পারিত না। তা' ছাড়া এই প্রচণ্ড উত্তাপে ভিতরকার নানা বিপজ্জনক গ্যাস হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া মাসান্তে অন্ততঃ একজন লোকের প্রাণ হানি করিত। খনির উপর হইতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় দমকা বাতাসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীচে পাঠাইয়া আজকাল কতকটা এই দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ঠিক

কেন্দ্রটিতে পৌঁছাইতে হইলে ৩৯৫৮ মাইল গভীর কূপের প্রয়োজন! আজকাল ভূতত্ত্ববিদেরা সবে দুই মাইল গভীর কূপ খনন করিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। পূর্ব্বোক্ত অঙ্কের তুলনায় এই দুই মাইল অগাধ সমুদ্রে দুই বিন্দু জলের সমান! পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছিবার বাসনা থাকিলে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণকে আরও কত মাইল ড্রিল চালাইতে হইবে তাহা পাঠকপাঠিকাগণই হিসাব করিবেন! এই দুইমাইল গভীর কূপের উত্তাপে মানুষ যখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে তিন হাজার নয়শত আটান্ন মাইল গভীর কূপের উত্তাপে মানুষের অবস্থাটা কি হইবে, তাহাই বিবেচ্য! এই প্রচণ্ড উত্তাপে জগতের যে কোন পদার্থ—তাহা জড়ই হউক আর জীবই হউক—কখনও আস্ত থাকিতে পারে না।”

“নক্ষত্রের অজ্ঞাতবাস। অনেক সময় আকাশে এমন দু'একটা তারা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের পরিচয় দশবিশ বছরের মধ্যে জানা ছিল না। এই সব তারাকে আপাতদৃষ্টিতে নূতন বলিয়া বোধ হইলেও, তাহারা পুরাতন তারা; কারণ জ্যোতিষের বহু পুরাতন দপ্তরে তাহাদের নামধাম লিখিত রহিয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ শতাব্দী বা অর্দ্ধ শতাব্দীকাল অদৃশ্য থাকিয়া পুনরায় দৃষ্টিপথে উদিত হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ একটি নির্ব্বাসিত নক্ষত্র গত ১৩২৮ সালে জ্যোতিষিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নক্ষত্রটি আজ একান্ন বছর আগে অর্থাৎ গত ১২৭৯ সালে আমাদের আর একবার দেখা দিয়া উনপঞ্চাশ বৎসরের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায়। গত ১৩২৮ সালে তাহার সেই উনপঞ্চাশ বছরের অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ায় সে আবার আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল এবং গত ১৩৩০ সাল পর্য্যন্ত তাহাকে সমভাবেই দেখা গিয়াছিল। গত সালের শেষেই আবার সে উনপঞ্চাশ বছরের জন্য অদৃশ্য হইয়া কোন সুদূর আকাশে চলিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিকনা নাই। এই তারাটির নাম হইতেছে এথেরা (Aethera)। এথেরার প্রথম আবির্ভাব কালই হইতেছে তাহার আবিষ্কারের বৎসর; সে আজ একান্ন বৎসর আগের কথা। মার্কিন ও রুষসাম্রাজ্যের সমসাময়িক দুইজন জ্যোতিষী এথেরাকে ১২৭৯

খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের পর এথেরা মাত্র একবার মানবচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে। এথেরার এই দ্বিতীয় উদয় সেদিন পর্য্যন্ত আকাশে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই বর্ত্তমান সনের প্রারম্ভেই এথেরা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং আবার সেই ১৩৭৯ ছাড়া তাহার দেখা পাইবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই। জ্যোতিষিগণ এথেরার এই দ্বিতীয় উদয়ের সুযোগে তাহার ভ্রমণপথ, পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব ও আলোক বিশ্লেষণযন্ত্র যোগে তাহার গঠনোপাদান ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন।

জ্যোতিষিগণের এই সকল পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে যে, নক্ষত্রটি সূর্য্য হইতে আড়াই কোটী মাইল এবং পৃথিবী হইতে ষাট কোটী মাইল দূরে থাকিয়া একটি সুনির্দ্দিষ্ট ভ্রমণপথে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহার দেহটি পঞ্চাশমাইল মোটা। ইহার পথের সীমানা পৃথিবী হইতে এতদূর এবং তাহা পৃথিবীর ভ্রমণ পথ হইতে এরূপভাবে বাঁকানো ও ঘোরানো যে, দূরে চলিয়া যাইবার সময় কিছুদূর অবধি তাহাকে দেখা যায়, তাহার পর তাহার আলো আর মানবচক্ষু দেখিতে পায় না। নক্ষত্রটির বৃত্তাকার ভ্রমণ-পথের বক্রতাই তাহার সুদীর্ঘ অদর্শনের একমাত্র কারণ। এই বক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের দর্শনযোগ্য ব্যবধানের ভিতর আসিয়া পড়িলেই আমরা তাহাকে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিতে দেখি, তাহার পর সেই পথেই ঘুর পাক খাইতে খাইতে সে যখন পৃথিবী হইতে খুব দূরে সরিয়া যায়, তখন মনে হয় যেন তারাটি হঠাৎ নিভিয়া গেল। এথারা ছাড়াও এমন অনেক তারা আছে, যাহাদের এই অজ্ঞাতবাসের কাল শতাব্দী কাল পর্য্যন্তদীর্ঘ। একজন জ্যোতিষী তাঁহার জীবনে কেবলমাত্র একবার একটি নক্ষত্রকে দেখিয়া ভাবীকালে তাহায় দ্বিতীয় উদয়ের হিসাব রাখিয়া গেলেন। জ্যোতিষে এমন উাদাহরণও বিরল নহে অনন্ত আকাশ পথে ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্রপুঞ্জের সুদীর্ঘ ভ্রমণপথের তুলনায় পৃথিবীয় ভ্রমণ পথ কত ক্ষুদ্র।

বঙ্গবাসী শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি-এস্ সি।

কল্পনা

কি মহান! গরীয়ান! অনন্ত প্রবাহে
শক্তিধারা প্রেমধারা জাগিছে সতত।
ক্ষণে ব্যক্ত ক্ষণে লুপ্ত আদিত্যাদি কত
বিরাট প্রকৃতি মাঝে গ্রহ শত শত ॥
নিবিড় রাগিনী এক বাজিছে গভীরে
প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে প্রতি স্তরে স্তরে।
সৃষ্টি স্থিতি লয়ে মিলাইয়ে নিজ তান
অবিরাম, ছুটিয়াছে অন্ত-হীন স্বরে ॥
তবে কেন ব্যর্থ কল্পনায় রচিয়াছ
অনন্তের মাঝে তুমি সান্ত অধিকার।
ক্ষীণশক্তি অতি ক্ষুদ্র স্বাধীনতা লয়ে
জাগায়েছ নিরাশায় রাগিনী তোমার
এ পর্ণ কুটির তব বিবিধ বরণে
পত্র পুষ্পে নানা সাজে সাজায়েছ তারে।
সকলি শুকাবে হায় কালের প্রভাবে
স্মৃতিটুকু সাথী শুধু মরণের পারে।
ক্ষুদ্র স্বার্থ বৃথা আশা তুচ্ছ এ কামনা
ভুলে যাও মহাস্রোতে অনন্তের পানে।
ক্ষুদ্র পটখানি তব মহাপটাকাশে
মিশে যাক মহানন্দে অনন্তের ধ্যানে।

—শ্রীমলিনাবালা দাসী

গ্রন্থ-পরিচয়

Swami Abhedananda in India—সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। সাত মাস পর্য্যন্ত তিনি কলম্বো হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে বোম্বাই ও অন্যান্য স্থান পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বত্রই তিনি সমাদৃত হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের পর এখন পর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তি এরূপ ভাবে অভিনন্দিত হন নাই। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী অভিনন্দন ও বক্তৃতাবলী 'হিন্দু' 'মহীসুর ষ্টাণ্ডার্ড', 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার', 'বোম্বে ক্রনিকল্', 'ব্রহ্মবাদিন্', ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রভৃতি প্রত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

পাঠকগণ এই পুস্তকে স্বামিজীর কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার বক্তৃতাসমূহ পাঠ করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমস্যা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবেন।

An Appeal to Young men of Bengal—(বঙ্গ যুবকগণের প্রতি) নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি। স্বামিজীর আশাস্থল বঙ্গীয় যুবক এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া প্রবুদ্ধ হউন এই আমাদের আন্তরিক কামনা। মূল্য দুই আনা।

৺দুর্গোৎসবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—দুর্গাপূজা বাঙ্গালার জাতীয় সাধনা-বিগ্রহের পূজা। মহাপুরুষগণের জীবনের সহিত গ্রথিত হইয়া তাহা আরও মহিমাময় হইয়া উঠে। পাঠক ভারতীয় সাধনায় অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলে গ্রন্থপ্রচার সার্থক হইবে। মূল্য চারি আনা।

ভারতের নিধি—প্রকাশক শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী সাহিত্য বিশারদ—মূল্য ।৵১০ আনা। বহি খানিতে সুললিত ভাষায় চারিটি পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সঙ্ঘ-বার্ত্তা

১। তাঞ্জোর ত্রিচিনাপল্লী কৈয়ম্বটোর মালাবারে ভীষণবন্যার কথা আমরা পূর্ব্বে জনসাধারণকে জানাইয়াছি। বন্যায় সেবা কার্য্যের জন্য বর্ত্তমানে বিভিন্ন স্থানে ১১টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। গত সপ্তাহে ১০,০০০ হাজারেরও অধিক দরিদ্র নারায়ণকে চাউল দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ অভাবগ্রস্তদিগকে দেড় হাজার বস্ত্র বিতরণ ও তাহাদের জন্য দেড়শত গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উক্ত স্থানসমূহে বাস গৃহোপযোগী উপকরণের অত্যন্ত অভাব। এ সমস্ত কার্য্যের জন্য আমরা ১৯৮৮৫৲ টাকা পাইয়াছি এবং গত মাসে ১০৫০৭৲ টাকা খরচ হইয়াছে কিন্তু দেশের এত অধিক পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে যে এখনও ৩০।৪০৲ হাজার টাকা পাইলে তবে বিপদাপন্ন নরনারীর কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। আশা করি সহৃদয় জনসাধারণ অর্থ ও বস্ত্রদানে বন্যাপীড়িত নরনারীগণকে এই দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। যাঁহারা সাহায্য করিবেন তাঁহারা বেলুর মঠে, বা উদ্বোধন অফিসে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্য জন্মভূমি জয়রামবাটী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর সব্‌ডিভিজানের অধীনস্থ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই জেলার এই অংশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অতীব ভয়াবহ। এই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে প্রতিবৎসর বহু সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় উক্ত গ্রামগুলি ক্রমেই জনহীন হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা এই স্থান দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয় রোগের প্রাদুর্ভাবে উৎসন্নপ্রায় এই গ্রামগুলির শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এই দরিদ্র ও অশিক্ষিত জন বহুল, অসহায় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অধিবাসিবৃন্দের শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে বিচলিত হইয়া কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী সদয় হৃদয় ৺ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন ১৩২২ সালের

আষাঢ় মাসে এই স্থানে শ্রীশ্রীসারদা দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন তিনি স্বীয় যত্ন ও চেষ্টায় বিগত সন পর্য্যন্ত উক্ত ঔষধালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে উক্ত মহাত্মা সহসা কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় উক্ত শুভ অনুষ্ঠানটি নষ্ট হইবার মত হয়। সেই সময় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণমিশন উক্ত ঔষধালয়ের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিয়া এতাবৎ কোনও রূপে চালাইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত ঔষধালয়টার সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন জন্য জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজনায়।

দ্বিতীয়তঃ—এইগ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামে বিদ্যালয়ের নামমাত্রও না থাকায় স্থানীয় বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব যৎপরোনাস্তি অনুভূত হইতেছে। এতদ্দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণমিশন গত ৪ঠা বৈশাখ তারিখে জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীশ্রীসারদা বিদ্যাপীঠ নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

এতদর্থে বাহিরের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ ভূমিসংগ্রহ, তদনুরূপ প্রয়োজনানুরূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং আবশ্যকমত সরঞ্জমাদি সরবরাহকল্পে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন।

আমরা এই উভয়বিধ অনুষ্ঠান সম্মুখে লইয়া উদারহৃদয় জনসাধারণের নিকট অগ্রসর হইতেছি এবং আশা করি তাঁহারা নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী উক্ত অনুষ্ঠানদ্বয়ের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইতে হইবে, (১) সেক্রেটারী, উদ্বোধন, বাগবাজার কলিকাতা (২) কার্য্যাধ্যক্ষ, জয়রামবাটী, দেশড়া পোঃ,বাঁকুড়া।

৩। কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ শেঠ নারায়ণদাস ঠাকুরজী মুলজীর দেহত্যাগে গভীর মর্ম্ম-বেদনা অনুভব ও আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছে। তিনি সুবিখ্যাত স্যার বিটলদাস দামোদর ঠাকুরজীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিকে তিনি যেমন ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত এবং বিবিধ লোক হিতকর প্রতিষ্ঠানের ট্রসষ্ট ছিলেন, অপরদিকে তেমনি বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। লোক

হিতকর কার্য্যে তিনি যে বহু অর্থ ব্যয় ও দান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৫৯০০০৲ টাকার দানটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই টাকার সুদ কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পরিচালন কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। সেবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তদীয় সুযোগ্য পুত্র শেঠ আন্নাসাহেব নারায়ণদাস ঠাকুরজী এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। বলাবাহুল্য শেঠ আন্নাসাহেবও লোকহিতকর ব্যাপারে বদান্যতায় পিতার সমতুল্য।

৪। প্রেমানন্দ-স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠা। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা সহচর, আজীবন শুদ্ধ সত্ত্ব বিগ্রহ শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামিজীর অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যাপুতঃ হৃদয়, এককালে পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিয়া, তদঞ্চলের মঙ্গল কামনায় যেন নিজকে একরূপ বিলাইয়া দিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে তিনি যে মহাবীর্য্যসম্পন্ন আধ্যাত্মিকতার বীজ ছড়াইয়া যান, তাহাই ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া এক্ষণে সুবিশাল ধর্ম্মতরু-রূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আজ (শুভ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে) বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী সোণারগাঁ যে তাঁহারই স্মৃতিপুত শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ-পীঠ স্থাপনা দর্শন করিল—তাহার স্বার্থকতা কালই স্বয়ং বর্ণনা করিবে।

সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সোণার গাঁ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (তাজপুরে) উপনীত হওয়া গেল। গিয়া দেখিলাম বেলুড়-মঠ হইতে পরমভক্তিভাজন শ্রীমৎ সুবোধানন্দ স্বামিজী মহারাজ ও আরও কয়েকজন সাধু সন্ত দুই একদিন পূর্ব্বে তথায় আগমন করিয়াছেন। সন্ধ্যারতির মধুর ধ্বনি আরম্ভ হইতে না হইতে, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে কয়েকজন ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্ম্মিত সুন্দর সিংহাসনটি লইয়া উপস্থিত হইলেন। গৌহাটীতে অগ্নিকাণ্ডে নিঃসম্বল প্রজাগণের সেবা ও সাহায্য দানান্তর আরও দুই জন স্বামী সদ্য আসিয়া পৌঁছিলেন।

কোথাও ভক্তগণ ভজন গাহিতেছেন, কোথাও পুষ্প পত্রাদির দ্বারা আশ্রমবাটী সুসজ্জিত হইতেছে। উৎসবের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে একটি শান্ত সংযত দিব্য শান্তির প্রবাহ যেন সকলের অন্তরে অন্তরে বহিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন ৭ই মে বুধবার (শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে) প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শুচিশুদ্ধ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র আশ্রমবাটীতে সমবেত হওয়া গেল। সুসজ্জিত নবনির্ম্মিত মন্দির মধ্যে পূজনীয় স্বামী অক্ষয়ানন্দ পূজাদি কার্য্যে রত ছিলেন। একটু পরে পূজনীয় সুবোধানন্দ স্বামিজী মহারাজ, মধুর শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি সহ তিনবার মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করিয়া স্বহস্তে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রতিকৃতি সিংহাসনোপরি বসাইয়া দিলেন। শ্রীশ্রী 'মা' এবং স্বামিজীর মূর্ত্তিও ঐরূপ শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রতীক সুশোভিত "প্রেমানন্দ স্মৃতি" মন্দির, মহদুদার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, চূড়া হইতে ভিত্তিতল অবধি সুবৃহৎ পীতধ্বজা সহ, উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিল। "জয় শ্রীগুরু মহারাজ জী কি জয়" রবে তাজপুর মুখরিত হইল। গীতা, উপনিষদ, চণ্ডী পাঠ হইতে লাগিল, এবং ঐ পবিত্র মন্ত্রধ্বনি এক মহান্ আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ স্বরূপ হইয়া যেন দিগন্তে ভাসিয়া চলিল।

কয়েকটি ভাগ্যবান যুবক আচার্য্যদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবজীবন লাভ করিল। দুইজন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের (শিবানন্দ স্বামিজীর) অনুমতির জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, বৈকালে অনুমতি আসিল :—"Guru moharaja's blessing inauguration. Give Brahmacharya Two"। অতএব সন্ধ্যার পর তাঁহারা ভারতের সনাতন ত্যাগাদর্শের নিকট নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া মহাপবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন।

বৈকালে সেবাশ্রমের সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নিকটস্থ বিভিন্ন পল্লী হইতে হিন্দু মুসলমান প্রায় পাঁচ ছয় শত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের গত দুই বৎসরের কার্য্য বিবরণী পাঠ হইল এবং অনেকে বক্তৃতা করিলেন। একটি মুসলমান ভদ্রলোক বেশ বলিয়াছিলেন। সৎকর্ম্মে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও সহায়তা করা যে, ইসলামের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত তাহা তিনি বিষদ্ করিয়া বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মচারী অমল চৈতন্য মহারাজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে, এবং

সেবাশ্রম ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা সম্বন্ধে, ওজস্বিনী ভাষায়, অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি (অমল চৈতন্য) প্রেমানন্দ স্বামী সম্বন্ধে যে একটি ক্ষুদ্র স্মৃতি বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল এবং বোধ হয় সকলেরই মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। একবার তিনি (অমল চৈতন্য) ছাত্রাবস্থায় পূজনীয় প্রেমানন্দ স্বামিজীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন স্বদেশীর পুরা মরসুম। স্বামিজীর নিকট আর ও কয়েকটি ছেলে ছিল। তখন ঢাল তরবারি ভিন্ন ভারতের উদ্ধার সাধন হইবে না, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি (প্রেমানন্দ স্বামীজি) তাহাতে উত্তেজিত হইয়া, মহাবীর বিবেকানন্দ স্বামীর ফটোগ্রাফ দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন "এমন বীর কি জগত কখনো দেখিয়াছে? যদি অস্ত্র বলেরই আবশ্যক হইত, তাহা হইলে কি ইঁহার পাশে একখানি তরবারিও ঝুলিত না?"

সর্ব্বশেষে পূজনীয় স্বামী রামেশ্বরানন্দ সকলের প্রতি শ্রীভগবানের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন ও সভাভঙ্গ হয়।

সন্ধ্যা বেলায় দেখা গেল, আগত মুসলমান ভ্রাতাগণ অদূরে সেবাশ্রমের পুষ্করিণীর তীরে সারি সারি দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতেছেন। সে এক পবিত্র সুন্দর দৃশ্য।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী এবং উৎসব কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ধন্যবাদ যে কাহারও কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। উৎসবান্তে পরদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী মহারাজগণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম। শুধু হৃদয়ে জাগরুক রহিল, সেই দুই দিনের মধুময় স্মৃতি। ঐরূপ শুভযোগ জীবনে বড় বহুবার ঘটে বলিয়া মনে হয় না। তাই বার বার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হইতেছে। (শ্রীঅবনী মোহন গুপ্ত)

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৫। আজ দর্শন করতে গিয়ে সুবিধা থাকায় মার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল, সবই কিন্তু মঠের সন্ন্যাসী ছেলেদের কথা। প্রেমানন্দ স্বামিজীর দেহ রক্ষায় বোধ হয় তাঁর মনে আজকাল ছেলেদের কথা সর্ব্বক্ষণ উদয় হচ্ছিল, তাই তাঁদের কথা তুলে মা বললেন "ঠাকুরকে ছেলেরা সব, বাঁড়ে (পরীক্ষা করে) নিয়ে তবে ছেড়েছে। বরানগর মঠে যখন ওরা ছিল তখন, আহা! নিরঞ্জন-টন্ ওরা সব কত দিন আধপেটা খেয়ে ধ্যান জপ নিয়ে কাটিয়েছে। একদিন সকলে বলাবলি করলে—"আচ্ছা, আমরা যে ঠাকুরের নামে সব ছেড়ে ছুড়ে এলুম, দেখি তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকলে তিনি খেতে দেন কি না। সুরেনবাবু এলে কিছু বলা হবে না। ভিক্ষে-টিক্ষেও কেউ করতে যাব না",—বলে, সব চাদর মুড়ি দিয়ে ধ্যান লাগিয়ে দিলে। সারাদিন গেল—রাতও অনেক হয়েছে, এমন সময় শোনে দরজায় কে ঘা মারছে। নরেন আগে উঠেছে বলছে "দেখ তো দরজা খুলে, কে? আগে দেখ্ তার হাতে কিছু আছে কি না!" আহা, খুলেই দেখে লালাবাবুর মন্দির থেকে (গঙ্গার ধারের শ্রীশ্রীগোপালের বাড়ী) ভাল ভাল সব খাবার নিয়ে একজন লোক এসেছে! দেখে ত সব মহা খুসী—ঠাকুরের দয়া টের পেলে। তখনি উঠে ঠাকুরকে ভোগ রাগ দিয়ে সেই রাতে সকলে প্রসাদ পেলে। এমনি আরও ক

দিন হয়েছে। সিতির বেণীপালের বাড়ী হতেও অমনি করে একদিন লুচি এসেছিল। এখন ছেলেরা ত মহা সুখে আছে। আহা! নরেন, বাবুরাম ওরা সব কত কষ্ট করে গেছে। এখন তোমাদের মহারাজ সেই রাখালকেও আমার কতদিন ভাতের হাঁড়ী মাজতে হয়েছে। নরেন একবার গয়া, কাশীর দিকে যেতে যেতে দু দিন না খেয়ে এক গাছ তলায় পড়ে ছিল। খানিক পরে দেখে, কে তাকে ডাকছে। দেখে, সে লোকটি খানকতক লুচি, তরকারী, মিষ্টি ও এক ঘটী ঠাণ্ডা জল সামনে ধরে বললে "রামজীর প্রসাদ এনেছি, গ্রহণ করুন।" নরেন বললে—'আমার সঙ্গে ত তোমার কোন পরিচয় নেই, তুমি ভুল কচ্ছ—আর কাউকে উহা দিতে বলেছেন। লোকটি মিনতি করে বললে 'না মহারাজজী, আপনার জন্যই এইসব এনেছি। দুপুরে আমি ঘুমিয়েছি দেখি কি স্বপ্নে একজন বলছেন 'শীগগির ওঠ, অমুক গাছ তলায় যে সাধু আছেন, তাকে খাবার দিয়ে আয়। স্বপ্ন ভেবে আমি তাতেও না উঠে পাশ ফিরে শুলাম তখন আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে তিনি বললেন 'আমি উঠতে বলচি আর, তুই ঘুমুচ্ছিস, শীগগির যা।" তখন মনে হল, মিথ্যা স্বপ্ন নয়, রামজীই হুকুম কচ্ছেন। তাই এই সব নিয়ে ছুটে এসেছি। তখন নরেন ইহা ঠাকুরেরই দয়া ভেবে ঐ সব খাবার গ্রহণ করে।

আর একবার এমনি হয়েছিল। তিন দিন পাহাড়ে হেঁটে হেঁটে নরেন খিদেয় মূর্চ্ছা যাবার মত। এমন সময়ে এক মুসলমান ফকির একটি কাঁকুড় দেয়, সেইটি খেয়ে তবে বাঁচে। নরেন আমেরিকা হতে ফিরে এসে এক সভায় (আলমোড়ায়) একদিন ঐ মুসলমানটিকে এক ধারে দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে তার হাত ধরে নিয়ে এসে সভার মাঝে বসালে। সকলে বললে "একি"। তখন নরেন বললে 'এ আমার জীবন দাতা' বলে ঘটনাটি সকলকে বললে। তাকে টাকাও দিয়েছিল। সে কিছুতেই নেবে না। বলে 'আমি কি করেছি যে টাকা দিচ্ছেন?' নরেন তা কি শোনে?—বলে দিয়ে দিলে।

আহা, নরেন আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম পূজা (দুর্গা পূজা)

যেবার করায়—সেবার পূজককে * আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালে। চৌদ্দ শ টাকা খরচ করেছিল। পূজোর দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাট্‌চে। নরেন এসে বলে কি "মা, আমায় জ্বর করে দাও।" ও মা বলতে না বল্‌তে খানিক বাদেই হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি 'ওমা একি হল, এখন কি হবে?' নরেন বললে 'কোন চিন্তা নাই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম। এই জন্যে যে, ছেলে গুলো প্রাণপণ করে ত খাটচে, তবু কোথায় কি ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকবো, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসব। তখন ওদেরও কষ্ট হবে আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে!" তার পর কাজ কর্ম্ম চুকে আস্‌তেই আমি বললুম 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠো।' নরেন বললে "হাঁ, মা, এই উঠ্‌লুম আর কি'—বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল!

"তার মাকেও পূজার সময় মঠে নিয়ে এসেছিল। সে বেগুন তোলে, লঙ্কা তোলে আর এ বাগান ও বাগান ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মনে একটু অহং যে, আমার নরেন এ সব করেছে। নরেন তখন তাকে এসে বলে—'ওগো, তুমি কচ্চ কি? মায়ের কাছে গিয়ে বস না। লঙ্কা ছিঁড়ে, বেগুন ছিঁড়ে বেড়াচ্চ'। মনে কচ্চ বুঝি তোমার নরু এ সব করেছে। তা নয়। যিনি করবার তিনিই করেছেন, নরেন কিছু নয়।" "মানে, ঠাকুরই সব করেছেন।" "আহা, আমার বাবুরাম নেই, কে এবার পূজো করবে?"

২০শে শ্রাবণ, ১৩২৫ মঙ্গলবার অমাবস্যা। আজ গিয়ে দেখি মা উত্তরের বারান্দায় বসে জপ করচেন। খানিক পরে পাঁচ ছয়টি মেয়ে লোক মাকে দেখতে এলেন। তাঁরা ঠাকুর প্রণাম করে বসতেই মা

* এ বৎসর কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজক ছিলেন। শশী মাহারাজের বাবা তন্ত্রধারক ছিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজা করিলেও তন্ত্রধারকই সব দেখাইয়া শুনাইয়া দেওয়ায় তিনিই কার্য্যতঃ পূজক ছিলেন। শ্রীশ্রীমা পূজক বলিতে তাঁকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

জপ শেষ করে তাঁরা কোথা হতে আসছেন জিজ্ঞাসা করলেন। নলিনী তাদের পরিচয় দিলেন। শুনিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন চিকিৎসার জন্য এসেছেন, পেটে 'টিউমার' হয়েছে, ডাক্তার সাহেব বলেছেন অস্ত্র করতে হবে, তাই শুনে তিনি বড় ভয় পেয়েছেন। কে জানে কেন, মা এদের কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিলেন না। তাঁরা ঐজন্য বারম্বার প্রার্থনা করলেও স্বীকৃত না হয়ে বললেন ঐ চৌকাঠ হতে ধূলো নেও। তাঁরা শেষে অসুস্থ মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন ও সেরে উঠে আবার আপনার দর্শন পায়।" মা ভরসা দিয়ে বল্লেন—"ঠাকুরকে ভাল করে প্রণাম কর, উনিই সব।" পরে যেন একটু অতিষ্ঠ অতিষ্ঠ ভাবে বললেন তবে তোমরা এখন এস, রাত হল।" তারা ঠাকুর প্রণাম করে চলে যাবার পরে বললেন 'গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে ফেল, ঠাকুরের ভোগ উঠবে।' বউ আদেশ পালন করলে মা উঠে এসে নীচের বিছানায় শুয়ে গায়ের কাপড় খুলে ফেলে পাখা আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাতাস কর তো মা, শরীর জ্বলে গেল! গড় (প্রণাম) করি মা কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আস্‌ছে, কারো বা পঁচিশটা ছেলে মেয়ে —দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে—মানুষ ত নয়, সব পশু! সংযম নেই, কিছু নেই! ঠাকুর তাই বলতেন 'ওরে, একসের দুধে চার সের জল, ফুঁকতে ফুকতে আমার চোখ জ্বলে গেল। কে কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস—আয় রে, কথা কয়ে বাঁচি।' ঠিক কথাই বলতেন। জোরে বাতাস কর মা, আজ বেলা চারটা হতে লোক আসছে, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না!

"আহা, আজ বলরামের পরিবারও এসেছিল, বাবুরামের জন্য কত কাঁদলে। বললে 'একি আমার যে-সে ভাই।' তাইত মা, দেবতা ভাই'।

খানিক পরে তেল মালিস করতে বললেন। মালিস করতে করতে বললুম "মা, ডাল রান্না করে এনেছি,—ভক্তেরা খাবেন বলে"। মা

বললেন 'বেশ করেছ, রাখালও দুটো ইলিস মাছ পাঠিয়েছে। বাবু-রাম গিয়ে অবধি সে এখনও মাছ খায় নাই।

এর পূর্ব্বে একদিন রাধুর বর মাংস খেতে চেয়েছিল। সেই কথা এখন একজন বলায় মা বললেন 'এখন এখানে কেমন করে হবে! এই বাবুরামটি আমার চলে গেছে, সবারই মন খারাপ। এ ঠাকুরের সংসার, তাই কাজ কর্ম্ম সব হচ্চে। তা না হলে কান্নার রোলে বাড়ী ভরে যেতো, কেউ কি উঠতে পারতো। তবে খেতে চেয়েছে দিতেই হবে। তা, এরা যদি রান্না করে আনে, তবে হতে পারে" বলে আমার পানে চাইতেই, বললুম 'জামাই, যদি আমাদের হাতে খান, তবে অবশ্যই আনতে পারব।' মা বললেন 'তা খাবে না কেন? খুব খাবে। রান্না করে বামুন ঠাকুরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। ছেলেদেরও কারু কারু অরুচি হয়েছে, জগদম্বার প্রসাদ হলে তারাও একটু একটু খাবে—তা কত হলে হবে যোগীন?" যোগীন মা বললেন 'তা, তিন চার টাকার, কমে হবে না।' মা বললেন 'তবে, কিছু টাকা নিয়ে যেয়ো। আমি—'তা হবে না মা, শ্রীমান্ রাগ করবে।' মা হাসতে লাগলেন। বললেন 'তবে থাক্'। পরের রবিবার কালীঘাট হতে মাংস আনিয়ে রেঁধে পাঠানো হল।

২৬শে শ্রাবণ সোমবার আজ মায়ের কাছে যেতেই মা বললেন 'পাঁঠা বেশ হয়েছিল গো, সব্বাই বেশ খেয়েছে! কেমন করে রাঁধ্‌লে? আমি যখন ঠাকুরের জন্য রাঁধ্‌তুম কাশীপুরে, কাঁচা জলে মাংস দিতুম, কখনো তেজপাত ও অল্প মসলা দিতুম, তুলোর মত সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতুম। আমি—'সে বোধ হয় জুস্ (সুরুয়া) হত মা'। মা—'তা হবে'। নরেন আমার নানা রকমে মাংস রাঁধতে পারতো। চিরে চিরে ভাজতো, আলু চ'টকে কি সব রাঁধতো—তাকে কি বলে? আমি—'বোধ হয় চপ্, কাট্‌লেট্ হবে।' 'তুমি সে সব রাঁধতে পার?" 'পারি। জামায়ের জন্য করে আনবো'।

আ—শ্রীমানের বড় ইচ্ছা, আপনাকে কিছু খাবার তৈরী করে খাওয়ায়। তা, আমি যদি রেঁধে আনি, খাবেন আপনি? "তা,

খাব না কেন মা, তুমি হলে আমার মেয়ে, তবে বেশী করো না, অল্প স্বল্প। দেহ সুস্থ নয় কিনা, আর, এই রাস্তাটা দিয়ে আন্‌তে হবে।” আমি—“আচ্ছা, তাই হবে” বলে সেদিন বিদায় নিলুম।

পর দিন কিছু খাবার করে নিয়ে যেতেই মা বল্‌চেন “এই দেখ গো, আবার কত কষ্ট করে এ সব নিয়ে এসেছে”। নলিনী বললেন—‘তুমি চাও কেন, তাই তো নিয়ে আসে।” মা বললেন—‘তা, ওদের কাছে চাইব না ?—আমার মেয়ে, আর এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা ! কি বল মা।” আমি—সে তো ঠিক কথা। মা যে কৃপা করে আনতে বলেন, তাতেই আমরা ধন্য হয়ে যাই। আজ অনেক রাত হতে তবে গিয়েছিলাম। ভোগের পর প্রসাদ নিয়া বাড়ী আসবার সময় বললুম, কাল বোধ হয় আসা হবে না মা, এক বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে। ‘আচ্ছা, তা কাল না এলে ভাব্‌বো, বিয়ে বাড়ী গেছে’। ঘিটা সেদিন ভাল ছিল না, “ভাজা জিনিষগুলো ভাল হয় নাই,” মা বল্‌তে আর একদিন ভাল ঘিয়ে কয়েক রকম খাবার, পিঠে ও ডাল, তরকারী রেঁধে নিয়ে গিয়াছিলাম। খেয়ে মা খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। মার ভাইঝি নলিনী দিদির একটু শুচিবাই ছিল—তিনিও সেদিন ঐ সব খাবার খেয়ে বলেছিলেন, আমার ত কারুর রান্না রোচে না, কিন্তু এর হাতে খেতে কিন্তু ঘেন্না হচ্চে না। মা বললেন—“কেন হবে—ও যে আমার মেয়ে।” পরে আমাকে বল্‌চেন “দেখো সেদিন যে কচু শাকের অম্বল দিয়েছিলে, তা আমাকে ওরা দেয় নাই।”

২৯শে শ্রাবণ—১৩২৫। আজ গিয়ে দেখি মা, ডাক্তার দুর্গাপদ বাবুর ভগ্নীর সঙ্গে কথা কচ্চেন। বোর্ডিংএর দুটি মেয়ে ও ঢাকা হতে একটি বউ এসেছে। সকলে মাকে ঘিরে বসে আছে। প্রণাম করে আমি বসলাম। ডাক্তার বাবুর ভগ্নী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। তাঁর স্বামীর বিষয় নিয়ে গোল বেধেছে, ভাগ্নেরা গোল করছে, উইলের ‘প্রবেট’ পেতে দেরী হচ্ছে এই সব অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তা হল। শেষে মা বললেন—“দান বিক্রয়ে যখন তোমার অধিকার নেই তখন ভাল লোকের হাতে বন্দোবস্তের ভার দিও। সংসারী বিষয়ী লোকদের

কি বিশ্বাস আছে? টাকা কড়ির লোভ সাম্‌লে কাজ করতে পারে প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসীতে; তা মা, তুমি অত ভেবো না। যা করবার হরি করবেন। তুমি সৎপথে আছ, ঠাকুর কি আর তোমায় কষ্টে ফেলবেন? তবে এখন এস। (গাড়ী এসেছে, বাহির হতে তাগিদ আসছিল) চিঠি পত্র দিও, আবার এসো।"

তিনি বিদায় হবার পরেই শ্রীযুত শ্যামাদাস কবিরাজ গোলাপ মাকে দেখতে এলেন। তিনি যদি দেখা করতে আসেন ভেবে মা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। পরে চলে গেছেন শুনে শয়ন করিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এইবার তোমার কাজটি করো।" আমি তেল মালিস করতে বসলুম।

তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে মা বললেন—'আহা, গিরিশ ঘোষের বোন্‌ আমাকে বড় ভালবাসতো, বাড়ীতে যা রান্না বান্না করতো আমার জন্য আগে রেখে নিয়ে আসতো। কত রকম রান্না করিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে নিয়ে এসে, বসে বসে আমাকে খাওয়াতো। একদিন বলে কি, "মা দুখানা ইলিস্ মাছ ভাজা খাও না, তোমার আর দোষ কি?" আমি বল্লুম—"তাকি হয় মা? তার ভালবাসা মুখ দেখানো ছিল না। বড় ঘরের বউ ছিল, টাকা পয়সা ছিল, সে সব পাঁচ জনে নিয়ে নষ্ট করলে। অতুল পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা খুলে বসলো। তা ছাড়া এক বৎসর স্বামীর চিকিৎসায় অনেক টাকা ব্যয় করেছিল। শেষে মরবার সময় আমার জন্য একশো টাকা লিখে দিয়ে গিছল। বেঁচে থাকতে হাতে করে দিতে লজ্জা বোধ করেছিল—কি বলে একশো টাকা দেয়। দেহ রাখবার পরে তার ভাই এসে আমাকে টাকাটা দিয়ে যায়। আহা, বোধনের দিন দুপুরে আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে গেল। যতক্ষণ ছিল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলো। পূজার পরেই আমাদের কাশী যাওয়া হবে বলে সেদিন জিনিষপত্র গুছাতে এঘর ওঘর করে একটু ব্যস্ত ছিলাম। যাবার সময় বললে—"তবে আসি মা", আমি অন্য মনস্ক হয়ে বললুম, "হাঁ যাও।" বলতেই থপ্‌ থপ্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সে যেতেই মনে হল বললুম কি? যাও বললুম?

এমন তো আমি কাউকে বলিনে। আহা আর এলো না।* কেনই বা অমন কথা মুখদিয়ে বেরুল। কিছুক্ষণ অন্য মনে চুপ করে থাকবার পরে আমাকে বললেন "কাল এলে না মা, কেমন লাল পদ্মগুলি পাঠিয়ে ছিল শোকহরণ!—আমি নিজেই তা দিয়ে ঠাকুর পূজা করেছিলুম। কেমন ঠাকুর সাজিয়েছিলুম। তুমি এসে দেখবে বলে সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ রেখেছিলুম।"

আজ সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখি মা শুয়ে আছেন এবং রাধু তাঁর পাশে ভিন্ন প্যাটিতে শুয়ে গল্প বলবার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করচে। আমাকে দেখেই মা বললেন একটি গল্প করত মা।" আমি মুস্কিলে পড়ে গেলুম, মায়ের কাছে কি গল্প বলি। তারপর, সেদিন মীরা বাই পড়ে গিয়েছিলুম, সেই গল্প বললুম। মীরার "বিন্ প্রেম্‌সে নহি মিলে নন্দলালা" এই দোঁহাটি বলতেই মা বললেন, "আহা, আহা, তাইতো প্রেমভক্তি না হলে হয় না।" রাধুর কিন্তু এ গল্পটা বড় মনঃপুত হল না। শেষে সরলা এসে দুয়ো রাণী শুয়ো রাণীর গল্প করতে সে খুসী হল। সরলাকে মা খুব ভালবাসেন, তিনি এখন গোলাপ-মার সেবায় নিযুক্ত। সেজন্য একটু পরেই চলে গেলেন। রাধু বলছে আমার পা কাম্‌ড়াচ্ছে। তাই আমিই খানিক টিপে দিতে লাগলুম। রাধুর কিন্তু আমার টিপা পছন্দ হল না, বললে 'খুব জোরে দাও'। মা তাই শুনে বললেন 'ঠাকুর আমার গা টিপে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন—এমনি করে টিপো। ঐ কথা বলে মা আমাকে বললেন 'দেও তো মা তোমার হাত খানা।" আমি এগিয়ে যেতেই আমার হাত টিপে দেখিয়ে দিয়ে বললেন "ওকে এমনি করে টিপো।" আমি তেমনি করে খানিকক্ষণ টিপতেই রাধু ঘুমিয়ে পড়ল। মা বললেন "এইবার আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দাও মশা কামড়াচ্ছে। মঠের এবার বড়ই দুর্ব্বৎসর পড়েছে। আমার বাবুরাম, দেবব্রত, শচীন সবাই চলে গেল।' দেবব্রত মহারাজের শরীর ত্যাগের

* তিনি সেই দিন রাত্রেই হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। মা ঐ দিন বৈকালে মঠে পূজা দেখ্‌তে গিয়েছিলেন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহারাজ উদ্বোধনের বাড়ীতে ভূত দেখেছিলেন। সেই কথা মাকে জিজ্ঞাসা করতেই মা বললেন—"আস্তে, ওরা ভয় পাবে।"

"ঠাকুরও অমন কত দেখতেন গো। একবার বেণী পালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে গেছেন। তিনি বাগানের দিকে বেড়াচ্ছেন। ভূত এসে বলে কি—'তুমি কেন এখানে এসেছ, জ্বলে গেলুম আমরা। তোমার হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্চে না, তুমি চলে যাও, চলে যাও।' তাঁর পবিত্র হাওয়া, তাঁর তেজ ওদের সহ্য হবে কেন? তিনিত হেসে চলে এসে কারুকে কিছু না বলে খাওয়া দাওয়ার পরেই একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বল্লেন।

কথা ছিল রাতটা ওখানে থাকবেন। তারা বলে এত রাতে গাড়ী পাব কোথায়? ঠাকুর বললেন তা পাবে যাও। তারা ত গিয়ে গাড়ী আনলে। তিনি সেই রাতেই গাড়ী করে চলে এলেন। অত রাতে ফটকে গাড়ীর শব্দ পেয়ে কান পেতে শুনি ঠাকুর রাখালের সঙ্গে কথা বলচেন। শুনেই ভাবলুম 'ওমা কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন! কি খেতে দেবো এই রাতে? অন্য দিন কিছু না কিছু ঘরে রাখতুম, এই সুজি হোক, যাই হোক। কেন না কখন খেতে চেয়ে বসবেন ঠিকতো ছিল না। তা, সেদিন আসবেন না জেনে কিছুই রাখিনি। মন্দিরের ফটক সব বন্ধ হয়ে গেছে, রাত তখন একটা। তিনি হাততালি দিয়ে ঠাকুরদের সব নাম করতে লাগলেন কি করে যেন দরজা খুলিয়ে নিলেন। আমি বলছি 'ও যদুর মা, (ঝি) কি হবে?' তিনি শুনে বুঝতে পেরে তাঁর ঘর হতেই ডেকে বলছেন—'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি। পরে রাখালকে সেই ভূতের কথা বলতে, সে বলেছে 'ও বাবা, তখন বলোনি ভালই করেছ, তা হলে আমার দাঁত কপাটি লেগে যেতো—শুনে আমার এখনি ভয় পাচ্চে" বলে মায়ের এই হাসি। আমি—'মা ভূতগুলো তো বড় বেকুব। ঠাকুরের কাছে কোথায় মুক্তি চাইবে, তা নয়, চলে যেতে কেন বললে মা? মা বললেন 'ওদের কি আর মুক্তির বাকী রইল, ঠাকুরের যখন দর্শন পেলে? নরেন একবার মান্দ্রাজে ভূতের পিণ্ড দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।" আমি

মাকে একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত বললুম—মা একদিন স্বপ্নে দেখি কি, যেন আমি স্বামীর সহিত কোথায় যাচ্ছি। যেতে যেতে দেখি পথের মাঝে কূল কিনারা দেখা যায় না এমনি এক নদী। গাছতলা দিয়ে নদীর ধারে যাবার সময় আমার হাতে সোনালি রঙএর একটা লতা এমন জড়িয়ে গেল যে আর খুলতে পারছি না। সেটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে নদীর কাছে গিয়ে দেখি ওপার হতে একটি কালো ছেলে একখানা পারের নৌকা নিয়ে এল। সে বললে হাতের লতাটা সব কেটে ফেল, তবে পার করব। আমি সেটার প্রায় সবটা কেটে ফেলছি, একটু কিন্তু আর কিছুতে পাচ্ছি না, ইতিমধ্যে আমার স্বামী যেন কোথায় চলে গেলেন তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। শেষে আমি বললুম এটুকু আর কাটতে পারছি না। আমাকে কিন্তু পার কর্ত্তে হবে বলে নৌকায় উঠে পড়লুম। উঠবা মাত্র নৌকা ছেড়ে দিলে।—স্বপ্নও ভেঙ্গে গেল।

শ্রীশ্রীমা—ঐটি যে দেখলে ঐ ওঁর রূপ ধরে মহামায়া পার করে নিলেন। স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল, সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন। কাটতে না পারলে পার হওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটতে হবে। কিসের দেহ মা, দেড় সের ছাই বৈত নয়—তার আবার গরব কিসের। যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে ওই দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা! হরি বোল, হরিবোল, জয় মা জগদম্বা, গোবিন্দ, গোবিন্দ, রাধাশ্যাম, গুরুদেব, গুরুদেব, গঙ্গা গঙ্গা, ব্রহ্মবারি।"

মা—"দুই মাস আরা জেলায় কৈলোয়ার বলে এক দেশে ছিলুম। সেখানকার জল বায়ু ভাল বলে। সঙ্গে গোলাপ, বাবুরামের মা, বলরামের পরিবার, এরা সব ছিল। সেদেশে কি হরিণ মা, সব দল বেঁধে তিন কোণা 'ব'এর মত হয়ে চলেছে। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে এমন ছুট দিলে, সে আর কি বলবো, যেন পাখা ধরে উড়ে যাচ্ছে। এমন দৌড় দেখিনি। আহা, ঠাকুর বলতেন হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়। জানে না

কোথা হতে গন্ধটি আস্‌ছে, তেমনি, ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে।"

'ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা, কি বল মা ?'

মায়ের গায়ের আমবাত বড় বেড়েছে। মা বলছেন—'তিন বছর হলো মা, এই যে আমবাতে ধরেছে, মলুম এর জ্বালায়। 'জানি না মা, কার পাপ আশ্রয় করলে, নইলে এ সব দেহে কি রোগ হয় ?'

একদিন সন্ধ্যার পর গেছি। দেখি—নিবেদিতা স্কুলের কয়েকটি মেয়ে এসেছে—ওখানে দুটি মান্দ্রাজী মেয়ে আছে তারাও এসেছে আর মা তাদের পড়া শুনার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁরা ইংরাজী জানেন শুনে মা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা, আমরা এখন বাড়ী যাব, এর ইংরাজী করতো।' তাঁদের দুজনের মধ্যে একে অপরকে বলছেন 'তুমি কর।' তারপর উহার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা যেটি তিনিই করলেন। মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ী গিয়া কি খাইবে ? এর ইংরাজী কি হবে ? উত্তর শুনিয়া মা খুব খুসী। হাসতে লাগলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা গান জান ? তাহারা 'জানি' বলাতে মান্দ্রাজী গান গাইতে আদেশ করিলেন। মেয়ে দুটি মান্দ্রাজী গান গাইলেন। মাও শুনতে-শুনতে খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পরে আবার মাকে দর্শন করতে গিয়েছি। কিছুক্ষণ পরে দুর্গাদি তাঁদের আশ্রমের দুটি বালিকা সঙ্গে মায়ের কাছে এলেন। তারা মাকে প্রণাম করতেই—মা আশীর্ব্বাদ করে একটি ছোট মেয়েকে (বছর আট হবে) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি গান গাইতে জান ?' মেয়েটি বললে 'জানি'। মা—'গাও তো শুনি' মেয়েটি একটি গান গাইল। তার দুই এক ছত্র মনে পড়ছে।

"জয় সারদাবল্লভ, দেহি পদপল্লব দীন জনে"

কিঙ্করী গৌরী তনয়া তোমরি রেখো মনে"

মেয়েটি গৌরীমার শিষ্যা, অবিকল গৌরী মার স্বরে গাহিল। মা বিস্মিত হইয়া বললেন—তাই ত ঠিক "গৌরদাসী।' সে বেঁচে আছে, তা নইলে বলতুম, তার প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে।

মেয়েটিকে আদর করে চুমো খেয়ে আর একদিন এসে গান শুনাতে বললেন।

৫ই ভাদ্র, ১৩২৫—আজ সন্ধ্যার পরে গিয়াছি। মা তাঁর তক্তা-পোসের পাশে মেজেতে একটি মাদুরে শুয়ে আছেন। প্রণাম করে কথা-প্রসঙ্গে মাকে জিজ্ঞাসা করলুম—'মা অনেক দিন এসেছি এখন কি আমার কালীঘাট বাসায় যাওয়া উচিত?' মা—"থাকো না আর কিছু দিন, সেখানে গেলে এখানটিতে তো আর এমন করে আসতে পাবে না। একদিন যদি না আস ত ভাবি কেন এল না গো! এই কাল এস নি, ভাবলুম অসুখ করলো না কি, আজ না এলে বামুন ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিতুম। তবে যদি তোমার স্বামীর কোন অসুখ বিসুখ করে আর, তার মনের ভাবে বুঝ, আর তার ইচ্ছা যদি হয় তুমি এখনি যাও তা হলে অবিশ্যি যেতে হবে।" আমি—'তিনি প্রসন্ন থাকিলেও লোকে ত মা বলে, ঘর সংসার ছেড়ে এতদিন বোনের বাড়ী রয়েছে, স্বামীর সেবা, সংসার, এ সবও তো করা কর্ত্তব্য।' মা—'ঢের দিন ত সংসার করলে। লোকের কথা ছেড়ে দাও, তারা অমন বলে থাকে। পূজোর সময় আশ্বিন মাসে ত সেখানে যেতেই হবে।' আমি—'সংসারের জন্য বড় একটা ভাবনা কথনো ছিল বলে ত মনে হয় না মা। আপনার কাছে এমন আসতে পাব না, সেই ভাবনাই এখন সর্ব্বদা মনে হয়। মা—"তবে আর কি? থাকো না, এ মাসটা।"

জনৈক মহিলা মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, একজন ব্রহ্মচারী খবর দিয়ে গেলেন। ইতিপূর্ব্বে বিষম ক্লান্ত হয়ে মা শয়ন করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে, "এই আবার একজনকে নিয়ে আসছে! আঃ গেলুম মা", বলে বিরক্তি প্রকাশ করে বসলেন। খানিক পরে সুন্দর বসন ভূষণ পরিহিতা একটি মহিলা, মায়ের শয্যা প্রান্তে এসে বসে মায়ের শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। মা তাহাতে বললেন 'ওখানেই কর না মা, পায়ে কেন?' তার পর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বল্লেন "জানেনইত মা, তাঁর অসুখ। মা—'হাঁ শুনেছি, তা

এখন কেমন আছেন? কি অসুখ, কে দেখছেন?' তিনি—"অসুখ বহুমূত্র, ডাক্তার দেখচেন। পেটে জল হয়েছে, পা একটু একটু ফুলেছে ডাক্তাররা বলচেন খুব শক্ত ব্যারাম। তা ডাক্তারদের কথা আমি মানিনে। মা আপনাকে এর উপায় করতেই হবে। আপনি বলুন তিনি ভাল হবেন।"

মা—আমি কি জানি মা, ঠাকুরই সব। ঠাকুর যদি ভাল করেন তবেই হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব।

তিনি—তা'হলেই হলো, আপনার কথা কি ঠাকুর ঠেলতে পারেন—বলে তিনি আবার শ্রীচরণে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। মা তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন "ঠাকুরকে ডাকো। তিনি যেন তোমার হাতের নোয়া রাখেন।"

মা—এখন খাওয়া দাওয়া কি করেন।

তিনি—এখন লুচি এই সব খান।

এইরূপ দুই চারি কথার পরে তিনি মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম করে বিদায় নিলেন ও নীচে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন।

"সব লোকের জ্বালা তাপে শরীর জ্বলে গেল মা" বলে গায়ের কাপড় ফেলে মা শয়ন করলেন। আমি তেল মালিস করবার উদ্যোগ কচ্ছি এমন সময় আবার মহিলাটির কে আত্মীয় (সঙ্গে এসেছেন) প্রণাম করতে এলেন। আবার মাকে উঠ্‌তে হল। তিনি চলে যেতে মা পুনরায় শয়ন করলেন। বললেন "এবার যেই আসুক আমি আর উঠ্‌ছি না। পায়ের ব্যথায় বার বার উঠ্‌তে কত কষ্ট দেখচ ত মা। তার পর আমবাতের জ্বালায় সারা পিটটা এমন কচ্চে। বেশ করে তেলটা ঘসে ঘসে দাও ত"। তেল মালিস করবার সময় পূর্ব্বোক্ত মহিলাটির কথা উঠায় মা বললেন "অমন বিপদ, ঠাকুরের কাছে এসেছে, মাথায় মুড় খুড়ে মানসিক কত্তে যাবে—তা নয়, কি সব গন্ধ টন্ধ মেখে কেমন করে এসেছে দেখচ? অমন করে কি ঠাকুর দেবতার স্থানে আস্‌তে হয়? এখনকার সব কেমন এক রকম।

কিছুক্ষণ পরে বউ এসে আমায় বল্লে "লক্ষণ (চাকর) নিতে এসে বসে আছে গো"। মা সাড়া পেয়ে বউকে প্রসাদ দিতে বলে বল্লেন "এই আমি মাথা তুলেছি প্রণাম কর গো"। আমি প্রণাম করে রওনা হলুম।

৬ই ভাদ্র, ১৩২৫—সন্ধ্যার পর আজ মার কাছে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে মাকে প্রণাম করতেই শুনি মা বলছেন (জনৈক স্ত্রীভক্তের সম্বন্ধে কথা উঠেছে) "বৌয়ের উপর তার অতিরিক্ত শাসন। অত কি ভাল? পেছনে থেকে সামনে একটু আলগা দিতে হয়। আহা ছেলে মানুষ বউ, তার একটু পরতে খেতে ইচ্ছে হয় না? অমন করে যে সে বলে, যদি আত্মহত্যাই করলে বা কোন দিকে বেরিয়েই গেল—তখন কি হবে?"

আমাকে দেখে বলছেন :—"একটু আলতা পরেছে, তা আর কি হয়েছে। আহা, ওরাত স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমিত চোখে দেখেছি, সেবা যত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি। যখন বলেছেন কাছে যেতে পেয়েছি, যখন বলেন নি এমন কি দুমাস পর্য্যন্ত নবত হতে নামিই নি। দূর হতে দেখে পেন্নাম করেছি। তিনি বলতেন "ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই সাজতে ভালবাসে।* হৃদয়কে বলেছিলেন "দেখতো তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে ভাল করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে"। তখন তাঁর অসুখ, তবুও আমায় তিনশ টাকা দিয়ে† তাবিজ গড়িয়ে দেওয়ালেন—যিনি নিজে টাকা কড়ি ছুঁতেই পারিতেন না!

ঠাকুর চলে যাবার পর আমার যখন এখানে (কলিকাতায়) আসার কথা হল, তখন আমি কামার পুকুরে। ওখানকার অনেকেই

* ঠাকুর গোলাপ মাকেও বলেছিলেন ও (শ্রীশ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে—রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়—তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।

† তাবিজের জন্য ঠাকুর ৩০০৲ টাকাই দিয়েছিলেন। কিন্তু তাবিজ গড়াতে কম (২০০৲ টাকা) লেগেছিল। বাকী ১০০৲ টাকা শুনেছি শ্রীশ্রীমাকে নগদ দেওয়া হয়েছিল।

বলতে লাগল 'ওমা, সেই সব অল্প বয়সের ছেলে, তাদের মধ্যে গিয়ে কি থাকবে'। আমি ত মনে জানি, এখানেই থাকব। তবু সমাজ কি বলে একবার শুনতে হয় বলে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

কেউ কেউ আবার বলতে লাগ্‌ল "তা, যাবে বৈ কি, তারা সব শিষ্য"।

মা—আমি শুধু শুনি। পরে, আমাদের গাঁয়ে একটি বৃদ্ধা বিধবা আছেন, তিনি (লাহাদের প্রসন্নময়ী) ভারী ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমতী বলে সকলে তাঁর কথা মানে, আমি তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম "তুমি কি বল!" তিনি বললেন "সে কি গো? তুমি অবিশ্যি যাবে। তারা শিষ্য। তোমার ছেলের মত। একি একটা কথা! যাবে বৈ কি"। তাই শুনে তখন অনেকে যাবার মত দিলে। তখন এলুম। আহা ওরা আমার জন্যে—গুরুভক্তির জন্যে জয়রামবাটীর বেড়ালটাকেও পুষছে!

"মা দুঃখ করতেন 'এমন পাগল জামায়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম, আহা ঘর-সংসারও কল্লে না, ছেলে পিলেও হল না। মা বলাও শুনলে না!" একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বলছেন "শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না—আপনার মেয়ের এত ছেলে মেয়ে হবে শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে। তা যা বলে গেছেন, তা ঠিক হয়েচে মা"।

* * * *

আজ বৈকালে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মায়ের কাছে যাবার সময় হল, কেমন করে যাই। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। শো—র ওয়াটার প্রুফটা (সে বুদ্ধিটা শ্রীমানই দিয়েছিলেন) সারা গায়ে জড়িয়ে ত চল্লুম। বৃষ্টির ঝাপটা নাকে মুখে লেগে অস্থির করতে লাগল। তবু সে যে কি আনন্দে, কি টানে ছুটে চলেছি তা বলবার নয়! খিড়কী দরজা দিয়ে গেলুম। সামনে দিয়ে গেলে স্বামিজীরা দেখতে পেয়ে কি ভাববেন, লজ্জা হলো। মার কাছে যেতেই আমার বেশ দেখে মায়ের, এই হাসি! কিন্তু যখন প্রণাম করতে গিয়ে শ্রীপদে ভিজে কাপড় লাগল (কারণ মাথার কাপড়টা ভিজে গিয়েছিল)

তখন ব্যস্ত হয়ে বল্লেন "এই যে ভিজে গেছ শীগগির কাপড় ছাড়, এই রাধুর কাপড় খানা পরো"। আমি বল্লুম "দেখুন মা গায়ে হাত দিয়ে, আর কোথাও ভেজেনি কাপড় ছাড়তে হবে না"। মা দেখে বললেন 'তাই বটে'!

মা এক খণ্ড ফ্লানেলের কথা বলেছিলেন, তাও নিয়ে গিয়েছিলুম। পটি বাঁধ্‌বার সুবিধা হবে বলে দুদিকে নূতন কাপড় দিয়ে ফিতের মত করে দিয়েছি দেখে ভারী খুসী হলেন। কথায় কথায় জয়রামবাটীর কথা উঠলো। মা—"একবার সেখানে কি দুর্ভিক্ষই লাগলো *। কত লোক যে খেতে না পেয়ে আমাদের বাড়ী আসতো।

আমাদের আগের বছরের ধান মরাই বাঁধা ছিল। বাবা সেই সব ধানে চাল করিয়ে কড়াইয়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ী রাঁধিয়ে রাখতেন। বলতেন "এই বাড়ীর সবাই খাবে, আর যে আস্‌বে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্য খালি ভাল চালের দুটি ভাত করবে। সে আমার তাই খাবে"! এক একদিন এমন হতো এত লোক এসে পড়তো যে খিচুড়ীতে কুলাতো না। তখনি আবার চড়ান হত। আর, সেই গরম গরম খিচুড়ী সব যাই ঢেলে দিত শীগগীর জুড়াবে বলে আমি দু হাতে বাতাস করতুম,—আহা, ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্য বসে আছে।

দেহ ধরলেই ক্ষিদে তেষ্টা সব আছে। ক্ষিদের জ্বালা কি কম! এবার বাড়ীতে অসুখের সময় একদিন মাঝ রাতে আমার এমনি ক্ষিদে পেলে! সরলা টরলা সব ঘুমিয়েছে। আহা ওরা এই খেটে খুটে শুয়েছে, ওদের আবার ডাকবো? নিজেই শুয়ে শুয়ে চারিদিকে হাতড়াতে লাগ্‌লুম। দেখি চারটি খুদ ভাজা একটা বাটীতে রয়েছে। আবার মাথার বালিসের পাশে দুখানা বিস্কুটও পেলুম। তখন ভারী খুসী। তাই খেয়ে ত জল খেলুম—জল ঘটিতে সামনেই ছিল। ক্ষিদের জ্বালায় খুদ ভাজা যে খাচ্ছি তা জ্ঞান নেই!"—বলে হাসতে লাগলেন।

সেই সময়ে রাঁচি হতে কোন ভক্ত বড় বড় পেঁপে এনে ছিল।

---

* ১৮৭১, মায়ের বয়স তখন ১১ বছর।

পেঁপেটা আমি বড় ভালবাসি মা। আমি টুক টুক করে তাকাচ্ছি—আহা, এই পেঁপে আমাকে ওরা একটু দেয় ত খাই। তা, ওরা দেবে কেন! তখন যে আমার খুব জ্বর। কোয়ালপাড়ায় কি অসুখই করেছিল মা। বেহুঁস—এই বিছানাই বাহ্যে, প্রস্রাব, সব। সে সময় সরলা ও বউ আমার খুব করেছে। (ক্রন্দনের স্বরে) তাই ভাবছি মা—আবার ত তেমনি ভুগতে হবে। তা এবারে কাঞ্জিলালের অষুধে সেরে গেল। আহা মা, কি হাত পায়ের জ্বালা! কাঞ্জিলালের ঠাণ্ডা মোটা পেটটিতে হাত দিয়ে থাকতুম। শরৎ সেবার গিয়েছিল।

একটু পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম "আচ্ছা মা, জয়রাম বাটী হতে চিঠি লিখে কেন সে স্ত্রীভক্তটির সঙ্গে মিশ্‌তে নিষেধ করে ছিলেন?

মা—"ওর ভাব আলাদা। এ ভাবের (ঠাকুরের ভাবের) নয়।" —বিস্মিত হয়ে গেলুম! ঐ অসুখ বিসুখে অত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে, দূরে থেকেও আমাদের কিসে মঙ্গল হবে তাই চিন্তা!

আমি তারপর দিনে ভাল দেখে পাকা পেঁপে ও আম নিয়ে গেছি। মা কি খুসী, আর আমাদের খুসী করবার জন্য তাঁর কি আনন্দ প্রকাশ করা! করুণাময়ী মা আমাদের তোমার ভাব আমরা কি জানি! "এই যে গো, কাল যে পেপের গল্প হল, ঠিক সেই রকম! বেশ আম।" তারপর "এই আমটি শরৎকে দিও, এইটি গণেনকে, একটি জামাইকে" এমনি করে কিছু ভাগ করা হল। ভারী গরম। মায়ের বড় ঘামাচি বেরিয়েছে। বল্‌ছেন—"চন্দন মাখ্‌লে ঘামাচি কম্‌তে পারে; কিন্তু তাতে ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে।" আমি—'কাল পাউডার নিয়ে আস্‌বো? মাখলে ঘামাচি কম্‌বে।' মা—'তা এনো গো, দেখি তোমাদের পাউডারই মেখে।' 'এক ঘটি জল আন্‌তে বলতো মা, একবার বাইরে যাব।' বউ বল্লে "জল রেখেছি।"

মা রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ডাক্‌ছেন "ও মেয়ে, ও মেয়ে, একবার এদিকে এস শীগগির এস," আমি কাছে যেতেই বল্‌ছেন—"দেখ দেখ ঐ বেশ্যা বাড়ীর সাম্‌নে জানালার ধারে একটা লোক, একবার এ জানালা, একবার ও জানালা করে মরছে,

—ঢুক্‌তে পাচ্চে না—দেখো কি মোহ, কি প্রবৃত্তি! ভিতর থেকে ঐ গানের শব্দ আস্‌চে, আর ও ঢুক্‌তে পাচ্চে না—আহা, মলো গো ছট্‌ফটিয়ে"। মা এমনি করে ঐ কথাগুলি বললেন যে হাসি আর চাপতে পারলাম না! তখন মাও হাসেন, আমিও হাসি, হাস্‌তে হাস্‌তে দুজনে ঘরে এলুম।

"আহা, ভগবানের জন্য ঐরূপ ছট্‌ফটানিটুকু হয়, তা হয় না, মা! একটি মেয়ের কথা উঠ্‌লো। বল্লেন—'কি মোহ হয়েছে মা, ওর স্বামীর জন্য! খেয়ে শুয়ে সুস্থির নেই, খেতে খেতে উঠে গিয়ে দেখে আসে। দিন রাত ঘরে বন্দী করে নিয়ে বসে আছে। ওর জন্য কোন জায়গায় বেরুতে পর্য্যন্ত পারে না। ছি! ছি!! আর শরীর হচ্ছে দেখো! একটা ছেলে টেলে হলে যদি ওর এই ভাব কমে।

বউ এসে বললে। 'তোমায় নিতে এসেছে গো', রাতও হয়েছিল অনেক, প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

পরদিন মা রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে জপ কচ্ছেন। ঘরে তাঁকে দেখ্‌তে না পেয়ে বারান্দায় গিয়েছি। মা বল্‌চেন—"কিগো, এলে, বসো"। জপ সারা হল, হরিনামের ঝুলিটি মাথায় ঠেকিয়ে দিলেন। মার বাড়ীর সামনে তখন মাঠ ছিল, তাহার পশ্চিম ধারে খোলার ঘরে যে কতকগুলি দরিদ্র লোক ভাড়াটে ছিল এইবার তাদের লক্ষ্য করে বললেন—"এই দেখ, সারাদিন খেটে খুটে এসে এখন সব নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে,—দীনার্ত্তরাই ধন্য!" যীশুখৃষ্টের মুখ দিয়ে একদিন ঐ কথা বেরিয়েছিল বাইবেলে পড়ে ছিলাম মনে পড়িল। আজ মায়ের মুখেও সেই কথা শুনলাম! একটু পরে মা বল্লেন "চল, ঘরে যাই"। বউ নীচে বিছানা করে রেখেছিল, এসে শয়ন করলেন। সকালেই লক্ষ্মণকে দিয়ে পাউডার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মা বল্‌ছেন 'ওগো, তোমার দেওয়া পাউডার মেখেছিলুম্‌, তাইত এই দেখো, ঘামাচিগুলো মিলিয়ে মজে এসেছে। এইখান্‌টায় বড্ড হয়েছে, দাও তো মাখিয়ে। চুল্‌-কানিটাও যেন কমে গেছে। শরতেরও বড় ঘামাচি উঠেছে—আহা, তাকে কেউ এইটি মাখিয়ে দেয়। আমি—'ও বাবা, তাঁকে এ কথা

কে বল্‌তে যাবে মা! ও জিনিষটা যে সৌখীন লোকেরাই ব্যবহার করে থাকে"। শুনে মা হাসতে লাগ্‌লেন।

মায়ের হাঁটুর বাত বড় বেড়েছে। কাল্‌কে জনৈক ভক্তের দুটি ছেলে ইলেকট্রিক্ ব্যাটারী লাগিয়েছিল, তাতে একটু কমেছে। আজও সেই দুটি ছেলে এসেছে। ছোট মামী বল্‌ছেন—'আমারও কাল হতে বাত বেড়েছে, আমিও ঐ কল্‌টা লাগাবো গো! মা শুনে হাস্‌তে লাগ্‌লেন বল্লেন—'দেও তো বাছা, ওকে"। ছেলে দুটি তাড়াতাড়ী যন্ত্রপাতি ঠিক ঠাক করে নিয়ে গেল। মামীর পায়ে একবার ব্যাটারী ধরেছে, আর সে কি চীৎকার—'ওগো, মলুম গো, সর্ব্ব শরীর ঝিন্ ঝিন্ কচ্ছে, ছাড় ছাড়! সকলের হাসি। এ ত আর সর্ব্বংসহা জননী নন্। তখন ছোট মামী মাকে বলছেন—'কই তুমি ত এমন হবে বল্লে নি?' মা—"সেরে যাবে, চেঁচাস নে একটু সহ্য কর"। তারপর মামী বললেন, 'সত্যিই, যেন একটু কমেছে!

বিলাস মহারাজ আরতি করে গেলেন। বউ বল্‌ছে—'আচ্ছা, এর নামে কোন "আনন্দ" নেই?' মা হেসে বল্‌ছেন "আচ্ছা বৈকি গো—ওর নাম বিশ্বেশ্বরানন্দ। মা বল্‌ছেন—"কেউ ওকে ডাকে কপিল "আচ্ছা ওর সঙ্গে কি আনন্দ আছে? কপিলানন্দ নাকি?" (এই সময়ে সরলা দিদি ঘরে ঢুকলেন) মা—আচ্ছা, কপিল মানে কি?" সরলাদি বল্লেন—কি জানি,—বানর বোধ হয়।" আমি—সে কি সরলা দিদি, কপি মানে বানর, কপিল মানে নয়।" আর সকলের হাসি। মা বল্‌ছেন—'আবার একজনের নাম আছে 'ভূমানন্দ' আচ্ছা এর মানে কি?" আমি—"সেত আপনিই ভাল জানেন মা।' "না, না, তোমরাই বল শুনি।" আমি—'ভূমা মানে ত সেই অনন্ত বা সর্ব্বব্যাপী পুরুষকেই বুঝায় শুনেছি মা।" মা ঐকথা শুনে সুখী হয়ে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছেন্—সত্যই মা এক এক সময় এমন ভাব দেখান যেন ছেলে মানুষটি—কিছুই জানেন্ না। আবার অন্য সময়ে দেখেছি, কঠিন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কেমন ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন! যেখানে মানুষের পুঁথিগত বিদ্যায় কুলায় না তখন আর এক ভাব, যেন সব বুঝেন। মা বললেন আর কপিল

মানে কি হল?" মা ওটি শুন্‌তে চান; আমি—'কি জানি মা। কপিল নামে ত সাংখ্যদর্শন প্রণেতা এক মুনি ছিলেন। আবার কপিল রংও আছে, ওরা কি অর্থে নাম রেখেছেন কি জানি, ঐ কথার আরও হয়ত অর্থ আছে মনে পড়ছে না। কাল অভিধান দেখে আসবো।'

এই সময়ে একদিন বৈকালে গিয়াছি। একজন সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম কর্‌তে এসে বল্‌ছেন—'মা, মাঝে মাঝে প্রাণে এত অশান্তি কেন? সর্ব্বক্ষণ আপনার চিন্তা নিয়ে থাকতে পারি না। পাঁচটা বাজে চিন্তা কেন এসে পড়ে। মা, ছোট খাটো অনেক জিনিষ চাইলেই পাওয়া যায়, পেয়েও এসেছি, আপনাকে কি কোন দিনই পাব না? মা কিসে শান্তি পাব, বলে দিন; আপনার কৃপা কি কখনও পাব না? আজকাল দর্শন টর্শনও বড় একটা হয় না। আপনাকেই যদি না পেলাম তবে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? শরীরটা গেলেই ভাল।" মা—"সে কি বাছা, ও কথা কি ভাবতে আছে? দর্শন কি রোজই হয়? ঠাকুর বলতেন 'ছিপ্‌ ফেলে বস্‌লেই কি রোজই রুই মাছ পড়ে? অনেক মাল মসলা নিয়ে একাগ্র হয়ে বস্‌লে, কোন দিন বা একটা রুই এসে পড়লো, কোন দিন বা নাই পড়লো, তাই বলে বসা ছেড়ো না। জপ্‌ বাড়িয়ে দাও"।

যোগীন মা—"হ্যাঁ, প্রথম প্রথম মন একাগ্র না হলেও, হবে নিশ্চয়!"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কত সংখ্যা জপ করবো, আপনি বলে দিন্‌ মা, তবে যদি মনে একাগ্রতা আসে?" মা—"আচ্ছা, রোজ দশ হাজার করো,—দশ হাজার, বিশ হাজার যা পার।"

তিনি—'মা, একদিন সেখানে ঠাকুর ঘরে পড়ে কাঁদছি, এমন সময় দেখলাম—আপনি মাথার পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, "তুই কি চাস্‌?" আমি বল্লাম—"মা আমি আপনার কৃপা চাই, যেমন সুরথকে করেছিলেন, আবার বল্লাম না মা সেতো দুর্গারূপে, আমি সেরূপে চাই না, এই রূপে! আপনি একটু হেসে চলে গেলেন। মন তখন আরও ব্যাকুল হল, কিছুই ভাল লাগে না মনে হল, যখন তাঁকে লাভ কর্‌তে পার্‌লাম না, তখন আর আছি কেন?" মা—"কেন, ঐ যেটুকু পেয়েছ

তাই ধরে থাক না কেন? মনে ভাব্‌বে আর কেউ না থাক্‌, আমার একজন মা আছেন।" ঠাকুর যে বলে গেছেন, "এখানকার সকলকে তিনি শেষ দিনে দেখা দিবেনই—দেখা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

সন্ন্যাসী—"যেখানে ছিলাম, তিনি খুব ভক্ত গৃহস্থ। তাঁর স্ত্রী এক বড় লোকের কন্যা, খুব খরচ করেন। মাছ খাবার জন্য আমাকে বড় অনুরোধ করেন। আমি খাই না"।

মা—মাছ খাবে। খাবার ভিতর আছে কি? খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। তাকে বেশী বাজে খরচ করতে বারণ করবে। ভক্ত গৃহস্থের টাকা থাকলে সাধুদের কত উপকারে লাগে। তাদের টাকা তেইত সাধুরা বর্ষাকালে একস্থানে বসে চাতুর্ম্মাস্য করতে পারে। তখন ত সাধুদের ভ্রমণ করে ভিক্ষা করবার সুবিধা হয় না।

সন্ন্যাসীটি প্রণাম করে নীচে গেলেন।

বন্ধন ভীতি

আমারে বাঁধিতে চায়!
ওরে, আমারে বাঁধিতে চায়!!
শত দিক্ হতে শত প্রলোভনে
মাথা তুলি কিবা করে গর্জ্জন
উদ্যত ফণা বিস্তারি মোরে
　　　　করিবে কি দংশন?
ওরে, বিষের জ্বালায় জ্বালিয়া মারিতে
　　　　ছোবল মারিবে পায়!
ওরে, আমারে বাঁধিতে চায়!!

দুর্ব্বল হিয়া রহিয়া রহিয়া
কেঁপে উঠে দুরু দুরু!
সত্যি দেবতা, আজ হতে নাকি
গোলামির হবে সুরু?
উচ্ছৃঙ্খল পক্ষ আমার
পারে কি বহিতে শিকলের ভার!
উদার আকাশে এ সুখ সাঁতার
থাকিবে না আর হায়!
ওরে আমারে বাঁধিতে চায়!!
এ খড়ের নীড়
থাকে না তো থির
বহিছে বিষম ঝড়!
বজ্র বিপাকে আশ্রয় তরু
কাঁপে ওরে থর থর!!
সোণার খাঁচায় সোণার আলোক
আঁধারের মাঝে ঝল্‌সিছে চোখ
হে বন দেবতা, ডাকে আর হাঁকে,
ওরে, বোকা আয়, আয়!
এই প্রলোভন
করিয়া ছেদন
টেঁকা যে গো বিষম দায়!!
ওরে, আমারে বাঁধিতে চায়!!
খাঁচার শিকল
করিবে বিকল
জানি জানি দেব ঠিক্‌।
তবু মনে হয় দ্বারে দ্বারে আর
মাগিতে হবে না ভিখ্‌॥
না—না—না—আমারে ঘিরিয়া

থাকিবে সোণার শিক্।
ছট্ ফট্ করি মরিব কারায়
বাহিরিতে আর পারিব না হায়,
ধিক্ ধিক্ সুখে ধিক !!
ঊষা নিয়ে আসে নিশার স্বপন
বাতাস হাঁকিয়া যায় শন্ শন্
শৃঙ্খল দল বাজে ঝন্ ঝন্
পিশাচের হাসি যেন !
নিজেরে ছাড়িয়া
পরেরে বেড়িয়া
অধীন হইব কেন !!
উঠিতে বসিতে ঘুরিতে ফিরিতে
পরের হুকুমে হইবে চলিতে
হুকুমে জীবন
হুকুমে মরণ
সামান্য ইসারায় !
ওরে, আমারে বাঁধিতে চায় !!
ও সোণার খাঁচা থাক্ পড়ে থাক্
এ নীড় ভাঙ্গিয়া যায় যদি যাক্
নির্ভর সুখ আগুনের মাঝে
মরিব কি পোড়া ঘায় !
আমারে বাঁধিতে চায় !!
ওরে, আমারে বাঁধিতে চায় !!!

—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

জড় বিজ্ঞানে মায়াবাদ

মায়াবাদের আবিষ্কর্ত্তা মায়াকে বর্ণনা করেছেন—অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধি—যা যেটা নয় সেটাকে তাই বলে ভ্রম হওয়া। তিনি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে এই সত্যে পৌঁছেছেন। জড় বিজ্ঞানও অত্যদ্ভুত অধ্যবসায় বলে সেই দিকেই আগাচ্চেন—অন্ততঃ এই স্থূল বাহেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎটা যে একটা মস্ত প্রহেলিকা তা তাঁরা এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। একখানা অনুবীক্ষণ কাচ (microscopic glass) দিয়ে যদি খুব সুন্দর মুখও দেখা যায় তা হলে সেটাও সে কত বিভৎস হয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়, তা একবার সকলেই পরখ করে দেখতে পারেন। অনুবীক্ষণ কাচ দিয়ে মুখ খানাকে আরও স্পষ্ট করে—সত্য করে দেখা। কিন্তু এই সত্যিকার দেখাটা অতি বড় সুন্দরীও নিজের মুখ একবার দেখলে আর দেখতে চাইবেন না। কেন না মানুষের স্বভাব হচ্চে সূর্য্যের চাইতে চাঁদটাকে ভালবাসা, যদিও চাঁদের প্রাণ হচ্চে ঐ সূর্য্যে। মানুষ চায় একটা কাল্পনিক মনগড়া সত্য নিয়ে অলেয়ার পেছনে ছুটতে—যে স্বপ্নের নন্দন কানন সে কোনও কালে পাবে না, আর যদি বা কখনও স্বপনে সুখের পরশ পায় তা ওমনি দুঃস্বপ্নের প্রচণ্ড আঘাতে সে নন্দন ছায়ার মত মিশে যায়, মানুষ তখন ঘুমের ঘোরে বিকট আর্ত্তনাদ করে ওঠে।

তাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বলচেন জগতটাকে দেখ, সত্যি করে দেখ। একজন মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বলছেন গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ, দেশ-কাল নিমিত্ত, নাম-রূপ ছাড়া এ জগৎটার অস্তিত্ব কোথায়? ঐ গুলোর প্রবাহ ত দিন রাত চলছে, আজ যা আছে কাল তা নাই—নিত্য সত্য কোথায়? আর একজন জগতটা বাইরে রয়েছে মেনে নিয়েও বলছেন যা দেখছি শুনেছি তা এ জগতটা নয়। একখানা বেঞ্চিতে যখন আমরা বসি তখন আমরা এই মনে করে বসি যে সে কাঠের মধ্যে কোনও অবকাশ নেই সেটা একটা Continuous solid substance, কাজেকাজেই আমাদের পড়ে যাবার কোনও ভয় নেই।

কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের ধারণা করিতে বাধ্য করাচ্ছেন যে একখানা বেঞ্চির তক্‌তা প্রকৃতপক্ষে যেন আকাশে বহু সংখ্যক সরষে ছড়ান রয়েছে, আর সেগুলো যেন একটা যাদু শক্তির আকর্ষণে সেই শূন্যেই ঝুলচে। যাঁরা অনুবীক্ষণ শক্তিযুক্ত আয়নায় মুখ দেখেছেন, তাঁরাই জানেন যে অমন মোলায়েম সুন্দর মুখখানা সহস্র গর্ত্তে অসমান বলে বোধ হয়, তাঁরা ঐ কথাটার কিছু ধারণা করতে পারবেন। কেউ যেন মনে না করেন যে সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেবল যত বিভৎসই এসে হাজির হয়। যাঁরা নিজদের মুখ দেখে ভয় পান তাঁরা একবার ফুলের একটু রেণু নিয়ে যদি অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখেন তা হলে দেখবেন যে তার সৌন্দর্য্যের কাছে বোধ হয় স্বর্গের পারিজাত হার মেনে যাবে। তাই বৈজ্ঞানিক বলছেন এ জগতটা যা দেখছ প্রকৃতপক্ষে এটা তা নয়।

সংস্কৃততে অলাতচক্র বলে একটা কথা আছে। একটা কাটির দুধারে ন্যাকড়া জড়িয়ে তারপর কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে, মাঝে আর একটা কাটি হাতলের মত করে, ঐ দুই অংশে আগুন ধরিয়ে যদি ঘুবান যায়, তাহলে ঠিক একটা আলোর বৃত্ত তৈরী হয়। সেটা যে একটা অবিচ্ছিন্ন বৃত্ত তা নয়। কাটির দু পাশের দুটো আলো এত তাড়াতাড়ি ঘুরচে যে আমাদের চক্ষু সেই পরিবর্ত্তনের ক্রমগুলোকে ধরতে না পেরে দেখছে একটা নিরবচ্ছিন্ন বৃত্ত। একটা ভোতা পেন্‌সিল যদি খুব তাড়াতাড়ি বৃত্তাকারে হাতের তেলোয় ঘোরান যায় তাহলে সমস্ত পরিধি ধরে একটা সমষ্টি স্পর্শের অনুভব হবে কিন্তু বাস্তবিক পেন্‌সিলটা হাতে স্পর্শ দিচ্চে পর পর অনেকটা যায়গা নিয়ে। বাতাসের মধ্যে আমরা হাত পা নাড়চি, শূন্য বলে বোধ হচ্চে কিন্তু বোম্বাই মেলে চড়ে, হাত বাইরে বাড়ালে সেই বাতাসই কঠিন বলে বোধ হয়। তাই আজ কালকার প্রাচ্য দার্শনিক ও প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক উভয়ই বলতে বাধ্য হচ্চেন যে জগতটা অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধি বা permanent possibilities of sensations.

এই যে আমাদের সামনে পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ—কঠিন স্থূল জগৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পড়ে রয়েছে—যা আমরা রূপে রসে গন্ধে শব্দে স্পর্শে অনুভব

করছি, প্রাচীন যাকে ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুতব্যোম্ বলে সম্বোধন করেছিলেন—একটা মস্ত প্রহেলিকা, কোন এক যাদুকরীর কর-দণ্ড স্পর্শে এ কুহকের সৃষ্টি। এ কুহককে জানবার চেষ্টা কর সত্যের দিকে এগোও তখনই এ কুহক রূপান্তরিত হয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক বলেন দৃশ্য অদৃশ্য বস্তু হচ্চে অণুর (molecules) সমষ্টি, অণু আবার পরমাণুর (atoms) সমষ্টি এবং পরমাণু আবার বিদ্যুতিনের (Electrons) সমষ্টি। এক একটি পরমাণু যেন ঠিক এক একটি সৌর জগৎ—মাঝখানে প্রকাণ্ড মহাশক্তিশালী সূর্য্য আর তার চারি পাশে গ্রহগণ বিষম দ্রুত গতিতে ঘুরে বেড়াচ্চে। পরমাণুর গ্রহ হচ্চে বিদ্যুতিন (Electrons) আর সূর্য্য হচ্চে কেন্দ্রিন (Nucleus)। কিন্তু উদ্‌যানের কেন্দ্রিন (Proton) ব্যতীত অপরাপর পদার্থের কেন্দ্রিনেরা বহু বিদ্যুতিনের সহিত একত্রিত হয়ে অবস্থান করে আর তার চারি পাশে অপর বিদ্যুতিনেরা প্রচণ্ড বেগে ঘুরে বেড়ায়। সেই ঘূর্ণায়মান বিদ্যুতিনের ক্ষুদ্রতার তুলনায় কেন্দ্রিন ও তাহাদের মধ্যে যে অবকাশ তাহা গ্রহগণ ও সূর্য্যের মধ্যে যে অবকাশ তাহা অপেক্ষাও অধিক। তা হলে প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ায় এই যে, আমরা যাকে কঠিন জগৎ বলে স্পর্শানুভব করচি তার মধ্যে কিন্তু বিপুল অবকাশ বর্ত্তমান। বিদ্যুতিনেরা চক্রাকারে আমাদের অনন্ত স্পর্শ দিচ্চে কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় তাদের বিভক্ত করে করে ধরতে পারচে না বলে সেগুলিকে একটা গোটা দেশের (space) স্পর্শ বলে আমাদের ভুল ধারণা করিয়ে দিচ্চে।* যেমন চার পাঁচ খানা পদ্ম পত্র যদি আমরা পট্ করে ছুঁচ দিয়ে বিদ্ধ করি তাহলে মনে হয় যেন তারা এক সঙ্গে বিঁধল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছুচ প্রত্যেক পত্রটিকে পর পর বিঁধেছে। তাই আজ বৈজ্ঞানিক বৈদান্তিকের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলছেন এ জগৎটা অন্যস্মিন্নন্যাবভাসঃ।

—স্বামী বাসুদেবানন্দ।

* আলোক ১ সেকেণ্ডে প্রায় ১৮০,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। বিদ্যুতিন, ঐ সময়ে ১৪০০ মাইল ভ্রমণ করে। বিদ্যুতিনের পরিধি অনুমান ১ সেন্টিমিটারের ২০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ। সে তার কেন্দ্রিনের চারি পাশের কক্ষা ১ সেকেণ্ডে ৭ বৃন্দ (৭০০০০০০০০০) বার ঘোরে। গ্রহের তুলনায় এই তার বার্ষিক গতি।

রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ ও সার্ব্বভৌমিক বেদান্ত

পৃথিবীর সকল দেশের সকল কালের সকল মানবই দীর্ঘজীবন, জ্ঞান ও সুখ লাভ করিবার জন্য তাহাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে অবিরত চেষ্টা করিতেছে। মানব জীবন সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া দেখ;—এই তিনটি বিষয়ই তাহার একমাত্র কাম্য ও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এই তিনটি বিষয় দ্বারাই তাহার সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত। মানুষ জন্মপরিগ্রহ করা মাত্রই তাহার পঞ্চেন্দ্রিয় এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির সঙ্গে এমন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে, জগতের ক্ষণস্থায়ী নানা বিষয়ের সহিত সম্বন্ধহেতু উহাদের প্রতি তাহার এরূপ এক মায়িক অনুরাগ জন্মে, উহাদের সঙ্গে সে আপনাকে এমন ভাবে মিশাইয়া ফেলে যে উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এক অদৃশ্য অজ্ঞেয় রাজ্যে যাইবার কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইলেও সে ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়ে। মানুষ মেঘ পটলের ঊর্দ্ধস্থিত কল্পিত স্বর্গ রাজ্যের সঙ্গে যদিও তাহার ঈপ্সিত সর্ব্বপ্রকার চিরস্থায়ী সুখ স্বপ্ন বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি কেহ এই দুঃখভরা পৃথিবী-বক্ষ হইতে চিরবিদায় গ্রহণের বিনিময়ে উহাকে লাভ করিবার কামনা করে না। এই যে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; পরন্তু উহা জগতের প্রাণীমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। মানুষ কল্পিত অভিনেতা সাজিয়া জগৎ প্রপঞ্চ নাট্যে অভিনয় করিতেছে, সে ঘুমের ঘোরে আশার নেশায় আত্মহারা হইয়া স্বপ্নরাজ্যের সুরক্ষিত দুর্গে আপনাকে সযত্নে আবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে, সে জানিয়াও জানে না,—দেখিয়াও দেখে না যে তাহার স্বপ্নরচিত সুরক্ষিত দুর্গ বাস্তব সত্ত্বাহীন। "মৃত্যু অপেক্ষা

ধ্রুব সত্য জগতে আর কিছুই নাই জানিয়াও যে মানুষ আপনাকে অমর মনে করে পৃথিবীতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয় ।" *

যাহা হউক, যদি মানুষ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে—মৃত্যুকে জয় করিতে চায়, তথাপি সে তাহার চক্ষের সম্মুখে বালক যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলকেই কালের কুক্ষিগত হইতে অবিরত দেখিতে পায়। হয়ত সে কাহাকেও খুব ভালবাসিত এবং তাহার সুখের জন্য উন্মত্ত বৃষভের ন্যায় আচরণ করিতে, অথবা অপরের সর্ব্বনাশ করিতেও দ্বিধা বোধ করিত না, সে হঠাৎ মরিয়া গেল, তখন তাহার মনে স্বতঃই উদয় হইবে—"ইহাই কি তবে মানুষের চরম পরিণাম !" মানুষকে একদিন মরিতে হইবে,—অবশ্য সকল প্রাণীকেই,—ইহাই যদি সত্য, তাহা হইলে এই যে মানুষের চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা কেবল আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। কিন্তু এই বাঁচিয়া থাকিবার বাসনার অন্তরালে তাহার অমরত্ব নিহিত আছে। বেদান্ত বলেন যে এই অমরত্ব মানুষের অভ্যন্তর-স্থিত আত্মারই গুণ, কারণ আত্মা অজর, অমর ও শাশ্বত। †

মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় জগতের প্রত্যেক বিষয়েই পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য একান্ত লালায়িত। এই জ্ঞান লাভের স্বাভাবিক ইচ্ছাই মানুষকে পশুশ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। দীর্ঘজীবন বা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা এবং সুখলিপ্সা মানবের ন্যায় পশুগণের মধ্যেও বিদ্যমান বটে ; কিন্তু পশুস্তরে জ্ঞানের তাদৃশ বিকাশ নাই ; সুতরাং এই জ্ঞান মন্দাকিনীর পীযুষ প্রবাহ যে মানুষের মধ্যে যত অধিক মন্দীভূত, নামে মানুষ হইলেও সে পশুস্তরের তত নিকটবর্ত্তী। বাস্তব বা কল্পিত সকল বিষয়েরই রহস্য ভেদ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইবার চেষ্টা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাহাকে

---

* "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ ।
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥"
—মহাভারত ।

† "ন জায়তে ন ম্রিয়তে কচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচন ।"
—যোগবাশিষ্ট ।

আমরা অতি বড় গণ্ডমূর্খ বলি, অথবা যে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন, তাহার প্রবৃত্তি অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাইব যে তাহার মধ্যেও নানা জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহ বর্ত্তমান; সেও আপন ভাবে দুনিয়ার রহস্য ভেদ করিতে সতত তৎপর। বোধ হয় এরূপ মানব পৃথিবীর কোন স্থানে কোন কালেও ছিল না, বর্ত্তমান কালেও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না, যাহার কোন না কোন প্রকার জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি নাই। হয় ত এই জ্ঞান খুব নিম্নস্তরের হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানকে জ্ঞান ভিন্ন অন্য আর কোন আখ্যা প্রদান করা যায় না। আমরা যাহাকে উন্নত জ্ঞান বলি, তাহা এ পর্য্যন্তও তাহার লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে সমর্থ হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞতাকে জ্ঞানের চরম আদর্শ রূপে গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানকেও উন্নত বলা চলে না। বিজ্ঞান জড় ও চৈতন্যের কার্য্য কারণ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শত শত অচিন্ত্যনীয় অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন; এইরূপে দর্শন-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও আরণ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি পৃথিবীর অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়গুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটি শাস্ত্র এক এক বিভাগের ভার গ্রহণ করতঃ ইহার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে। মহাত্মা গ্যালিলিওর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে "সকল শাস্ত্রই জ্ঞানসিন্ধু তীরস্থ উপলখণ্ড মাত্র আহরণ করিতেছেন।" মানুষের নিকট পৃথিবীর সকল বিষয়ই একটা বাহ্য আবরণে আপনাকে সযত্নে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সে এই আবরণ উন্মোচন করিয়া সকল বিষয়ের প্রকৃত রহস্য অবগত হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে জীবনব্যাপী চেষ্টা করিতেছে। কেহ হয়ত কোন বিষয়ের উপর হইতে এই আবরণ উন্মোচন কার্য্যে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারের প্রত্যেক বিষয়ের আচরণ উন্মোচন করা বদ্ধশক্তি মানবের পক্ষে অসম্ভব। আর কোন বিষয়কেও সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করিতে তিনি এই পর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই; বোধ হয় ভবিষ্যতেও হইবে না। প্রত্যেক মানুষই এই আচরণ উন্মোচন কার্য্যে অপারগ হইয়া আপনার ভিতরে ভিতরে কি যেন কি

একটা "নাই,—নাই, হায়, হতোঽস্মি"র ভাব অনুভব করিতেছে। বেদান্ত বলেন যে মানুষের মধ্যে জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ মানুষ বদ্ধ জীব বলিয়া তাহার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য ; বদ্ধ জীবের পক্ষে অসীম পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য দর্শনও এই বেদান্তবাক্য মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করিতেছেন। পাশ্চাত্য (Psychology) বলেন :—"There can be no complete and exhaustive philosophy because the world as a whole is infinite while our minds are finite and the finite can not exhaust the infinite. Philosophy therefore can only be approximate one system may be better and truer than another but none can be perfect or final." স্বামী বিবেকানন্দ এই আবরণ উন্মোচন প্রবৃত্তি (tendency of unfolding) কে 'জীবন' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক, সসীম জীবের পক্ষে অসীম পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর না হইলেও মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই ;—আর বিরাম থাকিতেও পারে না, কারণ এই চেষ্টার সমষ্টিই মানবজীবন। এই অসীম পূর্ণজ্ঞান সর্ব্বতত্ত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব শক্তিরই এপিঠ ওপিঠ ; বেদান্ত মতে এই পূর্ণ জ্ঞানই মানবাত্মা। * যদিও পূর্ণ জ্ঞান মানবাত্মার গুণ বা যথার্থ বলিতে গেলে মানবাত্মা পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, তথাপি সীমাবদ্ধ জীব যতই চেষ্টা করুক না কেন পূর্ণ জ্ঞানলাভ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের বস্তুজ্ঞান প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। স্বামিজী তাঁহার বেদান্ত বক্তৃতার এক স্থানে ইহা সুপরিস্ফুট করিয়াছেন,—"বাহ্

---

* (ক) "জ্ঞানং ব্রহ্ম চৈতন্যং"।

—শ্রীধর স্বামীর টিকা।

(খ) "উৎপত্তি বিনাশ রহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে।"

—সর্ব্বোপনীষদ্ সার।

(গ) "পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি বিশিষ্টং জ্ঞানং ভগবান্।"

—ক্রমসন্দর্ভঃ।

জগৎ হইতে আমরা কেবল আঘাত মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি, এমন কি আঘাতটির অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগের ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয়, আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনের অংশ বিশেষকেই সেই আঘাতের দিকে প্রেরণ করিয়া থাকি আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তাহা আর কিছুই নয় আমাদের নিজ মন ঐ আঘাতের দ্বারা যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই আকার প্রাপ্ত মনকেই জানিতে পারি। যদি বহির্জ্জগৎকে আমরা 'ক' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তবে আমরা প্রকৃতপক্ষে ক + মনকেই জানিতে পারি। আর এই জ্ঞান ক্রিয়ার মধ্যে মনের ভাগটি এত অধিক যে, উহা ঐ "ক"এর সর্ব্বাংশব্যাপী আর ঐ "ক"এর স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। অতএব যদি বহির্জ্জগৎ বলিয়া কিছু থাকে তবে উহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

(ক্রমশঃ)

—ব্রহ্মচারী ধ্যানচৈতন্য।

সাংখ্য দর্শন

আদি বিদুষে কপিলায় নমঃ।

জগতে চিরদিন জীবকে ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত সহিতে হইতেছে। এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই অভিপ্রেত। দুঃখ নাশের জন্য সচরাচর যে সমুদায় উপায় অবলম্বিত হয় তদ্দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। ঐ সকল উপায় সাময়িক মাত্র। দুঃখ নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। এই দর্শনের মতে জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়।

সাংখ্য দর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল। তাঁহার শিষ্য আসুরি, আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ। পঞ্চশিখ সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে যে সমুদায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সে সমুদায় গ্রন্থ অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। অধুনা সাংখ্য শাস্ত্রের যে সমুদায় গ্রন্থ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে তত্ত্ব-সমাস, সাংখ্য-কারিকা ও সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র প্রধান। এই সমুদায় গ্রন্থের উপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক ভাষ্য ও টিকা আছে। তত্ত্ব-সমাস সাংখ্য দর্শনের সূচিপত্র, কারিকা দ্বিসপ্ততি শ্লোক বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইহা আর্য্যাছন্দে রচিত। ঈশ্বরচন্দ্র ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা পঞ্চশিখ রচিত অধুনালুপ্ত ষষ্ঠিতন্ত্র অবলম্বনে রচিত। প্রবচন-সূত্র কারিকার তুলনায় আধুনিক গ্রন্থ। সং,—সম্যক, খ্যা—জ্ঞান এই দুই শব্দ হইতে সাংখ্য উৎপন্ন। যে শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম সাংখ্য শাস্ত্র। সহজ বাংলা ভাষায় সাংখ্য-কারিকার অর্থ করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

১

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥

পদ পাঠ—দুঃখত্রয় অভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তৎ অবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সা অপার্থা চেৎ ন একান্তঃ অত্যন্ততঃ অভাবাৎ ॥

অন্বয়—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ, তদবঘাতকে, হেতৌ, জিজ্ঞাসা,
দৃষ্টে সা চেৎ অপার্থা ন একান্ততঃ অত্যন্ততঃ অভাবাৎ।

দুঃখত্রয়ঃ—সাধারণতঃ দুঃখকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় সেইজন্য "দুঃখত্রয়"। ত্রয় বা ত্রি অর্থ তিন, যেমন ত্রিতাপ। দুঃখ-ত্রয়=ত্রিবিধ দুঃখ যথা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক। আধি অর্থ দুঃখ; আত্মিক=আমার মন ও দেহ সম্বন্ধীয়; ভৌতিক=ভূত সম্বন্ধীয়; দৈবিক=যাহার মূলে দৈব শক্তি আছে।

আধ্যাত্মিক দুঃখঃ—ইহা দ্বিবিধ; রোগাদির জন্য শারীরিক দুঃখ, রিপুদিগের জন্য মানসিক দুঃখ।

আধিভৌতিক দুঃখ :—মনুষ্য, পশু বা স্থাবর জনিত (যথা ছুরির ধারে হাত কাটা) দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ।

আধিদৈবিক :—বজ্র, ভূমিকম্পাদির আক্রমণে যে দুঃখ হয়।

অভিঘাতাৎ = 'ঘা' খাওয়ার দরুন।

তৎ + অবঘাতকে, তদবঘাতকে—(৭মী বিভক্তি) তাহার অর্থাৎ দুঃখের অবঘাতকে—নাশে ; হেতৌ ৭মী বিভক্ত, (সাধু শব্দবৎ) উপায় বিষয়ে, জিজ্ঞাসা = জানিবার ইচ্ছা।

"হয়"—উহ্য ; জিজ্ঞাসা কর্ত্তার ক্রিয়া।

প্রথম ছত্রের অর্থ :—মানুষ তিন রকম দুঃখের ঘা খাইয়া পরে 'ঘা' যাহাতে না খাইয়া হয় সেই উপায়ের জন্য জিজ্ঞাসা করে।

দৃষ্টে :—দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে, (যেমন জ্বর হইলে কুইনাইন সেবনে)

চেৎ—যদি 'হয়' উহ্য।

অর্থাৎ যদি লৌকিক উপায়ে দুঃখ দূর হয়। ইহাতো দেখা যাইতেছে যে লৌকিক উপায়ে দুঃখ দূর হয়।

সা।—অর্থাৎ সেই জিজ্ঞাসা।

অপার্থা = অপ্রয়োজন, নিষ্প্রয়োজন।

লৌকিক উপায়েই তো দুঃখ দূর হয়, সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নিষ্প্রয়োজন।

ন = না এইরূপ হইতে পারে না।

কুইনাইনে জ্বর দূর হইলেও পুনরায় হেমন্তে জ্বর আসে। কুইনাইন সাময়িক উপায় মাত্র। কেন কুইনাইনাদি লৌকিক উপায় দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হইতে পারে না—ইহার উত্তর, লৌকিক উপায়ের অভাব আছে—অভাবাৎ। লৌকিক উপায় পূর্ণ নহে।

অভাবাৎ = অভাব হইতে, অভাবের জন্য।

কিসের অভাব ? একান্তাত্যন্ততঃ—এর অভাব।

একান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ :—অত্যন্ত = একবারে ; একান্ত = নিশ্চিত।

লৌকিক উপায়ের দুইটি অভাব আছে ; ইহা নিশ্চিত বা অব্যভিচারী নহে, ইহা চিরদিনের জন্য নহে—অর্থাৎ ইহা সম্যক নহে।

জীব ত্রিতাপে আঘাতিত হইয়া তাপ নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করে। সত্য বটে তাপ নিবৃত্তির লৌকিক উপায় আছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যখন লৌকিক উপায় আছে তখন কেন দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বৃথা জিজ্ঞাসা। কিন্তু জিজ্ঞাসা বৃথা নহে, কেননা লৌকিক উপায় সাময়িক মাত্র, উহা সব সময়ে খাটে না এবং উহা স্থায়ী নহে। মানুষ ঠিকা প্রজা হইতে চাহে না ; মানুষ চায় মৌরসী মকৃরুরী স্বত্তের প্রজা হইতে।

২

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ ॥

পদ পাঠ—দৃষ্টবৎ আনুশ্রবিকঃ স হি অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ।
তৎ বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্ত অব্যক্ত জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ॥

অন্বয় :—আনুশ্রবিকঃ দৃষ্টবৎ। স হি অবিশুদ্ধি ক্ষয় অতিশয় যুক্তঃ ; শ্রেয়ান্ তদ্বিপরীতঃ ; ব্যক্ত অব্যক্ত জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ।

আনুশ্রবিক = (উপায়) শ্রুতি বা বেদ বিহিত কর্ম্ম কলাপ।

দৃষ্টবৎ—১ম কারিকোক্ত উপায় তুল্য, অর্থাৎ দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তিতে অক্ষম।

—কেন ? কারণ স হি—অর্থাৎ (তাহাও) আনুশ্রবিক উপায়ও ত্রিদোষ যুক্ত ; যাহা দোষ যুক্ত তাহার ফল নির্দ্দোষ নহে। তিন দোষ কি কি ? অবিশুদ্ধি, ক্ষয় এবং অতিশয়।

অবিশুদ্ধি—বেদোক্ত যজ্ঞ সাধনের জন্য যাজ্ঞিককে জীব হিংসা করিতে হয়। যজ্ঞ ফলে স্বর্গ সুখ হইলেও হিংসা জনিত পাপের ফলে কিঞ্চিৎ দুঃখও পাইতে হয়। যজ্ঞের ফল বিশুদ্ধি নহে উহা মিশ্র বা অবিশুদ্ধি।

ক্ষয়—(ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্গলোকাচ্চ্যবন্তে) পুণ্য ক্ষয় হইলে প্রাণী স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হয়।

অতিশয়—(তারতম্য) যজ্ঞ অনুসারে স্বর্গ সুখের তারতম্য আছে ;

ভিন্ন যজ্ঞের ভিন্ন ফল হয়। কেহ ইন্দ্রত্ব পাইলেন, কেহ বা দেবত্ব পাইলেন পরস্পরের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভেদ দর্শনে স্বর্গবাসীর দুঃখ বোধ অপরিহার্য্য।

শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠ।

তদ্বিপরীত—যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ যে উপায় অবিশুদ্ধি, ক্ষয়াতিশয় হীন অর্থাৎ বিশুদ্ধ, অক্ষয় ও তারতম্য হীন।

সেই উপায় কোথা হইতে আসে? বিজ্ঞান হইতে আসে। কিসের বিজ্ঞান? ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই ত্রিবিধ বস্তুর পার্থক্য জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। সচরাচর যাহাকে আমরা বাহ্য বা জড় জগত বলি তাহা রূপরসাদি জ্ঞানের বিকার মাত্র; স্বপ্ন দৃষ্ট বৃক্ষও জ্ঞানের বিকার। ইহাই ব্যক্ত জগৎ। সাংখ্য মতে বুদ্ধি অহঙ্কারাদি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের নাম ব্যক্ততত্ত্ব। যাহা জ্ঞানের কারণ স্বরূপ এবং "যাহার সত্তা (থাকা ভাব) অনুমানের দ্বারা উপলব্ধ হয় তাহার নাম প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্ত্ব। ব্যক্ত জগতের পশ্চাৎ ভাগে অব্যক্ত জগৎ বিদ্যমান আছে।" উভয় জগৎই জড় বা অচেতন।

জ্ঞ যে জানে আত্মা—আমি। জ্ঞর অপর নাম পুরুষ ইহা নিত্য ও চৈতন্যরূপ। সমস্ত জগতকে বিভক্ত করিলে দুইটি বস্তু পাই, আমি এবং আমি ছাড়া আর যা কিছু। আমি ছাড়া আর যা কিছু তাহার নাম প্রকৃতি; আসল প্রকৃতিকে আমি দেখিতে পাই না। প্রকৃতি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বাহ্য জগতের রূপে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রতীয়মান বাহ্য জগতের স্বরূপের নাম প্রকৃতি, প্রকৃতির স্বরূপ অব্যক্ত, প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ ব্যক্ত। (আসরের বা রঙ্গমঞ্চের মনমোহিনীরূপ বৃদ্ধ নর্ত্তকীর ব্যক্তরূপ মাত্র তাহার স্বরূপ রঙ্গমঞ্চে অব্যক্ত। নর্ত্তকীর দুইরূপ—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। নর্ত্তকীর অব্যক্ত রূপ অনুমান করা যায় এবং সময় সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দর্শক তাহার অব্যক্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়)। প্রকৃতি জড়, আমি চেতন। পুরুষ বা আমার জ্ঞান হয় এই জন্য পুরুষের নাম জ্ঞ। (জ্ঞা+ড)

বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট উপায় তুল্য দুঃখের সম্যক নিবৃত্তি করিতে

অসমর্থ। উহা অবিশুদ্ধি, অতিশয় এবং ক্ষয় এই ত্রিদোষ যুক্ত। যাহা ঐ ত্রিদোষের বিপরীত অর্থাৎ যে উপায় বিশুদ্ধ, তারতম্যহীন ও শাশ্বত সেই প্রকৃষ্ট উপায় ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিজ্ঞান হইতে ঘটে।

৩

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ, এই তিন বস্তুর মধ্যে ব্যক্ত বস্তু ত্রয়োবিংশতি রকমের; জ্ঞ বা পুরুষ, অব্যক্ত বা প্রকৃতি এবং ব্যক্ত বা ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বসমেত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। ইহারা অবিকৃতি আদি চতুরভাগে বিভক্ত। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহাদের সাধারণ বিবরণ সাংখ্য-কারিকার তৃতীয় শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোক যথা—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥

পদ-পাঠ—মূল প্রকৃতিঃ অবিকৃতিঃ মহৎ আদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকঃ তু বিকারঃ ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥

অন্বয়—১ মূল প্রকৃতিঃ——অবিকৃতিঃ;
৭ মহৎ আদ্যাঃ সপ্ত——প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ;
১৬ ষোড়শকঃ তু——বিকারঃ;
১ পুরুষ——ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ,
(১+৭+১৬+১=২৫) ইতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

চেতন পুরুষ এবং অচেতন প্রকৃতি, পরস্পর সন্নিহিত হইলে যে জ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন হয়, যাহাতে চৈতন্যের আভাস এবং অচেতনের পরিণাম একত্রিত হয় সেই ফলের নাম মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র জ্ঞান পুষ্পাবলী আমি রূপ সূত্রের দ্বারা গ্রথিত হইয়া জীবনমাল্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রকৃতি=কারণ, যাহা কার্য্য উৎপাদন করে; বিকৃতি বা বিকার=কার্য্য, পরিণাম; প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ=এক হিসাবে কারণ, এক হিসাবে কার্য্য। মূল=যাহার কারণ নাই।

মহদাদ্যাঃ সপ্ত=মহৎ আদি সপ্ত তত্ত্ব;—যথা মহৎ (জ্যোতিঃ বুদ্ধি)। অহঙ্কার (আমি নামক সাধারণ ভাব) পাঁচ তন্মাত্র (তৎ+মাত্র, তৎ=সেই)। পাঁচ তন্মাত্র কি কি?—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। রূপ নীল লোহিতাদি নানা রূপ হইতে পারে; কিন্তু যাহা কেবল মাত্র রূপ তাহাই রূপ তন্মাত্র। মূল রূপ একটি স্পন্দন মাত্র, বহুবিধ স্পন্দন সমষ্টির একত্রীভূত সংখ্যা অনুসারে কখনও বা লোহিত রূপ হয় কখনও বা পীতাদি অন্যরূপ হয়। মহৎ তত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি কিন্তু অহঙ্কার তত্ত্বের কারণ বা প্রকৃতি। অহঙ্কারও আবার পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি।

ষোড়শকঃ তু বিকারঃ। ইহারা কাহারও প্রকৃতি নহে। ইহারা 'নিছক' বিকৃতি। ষোড়শ তত্ত্ব—১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত। চক্ষু কর্ণাদি ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত পদাদি ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং একাধারে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় মন, সর্ব্ব সমেত ১১ ইন্দ্রিয়; ক্ষিত্যাদি ৫ ভূত, ১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত সর্ব্ব সমেত ১৬। শব্দগ্রাহী কর্ণ; স্পর্শ গ্রাহী ত্বক্; রূপগ্রাহী চক্ষু, রসগ্রাহী জিহ্বা, গন্ধগ্রাহী নাসা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক পানি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয়। সর্ব্বসমেত একাদশ ইন্দ্রিয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগের কার্য্য আহরণ—যথা উচ্চারণ, শিল্প, গতি, উৎসর্গ এবং প্রজনন। ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চ ভূত। ক্ষিতি বা অপ অর্থে মাটি বা জল বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে; তেজ অনল নহে; বায়ু বাতাস নহে, আকাশ ইথার নহে; উহারা সংজ্ঞা মাত্র। যে ভূতের কারণ শব্দ তন্মাত্র অর্থাৎ যে ভূত হইতে আমার শব্দ অনুভূতি হয় তাহা আকাশ ভূত, ক্ষিতির কারণ গন্ধ তন্মাত্র, অপের কারণ রস তন্মাত্র, তেজের কারণ রূপ তন্মাত্র, বায়ুর কারণ স্পর্শ তন্মাত্র।

পুরুষ (জ্ঞ, দ্রষ্টা, জীব) কাহারও মূল নহে, কাহারও বিকারও নহে। ব্যানাদি পঞ্চপ্রাণ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে সাধারণ বলিয়া সাংখ্যেরা উহাকে পৃথক ভাবে ইন্দ্রিয় বলেন নাই। (পরে ২৬, ২৮, ২৯ প্রভৃতি কারিকা দ্রষ্টব্য)

আপাততঃ তৃতীয় কারিকায় অবান্তর মনে হইলেও পরে অন্য কারিকা বুঝিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া আমি যাহা পণ্ডিতপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট অনুভূতি সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম তাহার ভাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—আমার জগতে প্রধানতঃ দুইটি বস্তু আছে, (ক) আমি. (খ) আমি ছাড়া আর যাহা কিছু তাহার সমষ্টি ; ইন্দ্রিয়যুক্ত আমার দেহ "এর অন্তরভূত হইলেও অন্যান্য আমি ছাড়া বস্তুর তুলনায় আমার নিকটবর্ত্তী। পুরুষ অনুভব করেন, তিনি শরীরী বটেন অথচ শরীর নহেন। ইন্দ্রিয়ের অপর নাম করণ। করণ অর্থ দ্বারা অর্থাৎ যদ্দ্বারা পুরুষের অনুভূতি হয়। চক্ষু, কর্ণ, হস্তপদাদিকে বাহ্য করণ বলে। পূর্ব্বোক্ত মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই তিনের সম্মিলনকে অন্তঃকরণ বলে। আমি ছাড়া বস্তু সমষ্টির নাম বাহ্য জগত। বাহ্যজগত রূপ রসাদির সমষ্টি মাত্র। বাহ্য জগতকে বিষয়ও বলে। পুরুষ বিষয় ভোগ করেন বলিয়া পুরুষকে বিষয়ী বলা যায়। চক্ষুর বিষয়-রূপ, চক্ষুর সহিত রূপের সংযোগ হইলে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহার নাম আলোচন বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান। আলোচনের উপর মনঃসংযোগ হইলে মনের সংকল্প বৃত্তিদ্বারা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান সবিশেষ হইতে আরম্ভ হয় অতঃপর অহঙ্কার সবিশেষ জ্ঞানের উপর ক্রিয়া করে, ইহার ফলে বৃত্তিগুলি 'আমার বৃত্তি' বলিয়া অনুভব হয়। অহঙ্কারের ক্রিয়ার নাম অভিমান। ইহা আমার বিষয়, ইহাতে আমি অধিকৃত ; আমি শক্ত, আমি ব্যতীত কেহ অধিকারী নাই, এই যে অহমস্মি স্বামিত্ব বৃত্তি ইহাই অভিমান। এইবার তাহার উপর বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। বুদ্ধির নিজস্ব বৃত্তি অধ্যবসায় বা বিনিশ্চয়। বুদ্ধির দ্বারা ব্যাকৃত হইলে তবে বুদ্ধি বিনিশ্চিত আকার ধারণ করে। প্রথম আলোচন, আলোচনের পর সঙ্কল্প, সঙ্কল্পের পর অভিমান এবং অভিমানের পর বিনিশ্চয়। কিন্তু বিনিশ্চয়ের স্তরে উঠিলেও অনুভূতি প্রক্রিয়ার অবসান হয় না। ইহার সহিত চিতের বা পুরুষের যোগ চাই। বিষয় দ্বারা উপরঞ্জিত বৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে অধিরূঢ় হইলে তবে অনুভূতি হয়। দ্রষ্টা পুরুষ চিত্তের দ্বারা দৃশ্য বিষয় দর্শন করেন। বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব

যখন পুরুষে সংক্রান্ত হয়, তখন সেই সেই চিত্তবৃত্তি পুরুষের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিষয় অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি পুরুষকে প্রদান করে।

অর্থ—মূল প্রকৃতি কাহারও কার্য্য বা পরিণাম নহে—তাহার মূল নাই। প্রকৃতিই জড়াত্মক সর্ব্ব বাহ্য জগতের মূল।

মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি বস্তু একাধারে প্রকৃতি এবং বিকৃতি; মন প্রমুখ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত এই ষোলটি বস্তু নিছক বিকৃতি। (ক্রমশঃ)

—ওমার খৈয়াম্।

এরিষ্টটল ও আত্মা

কিছু কাল পূর্ব্বে "পরাবিদ্যা" সম্বন্ধে এরিষ্টটলের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অতঃপর আত্মা বলিতে তিনি কি বুঝিতেন, তৎসম্বন্ধে তাঁর কি মত ছিল, আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব। মোটামুটি বলিতে গেলে এরিষ্টটলের মতে বস্তুর সত্তা (essence) বা সার পদার্থই আত্মা শব্দ বাচ্য, যাহা না হইলে যে বস্তু বর্ত্তমান থাকিতে পারে না সেইটিই সেই পদার্থের আত্মা। আবার তিনি বলেন, কোন একটি বস্তুর সার অংশ বা আত্মা হইতে তাহার আবরণ বা দেহকে বাদ দিতে পারা যায় না, এবং এই আবরণ বা দেহটি সেই সারাংশ বা আত্মার অপরিণত বা অপরিস্ফুট অবস্থা।

একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করা যাউক। জগতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; কতক লোক নিজের দেহ লইয়াই ব্যস্ত, দেহ ছাড়া আর কিছু আছে কি না তাঁহারা সংবাদ

লন না বলিলেই হয়, তাঁহাদের দেহ ও আত্মা অভেদ হইয়া পড়িয়াছে বলিলেও চলে। অপর এক শ্রেণীর লোক দেহ ছাড়া দেহাতিরিক্ত আত্মার সংবাদ লন কিন্তু দেহকে ভুলে না ; আর এক তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে তাঁহাদের দেহের সন্ধান নাই বলিলেই হয়, তাঁহারা আত্মধ্যানে মগ্ন হইয়া অহং ভুলিয়া যান। প্রথম শ্রেণীর লোকের চৈতন্য নাই বলা যায় না কিন্তু সেটি অপরিস্ফুটভাবে বর্ত্তমান ; তাঁহারা যে চিৎ পদার্থ এ জ্ঞান ভুলিয়া গিয়া সেই চৈতন্যের আবরণ দেহকেই চৈতন্যের সহিত অভেদ করিয়া ফেলিয়াছেন। যেটি আবরণ সেইটিই কিন্তু আবার এরিষ্টটলের মতে চৈতন্যের অপরিপূর্ণ বিকাশমাত্র তাই অপরিপূর্ণ বিকাশ বা দেহকে চৈতন্যের সহিত অভিন্ন করা চলে। এরিষ্টটল বলেন, চৈতন্য থাকিলেই দেহ থাকিবে চৈতন্যের বিকাশ হইতে গেলে দেহের মধ্যে দিয়াই হইবে। যেখানে চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ সেখানে দেহ দেহীর ভেদ লোপ হইয়াছে, যেখানে অল্প বিকাশ সেখানে ভেদ বর্ত্তমান। দৃষ্টান্তের শেষ শ্রেণীর লোকের চৈতন্য পরিস্ফুট তাই যেন দেহটির পৃথক সত্তা লোপ পাইয়াছে। কেন বলিলাম কারণ এরিষ্টটল একমাত্র ঈশ্বর (God) ভিন্ন অন্য কোথাও দেহ দেহীর অভেদ স্বীকার করেন না। এরিষ্টটল বলেন, জগতের যাবতীয় পদার্থে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এমন কি উদ্ভিদে পর্য্যন্ত চিৎ শক্তি বা আত্মা বর্ত্তমান। কিন্তু সেখানে তাদের শরীর বা জড়াংশ ও আত্মা বা চিদংশের পার্থক্য আছে, কারণ সেখানে চিৎ শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ নাই ; চিৎ শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে সেখানে জড়াংশ থাকিতে পারে না। জগতের যাহা কিছু সবই চিৎশক্তির আংশিক বিকাশের পরিচয় প্রদান করে, তাই জড়ের ও চৈতন্যের পার্থক্য দৃষ্টি হয়। এরিষ্টটল বলেন কি বাহ্য জগতে কি জড় জগতে—কি জীব জগতে—সর্ব্বত্রই দেহ বা জড়াংশ ছাড়া দেহী বা চিদংশ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না ; দেহ বা জড়াংশছাড়া দেহীর চিদংশের আলোচনা নিরর্থক। সত্য বটে দেহী বা চিৎ শক্তিই দেহকে ধারণ করিয়া আছে—চিৎ শক্তির অন্তর্দ্ধানে জড়াংশ বিনাশ প্রাপ্ত হয়—কিন্তু উভয়ের মধ্যে তাঁর মতে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁর মতে আত্মা দেহের পরিণাম নয়।

উদ্ভিদের চৈতন্য আছে—এটি নবযুগের নূতন আবিষ্কার মনে করিবেন না। এরিষ্টটলও এই তত্ত্ব প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন নাই। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা এ সত্যের পরিচয় বহু পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ঘরের সংবাদ রাখি না। তাঁহারা কি সুন্দর ভাবে বুঝিয়াছিলেন দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সকলেই জানেন একই মাটিতে পাশাপাশি আম্র-বৃক্ষ ও নিম্ব-বৃক্ষ রোপন করিলে আম্র বৃক্ষ মিষ্ট রস ও নিম্ব বৃক্ষ তিক্ত রস গ্রহণ করে। মাটীতে পাঁচটী রস থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন রস গ্রহণ করে কেন? কেহ হয়ত বলিবেন স্বভাব (instinct)। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এটি কি নির্ব্বাচনের পরিচয় প্রদান করে না? নির্ব্বাচন করিতে পারে কে যার চৈতন্য আছে। ইহাই প্রাচীন আর্য্য ঋষির সিদ্ধান্ত। এরিষ্টটলের নিকটও এই সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি বলেন উদ্ভিদ হইতে পশু পক্ষী শ্রেষ্ঠ কারণ পশু পক্ষীতে উদ্ভিদ অপেক্ষা অধিকতর চৈতন্যের বিকাশ। উদ্ভিদ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার উপযোগী বস্তু আহরণ করে তাহাদের অপর অনুভূতি নাই, পশু পক্ষীর সকল অনুভূতি আছে। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ও প্রাচীন যুগের তত্ত্ব দ্রষ্টা ঋষি এ সিদ্ধান্তে এক মত হইতে পারিবেন না—তাঁদের মতে উদ্ভিদদেরও সকল প্রকার অনুভূতি আছে। এরিষ্টটল বলেন জীবের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ কারণ ইতর জীবে reason বা বুদ্ধি বৃত্তি নাই মানুষে সেটী বর্ত্তমান। ইতর জীব হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কাজ করে মানুষ যদি সেরূপ করে তাহাকে পশু বলিতে হইবে।

আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টায় প্রাণের অনুভূতিতে মনের ও বিবেক শক্তিতে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তিনটি একই চিৎ শক্তির বিকাশ মাত্র। এরিষ্টটল উদ্ভিদ পশুপক্ষী ও মানুষকে মোটামুটী তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিলেও তাহাদের মধ্যে যে একই চৈতন্য শক্তি বর্ত্তমান এ কথা অজ্ঞাত ছিলেন না, কারণ তিনি বলেন প্রাণ মনের এবং মন জ্ঞানের বা বুদ্ধির অন্তর্ভূক্ত। অন্য কথায়—যার জ্ঞান আছে তাহার মন আছে প্রাণ আছে, যার মন আছে তার প্রাণ আছে মাত্র।

সকলেই বলেন, 'আমার প্রাণ চায় ইহা করিব উহা করিব'। এ কথায় কি বুঝিব ? এ কথায় কি ইচ্ছারই পরিচয় পাওয়া যায় না ? ইচ্ছা পূর্ণ হইলেই ক্রিয়া নাম ধরে—ইচ্ছাটি কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা। সুতরাং ক্রিয়াশক্তি বা প্রাণ শক্তিকে willing আখ্যা দেওয়া চলে। এই প্রকারে অনুভূতি বা মনের ব্যাপারকে feeling ও বুদ্ধি বা জ্ঞানের ব্যাপারকে knowing আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আধুনিক দার্শনিকগণের মত এরিষ্টটল যথাযথ লিপিবদ্ধ না করিলেও তাহার আভাষ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রাণ, মন, বুদ্ধি একই চিৎশক্তি বা আত্মার বিকাশ। প্রাণের কার্য্য আত্মরক্ষা, মনের কার্য্য অনুভূতি প্রভৃতি ও বুদ্ধির কার্য্য বিচার, প্রণিধান ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি sense perception বলিতে এরিষ্টটল কি বুঝিতেন সেইটি অতঃপর আলোচনা করা যাউক। তিনি বলেন এক খণ্ড মোমের উপর মোহর করিলে যেমন ছাপা পড়ে তেমনি মনের উপর ইন্দ্রিয় দ্বার চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি দিয়া বাহ্য পদার্থের ছাপ পড়ে। তার ফলে একটি অনুভূতি হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া এই অনুভূতি হয় বলিয়া ইহার নাম ইন্দ্রিয়ানুভূতি। মোমের উপর মোহর করিলে মোহর একটা ছাপ দেয় মাত্র তাহা ছাড়া আর কিছু করে না। এবং মোহর যে পদার্থে প্রস্তুত তার কোন অংশ মোমে অধিগত হয় না ; মনটা যেন মোমের টেবিল, পদার্থগুলি যেন মোহরের মত। উদাহরণের প্রতি কেবল মাত্র দৃষ্টি রাখিলে মনের যে কোন ক্রিয়া আছে সে কথা ভুলিয়া যাইতে হয়, পরন্তু এরিষ্টটলের মতে মন নিষ্ক্রিয় নয় কারণ বাহ্য পদার্থের ছাপ গ্রহণ ব্যাপারে মন তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য বা উপসাদৃশ্য সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিয়া প্রতীতিগুলিকে নিয়মিত করে, সুসজ্জিত করে।

প্রতীতি কখনও একটি ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া হয় কখন বহু ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া হয় ; এরিষ্টটল প্রথম শ্রেণীর প্রতীতিকে special বা বিশিষ্ট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীতিতে common বা সাধারণ আখ্যা দিয়াছেন।

শ্বেত রূপের প্রতীতি হওয়ার পর শ্বেত মনুষ্যকে বা শ্বেত পুষ্পটিকে শ্বেত রূপে গ্রহণ করা ব্যাপারে অনুমানের প্রণালী অন্তর্নিহিত ? কিন্তু

সেই অনুমান এত অল্প সময়ে ঘটিয়া উঠে যে তাহার ভিন্ন ভিন্ন ক্রমগুলি আমাদের লক্ষ্য হয় না এই শ্রেণীর প্রতীতিকে এরিষ্টটল Inferential বা আনুমানিক আখ্যা দিয়াছেন।

চক্ষুদ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস, নাসিকার দ্বারা গন্ধ। ত্বক দ্বারা স্পর্শ ও কর্ণ দ্বারা শব্দ গ্রহণ করি। এরিষ্টটল বলেন, ইহাদের মধ্যে ত্বক অমিশ্র (rudimentary) অর্থাৎ ত্বক দ্বারা যে প্রতীতি হয় তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতির সংমিশ্রন নাই কর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ (Instructive) চক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি কারক (Ennobling)।

এরিষ্টটল বলেন বাহ্য পদার্থের প্রতীতি হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়-গুলির সহিত বাহ্য পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না, মধ্যে একটা ব্যবধান প্রয়োজন—উদাহরণ স্বরূপে বলেন কর্ণের দ্বারা শব্দ শুনিতে হইলে মধ্যে বায়ুর ব্যবধান প্রয়োজন।

এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মূলে একটা কেন্দ্রগত বা মূল ইন্দ্রিয় (Central sense) এরিষ্টটল স্বীকার করিতেন। আমরা হৃদয় বা মন বলিতে যাহা বুঝি মনে হয় এরিষ্টটল তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; চক্ষুর দ্বারা রূপের প্রতীতি হইতেছে, কর্ণ সেই সঙ্গে শব্দ গ্রহণ করিতেছে সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা ঘ্রাণ লইতেছে যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য চলিতেছে দেখা যায় যদি কেন্দ্রগত ইন্দ্রিয় এই পাঁচটির মধ্যে কোন একটি ইন্দ্রিয় হইত তাহা হইলে ইহা যুগপৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিতে পারিত না। আমাদের ভাষায় ইহাকে অন্তঃকরণ বলে এরিষ্টটল বলেন ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতির পার্থক্য উপলব্ধি হয়।

মনের বৃত্তি নানারূপে প্রকাশ পায়। কোন একটি পদার্থের প্রতীতি হইবার পর সেই পদার্থের অবর্ত্তমানে সেইটিকে মনে করার ব্যাপারটিকে এরিষ্টটল কল্পনা (imagination) আখ্যা দেন। এবং এই কল্পনার সাহায্যেই তাঁর মতে স্মৃতি (Memory) উদয় হয়। কোন একটি পদার্থের প্রতীতি হইবার পর সেটি যদি একেবারে লোপ পাইত তাহা হইলে কল্পনার বা স্মৃতির সম্ভাবনা থাকিত না। পদার্থের প্রতীতির পর সেটি মনের মধ্যে অব্যক্তাবস্থায়

থাকে তাই কল্পনার সাহায্যে সেটি স্মৃতি পথে উদিত হইতে পারে। এই স্মৃতির সাহায্যে আবার প্রতীতিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্দ্ধারিত হয় সেই নির্দ্ধারণ ব্যাপারটি কিন্তু কেবলমাত্র স্মৃতির কার্য্য নয় ইহাতে বুদ্ধির বিচার প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকানাইলাল পাল, এম-এ, বি-এল।

মাধুকরী

দুঃখ-বাদ ও জীবনের আদর্শ—একটা চ্যালেঞ্জ —Pessimism শব্দটির উৎপত্তি Latin pessimus হইতে। ইহার ইংরাজী অর্থ worst অর্থাৎ অপকৃষ্ট। New English Dictionaryর মতে Pessimism নামক ইংরাজী শব্দটি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে Coleridge তাঁহার পত্রাবলীতে সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করেন। বাংলায় ইহার পারিভাষিক প্রতিশব্দ "দুঃখ-বাদ" সম্প্রতি দৃষ্টি গোচর হয়। Optimism শব্দটির অর্থ ঠিক বিপরীত। Pessimism শব্দটির বাংলা পারিভাষিক যদি 'দুঃখ-বাদ' হয়, তাহা হইলে Optimismএর পারিভাষিক 'সুখ-বাদ' হওয়া সঙ্গত। 'দুঃখ-বাদ' শব্দটি বাংলা ভাষায় এখনও ভালরকম চলিত হয় নাই, আর 'সুখ-বাদ' শব্দটি এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখি নাই। কিন্তু ইংরাজী Pessimism ও Optimism শব্দ দুইটি আমরা আজকাল খুব বেশী রকম ব্যবহার করিয়া থাকি ; এবং পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে আমাদের বশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, Pessimism বা দুঃখ-বাদ জিনিষটা মন্দ ; কারণ, ইহা ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের উন্নতির অন্তরায়,

এবং Optimism বা 'সুখ-বাদ' জিনিষটি ভাল ; কারণ ইহা উন্নতির অনুকূল। এরূপ বিশ্বাসের বিশেষ দোষও নাই, যেহেতু Pessimism শব্দটি Condemnatory Sense অর্থাৎ নিন্দাবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; এবং ইহার association পাশ্চাত্য লেখকদিগের মতে মোটামুটি নাস্তিকতার সঙ্গে, কারণ, ভগবান যদি মঙ্গলময় হন এবং ভগবানের অস্তিত্বের teleological proof বা উদ্দেশ্য-মূলক প্রমাণ যদি একটা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে Pessimistদের নাস্তিক ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। বিশেষ Materialist বা জড়বাদীরা পরলোকে অবিশ্বাসী কাজেই তাঁহাদের 'মৃত্যু' মানে Annihilation বা বিনাশ। এরূপ বিশ্বাস লইয়া মানুষ Optimist থাকিতে পারে না।

ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনসমূহকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Pessimistic বা দুঃখ-বাদী বলিয়া থাকেন, এই জন্য যে, এই সমস্ত ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল সূত্রটি এই যে জীবন দুঃখময় ; এবং এই জন্যই যে ভারতের অবনতি হইয়াছে, এইরূপ একটা ধারণা শুনিয়া শুনিয়া আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; আর পাশ্চাত্য জগতের যে উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, ইহার কারণ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা মনে করে যে, Life is worth living অর্থাৎ জীবন ধারণটা বাঞ্ছনীয় ; এবং পাশ্চাত্য জগতে বাঁচিয়া থাকার আনন্দ বা Joie de vivre বলিয়া একটা সত্য বস্তু আছে। অনেক European লেখকের মতে ঋগ্বেদের ধর্ম্মটা বেশ healthy অর্থাৎ সুস্থ এবং Optimistic ছিল। তার পর উপনিষদে অবনতির সূচনা ; কারণ উপনিষদে মায়া নামক বস্তুটি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আর বৌদ্ধমতে ধর্ম্মের চরম অবনতি হইয়াছে ; কারণ, pessimism ওখানে চরম মাত্রায় পৌঁছিয়াছে।

আরও একটা কথা আছে। পাশ্চাত্য মানব বলিয়া থাকেন যে, Pessimism জিনিষটা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক এবং Optimism জিনিষটা robust অর্থাৎ বলবান। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ Jamesএর মতে এ ধারণাটা ভ্রান্ত। তিনি Pessimistদের tough-minded ও

Optimistদের soft-minded বলিয়াছেন। তথাপি, সাধারণের ধারণা অন্যরূপ। আবার Encyclopædia of Religion and Ethics গ্রন্থে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের Pessimismটার যদিও দার্শনিক ভিত্তি আছে, তথাপি, উহার প্রধান কারণ Environmental ও Temperamental অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক ও মানসিক অবস্থা; এবং এই Pessimism এর যে বিষময় ফল তাহার কতকটা নিরসন হইয়াছে আমাদের দেশের প্রাচীন বৈষ্ণবদের ভক্তি cult বা ভক্তিযোগ দ্বারা; আর কতকটা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আমরা যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতেছি ও ব্যাঙ্কে টাকা জমাইতে পারিতেছি, সেজন্য; এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতে যে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্য সমাজ নামধেয় Theistic movements অর্থাৎ নিরাকার সগুণ একেশ্বরবাদের আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কতকটা তাহারও জন্য। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

এই Pessimism ও Optimism ছাড়া আরও একটি শব্দ সম্প্রতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, যাহা অত্যন্ত আধুনিক। এই শব্দটি Meliorism। এই শব্দটি সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করেন George Eliot। তাঁহার বন্ধু ও Comteর শিষ্য Frederic Harrison নিজকে Meliorist বলিতেন; এবং আমেরিকার দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ Jamesও ঐ বিশেষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজকাল নিজকে Meliorist বলাটাই, দেখা যায়, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে একটা বড় রকমের ফ্যাশান। আসল কথা, Leibnitzএর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর Deistদের Optimism বিচার সহ নহে। Schopenhauer ও Hartmannএর উপর যিনি যতই ঝাল ঝাড়ুন, আর তাঁহাদের metaphysics বা দার্শনিক তত্ত্বের যতই ত্রুটী থাকুক, যে সব যুক্তি দ্বারা জগতের দুঃখ তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন, সেগুলি অকাট্য। Schopenhauerএর যুক্তির সারবত্তা নব্য জার্ম্মানীর Activism বা কর্ম্মপ্রবণতা দার্শনিক Encxenও স্বীকার করিয়াছেন। Optimism নামে যে জিনিষটার খুব চলতি সে জিনিষটা যে নিতান্ত shallow এবং ঐ বিশ্বাসটা যে চিন্তাহীনতার পরিচায়ক কিম্বা

Theological prejudiceএর ফল এ কথাটা Europe ও Americaর চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে Optimism অত বড় একটা সংস্কার—সহজে ত যাইবার নয়; আবার নিজেকে Pessimist বলিলে পাছে লোকে দুর্ব্বল মনে করে, তাই তাঁহারা Optimism ও Pessimismএর মধ্যে একটা রফা করিয়া আপনাদিগকে Meliorist নামে পরিচিত করেন। অর্থাৎ তাঁহারা Optimistও নন্ Pessimistও নন্—এ দুইয়ের মাঝামাঝি। জগতের দুঃখ তাঁহারা স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা বলেন যে জগতের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে ও সুখের পরিমাণ বাড়িতেছে। অনন্ত কাল ধরিয়া দুঃখ কমিতে থাকিবে ও সুখ বাড়িতে থাকিবে। সে কমারও শেষ নাই, সে বাড়ারও শেষ নাই; এবং এই সুখ বৃদ্ধি বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টিত থাকিতে হইবে। এই চেষ্টাশীলতাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। ইঁহাদের সকলের বিশ্বাস যে, Imperfect world is becoming perfect এবং কাহারও কাহারও মতে Imperfect God is also getting perfect। Evolution বা অভিব্যক্তির হাত হইতে ভগবানেরও পরিত্রাণ নাই। ওদিকে Hegel আবার এদিকে Bergson সম্বন্ধে Meliorist শব্দটির প্রয়োগ যদিও দেখি নাই, তথাপি, বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইঁহাদের পরস্পর বিরোধী দার্শনিক তত্ত্ব সত্বেও উভয়কেই Meliorist বলাই উচিত। আর কবি Browning এর মতে যখন Imperfect man is getting perfect এবং Imperect God is also getting perfect তখন তাঁহাকেও Meliorist ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? আর Evolutionist বা অভিব্যক্তিবাদীদের ত কথাই নাই। তাঁহাদের নিকট হইতেই ত বর্ত্তমান নাস্তিক ও আস্তিক দার্শনিকেরা জগতের অনন্ত উন্নতিশীলতা এবং Modern Christian Theologyর অনুসরণকারী আমাদের দেশের Theistরা আত্মার অনন্ত উন্নতিশীলতা শিক্ষা করিয়াছেন।

য়ুরোপীয়ান ও আমেরিকানরা যখন বলেন যে, তোমাদের

ধর্ম্ম ও দর্শন Pessimistic, তাই তোমাদের এত দুর্দ্দশা, তখন আমরাও বলিতে পারি যে, তোমাদের ধর্ম্মটাই বা কি? সেখানেও ত Pessimism ছাড়া কিছুই দেখি না। Old Testamentএর Book of Ecclesistes বাদ দিলেও ত' দেখি যে, New Testamentএ যীশু বলিতেছেন এ জগৎটা কিছুই নয়—Vale of Sorrow—সব ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও। জগৎটা শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে; এবং আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের বিচার করিতেছি; এবং কতকগুলি লোককে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিতেছি। Imitation of Christএরও ত' কথা Vanity of vanities—all is vanity অর্থাৎ সমস্তই অসার স্বপ্ন। আর যীশুর উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া ত' মধ্যযুগের য়ুরোপ একটা প্রকাণ্ড মঠে পরিণত হইয়াছিল।

একথার উত্তরে তাঁহারা বলিবেন, "হ্যাঁ, এ সবই সত্য। কিন্তু বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয় এই যে, যীশু দুঃখের বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে আশার বাণীও প্রচার করিয়াছিলেন। আর সেই বাণীটাই Christianityর মস্ত বড় কথা—সেটা স্বর্গের আশা ও Salvationএর "আশা"। Salvation কথাটার বাংলা 'মুক্তি' নয়। ইহার বাংলা যীশুর কৃপায় আকাশের উর্দ্ধে যে স্বর্গলোক আছে, যেখানে ঈশ্বরের অনুগৃহীত মানবগণের শেষ বিচারের পর বাস। শেষ বিচার পর্য্যন্ত সকলকেই কবরে প্রোথিত থাকিতে হইবে।

আরও একটা কথা অনেক Protestant খ্রীষ্টানরা উত্তরে বলিবেন। সেটা এই যে, "খ্রীষ্টধর্ম্মের সঠিক ব্যাখ্যা আমরাই করিয়াছি। Mediævalism অর্থাৎ মধ্যযুগের অবসাদ আমরা অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যথার্থ Interpretation বা ব্যাখ্যাটা Modern Christian Theology exegesis বা বর্ত্তমান খ্রীষ্টিয় Protestant ধর্ম্মতত্ত্বের বিবৃতি, যাহার সুর Optimistic এবং যে মত অনুসারে কিছুই ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই। Ascetic

ideal বা সর্ব্ব ত্যাগের আদর্শটা ভ্রান্ত, বিকৃত, অসম্পূর্ণ ও স্বার্থ দুষ্ট"। এখনকার খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মটাকে সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রথমে Hegel দর্শনের সঙ্গে ও Science ও Evolution অর্থাৎ বিজ্ঞান ও অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ান হইয়াছিল ও এখন Bergsonএর Vitalism বা জীবনীশক্তিবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ান হইতেছে।

ক্রমে বোধ হয় আরও অনেক জিনিষের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হইবে। অবস্থা কাহিল সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্ট দুঃখের বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে আশার বাণীও প্রচার করিয়াছিলেন, অতএব খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে Pessimistic বলা যায় না, এইরূপ উত্তরের আমরাও ত' পালটা জবাব দিতে পারি এই বলিয়া—"স্বীকার করি, যীশুর আশার বাণী ও Salvationএর বাণীটা খুব বড় কথা; কিন্তু, আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও দর্শনেও ত' মোক্ষ, নির্ব্বাণ, কৈবল্য, অপবর্গ অথবা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কথা আছে; এবং সেটাই ত' আমাদের সকলের চেয়ে বড় কথা। অতএব আমাদের দর্শনটাকেও ত' Optimistic বলা উচিত। তবে "জগৎ দুঃখময় ও বাসনাই দুঃখের মূল" এই কথাটা বলার জন্য যদি আমাদিগকে Pessimistic বল, তাহা হইলে তোমাদের ধর্ম্মটাকেই বা আমরা Pessismistic বলিতে পারিব না কেন?"

তারপর Modern Protestant Christian Theology (বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় Protestant ধর্ম্মতত্ত্ব) যেটাকে প্রথমে Hegel, Seience (বিজ্ঞান) ও Evolution (অভিব্যক্তিবাদ) এর সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া এবং বর্ত্তমানে Bergsonএর Vitalism (জীবনীশক্তিবাদ) এর সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সন্ন্যাসের আদর্শকে খর্ব্ব করা হইতেছে, ও যেটাতে অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে একটা আপোষের প্রাণান্ত চেষ্টা করা হইতেছে, সেটাকে যিনিই Bible সরলান্তঃকরণে পাঠ করিবেন, তিনিই বলিবেন যে, ওটা কদর্য্য ও Sophsitry (দুষ্ট তর্ক)। যদি সরল হও, তাহা হইলে বিবেকানন্দের ভাষায় বলিতে হইবে—"য়ুরোপ প্রোটেষ্টাণ্ট হ'য়ে খৃষ্টধর্ম্মকে ঝেড়ে ফেলেছে।" Nietzscheও তাই, যদিও

বিবেকানন্দের বিপরীত আদর্শের দিক্ হইতে, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন "ও সব ভণ্ডামী আর কেন ? যদি মন মুখ এক করিতে হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম জিনিষটাকেই ঝাড়িয়া ফেলিত হইবে। ও নামটুকু আর কেন ? উহার Slave moralityকে চিরনির্ব্বাসিত করিতে হইবে। পুরাতন Odinism Christianity অপেক্ষা ঢের শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম। এই Odinismএ ফিরিয়া না গেলে আর য়ুরোপের মঙ্গল নাই"। এজন্য Nietzscheকে A moralist বলা হয় এবং এই জন্য Nietzche'smএর অপর নাম Inverted Schopenhauerism বা প্রতিলোম শোপেন্হাওয়ার-তত্ত্ব। তিনি চান—Transvalaution of values এবং ইহকাল সর্ব্বস্ব Superman। একে মনসা তায় আবার ধুনার গন্ধ। তাহা হইলে আর রক্ষা নাই !! যাহা হউক Chirstianityর মূল্যাবধারণ সম্বন্ধে Nietzcheর সহিত কাহাকেও একমত হইতে বলিতেছি না। তবে Christianityটাও যে আমাদের দেশের ধর্ম্মের ন্যায় Pessimistic, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না, Christanityর বিকৃত ব্যখ্যাকারীরা যাহাই বলুন।

এই Pessimism বিষয়ক মত, বিশ্বাস ও ধারণার মধ্যে কতটা সত্য আছে, সে বিষয়ে আলোচনা হওয়া বিশেষ আবশ্যক, নতুবা আমরা ভারতের Culture ও Civilsationএর spiritও বুঝিতে পারিব না, সত্য কি তাহাও ঠিক করিতে পারিব না এবং জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যও নির্ণয় করিতে পারিব না। যেহেতু Optimism, Pessimism ও Meliorism এই তিনটি কথাই আসল কথা। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা হইতেছে এই—How we feel life অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিটা কিরূপ। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন—যাহাকে জীবনের 'Values' বলা হয়, তাহার নির্দ্দেশ এই প্রশ্নটার উত্তরের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। Monism, Dualism, Pluralism, Monotheism, Polythism, Atheism, বা অন্য কোন—ism—যাহার ভিত্তি মাত্র intellect, সেই প্রকার কোন Intellectualism এর উপর নহে।

আমরা এ পর্যান্ত আলোচনা করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে ইহাই বুঝিলাম যে, মুক্তির কথা থাকা সত্ত্বেও দুঃখকে যেখানে স্বীকার করা হইয়াছে, সেখানেই Pessimism শব্দটির প্রয়োগ হইতেছে; এবং ঐ শব্দটি Condemnatory sense অর্থাৎ নিন্দাবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। আমরা Pessimism শব্দটি 'দুঃখ স্বীকার' অর্থেই প্রয়োগ করিব। কিন্তু, দেখাইব যে, নিন্দাবাচক অর্থে ও শব্দটির ব্যবহার উচিত নয়, যদিও কড়া করিয়া বলিতে গেলে Pessimist তিনিই, যিনি বলেন—"কোন আশা কোন কালেই মানবের নাই—সব শূন্য —আত্মহাত্যা ভিন্ন পালাইবার পথ নাই।" আমাদের দেশের কোন ধর্ম্ম ও দর্শন যখন এই শেষোক্ত অর্থে Pessimistic নয়, অথচ য়ুরোপীয়ানরা যখন সেগুলিকে Pessimistic আখ্যা দেন, আর Pessimismটা যখন ইংরাজী শব্দ, তখন তাঁহাদের অর্থেই এ প্রবন্ধে Pessimism শব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। কেবল নিন্দাবাচক অর্থে ইহার প্রয়োগ হওয়া উচিত নয়—এই কথাটা উত্তমরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কোন বিষয়ে সত্য নির্ণয় করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকার Pre-conceived notions অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পিত সংস্কার বর্জ্জন করা আবশ্যক। "ভগবান্ মঙ্গলময় অতএব তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গল আসিতে পারে না"—এই প্রধান ধারণাটি A-priorism। ভগবান আছেন কি নাই, তিনি মঙ্গলময় কি না, এ বিষয়ে কোনও ধারণা মনের মধ্যে থাকিলে, আমরা সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হইব না। জীবনের প্রধান কথা—Experience, তা সেটা Materialistic অর্থাৎ আধিভৌতিকই হউক আর Spirtualistic অর্থাৎ আধ্যাত্মিকই হউক্। এই Experienceএর ভিত্তি Feeling এই Feelingএর elementary from বা মূল উপাদান Sensation, যাহা ব্যতীত কোন প্রকার Cognition বা জ্ঞান অসম্ভব। আমরা প্রথমে feel না করিলে think করিতে পারি না ও actও করিতে পারি না। যেমন মনে করুন, আগুনের সঙ্গে হাতটার সংস্পর্শ হইলে যন্ত্রণা বোধ হইল। তারপর চিন্তার উদয় হইল যে, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে; আর তারপর এরূপ act করাই স্বাভাবিক —যেন আগুনে হাত না দিই।

জীবনের কোন সমস্তার সমাধান করিতে হইলে এই Feeling জিনিষটা প্রধান সহায়। Ruskin একটা বড় সত্য কথা বলিয়াছেন—The ennobling difference between one man and another is precisely this that one man feels more than another." যাঁহার feeling নাই, তাঁহার বিচার কেবল Logic-chopping বা ন্যায়ের কচ্ কচি। সে জিনিষটা কাহারও মর্ম্ম স্পর্শ করে না এবং তাহা শুনিবার ধৈর্য্যও সকলের থাকে না। লোকে সেটাকে বাজে কথা বা দাবা ব'ড়ের খেলার মত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের খেলা বলিয়া মনে করে। আমাদের আলোচ্য বিষয় আমরা প্রথমে এই feeling এর ভিতর দিয়া বুঝিতে যদি চেষ্টা করি, তবেই প্রকৃত বোধ হইবে। আমাদের দেশের সমস্ত দর্শন যাহা আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার উৎপত্তি এই feeling হইতে।—দুঃখাভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা।

এখন কথা হইতেছে এই যে, Pessimismএর যে Feeling হইতে উৎপত্তি, সেটা Universal experience বা সর্ব্বসাধারণের experience কি না। এই Pessimism এর কোনও Scientific basis বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না। কোন statistics বা অঙ্কসঙ্কলন সম্ভবপর কি না, যাহাতে জমা ও খরচ খতাইয়া নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, জীবনের দুঃখের ভাগটাই অধিক।

প্রথম কথাটার উত্তর এই যে, আমোদপ্রিয় চঞ্চলচিত্ত সাধারণ মানবের কোন গভীর Feeling বলিয়া জিনিষ নাই; অতএব তাঁহাদের Feelingএর কোন মূল্য নাই। পৃথিবীতে যে প্রধান ধর্ম্মগুলি মানবের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সেই প্রধান ধর্ম্মগুলির স্থাপয়িতা ও সাধকদের যদি একপ্রকার Feeling বা Feelingএর agreement বা ঐক্য হয়, তাহা হইলে বোধ হয় বলা নিরাপদ যে, Pessimistc Feelingটা Universal experience। কেবল কারণবশতঃ মহম্মদ সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিব না।

তবে মহম্মদের জীবনে যে একটা গভীর দুঃখ বোধ ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। আরবের দুর্দ্দশায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। ইস্লামের

দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দুর্দ্দশায় যখন ভারতীয় মুসলমানের প্রাণ কাঁদিবে, তখন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য অনিবার্য্য। মহম্মদ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও, মুসলমান সূফী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, ইঁহাদের ধর্ম্মটা দরবেশ বা ফকীরের ধর্ম্ম, এবং জীবনটা দুঃখময় বলিয়া না বুঝিলে কেহ ফকীর হয় না। তার পর হিন্দু দর্শন ও ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ও ধর্ম্ম, চীনদেশের Laotzeএর Taoism Old Testamentএর বা য়িহুদী জাতির ধর্ম্ম এবং New Testament বা যীশু খৃষ্টের ধর্ম্ম—সবগুলিই দেখিতে পাই Pessimism। Zoroaster এর ধর্ম্মে অহুর মজ্দার সঙ্গে যখন একজন অহিমান আছেন, তখন সেটাও Pessimism। তাহা ছাড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যেখানে পাপ বোধ বলিয়া জিনিষ আছে, নিজদিগকে সে সব সম্প্রদায়ের লোকের জোর করিয়া Pessimist না বলিলেও, তাঁহারা Pessimist। অতএব Pessimism Universal Experience.

দ্বিতীয় কথাটি statistics সম্বন্ধে। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে এরূপ কোন statistics সম্ভবপর নহে। কিন্তু সেজন্য Optimistদের উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই; যেহেতু তাঁহাদের Philosophy ঐরূপ কোন statistics-মূলক ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তাঁহারা যদি বলেন যে, Pessimism Dogmatic, Environmental, ও Temperamental, তাহা হইলে আমরাও বলিব যে, তাঁহাদের Optimismও তাহাই। Pessimismটা যে Dogmatic, Environmental ও Temperamental নহে, তাহা আমি পরে দেখাইব। আপাততঃ দেখাইব এই যে, Ethical life বা ধর্ম্ম-জীবন Pessimism ভিন্ন সম্ভবপর নয়—Science ও Evolutionএর উপর কোন Ethical theory দাঁড় করান যায় না, অতএব Pessimism সম্বন্ধে Scientific basisএর কথা উত্থাপন করা একটা মারাত্মক ভুল। আর Science ও Evolutionএর দিক দিয়া দেখিলেও Optimismএর কোন স্থানেই নাই; বরং Science ও Evolution হইতে যে Pessimism পাওয়া যায়, সেটা, আমি যে অর্থে Pessimism শব্দ ব্যবহার করিতেছি, সে Pessimism নয়। সেটা সেই Pessimism,

যাহা চিন্তা করিলে আত্ম-হত্যা ভিন্ন উপায় নাই ; কারণ সে Pessimism বলে যে, মানবের কোন কালে কোন আশা নাই এবং মানবের জীবনের কোনই উদ্দেশ্য নাই ।

এই Ethecal lifeএর testই প্রধান test। আমি এই প্রধান কষ্টি-পাথর বা Crucial test দ্বারা Pessimismএর বিচার করিব। ভগবান থাকুন, বা না থাকুন পরলোক থাকুক্ বা না থাকুক্, আমি যদি Ethical ideal পাইলাম, তাহা হইলে আমার জীবনের meaning বা উদ্দেশ্য পাইলাম। আমার জীবন-ধারণ তাহা হইলে সার্থক হইল।

বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে কিছুই পাইব না। মানবের যেখানে মানবত্ব, Pessimism ও Optimism নামক সমস্যার সমাধান সেইখানে, এবং জীবনেরও সমাধান সেইখানে।

মানবের মানবত্ব কোথায়? মানবের মানবত্ব আমরা দেখিতে পাই—সর্ব্ববিধ উন্নতির চেষ্টায়, Becoming এবং Beingএ, Creative ar এ ; এবং সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত মানব তিনিই যিনি জিতেন্দ্রিয়, বীতরাগভয় ক্রোধঃ এবং বিশ্ব-প্রেমিক। এই উন্নতির মূলে কি, সেটা যদি আমরা তলাইয়া দেখি, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহা-দুঃখ বোধ বা Pessimism ছাড়া আর কিছুই নহে। পার্থিব উন্নতির মূলে necessity বা দুঃখ বোধ ; এবং আমরা সকলেই জানি যে, Necessity is the mother of inventions। এই জড়-জগতে দুঃখ বা অভাব বোধ হইয়াছে বলিয়াই Science ও Artএর উন্নতি ; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দুঃখ বোধ হইয়াছে বলিয়াই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি ; আর অন্তর্জগতে দুঃখ বোধ হইয়াছে বলিয়াই Moral and Spirtual progress। এই Moral ও Spiritual progresএর দিক্ দিয়া বা জীবনের আদর্শের দিক্ দিয়া এ প্রবন্ধে বিষয়টির বিচার করিব ; কারণ, আধ্যাত্মিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি, ইহা দ্বারাই Civilisation বিচার্য্য এবং মনুষ্যের মনুষ্যত্বও ঠিক এইখানে।

Moral lifeএর বাংলা হইবে ধর্ম্ম-জীবন,—নৈতিক জীবন নহে ;

কারণ, সংস্কৃতে নীতি মানে policy। আর Religionএর বাংলা ধর্ম্ম না হইয়া তত্ত্ব বিষয়ক মত হওয়া উচিত। Conscienceএর বাংলা হইবে ধর্ম্ম-বুদ্ধি, বিবেক নহে, কারণ, সংস্কৃতে বিবেক মানে নিত্যানিত্য বিবেক। এই Moral Life, Life of Coscience বা ধর্ম্ম জীবনটা কি? ইহার উৎপত্তি কোথায়? Moralityর Evolution হইয়াছে এ কথা স্বীকার করি; Evolution তাহারই হইতে পারে যাহার অস্তিত্ব আছে; অর্থাৎ যাহা involved বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান। যেখানে Involution নাই সেখানে Evolutionও নাই। যাহা নাই এবং কোন কালে ছিল না, তাহার Evolution কি প্রকারে হইতে পারে? কিন্তু Evolution হইয়াছে বলিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া Evolution চলিতে থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। এটা Scienceএর কথা নয়—Hegel—দর্শনের কথা Infinite possibility টা Hegel—দর্শনের Fiction। উহার কোন প্রমাণ নাই। Infinity ও Possibility কথা দুইটি পরস্পর—বিরোধী। Infinite মানে ever-lasting yea---সৎ। ইহার আবার Possibility কি? Possibility শব্দে ভবিষ্যৎ বুঝায়। Infinityর আবার অতীত, Infinityর আবার ভবিষ্যৎ? Infinityর তাহা হইলে অংশ আছে? কোন্ Mathematicsএর মতে Infinite অংশ বিশিষ্ট, কোন গণিত-শাস্ত্রবিৎ জানাইলে সুখী হইব। গণিতশাস্ত্রে ওকথা নাই বলিয়াই গণিত শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট শুনিয়াছি আর বেদান্তে Infiniteকে বলে নিষ্কলম্। Mathematics ও বেদান্তের সিদ্ধান্ত এক।

Involution ব্যতীত Evolution হইতে পারে না। আর অনন্ত কাল ধরিয়া Evolution চলিতে পারে না, এ দুইটি তত্ত্ব অন্যান্য আরও অনেক তত্ত্বের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের জগতের দার্শনিক চিন্তায় মৌলিক এবং মস্ত বড় দান। তাঁহার পূর্ব্বে এ সমস্ত কথা কেহ বলেন নাই জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ—" এই পাতঞ্জল সূত্রদ্বয়ের এরূপ ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখি নাই। Evolution তত্ত্বটা ত'—Biology আলোচনার ফল। আর Hegelএর দর্শন এক সময়ে যে অত লোকপ্রিয় হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ, Science ও Evolution

এর সঙ্গে Absolute এর খাপ্ খাওয়াইয়াছেন বলিয়া। তিনিও মনে করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেকেই মনে করিয়াছিলেন। কি দুর্দ্দশা Absoluteএর? সাধে কি আর বর্ত্তমান যুগের Pragmatist নামক কালাপাহাড়েরা Hegelএর Absoluteকে Zero বলিয়া—উপহাস করেন? অমন Absolute টাকে ধামা চাপা দিলেই হয়।

(ক্রমশঃ)

"ভারতবর্ষ
আশ্বিন } —অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র এম্-এ

ভোগ ও ত্যাগ

আমরা মুখে যতই ত্যাগ-বৈরাগের ভাব, ধর্ম্মের ভাব প্রচার করি না কেন, আমাদের ভেতরে ভেতরে কিন্তু ভোগের ভাবটাই ষোল আনা। ভোগ বাসনা ঠিক ঠিকমত চরিতার্থ কর্‌তে গেলে যে শ্রম, যে কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য প্রভৃতির আবশ্যক, তা আমাদের আদপেই নেই। আমরা অলস, শ্রমবিমুখ, ধৈর্য্যহীন, আশাহীন, উদ্যমহীন, যেন তেন প্রকারেণ জীবন ধারণে অভ্যস্ত, তাই ভোগটাকে আমরা জড়ের ধর্ম্ম বলে প্রচার করি। কথামালার গল্পে শৃগালের নিকট আঙ্গুর ফল যেমন টক্ আমাদের নিকট ভোগটাও তেমনি জড়ের ধর্ম্ম। এই যে ভাবের ঘরে চুরে, এ থাকতে কি আর আমাদের ধর্ম্ম হবে, না ভগবান আমাদের কথা শুনবেন। স্বামিজী বলতেন, "আহাম্মকের কথা মানুষেই শুনে না, আর ভগবান!" বাস্তবিক আমরাত সব আহাম্মকের দল, আমাদের কথাও যে মানুষেই শুনছে না, আর ভগবান কি শুনবেন। এই যে রাতদিন বল্‌ছি, "ভোগটা জড়ের ধর্ম্ম, ত্যাগটা চৈতন্যের ধর্ম্ম, ত্যাগেই পরাশান্তি" প্রভৃতি, কে শুনছে আমাদের কথা! বরং সবাই আমাদের পদ দলিত করে, সাহঙ্কারে আমাদের বুকের উপর দিয়ে বীর বিক্রমে

চলে যাচ্ছে, আর দুনিয়াটা মহা আরামে ভোগ করছে, আর আমরা বল্‌ছি, "দলুক না, সহ্যকর, যে সয় সেই রয়, চিন্তা কি, ভগবান আছেন, ধর্ম্ম-আছে, এর বিচার হবেই হবে, এর উপযুক্ত প্রতিফল ওরা একদিন পাবেই পাবে। আমরা ত আর ঐহিক ভোগ সুখ চাই না, ওরা নির্ব্বোধ তাই জড়ের উপাসনা করে, আমাদের ওতে দরকার নাই, ইত্যাদি।" এই হল আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান, এই হল আমাদের ত্যাগ মাহাত্ম্য ! ইহ-কালে যদিও খেতে পাচ্ছিনে, যদিও রোগে শোকে, দারিদ্র্যে প্রতিদিন পিষ্ট হয়ে মরছি—এত লাঞ্ছনা, এত অপমান, এত আঘাত যদিও নীরবে সব সয়ে যাচ্ছি ; কিন্তু পরকালত আছে, পরকালে এর পুরস্কার আমরা অবশ্য পাব, পরকালে আমাদের এদুঃখ কষ্ট থাকবে না, আমরা মহাসুখে থাকব। আমাদের ত্যাগ-বৈরাগ্য, আমাদের তিতিক্ষা এ কথনও বৃথা যাবে না। এই যে ভাব এও কি বলতে হবে, আমাদের ত্যাগের লক্ষণ, আমাদের ধর্ম্মের লক্ষণ ? এযে ঘোর কাপুরুষতার, ঘোর দুর্ব্বলতার লক্ষণ, এযে মহাবীর্য্যহীনতার লক্ষণ, মহা তমো গুণের লক্ষণ। স্বামিজী বলতেন, "যে ভগবান আমাকে ইহকালে খেতে দিতে পারে না, সুখে রাখতে পারে না, সে ভগবান যে আমাকে পরকালে খেতে দেবে, সুখে রাখবে তা আমি বিশ্বাস করি না।"

ঠিক কথা, আসল কথা হচ্ছে ভায়া, ভোগই বল আর ত্যাগই বল, কোনটাই আমাদের মত অলস, কাপুরুষ, দুর্ব্বলের, আমাদের মত হীনবীর্য্যের প্রাপ্য নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আর নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। কাজেই ভোগই চাও, আর ত্যাগই চাও, বীর্য্যবান হতে হবে, বিপুল অলসতা, দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা সব দূর করে দিতে হবে, অভিঃ হতে হবে, উদ্যমে কর্ম্ম করতে হবে, তবেত বসুন্ধরা ভোগ করতে পারবে, তবেত আত্মাকে লাভ করতে সক্ষম হবে।

আর ভোগকে ছেড়েই কি তুমি ত্যাগের অধিকারী হতে পারবে ? আগে বীর্য্যবান হয়ে চেষ্টা উদ্যম করে দুনিয়াটা ভোগ কর, তবে ত ত্যাগী হতে পারবে ; এতটুকু ভোগ করতে পারনি, ত্যাগ করবে কি ! ভোগটাকেই ত ত্যাগ করবে। আমাদের ভায়া ঐ স্বামিজী যা বলেছেন,

'না আছে ভোগ, না আছে যোগ।' এমনই শোচনীয় অবস্থা আমাদের হয়েছে তাই মনে হয় আমাদের ইহকালেও দুর্গতি, পরকালেও ততোধিক।

আমাদের দেশটা ত্যাগের দেশ বটে ; কিন্তু আমাদের এখন উঠতে হবে ভোগের ভেতর দিয়ে, কেননা আমরা এখন ঘোর তমো আচ্ছন্ন হয়ে আছি, রজোর ভেতর দিয়ে, প্রবল কর্ম্ম স্রোতের ভিতর দিয়ে না উঠলে ত আর সত্ত্বে পৌছিতে পারব না, রজোকে ডিঙ্গিয়েও সত্ত্বে পৌছান যাবে না, আর সত্ত্বে পৌছিতে না পারলে, ত্যাগেও আমাদের অধিকার নেই, তাই ভোগটাকে আমাদের উপেক্ষা করলে চলছে না, ভোগ টাকেই আমাদের এখন বিশেষ করে আঁকড়ে ধরতে হবে। আমরা মুখে যদিও ত্যাগ ত্যাগ করি, আমাদের মনটা কিন্তু ভোগবাসনায় জড়ীভূত হয়ে আছে। আর ভোগেও ত আমাদের সতিকার বৈরাগ্য আসেনি, আমরা যা বৈরাগ্যের ভাব বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে থাকি, ওটা কপট বৈরাগ্য, মোটেই আন্তরিক নয়। ভোগে সত্যি করে বিরক্তি না আসলে ত্যাগেও আসক্তি আসবে না। আর ভোগও একটু আধটু না করতেই কি অমনি তাতে বিরক্তি এসে যাবে! তাই চেষ্টা চরিত্র করে আমাদের এখন ভোগের মধ্য দিয়েই উঠতে হবে, উঠে পড়ে লাগতে হবে, ত্যাগের ভান ছেড়ে দিয়ে মন মুখ এক করে কাজে লেগে যেতে হবে, তবেত আমাদের দুর্গতি ঘুচবে। যারা আজ তুচ্ছ জ্ঞানে, পদদলিত করে সাহঙ্কারে আমাদের বুকের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তারা তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সরে দাঁড়াবে, দয়া করে নয়, উপেক্ষা করে নয়, প্রতিঘাতের ভয়ে ; তখন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হবে, আমাদের কথা তখন তারা ঠিক ঠিক শুনবে, শুধু তারা কেন, জগতের সবাই শুনবে, ভগবান পর্য্যন্ত! ভগবানও তখন আমাদের সহায় হবেন। God helps those who help themselves. যাদের নিজেদের ভেতর চেষ্টা চরিত্র আছে, ভগবান তাদের সহায় হন।

মুখে ত আমরা রাতদিন ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বলছি, কিন্তু কাজে কি কচ্ছি, তা' কি একবার ভেবে দেখি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে

কুকুরের মত রাতদিন ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি। ভায়ের সঙ্গে ভায়ের মিল নেই, ছেলে বাপের সঙ্গে, বাপ ছেলের সঙ্গে এক ঘরে ঘর করতে পারেনা। রাতদিন কেবল হিংসা, দ্বেষ লেগেই আছে। নিজে ভিক্ষুক, খেতে পাইনে, আবার বিয়ে করে 'স্যাঁতসেতে ঘরে ছেড়া কাঁথায় শুয়ে শুওরের মত' বছর বছর ছেলে মেয়ের জন্ম দিচ্ছি, আর ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি করছি, সাত বছরের মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি, বার বছরের মেয়ে ছেলে পুলের মা হচ্ছে, যা জন্মাচ্ছে, তার চেয়ে মরছে বেশী, যেগুলো বেঁচে থাকছে, সেগুলো মৃত্যুবিভীষিকাকে আরও বিভীষিকাময় করে তুলছে! এ সব কিনা আমাদের ত্যাগ-বৈরাগ্যের লক্ষণ! আর যারা মহাবীর্য্যবান, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে দেশ বিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে, রাজ্য বিস্তার করে দুনিয়াটার উপর আধিপত্য করছে, ঝড় তুফান গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌ছে না জলে, স্থলে, আকাশে যাদের অবাধ গতি, তারা কি না জড়বাদী, তাদের কি না পরকালে নরক! আর আমরা-যারা খেতে পাইনে, রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত, রাতদিন ঘরের কোনে বসে বসে কেবল মরণের দিন গুণছি, আর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পলে পলে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব কচ্ছি, আমাদের কিনা পরকালে অনন্ত স্বর্গ! এর চেয়ে আর আত্ম-প্রবঞ্চনা, এর চেয়ে ভণ্ডামী কি হতে পারে? বাঁচতে হলে, উঠতে হলে, এ সব ভণ্ডামী ছেড়ে দিতে হবে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, সরল সত্য পথে চলতে হবে;
আসুক, সব নির্ভীকচিত্তে উপেক্ষা করে বীরবিক্রমে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হবে।

ভয়ই যত অনর্থের মূল। এই ভয়কে জয় করতে হবে, অভিঃ হতে হবে, তবেত দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর হবে, আমরা যে মরণের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছি। একেবারে জড় হয়ে গেছি! পাশ্চাত্যদের জড়-বাদী বলে আমরা বিদ্রূপ করি, কিন্তু আমরা যে একেবারে জড়-বিগ্রহ, তা কি একবার ভাবি? কেবল শুয়ে শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছি, আর মনে মনে ভাবছি আমরা সত্বগুণসম্পন্ন বড় একটা আধ্যাত্মিক

জাত; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার মূলে যে অভির ভাব, নির্ভীকতার ভাব, সে ভাবটা আমাদের কোথায়? দুনিয়ার আর সব জাতের দিকে দৃষ্টি-পাত করে দেখ, দেখবে তারা যেমন অভিঃহয়ে, নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা একটু এগুতে হলেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাই, এমন কি এক পা' এগুতে গেলে, হাঁচি, টিকটিকিকে পর্য্যন্ত আমাদের ভয়! যারা অভিঃ হতে পেরেছে, আধ্যাত্মিকতা তাদের কাছে বড় দূরে নয়, আধ্যাত্মিকতা লাভ করা তাদের নিকট বড় কঠিন নয়, কিন্তু আমাদের মত ভয়াতুর জীবের পক্ষে সেটা অতি কঠিন,—অতি দূর। সেইজন্যই বলছি, আমাদের এখন অভি হতে হবে, নির্ভীকচিত্তে দুনিয়ায় আর সব জাতের সঙ্গে তালে তালে পা' ফেলে চলতে হবে, তা হলে আধ্যাত্মিকতা লাভ করাটা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে আসবে। এ ছাড়া আমাদের বাঁচবার আর উপায় নাই, মুক্তির আর পথ নাই, এ না হলে মৃত্যু নিশ্চিত, শমন শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করেই স্বামিজী বলেছিলেন, "জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?"

তুমি যে বীর, বীরের ধর্ম্মই হচ্ছে অভিঃ হওয়া, তোমাকে অভিঃ হতে হবে; তোমার স্বরূপকে চিনতে হবে, বুঝতে হবে তুমি কে, তুমি কার সন্তান! কালের কাল মহাকাল যাঁর পদানত, সেই শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী মা রাজ-রাজেশ্বরীর সন্তান তুমি, 'ভয় কি তোমার সাজে?' ভয়কে এই মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ কর, জাগো, তমোনিদ্রা পরিহার কর, স্বপ্ন ঘুচে যাক, জড়তা টুটে যাক, প্রবল রজোগুণ সহায়ে নব উৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; যদি বাঁচতে চাও, যদি দুনিয়ায় ভীষণ সংঘর্ষণের ভেতর আত্মরক্ষা করে টিকে থাকতে চাও, তবে—

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল।
এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল
মৃত আবর্জ্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে

এই কর্ম্মধামে। দুই নেত্র করি আঁধা,
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতি পথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা, করে দিয়ে দূর,
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দ উদার উচ্চ।"

—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক।

পুস্তক পরিচয়

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। **গুরু-শিষ্য**—শ্রীনিশিকান্ত দত্ত প্রণীত—মূল্য চারি আনা। বিধুরঞ্জন সান্যাল কর্তৃক প্রকাশিত—**মোহমুদ্গর** (বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদসহ)—মূল্য দুই আনা। **হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ**—স্বামী বিবেকানন্দ—মূল্য ছ পয়সা। **আদর্শ কি—ত্যাগ না ভোগ**—স্বামী বিবেকানন্দ—মূল্য দুই আনা। **আমায় মানুষ কর**—স্বামী বিবেকানন্দ—মূল্য এক আনা।

সংঘ-বার্ত্তা

১। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পর পর নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতা কয়টীর অনুষ্ঠান হইয়াগিয়াছে। ২৩শে কার্ত্তিক রবিবার চরকা প্রতিযোগিতা। মোট ২৫ জন প্রতিযোগী ছিল। তন্মধ্যে চারজন অল্প-বয়স্কা বালিকা ছিল। প্রত্যেকেই কিছু কিছু পারিতোষিক পাইয়াছিল।

গত ৵ কালী পূজার দিন Sport compitition হইয়াছিল। তাহাতে Cycle, দৌড়, লম্ফ, হামাগুঁড়ি, দড়িটানা প্রভৃতি এবং তুব্রি বাজির অনুষ্ঠান ছিল। প্রত্যেক প্রতিযোগীকেই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

গত ৩০শে ডিসেম্বর রন্ধন প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। উহাতে মোট ১৫ জন প্রতিযোগী ছিল। প্রত্যেককেই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

অগামী ৬ই পৌষ গৃহ-শিল্প প্রদর্শনী হইবে।

২। গত ৫ই ডিসেম্বর বেলুড়মঠে শ্রীমৎস্বামী প্রেমানন্দজীর জন্ম-মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

৩। আগামী ৩রা পৌষ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে।

৪। আমরা দীনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্য্য বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। এই আশ্রম ১৩৩০ সালের ২১শে ভাদ্র স্থানীয় এসিস্‌টেণ্ট্-সার্জ্জেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে উহা কার্য্যের প্রসারের সহিত একখানি ভাড়া বাটীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি আশ্রম হইতে হইয়া থাকে—(ক) ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিবেশন (খ) পূজা পাঠ (গ) সেবাকার্য্য—নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে কলেরা প্রভৃতি মহামারীর আবির্ভাব হইলে সেবক প্রেরিত হয় (ঘ) কালাজ্বর এবং ম্যালেরিয়া

চিকিৎসা-কেন্দ্র পরিচালন—অদ্যাবধি ১৭৩টি কালাজ্বরের রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে (ঙ) ঔষধ, পথ্য, বস্ত্রাদির দ্বারা দরিদ্রগণের সেবাও হইয়া থাকে। এই শিশু প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমরা সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি।

৫। আগামী ৪ঠা মাঘ ইং ১৭ই জানুয়ারী শনিবার পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের বেলুড়মঠে তিথি পূজা ও উৎসব।

৬। (ক) গঙ্গা-যমুনা-বন্যা-সেবাকার্য্য—মিশন গত অক্টোবর মাসে বন্যা-পীড়িত লোকের সহায়তার জন্য হৃষীকেশে ও কনখল হরিদ্বারে ২টী কেন্দ্র খুলেন। ইহার পর অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে নিম্ন লিখিত কেন্দ্র হইতে যে কার্য্য হইয়াছে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।—

(খ) জেলা সাহারানপুর—ফেরুপুর কেন্দ্র এই কেন্দ্রের বিস্তৃত কার্য্য বিবরণী পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণ ও সাময়িক সাহায্য কল্পে ২৫৮ টাকা বিতরণ করা হইয়াছে।

(গ) কনখল (হরিদ্বার) কেন্দ্র—চামার জোলা ও মেথরদের ১৯ খানি গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে মোট ১০৮৲ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) লাক্‌সার থানার অন্তর্গত মতোলী কেন্দ্র হইতে বানগঙ্গার ধারে অবস্থিত ১০ খানি গ্রাম তদন্ত করিয়া ৭টী গ্রামে ৩৬টী পরিবারের গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে আংশিকভাবে ১৭২৲ টাকা সাহায্য করা হইয়াছে। এই গ্রামগুলির মধ্যে নিহিন্দপুর ও ঝিগড়গাড়ী গ্রামের অধিকাংশ গৃহগুলিই ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) লাক্‌সার থানার অন্তর্গত বানগঙ্গা ও নীলধারার মধ্যে অবস্থিত নিরঞ্জনপুর কেন্দ্র হইতে ১৭ খানি গ্রাম তদন্ত করিয়া ১২টী গ্রামে ৫৫টী পরিবারের গৃহ নির্ম্মাণকল্পে আংশিকভাবে ৩০১৲ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কিছু অর্থ সাহায্যও করা হইয়াছে। এই গ্রামগুলির অধিকাংশই বন্যাবিধ্বস্ত। বাইবাটীগ্রামে ২৫ জন লোক বন্যায়

ভাসিয়া যায়। বাহালপুরি, রণজিতপুর এবং প্রতাপপুর গ্রামগুলিতেও ও লোক মারা গিয়াছে।

(চ) দেরাদুন জেলা—চোহরপুর (দেরাদুন জেলার যমুনার দিকে চক্‌রোতার পথে) কেন্দ্র হইতে ২১টী পরিবারের জন্য গৃহনির্ম্মাণ ও ১০ খানি কম্বল ও ২৯ খানি বস্ত্র বিতরণ বাবদ ১৭৩৲ টাকা খরচ হইয়াছে।

(ছ) হৃষীকেশ কেন্দ্র—যে কয়েকজন সাধু ও ব্রহ্মচারী বন্যায় পড়িয়া অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যে ছয়জন হৃষীকেশে ছিলেন তাঁহাদিগকে একখানি করিয়া গরম কম্বল ও কাপড় দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাধুদের কুটীর নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। বড় ঝাড়ীতে ও ছোটঝাড়ীতে পাকা ঘর ব্যতীত সাধুদের থাকিবার জন্য প্রায় ৭০০ কুটীয়া ছিল। ইহাদের কোনও চিহ্নই নাই। যে সকল সাধুদের কুটীয়া ছিল তন্মধ্যে যাঁহারা বন্যার সময় হৃষীকেশে ছিলেন না কিন্তু বর্ত্তমানে হৃষীকেশে আসিয়াছেন বা ক্রমশঃ আসিতেছেন তাঁহাদের জন্য যে কুটীরের প্রয়োজন একথা মিশন প্রথম আবেদনে জানাইয়াছেন। আমরা বিশেষভাবে সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

৭। আমরা গভীর বেদনার সহিত উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাকে জানাইতেছি, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অন্যতমা সেবিকা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যা শ্রীশ্রীগোলাপমাতা বিগত ৪ঠা পৌষ বৈকাল ৪টা ৪ মিনিটে প্রভুর পাদ-পদ্মে উপস্থিত হইয়াছেন।